

ଅ
- ଅ. ୨ ୨୨ -

}

୦୫ ଅ

୨୫ ଅ

୨୦୨୨

আর্য্যাবর্ত



স্বপ্নের চিত্র ।

REPRODUCED & PRINTED BY
THE ADHI PRINTING & PROCESS WORKS
11 Anderson Street Calcutta.

১৫

স: /
স্ব: প ৭৯

P29205

বর্ষবরণ সঙ্গীত ।

(ইঙ্গিতস্বা স্বয়ং)

বন্দে. কগদম্বা, নবীন, রমা !
মন্দাকিনী নির্ঝর স্থপিত্তলে,
ছায়া-যেতুফলৈশ্য নলে,
শ্রীধর কান্দীর উদয় অলে
চন্দ্রাশীষশিখরতঃ, সৌম্য ।
বন্দে. পল্লব, প্রিয়কান্ত, রমা ॥

নৈরাশ্রবদ : ব্রহ্মান প্রাপে
জুগোপনপ্রদানপ্রদানে ;
পৌরহানিয্যন্ত দৃষ্টদানে
সঙ্গীবনানন্দ সুবাপিগন্য ।
শান্তোদ্ধল, খাগত, বীর, রমা ॥

নির্ঝর-বাবানদসদ পর্ণে,
বৈশাখসুভাগাবপিরবর্ণে ;
জাগ বন্দ-বিধা-প্রোপাষমোহজাভা-
বীজসুপুঞ্জ দহি, কুজ, মধ্য ।
এস তেজোময়োধীপ, নবীন, রমা ॥

শ্রীকালিদাস রায় ।



একাদ্রবর্ত্তি-পরিবার ।

(আলোচনা ।)

সাহিত্য-পরিষদে গঠিত ।

একাদ্রবর্ত্তি-পরিবারের স্বৰূপের কথা আমরা অনেকই অল্পবিস্তর জানি—কেম না আমরা অনেকই ভুক্তভোগী । সস্ত্রিতি, বহিঃসংস্কার আখ্যায়িক-বর্ণিতে স্বাক্ষরীকৃত পুস্তক কি তাহা চিত্রিত হইয়াছে তাহার আলোচনা করিতে গিয়া একাদ্রবর্ত্তি-পরিবারের কথা নূতন করিয়া মনে উদয় হইয়াছে । এ সম্বন্ধে আমার জ্ঞানবুদ্ধিতে যে চুঁকু আসিয়াছে, তাহা লিপিবদ্ধ করিতেছি । সমাজতত্ত্ব বড় জটিল ব্যাপার, সব কথা যে বর্ণিতে বা বুঝাইতে পারিয়াছি, একপ বিবেচনা করি না ।

একাদ্রবর্ত্তি-পরিবার অবশ্য তবু স্বাক্ষরী ও তাঁহার এক বা একাধিক বধূকে লইয়া নহে—বধূগণের জ্যেষ্ঠস্বাক্ষরী পুত্রস্বাক্ষরী অথবা মাসস্বাক্ষরী স্বামী-স্বাক্ষরী কোন কেম কেহে পিসস্বাক্ষরী মনদ প্রভৃতি বৃহৎ পরিবারে বিস্তার করেন । আবার ফাঁদবস্ত্র তাঁহাদিগের পুত্রকন্যা পুত্রবধূকন্যা প্রভৃতিও সেই সঙ্গে গৃহাছেন । তবে আজকালকার দিনে এরূপ বৃহৎ গোষ্ঠীর একত্র অবস্থিতি আর দেখা যায় না । সেই জন্য কয়েকটি সম্পর্কের কথাই বলিব ।

আর এক কথা । একাদ্রবর্ত্তি-পরিবার কেবল মাতৃপুত্রী নহে—স্বামী, স্বতন্ত্র, ভ্রাতৃপ, দেবদ, জ্যেষ্ঠস্বতন্ত্র, বৃদ্ধস্বতন্ত্র অথবা মাসস্বতন্ত্র, মাসস্বতন্ত্র প্রভৃতি পুরুষগণও তাহা অন্তর্ভুক্ত । কিন্তু প্রীতনের সম্ভাব-সস্ত্রীতির উপরই পারি-
-ব্যতিক্রম শাস্ত্র অধিক পরিমাণে নির্ভর করে । সেই জন্য তাঁহাদিগের কথাই বেশী করিয়া বলিতেছি । শাস্ত্র আছে—

স্ত্রী প্রধানং যতঃ প্রাহগার্হস্থ্য পতিভ্যাঃ যুগ ।

যত্নস্বা পরিচ্ছিন্ন করিবার জন্য, প্রায়শ্চৈ একাদ্রবর্ত্তি-পরিবার-প্রধানস্বতন্ত্রে সাধারণ ভাবে চিত্রিত আলোচনা করিব ।

আমাদের সমাজের সঙ্গে ইউরোপীয় সমাজের যে সকল প্রভেদ পরিস্ফুট হয়, তন্মধ্যে পরিবার-গঠন-প্রণালী অন্যতম । ইউরোপীয় সমাজে পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেই স্বতন্ত্রতা লাভ করিয়া স্বাধীন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন । পুত্রপক্ষীদিগের ভিত্তিতেই প্রাকৃতিক নিয়মবশে এই পদ্ধতিবন্ধন-ক্রিয়া সংশোধিত হয় । ইউরোপীয়

মানব-সমাজেও সেই নিয়ম বহনান। যুরোপীয় যুগে যৌননিষ্ঠাচেনের পর যতই বরকরণা পাতেন; স্বামি স্ত্রী Social unit রূপে 'হৃদয়ে একেলা' থাকেন। বাপমা ভাইবোন লব পুত্র—যে ত বৎসরান্তে বড়দিনের সময় তাঁহাদিগের সহিত একবার আনন্দমিলন হয়, এই পন্থা। অনিষ্টাঙ্গি, বিলাতী বাদ্যযন্ত্র পিরাণো বাজাইতে হইলে একজন খাজনার কল টিপিয়া বেগ বাহির করেন, অন্ততন তাঁহার সম্মুখে বরাদিগির পুস্তকের পাতা উন্টাইয়া যান। বিলাতী স্বামিষ্ঠীর জীবনের সুরত ঠিক এই পিরাণোর সুরে বাঁধা। অথবা আশাঘের আশা উপহার, ঠিক যেন এক চোপ আর এক কাঁসা।

বিলাতী পারিবারিক জীবন একতাগর আলান; আমাদের একাত্মবর্তি-পরিবার 'বীণা সত্ত্বর'। যাত্রার আসরে যেমন বাঁদ্যতবলা, ঢোলক, মৃদঙ্গ, মদিরা, বীণ-গেহালা, সেতার এলাক তানপুতা, প্রকৃতি বিবিধ বাদ্যযন্ত্রের বিভিন্ন মন্ত্রণে জমজমাট করিয়া তোলে, আমাদের পারিবারিক জীবনও সেইরূপ। বাপ, ভাই বোন, পুত্র কন্যা, পিসি মাসি, বুড়ী জোড়ী, ভাতৃবৃ ভগিনীপতি, ভাইপো ভাইবো, কোন কোন ক্ষেত্রে ভায়ে ভায়ে, ভায়েবো ভায়ে ভায়ে, এমন কি দুঃসম্পর্কের আত্মীয়া প্রকৃতিকে লম্বা পুণ্ডল জটিলতা-য়। ইহা আমাদের পল্লীপ্রান্তরের বিশাল বনস্পতি বটবৃক্ষের স্তম্ভ বিরট-কার। এক একটি পরিবার সমগ্র সমাজের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিরূপ (Miniature)। সেই ক্ষুদ্র ক্ষেত্রে সমবেদনা, পরাধীনতা, নিঃশেষতা, গুরুত্বের আত্মহুঁবর্তিতা, সেবনীলতা, দয়াদাক্ষিণ্য, প্রজ্ঞাভক্তি, দেবাধ্ব্য প্রকৃতি শিক্ষা করিয়া আমরা সমাজের সুরভংগে ক্ষেত্রে সেই শিক্ষার পরিচয় দিবার উপযোগিতা লাভ করি। বৈমম্বিক ধানের বীজ যেমন প্রববে অল্পপিসির জুমিখেতে উঠে হইয়া সেই স্থানেই অঙ্কুরিত হয়, পরে একটু বড় হইলে ধানের চারাগুলি সুপরিসর ক্ষেত্রে রোপিত হয়, সেইরূপ একাত্মবর্তি-পরিবারে যে সকল গুণ অঙ্কুরিত হয়, তাহা সমাজের গ্রন্থের ক্ষেত্রে পুষ্কল কলিত হইয়া উঠে।

যাত্রার কথা যদি তুলিলাম, তবে কবাটা আরও একটু খোলসা করিয়া বলি। অবশ্য যত্নে সুর বাঁধিবার পক্ষে একটা দিকটো হুটখোল শুনা যায়, কিন্তু সেটা আশেড়াইয়ের পালা। একবার লম্বিয়া গেলে একতানবাসন বড়ই দুর লাগে। সুর বাঁধিতে না পারিলে নিত্যন্ত বেহুয়া বেহায়া উঠে।

পারিবারিক জীবনেও সর্বদা বাববিসংবাদ কনহকারিতা হিংসাবোধ লাগিয়া থাকিতে নিত্যই বিসদৃশ দেখায়। কিন্তু উভয় স্থলেই অপকারীর দোষে এই কঠিনতা ঘটে। ইহার জন্য প্রথাও নির্ধা করা চলে না। জীবনসংগ্রামের কঠোরতার প্রভাবে আর তেমন গ্রামে গ্রামে, পাড়ার পাড়ায়, সমাজের আশ্রয় দেখা যায় না। স্বাধীনতার সর্বত্র প্রাণ, ভাষার বড় জোর ঘরে, একটা পিয়ানো বা হার্মোনিয়াম কিনিয়া অবসর-বিনোদন করেন। সেইজন্য জীবনসংগ্রামের কঠোরতার প্রভাবেই কি একপ্রাণ পরিবার প্রথাও উৎসর্গ হইতে বসিয়াছে?

যাহা হউক, এই প্রকার উচিত না যদিও কনহকারিতা ও বিলাসী সমাজের অশুকরণ স্পৃহায় কমিয়া আসিতেছে, তথাপি এখনও তাঁহারা আজও আশা-দ্বিগুণ মধ্যে বজায় আছে। 'তাই তাই তাই তাই' এমনবাক্যে কতদিনের পুরাতন তাহা জানি না। প্রায়শঃ-মহাভারতে, শুধু সর্বোচ্চ কেন, ঐশ্বর্যেরূপের মধ্যেও যে সৌভাগ্যের আদর্শ দেখা যায়, তাহা অতি মহৎ। জানি না, তৎকালে শিক্ষার সুযোগে আমরা সেই উচ্চ আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িতেছি কি না। সব কথা তাই যাহা বোঝবার করিতেন, তাহা আরের হাতে জানিয়া দিতে, কেবল লুকাইয়া নিজেদের জন্য কিছু রাখিতেন না; যাও অপকৃপাতে সব কল্পনের মধ্যে তাহা বটন করিয়া দিতেন। পঞ্চাশকের আমলের এই আদর্শ বহাদুর আমাদের সমাজে চলিয়াছিল। সেখানে বাঙালী সমাজে এক তাই শিদ্দেগে চাকরী করিতেন, অন্য তাই দেশে গিয়া পৈত্রিক মোতজমা দোষভেদ বা চাকরে জাতীয় উপার্জিত অর্থে ক্রীত এসম্মান সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করতেন, কোন তাই বা ঠায় বসিয়া বাইতেন, এইরূপ গীত ছিল। কিন্তু আজকাল যে তাইএর আর বেই, তিনি এ ব্যবস্থার অন্যতম হইয়া পড়েন, বিশেষতঃ রোজগারে স্বাধীনতা এ ব্যবস্থার বিসম প্রতিপত্তা হইয়া উঠেন। এখন কেহ নিজ পরিবারার্জিত সম্পত্তি পরে (অর্থাৎ মায়ের পেটের তাইকে) ভোগ করিতে দিতে চাহে না, দ্বিতীয় অর্থনীতির প্রাণকায় রূপে থাকে অর্থ দিতে রাগী হয় না। সমাবিত্ত লোক, পৈত্রিক বা' বিবেচনাই জুই চিহ্ন। পুত্রগণকে উচ্চশিক্ষা দিবার জন্য কন্যাদান উদ্ধার হইবার জন্য তাহা হস্তান্তরিত করিয়া ও ছাত্রপোকার জগতের মধ্যে অশুক লাগাইবার ন্যায়, ম্যাগেজিয়ার আলার গুহাশ্রয়ী বিজয় করিয়া, উদগ্রস্তের সংস্থানের জন্য শহরবাসী হইতেছে—সুতরাং

যা'র আপন আপন ওড়াইবা লইতে গন্ত। এ ক্ষেত্রে 'ভাই ভাই ঠাই ঠাই' হওয়া প্রিয় উপায় কি? সকলেই

পুত্রকপালের মত

কর্মক্ষেত্রে অবিবর্ত

স্বসার্থ সাধনে রত

কেনা ভাবে কাছাড়ে?

এ ক্ষেত্রে 'কলির ধৌ বরতাকানী' বলিয়া সকল পদাধীনা ভাষাভাষীর কাছে চাপাইলে চলিবে না। ফলতঃ, যে কাতবেট হটক, আকাকালকার দিনে যায়ে যায়ে বরকরণের সন্তাননা জন্মেই কমিয়া আসিতেছে। তবে এখনও পল্লীগ্রামে যায়ে যায়ে একত্র বাসে। ভূঁইয় ভূঁইয় দৃষ্টান্ত দৃষ্টিগোচর হয়। শাস্ত্রবোধ বিষয় এই যে, বহুকাল হইতে প্রচলিত ব্রতকথায় ও মেয়েলি ছড়ায় যত্নর স্বাক্ষর দেবর স্বামী প্রভৃতি সম্বন্ধে যেমন সব সাধ আছে, তা (বা নন্দ) সম্বন্ধে সেদণ কোন সাধ নাই। কেবল এক মনসার কপার খেণে স্ত্রীস্বের ঘরে শান্ত ঘরের সন্তান-সন্তানিত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। 'লক্ষণের মত দেবর পাব' নারীজীবনের এই সাধ ব্রতমত্রে দেখিতে পাও; কিন্তু আত্মকারী ঠাকুরপো ও মেয়েদা বৌদিদর চোখে ব্রতকথায় বা মেয়েলি ছড়ায় অঙ্কিত হইয়াছে, তালাত কৈ অণে হয় না। রামায়ণে শীতা ও লক্ষণের আদর্শ অবস্ত্র আশাধের প্রাচীন সাহিত্যের অমূল্য অবিনবর সম্পত্তি।

যাহা হউক, 'ভাই ভাই ঠাই ঠাই' হওয়াতে হস্ত হাণের গৃহীণগণকে বড় একটা সা লইয়া বর করিতে হয় না, কিন্তু বাঙালীকে পর্য্যাপ্ত বন্ধন করিয়া সংসার-তহাশের সম্পূর্ণ স্রলতা-সম্পাদন আজও আবকাংণে ক্ষেত্রে ঘড়ির উঠে নাই। অতএব স্ব'গুড়ী-বধু-সম্পর্কের কথার একটু বিপর্য্যভাবে আলোচনা করার প্রয়োজন। বাস্তবিক, এই স্ব'গুড়ী-বধু-সম্পর্কই আমাদের একাম্বর্ত্তি-পরিবারের মেরুদণ্ড। বিলাতী নারীর না জুলিলে, আমাদের সকল সামাজিক প্রথা, সকল আচার অলুটানই বেধ—অগ্রদেয় বাঁচিয়া বিবেচনা করেন, এমন এক শ্রেণীর শিক্ষিত লোক আছেন; তাহাদিগের অবগতির জন্য এবেই, ভাগ্যকরভাবে ডাক্তার পোলেনের (Dr. Pollen) বিলাতী বক্তৃতার কিংদণ উদ্ধৃত করিতেছি :—

The 'Mother-in law system' of training in Indian families had, in most cases, been fruitful of good results, and had produced Indian mothers and wives, not learned in the Western sense of the word, but skilled in gracious household

ways and endowed with a wealth of moral legendary lore or love of art and song.

(অস্থায়ী অনাবশ্যক, কেন না ইয়োজীনবীশমিগের জন্তই এই মজীর উদ্ভূত করা ।)

কল কবা, যাগুড়ীই বৃহৎকর্তার কর্তব্য বহুকে দ্বায়ে বসিয়া পিথাইয়া লয়েন। আবার যাগুড়ী অল্পবয়সী পুত্রবধূকে দেখিয়া সেন, পুত্রবধূ বয়সী গৃহিণী হইয়া সেই শিকারী হাংস পুত্রবধূ ও অল্পবয়সী দ্বা'কে দেন। এইরূপ পরস্পরক্রমে সামসারিক ও সামাজিক বর্ণকর্ণাশিকার নানীকরমে সংক্রামিত হয়। ইহাই আখ্যানবর্ষের দেশের প্রকৃত জীবিকা। বাহাতে এই শিকারীকায় প্রচুররূপে প্রবৃত্ত হইতে পারে তৎপ্রকৃতি আশ্রয়ের সমাজে কল্যাণের অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সে বিবাহ দেওয়ার রীতি প্রচলিত। কেন না, যেমন কলম বাঁধিতে হইলে বড় গাছের সঙ্গে চোরা গাছের সংযোগ ঘটাইতে হয়, সেইরূপ একজন পরমজ্ঞাকে একটি বৃহৎ পরিবারের ক্ষীণভূত করিতে দাইলে অল্পবয়সী কস্তার প্রয়োজন। বাহা হউক, তৎকালিক সামাজিকতার পক্ষে শুভকালীনি করা আপাততঃ আবার উদ্দেশ্য নহে। প্রসঙ্গক্রমেই কেবল এ কথা স্থগিত রাখ। এক্ষণে যাগুড়ীবধূ-সম্পর্কসম্বন্ধে একটু বিশদভাবে আলোচনা করিব।

ছেলেটি বাঁচিয়া বর্ত্তিতা থাকিবে, লক্ষ্মীস্বত্বপা বধূ করে আসিবে, এ সাধ-আজ্ঞার বাস্তবায়ন করে সকল জননীই করেন। অনেকের আবার এ সাধ প্রভূত প্রবল হয় যে, নৈশবেই পুত্রটির উদ্ধারবন্দন ঘটাইয়া দেন, দুধের ছেলের একটি খেলায় সাবী ঘুটাইয়া দেন—সংসারের ছায়াঘাচ্ছিতে জীর্ণ শুকনো খেলা দেখিয়া চক্ষুঃ সার্থক করেন। কুশলী ব্রাহ্মণের ঘরে উপনয়নের পর, বৎসর না ঘুরিতেই বিনাহজিরা সমাধা হইতে আখিয়া অনেক হুলে বেঁধিয়াছি। * মেরেলি ডড়ার ও ব্রতকবার, পুরঞ্জীরা 'গণবতী বৌ চান,' 'বৌরাভা ভাত বেঁধে চাঁদপানা ঘুচান'; সুমারীরা 'কৌশল্য যাগুড়ী পাব,

* বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বাহা দ্বায়েবদন প্রভৃতির আট বৎসর বয়সে প্রথম বিবাহ হয়, এবং সেই স্ত্রীর সন্তান পর আবার বয় বৎসর বয়সে বিবাহ হয়। বহিঃপ্রদেশের একজন বর্ষ বয়সে পঞ্চবর্ষীয়া কস্তার সহিত প্রথম বিবাহ হয়। -বহিঃপ্রদেশে মূলোপাখ্যানের আদমবর্ষ বয়সে প্রথম বিবাহ হয়। -বহিঃপ্রদেশে বিখ্যাতবর্গের একজন বর্ষ বয়সে বিবাহ হয়।

দশরথ বস্তুর পাব, সন্তানের মত দেবর পাব' ইত্যাদি প্রার্থনা করে। কিন্তু উভয়পক্ষেই এত সাধ করিয়া অনেক লম্বা শেব রক্ষা হয় না। বৌকীটুকী স্বাত্ত্বীর সাক্ষাৎও সম্বোধে অগ্রতুল্য নাই। অনেক ক্ষেত্রে বহুও মিথ্যাস্ত জাল ব্যাপ্তি করেন। কিন্তু উগ্রচর্য বহু অপেক্ষা রণচর্য স্বাত্ত্বীই বোধ হয় বেশী—কেন না ভাগ্যবতী বৌকীটুকী শব্দ রহিত আছে, কিন্তু স্বাত্ত্বীকীটুকী শব্দ নাই। ইহার কারণ বোধ হয় এই যে, তখনকার দিনে এত বোঝাচারিতা ছিল না, শাসনও খুব কঠিন ছিল। সুতরাং বহুরা প্রবলা হইতে পারিতেন না। আজকালও সম্বোধনক্ষেত্রে বহু উপর স্বাত্ত্বী-নন্দদের অত্যাচারকাহিনী মথো মথো কীর্তিত হয়। ঘটনাক্রমে সকল স্থানে মিথ্যাস্ত নীচ জাতির দৃষ্টেও সংঘটিত হয় না। তবে হুজুরী লোক হয়ত বলিবে, যে সকল ক্ষেত্রে স্বাত্ত্বী-নন্দ বহুর হাতে নিধাত্তিত করেন, সে সকল ক্ষেত্রে তাঁহারা লোকলজ্জাতমে কৌল-বাইরা কৌল চুরি করেন, বাপাটটা চাপিয়া ধারেন, প্রাঙ্ক আদালত পর্যন্ত গড়ায় না। তাই সে সব কথা সাধারণে জানিতে পারে না। নতুবা, স্বীকার করিতে হইবে যে, কবিকল্প কলির সোব কীটনে 'দুখল হ'বে বলী, স্বাত্ত্বীর বরিচুলি, বস্তুরে করিবে অপমান' বলিয়া যে ভাববুদ্ধবান্ধি কথিয়াছেন, তাহা কলিতে আরম্ভ হইয়াছে।

ব্রতকথা রূপকথা প্রভৃতির ভিতর সন্ধান করিলে দেখা যায় যে, সেকালেও জটিল-হুটলাপন সংসার-আসর বুদ্ধিরা ব্যাকিতেন। রূপকবার বহুর প্রতি স্বাত্ত্বীর নিষ্ঠুরতার উদাহরণ মিলে। যেহেতু হুজুর 'উড়কি গানের মুড়কি মিব স্বাত্ত্বী জুলাতে' 'এই শেব ছত্র সেবিলেই বিদিত হওয়া যায়, স্বাত্ত্বী কিসে কলিবে এই পরম দৃষ্টিস্ত। ওখ...ও সম্পূর্ণ ছিল।' হুই একটি ব্রতকবার স্বাত্ত্বী বহুরে ব্রতপালনে বাণ্য দিতেছেন, বহুর চমকও লাগাইতেছেন—কিন্তু শেবে স্বাধীলা বহুরে শুণে ব্রতের প্রোভাত্তার সদগতি হইতেছে এতদ বিবরণ আছে। বহুরের ব্রতে উদ্ভবের বা'র কথা বোধ হয় অনেকই জানেন। পক্ষান্তরে, শীতলাবতী ও মদসপুকার কবার শেবরতী স্বাত্ত্বী ও ভক্তিমতী বহুর চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে।

বারে বারে যেহেতু বহুরে প্রচলিত ব্রতকথা প্রভৃতির উল্লেখ করিলে বিজ-ব্যক্তিমণ হয়ত বলিয়া যাবেন, ইং শেবকেও পথোচিত ও বহুরে লুচি পাতিবার পরিচায়ক নহে। কিন্তু পরিতে গেলে, এই সব যেহেতু হুজুর ও

কদামত অতীত জীবন ও চাত্রে নিখুঁতভাবে প্রতিবিম্বিত । আমাদের যত্নের সোণের চাঁদ কবি বাঙালীর মেয়ের 'ব্রতকর্মা, উপকথা, লেখুতি পালন' অবতার চক্রেতে ঘোঁরায়েছেন বটে, কিন্তু কবাজি প্রবীক্ষনাৎ সেগুলির ভিতর যে সৌন্দর্য্যাদুর্বা, যে সমাকর্ষক আচারভঙ্গ, প্রদর্শন কাগরায়েছেন, তাহার পর আর কেহ যোগ দর সাহস করিয়া সেখানে কে টটকাগী দ্বিতে পারিবেন না ।

যাক্তজীবনঃ এই অসম্ভাব-অসম্ভ্রান্তর কারণ কি ? কথাতা ভবিতে আপনাদের হস্ত ত কেমন কেমন ঠোকবে, কিন্তু ইহা মনস্তত্ত্বের একটি সুন্দর প্রহস্তু যে, ভালবাসা পাত্রভেদে ভিন্ন ভিন্ন নাম ও রূপ ধারণ করিলেও মূলে এক । পত্নানবাসগ্যা, ভ্রাতৃত্বের, পাতপ্রীতি, পত্নাপ্রেম, সহোদরপ্রীতি, মাতাপিতার প্রতি ভক্তি, সকলই এক রূপের ভিন্ন ভিন্ন বিকাশ । যাতার সুপার্বজ প্রেম এবং পত্নীর পাবজ প্রণয়—এই দুই প্রকারের ভালবাসাই স্বর্গীয় বয় বহলেও উভয়ের মধ্যে প্রেমাত্মক যেবায়েনি, পাড়া আড়ি কাড়া-কাড়ি একটু ব্যাকবেই । সুতরাং বহু যৌবনহা হইলে জননীর মনে প্রতাপ-আশঙ্কা হওয়া অস্বাভাবিক নহে—বুঝ পত্নের মেয়ে বয়ে আসিয়া আমার পেটের ছেলেকে, আমার নাড়ীছেঁড়া বনকে, পর করিয়া বিবে । এই আশঙ্কার অনেক স্থলে যাক্তজীবনকে নানাপ্রকারে নিষাত্তন করিতে থাকেন, ছেলে বাহাতে নৌকে বিধ দেখে তাহার অবিরত চোঁকা করেন । ইহাতে বহুর জ্বরও অবশ্য ক্রমক্রমতঃপে অভিযুক্ত হইয়া উঠে না । ক্রমেই একটা পাড়া-ছাড়ি ভাব, একটা অবনিবনাও, আসিয়া পড়ে । কোন কোন ক্ষেত্রে আশঙ্কার কারণও বস্তুমান থাকে । বহুটি নিকিৎ বর-বর, হয় ত একটু রূপগাঙ্কিতা, এবং পুত্রটি দুর্বলচিত্ত, রূপলালসায় আসন্নাত্মায় ত্রৈণ হইয়া পড়ে (বিশেষতঃ যত্নর বা তৃতীয় পক্ষের হইলে), পত্নীপ্রীতি ও মাতৃভক্তি উভয় বৃত্তির সামঞ্জস্য রাখিতে পারে না, ফলে গর্ভধারিণী জননীর নানারূপ শাঙ্কনা-অব-মাননা ঘটে । বিষয় যাক্তজীবনের বেলায় এই কথাতালি বিশেষ ভাবে খাটে ।

মনস্তত্ত্বের সুন্দর বিশ্লেষণে অনেকে হস্ত মধুর রূপের পরিবর্তে বীতংস-রূপ সকার আশঙ্কা করিতেছেন । তাই সুন্দর তব ছাড়িয়া কয়েকটি মোটা কথা বলিব ।

সংসারে সর্বময়ী কর্ম্মী হইব, এই অভিলাষ সকল নারীই করেন, ইহা নারীর একটা বড় আশঙ্কার । সুতরাং, এই অধিকারে কেহ 'ভাগীদার' হুটিয়ে, এই অধিকার জুর হইবে, ইহা কোন নারীই বরদাও করিতে পারেন

আর্য্যাবর্ত



ললিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ।

২

না। অনেক সময়ে, ইহা হইতেই স্বাতন্ত্র্যবধূর কলহের উৎপত্তি হয়। আজকালকার দিনে নৃপুত্র আর প্রৌঢ়বয়স পর্যন্ত স্বাতন্ত্র্য অল্পবর্তিনী হইয়া চলিতে চাহেন না, বড়পাছেই আবডালে থাকার যে কি সুবিধা তাহা বুঝিতে চাহেন না, একটু পেয়াদা হইয়াই আপন গত্তা বুঝিয়া লইতে চাহেন। গুণবর স্বামীও অনেক সময় তাঁর দিক লয়েন। পক্ষান্তরে, স্বাতন্ত্র্য ও বধূর হাততোলা বাইতে চাহেন না, কোণঠেসা হইতে রাজী নহেন, বাঁচিয়া থাকিতেই মরার সামিল হইতে প্রস্তুত নহেন, হালিমুখে কর্তৃত্বক্ষমতা বধূর হস্তে ন্যস্ত করিতে সম্মত নহেন, ফলে ঘোরতর অশান্তি উপস্থিত হয়। এই অশান্তিনিবারণকল্পে সাধারণতঃ দুইটি উপায় অবলম্বিত হয়। স্বামী সত্ৰীক শকটারোহণে কর্তৃত্ব লে চলিয়া যান, যা হয় বেশে ফুঁড়ে আগলাইয়া থাকেন ও ভিটার সহ্য দেন, আর না হয় হিন্দুর পিঁজরোপোল কানী বা ঈশ্বর্যাবনে চালান করেন। আপত্তান্তি! * কোন কোন স্থলে আবার মুরারেরতুলীয়ঃ পন্থাঃ। জননী বিনাবেতনে পাটিকাবৃত্তি ও দাসীপুত্রি করিয়া পুত্রের সংসারে উদরারের সংস্থান করেন। অবশ্য এ সমস্ত কথাও বিধবা স্বাতন্ত্র্য বেলার খাটে।

যুগস্থায়ী এই বিষয় সমস্তা লক্ষ্য করিয়াই আমাদের মেরেলি শাস্ত্রে নিম্নলিখিত শ্রবণ প্রথা চলিত আছে—বর বিবাহকালে বলিয়া যান, ‘মা, তোমার দাসী আনিতে যাইতেছি।’ কিন্তু অনেক স্থলে ইহা তোকব্যকো পর্য্যবসিত হয়। মেয়েমহলে একটি কোতুককর উদ্ভট পুরাণ প্রবাদ প্রচলিত আছে, এই প্রসঙ্গে সেটির উল্লেখ স্থানোচিত। কথিত আছে, কুমার কার্ত্তিকের এক সময়ে আইবুড় নাম ঘুচাইবার জন্য বটা করিয়া বিবাহযাত্রা করেন, পরে কি একটা প্রয়োজনে গৃহে এক বৃহত্তর জন্তু করিয়া আসিয়া দেখেন, ঘরের মধ্যে মা দুর্গা দলহাত বাহির করিয়া বাইতেছেন। কার্ত্তিকের সর্বদা জননীর দুই হাতই ধঁকিতেন, বিম্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘মা, একি?’ মা দুর্গা বলিলেন—‘বাবা, বৌমা ঘরে এসে আর ত খেতে পাব না, তিনিই একেশ্বরী হইয়া উঠিবেন, তাই এই বেলা আন মিটিয়ে খেতে নিচ্ছি।’ বদানন জনিতা স্তম্ভিত হইলেন। তাহার চক্ষুঃ ফুটল, বিবাহের সাধ তাহার মাথার উঠিল। সেই অবধি তিনি অক্লান্তঃ।

* প্রভাশঙ্কর ঈশ্বর্য্যবনে হুজুর ত্রিবেণী মহাপুর কোতুকজলে বলেন যে, এই জন্তুই বাব হই পূর্বকালে বাপএকের ব্যবস্থা ছিল।

আর এক কথা। দুর্ভাগ্যের উপর প্রভাবের অভ্যাসের সাধারণ নিয়ম। শিশুকালে যেখানে যার, অধিক বয়স বালক অল্পবয়সে তাই ভগিনীতাকে নির্ভররূপে গ্রহণ করত। স্বাক্ষরী অভ্যাসেরও অনেক সময়ে এই সাধারণ নিয়মের ফল। আবার আমরা ছেলেবেলায় অনেকে যেমন মা-বাপ বা গুরুবহাশয়ের হাতে যে দার খাইয়েছি, সেই দার মার মূগ নিম্ন সন্তান বা ছাত্রের উপর চান্দাইয়া পরম প্রীতিলাভ করি, অনেক স্বাক্ষরীও সেইরূপ নিজের বহুকালের নির্ভরত্বের পুত্রবৎ উপর দিয়া দান তোলেন। 'কনি-কনক চতীতে 'স্বাক্ষরী-মনন, কিবা কৈল মনন,' বিজ্ঞানস্বর্গে 'সত্যিনী বাগিনী, স্বাক্ষরী রাগিনী, মননী রাগিনী, বিবের তরা,' গুরুকবির পৌরোহিত্যে 'স্বাক্ষরী মনন কত কথা কহ বৈকে,' মেরেলি ছড়ায় 'হাড় হ'ল ভালা ভালা মাস হ'ল দড়ি' প্রভৃতি পাঠ করিয়া মনে হয়, এই ব্যাপি আমাদের সমাজের মস্তাগত। আরও আমাদের কলিকাতা অঞ্চলে বয়সের বা ভয়ের ব্যাপারে বরের মা'র চিত্তে যে অপ্রসন্নতা হয়, তিনি সে আলটা বহু উপর কাড়িয়া তাহার সহিত ভবিষ্যৎ মনান্তরের সুত্রপাত করেন। আবার যদি বহু বিবাহের অল্প-দিন পরেই বিবহা হয়, তবে সেই অলক্ষ্যের দোষেই এই অত্যাধিক ঘটিয়াছে স্বাক্ষরীর মনে প্রবণতায় হয় এবং অতাপিনীর লাঞ্ছনা-সঙ্কটের সীমা থাকে না।

ইহার উপর, মননী ও ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁহার সুচিত্রিত 'পারিবারিক প্রবন্ধ' সতঃপ্রসঙ্গে স্বাক্ষরীর আর একটি আক্রোশের কারণ নির্দেশ করিয়াছেন—তাহা মেরেলি ছড়ায় নিম্নোক্তভাবে প্রথিত আছে :—

এমন সুন্দর যেরেটি আবার যাহেন পরের ঘর ।

আর গোদামুখীর মেয়ে এসে যাবে দুগের সুর ।

ইহার জন্যও স্বাক্ষরীর বহু ক বিষমরূপে দোষবার সন্তাননা। বরজামাই না রাখিলে মায়ে'র মনের এ বেদ মিটিবার উপায় নাই। বলা বাহুল্য, যেখানে কয়েকটি কারণ সন্থা বিবহা উভয় প্রেমীর স্বাক্ষরীর বেলায়ই ভুল্য-রূপে ঘটে।

এ পর্যন্ত বাহা বলিলাম তাহা হইতে অনেকে ভাবিতে পারেন, তবে বৃদ্ধি বাচ্চাণীর ঘরে নিত্য সঙ্গ কল্পে'র বৃদ্ধ অতিনীত হইতেছে, স্বাক্ষরী বহু যেখানিবে সোণার সংগার জালিয়া যাইতেছে। প্রকৃত কথা অবশ্য তাহা নহে। কেন না পেরণ হইলে এত দিনে সংগার স্থান হইত। যেহেতু

বসন্ত ও ভাদ্রমাসে বধু সস্তাবসস্ত্রীতিতে একত্র বাস আমাদের সমাজে অস্বাভাবিক ব্যাপার নহে। তবে ইতিহাসে যেমন দেখা যায় সপ্ত বর্ষ বাপী বা শতবর্ষ বাপী সম্বন্ধে, অল্পকাল স্থায়ী বা অধিক কালস্থায়ী বৃদ্ধ বাপ্যদের বৃত্তান্তই সচিব-দ্বারা বর্ণিত হয়, ত্রিশব্দ বর্ষবাপী শাস্তি-স্থলের বৃত্তান্ত বড় একটা বর্ণিত হয় না। সেই রূপ সমাজেও গৃহস্থদের বাপ্যারটাই সহজে চোখে পড়ে, সস্তাবের জীবন ততটা নজরে আসে না।

ইহাও অবশ্য স্বীকার্য যে, বিরোধের ব্যাপারেও উত্তর পক্ষের দোষ না থাকিলে কলহ হয় না, এক হাতে তালি থাকে না। এক সঙ্গে বস করিতে হইলে সময়ে সময়ে সামান্য একটু ঝিটমিট হয়, শুধু বাতুলী বধুতে কেন বাহিনীতেও হইয়া পড়ে। তাহা নষ্টব্য নহে। তবে আজ কালকার দিনে এমন অনেক অসহিষ্ণু বধু দেখা দিচ্ছিলেন যে, তাঁহাদের একটি সামান্য কথাই শোনে না, একটু নড়িয়া বলিতে বলিলে কাঁদিয়া কাটিয়া কুরুক্ষেত্র করেন। এ সমস্যাই কালের বর্ধ।

বাক্য বাতুলীর কথা সচিবদ্বারা বর্ণিত। যাদের কথা সংক্ষেপে সারিগ্রাহি। এক্ষণে মনন-ভাজের কথা একটু তুলিব।

অবশ্য ইহা স্বীকার্য যে, বাবানী বধুতে বাতুলী ও বা লইয়া যেমন ব্যর্থমাস বস করিতে হয়, মনন বা ভাজকে লইয়া সে রূপ বস করিতে হয় না। কেন না, আমাদের সমাজে সৎবা নাগীর ব্যর্থমাস পিত্রালয়ে বাস করা সাধারণ নিয়ম নহে। কালিবাসের প্রসিদ্ধ স্লোকার্ছ 'সতীমপি জাতি কুলৈক সংপ্রয়াং জনো-হনাথা ভক্তমতৌ বিশক্তে' অনেকেরই জানা আছে। * এমন কি বিশ্বাস মননও অনেক সময়ে পিতার বা স্ত্রীর গণগ্রহণ হইয়া শত্রুর বা স্বতন্ত্র অবর্তমানে, ভাতুর বা দেবরের পরিবারস্থ হইয়া থাকেন, ইহাই হিন্দু পরিবারের স্বাভাবিক বাস্তব। কিন্তু তথাপি সেকালেও সোণাও কোণাও এ কালেও স্ত্রীলোকের ঘরে এবং ঘনিষ্ঠ হইয়া সৎবা কন্যা পিতৃগৃহে বাস করেন, ইহা একেবারে অজ্ঞাত নহে। আর সন্তানপ্রসব, পাঁড়ার চিকিৎসা, গাভাপিতার সাংসারিক প্রয়োজনে, পারিবারিক উৎসব উপলক্ষে বিবাহিতা কন্যা পিতৃগৃহে নথো নথো আসিয়া বাস করেন, ইহা অবশ্য প্রচলিত প্রথা।

* মননবধু বিজ্ঞের ব্রহ্মদেবী কাম্বো (মণ্ডন মণ্ডে) স্ত্রীলোকের একজন কালিবাসের লোকটিও ভাবার্থের অঙ্গাঙ্গ আছে।

সুতরাং নন্দ-ভাণ্ডের পরস্পর স্নেহবন্ধন না থাকিলেও এ সকল ক্ষেত্রে অশান্তির সূত্রপাত হইতে পারে। পক্ষান্তরে বিধবা, বিশেষতঃ বানবিধবা সন্তানহীন। নন্দ, ভাণ্ডের সংসারে থাকেন এবং তিনিই সংসারের সর্বময়ী কর্ত্রী হইলেন, এ নিয়মও অনেক স্থলে দেখা যায়। এ সকল স্থলে সুধু গৃহস্থালীর কায় কেন সন্তান-পালনের ভারও বিধবা নন্দ লইয়া থাকেন। ছেলে মেয়েরা মা'র চেয়ে পিসিমাকেই চিনে ও ভীহারই নেওটা হইয়া পড়ে এবং পিসিমাও চিরসকিত মাতৃস্নেহ তাহাদিগের শিরে বর্ষণ করেন, এ দৃষ্ট বহু পরিবারে দেখা গিয়াছে। তবে আজ কাল নন্দের হাতে ক্ষমতা ছাড়িয়া দিতে ভাণ্ডেরা বড় রাজী নহেন।

নন্দের প্রতি স্বত্তরশাস্ত্রীর অর্থাৎ ভীহার মাতাপিতার স্নেহাধিক্যবশতঃ পক্ষপাত দেখিলে বধুর তাহা অসহ্য হয়। অনেক সময়ে এই পক্ষপাত বধুর কলন্য-প্রসূত বা ঘেব-সম্বন্ধে। কন্যা পিত্রালয়ে আসিয়া একটু আশ্রয় পায়, গৃহস্থালীর পরিচর্যসাধ্য কার্য সম্পাদন হইতে অব্যাহতি পায়, মাতাপিতার আন্তরিক ইচ্ছা; পীড়িতা বা আসন্ন প্রসবা অবস্থার ইহা ত অতি প্রয়োজনীয়। অথচ এইটুকুতেই বধু স্বত্তরশাস্ত্রীকে 'একডোকে' ভাবিয়া বসেন। কোন কোন নন্দও বে বধুর উপর একটু সর্কারি করিতে তৎপর, স্বত্তরালয়ে পতের কর্তৃত্ববীন থাকিতে হয় বলিয়া পিত্রালয়ে আসিয়া কর্তৃত্ব ফলাইতে বাঞ্ছা, ইহাও অস্বীকার করা যায় না। ইহার উপর আবার যদি স্নেহবন্ধ অগ্রজ বালা-সঙ্গিনী স্নেহশত্রী ভগিনীকে বহুদিন পরে পাঠিয়া তাহার আদর-বস্ত্র একটু বেশী বেশী করেন, তাহা হইলে বধুর তাহা আরও অসহ্য হইয়া পড়ে। নিজের প্রাপ্য আদর অপরে পাইল বলিয়া তিনি অভিমান করিয়া বসেন, ইহাতে একটু ঘেবাঘেবি, রেবারেবি আসিয়া পড়ে। এ ক্ষেত্রেও বিব্রোভের কণার উপরই বেশী জোর দিলাম। নন্দ-ভাণ্ডে গলায় গলায় ভাব, নন্দ বৌদিদি বলিয়া অজ্ঞান, ভাণ্ড ঠাকুরসি বলিয়া অজ্ঞান, এতদূর দৃষ্ট ও বাঙ্গালীর সংসারে বোধ হয় নিত্যন্ত বিরল নহে।

কল কপা, সাধাঙ্গণতঃ স্ত্রীজাতির আত্মপরায়ণতা, অপরিণামদর্শিতা, দৈহ্য-ঘেব, ক্ষুদ্রাশয়তা, স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা প্রকৃতির জন্য একান্তবস্তি-পরিবারের অশান্তি উপস্থিত হয়। বীহারী স্ত্রীলিঙ্গ অর্থে লিখাপড়া জানা বুঝেন, ভীহারী বলেন, স্ত্রীলিঙ্গের অন্তাবেই এই সব দোষ ঘটে। কিন্তু বীহারিগণের সেকালের পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা আছে, ভীহারী জানেন যে,

লিখাপড়া মা জানিরাও সেকালের বরনী গৃহিণীরা যবেই উদার-জন্ম।, স্নেহ-
শীলা ও অপক্ষপাতিনী ছিলেন। বরং হালের যে সব মেয়েরা কিকিৎ কেতাণী
বিভা উদরহ করিয়াছেন, তাঁহারা ই অতিমাত্র আত্মপরাধন; ও আপাত-
সুখাভিলাষিনী হইয়া পড়েন, ইহাই দেখা যায়। ঈর্ষাযেশ ও কুহাশয়তা ত
যেদে বার্ষপরতারই প্রকাশভেদ। অবশ্য সকল কালেই সু হু উভয় প্রকৃতির
মাত্রা আছে। কিন্তু আধুনিক শিক্ষা ও কালপন্থা যে পুরুষ ও স্ত্রীলোককে
অতিমাত্র বিলাসপ্রিয় ও আত্মসুখ পরায়ণ করিয়া তুলিতেছে, তাহাযে সন্দেহ
নাই। স্বাধীনতাপ্রিয়তা ত সম্পূর্ণ আধুনিক ব্যাপি। অনেক স্থলে ইহা
অসংযমের নামান্তর। পূর্বেই যত এখন আর বয়ঃস্বা মাতীরা স্বাক্ষী, কোষ্ঠ-
স্বাক্ষী, খুড়স্বাক্ষী, দিদিস্বাক্ষী, মাঝিস্বাক্ষী, মাসস্বাক্ষী প্রভৃতির বা নন্দদের
ভাবে থাকিতে চাহেন না। বড় বায়ের গিটোপনাও তাঁহারা বরদাশ করিতে
পারেন না। অনেক ক্ষেত্রে বড় যারও ইহাতে বিলক্ষণ দোষ আছে। তিনি
গোপনেই স্বামী পত্নী হইলে নিম্নের কোলপানে কোল টানেন, এ দৃশ্য
আধুনিক সমাজে বিরল নহে।

আবার পুরুষরাও এ ক্ষেত্রে বেকসুর খালাস পাইতে পারেন না। অধি-
কাংশে স্নেহ, পুরুষের দোষে স্ত্রীর চরিত্র কুহাশয়তা প্রভৃতি দোষহইত হয়।
পুরুষ কোন কোন স্থলে নারীকে অথবা প্রসন্ন ঘেন, কোন কোন স্থলে তিনিই
বিষয়সম্পত্তি লইয়া বিবাদ বাধাইয়া গৃহবিচ্ছেদে অগ্রণী করেন। স্ত্রীলোকের
চরিত্র-গঠন পুরুষের একটি গুরুতর দায়িত্ব। আমরা কয় জন এই দায়িত্ব
বুঝিয়া কায করি? এই কর্তব্য সম্পাদনের সুবিধার জন্য স্ত্রীজাতির অল্প
বয়সে বিবাহ দেওয়ার রীতি আমাদের সমাজে প্রচলিত। কিন্তু আজ কাল
পুরুষরা ইংরাজ সমাজের দেবাধোষ পিতাপুত্র, পিতৃবা ভ্রাতৃপুত্র, ভ্রাতায়-
ভ্রাতায় ব্যতন্ত্র অবলম্বন করিতে শিখিতেছেন এবং সেই বিবর্ষকী নারীগণের
কোমল স্বরকক্রেত্রেও সংক্রামিত করিতেছেন। আবার ইহাও সত্য যে, যদি
নারীপ্রকৃতিতে কুহাশয়তা দেবপরায়ণতা কলহ-প্রিয়তা প্রভৃতি মজ্জাগত
হয়, তবে পুরুষ হাজারও চেষ্টা করুন, কিছুতেই পরিবারে শান্তিস্থাপন
করিতে পারিবেন না। সেই জন্যই পুনঃ পুনঃ নারীজাতির কথাই বেশী
করিয়া বলিতেছি। বাহ্য হউক বিলাতী সামাজিক আদর্শের প্রভাবে,
কালপন্থা এবং জীবন-সংগ্রামের কঠোরতার বৃদ্ধি বশঃ অর্ধকৃত্তার
নিশ্লেষণে, এই জীবিত কারণে একাম্বর্জি-পরিবার-প্রথা উৎসন্ন হইতে

বলিয়াছে। ইহার প্রতিবিধানের উপায় অবলম্বন নিত্যান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

অবশ্য এ কাণ্ডের ভার নিজ সামাজিকগণ গ্রহণ না করিলে ব্যাপার অসম্ভবপূৰ্ণে নিশ্চিন্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। সৰ্ব্ব সৰ্ব্ব সাহিত্যকেও এ কাণ্ডে সহায়তা কৰিতে হইবে। তৎসম্বন্ধে কয়েকটি ইঙ্গিত করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

প্রধানতঃ চারিটি উপায়ে বঙ্গীর লেখকগণ সমাজের মঙ্গলসাধন করিতে পারেন।

(১) লোকশিক্ষা বা লোকমতগঠনের উদ্দেশ্যে চিত্তাঙ্গীণ লেখকগণ এই সামাজিক সমস্যাগতকে সন্দর্ভ করেন। করিয়া কাণ্ডের সহায়তা করিতে পারেন। বর্ত্তমান লেখকের এই অকিকিৎসার আলোচনা ইহার একটি নিরুপস্থাপ্ত। পক্ষান্তরে, মনসী ভূদেব সুখোপাধ্যায়ের ‘পারিবারিক প্রবন্ধ’ এই শ্রেণীর সাহিত্যের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। ‘কুললক্ষ্মী’ নামক একখানি নবপ্রকাশিত ত্রীপাঠ্য পুস্তকও এই প্রণালীতে উল্লিখিত হইতে পারে। যাহাতে এই শ্রেণীর এই অধিক পরিমাণে রচিত হয় তদ্বিষয়ে সাহিত্যসেবী, সাহিত্যাহরণী, প্রত্নপ্রকাশক সম্প্রদায় ও সাহিত্য সমিতিগুলির দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত।

(২) এই প্রকারের আলোচনা কথোপকথনরূপে লিখিত হইলে তাহাতে সজীবতা আইসে, পাঠকের কৌতুহল উদ্রিক্ত হয় ও সম্বন্ধেই মনোঞ্জন হয়। এই বিবেচনার ভূদেব বাহু ‘পারিবারিক প্রবন্ধ’র স্থানে স্থানে উক্ত প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন। ৮গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরীর ‘গৃহলক্ষ্মী’ আগাগোড়া এই প্রণালীতে লিখিত। ঠাকুর মা, মা ও ছেলে, লক্ষ্মী মা, লক্ষ্মী মেয়ে, লক্ষ্মী নৌ প্রভৃতি পুস্তকেও এই প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে। তবে সকল লেখকই যে এই বিচিত্র উপায়ে উপদেশাবলির সহসতা-সম্পাদন করিতে পারিয়াছেন, এমন কথা বলি না। আরও অধিক সংখ্যক লেখক এই পথ অবলম্বন করিলে প্রতিযোগিতার ফলে ক্রমে রচনা-দোশল বা অট্টের উন্নতি হইবে এবং সেই উন্নতির অমুপাতে এই সাধু উদ্দেশ্য-শিদ্ধিরও সহায়তা হইবে।

(৩) ‘সীতা’ ‘দামিনী’ ‘শ্রোপদী’ ‘অরুণভী’ ‘বেহলা’ ‘কুল্লরা’ প্রভৃতি আদর্শনাট্যগণের চরিত্র অবলম্বনে আজকাল যে সকল ত্রীপাঠ্য পুস্তক রচিত হইতেছে সেগুলিও এই উদ্দেশ্যশিদ্ধির যথেষ্ট সহায়তা করিতেছে।

(৪) এই শ্রিবিদ উপায় অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ উপায় সাহিত্যক্ষেত্রের পরিভূক্ত নহে। কল্পনাকুল কবিগণ নূতন ধরণের কাব্যরচনা করিয়া এই উদ্দেশ্যকে পরিপূর্ণ সফলতা দিতে সমর্থ।

‘কাব্যে কাব্যসম্বিত্তরোপদেশপুণ্ড’—অনকার শাস্ত্রের এটি কথাটা বড় পাকা কথা। নাটক, আখ্যায়িকা প্রভৃতি ব্যাঙ্গ উচ্চ ও পবিত্র আদর্শগুলি যেমন পতীর ভাবে জনগণে মুদ্রিত হয় এমন আশা কিছুতেই নহে। জড়জনগণে যেমন ভাঙিতশক্তি মানবের মানাকার্য্যে নিয়োজিত হইতেছে, সাহিত্য-জনগণেও সেইরূপ কল্পনায় চপলগোচক সনাতনের নানা মঙ্গলবিধান, নানা আদর্শস্থাপনে, নানা প্রদর্শিতারে, নানা সমস্তা-সমাগনে, বিনিয়োজিত হইতেছে। এ ক্ষেত্রেও নাটক ও আখ্যায়িকা রচনা করিয়া সনাতন মঙ্গল আদর্শ প্রচার করা কবিশাস্ত্রী লেখকদিগের একটি প্রধান কর্তব্য।

রামায়ণে প্রবর্ত্তিতব্যং ন তু রাবণায়িবং—এই নীতি অবলম্বন করিয়া মঙ্গল চিত্র অঙ্কিত করিয়া সেট দিকে প্রবৃত্তি লক্ষ্যহীনে হইবে এবং কুৎসিত চিত্র অঙ্কিত করিয়া সেই দিকে হইতে নিবৃত্তি লক্ষ্যহীতে হইবে।

অজকাল অস্তঃপুণে নাটক নভেলের অবাধ্যানিচ্ছা দেখা যায়। বালিকা-বিদ্যালয়ে শিকাপ্রাপ্তা কুলবধু ও কুলকন্যাদিগের অবসর বাগানের প্রধান সঞ্চাল এই শ্রেণীর লঘু সাহিত্য। ব্রতকথা, কবকতা, পুরাণপাঠ প্রভৃতির আর ভেতন প্রণয়ন নাই, কুতিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারতও অঙ্গুর বহনে আর ভেতন আদর পায় না। এই কথা স্বরণ করিয়া যদি লঘু সাহিত্যের সংস্কারকরণ আশাবানি প্রেমলীলার বর্ণনা না করিয়া পূর্বোক্ত শ্রেণীর নাটক নভেল আখ্যায়িক কুলকন্যাদিগের হস্তে দেন, তাহা হইলেও সে মঙ্গল ভাল।

মুগের বিষয়, এ সম্বন্ধে অনেক নাট্যকারের ও আখ্যায়িকাকারের দায়িত্ব-জ্ঞান লম্বিয়াছে ও লম্বিতেছে। এই শ্রেণীর যে কথ্যানি নাটক ও আখ্যায়িকা পাঠের সৌভাগ্য বর্ত্তমান লেখকের ঘটনাছে, তদ্বোধে বেগলির স্বতি আকও মন হইতে বিলুপ্ত হয় নাই মূলভাবে সেইগুলির পরিচয় দিলে আশা করি তাহা অপ্রাসঙ্গিক বিবেচিত হইবে না।

— বর্ত্তমান লেখকের কৈশোরে পঠিত পুস্তকগুলির মধ্যে ৯দীনবন্ধু চিত্তের, বয়েসকথানি নাটকে ও ৬ তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিখ্যাত আখ্যায়িকা

‘বর্ণলতার’ এবং পণ্ডিত শ্রীমুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রীর ‘মেজ বৌ’ এ পারিবারিক জীবনের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। ‘জামাইবারিকে’ স্বাক্ষরী বধূ বা ও নন্দ ভাঙ্গের চিত্র সাধারণ পোছের ; ‘নবীন-তপস্বিনী’তে স্বাক্ষরী হাতে বধূর নিবাস্তনের দৃষ্টান্ত আছে। পক্ষান্তরে বনবাসিনী বড়রাণী কামিনী বা মনীন তপস্বিনীর প্রতি যেমন শ্রদ্ধাশীল, কামিনী ও তাঁহার প্রতি তেমনই ভক্তিমতী। কামিনীকে পুত্রবধূ করিয়া তপস্বিনী বলিয়াছেন “জামার বিয়ের বউকে আমি বুকের ভিতর করে রাখব, আমি আপনি কখন মন্দ কথা বলব না, আমার বিয়রকেও চড়া কথা বলতে দেব না।” তিনি স্বাক্ষরী নির্ঘাতনে ভ্রাগরাছিলেন, তাই নিজে স্বাক্ষরী হইয়া সেরূপ আচরণ করিবেন না। এটুকু জান অনেক স্বাক্ষরীই হয় না। ‘নীলমণ্ডী’তে ও ‘সদবার একাদশীতে’ স্বাক্ষরী বধূ চিত্রে কোনলতা নাই। কিন্তু ‘নীলমণ্ডী’ ও ‘সদবার একাদশীতে’ নন্দ ভাঙ্গের প্রতিবক্তনের দৃষ্টান্ত আছে। ‘নীলমণ্ডী’ স্বাক্ষরী বধূতে ও ধারে ধারে ব্রহ্মবন্ধ অতি সুন্দরভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহা বঙ্গসাহিত্যে অভুলমীর। ইহার বহুপরে প্রতিষ্ঠিত গণিতচক্র বোয়ের ‘প্রকৃত’ নাটকে স্বাক্ষরী-বধূ ও ধারের চিত্র ঠিক এই ধরণের। ‘প্রকৃত’র প্রায় সম-কালে প্রকাশিত শ্রীমুক্ত অমৃতলাল বসুর ‘তরুণালয়’ স্বাক্ষরী, বধূ ও নন্দের চিত্র অতি সুন্দর, অতি পবিত্র।

‘বর্ণলতার’ প্রেমদার চিত্র দেখিলে ধারে ও নৌদিদিতে অকুচি জন্মে। প্রেমদার প্রতাপে শনিভূষণও ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূকে ব্রহ্ম হইতে বঞ্চিত করিয়া-ছিলেন।

পণ্ডিত শ্রীমুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রীর ‘মেজবৌ’এ মেজ বৌ প্রেমদা = আদর্শ বধূ ও বা, কিন্তু তাঁহার স্বাক্ষরী ও বড় বা—এ বলে আবারে ব্রহ্ম, ও বলে আবারে ব্রহ্ম। স্বতঃ লোকটি ভালমানুষ, স্বতঃ পণ্ডীর বধূ। ‘সদবা নন্দ ভ্রাতা’ ‘কপাল কুণ্ডলা’র ভ্রাতার ভ্রাতৃ কুণীনপন্নী ও পিতৃগৃহবাসিনী, কিন্তু তিনি ব্রহ্মচর্যের ভ্রাতার ভ্রাতৃ ভাঙ্গের প্রতি ব্রহ্মশালিনী নছেন।

‘বর্ণলতার’ ব্রহ্মচর্যের ‘অদৃষ্ট’ নামক আর একখানি আখ্যায়িকাও দ্বারা বৌদিদির দাপুটে কনিষ্ঠকে ব্রহ্ম হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন, এমন কি স্বাতা

পিতার প্রতি কর্তব্যপালনে পরাঙ্ঘ হইয়াছেন। পক্ষান্তরে, মায়কের মাতা ও পত্নী মহামায়ার চিত্তে স্বাক্ষরীকৃত-সম্পর্ক অতি সুন্দরভাবে বিচিত্র হইয়াছে। অথচ মহামায়ার ভগিনী জয়দুর্গার স্বামী, ননদ ও স্বতন্ত্রপরিবারের সহিত ব্যবহার অতি কর্ণা। ডাক্তার বাবুর পরিবারে ননদভাজের অস-স্মৃতি বশতঃ বর ভাঙ্গিয়া গেল এবং গ্রহকার বিধবা নির্যাতিতা ননদার আশ্রয় ঘোড়াইবার জন্য ত্রাসমতে বিধবাবিবাহ দিয়া এই সামাজিক সমস্তার ধীমাংসা করিয়াছেন।

শেখোক্ত তিনখানি পুস্তকে বাঙ্গালীর সংসারের কঠোর বাস্তব চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। 'ননদ-ভাজ' ও 'স্বাক্ষরীকৃত' প্রবন্ধদ্বয়ে = দেখাইয়াছি বিভিন্নচক্র কর্তব্যখানি আখ্যায়িকায় এই দুইটি সম্পর্কের কেমন সুন্দর আদর্শ প্রচার করিয়াছেন। যথা,—কপালগুপ্তসা, বিধবাক, চন্দ্রশেখর ও আনন্দবর্ষে ননদভাজের এবং কৃষ্ণকান্তের উইল, ইন্দিরা ও দেবীচৌধুরাবীতে স্বাক্ষরীকৃত চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' একানবর্ষি-পরিবারে সম্পত্তি-বিভাগ লইয়া কিরূপে গৃহবিচ্ছেদ হয় তাহা সবিস্তারে প্রদর্শিত হইয়াছে।

৬রম্যেচক্র দত্তের ঐতিহাসিক আখ্যায়িকাগুলির মধ্যে 'মহাবীকরণে' ননদভাজের ঐতিহাসিক সুন্দরভাবে চিত্রিত হইয়াছে। শেখোক্ত লিখিত সামাজিক আখ্যায়িকা 'সংসারে' ও 'সমাজে' বহুস্থলে কথোপকথনজালে একানবর্ষি-পরিবারের দোষগুণ, স্বাক্ষরীকৃত বধুর নির্ধ্যাতন, প্রবল জাতি-কলঙ্ক সম্পত্তিহরণ, প্রভৃতি উল্লিখিত হইয়াছে। বিন্দু ও সুধার বড় জোঠাইয়া কিরূপে গর্ভিতা ও আত্মপরাণা হইলেও লোক মন্দ নহেন। পক্ষান্তরে ছোট জোঠাইয়া'র ব্যবহার বড় কর্ণা। সুধার বিধবাবিবাহের পর স্বাক্ষরী ও ননদ লইয়া সুখে বহুদৈন্যে বসবাস করায়ও পরিচর পাওয়া যায়। কালোভার্য প্রাতি খুড়স্বাক্ষরীদিগের দৃষ্টব্যব্যহার কঠোর বাস্তব চিত্র।

৭যোগেশচন্দ্র বসুর 'ঐজিরাঙ্গলক্ষীর' প্রারম্ভে স্বাক্ষরীকৃত একটি আদর্শ চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে, ঐগুপ্ত অমৃতলাল বসুর 'বোনা' প্রবন্ধনে আমাদের হালের হাল কঠোর বিক্রমের সুখে বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। ইহা দেখিয়া ভাবকবিত সত্য বাঙ্গালীর চক্ষুঃ স্তুতিবে কি ?

শ্রীমুক্ত পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায়ের 'উমা'র মেঘশালিনী খাত্তীর চিত্র সুন্দর। বহুও খাত্তীর অঙ্গুগতা। কিন্তু পুত্রকে পাপপথে প্রবৃত্ত দেখিয়া বিবশা ব্যতা যুগায়, লজ্জায়, রাগে, হৃৎখে কান্দীবাস করিলেন; এ ক্ষেত্রে তিনি মাতার কর্তব্য, স্বস্ত্রের কর্তব্য পালন করিতে পারেন নাই, গ্রহকার নিজেই এ কথা বলিয়াছেন। পক্ষান্তরে শ্রীমুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'চোখের বাণী'তে খাত্তীর চিত্র আট হিসাবে উৎকৃষ্ট হইলেও আদর্শ হিসাবে সুন্দর নহে। বধু আশাগতায় চরিত্র অতি সুন্দর, অতি মধুর।

শ্রীমুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের 'প্রেমের জরে' সৌভাগ্যের ও ব্যারে ব্যারে সন্তানের চিত্রে অতি সুন্দরভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে, ঐ গ্রন্থে শৈল-বালায় পিতৃহৃৎয়ের খাত্তীবধু সম্পর্ক কঠোর বাস্তব চিত্র। আখ্যায়িকার অপ্রধান পাত্র ভক্তার রমেশচন্দ্রের মাতা আদর্শ স্নেহময়ী কর্তব্যপরায়ণা নরী; পক্ষান্তরে রমেশের স্ত্রী ঠিক হালের মুখেরা উদ্ধতবস্ত্রাবা বিলাসপরায়ণ্য কর্তব্যবোধশূন্য 'বোমা'।

শ্রীমুক্ত বরীন্দ্রমোহন সিংহের 'জবতার' এবং শ্রীমুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের 'নাগপান' ও 'অদৃষ্টচক্র' এই তিনখানি আধুনিক আখ্যায়িকার ('নীলদর্পণ' নাটকের স্থায়) পল্লীগামের বৃহৎ একান্তবস্ত্র-পরিবারের পূর্ণায়ত চিত্র অতি উল্লেখ্য বর্ণে বিচিত্র হইয়াছে, এবং কলিকাতার হাওয়ার এই বহুকালের ইমারেতে কিরূপে লোনা লাগে তাহাও চিত্রের সম্পূর্ণতার লক্ষ্য প্রদর্শিত হইয়াছে। লেখকবর যেন হেমলেটের মত বলিতেছেন 'Look upon that picture and upon this'—'সেই চিত্র দেখ আর এই চিত্র দেখ'—কি অধঃপতন! সমাজস্থিতির অগ্রকূলে মিল নিজ সাহিত্যশক্তি বিনিয়োগ করিয়াছেন বলিয়া এই দুইজন গ্রহকার আমাদের বক্তব্য-ভাজন।

কতকগুলি ছোট গল্পও পারিবারিক জীবনের কোমল ও কঠোর দিক্ নিপুণতার সহিত প্রদর্শিত হইতেছে। দৃষ্টান্তস্বলে, শ্রীমুক্ত শৈলেশচন্দ্র মজুমদারের 'পূজার স্নেহ' ও 'দাদার কাজ' এই দুইটি ছোট গল্পের উল্লেখ করিতে পারি। 'পূজার স্নেহ' স্নেহ ও সেরাজ দুই বায়ের স্নেহপ্রীতির চিত্র বড় সুন্দর, তাঁহাদিগের সহিত বস্ত্রের সম্পর্কও সুন্দর। পক্ষান্তরে বৃত্ত্য-কালী 'কলির বৌ খরভাঙ্গানী'র প্রকৃষ্ট নিদর্শন, তাঁহার খাত্তী ও ব্যারের উপর ব্যাখ্যার অতি কর্তব্য। 'দাদার কাজে' প্রথম পক্ষের বৌদিদি আদর্শ

ভাষ্য, কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষের বৌদ্ধি অতি যুগ্ম ও ঘেঁষপরাশ্রয়। বাহ্য হউক স্বামীয় চরিত্রের দৃঢ়তার তাহারে শেষে পরাজয় মানিতে হইল। 'ভাষ্য স্বর আবার বোড়া লাগিল।' পুরুষ বল হইলে যে জীলোক স্বর ভাষিতে পারে না, ইহা হইতে এ সভাটি পরিপূর্ণ হয়।

ঐহিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বিরাজবৌ' গল্পে মোহিনী আদর্শ বা। এ চিত্রের কাছে গল্পের নায়িক। বিরাজ বৌ-এর চিত্রও মলিন। উক্ত লেখকের 'বড়দিদি' নামক গল্পে নন্দ-ভাতের অসন্তোষের কথা ইহাতে বলা হইয়াছে এবং তৎপ্রসঙ্গে একটু সমীচীন আলোচনাও করা হইয়াছে।

৮নং চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'যাত্রী' নামক নবপ্রকাশিত পুস্তকের 'মাতৃভক্ত', 'তেপান্তরের মাঠ' ও 'বৌদিদি' নামক গল্পত্রয়ও এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। 'মাতৃভক্ত' সরলা কুলবধুর স্বাস্থ্য ও নন্দনের হস্তে নির্দম নির্ধাতনের বিস্তারিত বিবরণ আছে। 'তেপান্তরের মাঠে' ভাতের গল্প-নার কিকিৎ আভাস আছে। 'বৌদিদি' গল্পে মেঘময়ী বৌদিদির চিত্র অতি সুন্দর।

ছোট গল্প লেখকদিগের মধ্যে রবীন্দ্র বাবু ও প্রভাত বাবুর নাম সর্বজন-বিদিত। কিন্তু তাঁহাদিগের রচিত গল্পের সংখ্যার অল্পপাতে এইরূপ পারি-বারিক চিত্র অতি অল্প। * প্রভাত বাবুর 'নবকথা' বা 'দেবী ও বিনাশী' বা 'গম্মাঙ্গণি'তে পারিবারিক চিত্র বেবিয়াছি বলিয়া স্বরণ হয় না। 'বোড়শী'তে পারিবারিক জীবনের চিত্র তিনটি গল্পে বেধিতে পাওয়া যায়। 'বউচুরি' গল্পে নন্দ-ভাত-সম্পর্কটি অতি মধুরভাবে বিবৃত। 'কলির মেয়ে'তে বউদিদির চিত্র সুন্দর, তবে শেষে তিনি যা'কে স্বামিসঙ্গ গ্রহণ করিতে বেধিয়া একটু টিপনি কাটিয়াছেন। 'প্রিয়তম' গল্পে স্বাস্থ্যের বধু-বধ কঠোর, বৃদ্ধস্বাস্থ্যটি কিন্তু 'পেটটি ভরা কুঁড়ো' কথা পরিনিদ্রা, মানি'র বনি।

এতদ্বিত্ত, মাসিক পত্রে প্রকাশিত কয়েকটি ছোট গল্পে বাঙ্গালীর পারি-

* ইহা হইতে কেহ না বুঝিয়া যেনে যে, লেখক রবীন্দ্র বাবু ও প্রভাত বাবুর ছোট গল্পের নিন্দা করিতেছেন। লেখক যে দিক্ হইতে ছোট গল্পের আখ্যানবস্তুর বিচার করিতেছেন সে দিক্ হইতে সে ক্রটি পরিলক্ষিত হয় তিনি তাহারই উল্লেখ করিতেছেন। উক্ত লেখকদ্বয়ের রচনা, স্বাধুর্গ ও কলাকৌশলে যে উচ্চতর 'অবিশেষ' দেখেই যাত্রা নাট্য।

বারিক জীবনের নিখুঁত ছবি দেখিতে পাওয়া যায়। গল্পগুলির নাম ভালরূপ অরণ না থাকাতো সে গুলির বিস্তারিত উল্লেখ করিতে পারিলাম না।

যাক, আর অধিক উদাহরণ সংগ্রহ করিয়া গল্পীর প্রকৃতি সামাজিক গণের বিরক্তির উদ্ভেক করিব না।

একান্তবর্ত্তি-পরিবারপ্রথাসংক্রান্ত দুগ্ন দুগ্ন কতকগুলি কথা বিশুদ্ধ ভাবে বলিলাম। আত্মপুঙ্খিক বিচার বা সুপরিণীত সিদ্ধান্ত স্থাপন করা আমার ক্ষুদ্র শক্তিগত অতীত। আধুনিক বাঙ্গালী-জীবনে ইহা একটা প্রধান ভাবব্যবস্থা।

ঐকলিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ।

আশীর্ব্বাদ ।

জানিনাকি কোন্ সুবশুরে লগ্নে মণিকঙ্কণ দু'টি
 বেলেতেছিল রে ইন্দ্রনীলের প্রাক্ষনে ছুটি' ছুটি'
 মুক্তভরণী ভাঙ্গাতেছিল কি মন্মাদিনীর জলে
 সিংহ-শিশুর দশন গবিয়া কোন্ তপসনতলে ?
 নন্দনবনে হুলিতেছিল যে মন্দার-হিম্মোলা
 তা'তে কি লায়িত আছিলি রে তুই ঘুমঘোরে আধতোলা ?
 তৃতীয়ার টাদ-তরণী বাহিয়া শিশুময়ধাম,
 নভোনীলিমায় ভেসে ভেসে তুই আর আর—মনোরম ।
 অকারণ হালি অধরে তুহার পীযুষের ফেনলতা
 কুম্ভকোশক মন্তের মাঝে আধ' আধ' কল কথা ।
 সবে আধ'ভয়ে সাধসে আধরে অধরের চুমুনিতে
 দেবদমনীর স্তন্যগন্ধ লভিল এ পৃথিবীতে ।
 কণ্ঠশোভিত দেববালায়চা পারিজাত ফুলহারে
 ক্ষৌর-সাম্রাজের কমলভ্রুটি আরের ধরার পারে ।
 তোম দেব-জাতি করিব হরণ ধরিয়া মোদের বৃকে,
 অরণে সাধে তাগ নে রে তুই আমাদের স্নেহচক্ষে ।
 ঐকালিদাশ রায় ।

হৃতসর্বস্বা।

সাত্তি প্রায় দশটা। কাবুলের প্রবেশে বাতাস নীতল্পর্ষ। পদ জনশূন্য। রাস্তার দুই ধারে গুলিগুলিতেও কোলাহল কমিয়া আসিয়াছে। কলিকাতার ইংরাজটোলার একটি বৃহৎ গৃহের ফটক মুক্ত ছিল—গাড়ীবারান্দার বিদ্রাব্দা-শোক জ্বলিতেছিল। দুইটি তেজস্বী অশ্বদ্বন্দ্বিত একপাশি যান গৃহে প্রবেশ করিল। গাড়ীবারান্দার আসিয়া গাড়ী স্থির হইলে দহিস বাস্তবাবে গাড়ীর দ্বার খুলিল; দুই জন ভৃত্য আসিয়া গৃহদ্বারে দাঁড়াইল। গাড়ী হইতে প্রবেশে স্রীমতী সুনীতি সেন ও পরে তাহার স্বামী গিটোর শিশির সেন সাত্তি হইলেন। উভয়েই মুখ অন্ধকার। সুনীতি দীর্ঘকাল অতিবাহনশ্রান্ত অশ্ববহের ভাগদ্রপ সজ্জার আদেশ দিয়া বাস্তবাস্য সোপান হইতে গৃহে প্রবেশ করিবার পূর্বেই শিশির গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল।

সুনীতি আপনার শরনকে প্রবেশ করিয়া দাসীকে বলিল, সে সেই কক্ষেই বেশপরিবর্তন করিবে। সে অলঙ্কারগুলি খুলিয়া একটা টেবুলের উপর রাখিল; তাহার পর বেশপরিবর্তন করিয়া হাতখুশ খোঁচ করিয়া আসিল। দাসী কাপড় জামা শুছাইয়া বলিল, “গহনাগুচ্ছা সিন্দূকে তুলিতে হইবে ত?” সুনীতি বলিল, “জাল ধাক্কক; প্রাতে তুলিব।” তাহার পর সে দাসীকে বলিল, “বগ্রে বড় গরম বোধ হইতেছে, একটা জালানা খুলিয়া দাও।” দাসী একটা জালানা খুলিয়া দিলে সুনীতি তাহাকে বাইতে বলিল। দাসী চলিয়া গেল।

সুনীতি স্বামীর জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। সে বড় শ্রান্ত হইয়াছিল; বিশেষ তাহার মনও ভাল ছিল না—প্রতীকার কাগজটা বড়ই দীর্ঘ বোধ হইতে লাগিল। সুনীতি পুনঃ পুনঃ ঘড়ী দেখিতে লাগিল। ক্রমে এক ঘণ্টা কাটিয়া গেল। তখন সুনীতি বুঝিল, শিশির রাগ করিয়াছে। তাহার নয়নে অশ্রু উখলিয়া উঠিল। সে ভাবিল—তাহার দোষ কি?

ভাবিতে ভাবিতে সুনীতির দুই গন্ত বাহিয়া অশ্রু করিতে লাগিল। এই কি তাহার প্রেমের প্রতিদান? সে কি স্বামীকে কোন রকম কথা বলিয়াছে? সে স্বামীকে ঘালা বলিয়াছে, সে ত তাহারই স্বপ্নের জন্য! সুবস্ত্রের জ্বর সেবনাব পূর্ণ হইয়া উঠিল।

দীর্ঘনিশ্বাস ভাগ্য করিয়া সুনীতি ঘাইয়া লব্ধাশ্রয় লব্ধন করিল । ঘরে
আলো আনিতে গাশিল ; ঘরের জানালা দুকুই রহিল ।

২

সুনীতি এসিদ্ধ ব্যারিষ্টার মিষ্টার গুপ্তের কন্যা । গুপ্ত মহাশয় বাবসায়-
বিষয়ে যেমন ভাগ্যবান ছিলেন, পারিবারিক বিষয়ে তেমনই দুর্ভাগ্য ছিলেন ।
তিনি যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে পরিবারে যেন কোন অভি-
শাপে ম্লান হইয়া গিয়াছিল । নৌকাডুনীতে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয় । তাঁহার
একমাত্র ভগিনী স্বামীসহ সহিত সামান্য মনান্তরে আত্মহত্যা করেন । গুপ্ত
মহাশয়ের দুই পুত্রের একজন দিতিলিয়ান ও অপরজন ব্যারিষ্টার হইয়াছিলেন ।
বোম্বাই প্রদেশে প্রেণে দিতিলিয়ান পুত্রের মৃত্যু হয় ; ব্যারিষ্টার পুত্র শিক্ষণ
করিতে ঘাইয়া বন্ধুকের গুলিতে প্রাণত্যাগ করেন । শোকাহতা জননী
উদ্ভাবনোগ্রস্তা হইয়া কয় বৎসর যন্ত্রণাভোগের পর সর্ব্বযন্ত্রণামুক্ত হইলেন ।
অল্প দিন পূর্বে সন্তানসন্তানে গুপ্ত মহাশয় দেহভাগ করিয়াছিলেন । মৃত্যুর
পূর্বে তিনি একমাত্র অবশিষ্ট সন্তান সুনীতির বিবাহ দিয়াছিলেন । শিশিরের
পিতার সহিত গুপ্ত মহাশয়ের সৌহার্দ্য ছিল । শিশিরকে তিনি বুদ্ধিমান—
চতুর বলিয়া জানিতেন । তাই সে বিলাত হইতে ব্যারিষ্টার হইয়া ফিরিলে
তিনি তাহার সবিত্ত কল্লার বিবাহ দিয়াছিলেন । সুনীতি তাঁহার সমগ্র সম্প-
ত্তির উত্তরাধিকারী । তাহার অল্প উপযুক্ত পাত্রের অভাব ছিল না । গুপ্ত
মহাশয় বাছিয়া শিশিরকেই জামাতা করিয়াছিলেন, তাহাকে আপনার গৃহে
আনিয়া রাখিয়াছিলেন—সঙ্গে লইয়া কায লিখাইতেছিলেন ।

কিন্তু কালে শিশিরের তেমন মন ছিল না । তাহার প্রাণন কারণ, সে
জানিত, তাহার অর্ধের অভাব নাই । আর বিলাত হইতে বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে
সে একটি নেশা লইয়া আসিয়াছিল—সুখাখেলা অভ্যাস করিয়া আসিয়াছিল ।
জীবনভাস হইতে বোঁড় দৌড়ের বাজীতে পর্য্যন্ত নানারূপ সুখা খেলার তাহার
আসক্তি দেখা যায় । গুপ্ত মহাশয় জীবিত থাকিতে সে এই অভ্যাসটা
সংযত রাখিয়াছিল । তাঁহার মৃত্যুর পর তাহা সর্ব্ববিধ সংযমের সীমা অতিক্রম
করিয়াছে । সেই জন্য তাহার অভাব লাগিয়াই আছে । প্রায়ই তাহাকে
“দুই ঘণ্টার” ওয়াল্লর সুনীতির কাছে দুই চারি শত টাকা চাহিতে হয়—আর
সে “দুই ঘণ্টা” কখনই কাটে না । এইরূপে গত ছয় মাসে যে প্রায় পাঁচ
হাজার টাকা নষ্ট করিয়াছে । স্বামী টাকা চাহিলে সুনীতি কখনও তাহা

দিতে অস্বীকার করিত না। তাহার এমন সত্য সত্যই ভক্তিগ নামান্তর যাই ছিল। কিন্তু জুয়াবেলার স্বামীর অতিরিক্ত আসক্তিতে সে কিছু লক্ষিত হইতে-ছিল। সে সর্ববিধ উদ্ধৃৎসগতানুষ্ঠানিতার ব্যবহার দেখিয়া দেখিয়া উদ্ধৃৎসগ-তাকে ভয় করিতেই শিখিয়াছিল।

আজ তাহার একটা নিমন্ত্রণে গিয়াছিল। ফিরিবার সময় পথে গাড়ীতে শিশির তাহার নিকট “এক দিনের জন্ত” চারি শত টাকা চাহিয়াছিল। পর-দিন গোড় দৌড় আছে, সুনীতি তাহা জানিত। সে বলিয়াছিল, “দেখ, আমাদের যে টাকা আছে, তাহাতে স্বচ্ছন্দে দিনপাত হইতে পারে বটে; কিন্তু বোটের উপর তাহার পরিমাণ খুব অধিক নহে। এ অবস্থায় আমাদের পক্ষে সাবধান হইয়া চলা ভাল। কল্যাণপ্রভাতে আমি তোমাকে গত ৩য় মাসের হিসাব দেখাইব; দেখিয়া ষরচের একটা ব্যবস্থা করিও।” শিশির তাহার কোন কাখে কোন দিন গ্রীর নিকট হইতে বাণ্য পায় নাই! তাই সে দিক হইতে কোন বাধার সম্ভাবনাও তাহার মনে হইত না। আজ বোড় ধৌড়ের ঠিক পূর্বদিন এই বাধাটা তাহার পক্ষে বড়ই বেদনার কারণ হইল—আর সে বেদনাটা মুহূর্তমধ্যেই গ্রীর উপর ক্রোধে আত্মপ্রকাশ করিল। সে বলিল, “টাকা তোমার। তোমার অস্ববিধা হয় নিও না। সে কবা লপ্ট করিয়া বলিলেই ভাল করিতে। আমি ঘুরান কবা ভালবাসি না।” সহসা স্বামীর এই কথায় সুনীতি মনে আঘাত পাইল; “তুমি টাকা লইও। টাকা কি তোমার নহে? টাকা তোমার বলিয়াই তোমাকে ষরচের ব্যবস্থা করিতে বলিতেছি।” শিশির বলিল, “বাক্। যে গ্রীর অর্ধে দিনপাত করে, তাহার পক্ষে খুব বুদ্ধিমান ষরচ করাই সম্ভব সম্ভব নাই। কিন্তু জানিও, যেহেতু হউক, আমি এখন হইতে আমার দিনপাতের ব্যবস্থা করিতে পারিব।”

কথায় কবা বাড়িতে লাগিল; আর কথায় কথায় শিশিরের কথামূল্য কড়া হইতে লাগিল দেখিয়া সুনীতি আর কবা কহিল না। বিশেষ শিশিরের কথায় সে যে আঘাত পাইয়াছিল তাহাতে অস্ত্র উদ্ধৃৎসে তাহার কণ্ঠ বদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। সে চুপ করিয়া তাবিত্তে লাগিল, তাহার অপরাধ কোথায়? আর তাহার বিশাল চক্ষু দুইটি জলে ভরিয়া উঠিতে লাগিল।

শিশিরও কোন কবা বলিল না; মিনাকরা গৌণ্যের দিগাহেট কেস হইতে একটা সিগারেট বাহির করিয়া পরাইয়া টানিতে লাগিল।

এই অবস্থার দীর্ঘ পথ অতিক্রান্ত হইলে পুড়ী ঘূষে আসিয়া উপস্থিত হইল ।

বিবাহিত জীবনে আত্ম প্রথম সুনীতি স্বামীর অন্ত অপেক্ষা করিয়া করিয়া হতাশ জনের বেদনা লইয়া শয়ন করিল ।

৩

পরদিন প্রাতে যখন সুনীতির ঘুম ভাঙিল, তখন মুক্তবাস্তবনপথে রৌদ্র কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে । সে গাভ হইয়া উঠিতে গেল ; কিন্তু মস্তকে এমন বস্ত্রণা অহুত হইল যে, সে আবার শয়ন করিয়া—উপাধানে বস চাপিয়া চক্ষু ঘূষিত করিল । তাহার লগাটে প্রবাহ অহুত হইতে লাগিল । অল্পকণ পরে দাসী কক্ষে আসিয়া তাহাকে ডাকিলে সে চক্ষু মেলিয়া বলিল, “আমার শরীর ভাল নাই ; আমি উঠিতে পারিতেছি না ।” দাসী মুক্তবাস্তব-ননের নিকে চাহিল—দেখিল, কক্ষে বিছাদালোক জলিতেছে । সে আলোক নিবাইতে যাইতে যাইতে বলিল, “রাত্রিতে কি জানালা বন্ধ করা হয় নাই ।” সুনীতি বলিল, “আমার মনে ছিল না ।” দাসী বলিল, “সারারাত্রি ঠাণ্ডা লাগিয়াছে, তাই অশ্রু হইয়াছে ।”

সুনীতির শরীর অশ্রু ভাবিয়া শিশির তাহাকে দেখিতে আসিল । সে সুনীতির লগাটে করতল সংস্থাপিত করিয়া বলিল, “অশ্রু হইয়াছে ।” সে ধারমিটার আনিতে গেল । তাহার এই যত্নে সুনীতির মনের সঞ্চিত অভি-মান দূর হইয়া গেল ।

সুনীতির তাপ লইয়া শিশির ডাক্তার ডাকিতে পাঠাইল ।

বেলা প্রায় দশটার সময় ডাক্তার আসিলেন ; সুনীতিকে দেখিয়া বলি-
লেন, “ইনফ্লুয়েন্স হইয়াছে ।” দাসী রাত্রিতে জানালা খোলা ছিল বলিল । তিনি বলিলেন, “সেই জ্বরই অশ্রু হইয়াছে ; একটু সাবধান থাকিতে হইবে—আর ঠাণ্ডা না লাগে । আত্ম আর উষ্ণিরা কাষাই ; প্রথম কাপড় ঢাকা দিয়া শুইয়া থাকুন ।”

ডাক্তার চলিয়া যাইলে শিশির আসিয়া সেই কক্ষের বাতায়নগুলি মুক্ত করিয়া সার্বি বন্ধ করিয়া দিল ; সুনীতিকে আবার সাবধান করিয়া যাইবার সময় বলিল, “গহনাগুণা যে বাহিরে পড়িয়া আছে ।” সুনীতি বলিল, “আমি উঠিতে পারিতেছি না ; তুমি তুলিয়া রাখ ।” সে স্বামীর হাতে টেবলের টানার চাবি দিল । শিশির টানা তুলিয়া আগমারীর চাবি বাহির

করিল। দাসী গহনাগুলি বাস্কে বাস্কে সাজাইয়া দিল। শিশির সেগুলি তুলিয়া আগমারী বন্ধ করিল; তাহার পর সে চাবি টানায় রাধিয়া টানা বন্ধ করিয়া চাবি স্ত্রনীতিকে দিয়া গেল।

অন্নকণপরে শিশির আবার আসিয়া স্ত্রনীতির তাপ পরীক্ষা করিল, তাহাকে ঔষধ দিয়া বলিল, “তবে আর আমি আর আদালতে যাইব না।” স্ত্রনীতি বলিল, “কেন?” শিশির বলিল, “তোমার অঙ্গ রহিয়াছে।” স্ত্রনীতি বলিল, “একটু সর্জিতে তুমি অত ব্যস্ত হইতেছ কেন? তুমি আদালতে যাও।” তখন পত্নীর সুখচূষন করিয়া শিশির আদালতে গেল।

শিশির সে দিন শীঘ্রই ফিরিয়া আসিল এবং সযত্নে স্ত্রনীতির শুশ্রূষা করিল। যেন সে পূর্কদিনের হৃদ্যবহারের প্রারম্ভ করিল। তাহার ব্যবহারে স্ত্রনীতির মন হইতে পূর্কদিনের বেদনা—নিরাশ্রয়তার পর দুঃখের মত দূর হইয়া গেল।

পাঁচ ছয় দিন পরে স্ত্রনীতি সুস্থ হইল। সে কয় দিন শিশির নামমাত্র একবার করিয়া আদালতে যাইত; আর সমস্ত সময়টাই পত্নীর কাছে কাটা-ইত।

সেই দিন হইতেই শিশিরের ব্যবহারে যে পরিবর্তন লক্ষিত হইল স্ত্রনীতির স্বাস্থ্যলাভের পরও তাহা অপরিবর্তিত রহিল। যৌবনাবেগপুলকিত স্বামিজীর প্রেমে আর কোথাও কোনরূপ বেদনার কারণ রহিল না। স্ত্রনীতি মনে করিত, তাহার মত সুখলাভ করুণনের জাগে ঘটে।

৪

চারি মাস পরে একটি শাক্যসম্মিলনে নিমন্ত্রণে যাইবার সময় হায় বাহির করিয়া স্ত্রনীতি দেখিল, বাগের বাস্কে পেন্ড্যান্টটি নাই। তখন তাহার মনে পড়িল, ফাস্তন মাসে সেই নিমন্ত্রণে যাইবার সময় সে পেন্ড্যান্টটি খুলিয়া ত্রোচে লাগাইয়া লইয়াছিল। সে দাসীকে জিজ্ঞাসা করিল, “ফাস্তন মাসে নিমন্ত্রণ হইতে আসিয়া আমার অশুখ হইলে তুমি যখন গহনাগুলি গুছাইয়া-ছিলে তখন পেন্ড্যান্টটি কোথায় রাখিয়াছিলে?” দাসী মনে করিতে পারিল না। তবে সে বলিল, সে দিন সে পেন্ড্যান্টটি দেখিয়াছিল বলিয়া তাহার মনে পড়ে না।

যদি শিশিরের মনে থাকে জানিবার জন্য স্ত্রনীতি তাহার বসিবার ঘরে গেল। শিশিরও শাক্যসম্মিলনে যাইবে। সে প্রস্তুত হইয়া ছিল, স্ত্রনীতিকে

জিজ্ঞাসা করিল, “এখনই বাইবে ত ?” সুনীতি তাহাকে পেন্ড্যান্টটির কথা জিজ্ঞাসা করিল । শিশির যথ কুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “কোন্ পেন্ড্যান্টটি ?” সুনীতি বলিল, “মা’র হারের সেই বড় পেন্ড্যান্টটি ।” শিশির বলিল, “সেটা দাবী না ?” সুনীতি বলিল, “দাব্য প্রায় ছাড়ার ঢাকা, আর সেটা মা’র জিনিস ।”

সেটা কোথায় ছিল জিজ্ঞাসার উত্তরে সুনীতি সব বলিলে শিশির বলিল, “সে দিন গহনাগুলো ত বাহিরেই ছিল ।”

সুনীতি বলিল, “হাঁ ।”

“যে কোন্ কোন্ লোক গিয়াছিল ?”

“ডাক্তার ভিন্ন দাসী ছাড়া আর কেহ যায় নাই ।”

“তবে ত চোর বরা কষ্টই নহে । আমি পুলিশকে পত্র লিখিয়া দিতেছি ।”

শিশির থস থস করিয়া একখানা পত্র লিখিয়া ফেলিল ।

সুনীতি বলিল, “তুমি কি দাসীকে সন্দেহ করিতেছ ?”

শিশির বলিল, “তবে কি ডাক্তার চুরী করিয়াছে ?”

“দাসী আমাকে লালনপালন করিয়াছে । কোন দিন তাহাকে সন্দেহ করিবার কোন কারণ ঘটে নাই । আর অত দাবী জিনিস লইয়া সে কি করিবে ?”

“কি করিবে তাহা সে-ই জানে । সে কথা পুলিশ বাহির করিবে ।”

শিশির পত্রখানা পাঠাইবার লগ্ন কৃত্যকে ডাকিতে ঘণ্টা বাজাইল ; তাহার পর সুনীতিকে বলিল, “কিন্তু আমি বলিয়া রাখি, পুলিশ তোমার দাসীটিকেই সন্দেহ করিবে এবং একটু চেষ্টা করিয়া কথাটা বাহির করিতে চেষ্টা করিবে ।”

সুনীতি ঘৃণার বেলিল, “তাহা হইবে না ।”

“তবে আর পত্র পাঠাইয়া কাহ কি ? তোমার জিনিস তুমি যাহা ইচ্ছা, করিতে পার” — বলিয়া শিশির পত্রখানা ছিঁড়িয়া ফেলিল ; কৃত্যকে “এয়ো-জন মাই” বলিয়া বিদায় দিল ।

তাহার কথার সেই কান্ডের রাত্রির কথার সুর বাজিয়া উঠিল ।

সুনীতি দীর্ঘশ্বাস ভোগ করিল ; বলিল, “যে চুরী করে তাহার এক পাপ ; তাহার চুরী বার তাহার শত পাপ । সে কত নিরপরাধকে দোষী মনে করে ।”

তাহার পর সুনীতি শিশিরকে বলিল, “তবে চল, বাই ।”

বিরক্তভাবে শোণর হালিল, “চল ।”

শিশির কেন বিরক্ত হইল স্মৃতিতে মুক্তি পাবিল না ।

যে দিন স্মৃতি পহন্য হারানর কথা জানিতে পারিয়াছিল, তাহার পর এক পক্ষ কাল কটয় গিয়াছে । যদ্যপে স্মৃতি একথানা উপন্যাস পাঠ করিতেছিল । কৃত্য তাহাকে চুটখানি পত্র আনিয়া দিল—একথানা শিশিরের নামে, অপরাধানি তাহার নামে । চুটখানির খামই এক হাতের লিখা । স্মৃতি আপনার পত্রখানি খুলিল । তাহার মেনে। যদ্যপে হোসলাবাহে উকীল । কন্যার বিবাহে তিনি স্মৃতিকে বাইতে লিখিয়াছেন ।

স্মৃতি হিসাব করিয়া দেখিল, উপহার দ্রব্য সেই দিনই না পাঠাইলে বিবাহের পূর্বে পৌছে না । সে একটা কোন গহনা কিনিবার জন্য টাকা লইয়া গাড়ী আনাইয়া বাহির হইল ।

তাহার গৃহ হইতে অনতিদূরে একজন বাড়বাগীর একটি বৃহৎ অলঙ্কারের দোকান । স্মৃতি সেই দোকানে গেল এবং বাছিয়া এক খোড়া ইয়াররিং কিনিয়া তাহা ডাকে পাঠাইবার জন্য প্যাক করিতে দিল । জিনিষটা যখন প্যাক হইতেছিল তখন সময় কাটাইবার জন্য স্মৃতি দোকানের দ্রব্যগুলি দেখিয়া বেড়াইতে লাগিল ।

সহসা একটা আলমারীর একটা জিনিসে তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল—সে একটি পেন্ড্যান্ট, দেখিতে তাহার সেই হারান পেন্ড্যান্টটির মত । সে মিত্রের কাছে ডাকিয়া সেইটি বাধির করিতে বলিল । মিত্রের আশ্বাসী বুলিয়া পেন্ড্যান্টটি তাহার হাতে দিয়া বলিল, “এ জিনিস আপনাই উপযুক্ত । ইহার আসল নামে হাজার টাকার অনেক উপর ; আমরা একটু সস্তায় কিনিয়াছি, আপনাকে হাজার টাকার দিতে পারি ।”

স্মৃতি জিনিসটা বাড়িয়া চাড়িয়া বুগাইয়া ফিরাইয়া দেখিতে লাগিল—ঐক তাহার হারান গহনার মত । তাহার পেন্ড্যান্টে একটা গুপ্ত টিপকল ছিল—টিপিলে পেন্ড্যান্টটি বিধা বিতরু হইত । এটির সেই স্থান টিপিলেই গহনাটি খুলিয়া গেল । বহুদিন পূর্বে একদিন পেন্ড্যান্টটি খুলিয়া সে তাহার মধ্যে আপনীর নামের আশ্রয় লিখিয়াছিল । ইহাতে যে সেই অক্ষর যথি-
রাছে ! তবে এ তাহারই সেই হারান পেন্ড্যান্ট !

সুনীতি বিক্রেতাকে জিজ্ঞাসা করিল, “এ জিনিস তোমরা কোথায় পাইয়াছ ?”

বিক্রেতা বলিল, “তাহা প্রকাশ করা আমাদের নিয়মবিদ্ভূত ।”

“কিন্তু তোমাকে তাহা প্রকাশ করিতেই হইবে ; কারণ, এ জিনিস আমার ।”

বিক্রেতা একটু ভাবিয়া বলিল, “তবে আপনি স্বত্বাধিকারীর নিকট চলুন ।”

পেন্ডাণ্ট লইয়া সুনীতি দোকান ঘরের পশ্চাতে দোকানের স্বত্বাধিকারীর আফিস ঘরে প্রবেশ করিল । দোকানদার বৃদ্ধ । সে সুনীতিকে সসন্ত্রমে অভিবাদন করিয়া বসিতে বলিল । সুনীতি বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “এ পেন্ডাণ্ট তুমি কোথায় পাইয়াছ ?”

দোকানদার বলিল, “আপনি অপরাধ লইবেন না ; সে কথা আমি প্রকাশ করিতে পারিব না ।”

“কিন্তু তাহা জানিবার সম্পূর্ণ অধিকার আমার আছে । কারণ, জিনিসটা আমার ।”

“আমরা ও পরিচিত—সম্ভ্রান্ত লোকের কাছে জিনিসটা কিনিয়াছি ।”

“জিনিসটা যে আমার তাহার প্রমাণ এই জিনিসেই আছে । আমি পুলিশকে তাহা দেখাইব ।”

দোকানদারের মুখে চিন্তার ভাব দেখা দিল । সে উঠিয়া পার্শ্বস্থ আল-বারী হইতে একখানা মোটা খাতা বাহির করিয়া পাতা উন্টাইতে উন্টাইতে একটা পাতা বাহির করিয়া সুনীতিকে তাহার নাম ও ঠিকানা জিজ্ঞাসা করিল ।

সুনীতি তাহার নাম ও ঠিকানা বলিলে দোকানদার বিম্বিত ভাবে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, “আপনি জীলোক । অহুগ্রহ করিয়া যদি আপনার স্বামীকে একবার পাঠাইয়া দেন, তবে তাঁহাকে আমি সব বুঝাইয়া দিব ।”

সুনীতি বলিল, “ইহাতে বুঝাইবার কি আছে ? আমি জীলোক ; তাই বলিয়া কি তুমি আমাকে এমনই বোকা ঠাহরাইলে যে আমি জিনিসটা ফেলিয়া ফাইয়া আমার স্বামীকে পাঠাইয়া দিব ? তিনি আসিয়া কি আর জিনিসটা দেখিতে পাইবেন ? আমি জিনিসটা পুলিশকে দিবে তবে বাড়ী হাইব ।”

সুনীতি উঠিয়া দাঁড়াইল ।

তখন বিপন্ন দোকানদাৰ বলিল, “আমি বাৱিষ্টাৰ মিষ্টাৰ শিশিৰ সেনেৰ নিকট জিনিসটা আটপত টাকায় কিনিয়াছি।”

যেন কোন অতৰ্কিত দাক্ষণ আঘাতে অবসন্ন হইয়া স্তনীতি চেৱাৰে বসিয়া পড়িল। তাহাৰ পৰা ভূবিহাৰ সময় শোক যেন সজুৰে তৃণ দেখিলে তাহাও ধৰিয়া বাঁচিবাৰ চেষ্টা কৰে সে ভেতনই শেষ আশাৰ অবলম্বন লইল। জিজ্ঞাসা কৰিল, “তাহাৰ প্ৰমাণ কি?”

দোকানদাৰ বলিল, “আমাদেৱ কাছে ৱসিদ আছে।” সে বুজিয়া খুজিয়া একবাৰা ৱসিদ বাহিৰ কৰিয়া স্তনীতিকে দেখাইল। ৱসিদে শিশিৱেৰ সহি। সে সহিৰ প্ৰতি পৰিচিত অক্ষৰ যেন স্তনীতিৰ হৃদয়মন্দিৰে দাক্ষণ অনল আগাইয়া দিতে লাগিল। তাহাৰ নিশ্বাসৰোধ হইতে লাগিল। দোকানদাৰ তাহাৰ বিবৰ্ণ মুখেৰ দিকে চাহিয়া শক্তি হইল। চতুৰ বাবদাৰী আসল ব্যাপাৰ বুজিতে পাৱিল। এই সৱলা বুৰতীৰ বিবৰ বেদনাৰ তাহাৰ অন্তৰে কৰুণাৰ উৎস উদ্ভূত হইয়া উঠিল।

কিছুকণ পৰে কথকিঃ প্ৰকৃতিত হইয়া স্তনীতি বলিল, “একটা ভুল হই-
য়াছে। তোমাকে সেটোৱা সংশোধন কৰিতে হইবে।”

দোকানী জিজ্ঞাসা কৰিল, “কি ভুল?”

“জিনিসটা আমি বিক্ৰয় কৰিয়াছি; বাতাৰ আমাৰ নাম লিখিতে
হইবে।”

“কিন্তু বাতাৰ ও ৱসিদে মিল না থাকিলে আমি বিপদে পড়িতে পাৰি।”

“আমি ৱসিদ দিব।”

দোকানদাৰ ভাবিতে লাগিল।

স্তনীতি অল্পনয়পূৰ্ণ দৃষ্টি তাহাৰ মুখন্তত কৰিয়া বলিল, “তোমাকে এ কাষ
কৰিতেই হইবে। তুমি যত টাকায় ইহা কিনিয়াছ, আমি আৰও তত টাকা
দিব।” সে প্যান্ডাণ্টটি কেলিয়া দিল।

দোকানদাৰ স্তনীতিৰ নিৰ্দেশমত বাতাৰ পৰিবৰ্তন কৰিল; তাহাৰ পৰা
মুতন একবাৰা ৱসিদ লিখিয়া স্তনীতিকে দিল। স্তনীতি অক্লিষ্ট হতে
সেই ৱসিদে সহি কৰিল।

তাহাৰ পৰা শিশিৱেৰ সহি কৰা ৱসিদখানি আপনাৰ ব্যাগে পুৱিয়া সে
নিশ্বাস কেলিল। তাহাৰ মনে হইল, সে যেন তাহাৰ সৰ্ব্বৰ দিয়া স্বামীৰ
চৰিত্ৰেৰ কলঙ্ক মুছিয়া কেলিল—ত্ৰীৰ কৰ্ত্তব্যপালন কৰিল—মাত্ৰীকম

সার্থক করিল। সে দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করিল, “কত টাকা দিতে হইবে?”

দোকানদার বলিল, “আপনার স্বামীর রসিদের পরিবর্তে আপনি রসিদ দিয়াছেন। ইহার জন্য আপনাকে কিছুই দিতে হইবে না।”

স্বনীতি দোকানদারকে বস্ত্রব্যয় দিগ্ধা কেমন করিয়া যে আসিয়া গাড়িতে উঠিল তাহা সে আপনিই জানিতে পারিল না। দোকানদার তাহার গাড়ীতে ইয়াররিংএর বাক্স দিতে আসিলে সে ঠিকানা দিয়া তাহা হোসলবাধে পাঠাইতে বলিল।

৬

গাড়ী আসিয়া গৃহে পৌছিল। দেউ পরিচিত গৃহে প্রবেশ করিতে স্বনীতির জ্বরয় বাধিত হইতে লাগিল। সে তাহার সর্ব্বস্ব—নারীর সর্ব্বস্ব—স্বামীর প্রতি বিশ্বাস হারাইয়াছে, তাহার পক্ষে অগৎ পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে—জীবন দুর্ভর হইয়াছে।

গৃহে আসিয়া সে শয্যা লইল।

তিন দিন পরে স্তম্ভসর্ব্বস্ব স্বনীতির জীবনের সঙ্গে সঙ্গে তপ্ত মহাশয়ের অতিশয় পরিবারের শেষ চিহ্ন মুছিয়া গেল।

অনুেষণ ।

অসীম গগন-পথে বেবশিশুমল
আজি কোথা খেয়ে চলে উদাস পাগল,
কান্দয়ে ধূঁঝিয়া বেম। কত পথ তুলে
কণ্ঠে আপনা-ভাড়া দাঁড়ায় অকুলে।
ভাসিয়া নয়নদ্বারে ধরই ভাসায়,
তব'নি আবার কোথা ছুটে চলে যায়।
কে বুঝি ভাকিছে ঘরে। প্রেরণী আবার,
বোর বস্ত আশা-সাধ সদা অনিবার
এমনি চলিতে খেয়ে ধূঁঝিয়া ভোমার
কোথা তুমি—কোথা তুমি। পথ তুলে যায়,
কখন বিলাপে ছুবে, সে করুণ ভর
অগতে ব্যাকুল করে। হে চির-বনুর,
নিমেষে আবার শুনি' তব আবার
আকুল আবেশে পলে পানরি জ্বল
স্তব পানে ছুটে যায়। কেবলি ভোমার
লভিতে আদর তরে দিখত হিয়ার।

। শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত ।

ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ।

প্রাচীন কলিকাতার ইংরাজসমাজের অবস্থা অবগত হইতে হইলে যে সকল পুস্তক পাঠ করিতে হয় তাহার মধ্যে মিসেস ফের পত্রগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মিসেস ফের কলিকাতার একজন ব্যারিষ্টারের পত্নী ছিলেন। তাহার ইংলণ্ড হইতে স্থলপথে—ফ্রান্স ও ইটালী হইয়া বহুকষ্টে মিশরে পৌছেন ও মিশরের মধ্য দিয়া সুরেন্দ্ৰে আসিয়া উপনীত হইয়েন। তথা হইতে তাহার আত্মজীবনী কলিকাতায় আসিতে পথে হায়দার আলীর লোকের হাতে কালীকটে বন্দী ও হতসম্মত হইয়েন। বহুকষ্টে তাহার কলিকাতায় পৌছেন ও মিষ্টার ফের সঙ্গত দেওয়ানী আদালতে ব্যারিষ্টারী করিতে আরম্ভ করেন। মিসেস ফের আরও কয়বার ভারত হইতে গভাবৃত করিয়াছিলেন। বামী একটু “মাথা পাগলা” রকমের লোক ছিলেন। তিনি জলাধিপের সহিত কলহ করায় তাহার পক্ষার দ্বারা এবং তিনি বিলাতে চলিয়া য়ায়েন। পত্নী কলিকাতায় মহিলাদিগের পোষাকের দোকান খুলেন। তিনি বিলাতে তাহার স্বজনগণকে যে সব পত্র লিখিতেন সেগুলিতে সার্থক্য ও সামাজিক সংবাদ থাকিত; সেগুলি তৎকালের সামাজিক জীবনের সন্মুখল চিত্রে শোভিত। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে তাহার পত্রগুলি সংগৃহীত ও প্রকাশিত হয়। তখন সে পুস্তকের আদর হয় নাই। পরে পাত্রী মিষ্টার লং ‘কলিকাতা ট্রিভিউ’ পত্রে লিখিত এক্ষে সেই পুস্তক হইতে উপাদান সংগ্রহ করায় পুস্তকখানির প্রতি লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। সংগ্ৰহিত কলিকাতা ঐতিহাসিক সমিতি এই পুস্তক পুনরায় প্রকাশিত করিয়াছেন। পত্রগুলির নিঃসঙ্কোচ বর্ণনার বাণ্যুরী বিশেষ উপভোগযোগ্য। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দের ১০ই সেপ্টেম্বর তারিখে কলিকাতায় মিসেস ফেরের মৃত্যু হয়। ঐয়ৎকালের কথা তিনি বাহা বলিয়াছেন তাহা পাঠকদিগের মুখরোচক হইতে পারে। তিনি বলেন, এদেশের জল হাওয়া লোকের বেশ সখ হয়। সরমে ক্ষুধামান্দ্য হয়। বিলাতে স্নান যায়, বাজারের গরমে ক্ষুধা নষ্ট হয়; কিন্তু তিনি তাহার কোনই প্রমাণ পায়েন নাই। আর কোথাও তিনি লোককে এত খাইতে দেখেন নাই। তখন যুরোপীয়গণ অপরাহ্ন ২ টার সময় প্রধান আহার শেষ করিতেন।

তিনি কতকগুলি জিনিসের দরও দিয়াছেন। তেড়ার দাম ২ টাকা,

ভেড়ার ছানা ১ টাকা, মূর্খী বা হাঁপ টাকায় ৬টি, পায়রা টাকায় ১২টি, পাঁড়কটী টাকায় ৬ সেত, মাখন টাকায় ১ সেত, পানির ৩ টাকা সেত ।

এই পুস্তকে হিন্দুধর্মের আচারব্যবহার, পূজাপাঠ্যের বিবরণও আছে । তিনি কলিকাতায় চার্ক লেন ও বেষ্টিং স্ট্রীটের সংযোগস্থলে গৃহে বাস করিতেন ।

ঐক্যপ্রেমপ্রসাদ ঘোষ ।

নীরব প্রেম ।

নিশীথ প্রকৃতি নীরব তখন
পাপিয়া গাহিছে বীরে ;
অধর হ'তে চাদের কিরণ
পড়েছে নদীর নীরে ।
যদিহা হ'লেন প্রাসন্ন্য' পরে
চকল নদী পাশে ;
ফানন হইতে শেফালী-গছ
মধুর সসীবে ভাসে ।
নয়নের ভাণা করিছে নয়ন
অধর অধর' পরে
বাতপাশে বাহু পড়িয়াছে বীণা ;
প্রেমালোক চরাচরে ।
নীরব ভুবন নীরব গগন
সুপ্ত কুমুদল
হৃদয়ের সনে মিলিত হৃদয়—
উজল হৃদয়-তল ।

ঐক্যানাথন চট্টোপাধ্যায় ।

নাস্তিকের ধর্মানুষ্ঠান।

(বসন্তক।)

ডাক্তার বিদ্যানন্দ অল্প বয়সেই শারীর বিধাবিবরক একটি মৃত্যু তথা আবিষ্কৃত করিয়া স্ত্রীসম্বন্ধে বরোণ্য হইয়াছেন। সুযোগবশে জানালাকের সেক্রেটারী—পারী মহাবিদ্যা-লয়ের তিনি স্রেষ্ঠতম রত্নস্বরূপ। জীবনের অধমভাপে বিদ্যানন্দ ক্রিয়ৎকাল অস্বস্তিকিৎসায় নিরত ছিলেন। দৌত্যপাত্রের সুবিধ্যাত শল্যতন্ত্রবিদ দেস্মুন্সের শিষ্য গ্রহণ করার তাঁহার এই বিদ্যার অমুশ্লিলনের বশেষে সুবিধা ঘটিয়াছিল। দেস্মুন্সের আকস্মিক আবি-র্ভাব ও বিশেষ বৈজ্ঞানিক ভঙ্গিতে উচ্চাশ্রিতের সহিত স্তম্ভক্যেণে তুলিত হইতে পারে। এখন কি দেস্মুন্সের পরোক্ষাভিপ্রায়ের স্বীকার করিয়াছেন যে, তাঁহার মৃত্যুতে একটি অশিক্ষাভাষ্য চিকিৎসা-প্রণালী স্বত্বাসম্বল হইতে একেবারেই লোপ পাইয়াছে। অপর্যায় প্রাতিশ্রুতী ব্যক্তিবিশেষের জ্ঞান ও জ্ঞানিত এই ভগবদন্ত শক্তি উদ্ভাবিকার সূত্রে কার্যকর প্রদান করিতে পারেন নাই। সারক, অস্বস্তিকিৎসক ও অজ্ঞানেত্বপূর্ণের ন্যাস্তিকে বিশেষ সৌম্যদূত আছে। হতদিন তাঁহার জীবিত থাকেন হতদিনই কেবল তাঁহাদিগের সুখ্যাতি লোকমুখে ঘোষিত হইয়া থাকে। কিন্তু প্রায় মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাদের অলৌকিক প্রতিভার কথা বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হইয়া যায়। যে “কলাবৎ” বাদ্যকর আন্তর্য্য পারমর্শিতাওণে কলা এমিলিলাভ করিয়াছিল আজ আর তাহার ধ্যে কেহই অবগত নহেন। আর দেস্মুন্সই এইরূপ কণ্ডজ্ঞর প্রতিষ্ঠার নিদর্শনস্বরূপ। আজ কালিকার লোক কয়েক তাঁহার নাম প্রবর্ত্ত আছে : শলা বিদ্যার সর্গীর্ণ পতি হাড়াইয়া তাঁহার মনোহাশি সাধারণে অকর্ণিত হওয়ার সত্তাবনা নাই।

কোন দুঃখনির্দেশ করিতে হইলে আমরা সেই দুঃখের কোন বিধাত ব্যক্তির নামের উল্লেখ করিয়া থাকি। কারণঃ এই সকল বহাঙ্গমণের জ্ঞানপ্রবাহ ও জ্ঞানবলীতে দুঃখবর্ধ বিশিষ্টভাবে একত্রিত হইয়া থাকে। দেস্মুন্সের এইরূপ দুঃখনির্দেশকরূপে পরিচিত হইবার অধিকার ছিল কি না এ কথা নিম্নলিখিত বলা যায় না।

রোমীর রোগের তথা সিক্রপণে তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তাঁহার এই শক্তি সংস্কারগত বা শিক্ষাগত সাহায্য হইত না সেম, উহা তাৎকালিক জ্ঞানসম্বন্ধে বৈব-বলেরই সহিত উপস্থিত হইত। রোমীর বাতু ও তাহার বানসিক অবস্থার সহিত তিথি, কাল, কতু প্রকৃতির সামঞ্জস্য করিয়া অগ্রপ্রোগনের প্রকৃত সময় নির্ণয় করিবার তাঁহার আন্তর্য্য দক্ষতা অন্বিত্যছিল। প্রকৃতি-দেবীর সহিত একতা সূত্রে বদ্ধ হইয়া খীর কার্যসাধনের উদ্দেশ্যে তিনি বাতুসত্বের ও সৃষ্টিকারিত ভৌতিক ও মৈবিক পদার্থের

যোগাযোগ এবং মানব কর্তৃক ঐ সকলের বিরোধন ও নিঃশেষণ অস্ত্রিরদিয় দ্বারা
 রহস্যময় তথ্য নিরূপণে সক্ষমকণ নিযুক্ত থাকিতেন। বিখ্যাত জীবতত্ত্ববিদ সুবিজ্ঞের দ্বারা
 তিনি উপনিষিত ও অবদোহ এণালীর সাহায্যে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেন কি না তাহা
 জানিয়া জ্ঞাত নহি। যাহা হউক অস্ত্রান্ত সমবাবদ্যাদীদিগের অপেক্ষা তিনি যত্নবান্যাদির
 সকল তত্ত্ব উত্তমরূপে আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং বর্ধমান অবস্থা দৃষ্টে অতীত ও
 ভবিষ্যতের সকল ঘটনাই উপলব্ধি করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি ঔষার শিবানর্গের
 নিকট কোন নৃতন তথ্য আবিষ্কারের পথ উন্মুক্ত করিয়া দেন নাই এবং হিপক্রেটিস্ ও
 আরিস্টটল্ অভ্যুত্তির দ্বারা চিকিৎসা বিদ্যার সকল শাখাতলি ঔষার আয়ত্তাবীন ছিল
 না। আটম শতাব্দীর আনিপনের দ্বারা যত্নবান্যের দ্বারা প্রচলিত অস্ত্রান্তান্তকল
 সক্ষমকণ পর্যবেক্ষণ করিয়া জীবজগতে ভৌতিক উপাদানসমূহের সম্মিলন এবং জীবো-
 ত্ত্বের পূর্বাবস্থাবিশেষে ঔষার অসাধারণ অভিজ্ঞতা প্রদর্শিত হইতে, কিন্তু ঔষার
 অধিকাংশ যত্নবান্যঃ হইতে ঔষাকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। এই
 আশ্চর্য্যের কারণ ঔষার যত্নবান্যি অত্যন্তে বিলীন হইয়া গিয়াছে। এই জন্ত
 একজন বসন্তব্য আবিষ্কারকের যত্নবান্যঃ মুষ্টি বা স্মারকলিপি ঔষার সম্বন্ধে উপর
 প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। যত্ন ঔষার প্রতিভা ঔষার নাতিকৃত্যর অসীমত ছিল বলিয়া
 এ বর জগতে অসম্ভব লাভ করিতে পারে নাই। হেন্দ্রের যত্নে বিশ্বজগৎ স্বয়ং-
 সিদ্ধ জীবোৎপত্তির একটি বিশাল আখ্যার যাত্র। কঠিন যত্নের আবরণবিশিষ্ট এই
 বিশূলা পৃথী তিনি হংসাদির ডিম্বের দ্বারা অতিক্রমকর ও সহজবোধ্য বলিয়া মনে
 করিতেন। কিন্তু অগ্রে পক্ষী হইতে ডিম্ব, না ডিম্ব হইতে পক্ষী প্রসিদ্ধ হইবে এই
 প্রশ্নের সমাধান করিতে না পারিয়া তিনি ডিম্ব বা ডিম্বাবরণ কিছুই অস্তিত্ব স্বীকার
 করিতেন না। মানবের পূর্বপক্ষী জীবনে ও পরবর্তী আত্মা কিছুতেই ঔষার
 বিশ্বাস ছিল না। এ সম্বন্ধে হেন্দ্রের কোন সন্দেহবাদের প্রস্তর লইতেন না।
 তিনি এতল প্রশ্নের সহিত এতদ্ব্যতিরিক্ত অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিতেন।
 ঔষার এই অবিবিক্ত নাতিকৃত্যর এই প্রশ্নের বিরুদ্ধবাদের সহিত ঔষার সৌন্দর্য্য
 পরিচালিত হইত। বরম্বালে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের মধ্যে গণ্য হইলেও ঔষাকে
 বর্ধবিশ্ববাদের লেখক ছিল না। ব্যক্তিকই ইনি এরূপ নিরীক্ষণবানী ছিলেন যে,
 বর্ধবিশ্ববাদের লোকদিগের এ হেন বোঝা নাতিকের অস্তিত্ব সহজে বিশ্বাস করিবার প্রবৃত্তি
 হইবে না। যে ব্যক্তি বাল্যকাল হইতে জীবশ্রেষ্ঠ সমূহের প্রাণহীন ও জীবিত দেখে
 দ্রুতিকাভ্যন্তরে অভ্যন্ত—বেদ, বাস, অস্ত্র, শিরা, উপনিষা অভ্যুত্তি হুল ও যত্ন সকল
 অগ্রে ব্যবহৃত করিয়াও যিনি বর্ধবিশ্ববাদের বর্ণিত অস্ত্রান্তান্তর সাক্ষ্য লাভ করেন নাই ঔষার
 যে নাতিকতা প্রদর্শিত তাহাতে আর বিশ্বাস কোথায়? তিনি মানবজীবনের ভিন্নটি কেন্দ্র-
 নির্ণয় করিয়াছিলেন। ইচ্ছা-শক্তি, বুদ্ধি-শক্তি অভ্যুত্তির আখ্যার ব্যক্তিক কেন্দ্র, বর্ধন-শ্রবণ,
 অভ্যুত্তি বোধ শক্তির আখ্যার স্মারিক কেন্দ্র এবং বাস-প্রাণ ও বসন-প্রাণের রক্তপ্রোভেদ।

আবার সর্ব সুদৃষ্ট দেশ। এখানেও দুইটি নৃত্যকেন্দ্রের কার্যকারিতা ও পরস্পর নির্ভরতাপক্ষে দেখে দেওয়ার এক অল্পত বাধা জন্মিয়াছিল। তাঁহার সূত্রায় অল্পদিন পূর্বে তিনি লন্ডনে একজন কবিদের যে, অবশেষেও চর্চাশ্রমে, এবং ত চর্চা নৃত্যের নিয়মক মতে এবং কেবলমাত্র নাত্যিকের হইতেই এই সকল ইচ্ছারানির অভ্যাস নিঃসন্দেহে পূরণ করিতে পারা যায়। ইহা হইতেই দেখা যাইতেছে যে, দেশের জীবনীশক্তির একাধিক কেন্দ্র সিদ্ধান্ত করিয়া নিজ নাট্যকর্তৃপক্ষেরই এতাদৃশী চেষ্টাভিলাষ। বলা বাহুল্য তাঁহার অবলম্বিত দুটি প্রণালীই যাহা ইংরেজের অস্তিত্ব কখনও নিরূপিত হইতে পারে না। অপরাপর নিয়মবাহী নবীনগণের দ্বারা দেশের নৃত্য নাট্যজীবন শুধু বার্ষিক অসহনীয়তাভার বহন করিয়াই বহাগবে অরাজক হইতেছে। পরম কাস্টমিক ভগবানের কতনাভা এই সকল পর-লোকেও আশ্চর্য মনোভা বৃদ্ধ করুক।

এই চিকিৎসকগণের চরিত্র বানান্ধ্র অসমভাবে পূর্ণ হ্রাস। তাঁহার পক্ষপাত তদুই পৌরবহা নিম্ন উদ্দেশ্যে এই সকল বাস্তব: বিদ্যমানী চরিত্র-লক্ষণগুলিকে তাঁহার নীতিবোধতা বলিয়া নিম্না করিত। বলা বাহুল্য যে, পূর্ণ ও হিংসাপরায়ণ ব্যক্তিকল প্রতিভাশালী মহাত্মাশ্রমের একত উদ্দেশ্য মুক্তির বা পারিবা: বিহ: বিপের ভবাক্ষিত বৈশম্যের উল্লেখে আশ্রম: বানান্ধ্র কাস্টমিক অভিশ্রমের সূত্রি করিয়া থাকে এবং হঠাৎ কণকালের অল্প জনসাধারণের নিকট নিজ নিজ মতের সমর্থন লাভের কৃতকাব্য হয়। যদি কোম ভাষাবান পুস্তক এই সকল কথনা মানির বাবা অভিজ্ঞতা করিয়া নিম্নের প্রতিভাওণে বহুতর পক্ষে উন্নীত করেন তাহা হইলেও নিম্নাশ্রম: একেবারে বিলুপ্ত হয় না। এমন কি যে ব্যক্তিকল বিশেষর এই সকল নিম্নাশ্রম: বৈজ্ঞিক আধোমস্তির কারণ বলিয়া নিম্নিষ্ট ক্রিয়াছিল সেইগুলিই ভবিষ্যৎ উন্নতির উপাদান বলিয়া প্রমাণিত হইলেও সাধারণের মন হইতে নিম্নাশ্রমিত অধিবাসের ভাব সহসা বৃদ্ধিভূত হয় না। সুপ্রায় স্বতন্ত্র নেপোলিয়নের কথার উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিনি যখন তাঁহার সর্ববিভিন্নী স্বপ্ন-চিকিৎস পাতাকা ইংলণ্ডের দিকে প্রসারিত করিয়াছিলেন তখন তাঁহার সমসাময়িক ব্যক্তিকল কেতাই এ কার্যটি সুবৃদ্ধিতে দেখে নাই। ফরাসী ইতিহাসের ১৮০২ খৃঃ অব্দের ঘটনাবলী বৃদ্ধিতে বেলে ১৮০৪ খৃঃ অব্দের সাময়িক অভিজ্ঞান ও যুগল বন্ধের হুপ্রসঙ্গ নৌকাবাহিনীর কথা স্বরণ করা উচিত। দেশের ভেত্রে যে অজ্ঞাতিক পরিমাণে যেজ্ঞাতত্বতা বিদ্যমান ছিল, ইহা স্বীকার করিবার উপায় নাই। কখনও তাঁহার পরিজ্ঞানের প্রথম পাতিপাটা দেখা যাইত যে, দেশের কেবল একজনকেই পোতা যায়। আবার য:বা যথো পরিবেশবিষয়ে তাঁহার সম্পূর্ণ অবশ্রমোপেতিত ও লন্ডন্যাবেই পরিলক্ষিত হইত। তাঁহাকে কখনও বা অধমানে কখনও বা পনত্রে জয়ন করিতে দেখা যাইত। কখনও তাঁহাকে কর্তব্যজালী কখনও মিষ্টাশ্রমী বলিয়া মনে হইত। সাধারণের নিকট কৃপণভাব বলিয়া পরিচিত হইলেও তিনি রাজপরিবারবর্গের নির্জ্ঞানতালে তাঁহার দাবতীয় সম্পত্তি ভোগের যোগ্য নিয়োজিত করিয়াছিলেন। তাঁহার এই নিঃস্বার্থ দান ক্ষমতা: কিম্বৎকালের অল্প কৃতজ্ঞতার মীহিত বৃদ্ধি হইয়াছিল, ইহাতে সন্দেহ নাই।

যদিও কি ঔষধের অকৃত্রিমভাবে কেবলই সমর্থ হয় নাই। বিশেষতঃ নিম্নোক্ত তত্ত্ব সকল স্বেচ্ছায় লোকেই আকার ও মুখভঙ্গী অর্জিতে সক্ষম করিয়া তিনি ঔষধিগণের একত্ব স্বভাব অবগত হইতে পারিতেন। প্রতিভা সঞ্চিতোমুখী এই নিমিত্ত মহাপুরুষগণের চরিত্রে সকল গুণের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। ঔষধিগণের মধ্যে যদি কাহারও জ্ঞানবোধ অপেক্ষা ধীশক্তি অধিক পরিমাণে বিদ্যমান থাকে তাহা হইলেও সেখা যায় যে, তথাকথিত হুমিত ব্যক্তি অপেক্ষা ঔষধিগণের উপাস্যমানশক্তি বিশিষ্টরূপে অবয়ব। স্বভাবজ্ঞান ব্যতিরেকে নবনবোন্মেষশালিনী প্রতিভা তখনও বিদ্যমান থাকিতে পারে না। অবশ্য এই স্বভাবজ্ঞান যে কোনও বিশেষ বস্তুর প্রতি নির্দিষ্ট হইতে পারে। যে ব্যক্তির একটি সামান্য পুষ্প দর্শন করিবার কথটা আছে, সে যে লবিত্তদেবতাকে দর্শন করিতে পারিবে ইহা একটি প্রবলতা বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে।

সেসূরেন্সের চিকিৎসাগুণে দৃষ্টান্ত হইতে স্ফাটাত কোল রাজকর্কণাদী ঔষধকে রাজপরিবারের পারিবারিক কুশলসম্পর্কীয় অন্য লিঙ্গাদ্য করিলে তিনি বলিয়াছিলেন যে, ঔষধকর্তার পারিয়দল্লভ কর্তব্যবুদ্ধি যখন আরোগ্যলাভ করিয়াছে, তখন ঔষধের অকুদেহের আরোগ্যলাভে অধিক বিলম্ব হইবে না। ইহা হইতেই অনুমিত হইবে যে, চিকিৎসা-ব্যবসারে ডাক্তার স্ফটাতসম্বন্ধে যখন সতর্ক হইতে পারেন তথাপি ডাক্তার বুদ্ধিমত্তার ও ব্যক্তিগুণতার প্রমাণ না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। বলা বাহুল্য মনুষ্য-চরিত্র-বিশেষণে ঔষধিগণের অভিজ্ঞতা আছে ঔষধের অন্তরেই সেসূরেন্সের আশ্চর্যচিত্তের সর্ববর্ণন না করিয়া থাকিতে পারিবে না। অন্য চিকিৎসার দ্বারা রাজনীতিকেরও যে তিনি সম্বন্ধেই প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারিতেন ঔষধের তত্ত্বগণের এ বিশ্বাসও কেবল উপহাস্যাম্পদ বলিয়া বিবেচিত হইবার যথ্য। সেসূরেন্সের সমসাময়িক ব্যক্তিগণ ঔষধের জীবনের যে সকল এহেলিকার চরিত্র ভেদ করিতে সমর্থ হইতেন নাই আশ্চর্য্য অন্য সেইজন্য একটি এহেলিকার অর্থোজ্যটিমে আবৃত্ত হইবে। কি নিমিত্ত এই প্রশংসার অবতারণা করা হইয়াছে তাহা বলিতে গেলেই অনুমিত হইবে। আশ্চর্য্য ভরসা করি যে, ইহা একাধারে বলের ব্যঞ্জনা এবং সেসূরেন্সের নিম্নকণের নিম্নার সত্ত্বের প্রমাণে সমর্থ হইবে।

সেসূরেন্সের মতগুলি দ্বারা ছিল ডাক্তার যথো তিনি বোরেন বিমানের প্রতি সম্বন্ধিক অল্পহস্ত ছিলেন। সয়কালী চিকিৎসালয়ে চাকরী গ্রহণ করিবার পূর্বে বিমানের চিকিৎসা পাত্রাধ্যাপী দ্বাত্রয়জন “ল্য বেক” ততের” নামক একটা বুদ্ধিমানের যোগিত্য বাস করিতেন। যে দ্বাত্রয়ের কঠোর নিষ্পেষণে নিম্ন প্রতিভাশালী দুবলসম ধীরকালির দ্বারা নির্মলতা লাভ করিয়া শুদ্ধ ও অগাণবিকভাবে প্রকাশিত হইয়া থাকে সেই দ্বাত্রয়ের লবিত্ত এই জানেই ডাক্তার পরিচয় হয়। এই অগ্নি-পত্রীকার উত্তীর্ণ হইলে নৈতিক বাগ্যবদনধীর উচ্চ-অগণিত সুবল্যতা এবং কতকগুলি সঙ্গী লাভ করে যে, প্রতিভূল ঘটনাবলিতে কথাপি ডাক্তারের বৈদ্য বা দৃষ্টতার স্বভাব বোধ হয় না। প্রতিভার চিরগহ্বর বহুবিধ প্রদোষ

সর্বজন সম্মত করিতে হয় বলিয়াই ইহাদের মৃত্যু অন্যাচারিতমমুহ সমানুভূতপে বিকাশ পাইয়া থাকে। হোরেস বিদ্যানন্দ বড়ই সাধাণিবা মানুষ। যখন এক মূৰ্খ এক কাণ্ডকে বলে তাহা সে আশিত না। দুৰ্বা বাক্যসংলগ্নের সৃষ্টি না করিয়া তাহার অধিবৃত সে সেপ স্পষ্ট কথায় সোজাগুলি প্রকাশ করিত। কোম বৃদ্ধ উপকারের অস্ত্র নিজের পাত্ৰদের বন্ধক দিতে বা নিঃসর মূল্যদান সময় দায় করিতে সে অসুযোগও বিধা দেখ করিত না। বহুগণের সহিত ব্যবহারে কলানন্দনানের ভাব তাহার যখন লখনত স্থায় পাইত না। তাহার বৃদ্ধ বিশ্বাস ছিল যে, সে নিজে বহুগণের উপকারার্থ যে পরিমাণে কতি খাঁসার কতি তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক প্রতিদান সে বহুগণের নিকট হইতে পাইয়া থাকে। তাহার এই সৌমন্ত্রে কোমরপ বাড়াড়বয় ছিল না বলিয়া তাহার বহুগণ সকলেই তাঁহাকে মনে মনে প্রশংসা করিত এবং তাহারের মধ্যে অনেকেই বিদ্যানন্দ তিরস্কারতরে কোমরপ অস্ত্রায় কার্যে হস্তক্ষেপ করিত না। তাহাই বলিয়া বিদ্যানন্দ কখনও অতিশিষ্ঠার ভান করিত না। পান্ডুরগিরি করা তাহার বড় অন্ত্যাস ছিল না। বহুগণকে সৎপরামর্শ দিতে হইলেও কথার মাত্রাধারণ সে পরকারমত হুট একটা অভিধানবহুভূত বাক্য উচ্চারণ করা বোঝাবই মনে করিত না এবং সুবিধা পাইলে আঘোব আছোনে নোপ দিতেও তাহার কিছুমাত্র আপত্তি ছিল না। এত নিমিত্ত তাহার সাক্ষ্যার্থে সকলেই আসন্ম বোধ করিত। লোকের নিত তাহার সূকাইবার কিছুই ছিল না। ক্রিমি লক্ষ্যশীলতা বা স্ফাকারীয় তার দিয়া কখনও সে দাঁড়িতে চাহিত না, সে নিশ্চিত মনে উন্নতগণের খাঁর গন্তব্য পথে সমন করিত। হোরেসের বহুগণের মধ্যে অনেকেই সূশীলজীবীর পীড়নে গলয়নগর হইয়া তাহার আশ্রয়গ্রহণ করিত। সে তাহাদিগের সহিত হাসিমুখে সকল বৈষ্ণব-সকল দুঃখ সহ্য করিত। ইহা অপেক্ষা সাধনের আর কি নিদর্শন হইতে পারে? তাহার অর্থাভাব ছিল বটে, কিন্তু সে কারণে সে কখনও কণগ্রস্ত হয় নাই। তাহার বহুগণ বলিত, হোরেস উষ্ট্রের স্তায় ধীর ও সংযত এবং বস্ত্র মূগের স্তায় সতর্ক। বাস্তবিক তাহার কার্যে বা অতি-লাভে কখনও কোনও অধৈর্য বা বিধায় ভাব পরিলক্ষিত হইত না। যে বিষ চিকিৎসক এবর সেসেরে'র বিদ্যানন্দ বোধগণের প্রথম পরিচয় পাইলেন, সেই দিন হইতে তাহার উন্নতির সূত্রপাত হইল। কায়র, বিদ্যানন্দ তাহার বোধগণেই স্তম্ভনম্বায়ে প্রিয় হইয়াছিল; অল্পবয়সে শিক্ষাবিশেষের মধ্যে যদি কোম সাধারণ চিকিৎসালয়ে রোগনিবারণে নিযুক্ত কোনও এখান অধ্যাপকের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে, তাহা হইলে তাহার উন্নতির আর অন্তরায় থাকে না। বনীদিগের গৃহে আছত হইলে সেদ্রো'জ ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইতে ছুলিতেই না, স্তম্ভায় অধ্যাপকের সহকারী বলিয়া ছাত্রকেও রক্তহতে ফিরিয়া আনিতে হইত না। ইহাতে বিদ্যানন্দ আর এক সুবিধাও বটীয়াছিল। তাহার নিবাস সূর্য গরীগ্রাণে, বহাবদগীর ঢালঢালনের সহিত সে ভালরূপ পরিচিত ছিল না। সেস্মে'জের কুপার যে অল্পবিশেষে অভিভ্রাত ও বনী সন্ধ্যারের অভিশপ্তি আনিতে পারিয়াছিল। সেস্মে'জের অস্ত্র উপায়েও বিদ্যানন্দকে বধাশাখা সাহায্য করিতেই, রোদিনগ যে সময় তাহার গৃহে পরামর্শ গ্রহণ করিতে আসিত, ঐখন তিনি বিদ্যানন্দকে কাছে বসাইয়া আশ্রিতেন এবং

তিনি পাইলট তাহাকে তিকিৎসার ঔষুধ করিতেছেন । সেসময় যোগদত্ত ধর্মীর স্বাম-
পরিদর্শনের সাহায্য করিতে হইলে তিনি বিমানসংকে সমুদ্রবাহারী তিকিৎসকরূপে পাঠা-
ইয়া গিছেন । এইরূপে বিমানসং অঙ্গবিনেই তিকিৎসা ব্যবহারে সুপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিলেন ।
অন্ততিকিৎসার একজন অধীশ্বর ও এই ব্যাতিশ্রুতিশক্তিধীন সুবক্সর বধো অঙ্গবিনেই
সর্বোৎসাহে সচলমান রাখা হইয়াছিল । সেসময়েই তাঁহার প্রিয় শিষ্যটির নিকট
সকল কথাই অকপটচিত্তে একান্ত করিতেছেন । তাঁহার বিভিন্ন কর্মসমূহ বা তাঁহার পাঠ-
পুস্তকের বিস্তারিত বিবরণ কোন্ কোন্ বিলাসিনী কোন্ কোন্ সময়ে উপবেশন করিয়াছিলেন
তাঁহাও বিমানসংর অঙ্গবিনেই ছিল না ।

শিষ্য গুরুসেবকের বৈজ্ঞানিক ভাবনায়ই মুগ্ধ হইয়াছেন । সে জানিত যে, তাঁহার বড়ো
একান্তে সুসজ্জিত ও অপরূপে মিষ্টভাষার পরিচয় পাওয়া যায় ।

বোধ হয় এই একুত্তিতমেরই তাঁহার বন্ধু অধ্যাপিকরূপে স্বীকৃত হওয়ার তিনি
জনসম্মানে আক্রান্ত হইয়া অঙ্গবিনেই বৃত্তান্তে পড়িত হইতেন । বিমানসং এই বিখ্যাত
অধ্যাপকের কর্মবলম্বী ধর্মীর ঘটনাসম্মানে পুণ্ড্রপুণ্ড্ররূপে লক্ষ্য করিবার মধ্যেই অবসর
পাইয়াছিলেন । বিশ্বব্যাপ্তিগত সামাজিক উচ্চাভিলাষ ও শীত অর্ধশুভ্রতা
কিন্তু এজন্য থাকিতে পারে তাঁহা তাঁহার চরিত্রের হইয়াছিল । সেসময়েই স্বর্গীয় স্বভাব-
কোষের পুস্তিকটর বনোত্তমিতুল্যে কিন্ত্রুপে প্রচারিত করিতেছেন তাঁহা শিষ্য বিমানসং
ধর্মীর সমীক্ষণীয় বিচার্য্য পূর্ণ হইতেই অন্ততম করিয়াছিল ।

এক দিন বিমানসং কথোপকথনে সেসময়ের নিকট বলিয়াছিলেন যে, সেষ্ট অ্যাকেনস
পত্নীর একজন অভ্যর্থনায় বৈদ্য হইয়া জলবাহক অভাবিক প্রবর্তনতঃ কঠিন শ্রীতির আক্রান্ত
হইয়াছে । ১৮২১ সালের জীবন শ্রীতবৃত্তিতে এই অভাবা কেবল আশু সিদ্ধ হইয়া গাণ-
ধারণ করিয়াছিল । এই সংবাদ শুনিয়া সেসময়ের আর জনমাত্র বিলাস করিলেন না ।
তিনি সমস্ত রোগী পরিচর্যা করিয়া বিমানসংর নিকটে সেই বহিষ্কৃত ব্যক্তির গৃহান্তিমুখে পক্ষট-
রেখণে যাত্রা করিলেন, পথে এতদূর বেগে পাড়ী জালাইতে লাগিলেন যে, যোড়ারি বন বহু
হইয়া বাইবার উপকর হইতেছিল । রোগীকে পরীক্ষা করিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ বিজ্ঞ তত্ত্বা-
বধানে তাহাকে সেষ্ট ডেনিস মহাশয়ের বিখ্যাত কেসরকারী তিকিৎসালয়ে স্থানান্তরিত
করাইলেন এবং প্রত্যাহ প্রচার দমন করিয়া সোজা তিকিৎসা করিতে লাগিলেন । সে
সম্পূর্ণ আয়োজনাগত করিলে তিনি জলবাহকের জন্য পাড়ী ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি ক্রয় করি-
বার উপযুক্ত অর্থ দিয়া তাহাকে বিদায় দিলেন । বলা বাহুল্য ক্রান্ত প্রকৃতি সত্য-
বেদের জলবাহকরা সংশ্লিষ্টতঃ পাড়ী করিয়া জল আদায় করিয়া থাকে । তিন্তী এতদ-
(তদনং)।

ঐতিহাসিক সত্যকথা ।

অশ্রু।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

যাত্রা।

অশোক সিংহ জমিদারী-পরিদর্শনে বাইতেছিল। প্রকৃতি যে সকল সম্পদপ্রদানে প্রায়ই কাণব্য প্রকাশ করেন, আর যে সব সম্পদ লোক বহু কষ্টে লাভ করে—বিনা আয়াগে সে সকলই অশোক লাভ করিয়াছিল। আশাভেদে দেনে বহুকাল হইতে শুনা যায়, বিবাহব্যাপারে বরে কড়া রূপ মাতা অর্থ ও পিতা বিজ্ঞা চাহেন। মিষ্টাঙ্গলোপ ইত্যদনের কথা ছাড়িয়া দিলে এই সকল সম্পদ বাকিলেই বর সর্ববিষয়েই প্রার্থনীয় হয়। অশোকের দ্বন্দ্বের অভাব ছিল না—বর্ষের গৌরভায়, গঠনের সামঞ্জস্যে, বাহ্যের অনুরূপতার তাহাকে সুপুরুষ না বলিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে। আবার যৌবনের লাভণ্যে তাহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য আরও মনোহর হইয়া উঠিয়াছে। তাহার বর্ষের অভাব থাকে ঘূরে বাহুক আবৃত্তকাকিরিত্ত অর্থ ছিল। তাহার পিতা ওকালতী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া “বর জগদ্বর” ওকালতী করেন। তাহার পণ্যের সবে সবে প্রতিপত্তিও বর্ষেই হইয়াছিল। যে পরগণায় তাহার বাসগারী অবস্থিত সে পরগণাও তিনি জয় করিয়াছিলেন। এই সময়ে তাহার বাবনে বিশেষ পারদর্শন সংঘটিত হয়। এতদিন তিনি অর্থ উপাধানে ও অর্থসকলকেই ব্যাপৃত ছিলেন। তাহাতে তাহার ঘরেই সাকল্যও হইয়াছিল। তাহার একমাত্র সন্তান—কন্যাই তাহার সমস্ত স্নেহের অধিকারী হইয়া তাহার গৃহে আনন্দ ও ক্ষমদে সুখ বিতরণ করিত। সহসা বৃদ্ধা যখন তাহাকে পিতৃবক্ষ্যত করিয়া লইয়া গেল তখন শোকাভূত পিতার পক্ষে কাণ্ড যেন অসম্ভব হইয়া গেল। গৃহে কন্যার সন্নিবেশ স্থাতিচহ কেবলই তাহাকে স্মৃতিভক্ত করিতে লাগিল। তিনি সে গৃহে বাস কর্তৃক দেখিয়া কলিকাতায় আসিলেন। তখন কলিকাতায় ইংরাজাধিকৃত বাঙ্গালীগণের জ্ঞানমতের বিশেষ আদর। হিন্দুগণের আগোচনার অভাবে তাহার স্বপ্ননির্ঘরে অসমর্থ হুবকগণ সে ধর্ম্মে আস্থাহীন হইয়া কেহ বা নাজিক্যবাদের আশ্রয় লইয়াছিলেন, কেহ খুইত্বের দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তাহার পর জিহ্বাকাতবাক্ত হিন্দুসমাজ

ব্রাহ্মণ্য নামে শিক্ষিত বাঙ্গালীর নিকট সমাদৃত হইয়াছিল। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন প্রথম প্রযুক্তিও ব্রাহ্মণ্যের সহিত সংঘর্ষে পরিবর্তিত হইয়া কখনও উৎসাহী তরুণবয়স্ক প্রচারকের চেষ্টায় বিশেষরূপে ব্যাপ্ত হইতেছে। সেই সময় কলিকাতা নগরীর বিপিনবিহারী কলিকাতায় আসিলেন এবং ব্রাহ্মণ্যের আকর্ষণ হইয়া তাহাতেই শান্তি ও সাহসী সন্ধান করিলেন। যখন সময়ের শীতল সলিলসেতনে তাঁহার হৃদয়ে শোকের অনল-শিখার উগ্রতায় হইতেছিল সেই সময় এই সময়ের আকর্ষণ হইয়া তিনি তাহার অগ্রদূত হইয়া পড়িলেন। কিছুদিন কলিকাতায় থাকিয়া তিনি আপনাদের কর্মস্থানে প্রত্যাবর্তন করিলেন। তথায় ফিরিয়া তিনি দেখিলেন, তাঁহার বন্ধুত্বের প্রথমে তাঁহার পক্ষে পরিচিত সমাজের ঘর ভাঙ হইয়াছে। যে সকল ছাত্র আত্মীয় কুটুম্ব তাঁহার আগ্রহে থাকিয়া পাঠ বা চাকরী করিত সমাজসংস্কারের ভয়ে তাহারা তাঁহার গৃহত্যাগ করিল; সর্বত্র সামাজিক কার্যে তাঁহার নিমন্ত্রণ বন্ধ হইল। পল্লীগৃহে গোলমাল আরও থাকিয়া উঠিল। যথায় সকলের নিকট তিনি সমাদৃত হইতেন ও সকলের সামাজিক কার্যে কর্তৃত্ব করিতেন তথায় “একঘেরে” হইয়া বাস করা কষ্টকর হইয়া তিনি বাস উঠাইলেন। অমীমাংসিত কাছারী পল্লীগৃহে স্থানান্তরিত করিয়া, সর্বত্রের সর্বত্র একাধারে আবর্তিত হইলে ব্যবহার করিবেন এমন ব্যবস্থা কার্য্য অবশিষ্ট অংশে আমোদপ্রমত্তের বাস। নির্দিষ্ট করিয়া বিপিনবিহারী কলিকাতায় সময় করিলেন ও হাইকোর্টে ওকালতী আরম্ভ করিলেন। তথায় তাঁহার পশারও কমিয়া উঠিল; সঙ্গে সঙ্গে অমীমাংসিতও বাড়িতে লাগিল। এই সময় অশোকের সময় হয়। সে পিতার সময় সম্পত্তির অধিকারী; সুতরাং তাহার অধিকার অত্যন্ত ছিল না। বিজ্ঞা কেবল দান বা উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া না; কিন্তু প্রকৃতি তাহাকে বিদ্যালয়িকার উপায় বুদ্ধিতে কার্পণ্য করেন নাই। পিতার বয়স ও বুদ্ধির বলে সে বিদ্যালয়িকার নির্দিষ্ট বিদ্যালয় করিয়াছিল—বিদ্যালয়িকার উপাধিলাভ তাহার পক্ষে কষ্টসাধ্য হয় নাই।

অশোকের রূপ, অর্থ ও বিদ্যা ছিল। কিন্তু অনায়াসে এ সকল লাভ করিয়া সে একটি গুণের অনুশীলন করিতে শিখে নাই। তাহার একাগ্রতা—কোন একটি বিষয়ে নিবিষ্টচিত্ততা ছিল না। সে ওকালতী পড়িয়াছিল, কিন্তু পড়ীকা বেশ নাই, সে যেহেতু একটি কবিতা লিখিয়াছিল সেগুলি বিশেষ প্রশংসিত হইলেও কবিতা পড়িতে তাহার যেরূপ উৎসাহ ছিল, কবিতা

লিখিতে তাহার পেরূপ উৎসাহ ছিল না। সে মুকুট ছিল, কিন্তু গান গাহিতে ভালবাসিত না। পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন কিছুই সে অনালোচিত রাখে নাই, প্রাণিতত্ত্ব ও উদ্ভিদতত্ত্বও তাহার অজ্ঞাত ছিল না। কটোগ্রাফীতে সে সিদ্ধবিদ্যা ছিল। চিকিৎসা শাস্ত্রের কিছু আলোচনাও সে করিয়াছিল ও করিত। এক কবার তাহার বিদ্যাবুদ্ধিতে কেহ সন্দেহ করিত না এবং বাহারা যে কাবে ঘাত দেয় সেট কাবই করিতে পারে ও চেষ্টা করিলে যে কোন কাবে যশ অর্জন করিতে পারিত কিন্তু একাগ্রতার অভাবে কোন কাবেই লাগিয়া থাকিতে পারে না ও সেই অল্প সংসারে স্থায়ী যশের অবিকারী হয় না সে তাহাদের মনশ্চিন্তা করিতেছিল।

এই তপস্বান, তপস্বান ও বনবান যুবককে দেখিয়া বিবাহযোগ্যবয়ঃপ্রাপ্তা কুমারীগণের জননীগণের মেহ উছলিয়া উঠিত; সন্ত্যাসস্থিলনে বা নিমন্ত্রণ-সভায় তাহার আবির্ভাবে কুমারীমলে যে ঢাকলা-সজীবতাও লক্ষিত হইত না এমন নহে। কিন্তু অশোকের বিনয়ব্রিদ্ধ, সরস, অসঙ্কট আলাপ কিছুতেই আবেগে উজ্জ্বলিত হইত না; তাহা কিছুতেই বীরত্বের নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিত না। যে অভিজ্ঞতার অতর্কিত আগমনে সহসা জীবন যুবকের হয়, সে অভিজ্ঞতা সে লাভ করে নাই। সহসা এক দিন কোন কিশোরীর নয়নালোকে যুবক হৃদয়ে বসন্তাগম অসুভব করে—তাহার মনে হয়, সহসা তাহার হৃদয় বিগতকৃত্তমে শোভাময়—বিহগবিরাগে মুগ্ধরিত—মলয়হিল্লোলে প্রহর হইয়াছে। অশোক হৃদয়ে এখনও সে অসুভূতি লাভ করে নাই। আর সে সেই অসুভূতি লাভ করে নাই, বলিয়াই অসীম রেহীলা জননীর অমন্ত্র অহরোধ লবেও সে এখনও অকৃতকার্য।

তাহার জননী সত্য সত্যই তাহার প্রতি রেহীলা। একমাত্র সন্তান কল্যকে হারািয়া—শেবে অশোককে পাইয়া তিনি শোকের দশেনমুক্ত হইয়াছিলেন—শোক যদি অশোক করিতে পারিয়াছিলেন। সে তাহার মেয়ের একমাত্র অবলম্বন। সে-ই তাহার বিধবা জননীর সর্ব্ব্ব। এ অবস্থায় তাহার মেয়ের আভিষেখ্যে বিশ্বাসের কারণ থাকিতে পারে না। কিন্তু তাহার মেহে সত্য সত্যই কিছু বিশেষ ছিল। তাহার নিকট তাহার পুত্র সন্তানের আদর্শ—মাছের আদর্শ—দেবতার প্রতিমূর্ত্তি। সকলের মুখে পুত্রের প্রশংসা শুনিয়া তাহার এই ভাব অবিচলিত বিশ্বাসে পরিণত হইয়াছিল। অশোকের প্রতি তাহার মেহ গোপালের প্রতি যমোদার মেহের সহিতই তুলনীয়। সে মেহ

ভেমনই বিপুল—ভেমনই বয়স—ভেমনই বিকশিত । আবার তাহাতে বাৎসল্য ভেমনই ভাঙতা বা বিজড়িত—ভক্তিভাব ভেমনই বাৎসল্যাবিশ্লিত ।

অশোকের জননী মনোমোহিনী একালের লোক হইলেও তাহার বয়সটা সম্পূর্ণ “সেকেলে” । স্বামীর স্বপ্নই জীবন স্বপ্ন এই বিশ্বাসবশে তিনি কোনরূপ বিচার বা বিবেচনা না করিয়া স্বামীর সূহৃৎ স্বপ্নে দীক্ষিত হইয়াছিলেন ; কিন্তু পুঙ্খানুপুঙ্খ সংস্কারগুলি বর্জন করিতে কিছুমাত্র চেষ্টা করেন নাই । তিনি নিগ্রা-কাগ চৈতন্যবস্তুর দ্বারা উপাসনা করিতেন ; কিন্তু অশোকের সামান্য অশ্রুতে তাহার “খাড়া করা” ঐ কালীমন্দিরে বা সিংহবরীতলায় পূজা দানিলে পূজা বিহার বায় তিনিই বহন করিতেন ; আর বিবাহবিষয়ে অশোকের স্মৃতি হইলে সে যে তাহার বিবাহের পরাধীনই কালীবাটে মন্দিরে পূজা দিবে ঘনিষ্ঠাছিল তাহাও তিনি জানিতেন । দুরোপ-প্রভাগত ও দুরোপীয়াগিরের বেশভূষাভূষণ নগনারীপুট সমাজে বাস করিয়াও তিনি মেয়েদের ক্ষুভা ব্যবহার অপেক্ষা আলতা পরায়ই অধিক পক্ষপাতী ছিলেন । বিপিনবিহারী পুত্রকে বিদ্যালিক্ষার্থ ইংলণ্ডে পাঠাইতে চাহিলে তিনি অবিরল অলসভাবে স্বামীর সে সঙ্কল্প ভাসাইয়া দিয়াছিলেন । সত্য, সমিতি, সম্মান এ সকল অপেক্ষা সৃষ্টি-কাণ্ডেই তাঁহার অধিক আকর্ষণ ছিল ; পতিপুত্রের সুখবিধানচেষ্টাই তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য ছিল ।

অশোক জননীকে অত্যন্ত ভালবাসিত । তাঁহারই অশ্রুরোধে সে জমী-দারী-পরিচর্য্যে বাইতেছিল । বিশ্ববুদ্ধিসম্পন্ন বিপিনবিহারী সম্পত্তির সুব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন । পুত্রের কখনও আদায়ের অশ্রুবিধা হয় নাই । কিন্তু সত্য তিন বৎসর সে নিরন্তর ব্যতিক্রম হইয়াছে । দুই বৎসর অকস্মাৎ ঘোঁষাই দিয়া কর্ণচাটীয়া কম টাকা ইরশাল করিয়াছিলেন । অকস্মাৎ কথার অশোকও আদায়ের জন্য ব্যস্ত হয় নাই ; পরস্তু মার সহিত পরামর্শ করিয়া লিখিয়াছিল, প্রজার প্রতি কোনরূপ শ্রীড়ন না হয় । দ্বিতীয় বর্ষে অকস্মাৎ হইলেও আদায় আশাহত হইল না । কর্ণচাটী লিখিলেন, প্রজাদিগের নিকট অনেক বাকি পড়িয়াছে । ভালবতাপাধাও আদায় না হওয়ার নালিশ করিতে হুইতেছে ; আবার অনেক ক্রমাক্ষির অজুহাতে আত্মীয়ের তদন্ত প্রার্থনা করিতেছে, সে সব ক্ষেত্রে জরীপ শেষ না হইলে টাকা আদায় হইবে না । পুনঃ পুনঃ এইরূপ অনায়াসে মনোমোহিনী চিন্তিতা হইলেন এবং পুত্রের স্মৃতিতে অসীম বিশ্বাসবশতঃ মনে করিলেন, সে স্বপ্ন দেখিলে সব গোল মিটিয়া

যাইবে। তাই তিনি তাহাকে একবার জমীন্দারীতে যাইতে বলিলেন। পুত্রের সৰ্ব্ববিষয়ে পারদর্শিতার মা'র যতই বিশ্বাস থাকুক না কেন, অশোক বুকিল, সে যাইয়াই সহজে সব বুঝিতে বা কিছু করিতে পারিবে কি না সন্দেহ। তাই সে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল; কিন্তু শেষে মা'র অহুরোধে মতপরিবর্তন করিল এবং জরীপ ও বন্দোবস্ত সম্বন্ধে আবশ্যক অনাবশ্যক অনেকগুলি পুস্তক কিনিয়া বাজার আরোজন করিল। তাহার প্রধান উদ্দেশ্য দেশ-সেবা।

বাজার আরোজনও অনেক। পাতে পুত্রের কোন অশুবিধা হয়, সেই ক্ষত মনোযোগিনী কেবলই কিনিসের পরিমাণ ও পরিচায়কের সংখ্যা বাড়াইতে লাগিলেন। পুত্রের কিনিসও বেড়েই গেল। দূরবীক্ষণ, ক্যামেরা, ঔষধের বাক্স, পুস্তক প্রভৃতি বিবিধ জবা লইয়া সে কেবল এক পক্ষকালের জন্য প্রবাসে চলিল।

মনোযোগিনীই পুত্রকে যাইতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার যাইবার সময় যত নিকট হইতে লাগিল তিনি ততই চিন্তিতা হইতে লাগিলেন; ভাবিতে লাগিলেন, “কেন অশোককে যাইতে বলিলাম?” অশোক যদি তাহাকে সঙ্গে যাইতে বলিত তাহা হইলে তিনিও যাইতেন। অশোকের বরস তিনি “বেশে” যায়েন নাই। পূর্ণবাড়ীর ছোটদিবি, নাকের বাড়ীর রাঝাঠাকুরকি, ওপাড়ার বেগঠাকুরণ—তাহার সকলকে একবার দেখিবার ইচ্ছা হইতে লাগিল। তিনি জানিতেন না, তিনি ইহাদের স্মৃতি সম্বন্ধে রক্ষা করিতেছিলেন—গ্রামেও এখন তাহাদের অনেকের স্মৃতিমাত্র অবশিষ্ট আছে। শেষে যাইবার সময় তিনি পুত্রকে বলিলেন, “তুই কখনও পল্লীগ্রামে থাকিস্ নাই। তুই খুব সাবধানে থাকিস্; আর কিছুর কি করিতে চাইবে কণ্ঠচ্যারী-দের বলিয়া দিয়া চলিয়া আসিস্। তোর চারি পাঁচ দিনের অধিক থাকিবান আরোজন নাই।” অশোক হাসিয়া কহিল, “তবে যাইয়া লাভ কি, মা? আমি এবার কিরিয়া আসিয়া মিলাত যাইব। তখন কি করিবে?” অশোক বিদায় লইল।

অশোক যাইবার ক্ষণ ট্রেনের সোজা পথ ছাড়িয়া শীমারের ইন্ডা পথ ধরিয়াছিল। সে স্মৃতির বন ঘুরিয়া শীমারে যাইবে। স্মৃতির বন দেখা হইবে—সে জঙ্গলের অনেক গছ সে পড়িয়াছে; এবার লক্ষ্য দেখিবে। ইহাতে তাহার বিশেষ উৎসাহ পাকিত হইতেছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

বিপণ্না ।

রাজিতে কখন শীঘ্র ছাড়িয়াছিল অশোক জানিতে পারে নাই ; সে ঘুৰাইয়া ছিল । ঘন ভাৰিণেই সে কামরা হইতে বাহিৰে জাহাজের সমুখের পাটাতনে আসিল । তখন কৰ্ণধার একাকী ছিল—টুলে বসিয়া চাকা ঘুৰাইয়া জাহাজের গতি নিয়ন্ত্ৰিত করিতেছিল । আকাশে বৰষুণীৰ অন্ধকার ও নদী-বক্ষে ঐতিফলিত অন্ধকার কেবল দুঃ হইতেছে ; বেন জগতের বন্ধনকে জীবনের অভিনয় আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পূৰ্বে দিবসের অদৃষ্ট কণাকণ হইয়া অন্ধকার যবনিকা কল্পিত হইতেছিল । তাহার পর পূৰ্ণমিচ্ চক্ৰগালে কোষযুক্ত তরবারের দ্বাৰা বৰিৰাশি দেখা দিল ; নদী যেন গতিহীন । তাহার বৰিকল্পিত বক্ষে বৃদ্ধতঃ-চাকলা—বেন অক্ষয়কিৰণধারে তাহার জ্বয়ে পুলককল্পন অস্বপ্ন হইতেছিল । বেধিতে বেধিতে পূৰ্ণগগনে বীর—বৃদ্ধ পানবিক্ষেপে বিবাক্ত অশ্রু হইলেন । অন্ধকার দুঃ হইয়া গেল—ছায়াপোকে বহুতলবুৰ উভার পর দিবস দেখা দিল ; বিবালোকবিকাশের এই মনো-রম বৃদ্ধ অশোক আর কখনও দেখে নাই । তাহার জ্বয়ে অনন্তকৃতপূৰ্ণ আনন্দ অস্বপ্ন হইল । তাহার জ্বয় আনন্দে পূৰ্ণ হইল । যেমন যে খাত আনন্দা উদয় করি তাহাতে আমাদের পুষ্টি হয় না—বাহা আনন্দা ধীৰ করি তাহাতেই হয়, তেমনই বে আনন্দ আনন্দা উপভোগ করিতে পাই তাহাতে আনন্দেই জ্বয় পুলকিত হয় না—বাহা উপভোগ করিতে পারি তাহাতেই হয় । তাহার আনন্দসম্ভোগের ক্ষমতা যত অধিক সে তত অধিক আনন্দলাভ করে । অশাকলা, অনাটন, হৃদিত্তা, চঃখ, অশোক কিছুই ভোগ করে নাই—তাই তাহার আনন্দ-সম্ভোগ-ক্ষমতা দুৰ্বল হয় নাই ; তাই সে এই প্রাকৃতিক দৃষ্টে অসীম আনন্দলাভ করিল ।

সব নূতন । সহরের জনতা নাই—নদীবক্ষে নৌকা—আর তীরে কেবল শাহ, নিরুটে ফিকা, সৰু, বুৰে ঘন বেন—যেখ পুষ্টিকৃত হইয়াছে ; যথা যথো দেখা যায়, এক একবানা জাহাজ বিপন্নিত দিক হইতে অশ্রু হইতেছে । নদী ক্রমেই বিস্তৃত ।

তাহার পর সুন্দর ঘনের আরম্ভ । জগলে বেঙাল, সুন্দরী, পৈদো নানা-

জাতীয় পাণ্ডা। জলকুল পর্যন্ত পড়ে—গোগনাই অধিক। যখন জোয়ারের জল আসিয়া নদীতে প্রবেশ করে—নদীসর্গ জলে পূর্ণ হইয়া উঠে—সমস্ত নালার জল জললে প্রবেশ করে তখন এই সব পাহের ক্ষতচাংগ জনগণ হইয়া যায়। ঘাইতে ঘাইতে দেখা যায়, মথো মথো জলোচ্ছ্বাসবিধিখামুল প্রক পতনোদ্রুপ হইয়া আছে।

ক্রমে হুই দিকে কেবল জল ; জটিল জমীতে জল কাটিয়া বসতির চিহ্ন দেখা যায়। যৎস্থ প্রকৃতির সহিত সংগ্রাম করে—জমী চটয়া এই জল অকস্মাৎ ক্রিতেছে। জটিল হুই একখানি নৌকা দেখা যায়—মাঝির কাঠ বা হোপলার পত্র সংগ্রহ করিতে আসিয়াছে।

অশোক বসিয়া দেখিলে লাগিল ; কখন দূরবীক্ষণ দিয়া কখনও অমনই চাহিয়া সে নূতন দৃষ্ট দেখিতে লাগিল। কিন্তু জললে বৈচিত্র্যের একান্ত অভাব। তাই ক্রমে সে বিরক্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। সে বনে করিল, ইহারই নাম সুন্দর বন। কখনই নহে। নিম্নের সুন্দরী পাহের বন হইতে সুন্দর বন নাম হইয়াছে ; নহিলে যে বনে মাদ্রব নাই, ফুল নাই, গাছে পাখীও বড় দেখা যায় না তাহাকে কি সুন্দর বলা যায় ? অশোক বিরক্ত হইয়া একখানি পুস্তক পড়িতে আরম্ভ করিল ; ভাল লাগিল না। তখন সে আশ্রয় কেদারায় শয়ন করিয়া ভাবিতে লাগিল, এই সুন্দর বনে এক সুন্দরী মাদ্রবের বাস ছিল। বনজুড়িতে বহুলবাধি, দার্বক দেবাগর, শৈবালার সঙ্গী, পরিভ্রান্ত প্রোদ তাহার সাক্ষা দিতেছে। আর যে জ্বনি বাপদগর্জনে সুপরিচিত এক দিন তবায় মানবকণ্ঠ শ্রুত হইত। আর যে স্থান জনশ্রুত এক দিন তবায় কত মানবের ক্রমে বিরহবেদনা, মিলনানন্দ, অপত্যস্নেহ অশ্রুভূত হইয়াছিল। তখন এই স্থানে কত দুঃ, কত গরি হইয়া গিয়াছে ? অশোক এমনই কথা ভাবিতে লাগিল, আর মথো মথো নদীর উত্তর পাখের দৃষ্ট দেখিতে লাগিল।

ক্রমে দিন শেষ হইয়া আসিল। অশোকের কুতা আসিয়া বলিল, “বীথু, ঐ দেখুন, হরিণ।” অশোক উঠিয়া দাঁড়াইল—নদীতুলে হুইটি হরিণ চরিতে-ছিল। ঝালাসীরা তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়া শীঘ্রের বাণি বাজাইয়া দিল। সে শব্দে হরিণ হুইটি লক্ষপ্রদান করিয়া ক্রত বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া অদৃষ্ট হইয়া গেল।

দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। নদীর কর্ণমাত্র জল ক্রতবর্ণ ধারণ করিল। উপরে অন্ধকার আকাশে তারা দেখা দিতে লাগিল। স্বাক্ষ

কাঁকে পাখী উড়িয়া কোথায় ঘাইতে লাগিল। পশ্চিমে আকাশের নিম্ন-ভাগে—সাহের পদ্মতে রক্তাভা; স্বর্গা ঘোড়িহীন—রক্তরাগরঞ্জিত। ক্রমে স্বর্গা পশ্চিমে ভূবিয়া গেল—আকাশ হইতেও সে রক্তাভা মুছিয়া গেল। সব অন্ধকার। অশোক কক্ষে প্রবেশ করিল।

কিছুক্ষণ পরে সে বাহিরে আসিল। সমস্ত দিন বেঁটাটানেন এক কর্ণধার বাতীত সে ছাড়া আর কেহ ছিল না, এখন শুধায় দুইজন বাতী আসিয়াছেন। তাঁহারা তাহার সহযাত্রী; যুরোপীয় যুবকযুবতা—পতিপত্নী, বিবাহের পর একান্তে নবলজ্জ সুখসন্তোগ করিবার জন্য আনন্দ যাত্রার যাত্রী। তাঁহারা সমস্ত দিন কামরা হইতে বাহির করেন নাই—এখন সন্ধ্যাসময়মে বাহির হইয়া আসিয়াছেন। তাঁহারা দুইখানি চেয়ার কাছাকাছি টানিয়া লইয়া বসিয়া পল্ল করিতেছিল। অশোক খানিকটা দূরে একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিল। তাহার সহযাত্রীরা তাহাকে লক্ষ্য করেন নাই। তাঁহারা পরস্পরকে লইয়া তন্ময়—একের দৃষ্টি অপরের মুখে নিবদ্ধ। উজ্জ্বল বিদ্যাল্য-লোকে অশোক দেখিল, উভয়ের আননে আনন্দদীপ্তি যেন তুটিয়া উঠিতেছে। যাহুবকে লইয়া যাহুব যে এমন তন্ময় হইতে পারে অশোক তাহা পুত্তকে পাঠ করিয়াছিল বটে; কিন্তু কখনও প্রত্যক্ষ করে নাই। সে তরুণ প্রেমের উজ্জ্বল প্রত্যক্ষ করিয়া ভাবিল—এ যুব কি চিরস্থায়ী? আজ সে হৃদয়ে একটা নবীন অঙ্গভূতি লাভ করিল। তাহার মনে একটা নূতন চিন্তা উদ্ভিত হইল। সে বসিয়া ভাবিতে লাগিল; আর কত কবির কত প্রেমের কবিতা তাহার মনে পড়িতে লাগিল।

আহারের দণ্ডা বাড়িলে তাহার চক্ষু ভাঙ্গিল। তাহার পর আহারের সময়ও সে দেখিল, তাহার সহযাত্রীরা আপনাদের লইয়াই বিশ্রাম। জগতে যে আর কেহ বা আর কিছু আছে তাহা তাঁহারা বৃষ্টি মনেই করিতে পারিতেছেন না। আহারের পর আপনার লক্ষ্য হইতে অশোক আবার বাহিরে আসিল। তাহার সহযাত্রীরা পূর্বেই তথায় আসিয়াছিলেন। তাঁহারা দুই-খানি কেদারা কাছাকাছি টানিয়া বসিয়া ছিলেন—পত্নীর কর পতির করতল-স্তম্ভ। পতিপত্নীতে কত কথা হইতেছিল। সে প্রেমের বিকাশ। অপেক্ষের জন্য যে ব্যাধুলতা সে বাসনা—প্রেম লক্ষ্যে যেষ্টিত করিয়া বিকশিত হয়।

অল্পক্ষণ পরেই অশোক বাইয়া শয়ন করিল; তাহার সহযাত্রীদের কথা ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িল।

স্বন্দনসকালনশব্দে আশোকের নিস্রাভঙ্গ হইল। তাহার মনে হইল, কাহাজ ভুলিতেছে। সে উপাধীনতল হইতে বড়ী বাহির করিয়া দেখিল, রাত্রি ওটা। সে বাহিরে আসিয়া দেখিল, খালাশীরা ছুটাছুটি করিতেছে। বড় উঠিয়াছে, কাহাজ নোঙ্গর করিতেছে। অশোক বাইরা ভূতানিগকে দেখিয়া আসিল; তাহার পর আসিয়া কাহাজের সম্মুখে খোলা কারগার বসিল। বড় বাড়িতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে বারিপাত আরম্ভ হইল। অশোক উঠিয়া ককে আসিল।

ককে আসিয়া শয়ন করিয়া অশোক ঘুখাইয়া পড়িল। আবার স্বন্দন-সকালনশব্দে যখন তাহার নিস্রাভঙ্গ হইল, তখন প্রভাত হইয়াছে; বড়বুটি শেষ হইয়াছে; কাহাজ নোঙ্গর তুলিয়া যাত্রায় উদ্ভোগ করিতেছে। অশোক ক্ষিপ্তভাবে মুখপ্রক্ষালন সারিয়া দূরবীক্ষণ লইয়া বাহিরে আসিল। বাহিরে সত্তরাত্রির ঋতিকাির চিত্রবাত্র নাই। কেবল আকাশের পূর্ণপ্রান্তে একই মেঘ লাগিয়া আছে—উদয়োগ্রুথ তপনের কিরণলপ্ধে সে মেঘ রঞ্জিত। জ্বপাথে' সেই আবছির তরুপ্রাণ—জোয়ারের জল নামিয়া গিয়াছে; বেলাভূমিতে কেবল কর্ধম; যে জল জোয়ারের সময় খালগুলি পূর্ণ করিয়াছিল সেই জল এখন নালা বাহিয়া নদাতে পড়িতেছে; কর্ধমের উপর কোন কোন স্থানে বলাক্যপ্রবী আহারাঘেবণে বাস্ত।

কাহাজ চলিতে লাগিল। অশোক সেই স্থানে বসিয়া চা পান করিতে লাগিল। সৎসা কর্ণধার তাহাকে বলিল, "বাবু, দূরবীক্ষণ দিয়া দেখুন দেখি, সম্মুখে ও কি?" অশোক দূরবীক্ষণ তুলিয়া লইল—সম্মুখে দেখিয়া বলিল, "কূলে একটা কি পড়িয়া আছে, যেন কাপড়; আর একখানা নৌকা হইতে কর্ণজন লোক সেই স্থানে নামিতেছে।" কর্ণধার বলিল, "এ সময়টার—ওটা পড়িলে কেহ কূলে নৌকা তিদ্ধায় না। জোয়ারের সময় কূলে বাইতে হয়। একটা কি ঘটিয়াছে।" সে ক্রত কাহাজ চালাইবার লঙ্ঘতবার্কা উচ্চারিত করিল। কাহাজ ক্রত চলিল। কাহাজ আর একটু অগ্রদূর হইলে অশোক দেখিল, কূলে একটি যজুযাদেহ—বোধ হয় রমণীর। সে কণা সে কর্ণধারকে বলিল।

দেখিতে দেখিতে কাহাজ সেই স্থানে আসিয়া স্থির হইল। কাহাজ স্থির হইতেছে দেখিয়া বাহারী নৌকা হইতে নামিয়াছিল, তাহারী ক্রত আসিয়া নৌকায় উঠিল—নৌকা ভাগাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু নৌকা তখন কর্ধমে

ଏହି ହଇମ୍ମା ଗିଆହେ, ତାହାମାନେ ନୋକା ଡାମାହିବାର ପୂର୍ବେହି ଜାହାଜେର ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳ, ତାହାର ସହବାଜୀ ଯୁରୋପୀୟ ଯୁବକ, ଜାହାଜେର କେରାନ୍ତି ଓ କମ୍ପାନୀର ସାମାନ୍ତରୀ ତାହାମାନଙ୍କେ ବସିରା ଫେଲିଲ । କୂଳେ ଏକଟି ଗ୍ରହଣୀର ଦେହ—ନିକଟେ ଏକଟି ବାକ୍ସ ପଡ଼ିରା ଥିଲ, ନୋକାର ସାକାରୀ ମେହିଟି ଲହିରା ପଳାହିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିତେହିଲ । ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଯୁରୋପୀୟ ଯୁବକ କୂଳେ ନାହିଁରା ପିଞ୍ଜିଲ ବର୍ଦ୍ଧିମାତ୍ର ଛୁମ୍ବି ଅତିକ୍ରମ କରିରା ସେ ହାଲେ ଗ୍ରହଣୀର ସଂଜ୍ଞାସୂତ୍ର ଦେହ ପାତିତ ଥିଲ ସେହି ହାଲେ ଆସିଲ । ଗ୍ରହଣୀ ଯୁବତୀ—ସୁନ୍ଦରୀ ; ତାହାର ପରିଧେୟ ଓ ଶ୍ରେଣୀତର ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର, ତାହାର ସଂଜ୍ଞା ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥାର ପରିଚାୟକ । ଯୁରୋପୀୟ ବାଲିକ, “ଗତ ରାତ୍ରିର କଢ଼େ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚଣା ଘଟିରାହେ,” ଅଞ୍ଚଳ ବାଲିକ, “ସାଚିରା ଆହେ କି ?” ଯୁରୋପୀୟ ବାଲିକ, “ଦେଖା ଯାଉକ ।” ଜାହାଜେର କେରାନ୍ତି ବାଲିକେନ, “ରାତ୍ରିତେ କଢ଼େ ମିଳେ ହଇମ୍ମାହେ ; ମାମି ଆର ବିଳସ କରିତେ ପାରିବ ନା । ବରଂ ଉତ୍ତାଳେ ଜାହାଜେ ଲହିରା ଚଲୁନ ।” ତତ୍ତ୍ୱେନ ଲକ୍ଷେ ବରାଧରି କରିରା ଗ୍ରହଣୀର ସଂଜ୍ଞାସୂତ୍ର ଦେହ ଗୋଟିଏ ଛୁମ୍ବିରା ଜାହାଜେ ଆସିଲ । ସାମାନ୍ତରୀ ବାକ୍ସ ଓ ସାକୀମାନଙ୍କେ ଆସିଲେ ଅଞ୍ଚଳ ବାଲିକ, “ବାକ୍ସଟା ଲହିରା ଓଷ୍ଟାଳେ ଛାଡ଼ିରା ଦେଓରା ଯାଉକ ।” ଯୁରୋପୀୟ ଯୁବକ ବାଲିକ, “ନା, ଉତ୍ତାମାନଙ୍କେ ପୁଲିଶେ ଦିଅ ।” ଅଞ୍ଚଳ ବାଲିକ, “ଏତ ହଇମ୍ମା କରିରା ଲାଭ କି ? ଆସାମାନଙ୍କେହି ସନ୍ଧ୍ୟାପେ ନାହିତେ ହଇବେ । ଏହି ଗ୍ରହଣୀରହି ବା କି ହଇବେ ?” ତତ୍ତ୍ୱେନ ଯୁରୋପୀୟ ଯୁବକ ସାକୀମାନଙ୍କେ ଗହୀର କରିରା ବିଦାୟ ଦିଲ । ତାହାର ପର ତାହାରା ବିପନ୍ନାକେ ଲହିରା ବାହୁ ହଇଲ ।

বর্ষ-আবর্তন।

১

বর্ষ'যান—বর্ষ ফিরে আসে।

দিগন্তে তিমিরভটে শান্ত আকাশের পটে
অরুণ বিকাশে,
নূতন ফুলের গন্ধ বহিরা আসিছে মন্দ
প্রভাত-বাতাসে।

২

বর্ষ-আগে এসেছিলে ধবে—

এই বিন্দু সমীরণ, এমনি যুক্তিত বন
ক্রামল পল্লবে,
এমনি উদার রাগে ধরনী পুলকে কাগে
সজীভে—সৌরভে।

৩

আজও উঠে সেই জয়গান ;

আগ্রবে আশ্বাসে হর্ষে শত কণ্ঠ নববর্ষে
করিছে আহ্বান,
লগ্নে পত্রপুষ্পরাগি দবে অতিথিরে আজি
কণ্ঠে অর্ঘ্য দান।

৪

তবু এই অন্তরে আমার—

হে নব-বর্ষ, চাহি' দেব আজি কিছু নাহি,
সুকলি আঁধার ;
সেই আলো—সেই গীতি, সেই প্রাপত্তয়া প্রীতি
ফিরিবে না আর।

ঈশ্বরদীমোহন বোশ।

প্রতিশোধ ।

(বিশ্বতের আত্ম-কাহিনী ।)

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

আমি মৃত ।—অনসাধারণের নিকট আমার অস্তিত্ব লুপ্ত হইয়াছে ; আমি সমাধিসভে নিহিত । আমার অন্তঃকর্মে নেপলসের আবালগুরুবনিতা আমার এই উক্তি সম্বন্ধ করিবে । ১৮৮৪ খৃঃ পূঃ একে উক্ত মহানগরীতে যে মহামারীর প্রাদুর্ভাব হয় অন্য শত শত নগরগীর ত্রাণে আমিও তাহাতে আক্রান্ত হই । আমার মরদেহ তখন আমার পৈত্রিক সমাধিসন্ধিরে তমসাক্তে ক্রমশঃ রক্ষিত হইয়াছিল । তথাপি আমি জীবিত । আমার শিরায় শিরায় উষ্ণ রক্তস্রোতঃ প্রবাহিত । ত্রিশৎবৎসর বয়স্ক যুবকের সর্জনপ্রকার উন্নয়ন ও উৎসাহ আমার হৃদয় পূর্ণ করিয়া রহিয়াছে । চক্ষুর উজ্জ্বল তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, মাংস ও পেশীবহুল বাহুবল, সুগঠিত দেহকায় আমার যৌবনেরই পরিচয় দিতেছে । কেবল মস্তকের স্তব্ধ কেন্দ্ররাশি ইহার অন্যাক্ষরণ করে । আমার মানসাকাশে একদিন যে অশান্তির কটিকা প্রবাহিত হইয়াছিল আমার স্তব্ধ কেন্দ্র তাহার একমাত্র নিদর্শন । কেহ মনে করেন, উহা আমার পৈত্রিক বংশোদ্ভূতমাস্ত্র পীড়ার ফল ; কেহ মনে করেন, উহা কোনও আকাঙ্ক্ষার বিপদের পরিণাম ; কেহ বা মনে করেন, সুদার্ষক্যের উচ্চপ্রবান দেশে বাস করার আমি এই দশা লাভ হইয়াছি । কিন্তু হায় ইহার প্রকৃত কারণ কাহারও নিকট এ পর্যন্ত নিবেদিত হয় নাই । একদিন কথাস্রবণে এক চিকিৎসকের নিকট উহা প্রকাশ করার তিনি অবিবাহিতের হাসি হাসিয়া আমাকে উদ্ভ্রান্ত বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন । আজ আমার সেই আত্মকাহিনী তোমাদের নিকট বিবৃত করিব । স্বতন্ত্র দক্ষিণ আমেরিকার ঘনবনরাশিসমাক্ত পুত্র এক পল্লীতে আমি একদে বাল্য করিতেছি । সভ্যতার আলোক এখনও এ প্রদেশে প্রবেশ করে নাই । বিহঙ্গের কাকলী ও শুকপত্রের মর্দঙ্গধ্বনি বাতীত আমার গৃহের নিরুদ্ধ শব্দ আর কিছুতেই ভঙ্গ হয় না । আমি সম্পূর্ণ নিরাপদ স্থানেই বাস করিতেছি । জগতের সবকিছু আমার অতীত ইতিহাস বর্ণন করিলেও আমার আর বিপদের কোনও আশঙ্কা নাই । তাই আমার দুর্ভাগ্য জীবনের করুণ কাহিনী ক্রমে ক্রমে বিবৃত করিব ।

আমি বড় অশুভ জীবিত। এ কুহেলিকাপূর্ণ কথার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা বড় সহজ নহে। বাস্তবিক বৃত্ত আবার কি করিয়া জীবিত থাকিতে পারে ? ইহা এক দারুণ বিষয়ের বিষয়। শুধু বলিতেছি, আমি বৃত্ত অথচ জীবিত। মৃতের এই রক্তপূর্ণ বাক্যের অবসান যদি দেখিতে চাহ, তবে শবদাহপ্রথা গ্রহণিত কর। মৃতের অগ্নিহের অবদান এইবে তাহার সহিত সর্বপ্রকার সংগ্রহ গুণ্ত হইবে। ভবিষ্যতে তাহার দ্বারা আর কোন অনিষ্টের আশঙ্কা থাকিবে না। এমন স্বাস্থ্যকর ও নিরাপদ প্রথা আর নাই। স্মৃতিকাগছরে সঘরে রক্ষিত তোমার প্রিয়জনের মৃতদেহের কথা একবার চিন্তা করিয়া দেখ দেখি ! দুই দিনে উহা গালত ও ক্রূমি কাঁটের আবাসভূমিতে পরিণত হয়। সে স্মৃতিজনক মৃত্যুর বিষয় চিন্তা করিয়া কোন নরনারী না শিওরিয়া উঠে ? এতদনেকা ইহার পরিণাম যে আরও ভীষণ হইতে পারে তাহা কে চিন্তা করে ? শবদাহের রক্ষিত মৃতের পরিণাম চিরদিনই অনিশ্চিত। কে বলিতে পারে, সমাধিমন্দিরের সমগ্রগ্রন্থিত ইষ্টকমণ্ডলি চিরদিনই মৃতকে আবর রাখিতে পারিযাচিন ? কে বলিতে পারে, শবদাহেরে কঠিন বেটন-গুলি একদিন ধ্বংস হইয়া যায় নাই ? কে বলিতে পারে, মৃত পুনর্জীবন লাভ করিয়া একদিন তোমাদের ভালবাসা পদীক্ষা করিবার ক্ষমতা সকল বাধা বিয় অতিক্রম করিয়া গোপনে তোমাদের পশ্চাতে গুণ্ডা যান হইয়া নাই ? অবিখ্যাসী নরনারী, স্মৃতিচরিত্র অর্ধলোপুল হারণের যুবকযুবতী একবার সে কথা চিন্তা করিয়া দেখিয়াছ কি ? একবার ভাবিয়া দেখিয়াছ কি, তোমাদের নিষ্ঠুর অকৃতজ্ঞ ব্যবহার তাহার প্রাণে কিরূপে তীব্র ছুরিকা বিদ্ধ করিতে পারে ? আজ সেই কথাই তোমাধিগকে বলিব।

হায় জীবনের একটি বৎসরে যে সকল ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, আজ তাহাদের জয়গনিদারক স্মৃতি আমার হৃদয়কে মগ্নিত করিতেছে, চিরদিনই করিবে ; নতুবা আমার কিসের অভাব ছিল ? আমি নেপল্‌নের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলুম। পিতা কাউন্ট ফিলিপো গোমাসি আমার সমুদয় বর্ষ বয়স্ক কালে আমাকে তাহার অতুল সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী প্রাধিকার পরলোক গমন করেন। সংসারানভিজ চকল বালকের হস্তে এত বড় সম্পত্তির ভার অর্পিত হওয়ায় হিঠেবা আত্মীয়জন বতই কেন ভীত উঠেন না আমি কখনও দুর্নীতির পথ অবলম্বন করি নাই ; কখনও বিলাসিতার স্রোতে আপনাকে ডালাইয়া দিই নাই। যত্নপান, অসংসংসর্গ, স্নাত-

জীড়া চিরদিনই আমার ঘৃণার বিষয় ছিল । অতি অল্পদিনেই তাঁহার কৃষিকা-
ছিলেন, তাঁহাদের আদরের ফারিও গ্রোম্মনি তাহার পিতার উপযুক্ত পুত্র ;
বিপুল ঐশ্বর্য্য অপাত্রে অর্পিত হয় নাই ।

নেপল উপসাগরের তীরবর্তী একবাঁশী স্রমের মর্দর-গৃহে আমি বাস
করিতাম । গৃহসংলগ্ন উদ্যান নানাবিধ ফুল ও ফলবান বৃক্ষে সুশোভিত
ছিল । ঐ সকল বৃক্ষের বনপল্লবের অন্তরাল হইতে সুধাকণ্ঠ বিহঙ্গগণ বধন
তাঁহাদের সঙ্গীতলহরী বর্ষিত করিত তখন আমার চিত্ত কি আনন্দরসেই না
আম্লত হইত ! বিশেষতঃ উদ্যানের স্থানে স্থানে অসংখ্য কৃত্রিম জলপ্রপাত
নির্ম্মিত হওয়ার গ্রীষ্মের প্রবল প্রতাপ কখনও ঐ স্থানে অনুভূত হইত না ।
এক দিন চুই দিন করিয়া আমি জীবনের বহু বর্ষ এই স্থানে অতিবাহিত
করিয়াছি । সঙ্গীত, অধ্যয়ন ও শিল্পে অমূল্যলন তখন আমার জীবনের প্রধান
অবলম্বন ছিল ।

রমণীর কুহকজাল বহুদিন এ হৃদয় অবিকৃত করিতে সমর্থ হয় নাই । নারী-
জাতিকে, আমি না কেন আমি অবজ্ঞা ও অবিখালের দৃষ্টিতে দেখিতাম ।
কত দিন কত বালিকার পিতা আমাকে জায়াত্বরূপে গ্রহণ করিবার জন্য কত
কৌশলজালবিত্তার করিয়াছেন । তাঁহাদের সকল চেষ্টা বার্ষকইয়া যাইত ।
কত গৃহে আমি এই জল নিমজ্জিত হইয়াছি । তাঁহাদের এই অমুগ্ৰেব অব-
জ্ঞার সঙ্গিত প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে । আমার সমবয়স্ক বন্ধুগণ এ জন্ত আমাকে
কত উপহাস করিতেন আমাৎ সর্ব্বপ্রেক্ষ প্রিয়তম বন্ধু গিডো ফেরারিও এই
জন্ত আমার প্রতি তীব্র বিজ্ঞপবাণ নিক্ষেপ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না ।
তাঁহার মতে যিনি বিদ্যোত্তের অধঃশূন্য এক দিনও পান করেন নাই, যিনি
কম্পিত বক্ নিজবক্ষে সংলগ্ন করিয়া সেই ক্ষময়ের দ্রুত স্পন্দন অনুভব
করিতে চেষ্টা করেন নাই, যিনি হরিণনয়নাঙ্গিণের নয়নে নিজ প্রতিবিম্ব দর্শন
করেন নাই তাঁহার জন্ম বৃথা । তিনি আরও বলিতেন, রমণীর প্রেমলাভে
বঞ্চিত হইয়াই হতাশ-ক্লমর দার্শনিক ও নীতিকারগণ রমণী-বিষেখের নীতি
প্রচার করিয়া গিয়াছেন । উহা তাঁহাদের ভগ্নজগতের দারুণ প্রতিহিংসা যাত্র ।
উহা নঃস্বজনীন শূণ্যালের লাম্বল পরিচ্যায়ের উপদেশ যাত্র ।

আমার বন্ধুর সকল উপদেশ আমি গীরবে মঙ্গ করিতাম । তাঁহার সকল
ভর্তুক্য আমি সম্মিতবদনে শ্রবণ করিতাম । আমি কখনও তাঁহার কোনও
কথাঃ প্রতিবাদ করি নাই । বহুতঃই তাঁহাকে আমি বহু ভালবাসিতাম ।

একরূপ অকৃত্রিম প্রণয় বোধ হয় সচরাচর দৃষ্ট হয় না। তাঁহার সহবাস আমার স্বর্ণ ছিল। তাঁহার ব্যবহারেও আমি বন্ধুপ্রীতির নিদর্শন পাইতাম। বন্ধু পরিভ্রমের সম্ভান। আমার পিতার মৃত্যু তাঁহার পক্ষে বোধ হয় মঙ্গলকরই হইয়াছিল। আমি নান্য প্রকারে তাঁহাকে সাহায্য করিতে পারিতাম। বিশেষতঃ তাঁহার আত্মসম্মানে আপাত না লাগে এইরূপে তাঁহাকে আমি নিয়ন্তাই অর্থসাহায্য করিতাম। আমি এক দিনের জরও তাঁহাকে সঙ্গ ছাড়া করি নাই। এক কথার বলিতে গেলে, গিডো আমার অকৃত্রিম অগ্রদূত ও প্রগাঢ় বিশ্বাসের পাত্র ছিলেন। প্রতিদানে আমিও ইহার অধিক কিছু আশা করি নাই।

অসন্তে কিছুই চিরস্থায়ী নহে ; পরিবর্তন ইহার স্বাভাবিক স্বৰ্ণ। সুখ দুঃখ চক্রাকারে মানবের ভাগ্যগগনে ঘুরিয়া বেড়ায়। আমার অবস্থাই বা চিরদিন একরূপ থাকিবে কেন ? আমার ভবিষ্যতাকাশেও পরিবর্তনের ক্ষুদ্র রেখা অঙ্কিত হইল। প্রিয়বন্ধু গিডো কিছুদিন ব্যবৎ অন্তর (রোমে) ; আমি একক আমার গৃহে বাস করিতেছিলাম ; বন্ধুবিরহে মন অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল ; কিছুতেই শান্তি পাইতেছিলাম না। তখন যে খাসের শেখভাগ ; আমি এক দিন সন্ধ্যার প্রাকালে নেপলস উপসাগরের অগ্রকূল বাহুবক্ষে আমার ক্ষুদ্র নৌকাখানি ভাসাইয়া দিলাম। স্বর্গীকৃত বাহু যেন আমার চিন্তাক্লিষ্ট হৃদয়কে সাহসনা প্রদান করিতে সমর্থ হইতেছিল না। আমি অনতিদূরবর্তী এক বন্দরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সমস্ত দিন পরিশ্রমেত পর প্রাপ্ত নেপলসবাসীরা স্ব স্ব গৃহান্তিমুখে ছুটিয়াছে ; সকলেরই চিত্ত যেন কি এক আনন্দে ও আশায় পূর্ণ। আমিই শুধু বিষন্নচিত্তে স্বগৃহান্তিমুখে পলাতক অগ্রসর হইলাম। সন্ধ্যার মান ছায়া তখনও জগৎ ঢাকিয়া ফেলে নাই ; আমি নেপলসের প্রধান রাস্তা পথ ঘুরিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছি ; ঘুর হইতে যথু সঙ্গীত শ্রবণে প্রবেশ করিল। বিষয় ও কোভুলের বন্দবস্ত হইয়া আমি সে স্থানে কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিলাম। সঙ্গীতধ্বনি ক্রমেই নিকটবর্তী হইতে লাগিল। ক্রমে এক শোভাযাত্রা আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। কি সুন্দর দৃশ্য ! আজ নেপলসের আরাধ্যাদেবী বিজয়মাতা যেরূপ যত্নোৎসব। পুরোহিত ও বর্ষযাজকগণ সর্কাস্ত্রে, বালকবালিকার বল উৎপলভে এবং সর্কাস্ত্রে মানবের নয়ন ও মনবিমুগ্ধকারী রমণীমণ্ডলী যেন রূপের বিভায়ে স্তম্ভিত আলোকিত করিয়া আনিতেছেন। যতক ঘুরিয়া

গেল ; এত দিনের সকল সাধনা ও সকল ভাসিয়া গেল ; একখানি মুখ ও তাহার সিদ্ধদৃষ্টি গেম সত্ত্বের অগ্ররতন এদেশে রাখিয়া গেল । আমার জীবনযাত্রার এক নূতন অস্তর অভিনয় আরম্ভ হইল । আমি বিবাহ করিব—হিঁর করিলাম ।

সত্যি আমি এখন বিবাহিত । সেই অঙ্গরাবিনিমিত্ত ও রূপসী গোড়শীর সহিতই আমার পরিণয় কায়া সম্পন্ন হইয়াছে । নেপল্সবাদাদিগের জ্বরে একবার কাহারও প্রতি অজ্ঞানের সন্ধার হইলে বিবাহ ঘটিতে বড় বিলম্ব হয় না । আমার পক্ষেই বা সে নিয়মের ব্যত্যয় ঘটিবে কেন ? নানা (আমার জী) মরিষের সন্তান । ক্লোরেন্স নগরে তাহার পিতার বাস । নানা অসুস্থপায়ে তিনি জীবিকা অর্জন করিতেন ; কিন্তু জানি না কেন তিনি তাহার দুহিতাকে সন্ন্যাসিনীদিগের মঠে রাখিয়াছিলেন । আমি বিবাহের প্রস্তাব করিবা মাত্রই তিনি আমার অগাধ সম্পত্তির বিষয় অগ্রণ করিয়া তাহাতে সম্মতি প্রদান করিলেন । আমারই উভয়ের হস্ত একত্রিত হইল । পিতো আমাদিগকে নানাবিধ উপঢৌকন প্রদান করিলেন । তাহার আনন্দের আর সীমা নাই ; তিনি মনে করিলেন, এতদিনে তাহার উপদেশ আমার জীবনে কার্যকর হইয়াছে । বিশেষতঃ তিনি নবম্পুর সৌন্দর্য্যে এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তাহাকে ভিনাসের (দ্বাদশবর্ষী) সমতরকিত রমণীকে বলিয়া বর্ণনা করিলেন ।

নানার সৌন্দর্য্য সত্যি মনোমুগ্ধকর ছিল । কি সুন্দর তাহার দৃষ্টি ; কি অঙ্গরাবিনিমিত্ত তাহার কণ্ঠস্বর ; কি অলোকসামান্য তাহার রূপরাশি । আমি প্রতিদিন তাগাব রূপভাষা পান করিয়া তন্মগ্ন হইতাম । সে যেন নিতা নূতন সৌন্দর্য্যের আবরণে মাণ্ডিত হইয়া আমার নিকট উপস্থিত হইত ; নিতা নূতন আকর্ষণে আমাকে আকৃষ্ট করিত ! আমি আমার জীবনের সমস্ত ভালবাসা তাহাকে নিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলাম । সেও কি তাহার বিনিময়ে আমাকে ভালবাসে নাট ? তাহার প্রতিদিনের ব্যবহার তাহার অগাধ প্রেমেরই পরিচয় দিত ; আমি তাহাকে স্বর্গের দেবী বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলাম । তখন কে জানিত, সে কুসুমের কীট প্রবেশ করিয়াছে ? কে জানিত, সেই আনন্দ-দায়িনী এক দিন আমার সকল আনন্দ হরণ করিবে ? আমি যখন সে সকল কথা মনে করি, তখন আমি আর হিঁর থাকিতে পারি না ।

আমার গৃহ এক দিন সকল স্নেহের আকর ছিল। উচ্চশিক্ষিত বহুবর্ণবৈবরণ প্রতিদিন আমিরা তবায় সম্মিলিত হইতেন; আমি নির্মল আনন্দে তাঁহাদের সহিত কাশ্যবাপন করিতাম। আমার প্রিয়তমা পত্নী সকলের স্নেহ ও শ্রদ্ধার আকর্ষণে সকলপ্রমত্ত হইয়াছিলেন; সকলেই মনে করিতেন, এমন রমণীপত্নী-লাভ সচরাচর সকলের ভাগ্যে ঘটেনা। গিডোও সঙ্গত যুগে তাহার প্রশংসা করিতেন; আমি ও নীনা তাঁহাকে ভ্রাতার জায় ভালবাসিতাম। দন, জন, মান, সন্তান, স্নেহ, ভালবাসা, উপযুক্ত বস্ত্র, সুন্দরী স্ত্রী—যাহূষ যে সকলের আকাঙ্ক্ষা করে, আমার তাহার কিছুই অভাব ছিল না। আমার বাহা অভাব ছিল ১৮৮২ সনের ১লা মের সূর্যভাতে আমার পত্নী তাহা পূর্ণ করিলেন—সেই দিন আমি এক সুকুমারী কন্যা লাভ করিলাম।

সে দিন গৃহের সুবিস্তৃত বাগান্দার উপবেশন করিয়া আমি ও গিডো প্রান্তরায় এহণ করিতেছিলাম। বালিকার শাওরী শূন্যর বস্ত্রে আচ্ছাদিত করিয়া নদোন্মত্ত শিশুকে আমার ক্রোড়ে আনিয়া দিল। আমি ও গিডো উভয়েই তাহার স্নেহময় কপোলে আনন্দের প্রথম চুম্বন অঙ্কিত করিয়া দিলাম। বালিকা বিষয়ের সহিত আমাদের যুগের দিকে তাকাইয়া রহিল। তাহার স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তখনও যেন স্বর্ণের আলোক বিরাজিত ছিল। বাহিষ্যে পাপিয়া তখন তাহার শুনলিত কণ্ঠ পক্ষমে তুলিয়া দি শূন্য। স্বরই না বদিত করিতেছিল! নিশায় প্রস্তুতিত বৃষিকা পুষ্পভাল লংঘ্যাত হইয়া বাতাসে আমাদের পদপ্রান্তে আসিয়া উড়িয়া পড়িতেছিল। আমি বালিকাকে তাহার শাওরী ক্রোড়ে প্রত্যর্পণ করিয়া বলিলাম, “বালিকার জননীরকে বল, তাহার এ দান আমরা সাদরে গ্রহণ করিলাম।”

শাওরী চলিয়া গেল। গিডো আমার স্বন্ধে তাঁহার হাতবানি ধক্স করিলেন। তাঁহার মূষ যেন কিরূপ পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিয়াছিল। তিনি বলিলেন, “প্রিয় বন্ধো! তোমার মত উদারচেতা মানুষ ব্যক্তি বড় বিরল।” আমি বলিলাম, “সে কি? জগতের কোনও নরনারী অপেক্ষা আমি যে কোনও অংশে শ্রেষ্ঠ তাহা ত মনে হয় না।”

গিডো বারান্দার শুভসংলয় একটি লতার পুষ্পওছ লইয়া বেলা করিতে করিতে বলিলেন, “তাঁহাদের অধিকাংশের চিত্ত অবিবাহ ও সন্দেহে পূর্ণ।”

আমি গিডোর অস্বাভাবিক গাভীয়া ও কথা বলিবার ধরণ দেখিয়া কিছু

বিস্মিত হইয়াছিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “আমার কি কাহাকেও সন্দেহ করিবার কোনও কারণ আছে ?”

গিডো পুনরায় টেবলের সন্নিকটে উপবেশন করিয়া বলিলেন, “আমি সে কথা বলিতেছি না। কিন্তু নেপল্‌সের প্রকৃতি যেন বিভিন্নরূপ। এখানে বিশ্বাস বলিয়া যেন একটা কথা নাই। ঈর্ষ্যা ও সন্দেহ যেন সর্বদা সকলের পশ্চাতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। দাম্পত্য প্রেম কথাটা যেন এ স্থানে শব্দই পর্যবেশিত। একপ অবস্থায় তোমার বিস্তৃত পারিবারিক সুখ—পত্নীর প্রতি অগাধ বিশ্বাস কি খুব বিশ্বয়জনক নহে ?”

আমি হাসিয়া বলিলাম, “নীনা কে সন্দেহ করিবার ত আমি কিছু দেখি না। তাহার সন্তোষাত শিশুর মত সেও ত নিশ্চাপ ও শুভ্র। আমি অবিশ্বাস করিব কাহাকে ?”

ফেরারী উৎফুল্ল স্বরে বলিয়া উঠিলেন “নীনা সত্যই অত্যন্ত গির্জাপুঞ্জিত ববল ভূবারের মত শুভ্র, নিকলক হীরকবস্তুর ভায় উজ্জ্বলচরিত্রবিশিষ্টা ও সুদূর নক্ষত্রের ভায় নিশ্চাপ।”

তাঁহার কথায় তখন আমার সন্দেহ করিবার কিছুই ছিল না। কিন্তু আজ আমি সে সকল কথার ঐতোক অন্ধরের অর্থ যেন স্পষ্টরূপে হৃদয়লব্ধ করিতেছি।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমদেবমুণ্ড গুপ্ত ।

পদচিহ্ন ।

কতবার এসে' সে যে গিয়াছে চলিয়া
আছিল ঘুমায়ে আমি দুয়ার ক্রিয়া ।
কতবার ডেকে গেছে বাপগীর তানে
আমি ছিল আন মনে পশে নাই কাণে ।
সহসা প্রভাতে আমি খুলিয়া দুয়ার
হেরিতেছি চারিদিকে পদচিহ্ন তাঁর ।
উঠিতেছে ঐশ্বর্য মোর ঐশ্বর্য
অভিমানে বুকি গো সে গিয়াছে ফিরিয়া ।

শ্রীমদেবমুণ্ড গুপ্ত ।

আর্য্যাবর্ত



আলো ও চাঁদা বচসিহী

সমালোচনা ।

—:—

মাল্য ও নির্মাল্য । ৬

আমি 'আলো ও ছায়া'র কবির নূতন পুস্তক পাইয়া পুরাতন কথা মনে পড়িল। পঁচিশ বৎসর পূর্বে দেওঘরে রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের গৃহে একখানি নবপ্রকাশিত কবিতাপুস্তক দেখিয়াছিলাম। তেমন ছাপা, তেমন কাগজ, তেমন বাধাই বাঙ্গালা কবিতাপুস্তকে পূর্বে বোধ হয় আর দেখি নাই। রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী', অক্ষয়কুমারের 'প্রদীপ', হেমেন্দ্রপ্রসাদের 'উজ্জ্বল' তাহার অনেক পরে প্রকাশিত হয়। পুস্তকখানির ছাপা পরিষ্কার, কাগজ পুরু, যলাটে পর্কতের উপর মেঘের মধ্যে চন্দ্রোদয়ের ছবি—আলো ও ছায়ার খেলা। পুস্তকের নাম—'আলো ও ছায়া'। 'বৃন্দসংহারের' কবি হেমচন্দ্র তখন কবিতা-রচনা প্রায় ত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু দিনান্ততপন-কিরণে গগনের মত তাঁহার প্রতিভালোকে বঙ্গসাহিত্যের তখনও উজ্জ্বল। গ্রন্থের প্রথমেই তাঁহার লিখিত ভূমিকা। ভূমিকায় উদার প্রশংসার পূর্ণ-বিকাশ—“এই কবিতাগুলি আমাকে বড়ই সুন্দর লাগিয়াছে; হানে হানে এমন মধুর ও গভীর ভাবে পরিপূর্ণ বে পড়িতে পড়িতে হৃদয় মুগ্ধ হইয়া যায়। কলতঃ বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ কবিতা আমি অল্পই পাঠ করিয়াছি।” কবিতা-গুলি আদ্যকালের 'ছাঁচে' ঢালা। বাহার্য্য এ ছাঁচের পক্ষপাতী নহেন তাঁহারের নিকট এ পুস্তক কতদূর প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে তাহা বলিতে পারি না; তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, নিরপেক্ষ হইয়া পাঠ করিলে তাঁহার্য্যও সেথকের অসাধারণ প্রতিভা প্রকৃত কবিত্বশক্তি উপলব্ধি করিতে পারিবেন। আমার দৃঢ়বিশ্বাস এই যে, সজ্জন ব্যক্তি যাত্রেই এ পুস্তকের অধিকাংশ স্থলে মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারিবেন না। বস্তুতঃ কবিতাগুলির ভাবের গভীরতা, ভাবায় সরলতা, রুচির নির্মলতা, এবং সর্বত্র হৃদয়-গ্রাহিতাংশে আমি নিরতিশয় মোহিত হইয়াছি। পড়িতে পড়িতে গ্রন্থকারকে মনে মনে কতই সাধুবাণ প্রণাম করিয়াছি। আর বলিতেই বা কি স্থলবিশেষে হিংসারও উল্লেখ হইয়াছে।”

• মাল্য ও নির্মাল্য—'আলো ও ছায়া' এগেত্ৰ এগেত। কলিকাতা ১৮ নং বেলতলা রোড হইতে ঐশ্বরীদেবীনাথ পেন দ্বারা প্রকাশিত।

পুস্তকে কবির নাম ছিল না। কিন্তু যে লেখকের রচনায় প্রতিভার পরিচয় থাকে, তাঁহার পক্ষে বহুদিন নাম গোপন রাখা সম্ভব নহে। জর্জ এলিয়ট হইতে পিয়ার লোটা পর্য্যন্ত কেহই তাহা করিতে পারেন নাই। আবার জর্জ এলিয়টের পুস্তক পাঠ করিয়া ডিকেন্স যেমন কুস্তিতে পারিয়াছিলেন, সে রচনা রমণীর এই পুস্তক পাঠ করিয়াও ভেমনই বোকাগা বুলিয়াছিলেন, এ সব কাবিতা রমণীর রচিত। ‘নিরাশ’ কবিতায় সেই পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছিল। সে কবিতার করুণ বেদনা পুরুষের অজিজ্ঞাতার অতীত।

পঁচিশ বৎসর পূর্বে হেমচন্দ্র যে কথা বলিয়াছিলেন, পঁচিশ বৎসর পরে আজ আমাদের সেই কবাই মনে হইতেছে—বাঙ্গালী ভাষায় একতরফ কবিতা আমরা অল্পই পাঠ করিয়াছি; কবিতাগুলি যে নূতন ছাঁচে ঢালা কবি গ্রন্থা জানিতেন,—

“আমারে দিও না ধোব, নূতন সঙ্গীত

উন্মাদক নাহি যদি হয় ;—

শান্তি সে গোবুল আলো, সুহৃদ সাধ্যানিলে,

নহে ঝড় বজ্র-বিদ্রোহ।”

‘আলার স্বপন’ ও ‘রমণীর স্বপ্ন’ এই দুইটি কবিতা সমসাময়িক ঘটনা উপলক্ষে রচিত; আর সবগুলিই মানব জগতের চিরন্তন তাবের উপর প্রতিষ্ঠিত। শেখোক্ত কবিতাটির উদ্দেশ্য হেমচন্দ্রের কবিতা স্বরণ করাইয়া দেয়। “পিলাচ-পীড়িতা নাগীর স্বপ্নে” কবির “রমণী শকতি অনুরঙ্গলনী” এই বিদ্যাল কাপিয়া উঠিয়াছে, তাই তিনি বলিয়াছেন—

“সাতা সার্বভৌম জনমে পাবিত

ভাগতে রমণী হারায় মান,

তনিয়া নিশ্চিন্ত রয়েছিস্ সবে,

তোমের সতীষ শুধু কি ভাপ ?”

‘আলো ও ছায়া’র শিল্পী একতরফ—আলান একপ্রকার—

“কাব্যক্ষেত্রে ওই প্রথম পড়িয়া,

সব্বত্র-স্বল্প সংসার এই,

যাও রীরমণে কর গিয়ে রথ

যে জিনিবে জ্বল লভিবে সেই।

পরের কাগজে খাবে দিয়া বলি
এ জীবন যেন সকলি দাও,
তার বত সুখ কোথাও কি আছে ?
আপনার কথা তুলিয়া বাও।”

পাপকে ঘৃণা কর, কিন্তু পাপীকে ঘৃণা করিও না—‘আলো ও ছায়া’র এই
লিখা আছে—

“পতিত মানবন্তরে নাহি কি গো এ সংসারে
একটি বাধিত প্রাণ, হৃদি অক্ষথার ?
পথে পড়ে অসহায়, পদে তারে দলে বার,
ছুঁখানি হেহের কর নাহি বাড়্যাবার ?
সত্য দোষে আপনার চরণ স্থলিত তার
তাই তোমাদের পদ উঠিবে ও শিরে ?
তাই তার আর্দ্রবে সকলে বধির হবে,
যে যাহার চলে বাবে—চাষিবে না কিরে ?
তোমাদের বাতি দিয়া,” প্রদীপ জালিয়া নিয়া,
তোমাদের হাত ধরি হোক অগ্রসর,
পঙ্কজকে অঙ্ককারে ফেলে যদি যাও তা’রে,
জীবার রজনী তার রবে নিরন্তর।”

পুনশ্চ—

“পথ ভুলে গিয়াছিল, আবার এসেছে কিরে,
দাঁড়ায়ে রয়েছে তুই, লাগে ভয়ে নতশিরে ;
সম্মুখে চলে না পদ, তুলিতে পারে না আঁখ,
কাছে গিবে, হাত ধরে, ওরে তোরা আন ডাকি।”

ব্যবিতের অস্ত এইরূপ বেদনার—করুণার উচ্ছ্বাস বার্ষসের কবিতা ব্যতীত
আর কাহারও কাঁবতায় বড় দেখিতে পাই না।

শিকাদীকার প্রভেদে দাম্পত্য জীবনের ব্যবহার কথা ‘আলো ও ছায়া’র
বক্তৃৎ হইয়াছে—

“অলকারে সহশ্রিণীবে—কি বিজ্ঞান জানে অভিযান !
অলকারে গৃহিণীবে খোর ঢাকিয়াছি, নাহি আর স্থান।

কতবার সাধে যায়—বসি তব পদতলে,
শিখি সেই দিব্যমন্ত্র, বাহার মোহন বলে
বনী হ'তে বনী তুমি, বাহার অভাবে যম
প্রভাহীন রূপরাশি, অঁাধি দুটি অন্ধ সম।
বৃথা আশা। আর দাসী, চরণকণ্টক হয়ে,
চোখে না ভ্রমিতে সাধে ; থাক্ সে অঁাধার লয়ে।
সঁাতারিতে নারি সাধে, কেন আপনার ভারে
ডুবাইব প্রাণাধিক, তোমারেও এ পাবারে।”

এইরূপ আশ্বদানেই রমনীর শ্রেষ্ঠত্ব। ‘মালা ও নির্ঝালো’ রমনীর এই
ভাব ‘নিরুপায়’ কবিতায় আরও কোমল, আরও কমলীয়, আরও মধুর,
আরও মোহনরূপে আশ্বপ্রকাশ করিরাছে—

“প্রিয়তম, কহ তুমি বাহা ইচ্ছা তব,
যত কক্ষ ভীক্ বাণী আছে গো ভাষায়
সব আনি হান প্রাণে, আমি সয়ে রব
সিক্ত চোখে, বৌন যুখে, আমি নিরুপায়।
তুমি পতি, তুমি প্রভু ; যব, যান যব
সকলি তোমার হাতে ; হল যদি হায়,
এই রমনীর যন, তাহা, প্রিয়তম,
তোমারি চরণপ্রান্তে লুটাবে ধরায়।
করি যদি অপরাধ, তার ঘণোচিত
বিধান তোমারি কাছে ; তোমার উপরে।
কেহ নাই, যার ঘরে হব উপনীত
তব অবিচার হ'তে বিচারের তরে।

ভবে যদি নিত্য দৃষ্টি, নিত্য সহবাস
চক্ষে এনে দেয় তৃপ্তি, হৃদয়ে বিরাগ,
আমি তার কি করিব ? আমি বার মাস
তোমার পিঙ্গরে পাখী, ওহে মহাভাগ।

কর তুমি, প্রিয়তম, যা হয় বিচরিত
তোমার বিচারে ; মোর কেহ নাহি আর
এ ধরায় যার দ্বারে হব উপনীত
তব অবিচার হতে লজিতে বিচার ।”

‘এর্থ শেষের প্রার্থনাও এই আত্মত্যাগের পরিচায়ক—

“তোমার সে প্রেম হতে যেটুকু পেয়েছে কয়
আজ আমি সেইটুকু চাই,
কেনেছি তা’ এ জনমে আর ক্রিবার নয়,
আপ ভরি অক্ষ আসে তাই ।”

হার “অমর আত্মার প্রাণ” প্রেমও “বসন্তের ফুলটির মত” শুকাইয়া
যায় ?

“এর্থ শেষে বড় দুঃখে লতিয়াছি এই জ্ঞান,
যুঁচিয়াছে অংখা পরব,
তাই, অবনত মুখে মুখে ফেলে অভিমান,
বসে আছি পদতলে তব ।
আজ যতটুকু পার ততটুকু দিও দেহ,
ততটুকু আমার সোহাগ,
কোন দিন মিথ্যাহিলে সব ধন মন দেব,
সমস্ত প্রাণের অহুরাগ ।”

এই ভাবের নানাতরপ অভিব্যক্তি ‘মাল্য ও নির্মাল্যে’ আছে—

“প্রাণে বহব ছিল ভালবাসা, চোখে সব লেগেছিল ভালো,
ভালবাসা জীবনের মধু, ভালবাসা নয়নের আলো ।
ভিতরে বাহিরে, প্রিয়, মোর কোন কিছু হয় নি বহল
তুমি প্রেম হারায়ে বলে, মোর চোখে বহাইলে কল ।

বুঝিবে না, আমি কহা আছি, তাই আমি ছিলাম চিরদিন,
বিচিত্র তোমারি প্রেমালোকে লভেছিলাম যাবুতী নবীন ?
আমিও যে এপরেছি দাঁড়াতে সে আলোকে কোনো শুভকণে,
সেইটুকু মারী জীবনের সফলতা জাগিতেছি মনে ।”

এইরূপ নির্মল, শুভ্র, সংযত-স্তাবই এসব কবিতার বিশেষত্ব। কবি যে কামনা করিয়াছিলেন—

“মায়ের বুকের তত কীরধারা
যেই কণ্ঠে পরিয়াছি পান,
সেই কণ্ঠে যেন গেয়ে যেতে পারি
অনিন্দ্য মধুর পান”—

তাঁহার সে কামনা পূর্ণ হইয়াছে। ‘আলো ও ছায়া’রই মত ‘মায়া ও নির্মালা’ অনিন্দ্য মধুর পানে পূর্ণ।

কবির ভাবপ্রাণের ক্ষমতাও অসামান্য। জননীর শব্দ—

“পঙ্ক হ’তে যবা উঠে পঙ্কজিনী, জুইটাপা ছাড়া জুই,
আমার জবরে মূলচুই গ্রাথ তেমনি উঠিলি জুই,—
তোর সাধে মোর জীবনের যোগ, তবু এক নাই,—হুই।

* * *

তোমারি গৌরব, আমার ভেদিয়া উঠেছে আগোর বেশ,
মাটিতে জনমি বিবল শরীরে গ্রাথ নি মাটির লেশ,—
তোমার গৌরব আমার গৌরব ভাবি আমি নিষ্কপেশ—”

পুরুষের প্রেম—

“পুরুষের প্রেম দেয় নিজ পরিচয়
জীবনের প্রতি কাজে, রূপে যথা বীর,
সেতো নহে বচতাব্য ভীত, ক্ষুদ্রাশয়,
আপনার সুখ লাগি সে নহে অস্থির।”

“মরিচক” “ধনীক কুমারী” হিসাবে যে ভুল দেখাইয়াছে, সে ভুল বুঝিলে অগতঃ অনেক মনঃবেদনার কারণ পূর হই—

“হৃদয়ের মধু মধু বটে, নহে জীবনের অন্ন পান,
নিত্যন্ত বিবাহ অমিশ্র লবণ, করে অন্তে স্বাদধান ;
তুমি বুঝাইলে, প্রথম তেমন, দিতে শোভা, দিতে পান
তত প্রেম লাগি কত ভাল নয় এত বাধ বিসম্বাদ ।
যত তুচ্ছ কথা আছে মানবের এক প্রেমে নাই বাধ,
কোথা রবে স্তব্ধ স্বপ্নেরা যদি সুখ ভূগে নাই চাহ ?

নব পরিবার গঠনে উপায়, প্রেম ভো উদ্দেশ্য নয়,
নূতন যৌবনে, কবিত্ব, স্বপনে, একে আর মনে হয় ।

বেশী স্কুল ফোটে বাগানে তোমার, তাহাতে কাহার কতি,
আতশয় ধন পারে না বহির্ভে, বিতরিতে ধনপতি ?
বেশী প্রেম হ'লে তাতে নাহি ভয়, না থাকিলে বুঝা সব,
স্বপ্নের লাগিরা অস্ত্র আয়োজন, ধন যান বৈভব ।

তোমাতে পাইতে, তোমাতে রাখিতে, বাড়াতে তোমার স্বপ্ন,
এমন দুঃসাহ্য কি ছিল, বা হ'তে ফিরাতাম এই মুখ ?
তুমি লক্ষ্মীপা গৃহে দাঁড়াইলে, চরণ-পদ-ভরে
ধরনী ফাটিয়া কুটিয়া উঠিত ঐশ্বর্য্য দীনের ঘরে ;
কুলাল না হই, আমা হ'তে হ'ত প্রতিষ্ঠিত মহাকুল ।”

টেনিসনের Lady Clara Vere de Vere-এর ভীষণতা ইহাতে নাই ; কিন্তু
ইহার আক্ষেপ অনিন্দ্যসুন্দর ।

‘মাল্য ও নির্মাল্যের’ “স্বতিচিহ্ন” কবিতাটি এইরূপ—

“ওরা ভেবেছিল মনে, আপনার নাম
মনোহর স্বরূপ বিশাল অকরে
ইউক প্রস্তরের রচি, চিরদিন ভরে
রেখে যাবে ! হুট ওরা, ব্যর্থ মনকাম ।
প্রস্তর বসিছে তুমি প্রস্তরের পরে,
চারি দিকে গরুত্ব, তাহাদের তলে
লুপ্ত স্বতি ; শুধু তুণ কাল-মদী-জলে
তেসে যায় নামগুলি, কেবা রক্ষা করে ।
মানবলয়তুমি করি অধিকার,
করেছে প্রতিষ্ঠা বারা হুট সংহাসন,
দরিদ্র আছিল তারা, ছিল না সখল
প্রস্তরের এত বোকা জড়ো করিবার ;
তাদের রাজ্য হের অক্ষয় ক্রমেন,
কালপ্রোতে দৌত নাম নিত্য সঙ্কুল ।”

নবীনচন্দ্র একদিন এমনই ভাণে লিখিয়াছিলেন—

“ত্রিকালের সীমা ওই হের, নিরুপিয়া
গাড়াইয়া আছে তিন দগিত্র ত্রাশ্রয়।
নখর কোমাকীরাশি গিয়াছে নিবিয়া,
অধর তারকাবলী রয়েছে চাহিয়া।”

এই সংগ্রহের আর একটি কবিতা উদ্ধৃত করিয়া এই উপাধের পুস্তকের
সমালোচনা শেষ করিব। ‘যমুন-কল্পনা’ বাদ দিলে বাঙ্গালার কোন উৎকৃষ্ট
ঐতিকবিতাসংগ্রহ সম্পূর্ণ হইবে না।

ভার কূলে কূলে বৃক্ষি বহুল তমাল
 করে ফুল ছায়া দান,
 জলে জলে ছুটে ঐশ্বরের স্বিরিতি
 কল্লোলে বিগ্ৰহ-গান ;
সেখা সমীর-বিষ্টোলে বাজে বা ঝাশরী
 পরাণ উদাসী করা,
সেখা দিবসের আলো পোহুলি কোমল,
 আবার কৌমুদীভরা ;
বুঝি আয়াসবিহীন মধুর জীবন,
 স্নেহের স্বপন যত,
 সে ভূমি পরশে সুরস্বপন
 জীবনেতে পরিণত ;
 ক্ষদ্র-কাননে চির মধুয়াস,
 ভাবকূলে কুগময়,
 চামেলীর বাসে কোকিল-কাকলি
 সুরভিত হয়ে রয়।
ফাল সেই সে যমুন। হেরিবে ছ’ আঁধি,
 তাই তারা নিশি জাগে,
আমি কেহ না উঠিতে তাজিব শরন,
 জাপিবে না উবা আগে ;
ধীরে উবাকর বরি সেই পুণ্যজলে
 নানিয়া করিব জান,

আমি সেই বারিপানে বিধের পীড়িত-
আশ্রয় করিব পান ।
কাল প্রভাত-মারুতে, অরুণ-কিরণে,
কালিন্দীর স্রোত কূলে,
বুঝি বরষার বাধন আঁধি ঘেঁতে যোগ
সহসা ঘাইবে খুলে ।

আগ্না দুর্গ ।

কে বলে তোমারে দুর্গ এবে পরাধীন ;—
সম্রাটের বর্ষ-শৌধ, বিক্রমবিহীন ?
বন, কীড়ি, বহিষ্য ভূতলে অভুল—
কে না ঘোষে এই সত্য,—কেবা করে ভুল !
লোহিত প্রস্তরে তব অক্ষ আবরিয়া—
শ্বেত মণ্ডরের কলা বক্ষ মাঝে ধরি,—
রহ চির আদুয়ান দুর্গ পুরাতন ।
ভাতুল প্রতিভা, পক্ষ, দিবা বিভাবরি ।
অতীতের শিল্পকলা—অকর—অমর,—
সম্রাটের—বেগমের হাস-ক্রীড়া গহ,—
দুর্গ দুর্গ আখ্যা লভি বিরাজ পুলিনে—
কালিন্দীর নীল জলে ধৌত করি দেহ ।
যে দুর্গ—যে অতীতের বিলাস-আগার—
হতবুদ্ধি হর মর বৈতবে তোমার ।

ঐক্যপংপ্রসন্ন হাস ।

সংগ্রহ।

—:—

বিবিধ।

—:—

* ভারত কথা।

'কমকারেণ' নামক হিলাতী জৈবাসিক পত্রে ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ভারতীয় আবহবায়বীর হিসাব হইতে নিম্নলিখিত তথ্যগুলি সম্ভবিত হইয়াছে।

১৯১১ খৃষ্টাব্দের আবহবায়বীর করিতে ভারত পর্ব্ববর্ত্তের ২০ লক্ষ ৩০ হাজার টাকায় খরচ হইয়াছে।

ভূতত্ত্ব বিদ্যার দৃষ্টিতে বেবিলে ভারতবর্ষ একটি অপূর্ণ অক্ষুণ্ণ বেশ বলিয়া মনে হয়। এই বেলটি অতি প্রাচীন। কিন্তু হিমপিপিটি অত্যন্ত নবীন।

ভারতে প্রতিবর্ষে যে বারিবর্ষণ হইয়া থাকে, তাহার দশ ভাগেরদশ ভাগ অংশ দক্ষিণ-পশ্চিম দিক হইতে বায়ুদ্বারািত বারিবহ কণ্টক বর্ষিত হইয়া থাকে। প্রতিবর্ষে যদি ৪-৫ইঞ্চি বারিগাত হয়, আর সে অংশ যদি সকল অংশেই সমান ভাবে বর্ষে, তাহা হইলে তাহাই পূর্ণাঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।

কৃষিয়ার ভিন্ন সমস্ত দুর্বোপের বিস্তারিত জনসংখ্যা যত, ভারতের বিস্তারিত জনসংখ্যা তত। পড়ে ভারতে প্রতি বর্ষবাইলে ১৭০ জন লোকের বাস। কৃষিয়ার দ্বিতীয় দুর্বোপের বসতি সংখ্যাও আর ঐরূপ। ইংরেজাবিকৃত অঞ্চলে পড়ে প্রতিবর্ষবাইল ভূমিতে ২২০ জন লোক, আর দেশীয় রাজ্যে প্রতি বর্ষবাইলে ১০০ জন কৃষিয়ার বাস করে। ফ্রান্স দেশে প্রতি বর্ষবাইল ভূমিতে বড় লোকের বাস, তাহা অপেক্ষা দুইগুন-বাড়িত ভারতে প্রতি বর্ষ-বাইলে ৩৪ জন কৃষিয়ার অধিক লোক বাস করে। দেশীয় রাজ্যে লোকের বসতি স্পেনে লোকবসতির সমান। বাল্গারিয়া প্রতি বর্ষবাইলে ৭০১ এবং বুল্গারিয়াদেশে ৪২১ জন লোক বাস করে।

তুর্কী অধিকাংশ ভারতবাসীর প্রধান বাদ।। বাংলার কদল সকল করিতে হইলে প্রচুর বারিগাতের প্রয়োজন।

দেশের খালে কিছুপ উপকার হইয়াছে, গরবের লাগালপুস জিলাই তাহার উত্তম উদাহরণ হল। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে এই অঞ্চল বৃষ্টিপ্রাপ্তর রাজ ছিল, তাহার প্রতি বর্ষবাইলে ৭ জনের অধিক লোক বাস করিত না। ইহার পরবৎসরই এই অঞ্চলে দেশের খাল বনিত হয়। সেই সময় হইতে নানা বিপদে হইতে চাষীরা আসিয়া ঐ জিলায় বাস করিতে থাকে। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে প্রতি বর্ষবাইল ১৮১ জন লোকের বাসভূমিতে পরিণত হয়। এখন তাহার প্রতি বর্ষবাইল ২১২ জন বাস কণ্টক আদিত। তাহার জনসংখ্যা দিন দিন অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতেছে।

ভারতের জনসংখ্যায় মধ্যে শতকরা সাড়ে নয় জন সহরে বাস করে । ইংলেতে ও ওয়েলসে শতকরা আটাত্তর জনেরও কিছু অধিক লোক সহরবাসী ।

যে সহরে সাক্ষাৎ লোকের বাস, যে সহরে শতকরা ২-২ জন লোক বাস করিয়া থাকে । ইংলেতে ঐরূপ সহরে শতকরা ৪০ জন বাস করে ।

হাংডুর সহিত কলিকাতা সহরে ১২ লক্ষ ২২ হাজার ৩১০, বোম্বাই সহরে ৯ লক্ষ ৭২ হাজার ৪৪৫, মাদ্রাজ সহরে ৫ লক্ষ ১৮ হাজার ৬৬০ এবং হাইদরাবাদ সহরে ৫ লক্ষ ৬২০ জন লোক বাস করে ।

শত ৩০ বৎসরে ভারতে প্রায় ৫ কোটি লোক বাড়িয়াছে । অর্থাৎ শতকরা ১২ জন হিসাবে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে । যুরোপে ডিউটিনিক জাতি যে হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে, এ হার তাহার অর্ধেকেরও কম ; তবে ইটালীয় জাতির বৃদ্ধির হার অপেক্ষা এই বৃদ্ধির হার কিছু অধিক । যুরোপের সকল দেশ অপেক্ষা ভারতের জনতার হার অত্যন্ত অধিক । কিন্তু ভারতে মৃত্যুর হার, বিশেষতঃ শিশুমৃত্যু অত্যন্ত অধিক বলিয়া জনসংখ্যা বৃদ্ধি হইতে পারে না । ভারতে এক বৎসর বয়স পূর্ণ হইবার মধ্যেই অর্ধেক শিশু মরিয়া যায় ।

১৮৮১ খ্রষ্টাব্দে ভারতে ৪৪ কোটি টাকার বৈদেশিক পণ্য আমদানি হইয়াছিল । ১৯১১ খ্রষ্টাব্দে ১০৪ কোটি টাকার পণ্য বিদেশ হইতে ভারতে আসিয়াছে । রক্তানিও ঐ সময়ে ৭৪ কোটি টাকা হইতে ২১০ কোটি টাকার উঠিয়াছে । ১৮৮১ খ্রষ্টাব্দে ভারতে ৪৮টি জুলাই কল ছিল ; ১৯১১ খ্রষ্টাব্দে জুলাই কলের সংখ্যা ২৫০টিতে দাঁড়াইয়াছে । ঐ সময়ে জুলাই কলের মজুরের সংখ্যাও ৪৮ হাজার হইতে ২ লক্ষ ৩১ হাজারে উঠিয়াছে । গাটের কলও ঐ সময় মধ্যে ২১টি হইতে ৫৮টিতে পরিণত হইয়াছে । গাটের কলের মজুরের সংখ্যাও ৫৫ হাজার হইতে ১ লক্ষ ১৬ হাজারে উঠিয়াছে ।

১৮৮১ খ্রষ্টাব্দে ভারতে সর্বসাকল্যে ১০ লক্ষ টন কয়লা উঠিয়াছিল । ১৯১১ খ্রষ্টাব্দে উহা ১ কোটি ২০ লক্ষ টনেরও উপরে উঠিয়াছে । আমদানী সুবর্ণের মূল্য ৩৭ লক্ষ ও রজতের মূল্য ৫০ লক্ষ হইতে ২ কোটি ৭২ লক্ষ ও ১ কোটি ১৮ লক্ষ টাকায় বাসিয়াছে । রেলপথের বিস্তার ২ হাজার মাইল হইতে ৩২ হাজার মাইলে এবং রেলপথের যাত্রীসংখ্যা ৪ কোটি ১০ লক্ষ হইতে ৩৭ কোটি ১০ লক্ষে দাঁড়াইয়াছে । পূর্বে রেলপথে ১ কোটি টন (৭৪ মণে এক টন) বাল বাহিত হইয়াছিল, পেশোজ বৎসরে ৬ কোটি ৬০ লক্ষ টন বাল বাহিত হইয়াছে ।

পূর্বকার আদমশুমারী গ্রহণের নথ্যবর্তী ৭৭ বৎসরের মধ্যে ভারতের জনসংখ্যা শতকরা ৬-৪ জন হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে । শুণ্যপূর্বকালীন আদমশুমারী গ্রহণের নথ্যবর্তী সময়ে (প্রতি ৭৭ বৎসর অন্তর আদমশুমারী হয়) যথাক্রমে শতকরা ১-৪, ২-৬, ১-৫ জন হারে ভারতে লোক বাড়িয়াছিল ।

অন্ধমণ্ডেই অত্যন্ত অধিক লোক বাড়িয়াছে । ১৮২১ খ্রষ্টাব্দ হইতে ১৯১১ খ্রষ্টাব্দ পর্য্যন্ত শুধায় শতকরা ৩৭ জন লোক বৃদ্ধি পাইয়াছে ।

কাবরবাসীরা বড় 'ঘরঝোলা' লোক । তাহাজ্জা :

পত্নী আনন্দমহাশয়ের স্মরণ পত্ৰিকা ৮-৭ জন ব্যক্তিত্ব আর সকলেই যে জিলায় জন্মগ্রহণ করে, সেই জিলাতেই বাস করিতেছে বলিয়াছে।

এদিকে ত্রিপুরা অঞ্চল হইতে ভারতে আগত লোকসংখ্যা ১ লক্ষ ৪০ হাজার ২ শত ৬৬। তন্মধ্যে ১ লক্ষ ৩১ হাজার ২ শত ৬৮ জন যুরোপ হইতে আর ১ লক্ষ ২২ হাজার ২ শত ১১ জন বিলাতে হইতে ভারতে আগিয়াছে। ১২০১ খ্রিষ্টাব্দ হইতে ১৭ বৎসরে ইহাদের সংখ্যা ২৬ হাজার বাড়িয়াছে। বিলাতজাত ব্যক্তিদিগের মধ্যে ১৭ হাজার ৬ শত ২৬ জন পেশাবিজ্ঞানে ছিল। ১২০১ খ্রিষ্টাব্দে ছিল ৬০ হাজার ২ শত ৬৬ জন। সে সময় অনেক ধোঁরা দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়াছিল।

ভারত হইতে ৫ লক্ষ মাত্র লোক বৃষ্টিপ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত স্থানে গিয়াছে। তাহাদের মধ্যে তিন ভাগের দুই ভাগ পুত্র। বহিরাঙ্গ (বারিচ বীণ) বীণের অধিবাসীদিগের মধ্যে পত্ৰিকা ১০ জন ভারতীয় লোক। তৎকাল ২ লক্ষ ৮০ হাজার লোকের মধ্যে ৬০ হাজার মাত্র ভারতে গিয়াছে।

ইংলণ্ড ও স্কটল্যান্ডের রেলিষ্টার জেনারেলের রিপোর্টে প্রকাশ যে, ইংলণ্ডে সর্ব-সাকলো ৪ হাজার ৬২ জন ভারতবাসী আছেন। তন্মধ্যে ১ শত ১৭ জন স্ত্রীলোক। স্কটল্যান্ডে প্রায়শী ভারতবাসীর সংখ্যা ১ শত ৪০ জন। ইহাদের মধ্যে কেবলমাত্র দুইজন নারী। ইংলণ্ডে ২ শত ৮২ জন ভারতবাসী ছাত্র ও ২৮ জন ছাত্রী আছেন। স্কটল্যান্ডে ১ শত ২২ জন ছাত্র ও ১ জন ছাত্রী অবস্থিতি করিতেছেন। তাহাদের সংখ্যাও ঐ হিসাবের মধ্যে পণ্ডিত হইয়াছে। ইংলণ্ডে ১৬ জন ও স্কটল্যান্ডে ৮ জন (তন্মধ্যে ১ জন স্ত্রীলোক) চিকিৎসা ব্যবসায় করিতেছেন। অপরদিকে বহুজন ভারতবাসী আছেন কি না হিসাবে তাহার উল্লেখ নাই।

কলিকাতা বহুভাষার কলিকাতা বেসীর একটি বন্ধি আছে। ঐ বন্ধিরমধ্য বেসী-মুন্সির নাম "কিরিঙ্গী কালী"। বন্ধিরের পুরোহিত স্ত্রীস্বামী। একপ্রকার আংলো-ইণ্ডিয়ান (কিরিঙ্গী) এই বন্ধিরস্থিতা বেসীকে পূজা প্রদান করে। তাহাতেই পূজারী ঠাকুরের জীবনযাত্রা নির্ভর হয়। ভারতবাসীর অল্পমান কেবল বর্ষ অল্পসংখ্যে প্রেরী বিতরণ করা কঠিন, এই কথাটি বলিবার জন্য প্রস্তুতঃ ঐ কথা বলা হইয়াছে। ভারতের কতকগুলি লোক একাধিক বর্ষের সেবা করে এবং বহু বর্ষের একটা অধিবাসী থাকায়। অনেক হিন্দু মূলস্বামীর সঙ্গার থাকেন। আশ্রিত সন্তানিত জনগণের অধিবাসী খালকনা সম্ভার জাতিহিসাবে রাক্ষস, জাতি ও বেসিয়া। তাহারা প্রাথমিকঃ হিন্দুর বন্ধিরে পূজা দেয়, পরস্পর দেখা হইলে "রাম রাম" বলিয়া অভিবাদন করে এবং আপনাদের জাতির মধ্যেই বিবাহবিবাহ দিখা থাকে। কিন্তু তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ মঙ্গলদেয় যায়, স্ত্রীকর ও স্ত্রীকর কল দেয়। বিশেষ বহু জাতিতে তাহারা মূলস্বামীর সন্তানিত একত্র আহারও করিয়া থাকে। পক্ষান্তরে হিন্দুদিগের সন্তানিত পিতা, জৈন ও বৌদ্ধদিগের পার্বক্য করা কঠিন। একতরফে, ভারতে পার্বক্যের বৃত্তির বিন্যাস সামাজিক,

বর্ষের সহিত উহার কোন সম্বন্ধ নাই । কোনও প্রতিবেদীর বর্ধবিবাস কি তাহা আদিবার ভঙ্গ্য ভারতবাসীরা যাপ্ত নহে । প্রতিবেদীর সহিত সে তোষাশ্রুতা করিতে ও তাহার বলগ্রহণ করিতে পারে কি না, ভারতবাসীরা কেবল তাহাই জানিতে চাহে ।

ভারতে ২১ কোটি ৭০ লক্ষ হিন্দু আছে । অর্থাৎ সমস্ত অধিবাসীর মধ্যে আর এগার জনা হিন্দু । ১৯০১ খ্রষ্টাব্দ হইতে তাহার পতকরা ৫ জন হিসাবে বাড়িয়াছিল । মুসলমান, শিখ ও বৌদ্ধদিগের বৃদ্ধি হার বৎসরে পতকরা ৭, ৩৭ ও ২০ জন হিসাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে । হিন্দুদিগের মধ্যে বাল্যবিবাহ এতলিঙ্গ ও বিধবাবিবাহ অপ্রচলিত, সেই জন্য হিন্দুর বংশবৃদ্ধি অল্প ।

১৯০১ খ্রষ্টাব্দ হইতে ব্রাহ্মরা পতকরা ৩০ জন হিসাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে । তবে ব্রাহ্মদিগের সংখ্যা ৫ হাজার ৫ শত ৪ জন মাত্র । ইহার কারণ, পাণ্ডবে ১৯০১ খ্রষ্টাব্দে ব্রাহ্মদিগকে বস্ত্র প্রতীকৃত করা হয় নাই । বাক্যলাভেই ব্রাহ্মের বাড়ল্য । কলিকাতা সহরেই সিন্ধি অধিক ব্রাহ্মের বাস ।

আর্য্য সমাজীরা ব্রাহ্মদিগের মত অগ্নিবর্জিত নাই । তাহার দিন দিন উন্নতিতে বৃদ্ধি পাইতেছেন । এখন তাহার সংখ্যার ২ লক্ষ ৪০ হাজার । ১৯০১ খ্রষ্টাব্দে এই সমাজে বহু লোক ছিলেন এখন তাহার আড়াই গুণ এবং ১৮৯১ খ্রষ্টাব্দে বহু লোক ছিলেন এখন তাহার তিন গুণ লোক হইয়াছে । ইহার প্রধানতঃ দুইপ্রকারে ও লক্ষনদে অবস্থিতি করেন । হিন্দুগণ পরিত্যাগ করিয়া ইহার প্রবেশ করিয়াছেন, ইহার প্রাচীনদিগকেই স্বর্গে নীক্ষিত করিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়া থাকেন । ইহার অল্প বর্ধমানধী লোকদিগকে স্বর্গে নীক্ষিত করেন । সম্মতি ছইলেন দূরো-
ণীর বংশধর এই বর্ষ গ্রহণ করিয়াছেন । আর্য্যসমাজকর্ত্ত ব্যক্তিবর্গের লক্ষনদে একটা গ্রন্থ প্রণয়ন করিল ও ১০ টি উচ্চশ্রেণীর ইংরাজী বিদ্যালয় আছে । লক্ষনদে গ্রন্থের আলমহুবারী হুগারিটেণ্টেট্টী প্রভৃতি রাষ্ট্র বলেন যে, বিশেষ অর্থ পতনীর মধ্যে ভারতে আর্য্যবর্গের আন্দোলনই সর্বাঙ্গের । এবং বর্ধমানের হইয়া উড়াই-
রাছে । এই বর্ষের প্রতিষ্ঠাতা সন্ন্যাস স্বামী ভারতের একজন প্রধান লোক-
শিক্ষার অবর্ত্তক । হিন্দু জনসাধারণের পৌত্তলিকতা দেখিয়া তিনি বর্ধমানের প্রভা হইয়াছিলেন ।

মুসলমানগণ সংখ্যার ৬ কোটি ৬৬ লক্ষ, ভারতের লোকসংখ্যার এক গুণাং-
শের অধিক । ইহার পতকরা ৬-৭ হারে বৃদ্ধি পাইয়াছেন । হিন্দুদিগের বৃদ্ধির হার পতকরা ৫ জন ।

ভারতে খ্রৈস্তোপাসকের সংখ্যা ১ কোটি ৩ লক্ষ । ইহার সমস্ত জনসংখ্যার অগুণাতে পতকরা ৩ জন ।

খ্রষ্টান সংখ্যা ৩৮ লক্ষ ১০ হাজার ২০০ জন, সমস্ত জনসংখ্যার অগুণাতে হাজার করা ১২ জন মাত্র । ইহার মধ্যে দেশীয় খ্রষ্টানদিগের সংখ্যা ৩৫ লক্ষ ১৪ হাজার ১১০ জন, তন্মধ্যে পাঁচ ভাগের দুই ভাগ রোমান ক্যাথলিক ।

মাত্রাজ এবেদেই ভারতের তিন ভাগের দুই ভাগ খুটান আছে। কোচিন ও ত্রিবা-
ত্বরের অধিবাসীদের মধ্যে সিকির অধিক খুটান। বিহার ও উড়িষ্যা ২ লক্ষ
৬৮ হাজার, বোম্বাই এসেণে ২ লক্ষ ৪৬ হাজার, ব্রহ্মে ২ লক্ষ ১০ হাজার, পঞ্জাবে
৫ লক্ষ এবং যুক্তপ্রদেশে ১ লক্ষ ৮০ হাজার খুটান আছে। গত দশ বৎসরে
৩২-৬ জন হারে খুটান সংখ্যা বাড়িয়াছে। ১৮৮১ খুটান হইতে খুটান সংখ্যা বিত্তন
হইয়াছে। পকনদ এবেদেই খুটানের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক বাড়িয়াছে। ১৯০১
খুটানে এই এবেদে গত খুটান ছিল এখন তাহার তিনগুন হইয়াছে। সাম্প্রদায়িক
হিসাবে রোমান্ ক্যাথলিকগণ পকনদ বৎসরে অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছেন। তাহার
সংখ্যায় ২ লক্ষ ৮০ হাজার এবং অল্পপাতে শতকরা ২০ জন হিসাবে বাড়িয়াছেন। পকাত্তরে
প্রেসবিটেরিয়ান খুটান দশ শতকরা ২০৫, বাপটিষ্টন ৫০ এবং সুণাবীরয়ন ৪১ জন হিসাবে
বাড়িয়াছেন।

মুরোপীয়দিগের মধ্যে শতকরা ৭ জন ইংলেণ্ডের এলা। তাহাদের মধ্যে আবার
শতকরা ৭৯ জন ইংলেণ্ড ও ডারেলসুবাণী, ১১ জন স্কটল্যান্ডবাসী এবং ১০ জন
আয়ারল্যান্ডবাসী। মুরোপীয়দিগের তিন ভাগের দুই ভাগ আংগ্লিকান্, পাঁচ ভাগের ভাগ
রোমানিষ্ট, তের ভাগের ভাগ প্রিস্টিটেরিয় এবং ২৯ জনের মধ্যে একজন যাজ্বেষভিষ্ট।

কিরিস্টীয়দিগের সংখ্যা ২ লক্ষ ৪৫১ জন যাজ্বে। ১৯০১ খুটান হইতে ইহার
সংখ্যায় ১৫ জন হিসাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহাদের মধ্যে অর্ধেকের অধিক লোক
রোমান্ ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত, তিন ভাগের এক ভাগ আংগ্লিকান্। ইহা তির
প্রিস্টিটেরিয়, বাপ্টিষ্ট ও যাজ্বেষভিষ্ট সম্প্রদায়ভুক্ত কিরিস্টীয় শতকরা ৫ জন শতকরা ২ জন
হইবে।

বাহার্য চিঠিপত্র লিখিতে ও পড়িতে পারে, তাহারাই ১৯১১ খুটানের আদমশুমারীতে
লিখাপড়া জানে বলিয়া গণিত হইয়াছে। ১৯০১ খুটানে সেজন্য নিষন করা হয় নাই।
অতরাং পূর্বের সহিত এখানে তুলনা করা অসুবিধাজনক হইয়া পড়িয়াছে।

ভারতবাসীদের মধ্যে হাজারকরা ৫২ জন উল্লিখিত হিসাবে লিখিতে ও
পড়িতে জানে। হাজার পুরুষের মধ্যে ১০১ জন এবং হাজার বেহের মধ্যে ১০ জন যাজ্বে
লিখাপড়া জানে।

শিক্ষার হিসাবে ব্রহ্মদেশই অগ্রণী। হাজার বৎসর মধ্যে ২২২ জন শিক্ষিত, তবে
তাহাদের শিক্ষা অত্যন্ত সাধারণ প্রকরের। ব্রহ্মের পরই বাঙ্গালা। হাজারকরা
৭৭ জন বাঙ্গালী লিখাপড়া জানে। মাত্রাজাদিগের হাজারকরা ৭৫ জন লিখাপড়া জানে।
তৎপরে বোম্বাইবাসী, বিহারী ও উড়িয়া এবং পাঞ্জাবী। যুক্তপ্রদেশে হাজারকরা ৩৫,
মধ্যপ্রদেশে ৩০ এবং কাশ্মীরে ২১ জন লিখাপড়া জানে।

বৎসর দুগুণে অবরোধ এলা নাই, গ্রীষ্মকাল ব্রহ্মদেশই অগ্রণী। কিন্তু বোম্বাই ও
মাত্রাজ গ্রীষ্মকাল বাজ্যলোকে হটাইয়া বিয়াছে।

ব্রহ্ম ও অর্ধসম্বাসীদিগকে বাদ দিয়া বলিলে দেখা যায় যে, শিক্ষণযোগ্যে পার্শ্ববাসী

অবস্থায়। ই হাদেশ মধ্যে হাজারকরা ৭১ জন শিক্ষিত। জৈনরা তাদার পরবর্ত্তী স্থান অধিকৃত করিয়া আছেন। ই হাদেশ মধ্যে শিকিওর সংখ্যা পাশাঁদিগের শিক্ষিত সংখ্যার অর্ধেক। নৌদিগের চারিজনের মধ্যে এক জন শিক্ষিত। ব্রহ্মানদিগের মধ্যে শতকরা ২২ জন শিক্ষিত। ব্রহ্মান ভারতবাসীদিগের মধ্যে ছয় জনের ভিতর এক জন লিখিতে ও পড়িতে জানে, পুরুষ ব্রহ্মানদিগের মধ্যে দিকি ও ঘেরে ব্রহ্মানদিগের দশভাগের এক ভাগ লিখাপড়া জানে। অশিক্ষিত ভারতবাসীরাই এখানেতঃ ব্রহ্মান হইয়া পড়া; কিন্তু হিন্দুদিগের মধ্যে বহু লিখাপড়া জানা লোক আছে, দেশী ব্রহ্মানদিগের মধ্যে তাহার অল্পভাগে তিনগুণ ও মুলমান শিক্ষিতের তুলনায় চতুর্গুণ লোক শিক্ষিত,—আদমশ্রমারীতে ইহা একাধ পাঠ্য আছে।

শিক্ষার উপর ব্রহ্মান বর্ণের কিরূপ প্রভাব বিহার ও উড়িষ্যা অঞ্চলের হিসাব দেখিলে তাহা বুঝা যায়। ঐ অঞ্চলে ব্রহ্মানদিগের মধ্যে হাজারকরা ৭৬ জন লিখিতে ও পড়িতে জানে। পঞ্চাশের প্রোতোপাদকদিগের মধ্যে হাজারকরা ৫ জনের অধিক লোক লিখিতে ও পড়িতে জানেন না। ব্রহ্মানদিগের পর লিখ্যাই লিখাপড়া জানে। তাহাদের প্রতি ১৫ জনের মধ্যে একজন, হিন্দু পুরুষের মধ্যে হাজারকরা ১০১ ও স্ত্রীলোকদিগের হাজারকরা ৮ জন, মুলমান পুরুষদিগের হাজারকরা ৫২ ও স্ত্রীলোকদিগের ৪ জন এবং প্রোতোপাদকদিগের হাজারকরা ১১ জন পুরুষ ও ১ জন ঘেরে শিক্ষিত।

সমগ্র ভারতে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে ১ কোটি ৫১ লক্ষ লিখাপড়া জানা লোক ছিল; ১৯১১ অব্দে ১ কোটি ৮৬ লক্ষ লিখাপড়া জানা লোক হইয়াছে। দশ বৎসরে শতকরা ১৮ জন হিসাবে শিক্ষিতের সংখ্যা বাড়িয়াছে। তন্মধ্যে পুরুষের বৃদ্ধির হার শতকরা ১৫ জন ও স্ত্রীলোকের ৬১ জন হিসাবে।

সমগ্র ভারতে ১১ লক্ষ ভারতবাসী ইংরেজী লিখাপড়া জানে। প্রতি দশ হাজার ভারতবাসী পুরুষের মধ্যে ২৫ জন এবং নারীর মধ্যে ১০ জন ব্যতী ইংরেজীদ্বারা। ব্রাহ্ম-দিগকে বাদ দিলে পাশাঁরাই ইংরেজী শিক্ষার সর্বোচ্চস্থান অধিকৃত করিয়া আছেন, ই হা-দের প্রতি তিনজন ব্যক্তিই ইংরেজী জানেন; পুরুষের অর্ধেক এবং নারীদিগের ছয়ভাগের একভাগ ইংরেজী জানেন। তাহার পর ব্রহ্মানদিগের স্থান। ই হাদের ভিতর শিক্ষিতের অল্পভাগ পাশাঁদিগের দশ ভাগের ভাগ, তৎপরে জৈন, হিন্দু, শিব, মুলমান ও বৌদ্ধদিগের মধ্যে যথাক্রমে ইংরেজীশিক্ষিতের সংখ্যা অল্প। সর্বশেষে প্রোতোপাদকদিগের স্থান। ইহাদের দশ হাজার লোকের মধ্যে ২ জন ব্যতী ইংরেজী জানে। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ইংরেজী বলিতে পারে এমন লোকের সংখ্যা শতকরা পঞ্চাশ জন হিসাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ভারতে নরনারীর অল্পভাগ এইরূপ :—১০০০ পুরুষে ২৫৫ জন নারী। যুরোপের পশ্চিম অঞ্চল ভিন্ন যত দেশের তুলনায় নরনারীর এই পার্থক্য অধিক নহে। ভারতে নারীরাই মনে ও ব্যালোরিয়ায় অধিক ঘরে, কিন্তু দৃষ্টিকে পুরুষ অধিক-ঘরিয়া থাকে। পূর্ণাঙ্গশিক্ষা এখন শিশুসকলমধ্যেই কথিয়া গিয়াছে, কিন্তু তালিকার এখনও ইহার অভাব জানা যায়।

ভারতে বিলাতে অশ্রুত রথশ্রীর সংখ্যা ১৮৯১ গুটীকে ছিল ১৪ হাজার ৬৬০ জন ১৯১১ অব্দে হইয়াছে ১২ হাজার ৪৯০ জন ।

সমগ্র ভারতে মণ বৎসরের নূন বয়স্ক বীর সংখ্যা ২০ লক্ষ আর ১৫ বৎসরের নূন বয়স্ক সখবার সংখ্যা ২০ লক্ষ ।

ভারতের নারীদিগের মধ্যে পতকরা ১৭ জন বিধবা । যুরোপের পশ্চিমাকালে পতকরা ৮ জন মাত্র বিধবা । ৩ লক্ষ ০০ হাজার বিধবার বয়স ১৫ বৎসরের কম । বাক্সালার ৮৫ হইতে ৪০ বৎসর বয়স্ক বিধবার অল্পগাত পতকরা ১৬ জন ।

ভারতে পিতৃবিবাহ কসিতেছে কি বাড়িতেছে তাহা বলা বড় কঠিন । ১৮৯১ গুটীকে হাজার করা ১৬টি পাঁচ বৎসরের নূন বয়স্ক হিন্দু বালিকা বিবাহিতা ছিল । এখন সেই অল্পগাত ঈকুইয়াছে হাজার করা ১৮ জনের ; পক্ষান্তরে পাঁচ হইতে মণ বৎসরের বিবাহিতা হিন্দু বালিকার অল্পগাত হাজার করা ১৪৮ জন হইতে ১০২শে সাধারণ্যে । মহীশূরে ত বরোদার কঠোর আইনদ্বারা পিতৃ বিবাহ বন্ধ হইয়াছে । ভারতকে ৫ হইতে ১০ বৎসর বয়স্ক বালিকাদের মধ্যে হাজার করা ৬১৭টি বিবাহিতা ।

ভারতে ২২০ প্রকার ভাষা প্রচলিত । উল্লেখ্য ৮৫টি উপভাষা ।

১ কোটি ৮২ লক্ষ ভারতবাসীর ভাষা হিন্দী । ৪ কোটি ৮৪ লক্ষ লোক বাঙ্গালা বলে । ইয়া ভিন্ন ১ কোটি ২৮ লক্ষ লোক মারহাট্টী, ১ কোটি ৫৯ লক্ষ গাঞ্জাবী ২ কোটি ৪০ লক্ষ তেলিগ, ১ কোটি ৮১ লক্ষ তামিল, ৮৮ লক্ষ বুড়া ও ২১ লক্ষ সঁওতালি ভাষা বলে ।

এখন ভারতে বেঙ্গল প্রদেশ বিভাগ হইয়াছে তাহাতে বাঙ্গালা প্রদেশের অধিকাংশ লোকেরই এক ভাষা । এই প্রদেশের মণ ভাগের মণ ভাগ লোক একই ভাষায় কথা কহে । অল্প অংশ আর কোমণ্ড প্রদেশেই নাই । সাম্প্রদায়িক ভাষার বিজ্ঞান জন্মণ ; কসিয়া আসিতেছে । ৪৫ হাজার জুরি জাতির মধ্যে ৬,৫০০ জুরি আগমনের সাম্প্রদায়িক ভাষার কথাবার্তা কহিয়া থাকে । ১ লক্ষ ২০ হাজার ৪৬ জন কোচের মধ্যে ৬ হাজার ৫২৮ জন কোচ, কোচভাষা বলে । খ্য়াপ্রদেশে ২৪ লক্ষ ৬২ হাজার ৫৮০ জন মণ্ডের অর্ধেক লোক মণ্ডভাষায় ভাষায়, ২১ লক্ষ ৭৮ হাজার ১১৬ জন সঁওতালের মধ্যে ২০ লক্ষ ৮০ হাজার ৮১৬ জন সঁওতালী ভাষায় কথা কহিয়া থাকে ।

আবহুমানীর হিসাবে চাষিকার ব্যাধির উল্লেখ আছে । খ্যা—ঈন্ডাঘরোণ, মুকবদি-রতা, কুর্ট ও আন্ডা । ইহার মধ্যে সুমারকারীয়া কেবল শেখোক্ত ব্যাধি আগমনা দেখিয়া লইতে পারিয়াছেন, প্রথম ও তৃতীয় রোগের হিসাব কেবল আন্ডালী মাত্র । তবে হিসাবটি বিধানযোগ্য করিবার জন্য খ্যাখ্যা চেষ্টা করা হইয়াছে ।

ভারতে সর্বসাক্ষ্যে ৮১ হাজার ৬ জন পাগল, ১ লক্ষ ৮০ হাজার ৮২১ জন কালাবোবা, ৪ লক্ষ ৪০ হাজার ৬৫০ জন অন্ধ এবং ১ লক্ষ মণ্ড হাজার ২৪ জন কুর্টরোগী আছে । ১৮৯১ গুটীকে এই সকল রোগগ্রস্ত লোকের সংখ্যা ছিল লক্ষ করা ০১৫ জন, ১৯১১ গুটীকে হইয়াছে লক্ষ করা ২৭৬ জন । পশ্চিম যুরোপের জুদবার ভারতে বাতুলগের সংখ্যা অতি অল্প । পশ্চিম যুরোপে লক্ষ করা ০৬৪ জন পাগল আর ভারতে লক্ষ করা ২৬ জন মাত্র । ভারত অপেক্ষা পশ্চিম যুরোপে চৌদ্দগুণ বাতুল বর্তমান ।

ভারতে লক্ষ করা ৬৪ জন হোমোফ্রোপ্যা, দুইগুণে লক্ষ করা ১২০ জন । ভারতে লক্ষ করা ১৪০ জন অন্ধ, অধিকাংশ রুগ্নোপীর্ণ দেশে ও মার্কিনে অন্ধের সংখ্যা লক্ষ করা ৮০ হইতে ৯০ জনের অধিক নহে । কেবল ক্রিস্টিয়ান লক্ষ করা ১৪০ জন অন্ধ ।

ভারতের গরম দেশেই বধা পঞ্জাব, বেঙ্গলিয়ান, মুক্তদেশ, রাজপুতনার অন্ধের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক । দত্ত-দামলা কাননকুল্লা বাজালা আসানু ও বাহাল ভূমিতে অন্ধের সংখ্যা অধিক । ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে অন্ধের অনুপাত দশ হাজার করা ১৭ জন হইতে ১৪ জনে নামিয়াছে । বঙ্গ রোগের একোপত্র্য এই আত্মরোগের সংখ্যাভ্রাসের অন্ততম কারণ ।

ভারতে প্রুগের বধা লক্ষ করা ৭১ জন আর বেরদের বধা লক্ষ করা ১৮ জন কুর্জরোগ-গ্রস্ত । আনামেই কুর্জরোগের আবলা অত্যন্ত অধিক । তৎপরে ব্রহ্মদেশ, তৎপরে বিহার ও উড়িষ্যা । ক্রমে বহা-দেশ, ময়দেশ, বঙ্গদেশ, বোম্বাই অঞ্চল, মুক্তদেশ, পুণব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত এদেশের স্থান । দশ বৎসর বয়সের ন্যূন বয়স ব্যক্তিদিগের বধা কুর্জরোগের একোপ অত্যন্ত অধিক । খ্রীষ্টানদিগের বধা কুর্জরোগের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক । ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে ১ লক্ষ ২১ হাজার কুর্জরোগ ছিল, ১৯১১ অব্দে উহাদের সংখ্যা কমিয়া ১ লক্ষ ২ হাজারে পৌঁছাইয়াছে । হুবার লোকসংখ্যার অনুপাতে ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে প্রতি দশহাজারে ৩৪ জন করিয়া কুর্জরোগ ছিল, ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে তাহাদের সংখ্যা প্রতি দশহাজারে ১৪ জনে পৌঁছাইয়াছে । ভারতে ৭০টি কুর্জরোগ ও ৪ হাজার ১১৬ জন কুর্জরোগে আক্রান্ত আছে ।

ভারতে ২১ কোটি ৭০ লক্ষ লোক কৃষিকার্য্যদ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিয়া থাকে । সমগ্র ৮০ লক্ষ লোক কৃষিকার্য্যে ১৬ কোটি ৮০ লক্ষ লোক আপনাদের নিজের অথবা বাজনা করা জমিতে চাষ করে, ৪ কোটি ১০ লক্ষ লোক কৃষিকাজে সহায়ী করে, আর পাঁচ লক্ষেরও কম লোক জমিদারী দরকারে ও ভূমিসম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়ে কাষ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিয়া থাকে ।

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে ১ কোটি ২০ লক্ষ টন করলা উৎপন্ন হইয়াছে । বিলাতে ঐ বর্ষে ২৭ কোটি ২০ লক্ষ ৬ টন করলা উৎপাদিত হইয়াছে ।

বর্ধনশক্তি পেশা হিসাবে ভারতে ১৬ লক্ষ লোক গৌরহিত্য, বর্ধনশক্তি দেবদেবী প্রভৃতি করিয়া থাকে । ৭ লক্ষ লোক সন্ন্যাসী তকির প্রভৃতি বর্ধনশক্তি তিত্ত্বক, ৪ লক্ষ লোক সেখোদিগের করে অর্থাৎ লোকদিগকে তীর্থযাত্রিতে লইয়া যায় । ৬ লক্ষ বর্ধনশক্তি ব্যবস্থা প্রভৃতি এলাব করে ।

সমগ্র ভারতে ৭ হাজার ১০০টি কল কারখানা আছে, তাহাতে ২১ লক্ষ লোক কাষ করিয়া থাকে । অর্থাৎ ভারতের লোকসংখ্যার অনুপাতে হাজার করা ৭ জন লোক কলে কাষ করিয়া থাকে ।

ভারতের লোক ক্রমশঃই জাতিবান্ধু পরিচ্যাপ করিতেছে । এখন পাঁচ ভাগের এক ভাগ এতৎ বর্ধনশক্তি করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে না । হর জনের বধা এখন বৈদ্য চিকিৎসা দ্বারা ।

কিশোরীচাঁদ মিত্র।

এই সভা কর্তৃক প্রকাশিত প্রাণুরিষিত "প্রবন্ধাবলীতে" নিম্নলিখিত ইংরাজী ও বাঙ্গালা প্রবন্ধ সরিষিত ছিল :

1. Discourse read at the Inaugural Meeting of the Hindu Neophilanthropic Society.
2. পরমেশ্বরের শক্তি ও দয়া।
3. The Goodness of the deity manifested in a leaf.
4. The System of Philosophy inculcated in the Bhagavat Geeta,
5. On the Bhagavat Geeta.
6. ব্রহ্মোপাসনায় আমন্য।
7. The Power, Wisdom and Goodness of the deity as displayed in the organisation of the Zoophyte.
8. নীতিজ্ঞান।
9. On Hinduism as it is.
10. The Phenomena of reproduction—an argument for the goodness of God and the immortality of the soul
11. স্বার্থ প্রেম এবং তত্ত্বদ্বারা পরমেশ্বরের উপাসনা করা কর্তব্য।
12. The association of virtue with happiness and of vice with misery—an argument for the goodness of the deity
13. On the Immortality of the Soul as inculcated in the Hindu religion
14. পরোপকার।
15. Conformity and Nonconformity

বাঙ্গালা প্রবন্ধগুলির প্রায় সমস্তগুলিই মহাত্মা অক্ষয়কুমার দত্ত ও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের রচিত বলিয়া বোধ হয়। ইংরাজী প্রবন্ধগুলির অধিকাংশ সভার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক কিশোরীচাঁদের লিখিত। ছইটি প্রবন্ধ On the Bhagavat Geeta এবং Conformity and Nonconformity যেতারেণ্ড ব্রহ্মমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত। ইহার প্রথমটি কিশোরীচাঁদের On

the system philosophy inculcated by the Bhagavat Geetaয় প্রচু্যত। এবন্ধে কিনোয়ীটাদ গীতা হইতে বহুসংখ্যক শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া গীতার প্রধান প্রধান উপদেশগুলির ব্যাখ্যা করেন। এই গ্রন্থের সারাংশ নিয়ে গ্রন্থ হইল ;—

ব্রহ্মোপাসনাই বৃত্তির একমাত্র উপায় ।

যো মাং সর্কেষু ভূতেষু সৰ্বমাত্মানসীধরং ।

যি আচ্চাং তদন্তে মৌল্যাং ভবন্যোব ভূহোতি সঃ ॥

সংকর্মেই পুণা হয়, কর্মফলের সহিত ইহার কোনও সম্বন্ধ নাই । কর্ম-ফলের বিষয় চিন্তা না করিয়া সংকর্ম করিবে ।

কর্মণ্যোবাধিকারন্তে মা ফলেষু কদাচন ।

মা কর্মফলহেতুর্মা তে সর্বোহম্বকর্মণি ॥

(নিকায়) কর্মেই তোমার অধিকার হউক, কর্মফলে যেন কামনা না হয় ; কর্মফল যেন তোমার প্রবৃত্তির হেতু না হয় এবং কর্ম পরিত্যাগে তোমার আশঙ্কি না হউক ।

স্বব্রহ্মণের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া কর্মব্যাকর্ম সাধনই যোগ । যিনি সিদ্ধি ও অসিদ্ধি উভয়ই ভুলাজ্ঞানে দেখেন, সম্পদে উৎসাহিত বিপদে অবসাদ-গ্রস্ত হইবেন না তিনিই প্রকৃত যোগী :—

যোগঃ কুরু কর্মণি সৎ ত্যক্ত্বা বনজয় ।

সিদ্ধাসিদ্ধোঃ সর্বো ভূম্য সমঃ যোগ উচ্যতে ॥

বুদ্ধিবৃত্তো লব্ধাতীহ উভে স্তম্ভত হৃদন্তে ।

হে বনজয় । তুমি কসকামনা পরিত্যাগপূর্বক একান্ত ইশ্বরপরায়ণ হইয়া সিদ্ধি ও অসিদ্ধি উভয়ের ভুলাজ্ঞান করতঃ কর্মসকলের অহুর্টান কর ; সিদ্ধি ও অসিদ্ধি উভয়ের ভুলাজ্ঞানেই যোগ বলিয়া অভিহিত ।

ইহার কর্মযোগবিগমিনী বুদ্ধি উপস্থিত হয়, তিনি এই অর্থেই পরমেশ্বর প্রসাদে স্তম্ভত ও হৃদন্ত উভয় পরিত্যাগ করেন । সুতরাং কামনা-বিগর্হিত ব্যক্তিই যুক্ত প্রজ্ঞ । তাঁহার স্রবের উৎস ভিতরে, বাহ্য বস্তুতে নহে । তিনি কর্ম করেন কিন্তু নিকামভাবে । তিনি পৃথিবীতে বাস করিলেও পার্থিব নহেন । তাঁহার স্রব জৈবর্থে নহে, সম্মানে নহে ; কিন্তু এমন কোন বস্তুতে তাঁহার স্রবের উৎস বিদ্যমান যাহা পৃথিবী প্রদান করিতে পারে না অথবা কাড়িয়া লইতে পারে না ।

আর্যাবর্ত —



বিজয়া প্রেস, কলিকাতা।

আর্যাবর্ত



বিজয়া প্রেম, কলিকাতা

তিনি কোনও বস্তুর অভাব অনুভব করেন না। সঙ্গ অনন্যভাবেই তিনি ম্লগ বোধ করেন :—

“প্রবহতি যদা কামান্ সৰ্বান্ পার্শ্ব মনোগতান্।

মান্বনোবাহন্য তুইঃ স্ৰিঃ পতন্তঃকোষাতে ॥

হুঃশুভ্রবিগমনাঃ স্তবেষু বিপত্তমূহঃ।

বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতবীৰ্যনিরুচ্যতে ॥

যঃ সৰ্বজ্ঞানভিরেবংভব্য প্রাপ্য তত্তাত্তম্।

নাভিনন্দতি নখেষ্টি তন্ত্ৰ রাজ্য প্রতিষ্ঠিতা ॥

হে পার্শ্ব! যিনি সর্বপ্রকার মনোগত কামনা পরিত্যাগ করেন, নীহার আশ্রা আশ্রাতেই সন্নিবিষ্ট থাকেন, তিনিই স্নিহিত রাজ্য। যিনি হুঃশে অক্ষুণ্ণচিত্ত, হুঃশে স্পৃহাশূন্য ও অনুভবগত ভয় ও ক্রোধ-বিনশ্চিত্ত সেই স্থান 'স্নিহিতপ্রজ্ঞ'। যিনি সৰ্বত্র স্নেহশূন্য, যিনি অহুত্ব বা তত্তপ্রাপ্তিতে আনন্দিত, পতিত্ব বা অতত্ত-প্রাপ্তিতে বিষমবৃত্ত না করেন নীহারই বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত। বইয়াছে।

এতদ্বারা প্রতীক্ষান হইবে যে, কর্ণকর বা হটক অবস্থা হু হটক উভয়ই নির্মিত্যব চিত্তে দর্শন করাতাই স্তবেষ উৎস প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু এতদ্বারা কর্ণের প্রতি ঔদাসীনা শিক্ষা দেওয়া হয় নাই। পক্ষান্তরে স্নিহিত বহু স্থানে লিখিত আছে যে, পূণ্য বৈরাগ্যে নহে, কর্ণে; কর্ণক্ষেত্র হইতে অবস্থিত হওয়ার নহে, কর্ণব্যাকর্ষ সম্পাদনের জন্য সৎ চেষ্টায়। ইহার উপদেশ এই যে, সৎকর্মেয় অনুষ্ঠান কর এবং এই সৎকর্মেয় অনুষ্ঠানই তোমার আবাসস্থানের পুরস্কার হউক। সৎকার্য্যেই ধর্মের লিঙ্গ; ইহার অনুষ্ঠানই স্কন্ধের উপায় স্মরণ্যে সৎ-কার্য্যে আপনাকে নিয়োজিত কর।

“হস্তার্ঘ্যং কর্ণপোহন্যত্র লোকোহয়ং কর্ণবন্ধনঃ।

ভদ্রং কর্ণ কোঃস্তেয় মুক্তসমঃ সমাচর ॥

বিক্রম আরাধনার কর্ণ বাঠিত অন্য কর্ণ করিলে লোক কর্ণে বদ্ধ হয়; অতএব হে কোঃস্তেয়! বিক্রম শ্রীভার্গব বিভাগ হইয়া কর্ণের অনুষ্ঠান কর।

“তদ্বাদসন্তঃ সততং কার্য্যং কর্ণ সমাচর ॥

অসক্তো হ্যচরন্ কর্ণ পরমাত্মোতি পুরুষঃ ॥

পুরুষ আনন্দি পরিত্যাগ করিয়া কণ্ঠানুষ্ঠান করিলে মোক্ষলাভ করেন; অতএব তুমি আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া কর্ণানুষ্ঠান কর।

"ব্রহ্মণ্যাদি কৰ্মাণি সৰ্বা ভ্যক্তা কৰোতি যঃ ।
 লিপ্যন্তে ন স পাপেন পত্নপত্নমিবাভ্যাসা ॥
 কারেন যনসা বুধ্যা কেবলৈরিপ্তিগৈরিণি ।
 যোগিনঃ কৰ্ম কুৰ্ব্বতি সৰ্বং ভ্যক্তাস্তত্ত্বয়ে ॥
 যুক্তঃ কৰ্মফলে ভ্যক্তা শান্তিমাপ্নোতি নৈজীকীন্ ।
 অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সন্তো নিবধ্যতে ৷

"যিনি আসক্তি পরিত্যাগপূৰ্বক ব্রহ্মে কৰ্মফল সমৰ্পিত করিয়া কৰ্ম করেন, পত্নপত্নের জলের স্তর তাহাতে পাপ লিপ্ত হয় না। কৰ্মযোগিগণ চিত্তত্বদ্বির নিমিত্ত কৰ্মফলে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া, শরীর, মন, বুদ্ধি ও যমত্ববুদ্ধি-বর্জিত ইন্দ্রিয়দ্বারা কৰ্মাহতান করেন ।

পরমেশ্বরপরায়ণ ব্যক্তি কৰ্মফল পরিত্যাগ করিয়া কৈশল্য (মোক্ষ) প্রাপ্ত হইবেন ; কিন্তু ঈশ্বর-নিষ্ঠাবিশুদ্ধ ব্যক্তি কামনাবশতঃ ফলপ্রত্যাশী হইয়া বদ্ধ হয় ।

উদ্ধৃত শ্লোকসমূহ হইতে প্রতীয়মান হইবে যে, গীতা কৰ্মে অনাসক্ত সন্ন্যাস যুক্তির উপায় বলিয়া নির্দেশ করে না, পক্ষান্তরে নিকাম কৰ্মব্রতধারণ করিতে উপদেশ দেয় ।

"সন্ন্যাসস্ত মহাবাহো হৃৎকম্পম্ যোগতঃ ।

যোগযুক্তো যুনিত্রীন্ ন চিরেণাদিগচ্ছতি ॥

হে মহাবাহো ! কৰ্মযোগ বাতীত সন্ন্যাস হৃৎকম্পাভির কারণ, কৰ্মযোগ-যুক্ত ব্যক্তি সন্ন্যাসী হইয়া অচিরে ব্রহ্মলাভ করেন ।

গীতা আমাদের হৃদয়ের বেহমমতা প্রভৃতি উচ্চ বৃত্তিসমূহের ধ্বংস করিতে উপদেশ দেয় না, লোকালয় ভাগ করিয়া নির্জনে আত্মোন্নতি সাধন করিতে উপদেশ দেয় না, পরন্তু সকলের হিতাহুতানে জীবন উৎসর্গ করিতে শিক্ষা দেয় —

"লভন্তে ব্রহ্মনির্জ্ঞানবরঃ কীপকম্বাযাঃ ।

হিরণ্যৈব। যতাম্বানঃ সৰ্বভূতহিতৈ রতাঃ ॥

যাঁহারা পাপকে ধিনষ্ট করিয়াছেন, সংশয়কে হিন্ন করিয়াছেন, চিত্তকে বশীভূত করিয়াছেন এবং সকলের হিতাহুতানে ব্যাপ্ত আছেন, সেই তত্ত্ববর্ণি-গণই মোক্ষলাভ করেন ।

“আত্মোপমেমে সর্বত্র সমং পশ্চতি বোহর্জুন।

স্বথং বা যদি বা হুঃখং স যোগী পরমো যতঃ।

হে অর্জুন! যে ব্যক্তি আপনার সুখদুঃখের জ্ঞান সকলের সুখদুঃখ দর্শন করে, সেই ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ যোগী।

এইরূপ গীতার প্রধান প্রধান উপদেশগুলির ব্যাখ্যা করিয়া কিশোরীচাঁদ প্রাচীন নীতিকারগণের উপদেশের সহিত তুলনায় সমালোচনা করিয়া গীতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করেন। উপসংহারে তিনি বলেন :—

সত্য বটে গীতার উপদেশ আমাদেরকে এত উচ্চ নৈতিক আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে শিক্ষা দেয় যে, বর্তমান অবস্থায় মানব-প্রকৃতিতে ততদূর উন্নতি অসম্ভব। কিন্তু ইহাতে কি আইশে যায়? চরম উৎকর্ষ লাভই কি আমাদের জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত নহে? যাহা উচ্চ, যাহা কষ্টসাধ্য তাহারই অনুসরণ করিতে মানবকে উত্তেজিত করা উচিত নহে কি? এই প্রচেষ্টাই কি তাহার প্রকৃত শক্তিকে বিকশিত করে না? আদর্শের সহিত তাহার যে পতীর দ্বন্দ্বোদ্বতকাণী লব্ধ আছে তাহাই কি তাহার সাধনার শক্তি-প্রদান করে না এবং প্রথমে যে সকল বাধাবিপত্তি অনতিক্রম্যীয় বোধ হয় তাহা লঙ্ঘন করিতে সার্থ্য প্রদান করে না? যে সকল উচ্চ আশা ও আকাঙ্ক্ষা হয়ত মানবজীবনে সচল করা অসম্ভব সেই সকল আশা ও আকাঙ্ক্ষাই কি সর্বশক্তিমান মঙ্গলময় বিঘাতার প্রবল মানবজীবনের সুন্দর ও আশ্রয় মনোবৃত্তিসমূহ বিকশিত করিতে সাহায্য করে না? ইংলণ্ডের কোনও সুপ্রসিদ্ধ লেখিকা বলেন :—“এলফ্রড ও ইজ্রয়লুয়াসতির সহিত সামঞ্জস্য রাখিবার নিমিত্ত আধুনিক নীতিকারগণ বেদন মানবের নৈতিক আদর্শ হীন করিয়াছেন প্রাচীন নীতিকারগণ লেদন করেন নাই, ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহাদের প্রতি আমার প্রচণ্ড উদ্বেগ হয়। তাঁহারা কখনও সমগ্র মানবজাতিকে শিষ্য প্রদান করিবার অভিলাষ করেন নাই, বরঞ্চ সংসার হইতে যত দূরে সম্ভব তত দূরে অবস্থান করিতেন। তাঁহারা সরল ভাষায় বলিয়া দিতেন, কিরূপ আত্মত্যাগ প্রদোষন এবং তাহা হইতে কিরূপ সিদ্ধিলাভ সম্ভব। যদি ভূমি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে চাহ—এইরূপ সাধনার প্রয়োজন; এই এই জিজ্ঞাসুতান আব-ভ্রক, বিত্তীয় পথ নাই। যদি ভূমি না করিতে পার, অজ্ঞানদিগের সমাজে প্রবেশ কর।”

শ্রীতার উপদেশে এই ভাবই প্রচলিত হইয়াছে । শ্রীতার উপদেশ সুমহান নৈতিক ভাবে পরিপূর্ণ । পার্থিব পৌরষ ও ঐশ্বর্য কিছুই নহে—শ্রীতা আত্ম-দ্বিপক্ষে ইহাই শিক্ষা দেয় এবং আত্মাদিপক্ষে উচ্চতর অবিনশ্বর সৃষ্টির অন্বেষণে প্রগতি প্রদান করে ; শ্রীতার উপদেশ আত্মদ্বিপের জন্মের উচ্চ বৃত্তিসমূহ প্রবুদ্ধ করে । শ্রীতা উপদেশ দেয় যে, স্বাস্থ্য নশ্বর নহে, মাদ্রব অবিনশ্বর—অমঙ্গ আকাশ মধ্যে তাময়ান অসংখ্য সূর্য্যচন্দ্রগ্রহাদিগ ঘূর্ণন হইলেও মানবাত্মার ক্ষয় নাই, পরমেশ্বরের করুণা ও ন্যায়পরায়ণতার বিশ্বাসের উপর শ্রীতার বর্ণের প্রদান যন্ত্রগুলি প্রতিষ্ঠিত, শ্রীতার ধর্ম আত্মাদিপক্ষে পৃথিবী হইতে আরও উচ্চে লইয়া যায় এবং চরম আদর্শের নিকটবর্তী করে—ভক্তি, মায়ার এবং করুণার উচ্চ মনোবৃত্তিভিদের বৃদ্ধি ও বিকাশে শ্রীতার ধর্ম বিশেষভাবে সাহায্য করে ।

The Immortality of the Soul as inculcated in the Hindu religion নামক গ্রন্থেও কিশোরীচাঁদ বেধ বদ্যন্ত শ্রীতা ও গ্রামমোহন চায়ের গ্রন্থাবলী হইতে শ্লোকাদি উদ্ধৃত করিয়া জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার সম্বন্ধ প্রদর্শন করাইয়া জীবাত্মার অবিনশ্বরত্ব প্রতিপন্ন করেন । বাহ্য্য ভয়ে এ যুগে ইহাঁর বিস্তৃত পরিচয় দিলাম না । “শ্রীতার উপদেশ” শীর্ষক গ্রন্থের প্রাণ্ডরিখিত পরিচয়ও যথাসম্ভব সংক্ষেপে দেওয়া হইয়াছে । বর্তমান গ্রন্থে কিশোরীচাঁদের অসংখ্য রচনার সম্যক পরিচয় দেওয়া অসম্ভব ; তবে শ্রীতার উপদেশ বিষয় গ্রন্থটির সাগ্রাংশ প্রদান করিবার উদ্দেশ্য এইঃ—

প্রথমতঃ, কিশোরীচাঁদ উক্ত উপদেশগুলি তাঁহার জীবনের Motto করিয়া লইয়াছিলেন এবং আজীবন এই সকল উপদেশোক্তসারে কার্য্য করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন । (আমরা আশা করি পরবর্তী পরিচ্ছেদসমূহে পাঠকগণকে ইহাঁ স্পষ্টভাবে দেখাইতে সক্ষম হইব ।) স্মরণ্য তাঁহার জীবনের আদর্শ কি ছিল তাহা বর্ণনা করা চরিত্রকারের কর্তব্য ।

দ্বিতীয়তঃ,—তিনি বাণেশ্বরিক হিন্দুধর্মের সংস্কারপ্রার্থী ছিলেন এবং সময়ে সময়ে পৌত্তলিকতা প্রভৃতির বিরুদ্ধে তীব্র যত্ন প্রদান করিয়াছেন । কিন্তু বর্ধাৎ হিন্দুধর্মের প্রতি যে তাঁহার অকৃত্রিম অঙ্গুরাণ ছিল তাহা প্রাপ্তক গ্রন্থের উচ্চ উপসংহার হইতে প্রতীয়মান হইবে । একজন লেখক পাণ্ডী-চাঁদের সহিত কিশোরীচাঁদের তুলনায় সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন উভয়েই সংক্ষেপে ছিলেন । কিন্তু প্রোজাতা ধারতাবে নীতি-উপদেশদ্বারা বেশের

ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତ —



ହାରିଶ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ।

ବିଜୟା ପ୍ରେସ, କଲିକତା ।

হুসংস্কার দূর করিতে প্রয়াস পাইতেন, কনিষ্ঠ প্রাচীন আচারসমূহের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া অধিকাংশ লোকের দ্বারে আঘাত করিতেন। একজন আমাদিগের শাস্ত্র অব্যয়ন করেন, শাস্ত্রগ্রন্থাবির প্রতি সম্মান প্রদর্শিত করেন এবং রচনার ও কলোপকরনে শাস্ত্রবাক্যের উল্লেখ করেন, অপর ভ্রাতা কেবলমাত্র বিজ্ঞাতীর যুগান্তরতঃ এই সকল শাস্ত্র পাঠ করা অপ্রয়োজনীয় বোধ করিতেন।"

তিনি আমাদের শাস্ত্রানি যে নিত্যন্ত যুগের দৃষ্টিতে দেখিতেন না, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য বোধ হয় আমাদের আর কিছু বলা নিম্নপ্রয়োজন। পুরাণাদির গল্পাংশের সত্যতাপক্ষে সন্দেহ প্রকাশ করা, অর্থহীন অহুতান পদ্ধতির সহিত লনাপ্রদ-হিন্দুধর্মের সম্বন্ধ নির্ণয়ে অক্ষমতা প্রকাশ করা, হিন্দুশাস্ত্রে অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করার সহিত একাধ্বাচক মতে। পক্ষান্তরে যিনি গীতার উচ্চল আদর্শ সমুখে রাখিয়া এই বিশাল কর্মক্ষেত্রে নির্যাতনভাবে কর্তব্য সম্পাদনে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাঁহাকে সত্যতোষ লবও যথার্থ হিন্দু বলিয়া স্বীকার করিতে আমরা সঙ্কীর্ণ নহি।

এই বিশ্বপ্রয়োদীপনী সভা কর্তৃক প্রকাশিত প্রবন্ধাবলীর সন্মালোচনার উপসংহারে ভক্ত্যার ভুক্ত-রূপেন :—

"যখন আমরা আমাদিগের চতুর্দিকে নেত্রপাতে করি এবং দৃষ্টিগোচর করি যে, স্বর্গকে অবজ্ঞা করিয়া এবং পৃথিবীকে কলঙ্কিত করিয়া, পরমেশ্বরে অবমাননা করিয়া এবং মানবাত্মাকে কলুষিত করিয়া, অসংখ্য মানবমতলীর দ্বারা সেবার্জনার নামে নানাপ্রকার পৈশাচিক অভ্যাস, অর্থহীন অহুতান এবং শিকলবোচিত ক্রিয়াকলাপ সংসাদিত হইতেছে তখন অতি প্রাচীনকালে হইতে প্রচলিত বাহুবীর অবনতির হুসংস্কারের দৃষ্ট-নিপত্ত হইতে যুক্তিপ্রয়োগী বিশ্বপ্রয়োদীপনী সভার সভাপনের এই প্রাথমিক প্রচেষ্টা সম্বর্জন করিয়া বিশ্ববিষিষ্ট বা বিচলিত না হওয়া অসম্ভব। ইহা নিশ্চয়ই উগ্রতির একটি সোপান এবং হুগপরিবর্তনকারী করেকটি মহাশক্তির অস্তিত্ব ও ক্রিয়ার পরিচায়ক। এক কালের নির্জীবতার পরে নব-জীবন-প্রবাহের ক্ষীণতম আশ্রা দেখিয়া কে না আনন্দিত হইবেন? যুগ্য পৌত্তলিকতার পঙ্কিলভূমি হইতে উত্থান করিবার ইচ্ছা, ক্রিয়াকলাপের অর্থহীন অস্তিত্ব হইতে নিষ্কৃতি পাইবার ইচ্ছা, আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক নাস্তিকতার যুক্তিবিকৃততা প্রচার করিবার আকাঙ্ক্ষা, দ্বন্দ্বনিহিত বন্ধুত্ব ও নৈতিকবৃত্তিসমূহের ক্ষুধি প্রদানের

ইচ্ছা (ইহাই বার্থ ভগবন্ত) এবং অত্যন্ত পৌত্তলিক জাতির সম্মুখে
ইশ্বরকে পরমাত্মা ও সত্যরূপে পূজা করিবার ইচ্ছা—এই সকল আকাঙ্ক্ষা
যতই অল্পমাত্রায় বিস্তারিত থাকুক, যেহেতু তাহেই পোষণ করা যাউক, তেজস
তাহেই অনুসৃত হউক, ভবিষ্যৎ সুদিনের আশার সঞ্চার করে । ”

‘কলিকাতা রিভিউ’ পত্রিকার ৩৪ভাগে ৫ম সন্খ্যার রেভারেন্ড কুকমোহন
বন্দ্যোপাধ্যায় “The Transition states of the Hindu mind” নামক
একটুকু তত্ত্ববোধিনী সভা ও এই বিশ্বপ্রমোদীপনী সভার কার্যাবিবরণীর তুল-
নায় সমালোচনা করিয়া শেষোক্ত সভার উদারতার ও উচ্চতর আদর্শের
জুয়সী প্রশংসা করেন ।

কিন্তু হৃৎকের বিষয়, এই সভা অধিককাল স্থায়ী হইল না এবং ইহাতে দেশের
যেহেতু কল্যাণ সম্ভাবিত হইয়াছিল তাহা আশানুযায়ী সাধিত হইল না । ইহার
কারণ এই যে, ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে কর্তৃত্বত কিশোরীচাঁদ, যিনি এই সভার প্রাণ-
বল্লভ ছিলেন, রাজ কর্ম্মানুগোষে কলিকাতা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন এবং
আমাদের দেশের অন্তান্ত যে সকল মঙ্গলকর অনুষ্ঠান একজন ব্যক্তির
একক প্রযত্ন, উত্তম ও আন্তরিকতার উপর নির্ভর করে, সে সকল যেহেতু উক্ত
ব্যক্তির তিরোধানের সহিত বিলুপ্ত হয়, এই সভাও সেইরূপ বিলুপ্ত হইল ।

যখন কিশোরীচাঁদ অদমা উৎসাহের সহিত বর্ষবিজ্ঞানানুষ্ঠানে ব্যাপৃত
ছিলেন তখন তিনি দেশের অন্যান্য কল্যাণকর বিষয়ের প্রতি উদাসীন
ছিলেন না । ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে আমাদের দেশের রাজনীতিক আন্দোলনের
ইতিহাসে একটি চিত্রবরনীর বৎসর । এই বৎসরে বিখ্যাত ব্যারকানাথ ঠাকুর
পালিয়ারমেন্টের অন্ততম সদস্য, বিখ্যাত বাগ্মী ও ভারতবিশেষজ্ঞ মহাত্মা জর্জ
টমসনকে বিলাত হইতে এই দেশে আনয়ন করেন । ইনি রামমোহন রায়ের
অন্যতম বন্ধু মিষ্টার আড্যাম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ইংলণ্ডীয় ভারতসভার (British
Indian Society) একজন প্রধান সভ্য ছিলেন । ভারতসভ্যের তথ্যসংগ্রহ-
হানসে এবং দেশবাসিগণকে রাজনীতিক শিক্ষা প্রদানার্থ ইনি এতদ্বিধে
আগমন করিয়া Chuckerburty Faction = নামে অভিহিত ভারতচাঁদ

Friend of India সম্পাদক Mr. Marshman হিন্দুকলেজে শিক্ষিত
নব্য সংস্কারকগণকে উপহাস করিয়া Chuckerburty Faction নাম প্রদান
করেন ।

চক্রবর্তী প্রমুখ নবাবজদিগের নিকট রাজনীতিক শিক্ষাপ্রদ করেকটি অতি উৎকৃষ্ট বক্তৃতা প্রদান করেন। প্রচাম্পদ পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী বলেন, “যেমন চুয়ুকে লোহা লাগিয়া যায়, তেমনি রামগোপাল ঘোষ, তারারচাঁদ চক্রবর্তী, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি লর্ড টমসনের সহিত মিশিয়া গেলেন।”

কৌলদারী বালাখানায় প্রবৃত্ত ইহার করেকটি বক্তৃতার উল্লেখ করিয়া Friend of India সম্পাদক মার্শম্যান বলেন, “এখন দুই দিকে বন্ধ-
ধ্বনি হইতেছে; পশ্চিমে বাংলাহিসারে ও কলিকাতায় কৌলদারী বালাখানার টমসনের বক্তৃতা এতদেখিয়া শিক্ষিত যুবকগণকে এক নূতন কণ্ঠক্ষেত্র প্রদ-
র্শন প্রদাইল।” সে বক্তৃতাও কিরণ ছন্দোমুগ্ধকারিণী! রাজা দিগম্বর
মিত্রের চরিতে প্রচাম্পদ ভোলানাথ চন্দ্র লিখিয়াছেন, “বীহারী পালিয়া-
মেটের অন্যতম সভা লর্ড টমসনের বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছেন তাঁহার।
পালিয়ামেন্ট সভায় বক্তৃতা কিরণ তাহার পরিচয় পাইয়াছেন। ডেভিড
হেয়ার এ দেশে যে ক্ষেত্র প্রবৃত্ত করিয়া বিদ্যাছিলেন, লর্ড টমসন তাহাতে
রাজনীতিক শিক্ষার বীজ বপন করিলেন। তাঁহার স্বদেশীয়গণ তাঁহাকে
‘অভাবমোচয়িতা টমসন’ নামে অভিহিত করিয়া থাকিতে পারেন;
কিন্তু এতদেশে রাজনীতিক সভাসমূহের জন্মদাতা বলিয়া তিনি আমাদের
বন্যবাদভাজন।”

বলা বাহুল্য বিংশতিবর্ষীয় যুবক কিশোরীচাঁদও এই Chuckerburty
Factionএর মধ্যে থাকিয়া টমসনের সহিত পরিচিত হইলেন এবং তাঁহারই
নিকট রাজনীতিক শিক্ষার প্রথম পাঠ গ্রহণ করিলেন। টমসনের বক্তৃতার
কলে রামগোপাল ঘোষ, তারারচাঁদ চক্রবর্তী, চন্দ্রশেখর দেব, প্যারীচাঁদ ও
কিশোরীচাঁদের মধ্যে ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ২০ শে এপ্রিল দিবসে বঙ্গদেশে ব্রিটিশ
ইতিহাস লোসাইটী স্থাপিত হয়। টমসন ইহার সভাপতি ও প্যারীচাঁদ ইহার
সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন। ১৮৪২—৩ খৃষ্টাব্দের Bengal Spectator পত্রে
দেখা যায় যে, কিশোরীচাঁদ এই সভার অধিবেশনে মধ্যে মধ্যে প্রস্তাবাদি
উত্থাপিত করিতেন।

এই সময় জন সালিভ্যান (John Sullivan) নামক একজন যাত্রাক
নিবিলিয়ান ইংলণ্ডে East Indian Stockএর সম্বন্ধিকারিগণের নিকট
প্রস্তাব করেন যে, ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের Charter Actএর ৮৩ম ধারা অনুসারে
পরিবর্তিত করা হউক যে, শিক্ষিত ভারতবাসীগণকে শাসনকার্যে নিয়োজ

করা যাইতে পারিবে। আনাদের ত্রিটীণ ইতিয়া গোসাইটীও এই সময়ে দেশবাসিগণের কার্যক্ষমতাসম্বন্ধে বিস্তর হুজি প্রদর্শিত করিয়া একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। উক্ত সভার সমস্তগণ টাউনহলে একটি সভা করিয়াও সালিস্তানকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া একটি অভিনন্দন পত্রে প্রেরণ করেন। রামগোপাল বোষ গ্রন্থ অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তিই এই সভায় যোগদান ও বক্তৃতা দি করেন। কলিকাতার ভদ্রানীক্টন High Sheriff মিষ্টার অ্যাডাম ফেরী এসমিথ এই সভায় সভাপতিত্ব করেন। ১৮৪৩ খৃঃ অক্টোব ২৩শে এপ্রিল তারিখের Bengal Harkuru and India Gazette পত্রে এই সভার যে কার্যাবল্যগণী প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা হইতে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত অংশ হইতে দৃষ্ট হইবে যে, কিশোরীচাঁদও এই সভায় একটি প্রস্তাব বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন :—

“Raja Burodacant Roy moved the second Resolution.

‘That the following address be adopted and signed by all favorable to its object and that it be then forwarded to England for presentation to Mr. Sullivan.’ Baboo Kissory Chand Mittra rose to second the resolution. We will give his able speech on a future occasion.”

সাধারণ প্রকাশিত সভায় কিশোরীচাঁদের এই বোঝায় সর্বপ্রথম বক্তৃতা। দুঃখের বিষয়, আমরা এই বক্তৃতাটি সংগ্রহ করিতে পারি নাই এবং এই বিষয়ের পাঠকগণের পৌকুহগনিব্রতি করিতে অক্ষম।

১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ১০ অক্টোবর দিবসে লর্ড হার্ভিং বাহাদুর তাঁহার শিক্ষাবিসয়ক বিষয়াত অবধারণ প্রকাশিত করেন। ইহাতে প্রকাশ করা হয়, রাজকাৰ্য্যে নিয়োগকালে অশিক্ষিত অপেক্ষা শিক্ষিত দেশবাসিগণকে প্রাধান্য দেওয়া হইবে। শিক্ষিত দেশবাসিগণ এই অবধারণ প্রকাশে তাঁহাদের অকৃত্রিম আনন্দ জ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে ২৫শে নভেম্বর দিবসে ফ্রি চার্জ ইন্সটিটিউশনে একটি বিরাট সভার আয়োজন করেন। ঐ বৎসরের ২৮শে নভেম্বর তারিখের Bengal Harkuru পত্রে এই সভার বক্তৃত কার্যাবল্যগণী প্রকাশিত হইয়াছিল। দেশবাসিগণের শিক্ষার নিমিত্ত বড়লটি বাহাদুরের আন্তরিক ও উৎসাহপূর্ণ সহায়ত্বিত্তি জনা দেশবাসীর কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপনাবলম্বক প্রথম প্রস্তাব রামগোপাল বোষ কর্তৃক উপস্থাপিত হইলে কিশোরীচাঁদ উহার

সম্মুখনে যে সুন্দর বক্তৃতা প্রদান করেন কৌতুকলী পাঠকগণের জন্য যিহে ভাষা উদ্ধৃত করিয়া আমরা এই পরিচ্ছেদ সমাপ্ত করিলে।

Gentlemen, I believe I speak the sense of a large majority of this meeting when I declare that no Governor General came out to India with a stronger conviction that the true and legitimate object of Government is the happiness of the governed than Sir Henry Hardinge, and that no administration has opened under happier auspices than Sir Henry's. His Excellency has begun his Government by recognizing the paramount duty of educating the people and is at this moment, I have reason to think, engaged in the consideration of several important measures with reference to education which will be, ere long, adopted. The Resolution of 10th October is obviously, a practical recognition of the great truth that education is the grand remedial agent for regenerating and elevating our country. That ignorance is the root of all the evils she is labouring under, cannot be doubted. You talk of the diabolical system of Mofussil Police. You talk of the crushed and prostrate energies of the great mass of your countrymen, and of their squalid misery and destitution. I admit and deplore these facts. I seek not to apologize for that cold apathy to all but the animal wants of life which characterizes them. I disguise not from myself that ages of misrule have extinguished all generous aspirations in their breasts. But educate the people and you will find them manfully resisting the oppressions of the Zemindar. Educate the people and they will cease to be victimised by the Daroga. Educate the people and they will burst asunder these fetters by which they are now bandaged and trampled upon. The clear benevolence and enlightened statesmanship which have

dictated this resolution cannot be sufficiently appreciated. The practical operation of it will be fraught with results of the last importance to our country at the same time that it would benefit the State largely by the introduction of men of superior intelligence and moral integrity into those offices which are now held by those who, as it is generally expressed, make the best of them ; it cannot fail to subserve most powerfully the great cause of education. Among the formidable obstacles which oppose themselves to the progress of education in our country, the absence of all connection between education and pecuniary success in the world is one of the principal. Why is it that the generous and enlightened efforts of our rulers to disseminate its blessings in the North-Western provinces have resulted in, I may almost say, utter failure and have been crowned with a large measure of success in Calcutta and its vicinity ? Why ?—but because an acquaintance with English, and the knowledge of which it is the vehicle, is not, in the North-West, as it is, in some degree, in Calcutta, a passport to wealth and distinction. I hail therefore this resolution as, by recognizing the claims of educated, above those of uneducated, natives to Government employ, it cannot but further the mighty work of moral and intellectual enlightenment of our countymen. The Resolution, I have the honor of seconding, embodies our thanks to the Governor General. By adopting it, you will show and convince your friends here and elsewhere, that whatever might be the faults of your national character, ingratitude to your benefactors, or an incapacity to appreciate their exertions, is not one of them.

ঐশ্বর্যনাথ বোস ।

আবার আসিবে কবে ?

—:—:—

সেদিন যখন পাড়ালে আমার ছুয়ায়
 ভিখারীর বেশে, চিনিতে পারিনি সখে !
 যৌবনে তবে ভেসেছি সুখের কোয়ায়ে,
 সম্পদময়ে বেধেও দেখিনি চোখে ।

আজ সমাগত হ'ল যত হাসি খেলা,
 জীবন প্রান্তে ঘীরে পড়ে এল বেলা,
 যন কালো খেয়ে নামিল আঁবার ঘোর,
 বিধিপরিহাস উষ্টল বজ্রবে,
 আজ ভয়ে ভয়ে জ্বরবন্ধ মোর,
 কাতরে সুখাই আবার আসিবে কবে ?

নব বসন্তে নবীন গীতিকা ছন্দে
 সুখরিত দিবা, মন্দির সমীর ছুটে,
 সমাগত অলি আশ্রয়স্থলপক্ষে
 যৌন বাস্তব প্রকৃতি-বদনে স্টে ;
 তখন আমার ছুয়ায় ঘোঁর বেশে,
 কিশোর ভিখারী, হে সখা পাড়ালে এসে ?

তখনো আমার ভালে নি বুকের ঘোর
 ভাল ক'রে বাঁধা কাটে নি নয়নে তবে ।
 ফিরিলে বিরাগে জ্বরবন্ধ মোর ;
 এখন সুখাই আবার আসিবে কবে ?

কবে তুমি সখা জানের পোনার কাটিটি
 ছোঁয়ায় আমারে আগাবে নিভ্রা হ'তে,
 যারা রাক্ষসী ঘেরে আছে মোর বাটীটি
 হে ভাপস ! কবে আমারে তুলিবে রখে,

কবে পুনঃ সখা আশার দুয়ার দেনে

শত্রু নাশিতে পাড়াইবে ত্রাণবেশে,

পুনঃ কবে সখা

কাটিবে বিশ্বভোর

কবে বিদগ্ধ

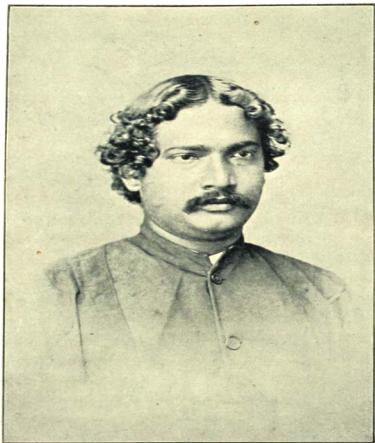
হেরিবে সমাস কবে

কদরসকল কদরবকল এমার ।

আশাতে আশারে আশার আসিবে কখন ?

ত্রি-লিঙ্গী-মোহন সুখোপাধ্যায় ।

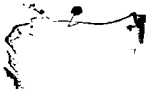
আর্য্যাবর্ত



নিদাঘ ।

—:~:—

এসেছে নিদাঘ, মলয়-মাকুতে
মাথায়ে অনলজ্বালা ;
দীপ্ত-দহনে দহিছে ধরনী
হবির ময়ূখমালা ;
চকিত-দাহিনী-দীপ্ত-বচিত
যেথের কেতন তুলি' ;
আসিছে স্বপ্না প্রাণেরপারে
উড়য়ে ধূসর ধূলি ;
সুকার সরসী-মলিল, কুসুম
ঝরি' পড়ে তরুতলে ;
ধরনীর নব যৌবনশোভা
ফুরাইছে পলে পলে ;
চিকন স্রাব পানপ-পত্র
ধূসর বর্ণ ধরে ;
নীরব বিহগ ছায়ামুদীতল
পাদপের শাখা'পরে ;
দড় সগনে তাসিয়া কেবল
পিপাসাকাতর স্বরে—
ঝুটিঝুটি মাগিছে চাতক
পীড়িতা ধরনী তরে ;
বিলম্বমুখের রজনী
তপন-তপ্ত দিন ;
ভটপরিসরবাসুমাঝে বধে—
তটিনীজীবন স্মরণ ;
জ্ঞান অবসানে মমি' বধু বাঁধে
তুলসীর শিরে ঝরি ।
এসেছে নিদাঘ আসিবে বরষা
বহিরা জীবন-বারি ।



অশ্রু ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

জ্ঞানোদঘেব ।

অশোক হৃৎতীর ছই হাত তুলিয়া ও মাথাইয়া পরীক্ষা করিল ; বলিল, “জল নাই” ।

হুগোপীয় হৃৎক বলিল, “বোধ হয়, কড়ে নৌকা উলুগাইয়া গিয়াছিল ; জলোচ্ছ্বাস রমনীকে বেগে কূলে প্রকিণ্ড করিয়াছে । সেই আঘাতই সংজ্ঞা-লোপের কারণ । কিন্তু দেখে জীবন আছে কি ?”

অশোক আবার পরীক্ষা করিয়া বলিল, “জীবন বাক্য অসম্ভব নহে ।”

“বোধ হয় নাই ; থাকিলে কি এতক্ষণ সংজ্ঞা ফিরিত না ?”

“না । এতক্ষণ সিক্তবস্ত্রে সিক্ত ভূমিতে পতিত বাক্য সংজ্ঞাশাভের পক্ষে অসম্ভব নহে ।”

“এখন কি করিবে ? জাগাজে ডাক্তার নাই ?”

জাহাজের কেরানী বলিল, “না । এ জাহাজে ডাক্তার থাকে না ।”

অশোক বলিল, “আমি একটু ডাক্তারী জানি । ইহাকে শুষ্ক বস্ত্রে আচ্ছাদিত করিয়া, নিকটে গরম জলের বোতল রাখিয়া, গরম কাপড়ে ঢাকিয়া দিতে হইবে ; আর একটু বলকারক ও উত্তেজক ঔষধ সেবন করাইতে হইবে । ঔষধ আমার কাছে আছে ।”

হুগোপীয়া মহিলাটি ততক্ষণে সংজ্ঞালুপ্তা রমনীগ্র পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন, তিনি বলিলেন, “তাছাই করা বাড়িক ।”

অশোক ও হুগোপীয় হৃৎক হৃৎতীর দেহ বহিরা অশোকের কামরায় আনিয়া শয্যায় শায়িত করিল । অশোক ক্ষিপ্র হস্তে বাল্ল হইতে কতকগুলি কাপড় তোরায়ে প্রকৃতি বাহির করিয়া দিল । জাহাজের বাটমার এক কেটল গরম জল দিয়া পেল ।

হুগোপীয়া মহিলা সযত্নে হৃৎতীর অঙ্গ মুছাইয়া বেশপরিবর্তন করাইয়া আপনাব একটি জামা পরাইয়া বামীকে ও অশোককে ঢাকিলেন । অশোক ততক্ষণ সোডাওয়াটারের বোতলে গরম জল পূরিয়া মাসে ঔষধ ঢালিয়া অপেক্ষা করিতেছিল । সে বাইরা হৃৎতীর পার্শ্বে বোতল রাখিয়া তাহাকে রাপ দিয়া ঢাকিয়া দিল । ঔষধ পান করাইতে বাইরা সে দেখিল, হৃৎতীর দন্ত দন্তে

বস। সে একখান চামচ দত্তপংক্তিঘরের মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া আর একখানি চামচ দিয়া একটু ঔষধ সুবতীর মুখে দিল। ঝানিকটা ঔষধ যেন উদরস্থ হইল। অশোক বলিল, “ঐচ্ছিয়া উঠিলে।”

জাহাঙ্গীর কামরা ক্ষুদ্র—ছুই দিকে ছুইখানি বেক; যথো চেয়ার পাতিবার স্থান নাই। অত্যা অশোক মেজের কার্পেটের উপর বলিয়া সুবতীর অবস্থা লক্ষ্য করিতে লাগিল। চুরোপীয়া মহিলা কিছুকণ তাহার নিকটে খসিয়া রহিলেন, তাহার পর উঠিয়া ঘাইলেন; অশোক একা রহিল।

প্রায় এক ঘণ্টা কাটিয়া গেল। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে অশোকের সহ-যাত্রীদ্বয় করবার আশিয়া সুবতীর অবস্থার সংবাদ লইয়া বাটলেন। অশোক করবার তাহাকে ঔষধ দিল। তাহার পর সুবতীর দেহ ঔষধ কাপিয়া উঠিল। অশোক রূপ তুলিয়া দেখিল, নিশাসপ্রবণে সুবতীর বক্ষ স্পন্দিত হইতেছে; যেন কোয়ারের জল প্রথম স্থির নদীতে প্রবেশ করিয়া তাহাকে চকল করিয়া তুলিতেছে। অশোকের হৃদয় আশায় ও আনন্দে চকল হইয়া উঠিল।

তাহার পর সুবতী চক্ষু মেলিল, যেন নিশার শিশিরমণ্ডিতা কমল প্রভাতালোকে ফুটিয়া উঠিল। চক্ষু মেলিয়াই সুবতী জিজ্ঞাসা করিল, “আমি কোথায়?”

এই প্রশ্নে অশোক বিবম বিপন্ন হইল। এ অবস্থায় সুবতী আপনার অবস্থা উপলব্ধি করিয়া হরত অধীরা হইবে—হরত মুহূর্ত্তা হইবে। আবার সে যুবক—একক। এ অবস্থায় তাহাকে কিরূপে সযোজন করিবে, কি বলিয়া সাস্তুনা দিবে? কিন্তু সুবতীর প্রশ্নে উত্তর দিতে ত বিলম্ব করা চলে না। সে খামিয়া উঠিতেছিল। অবশেষে সে প্রবীণের মতই গভীর ভাবে বলিল, “ভূমি জাহাঙ্গে। পরে সব শুনিও। এখন চকল হইও না। ঔষধটুকু খাও।” এই বলিয়া সে চামচে করিয়া সুবতীকে একটু ঔষধ দিল। ঔষধ পান করিয়া সুবতী জিজ্ঞাসা করিল, “আবার সন্ধ্যা কাহাকেও পাওয়া গিয়াছে কি?”

অশোক বলিল, “ভূমি চিন্তা করিও না। সব পরে শুনিবে।”

সুবতী দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল। অশোক হাঁক ছাড়িয়া ঐতিল। সে চিহ্ন, সুবতীর ললাটে বিন্দু বিন্দু স্বর্ষ দেখা দিতেছে। সে জিজ্ঞাসা করিল, “বড় গরম যোধ হইতেছে?”

সুবতী বলিল, “হঁ।”

অশোক পরম জলের বোতলগুলি সবাইরা লইল ; তাহার পর বলিল, “তুমি একটু ঘুমাও।” সে তাহার সহযাত্রীদ্বয়কে সংবাদ দিতে গেল, যুবতীর লুপ্ত সংজ্ঞা কিরিত্যা আসিয়াছে। সন্নিয়া মল্লিকাটি যুবতীকে দেখিতে আসিলেন। তিনি ভাঙ্গা হিন্দীতে যুবতীকে সে কেমন বোধ করিতেছে জিজ্ঞাসা করিলে, যুবতী বিস্ময় ইংরাজীতে উত্তর দিল, সে ভালই বোধ করিতেছে। মহিলাটি বিস্মিতনেত্রে অশোকের দিকে চাহিলেন ; তাহার নয়নেও বিস্ময় সূচিয়া উঠিতে ছিল। সে বৃষ্টিতে প্যারিল, যুবতীর বেশ দেখিয়া সে যে অসুস্থমান করিয়াছিল যুবতী হিন্দু বা মুসলমান নহে, সেই অসুস্থমানই সত্য। সে জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি কি গুটান ?”

যুবতী উত্তর দিল “না। আমার পিতা ব্রাহ্মমতাবলম্বী ছিলেন।”

অশোক যুরোপীয়া মহিলাকে বলিল, “আমরা একই বর্ণাবলম্বী।”— যুবতীকে জিজ্ঞাসা করিল, “তোমার পিতা কোথায় ?”

“বহু দিন হইল তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।”

“তোমার কে আছেন ?”

যুবতী বলিল, “কেহই নাই।”

যুরোপীয়া মহিলাটি জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কি গত রাত্রিতে নৌকায় বাইতেছিলে ?”

যুবতী বলিল, “হঁ। সেই সময় বড় উঠে। আমি কি কূলে পড়িয়া ছিলাম—না জলে ভাসিয়া বাইতেছিলাম ?”

“কূলে ছিলে।”

“আমি একাই ভিলাম ?”

“আমরা এই বান্ধটি পাইয়াছি”—বলিয়া অশোক যুবতীর হাত বান্ধটি টানিয়া দেখাইল।

“ওঃ !” বলিয়া যুবতী আবার চক্ষু যুগ্মিত করিল। যেন তাহার ভাবনা ভাবার প্রকাশিত হয় না।

অশোক ও তাহার সহযাত্রী যুবতীকে ঘুরাইতে বলিয়া চলিয়া গেলেন।

ঐ প্রায় এক ঘণ্টা পরে অশোক আবার কায়রায় প্রবেশ করিল। যুবতী তখন শয্যার উপর বসিয়া ভাবিতেছিল। তাহার অঙ্গে যুরোপীয়া মহিলায় পাড় লোহিত বর্ণের জাকেট ; আঙ্গুলের ত্বক যখন ভাবে লজ্জকে আচ্ছাদিত করিয়া থাকে সেই পিন্ড আবরণ তাহার দেহকে তেমনই অবিচ্ছিন্ন ভাবে

আবৃত্ত করিয়াছিল। সে আবরণে তাহার স্বগঠিত যৌবনপূর্ণতা প্রাচুর্য দেহের বস্ত্র প্রকাশ পাইতেছিল। সে বেহে পরিপূর্ণতা আছে; কিন্তু বাহ্যিক নাই—সে বকে মাতৃদেহের অক্ষয় ভাঙার না থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা প্রেমের লীলাভূমিরই উপদ্রুত। তাহার পাঁচবর্ষ ওষ্ঠাধরে রক্তরাগ দেখা দেয় নাই; কিন্তু তাহার মুখে তাহার জ্যাকটের বর্ণ যেন প্রতিফলিত হইয়া রক্ত-পুষ্পতার অভাব দূর করিয়াছিল। দীর্ঘ—মুক্ত কেশরাশি তখনও শুকাই নাই। অশোক ককে প্রবেশ করিলেই যুবতী মুখ তুলিয়া তাহার দিকে চাহিল। অশোক বিব্রত বোধ করিল। সে বতাবতঃ একটু লজ্জা হীন; কখনও অপরিচিতা যুবতীর সঙ্গে বাগ্যালাপ করে নাই। কিন্তু অতর্কিত ঘটনানুক্রম তাহাকেই আকৃষ্ট করিয়া এই অপরিচিতা বিপদা যুবতীর নিত্য নিকটে আনিয়াছে। তাই সে বিশেষ চেষ্টা করিয়া প্রবীণত্বের ভান করিয়া যুবতীর সঙ্গে কথা কহিতেছিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি কোথায় বাইবে?”

যুবতী বলিল, “তাই ভাবিতেছি।”

অশোক আবার বিব্রত হইল। যুবতী যদি কোন একটা নির্দিষ্ট স্থানের নাম করিত, তবে অশোক তাহাকে তথায় পাঠাইবার ব্যবস্থা করিত। কিন্তু তাহা হইল না। তখন সে অত্যন্ত পঙ্খীর ভাবে বলিল, “যদি তুমি আমার পরামর্শ লও, তবে আমি বলি, তুমি কলিকাতায় চল।”

অশোকের কৃত্রিম গাঙ্গীর্ষ্যে এই সময়েও যুবতীর চকুতে ও মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। অশোক লক্ষ্য করিল, সে মুখে রমণীয় কোমলতার সঙ্গে পুরুষোচিত ভাব সঙ্গত। যুবতী জিজ্ঞাসা করিল, “এ জাহাজ কি কলিকাতা বাইবে?”

অশোক বলিল, “না; কলিকাতা হইতে অদিকেছে।”

“তবে কোথা হইতে কলিকাতা বাইবার সুবিধা।”

“জাহাজ কল্যা প্রত্যবে যে ঘাটে ভিড়িবে আমি তথায় নামিব। তথা হইতে রেল ষ্টেশন বহুদূর নহে।”

“তুমি কি কল্যাই কলিকাতায় ফিরিবে?” যুবতী যেন ইচ্ছা করিয়া—তাহার গাঙ্গীর্ষ্যকে বিদ্রুপ করিয়া অশোককে “তুমি” বলিল।

“আমি জমীদারীতে যাইতেছি। আমার তথায় এক পক্ষ থাকিবার কথা। কিন্তু আমি তাহা না করিয়া কল্যাই ফিরিয়া যাইব।”

“কেন? আমার জন্য?”

“হাঁ।”

“আমার জন্য তোমার কাণ ফেলিয়া ঘাইবার প্রয়োজন নাই। তোমাকে যথেষ্ট কষ্ট দিয়াছি ; আর ঘিতে চাহি না।”

“এ বলিয়া তোমাকে একা ঘাইতে দিতে পারি না।”

“তবে তোমার কার্য্য শেষ হওয়া পর্য্যন্ত আমি অপেক্ষা করিব।”

“নামিয়া অথবা সুখিয়া সে বিষয়ে কর্তব্য স্থির কর্তব্য ঘাইবে।

সুখী কিছু বলিল না।

অশোক জিজ্ঞাসা করিল, “তোমার নাম কি?”

সুখী—বলিল, “অশ্রু।”

অশোক কামরা হইতে বাহির হইতেছিল। সুখী জিজ্ঞাসা করিল,
“তোমার নাম।”

“অশোক।”

জাহাজের আর দুইটা কামরা খালি ছিল। তাহারই একটার আপনার লম্বা পাতিবাস জল ভূতান্তে উপদেশ দিয়া অশোক জাহাজের সম্মুখভাগে ঘাইয়া দেখিল, অশ্রু ওখায় বসিয়া আছে। পার্শ্ব হইতে দৌল আসিয়া তাহার মুখে পড়িয়াছে। সে পার্শ্ব চেয়ারে উপবিষ্টা যুরোপীয়া মহিলার সঙ্গে কথা কহিতেছে। একটা কি কথা লইয়া দুইজনে একটু তর্কের মত হইতেছে। অশ্রুকে এই বিপদের মধ্যে এমন স্থিরভাবে তর্কে মনোনিবেশ করিতে দেখিয়া অশোক একটু বিস্মিত হইল—সঙ্গে সঙ্গে অনেকটা নিশ্চিন্তও যে না হইল এমন নহে। সে তাহার পার্শ্ব আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “পরী এখন ভাল বোধ হইতেছে?”

অশ্রু মুখ তুলিয়া তাহার দিকে চাহিল। অশোক দেখিল, রবিকরে তাহার কর্ণভিত্তর হীরকের দীপ্তির অপেক্ষাও তাহার নয়নের দীপ্তি উজ্জ্বল। অশ্রু বলিল, “হাঁ।” তাহার পর সে আবার অসমাপ্ত তর্কে যোগ দিল। অশোক দাঁড়াইয়া তাহার কথা শুনিতে লাগিল। তাহার কাছে এই অপরিচিতা সত্য সত্যই নিজের রহস্যময়ী—আর তাহার রহস্য যেন ক্রমেই বনীভূত হইয়া উঠিতে লাগিল।

রাত্রিতে শয়ন করিতে ঘাইবার পূর্বে অশোক অশ্রুকে বলিল, “প্রভু! যেই আশ্রয়দিকে জাহাজ হইতে নামিতে হইবে।”

অশ্রু বলিল, “হাঁ।”

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

—:—

বিদেশে ।

পরদিন প্রাত্বে জাহাজ ভিড়িবার সময় অশোক আসিরা দেবিল, অশ্রু নামিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে। অশোকের কৃত্রিম স্রাবাদি শুধাইয়া লইতে আসিলে অশ্রু তাহার সঙ্গে সশ্রু কিনিষ শুধাইয়া লইল; তাহাতে তাহার কোনরূপ বিঘা বা সঙ্কোচ দেখা গেল না।

অশোকের আমন্ত্রণের মৈত্র মহাশয় ঘাটে উপস্থিত ছিলেন। তিনি অশোককে দেখিরা মায়ুণী খিওমুখে স্বাগত-সম্ভাষণ করিলেন। কিন্তু অশোকের সঙ্গে অশ্রুকে দেখিরা তাহার মুখের হাসি মুখেই মিলাইয়া গেল, নয়নস্বয় বিস্ময়ে কিছু অতিরিক্ত বিস্কৃতিত হইল। তিনি অশ্রুর দিকে চাহিয়া, দৃষ্টি নত করিরা বলিলেন, “পাকী বেহাগা আছে।” অশোক অশ্রুর দিকে চাহিল। অশ্রু জিজ্ঞাসা করিল, “কত দূর যাইতে হইবে?” অশ্রুর একটি সুরমা হস্তা দেখাইয়া মৈত্র মহাশয় বলিলেন, “খুজাই দুর। ঐ বাড়ী দেখা যাইতেছে।” অশ্রু বলিল, “তবে আর পাকী কেন?” সে অশোকের সঙ্গে হাঁটিয়া চলিল; মৈত্র মহাশয় লব দেখাইয়া চলিলেন; পাকী লইয়া বাহকগণও সদর কাছারীর দোবে চোবে সঙ্গে চলিল। মৈত্র মহাশয় বদ্ধ চিন্তিত হইলেন। যাহাতে অশোকের কষ্ট না হয় সেইজন্য তিনি আগমন-মাত্র তাহাকে সদর কাছারীতে পাঠাইবার সুবস্থা করিরা রাখিয়াছিলেন। ইহার একটু বিশেষ কারণ ছিল। শহরের গৃহে একাংশ প্রয়োজন হইলে ব্যবহার করিবার এইরূপ ব্যবস্থা করিরা বিপিনবিহারী অরুণিষ্ট অংশে আম-বোজারকে বাস করিতে দিয়াছিলেন। সে আশ্র অনেক দিনের কথা। ইহার মধ্যে যখন কখনও বিপিনবিহারীর ও তাহার পর অশোকের সে গৃহে আগমনের কারণ ঘটে নাই, তখন মৈত্র মহাশয় সেই প্রাচীন ব্যবস্থাটা বহাল রাখা নিম্নপ্রয়োজন যেন করিরা সে অংশটা ভাড়া দিয়া আপনাতঃ কিছু আমদানি করিতেছিলেন। গৃহসম্ভার অধিকাংশ অর্থে রূপান্তরিত হইয়া মৈত্র মহাশয়ের টাকার সঙ্গে মিলাইয়া গিয়াছিল। অশোক যে সম্ভাগ্যতাই জমিদারী দেখিতে আসিবে, ইহা তিনি করনাও করিতে পারেন নাই। কিন্তু এবার সেই অল্টন ঘটিল। তথাপি মৈত্র মহাশয় শঙ্কিত হইলেন না। তিনি

ভাবিলেন, অশোক আসিযামাত্র তাহাকে কাছারীতে পাঠাইয়া দিবেন
বাড়ীর বিষয় সে জানিতেও পারিবে না। বুদ্ধি থাকিলে সব ব্যবস্থাই করা
যায়। কিন্তু তিনি ত কেবল একখানি পাকী রাবিয়াছেন! এখন
উপায় কি ?

অশোককে ও অক্ষকে বৈঠকখানায় তৈলমল্লিন ফরাশে বসাইয়া
মৈত্র মহাশয় বলিলেন, “অনেকটা পব বাইতে হইবে। বিলম্ব হইলে কষ্ট
হইবে। আমি আর একখানা পাকী আনাই।”

অশোক বলিল, “আমি আজ যাইব না।”

মৈত্র মহাশয় এইবার বিপদ পণিলেন, যুগ্মে বলিলেন, “সে ত আমার
নৌভাগ্য। তবে উপরের ঘরকরটা পরিকার করাইতে বলি।”

অশোক বলিল, “আমিত সে কথা লিখিয়াই দিয়াছিলাম।”

বিপদ বাড়িতে চলিল। কিন্তু উপস্থিতবুদ্ধি মৈত্র মহাশয় বলিলেন,
“আপনি এ ব্যতীর থাকিবেন না বলিয়া তেমন পরিকার করাই নাই; আর
আমার একজন আত্মীয় পৌড়িত হইয়া একটা ঘরে আছেন বলিয়া একটু”—

বাধা দিয়া অশোক বলিল, “আমার অধিক ঘরের দরকার কি ? তাঁহাকে
নাড়িয়া কাব নাই”।

মৈত্র মহাশয় অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া গৃহের আশ্রয় অধিকৃত অংশের
বিতলভাগ যথাসম্ভব নীত্র নুত করিতে চলিলেন। অশোকের আদেশে তাহার
কৃত্যাত্মক মৈত্র মহাশয়ের সঙ্গে গেল।

ঘরের বাহিরে আসিয়াই মৈত্র মহাশয় অশোকের খাস খানসামা পরি
ওরকে পরিক্রম্বেক জিজ্ঞাসা করিলেন, “বাঘুর বিবাহ হইল কবে ?”

পরি বলিল, “হয় নাই ও ?”

মৈত্র মহাশয় বিস্মিত ভাবে বলিলেন, “সঙ্গে বৌমা নহেন ! তবে কে ?”

পরি বলিল, “আমরা আসিবার সময় পথে জলের ধারে পাইয়াছি।
নৌকাভূবিতে কূলে মরার মত পড়িয়া ছিলেন।”

মৈত্র মহাশয় অবিবাসের হাসি হাসিলেন—“বেটা উড়ে, আমার সঙ্গে
চালাকি !”

তিনি চাকরদ্বিগকে উপরের ঘরে জিনিষ সরাইতে বলিয়া নামিয়া আসিয়া
গৃহিলীকে বলিলেন, “ঘাও উপরে যাইয়া ধরওলা সাফ করাও। এমন বিপদেও
মানুষ পড়ে !”

গৃহিণী বলিলেন,—“কি হইয়াছে ?”

‘ বাবু আজ থাকিবেন ।’

“কিন্তোহ, সন্ধ্যা বোমা ; তুমি বাহিরে বসাইলে কেন ?”

মৈত্র মহাশয় চক্ষু গোলাকার করিয়া অবশ্য বিকৃত করিয়া বলিলেন,—
“বোমা ।”

গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন,—“তবে কে ?”

উত্তেজিতভাবে গৃহিণীর মুখের কাছে হাত বাড়িয়া কর্তা বলিলেন,—
“আমি জানিব কেন করিয়া ? চাকরটা আবার খুব ভৈরবী ; বলে শ্রীমতের
আদিত্যে পথে কুড়াইয়া পাইয়াছে ! কৈ আর কেহ ত পথে এমন মেয়ে
মানুষ কুড়াইয়া পায় না ।”

কর্তার অকারণ ক্রোধে গৃহিণীরও বৈধব্যচ্যুতি ঘটিল ; তিনি বলিলেন,—
“পায় কি না, তাহা কি তুমি গিয়া গিয়াছ ?”

এই কথাটির মৈত্র মহাশয়ের ঘোবনের—এবং ঘোবনের পরেও কিছু
কালের একাধিক দুর্ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত থাকায় তিনি আর কিছু না বলিয়া,
অপেক্ষাকৃত শান্তভাবে গৃহিণীকে বলিলেন,—“এখন যাও, বরগুলা সাফ
করাও । কোণার ঘাই তা’র ঘিরে নাহি ।” যেন তাঁহার উপর অত্যন্ত অত্যা-
চারই অনুষ্ঠিত হইতেছে ।

বাহিরে আসিয়া মৈত্র মহাশয় অশোককে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“তবে
বেচারাদের বিদায় দিতে পারি ?”

অশোক বলিল,—“হাঁ ।”

“কখন আসিতে বলিব ?”

“সে কথা বৈকালে বলিব । আমি হয় ত কলিকাতায় ফিরিয়া যাইব ।”

মৈত্র মহাশয় বাহিরে যাইতেছিলেন । অশোক তাঁহাকে ডাকিয়া বলিল,
“উদ্বিগ্নকে কিছু পারিশ্রমিক দিয়া দিবেন ।”

অশোক তখন যাইবে না ভাবিয়া দোবে চোবে পাগড়ী খুলিয়া নিশ্চিত
হইয়া কচী বানাইবার উদ্ভোগ করিতে গেল ।

মৈত্র মহাশয় বলিলেন,—“তবে সকাল সকাল আহারের আয়োজন
করিতে বলি ।”

অশোক বলিল,—“আহার সন্ধ্যা পাচক ও চাকর আছে ; সব যোগাড়
করিয়া লইবে । আপনি ব্যস্ত হইবেন না ।”

মৈত্র মহাশয় মুখে বলিলেন,—“সেটা কি ভাল হয় ?”—কিন্তু মনে মনে খুশী হইলেন,—হাঁড়ি কেলার দ্বারা বাঁচিয়া গেলেন । কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভাবনা জুটিল—অশোকের পোকরা রাঁধিবে কোথায় ? তিনি গৃহিণীর সহিত পরামর্শ করিতে যাইলেন ।

মৈত্র মহাশয় বয়স হইতে যাইলেই অক্ষ বলিল,—“তুমি কলিকাতায় ফিরিবে কেন ? আমার জন্ত ?”

অশোক বলিল,—“হাঁ ।”

অক্ষ দৃঢ়ভাবে বলিল,—“তাং হইবে না । তুমি কাব করিতে আসিয়াছ । আমি আমার জন্ত তোমাকে কাব ফেলিয়া যাইতে দিব না ।”

“তুমি কোথায় থাকিবে ?”

“এই স্থানেই থাকিব ।”

অশোক ভাবিতে লাগিল ।

এদিকে ঘরের অবস্থা দেখিয়া পরিচরিত পিতা জলিয়া গেল । সে মনোমোহিনীর আচরণে এমনই হইয়া উঠিয়াছিল যে, গৃহে যাইয়া তিষ্ঠিতে পারিত না ; বলিত—“পড়া বেশ”—জবল আর শৃগালের ডাক ; সে তথায় থাকিতে পারে না । বিপিনবিহারী স্বয়ং সৌন্দর্য পোক ছিঙ্গেন ; তিনি গৃহসজ্জা সবই রাখিয়া গিয়াছিলেন । মনোমোহিনী পরিকল্পনা বলিয়া দিয়াছিলেন, “কত জিনিষ ! ইন্দুরে পোকায় নষ্ট করিয়াছে । সব কাড়িয়া মুছিয়া রাখিয়া আসিস ।” পরে সে সকলের চিহ্নও দেখিতে পাইল না । জিনিষের মধ্যে মৈত্র মহাশয়ের সিন্দুক বাস্তু আর কতকগুলি মণিন বিছানা—সেগুলিতে অনেক ছেলে “মাহুৰ” হইয়াছে—তাই বহুবিধ তরল পদার্থের অপ্রীতিকর গন্ধ সেগুলির মধ্যাপত হইয়াছে । সে সব লগাইয়া—দক্ষতাশ্রুট-চূর্ণসংগুলা নিক্ষেপনচিক্কাভিত কক্ষপ্রাচীর ও হস্তাতল দোত করিয়া সে মৈত্র মহাশয়কে বলিল,—“মা বলিয়া দিয়াছেন, ষাট, গদি, টেবল. চেয়ার সবই আছে । সে সব কোথায় ?”

“হাঁ—তা, আছে বৈ কি”—বলিয়া মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে মৈত্র মহাশয় হ্যাঁতাভাঙ্গা—বেতছেঁড়া করখানা চেয়ার এ কোণ ও কোণ হইতে টানিলেন ।

পরি বলিল,—“ওগুলার কি মাহুৰ বসিতে পারে ? ষাট কোথায় ?”

“ঘরেই তা আছে ।”

“ও গদিটাত হাতে ফেনিয়া দিয়াছি ; দুর্গকে প্রাণ ওঠাশত হয়।”

মৈত্র মহাশয় আর কোন কথা বলিলেন না। পরে তাঁহাকে অনাইয়া বলিল,—“দাদাবাবুকে বলিলে ত কিছু হইবে না। বাই কলিকাতায় ; মা'কে বলিয়া একটা প্রতীকার করাইবই।”

অপরাত্রে অশোক মৈত্র মহাশয়কে জানাইল, সে পরদিন প্রভাতে কাছারীতে যাইবে ; অশ্রু এই জানেই থাকিবে—আর তাহার তত্ত্বাবধানের জন্ত পরি থাকিবে। বাহাকে তিনি সন্ধ্যাপেক্ষা ভয় করেন, সেই পরী থাকিবে শুনিয়া মৈত্র মহাশয় দমিয়া গেলেন। সেটার যে কটকটে কথা।

বিছানা কাপড় প্রভৃতি অশোকের সঙ্গে অনাবশ্যক—অতিরিক্ত ছিল। সে কতকগুলি অশ্রুর জন্ত রাখিয়া গেল। তবে তাহার জামা প্রভৃতি ত চাহি। স্থানীয় কোন দোকানে সে সব পাওয়া যাইবে না শুনিয়া অশোক সেগুলার জন্ত কলিকাতায় একটা ঘুরোপীয় দোকানে পত্র লিখিল—সবই অনেকগুলি করিয়া আনিতে দিল—ভরন হিনাবে।

পরদিন প্রভাতে যাত্রার সময় অশোক অশ্রুকে বলিল,—“আমি দুই দিন দিনের মধ্যেই আসিব।”

অশ্রু বলিল,—“না।”

“কেন ?”

“তোমার কাব না সারিখা ভূমি আনিও না। আমার কৃতজ্ঞতার বশ আর বাড়াইও না।”

“কিন্তু তোমার যে অত্যন্ত কষ্ট হইবে ?”

“সেজ্ঞ তাবিও না। আমার জ্ঞত ভূমি তাড়াগাড়ি ফিরিও না।”

তাহার কথার পুরুষোচিত দৃঢ়তা—তাহার পুরুষোচিত মৃদুভাবে অশোক বিম্বিত হইল—বুনি দুঃখ হইল।

ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস ।

পঞ্চদশ অধ্যায় ।

(সর্বস্বনাশের সূত্রপাত)

রাজার দেহান্তর-প্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই অকস্মাৎ জনসাধারণের যোহনিদ্রা ভঙ্গ হইল। রাজমুগ্ধ হস্তে লইয়া দাতক বহুক্ষণ যাবৎ দর্শক-মণ্ডলীর প্রীতি-উৎপাদনের চেষ্টা করিল। পৈশাচিক বৃত্তি সমভাবে সমীচীন রাধিব্যায় নিমিত্ত রাজশোণিত বিন্দুমাঝার চতুর্দিকে নিক্ষিপ্ত হইল। অস্ত্র-ধারী ব্যক্তিবৃন্দের অত্যাচারী রাজরক্তে রঞ্জিত হইল। তথাপি কিন্তু ইতর-সাধারণের পূর্ব্ববৎ আনন্দ বা উৎসাহ পরিলক্ষিত হইল না। বাতাব্যমুক্ত বারিধির জ্বালা প্যারিসের জনসাধারণ দীর ও প্রাশস্ত ভাবধারণ করিল। রাজার বিবাহদময় পরিণাম-দুষ্ঠে তাহাদিগের ক্ষম অহুতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিল। যাহারা ইত্যগ্রে তৎপ্রতি দণ্ডাজ্ঞা-প্রচারের নিমিত্ত অথবা আগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছে, তাহারা এই এখন তাঁহার পবিত্র শ্রুতি-চিহ্ন রক্ষা করিবার নিমিত্ত শব্দেহ হইতে পরিচ্ছদ লইয়া শতাব্দিক যত্নে বিভক্ত করিয়া লইল। যাহারা যথেষ্টাচারী ও প্রজাপীড়ক জানে রাজাকে অশেষ একাধারে লাঞ্চিত করিয়াছিল, তাহারা এই তাঁহার কেশরাশি কপ্তিত করিয়া মহাঅগণের পবিত্র মন্দিরে সংস্থাপিত করিল। মিউনিসিপালিটীর কর্মচারী সত্তার সর্বজন-নিমিত্ত হইয়া সর্বসাধারণের ঘৃণা উৎপাদন করিল। জাতীয় পৈশতগণ লজ্জায় ও কোতো দ্রিয়মাণ হইয়া অবনতমস্তকে বিরসবধনে বস গৃহে প্রত্যাগমন করিল। প্যারিসের মহিলাগণ শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে অস্ত্রবর্ষণ করিতে লাগিলেন। জটনৈক বৃদ্ধ কর্মচারী রাজার দেহত্যাগবার্ত্তা শ্রবণমাত্র দেহ-ত্যাগ করিলেন। জটনৈক কেন-প্রসাধক সেই নিদারুণ হত্যাকাণ্ডের কথা শ্রবণমাত্র আত্মহত্যা করিল। বেনিট নামক পুস্তকবিক্রেতা সেই মর্ম্মভেদী ঘটনার বিষয় চিন্তা করিতে করিতে উদ্ভ্রাণ হইল। বিপদ-সমূহ রক্ত ও রাজপথ পরিত্যক্ত হইয়া প্যারিসনগরী অশ্বাসের জ্বালা ভয়ঙ্কর হুগ্গি ধারণ করিল। *

পাড়কমণ্ডলীর বিকট অগ্নি ও বজ্রবাদী কামানের তৈরব গর্জন-প্রবণে টেম্পল ভবনবাসী রাজপরিবারবর্গ রাজার দেহত্যাগের সংবাদ অবগত

হইলেন। রাজ্যী অচিরে স্বর্গবাসী পতির সহিত সম্মিলিত হইবার নিমিত্ত কৃত্তভাবন ভগবান্‌সমীপে কৃতাজ্জলিপুটে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। দেব-প্রকৃতি পরলোকগত ভর্তৃদেবের উচ্চ আদর্শের অহুসরণ করিয়া তিনি পুস্ত্র-কস্তাকে বলিলেন,—“তোমাদের স্বর্গবাসী পিতৃদেবের নির্ভীকতা এবং অস্ত্রাস্ত্র সঙ্গুণরাশির সর্গদা অহুসরণ করিও। তাঁহার দেহত্যাগের নিমিত্ত কদাপি প্রতিহিংসার যশবর্তী হইয়া কার্য করিও না। অতঃপর কহুঁপকৌশলগণের নিকট আবেদন করতঃ রাজপরিবারবর্গ শোকগরিচ্ছদ সংগ্রহ করিয়া পরিধান করিলেন।

ইতরসাধারণের চিত্তে অকস্মাৎ ভাবান্তর উপস্থিত হইল দেখিয়া জেকবিনগণ সান্তিশয় চিন্তিত ও উৎকর্ষিত হইলেন। অনতিদূর মানবগণ প্রশান্ত মূর্তি ধারণ করিলে তাঁহাদের সক্ষমজ্ঞি বিলুপ্ত হইবে এইরূপ আশঙ্কা করিয়া তাঁহারা পুনর্বার রাজনীতিক প্রভাৱগার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। অচিরে জেকবিনগণসমূহে বোরতুর আন্দোলন উপস্থিত হইল। সংখ্যা-ভীত সংবাদপত্রে পরলোকগত জুপতির কালিমাঘর চিত্র অঙ্কিত হইল। হাবার্ট নামক একজন সম্পাদক তৎসম্পাদিত পত্রে লিখিলেন :—

“এতদিন পরে লুই দেহত্যাগ করিয়াছেন। মৃৎগণ বলিয়া থাকে, আর তাঁহার নাম উল্লেখের প্রয়োজন নাই, কিন্তু আমি সে কথা বলি না। আমি বলি, তাঁহার ছুজ্জিৱাকলাপ অরণ করিয়া জনসাধারণের হৃদয়ে ঘৃণা-উৎপাদনের নিমিত্ত তাঁহার নামের উল্লেখ করা কর্তব্য। আমি সমগ্র জগৎ-সমক্ষে প্রতিপন্ন করিব যে, তাদৃশ মররাক্ষসকে স্মৃতিকাণ্ডে সংহার করাই কর্তব্য ছিল। বাল্যকাল হইতে অসহায় জীবজন্তুগণকে বহুস্তে বধ করিতে শিক্ষা করিয়া তিনি পরিশেষে মরণোণিতে দণ্ড কলঙ্কিত করিয়াছেন। তিনি অন্ধ, খঞ্জ, হুবিগ, ও অসমর্থ ব্যক্তিগণকে দুঃসহ যন্ত্রণা দিয়াছেন। তিনি বেজ্ঞাপ্রবোধিত হইয়া কদাপি সংকাষের অহুষ্ঠান করেন নাই। ফরাসী দেশের দুর্ভাগ্য বলতঃ তাঁহার সঙ্গিনীটিও সেইরূপ জুটয়াছিলেন।”

এইরূপে প্রভারিত হইয়া অনতিদূর ইতরসাধারণ পুনর্বার নিজ মূর্তি ধারণ করিল। এইরূপে জেকবিনগণের রাজনীতিক শক্তি পুনর্বার প্রতিষ্ঠিত হইল। গিরন্দিষ্টগণ জেকবিনগণের কুচক্র-নিবন্ধন প্যারিসনগরে শান্তিসংস্থাপন করিতে কোনক্রমে সমর্থ হইলেন না। ভার্ণিয়ড, ত্রিহট, গডে, প্রভৃতি গিরন্দিষ্ট নেতৃগণের নাম চিরদিন ধরিজীর যুথোজ্জ্বল করিবে সন্দেহ নাই ;

কিন্তু জেকবিন-পরিচালিত ইতরসাধারণ তাঁহাদের প্রকৃত মূল্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইল না। অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের সমক্ষে সদস্য উভয় পক্ষই মূল্যপূর্ণ প্রদর্শিত হইলে অসং পক্ষের প্রতিই তাহাদিগের চিত্ত আকৃষ্ট হয়। সেই জন্যই জেকবিনগণ তাহাদের দ্বন্দ্বের একাধিপত্য সংস্থাপিত করিতে সমর্থ হইলেন। সেই জন্যই দেশের এক প্রান্ত দ্রুতই অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত উচ্চ অগত্যাগারে নিমজ্জিত হইল।

ফরাসীরাণের প্রাণদণ্ড হইলে যুরোপের ভূপতিবর্গ ফ্রেঞ্চম্যান প্রদীপ্ত করিয়া রাজহত্যা ফরাসীজাতির বিরুদ্ধে যোৱন্তর যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। ফরাসীজাতির কুদৃষ্টান্তের অহুসরণে পাছে সমগ্র যুরোপের প্রজামণ্ডলী রাজকুলের প্রতিদ্বন্দ্বি দণ্ডায়মান হয়, এই আশঙ্কায় তাঁহাদের দ্বন্দ্বকল্প উপস্থিত হইল। অচিরে ইংলণ্ড, হলণ্ড, স্পেন, অস্ট্রিয়া এবং অজ্ঞাত রাজ্যের সহিত সম্মিলিত হইয়া ফরাসীদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধায়োজনে প্রবৃত্ত হইল। ফরাসী-দূত ইংলণ্ড হইতে বিতাড়িত হইলেন। তখন ফরাসীজাতিও যুদ্ধের নিমিত্ত আয়োজন আরম্ভ করিল। জাতীয় সৈন্তগণ ভিন্ন অতিরিক্ত তিন লক্ষ সৈন্ত সংগৃহীত হইল। ইংলণ্ড হলণ্ড এবং স্পেন দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষিত হইল। আবশ্যিক আয়োজনের ক্রটি হইল না।

ঘটনাক্রমে অকস্মাৎ এই সময়ে প্যারিসনগরে সর্বপ্রকার বাদ্যাসমগ্ৰী মহার্ঘ্যঃ ইয়া উঠিল। তদ্রূপে ইতরসাধারণ উগ্রমুখি ব্যরণ করিল। বিফ্রোতা-দিগের চক্রান্তই মূল্যবৃদ্ধির কারণ, এইরূপ ভাবিয়া তাহারা আবর্ঘ্য বস্তুর মূল্যবৃদ্ধির নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ জাতীয় সমিতিসম্মীপে আবেদন করিতে লাগিল। জেকবিনগণ তাহাদিগের দ্বিক্রিয়াকলাপের প্রায়শ্চিত্তকাল উপস্থিত দৃষ্টে চিন্তিত হইলেন। অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের ইচ্ছানুরূপ কাণ্ড না হইলে বিবম অনর্থের উৎপত্তি হয়; কিন্তু সমিতি সর্ব বস্তুর মূল্যনিয়ন্ত্রণে প্রবৃত্ত হইলে ফরাসী দেশের বাণিজ্য এককালে অন্তর্হিত হয়। বিবম সমস্তা দৃষ্টি করিয়া জেকবিনগণ আবেদনকারিগণকে স্তোকবাক্যে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু হিতাহিতজ্ঞানবিবজ্জিত মূর্খগণ জেকবিনগণের বচনে পরিতুষ্ট না হইয়া সত্যমণ্ডলীর প্রতি গালিঘর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। জেকবিনগণ কোনক্রমে তাহাদিগকে নিরস্ত করিতে সমর্থ হইলেন না। অনন্তর জেকবিন-নেতা ম্যারাট, তৎসম্পাদিত সংবাদপত্রে ইতঃসাধারণকে বশ্যতায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে উৎসাহ প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন।

তিনি নির্দেশেন :—“যে দেশে প্রকৃতপক্ষে জনসাধারণের অধিকার-পরিচালনের শক্তি আছে, তাহার স্বত্বের করাল গ্রাস হইতে পরিজ্ঞাপ-প্রাপ্তির নিমিত্ত জুই চারিটি বিপণিগৃহেই অবৈধ কার্য্য নহে।”

মার্সাটের কুশিক্ষার ফল অচিরেই ফলিল। প্যারিসনগরের বণিক-মণ্ডলীর সঙ্গীনাশ উপস্থিত হইল। বহুসংখ্যক বিপণি লুণ্ঠিত হইল। বহু-সংখ্যক বিপণি হইতে অর্জুয়া-প্রদানের অঙ্গীকারে রাশি রাশি বস্ত্র গৃহীত হইয়া আসে। মুণ্ডা প্রবৃত্ত হইল না। বেলা ৭টার সময় হইতে ১২টা পর্য্যন্ত সমভাবে অপব্যয়কার্য্য চলিল, তথাপি দম্মাগণের আশা নিবৃত্ত হইল না। দেশের বাণিজ্যশক্তি অস্তব্ধ হইবার উপক্রম হইল। বণিকগণ সঙ্গীবাস হইয়া হাহাকার করিতে লাগিল। কোটিপতি, লক্ষপতি, সহস্রপতি সকলেই ভিক্ষকের দশা প্রাপ্ত হইল। প্যারিসনগরের দুর্দশার পরিসীমা রহিল না।

কতৃপক্ষীয়গণ স্বাধীনতাপ্রাপ্ত ইতরসাধারণের কার্য্যকলাপনুষ্ঠে চিন্তাঘটিত হইলেন। জেকবিনগণ মধুর বচনে তাহাদিগকে আপ্যায়িত করিয়া শান্তি-সংস্থাপনের নিমিত্ত প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। রবছপিয়র প্রভৃতি যথেষ্টাচারময়ের দীক্ষাধরুগণ যথেষ্টাচারময় পরিহারপূর্ব্বক শান্তি-ময়ে দীক্ষাদান করিতে লাগিলেন। কিন্তু স্বস্তের মূলে কুঠারোষাচ্য কহিয়া অগ্রভাগে জলসেচনের ভায় তাঁহাদের সর্ব্ব যত্নই বিফল হইল। তাঁহারা কোনক্রমে শান্তিসংস্থাপন করিতে সমর্থ হইলেন না।

বর্তমান শত্বে কঠোর-নির্জগরণের নিমিত্ত জেকবিনগণের রাজনীতিক সভাপনুদেয় অবিবেশন হইল। রবছপিয়র প্রভৃতি নেতৃগণ গিবল্দিষ্টপক্ষেই সর্ব্ব অনর্বেয় সুগীত্ব বলিয়া নির্দেশ করিলেন। পরিশেষে এইরূপ স্থিতিকৃত হইল যে, গিবল্দিষ্ট-সম্প্রদায়ের ধ্বংসসাধনকল্পে অচিরে উপায় অবলম্বন করা কর্তব্য।

অনন্তর ড্যান্টন এবং অন্যান্য জেকবিন-নেতৃগণ গিবল্দিষ্ট বৈরীদিগের সংহারসাধনকল্পে প্যারিসনগরে “বৈপ্লবিক বিচারালয়” সংস্থাপনের নিমিত্ত সমিতি-গৃহে প্রস্তাব করিলেন। বৈপ্লবিক বিচারালয় প্রতিষ্ঠার প্রকৃত-উদ্দেশ্য গোপন করিয়া তাঁহারা বলিলেন, “যাহারা শীঘ্রাতঃ প্রদেশে বিদেশীয় শত্রু-বর্ষের সহিত যুদ্ধে নিযুক্ত রহিয়াছে, তাহাদিগের আত্মায়-অজ্ঞানগণকে আত্মাত্মক ঠেংকরণের হস্ত হইতে পরিজ্ঞাপের নিমিত্ত একটি বিচারসমিতি

সংস্থাপিত করা প্রয়োজন।” জেকবিনপ্রবর লিঙেট প্রস্তাবিত বিচারালয়ের গঠনশৃঙ্খলে বলিলেন, “প্রস্তাবিত বিচারালয়ে ১ জনমাত্র বিচারপতি নিযুক্ত হইবেন। জাতীয় সমিতি তাঁহাদিগকে নিযুক্ত করিবেন। কিন্তু বিচারপতিগণ আইন-প্রদর্শিত প্রণালীর অনুসরণ করিতে বাধ্য হইবেন না। তাঁহারা ইচ্ছানুসারে প্রমাণ-গ্রহণেই অপরাধ নির্ধারণ করিতে পারিবেন।”

ঈদৃশ বিচার-সমিতির প্রতিষ্ঠার প্রকৃত উদ্দেশ্য গোপন করিলেও, গিরন্দিগণ বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহাদিগের সংহারসাধনই জেকবিনগণের একমাত্র অভিপ্রায়। সেহক্ৰ তাহারা প্রাক্তন প্রস্তাবে ঘোরতর আপত্তি উত্থাপিত করিলেন। মহামতি ভানিয়ড বলিলেন, “প্রাণান্তেও আমি এক্ষণ প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিব না।” তাহা শুনিয়া জটৈক জেকবিন বলিয়া উঠিলেন, “তাহা হইলে ইতরসাধারণ উদ্বৃত্ত হইয়া সমিতির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবে।” বহুকণ উত্তর পক্ষে বাগ্‌বিত্ততা চলিল, পরিশেষে ইতরসাধারণের জুহুটি-বর্শনে ভীত হইয়া গিরন্দিগণ বৈপ্লবিক বিচারালয়-সংস্থাপনে সম্মতি প্রদান করিয়া আপনাদের শক্তিতে আগুনায়াই কুঠারাবাত করিলেন।

এইরূপে বৈপ্লবিক বিচারালয় সংস্থাপিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে গুপ্ত মন্ত্রণার নিমিত্ত একটি কমিটী প্রতিষ্ঠিত হইল। জেকবিনগণ অ্যুযোগ প্রাপ্ত হইয়া গিরন্দিগণের সংহারসাধনের নিমিত্ত উপায় উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হইলেন। কিয়দ্বিস পূর্বে ডুমুরিয়ার নামক জটৈক সেনাপতি জেকাবিন-শাসনের ধ্বংস-সাধনপূর্বক ফরাসী দেশে শান্তিসংস্থাপনে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু সৈন্তগণের মধ্যে মতভেদ থাকায় কৃতকায্য হইতে পারেন নাই। জেকবিনগণ এইরূপে প্রকাশ করিলেন যে, সেনাপতিপ্রবরের কার্যকলাপের অন্তরালে গিরন্দিগণ-নেতৃগণের হস্ত প্রচ্ছন্নভাবে বিদ্যমান আছে। এইরূপ প্রকাশ করিয়া তাঁহারা ভানিয়ড, গড়ে, ব্রিছট প্রভৃতি মহাক্ষমতাকে বৈপ্লবিক বিচারালয়ে প্রেরণের নিমিত্ত সমিতি-গৃহে প্রস্তাব করিলেন। জেকবিন-দলপতি রবছপিয়র গিরন্দিগণের বিরুদ্ধে অশেষবিধ অভিযোগ উপস্থিত করিয়া বলিলেন :—“ফরাসী জাতিতে জটৈক ভূপতি প্রদানের নিমিত্ত গিরন্দিগণ যুরোপের প্রজাপীড়ক ভূপতিমণ্ডলীর সহিত সম্মিলিত হইয়াছেন। স্বদেশীয় বড়বস্ত্রের সহিত বিদেশীয় পাশব শক্তি সংযোজিত হইয়াছে। বার্ষ-পরিচর্যা তিন্ন অস্ত্র ফোন অতিপ্রায়ে গিরন্দিগণ কদাপি জনসাধারণের সহিত সন্ধিসংস্থাপন করেন নাই।”

জেকবিন দলপতি কর্তৃক অভিযুক্ত হইয়া গিরমিষ্ট-প্রবর ভাণ্ডার উত্তর করিলেন :—“নিম্নে তাৎপৰ্য্য পরিচালন করিলে দেশ পুনর্বার ভূপতিপ্রসূত হইবে মনে করিয়া যদি আমরা বিপ্লবের উগ্রতা নিবারণের প্রয়াস পাইয়া থাকি তাহা হইলে কি স্বদেশের স্বাধীনতা কৰা হইয়াছে? বহুকালের অত্যাচারে প্রদীপ্ত হইয়া জ্বলন করাসী জাতি জাহি জাহি রবে আত্মনাশ করিতে লাগিল, আমরা কালবিলম্ব না করিয়া সাধারণ-তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করিয়াছি। যখন সবার বাস্তব সমস্যা নিবারণে সমগ্র প্যারিস নিবাসিত হইয়া উঠিল, আমরা তৎক্ষণাত্ রাজ্যের স্বাধীনতা গ্রহণ করিয়াছি। রাজ্যের স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে অর্জিত হইলে, তাঁহার পুত্রের জন্ম হইতে নৃপতিশুলক সর্বপ্রকার উচ্চাভিলাষ দুগ্ধকরণের নিমিত্ত আমরা জটিল অধ্যাপকনিয়োগের প্রস্তাব করিয়া কি জাতীয় স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়াছি? আমরা ল্যাকাইটির প্রাশংসা করিয়াছিলাম বলিয়া অভিযুক্ত হইয়াছি। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি, কোন্ সভা তাঁহার প্রশংসা করেন নাই? আমরা মিউনিসিপালিটির কুৎসাকারী বলিয়া অভিযুক্ত হইয়াছি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমরা কি মিউনিসিপালিটির কুৎসা করিয়াছিলাম? মিউনিসিপালিটির শাসনকালে, প্রবাসী ও স্বাধীনতা ব্যক্তিগণের যোগসঙ্গত লুপ্ত হইয়াছিল। আমরা সেই যথেষ্টাচার নিবারণের নিমিত্ত কৃতসঙ্কল্প হইয়া মিউনিসিপালিটির হস্তস্থিত অর্থস্বত্বের হিসাব দেখিবার প্রস্তাব করিয়াছিলাম। বিপ্লবাত্মক প্রসঙ্গে বৃদ্ধি লবণ করিতে করিতে আমাদের কর্ণ বধি হইবার উপক্রম হইয়াছে; কিন্তু অত্যাচার ও উৎপীড়ন ব্যতীত উৎসাহের অধিকার জন্মে না। যখন একবার স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তখন আর উৎসাহের প্রয়োজন কি? সবছপিয়র করাসী জাতির জন্মে জাতি উৎপাদন পূর্বক বিপ্লবকাণ্ড সমাধা করিতে ইচ্ছা করেন; কিন্তু আমি শ্রুতি ও প্রেমের সাহায্যে তৎকার্য সম্পাদনের নিমিত্ত কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি। নিরস্তর বাতুলগণপরিবৃত এবং অহর্নিশি অত্যাচারের আশঙ্কায় কলিতকলেবর হইয়া করাসী জাতি অকৃত স্বাধীনতা উপভোগ করিতেছে।”

সমিতি-গৃহে গিরমিষ্ট সভ্যের সংখ্যাধিক্য প্রযুক্ত জেকবিনগণের দুরন্তপন্থি পূর্ণ হইল না। কিন্তু পরাকৃত হইয়াও তাঁহাদের উত্তম ভঙ্গ হইল না। তাঁহারা সর্বদাই সমিতির বিরুদ্ধে উৎসাহের প্রয়োজন প্রতীপাচিত করিতে লাগিলেন।

শ্রীমুরেশ্বনাথ ঘোষ।

“সতীন” ।

(১)

বাগকে বাগকে সাধারণতঃ যেরূপ ভালবাসা ঘটিয়া থাকে, সুদীর ও সুবোধের বালাপ্রায় ঠিক সেরূপ প্রকৃতির ছিল না। উভয়েরই বয়ঃক্রম চতুর্দশের অধিক না হইলেও এই প্রেম যেন কতকটা নারক-নাগিকার অমুরাগের আকার ধারণ করিয়াছিল।

সুদীরের দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ জুড়ু দেহে পৌরুষের গুণাবিত্য এবং অমনসীহতার পরিচয় সর্বদাই পরিস্ফুট থাকিত, এবং সুবোধের আকৃত্তিক হৃদয়লবোভিত সুহৃদ্যর হ্রব বেধবানিতে রমণীমূলত কমণীমূলতার অভাব ছিল না।

হুইজনের মনের গঠনেও যথেষ্ট বিভিন্নতা ছিল। সুদীর যে স্থানে ঘাইত সেই স্থানেই বলপূর্ব্বক আপনায় স্থান করিয়া লইত এবং তাহাকে কেহ কোনরূপ অবজ্ঞা করিলে সে তাহার সমুচিত প্রতিশোধ না লইয়া ছাড়িত না। সুবোধ সর্বদাই সমুচিত হইয়া থাকিত এবং কোন কাণ্ডেই সে অগ্রসী হইতে সাহস করিত না। কেহ তাহার প্রতি উৎপীড়ন করিলে সে শুধু তাহার বিশাণ চক্ষু দুইটি সজল করিয়া কাতরভাবে উৎপীড়কের দিকে চাহিয়া থাকিত; প্রতিশোধের কথা মনে করিতেও তাহার সাহস হইত না।

এই দুই সম্পূর্ণ বিভিন্নপ্রকৃতি পরস্পরের আশ্রয় লাভ করিয়া নিজ নিজ অন্তরমণ্ডে একটা গভীর পরিভূক্তি অমুভব করিল।

সুদীরের বীরকবর অসহায় সুবোধকে আশ্রয় দিয়া পরিপূর্ণ আন্তঃপ্রসাদ অমুভব করিল এবং সুবোধের দুর্বল চিত্ত সুদীরের আশ্রয়ে আপনাকে সম্পূর্ণ নিরাপত্তা মনে করিয়া একান্ত আশ্বাস লাভ করিল। দিনে দিনে এই অন্তোন্ত আশ্রয়ের তাব গভীর প্রণয়ে পরিণত হইল।

ক্রমে হুইজন একসঙ্গে বসিত, পথে একসঙ্গে বেড়াইত এবং সুবোধকে সঙ্গে না লইয়া সুদীর কোন খেলার বোগদান করিত না। সুতরাং যতকণ সম্ভব উভয়ে একত্র থাকিবার চেষ্টা করিত। অল্পকালের ছাড়াছাড়িও উভয়কে একান্ত পীড়িত করিত।

কিন্তু তথাপি সময়ে সময়ে সুধীরকে সুবোধের নিকট হইতে দূরে রাইতে হইত। তাহার মধ্যে প্রাণশক্তির যে প্রাচুর্য্য ছিল, তাহা তাহাকে এক স্থানে আবদ্ধকরণ হির হইয়া বসিয়া থাকিতে দিত না, অথচ দ্রুতগতির কাণ্ডে সুকুমার সুবোধকে সঙ্গে লইতেও তাহার সাহস হইত না।

সুতরাং যখন সুধীরের দ্বিভ্রান্ত পনের আশ্রয় হইতে আত্ম-সংগ্রহের ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠিত, বা ছুটির দিনে, ষষ্ঠীররকে আয়োজন করিয়া রস সংগ্রহের আশ্রয় তাহাকে একান্ত লুপ্ত করিত, তখন তাহাকে অগত্যা সুকুমার বন্ধুটির সহ বর্জন করিতে হইত। এই সময়টা সুবোধের বড়ই কষ্টে কাটিত। সে সুধীর তির আর কাহারও সঙ্গে বিশিতে পারিত না এবং ছই একজন ব্যক্তি আর কাহারও নিকট তাহার বাক্যশ্রুতি হইত না। সুতরাং যে সময়ে সুধীর প্রচণ্ড-উদ্ভ্রাসে বিপদের মধ্যে ছুটিয়া বেড়াইত, সুবোধ সেই সময়ে আপনাতন্ত্র পাঠকক্ষটিতে বসিয়া পথের দিকে চাহিয়া বন্ধুর প্রতীক্ষা করিত; কখনও বা ভয়ে ভয়ে লুকাইয়া একখানি খাতার কবিতা লিখিয়া আপনাতন্ত্র মনের ভাব প্রকাশ করিত। সুবোধ ছাত্রবৃত্তি পাশ করিয়া আসিয়াছিল এবং কাব্যতা-রচনার তাহার কিছু অঙ্গুরাগ ছিল।

লিখিতে লিখিতে অনেক সময় তাহার ছবদের বেদনা চক্ষু-প্রান্তে অঙ্গ-বিস্মরণে ছুটিয়া উঠিত।

কখন সে লিখিত :—

“তুমি ত চলিয়া গেলে আলোকের বেশে
হাসি' দূর হাসি।

ঈশ্বরে নলিনী বেধা লুপ্ত হৃদয়ে
বেদনার দ্বাশ।

মুদিত পলায়ে তা'র শীতল বাতাস
হানে শরজাল।

তুহিন বহবে শিরে তীত্র হলহল
ভীষণ করাল।

এখনো না এস যদি, ছন্দ-দেবতা
নিজ কাজ শাসি।

লভিলে দুখিনী বাল্য চির আকাঙ্ক্ষিত
দলিল সমাধি।”

কখনো বা সে লিখিত :—

“মথুরাপুরীতে হ’য়েছ সম্রাট,

আর কি পড়িবে মনে ।

যমুনার তীরে চির নির্জাসিত

কাতর দুঃখিনীজনে ?”

কিছুকণ ছাড়াছাড়ির পর সুদীর্ঘচক্ষুকে তাহার স্নহুমার সঙ্গীটির মানভঞ্জনর জন্ত বধেই আয়াস স্বীকার করিতে হইত ।

এমনই করিয়া দুই বহু জীবনের পথে অগ্রসর হইতে লাগিল এবং বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের প্রেম শিবিলমূল না হইয়া দিনদিন দৃঢ়তর হইতে লাগিল ।

উভয়েই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল যে, তাহাদের দ্বয়ের কোন কালে আর কাহারও স্থান হইবে না ।

ষোড়শ বর্ষ বয়সে উভয়েই একটুপাশ পাশ করিয়া কলিকাতার পড়িতে গেল । তথায় আসিয়াও তাহাদের সঙ্ঘবৎ বন্ধন ছিন্ন হইল না । তাহারা দুইজনেই এক বাসায় এক কক্ষে স্থান গ্রহণ করিল এবং কলিকাতার কোলাহলমুখর জনারণ্যের মধ্যেও আপনাদের জন্ত একটি নিভৃত শান্তিনিভ নীড় রচিত করিয়া লইল । কিন্তু পত্রাত্তরাপারচিত নিভৃত নীড়ের মধ্যেও সময়ে সময়ে বাতের শর কেমন করিয়া অস্বস্তিতে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না ।

একদিন সকালের ডাকে একখানি নাতিদীর্ঘ পত্র পাটয়া সুদীরের মুখমণ্ডল ।
সহসা তীব্র বেদনায় বিবর্ণ হইয়া গেল । সে দ্রুতপদে আপনার কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া সপলে দ্বার কুদ্ধ করিয়া দিল । সুপোষ আকুল আগ্রহে কক্ষের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল । অনেককণ পরে দ্বার মুক্ত পাইয়া সুপোষ দ্রুতপদে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল, সুদীর আপাতদৃষ্টিতে বস্ত্রাশ্রিত করিয়া শযায় শয়ন করিয়া আছে ।

সে ভাড়াভাড়ি নিকটে যাইয়া আকুল কণ্ঠে বিজ্ঞাসা করিল, “কি সুদীর, কাহার পত্র ? কেনি হৃদয়বাহ অচ্ছেদিত ?” সুদীর কক্ষণকণ্ঠে উত্তর দিল, “আমার আজিকার মত সময় দাও । আমার মাথার তিত্তর আগুন

জলিতেছে। আমি কি করিব কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।’ সুবোধ দেখিল কাঁদিয়া কাঁদিয়া সুধীরের চক্ষু গজবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

সে নীরবে কল্মিষত্বকে ধীরে ধীরে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

অনাহার করিয়া সঙ্গীহীন সুবোধ ঘ্রানমূখে কলেজে চলিয়া গেল।

কলেজের ছুটির পর তুড়াতাড়ি ঘরে ফিরিয়া আসিয়া সে দেখিল, সুধীর তখনও শয্যা ত্যাগ করে নাই। একটা ভীত বেদনা সুবোধের হৃদয়কে ছিন্ন ত্রিন্ন করিয়া দিল। সে বাগ্রভাবে তাহার নিকটে গিয়া বলিল, “ভাই সুধীর, তোমার কি হইয়াছে বল? কোন অসুখ করে নাই ত?” সুধীর উত্তরে নীরবে সুবোধের হাত ধরিল—তাহার নয়নে অশ্রু উথলিয়া উঠিল। সুবোধও আপনার চক্ষু শুষ্ক রাখিতে পারিল না। অনেকক্ষণ পরে সুধীর বলিল,—“আর কিছুকণ অপেক্ষা কর, তাহার পর তোমার সকল কথা বলিব। আজ আমার জীবনে ভীষণ পরীক্ষার দিন।”

.

মাত্র দশটা; ‘মেন্সের’ প্রায় সকলেই শুইতে গিয়াছে। সুধীর সুবোধের হাত ধরিয়া নীরবে জ্যোৎস্নাশোভিত ছাতের উপর ক্রতবেগে পাচচারণা করিতেছিল। কাহারও মুখে কথা নাই।

উভয়েরই হৃদয় অজ্ঞাত বিষাদে আচ্ছন্ন। বেড়াইতে বেড়াইতে হঠাৎ সুবোধের দিকে ফিরিয়া সুধীর বলিল,—“আজিকার চিঠি দেখিবে?” বলিয়া সে কল্মিষ হস্তে পকেট হইতে চিঠি বাহির করিয়া সুবোধের হাতে দিল। সুবোধ চিঠি খুলিয়া চম্ভালােকে দেখিল। চিঠি সুধীরের পিতার হাতের লিখা। কিন্তু অশ্লষ্ট চম্ভালােকে চিঠির লিখা পড়া গেল না।

সুধীর পকেট হইতে মোমবাতি ও দিয়াশলাই বাহির করিয়া আলো আলিল। সুবোধ চিঠি পড়িয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল।

চিঠির প্রয়োজনীয় অংশ এইরূপ :—

“আগামী ১১ই ফাল্গুন তোমার বিবাহের দিন স্থির করিয়াছি। অতএব সত্তর এক সপ্তাহের ছুটি লইয়া বাড়ী আসিবে।”

চিঠি-পড়া শেষ হইবামাত্র, সুধীর আলোক নিবাইয়া দুই হাতে সুবোধের দুই হাত দৃঢ়রূপে ধরিয়া কাতর কণ্ঠে বলিল—“ভাই? এখন উদার?” সুবোধ ভয়ে ভয়ে বলিল,—“পিতার আদেশ কি করিয়া অমান্ত করিবে?” সুধীর আশ্রয়ভরে বলিল—“ভাই, তুমি কি আমার এত অসার মনে কর? এ

হৃদয়ে আর কাহারও স্থান কোথায় ?” শুনিয়া সুবোধের হৃদয় আনন্দে ও গর্বে স্ফীত হইয়া উঠিল ।

তখন অনেক ভাবিয়া দুই বন্ধুতে সেই শূন্য আকাশতলে বলিয়া পত্রের উত্তর রচনা করিল ।

উত্তর রচনা করিতে করিতে উত্তরেরই হৃদয় কখন আনন্দে কখন উৎসেগে কাঁপিয়া উঠিল এবং পুনঃ পুনঃ উত্তরের নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল ।

অবশেষে উত্তরে সুবীর পিতাকে লিখিল,—

“আমাকে ক্ষমা করিবেন । আমি এ জীবনে বিবাহ করিতে পারিব না । একজন আমাকে সংসার ত্যাগ করিতে হয় সেও স্বীকার, তবাপি আমি প্রতিজ্ঞাতকের পাণে আপনাকে কলুষিত করিতে পারিব না ।”

তখন সেই কৌতূহী-প্রসূর রজনীতে দুই বন্ধু আবার নৃতন করিয়া আমরণ বন্ধুত্বের প্রতিজ্ঞা করিল এবং সংসারত্যাগে বাধ্য হইলেও পরস্পরের সাহায্যে সন্মান ও তাহাদের পক্ষে কিরূপ যত্নসহায় হইয়া উঠিবে, তাহার আলোচনা করিতে করিতে দুই জনেই প্রীতিতে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল ।

(৩)

সাক্ষাৎসঙ্গ সমাপ্ত করিয়া দুই বন্ধু বাসায় ফিরিতেই কি সুবীরকে বলিল “একটি বাবু আপনাকে খুঁজছেন ।” সুবীর বলিল,—“কোথায় তিনি ?” কি বলিল—“আপনাদেরই ঘরে তাঁকে বসিয়েছি ।”

সুবীর ও সুবোধ দ্রুতগতি কক্ষের দিকে চলিল । কিন্তু কি এক অজ্ঞাত আত্মা সহসা উত্তরেরই হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিল ।

কক্ষে প্রবেশ করিয়াই সুবীর ঘাঘা দেখিল, তাহাতে তাহার সর্ব্বাঙ্গে রক্তের গতি অভ্যন্তর স্রষ্ট হইয়া উঠিল । সুবীরের কক্ষে তাহার পিতা বসে । তরে ও বিশ্বাসে সে তাঁহাকে প্রণাম করিতেও ভুলিয়া গেল ।

“হরিশ্চন্দ্র গভীরভাবে বলিলেন,—“জুপ মেল, ষ্টিক আর্টার সময়ে ছাড়ে মুক্তি ?” এবং উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই বলিলেন—“এখন সাতটা বেজেছে, এখনও সময় আছে । তুমি চটপট কাপড় চোপড় তুলো শুদ্ধি করে নাও । এই পাড়ীতে বাড়ী যেতে হবে । আমি নীচে বোড়ার পাড়ীখানা ঝাঁড় করিয়ে রেখেছি ।”

তবে সুবীরের বাতর্জনশক্তি হইল না । সে যন্ত্রচালিতের মত পিতার আদেশপালনে প্রস্তুত হইল । পনের মিনিট শৈবেই সুবীরও তাহার বাস

ঘোড়ার গাড়ীতে যথাস্থানে স্থাপিত হইল। সুদীর্ঘ বাইবার সময় লক্ষ্যে ও বেদনার সুবোধের মুখের দিকে চাহিতেও পারিল না।

সুবোধ সে রাজিতে আহার করিতে পারিল না। নানা বিভিন্নমুখী চিন্তা-শ্রোত তাহার মস্তিষ্কের মধ্যে ঝড়বেগে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহাদের প্রভাবে ব্যাকুল হইয়া সে-লম্বু রাত্রি জাগিয়া কবিতা রচনা করিল :—

“প্রলয় পবন আসে ছড়ারি’ গভীর
অশনি নাচিয়া উঠে বাকিয়া বাকিয়া
ভীষণ বিপদে রহ মেরু সম দ্বীপ
সাংসার বর্ষে বাণ অকম্পিত হিয়া।”

আবার :—

“ভালুক ছন্নবন্ধ, ঘর্ষ থাক ঘূরে
মুহুর্ত হাসির রেখা তপ্ত অক্ষর
অটল চরণে চল সত্যের মন্দিরে
নবর জীবনে শুধু সত্যরক্ষা সার।”

আবার :—

উত্তর মরুর মাঝে একটি কুহুর
কৃষ্ণ আকাশের গায়ে একমাত্র তারা
বিনিস জীবনে শুধু ছন্দের ঘুম
কেহ পাগে তাহাতেও হইলাম দ্বারা।”

কিন্তু ফল কিছুই হইল না।

১১ই ফাল্গুন যথাগাজিতে সত্যসত্যই সুনীরের শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। সুদীর্ঘের বোধ বেগরা যায় না। সে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ অস্ত্র যথোদ্যোগে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু পিতৃরূপী পুঁলকের পুণ্যতন দারোগার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়ান তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল।

নিরুপায় সুদীর্ঘ শুভদৃষ্টির সময় প্রাণপণে চক্ষু বুজিয়া ছিল এবং ফুলশয্যার রাজিতে একবারও সে বধূর দিকে মূখ ফিরাই নাই। বহুবৈধ মধ্যাহ্নাঙ্কারে অস্ত্র বেচারা ইহার অধিক আর কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

ফুলশয্যার পরদিনই সুদীর্ঘ তাহার মাতার কাছে প্রকাশ করিল যে, পরদিনই প্রাচ্যে কলিকাতায় যাইতে হইবে, নহিলে তাহার পড়াশুনার বিশেষ

কতি হইবে। সুখীরের পিতা জেৎ হাসিয়া অসুখ্যাত দিলেন। সুখ-কারাগার হইতে বাহির হইয়া সুখীর যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাটিল।

কিন্তু বতাই সে বাগার নিকট আসিতে লাগিল, ততই তাহার জ্বর অবসর হইয়া পড়িতে লাগিল। কেমন কারণ সে সুবোধের নিকট অবোধ মুখ দেখাইবে ?

কিন্তু তাহার সৌভাগ্যবশতঃ কাৰ্য্যকালে বাগারটা তাদৃশ গুরুতর বোধ হইল না। দুই বছর গীরব অক্সতেই জ্বরের অধিকার কাটিয়া গেল এবং অনিচ্ছাকৃত বিবাহের জন্য সুখীরকে কিছুমাত্র কৈফিয়ৎ দিতে হইল না।

সুবোধ লুটাইয়া খাতায় লিখিল :—

“ফিরিয়া এসেছ যদি হারাণ রতন
উদ্বিগ্নে ছদ্যাকাশে যেনমুক্ত শনি
আর দিনাক শশা বিরহবেদন
উজলি জ্বরপুত্রী রহ দিবানিশি।”

(৪)

কিন্তু তথাপি যুক্তি সুখীরচক্সের জ্বরের টান সম্পূর্ণ অকলঙ্ক রহিল না। চাদের উপর রাহর ছায়া দেখা দিল।

সুখীরের অপরাধ ছিল না। সে প্রাণপণে তাহার জ্বরের পরিপূর্ণ প্রেম সুবোধের জন্যই রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছিল। পাছে তাহার একবিন্দু অপাত্রে পড়িয়া যায়, সেইজন্য সে আর কাহারও সঙ্গে ভাল করিয়া মিশিতই না, কিন্তু তথাপি তাহার প্রতি বিধাতা বিমূণ হইল। সুখীর ও সুবোধ যে বৎসর বি, এ, পরীক্ষা দিল সেই বৎসরেই সুখীরের পিতার মৃত্যু হইল।

সুখীরের পিতা পুণিশ-বিভাগে কর্ম করিয়া যথেষ্ট বিঘরসম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছিলেন। একপণে সে সকলের তত্ত্বাবধানের ভার সুখীরের উপর পড়িল। কয়েই তাহাকে বাধা হইয়া পড়া ছাড়িতে হইল। কিন্তু সুবোধকে ছাড়িয়া সে কি করিয়া দেখে যায় ? উভয়-সকটে পড়িয়া হতভাগ্য সুখীর বিপন্ন হইয়া উঠিল। অবশেষে এক দিন সে সুবোধের কাছে সকল কথা খুলিয়া বলিল।

তিনিয়া সুবোধ হাসিয়া বলিল,—সেজন্য চিন্তা নাই, তাহার উপায় সে করিয়াছে।

সুধীরদের গ্রামে একটি এন্ট্রান্স স্কুল ছিল। ইতোমধ্যে তাহার বেড্‌-মাট্রোরের পদ বাগি হইয়াছিল, সুবোধ গোপনে চোঁকা করিয়া সেই পদটি সংগ্রহ করিয়াছিল। এক্ষণে সে হাসিয়া সুধীরকে তাহার নিয়োগপত্র দেখাইল।

সুবোধের অকৃত্রিম বহুশ্রীতি ও ত্যাগবীকার দেখিয়া সুধীর মুগ্ধ হইল। সে আবেগভরে বলিল—“তোমার মত প্রতিভাশালী ছাত্র তুচ্ছ মাট্রারী লইয়া চিরজীবনের জন্য দারিদ্র্য বরণ করিয়া লইবে, সে কিছুতেই হইবে না, ভাই!”

সুবোধ হাসিয়া বলিল,—“দারিদ্র্য কোথায় দেখিলে? একজনের পক্ষে মাসিক ৩০০ টাকা আয় যথেষ্ট নহে কি?”

নিষ্কণ্টক বিবাহিত জীবনের কথা। অরণ রাখিয়া সুধীর লক্ষ্যের একবার উত্তর দিতে পারিল না।

অবশেষে দুই বন্ধুতে একসঙ্গে গৃহযাত্রা করিল। ছিন্ন হইল সুবোধ সুধীরের বাড়ীতেই থাকিবে এবং সেই স্থানেই আহারাদি করিবে।

সুধীর বিবাহের পর হইতে একবারও গ্রামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নাই। বাড়ী আসিয়াও সে গ্রীকে আনাইল না; মাতা অসুস্থরোগ কব্ধা বলিল,—“যদি বধূকে পাইতে চাহ, তাহা হইলে ছেলেকে হারাইবে।” মাতা একলে চক্ষু মুছিয়া চলিয়া গেলেন।

সুধীর ও সুবোধের জীবন সুধীরের বিবাহের পূর্বে যেমন কাটিত, এখনও ঠিক তেমনই কাটিতে লাগিল।

অবশেষে সুধীরের মাতা জ্বিদ বরিলেন, তিনি কিছুদিনের মাত্র তীর্থে গাইবেন।

যে দিন তিনি তীর্থে গেলেন, তাহার পরদিন সন্ধ্যার সময় একখানি শিবিকা আসিয়া সুধীরের অন্তঃপুরে লাগিল। সুধীর সবিশেষে তনিল যে, তাহার জী অবাচিত ভাবে স্বামিগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তনিয়া সুধীর স্তম্ভিত পশিল। সে সুবোধের সঙ্গে পরামর্শ করিতে গেলে সুবোধ হাসিয়া বলিল,—“রাণীর রাজবেশে এবে লওগে আগ্রহ!” সুধীর অত্যন্ত কঠোর হইয়া বলিল,—“জীবন থাকিতে নহে”।

অবশেষে অনেক চিন্তার পর সুধীর গ্রামসম্পর্কে এক ঠাকুরপদ দিহিকে গৃহে আনাহইয়া তাহার হস্তে পত্নীর ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইল।

সেই দিন হইতে উভয় বন্ধুর বন্ধুত্ব বেশ আরও নিবিড় হইয়া উঠিল । সুখীর অন্তঃপুর পরিভ্রমণ করিয়া একান্ত চিত্তে বন্ধুর শরণাপন্ন হইল । ব্যাপার দেখিয়া সম্বন্ধেব অলঙ্কিতে মধুর হাসি হাসিলেন ।

মধ্যাহ্নকাল । সুবোধ জুলে গিয়াছে । সুখীর আহারান্তে শস্যায় শয়ন করিয়া বিশ্রাম করিতেছে । এমন সময়ে অন্তঃপুর হইতে ভীষণ কোলাহল উত্থিত হইল ।

ঠাকুরুণ দিদি ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া বলিলেন,—“ওরে শীগ্গির আর, বোমা কেমন করছে ।”

সুখীর ক্রতপদে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, সুকুমারী গংজাহীন অবহার মাটির উপর পাড়িয়া আছে । তাহার অঙ্গুলারিত কেশপাশ খুলায় জুটাইতেছে এবং তাহার অকলঙ্ক বিবাহর ঐষৎ কাঁপাইয়া দূর বাতাসে দীর্ঘশ্বাস মথো মথো বাহির হইতেছে । দেখিয়া সুখীরের হৃদয় বহুতর জল কাঁপিয়া উঠিল । একবার তাহার মনে হইল যে, তাহার উপেক্ষাতেই নিরপরাধা বালিকার এই হৃদয় ।

ঠাকুরুণ দিদি ব্যস্ত হইয়া বলিলেন,—“হঠাৎ অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে গেল । ওকে তুলে বিছানার উপর শুইয়ে দে । লোণ বর মাংসার খুব লেগেছে ।”

সুখীর বাবা হইয়া পত্নীকে তুলিয়া শস্যায় শোয়াইয়া দিল । তাহার সেই বৌবনবিকশিত সুকুমার দেহল্লর্পে সুখীরের পিশু হৃদয় আবার একবার গভীর আবেগে কাঁপিয়া উঠিল ।

প্রায় দুই ঘণ্টা পরে সুকুমারীর চৈতন্য হইল । সুখীর ভাড়াভাড়ি বাহিরে চলিয়া আসিল । বাহিরে আসিলেই সুবোধের সঙ্গে তাহার দেখা হইল । কিন্তু আজ সুখীরের হৃদয়তরঙ্গ তেমন উন্মুখ হইয়া বন্ধুর দিকে অগ্রসর হইল না ।

মনুশ্চিন্তা ত্রততীর মত এক সুবাসনায় মাতীকৃতি আজ সহসা দুই বন্ধুর মধ্যে হৃদেয়া বাবধান ঘটনা করিল । সন্ধ্যার সময় ঠাকুরুণ দিদি কাঁদিয়া বলিলেন যে, বধুর উপর নিশ্চয়ই কোন অপদেবতার “দৃষ্টি” পড়িয়াছে । তিনি রাত্রিতে আর কিছুতেই তাহার কাছে শুইতে পারিবেন না ।

বহু তর্কবিতর্কের পর বাণ্য হইয়া, সুখীরকেই অগত্য সে রাত্রিতে অন্তঃ-পুরে শয়ন করিতে হইল ।

সুবোধ ইর্যাভেরে লিখিল :—

“পিতাপুত্র ভাই ভাই, বন্ধ বন্ধ মিলি”

যাহে সুখে এক বৃন্তে মানবসমাজে ।

রমণী বহিয়া আনে বিরহের ডালি ।

চূর্ণ করে ক্ষতিহু যুহুস্তের যাহে ।

(৪)

হুই নৌকায় পা দিয়া সুদীর বিষম বিপদে পড়িল ! যে বন্ধ সখি বিনর্জন দিয়া তাহারই জন্য দারিদ্র্যকে বেছায় বরণ করিয়া লইয়াছে, যাহার জীবনে সে ভিন্ন আর কোন সুখ নাই, তাহাকে সে কেমন করিয়া অবহেলা করে ?— আবার ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক যাহাকে সে অমিলাকী করিয়া পত্নী বলিয়া গণ্য করিয়াছে এবং যাহার শরীর, মন ও আত্মার কল্যাণের ভার গ্রহণ করিতে সে নাহতঃ স্বহস্তঃ বাবা, তাহাকেই বা সে কিরূপে একেবারে বিনর্জন দেয় ?

অগত্যা সুদীরকে উভয়কেই সম্বলিত করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইতেছিল । কিন্তু কোনমতেই সে কৃতকায্য হইতে পারিতেন না ।

সুবোধের প্রতি অসুযোগ প্রকাশ করিতে গেলে সুবোধ তাহাকে বিচরণ করিয়া বলিত, “থকলে ফিরিয়া যাও অকপেরে লিখি ।” আবার সুকুমারীকে সম্বলিত করিতে চেষ্টা করিলে সে ঠা তাহার পবিপূর্ণ বিখ্যার স্মৃতি করিয়া বলিত, “যেখানে ভাল থাক, সেইখানেই যাও । বন্ধকে ছেড়ে এখানে কেন ? বন্ধ শুনে রাগ করবেন ।”

এইরূপ মৌখিক বিরোধ প্রকাশ করিয়া হুইজনেই তাহার জন্ম হইতে প্রাণপণে “ব্রহ্মসিংহ তপ্ত প্রেম বন্ধ দীর্ঘ ক্রি” বারি ক’রয়া লইতে চেষ্টা করিত । হতভাগ্য সুদীর নীরব বেদনার আকুল হইয়া উঠিত । জন্মের একপ বেদনা অধিক দিন নিরাপদে সহ্য করা যায় না ।

অতিরিক্ত মানসিক যন্ত্রণায় সুদীর এক দিন সহসা পীড়িত হইয়া শয্যাশায়ী হইল । ডাক্তার দেখিয়া বলিলেন, রোগটা কঠিন । Brain fever ; খুব যত্ন চাই । শুনিয়া স্থলে ছুটি লইয়া সুবোধ অক্লপণ নেজে সুদীরের কাছে আসিয়া বসিল । সুকুমারীও লজ্জাতর পরিতাপ করিয়া সুদীরের অপর পার্শ্বে স্থানগ্রহণ করিল । কেহ কাহারও সঙ্গে বাক্যলাপ করিল না । সেবার প্রতি-ষ্মিতায় পরস্পরকে পরামিত করিবার জন্য উভয়েই যথো একটা ন্যূন

প্রতিযোগিতা চলিতে লাগিল। স্থানীয় দীপে দীপে সংজ্ঞাগাত করিল। উভয়ের এই নীরব যুদ্ধ তাহার কৌতুক উজ্জ্বল করিল। তাহার মনে হইল, উভয়ের বিরোধভঞ্জনের ইহাই উপযুক্ত অবসর। স্বতরাং সে নানা কৌশলে উভয়ের মধ্যে খনিষ্টতারুদ্ধির চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু, সে চেষ্টায় আশাহীন কল ফলিল না।

স্ববোধ স্বকুমারীর সম্মুখে একান্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতে লাগিল। অন্য স্ববোধের অন্তত চরিত্র অধ্যয়ন করিতে করিতে স্বকুমারীর মুখে দীপে দীপে যত কৌতুক-বেশা ফুটিয়া উঠিল।

এক মাস পরে স্থানীয় স্থল হইয়া উঠিল। কিন্তু ইতোমধ্যে স্ববোধ ও স্বকুমারীর সম্বন্ধ সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হইয়া গেল।

লক্ষ্যভূত স্ববোধ স্বকুমারীকে চিনিবার চেষ্টা করিতেও সাহস করিল না; কিন্তু বুদ্ধিমতী স্বকুমারী এই সুযোগে স্ববোধের “নাড়ী নক্ষত্র” অধ্যয়ন করিয়া ফেলিল।

স্বকুমারী স্ববোধের নাম রাখিল “সতীন”। শুনিয়া বেচারী স্ববোধ লক্ষ্যে মরিয়া গেল। এখন হইতে দুইজনের সম্বন্ধটা প্রতিযোগিতার না হইয়া আন্তর ও আপাতকারীর দাঁড়াইল।

স্বকুমারী সুযোগ পাইলেই স্ববোধকে দুই একটা বোঁচা না মারিয়া ছাড়ত না এবং স্ববোধ বোঁচা খাইবার ভয়ে সর্বদাই ব্যাকুল হইয়া পলাইয়া বেড়াইত।

স্থানীয় দিন কতক এই কৌতুকাবহ দৃশ্য সামনে উপভোগ করিল। কিন্তু স্ববোধের চরিত্র দেখিয়া ক্রমশঃ তাহার চক্ষে কল্পনার সজ্জা হইল।

এক দিন সে স্বকুমারীকে বলিল, “দেখ, স্ববোধ বেচারী নিত্যন্ত ‘ভাল যাত্রা’—‘ভার’ প্রতি এরকম অত্যাচার করটা ভাল হয় না। বেচারী তোমার ভয়ে বাড়ী ভাঙার আসাই ত এরকম ছেড়ে দিতেছে; এরকম ব্যাপার আর কিছুদিন চললে হয়ত একেবারে দেশ ছেড়ে পলাবে!”

স্বকুমারী হাসিয়া বলিল, “সতীনকে কোন্ গ্রীষ্মক কমা করিতে পারে?”

(৬)

কিন্তু স্বকুমারীও ক্রমশঃ এই যুগ্ম-ব্যাপারে শ্রান্তি বোধ করিতেছিল। অন্তিমতঃ অন্তঃখনি বোঁচা খাইয়া উত্তেজিত হইয়া উঠে এবং মধ্যে মধ্যে

আশ্বাতের পরিবর্তে প্রতিঘাত করিতে উদ্যত হয়, তবেই শিকারীর আনন্দ। ক্রমাগত প্রাণভয়ে পলায়মান ভক্তের অহুসরণ করিয়া ভয়ানক আনন্দ হয় না। সুতরাং সূর্যমারী যখন দেখিল যে, তাহার ভীক শরণলাল মৃত্যুকাতৃপুকে বিদ্ধ করিতেছে মাত্র, কোনপ্রকার বাধা প্রাপ্ত হইতেছে না, তখন সে-ও ক্রমশঃ ক্রান্ত হইয়া পড়িতে লাগিল।

প্রতিযোগিতার ভাব অপসৃত হইলে সূর্যমারী সুবোধের গণাবলী অধ্যয়ন করিয়া মুগ্ধ হইল।

তাহার নির্মল চরিত্র, অসাধারণ নিঃস্বার্থপরতা, এবং সুধীরের প্রতি অকৃত্রিম অহুসরণ সূর্যমারীর চিতে তাহার প্রতি প্রভাব সঞ্চার করিল। সুতরাং সূর্যমারী কিছুদিন পরে সুধীরের প্রতি তাহার পূর্বাচরণের প্রায়শ্চিত্ত করিতে কৃতসংকল্প হইল।। কিছুদিন বামিনীতে এ বিষয় লইয়া গোপনে পতীর আলোচনা চলিল।

সূর্যমারীর তাড়না বইতে নিক্ত ৩ পাইয়া সুবোধ আবার অংকিত চিতে অন্তঃপুরে দাওয়াত করিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

এক দিন সন্ধ্যার সময় জনযোগাস্থে তাহার বাহির হইবার উপক্রমকালে সহসা সূর্যমারী তাহার সম্মুখে আসিয়া বলিল, “সুবোধ বাবু!”

বহুদিন পরে সূর্যমারীকে সম্মুখে আসিতে দেখিয়া সে একেই বিশ্বাস হইয়াছিল, তাহার উপর তাহার মুখে “সতীনের” পরিবর্তে “সুবোধ বাবু” সম্বোধন শুনিয়া সে যেন স্তম্ভিত হইয়া পেল।

ভয়ে ভয়ে সে একবার চকিতবৃত্তিতে সূর্যমারীর মুখের দিকে চাহিয়া লইল। কিন্তু আজ তাহার স্নেহকোমল প্রশান্ত মুখে আক্রমণের চিহ্ন মাত্র দেখা গেল না।

সূর্যমারী বলিল, “আপনার কাছে আমার একটি প্রার্থনা আছে। আমার একটি বোন এখানে এসেছে। তা’র পড়াওনাও বড় আগ্রহ। তা’কে যদি একটু একটু পড়ান—”

সুবোধ মাথা না তুলিয়াই বলিল, “বেশ ত।”

সূর্যমারী বলিল, “তা হ’লে আজ সন্ধ্যার পরেই তা’কে আপনার কাছে পাঠিয়ে দেব।”

সুবোধ দীক্ষিত হইয়া চলিয়া গেল ।

কিন্তু সন্ধ্যার পর যখন সত্যসত্যই সুবোধিনী সুকুমারীর সঙ্গে খাতা পত্র লইয়া নতুনবে সুবোধের কাছে প্রবেশ করিল তখন সুবোধ চকিত হইয়া অজ্ঞাতপারে উঠিয়া পাড়াইল ।

সুবোধিনী সুকুমারী অপেক্ষা দুই বৎসরের মাত্র ছোট । সুতরাং তাহার চতুর্দশ বৎসরের নবপুলিত মেহবরদী লজ্জাশীল। সুবোধচন্দ্রকে সহসা চাকিত করিয়া দিয়াছিল ।

সুবোধের সন্মুখে দেখিয়া সুকুমারী হাসিয়া বলিল, “এটি আপনার ছাত্রী, মাষ্টার মশাই ? ইন্সপেক্টর ‘সাহেব’ নয় ।”

সুবোধ অবিকৃত লজ্জিত হইয়া আসনের উপর আসিয়া পড়িল ।

ছাত্রী সম্মুখে বসিয়া নতমুখে বীরে বীরে পুস্তকগুলি সাজাইতে লাগিল । সুকুমারী বৃহৎ হাসিয়া লম্বপদে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল ।

সুবোধ সে দিন অধ্যাপনা কার্যে বিশেষ ক্রটিই দেখাইতে পারিল না । লজ্জার তাহার কথা কঠেই রহিয়া যাইতে লাগিল ।

কিছুদিন পরে লজ্জার সন্মুখে অনেকটা কাটিয়া গেল বটে ; কিন্তু আর এক একবারের বিপর সুবোধচন্দ্রকে নিতান্ত পীড়িত করিতে লাগিল ।

ছাত্রীর শিল্পের প্রতি অপেক্ষা তাহার সুবোধিনীর ইচ্ছাই যেন তাহার চিত্তে প্রবলতর হইয়া উঠিতে লাগিল । ‘মেঘনাদবধের’ অধ্যায়ের ভুল তাহার কর্ণকে পীড়িত করে না, ছাত্রীর মধুর স্বরটুকুই তাহার কর্ণে সুধা বৃষ্টি করিতে থাকে । অকণারও প্রতি সহস্র উৎপীড়নকে তাহার কিছুমাত্র দুঃখের কারণ বলিয়া মনে হয় না, ছাত্রীর লিখনরত সুকুমারী অঙ্গুলিগুলিই তাহার লুপ্ত কৃষ্টিকে আকৃষ্ট করিয়া রাখে এবং দৈবাৎ কোন ভুল দেখাইয়া দিলে ছাত্রীর সৌর গন্তে যে মধুর অক্ষরমালা সন্ধ্যার হয় তাহা তাহাকে বেদন প্রদান করে । কল্যাণকর ও অলঙ্কারবিশিষ্ট মনোহর রচনাও তাহাকে তাদৃশ্য তৃপ্তি দান করে না ।

সে ছাত্রীর বিশাল চক্ষুর দিকে চাহিতে সাহস করে না ; অথচ সেই ক্ষতিকর চিত্ত গবাক্ষের কথা দিয়া তাহার মনের কথা আভাস পাইবার জন্য তাহার চিত্ত একান্ত উৎসুক হইয়া উঠে ।

আজ কাল সুবোধকে সর্বদাই অন্যমনস্ক দেখায় । সুধীর হাসিয়া বলে, “কি সুবোধ, ছাত্রী কি বুঝ কঠিন Problem দিচ্ছে না কি ?”

সুবোধ লজ্জিত হইয়া বলে “না! না! টেবের Questionমিতে হবে কিনা; তাই মনে মনে প্ররণা একবার ঠিক করে রাখছি।”

সুধার হাসিয়া বলে, “টেব কাহার ঠিক বলা যায় না—ছাত্রের না মাষ্টারের?”

এইরূপে ছয় মাস ছাটিয়া গেল।

(৭)

এক দিন সন্ধ্যার সময় সুধুমারী আসিয়া সুবোধকে বলিল, “দেখুন, সুবোধ বাবু, সুধাসিনী ত বড় হয়ে উঠল; তা’র বিয়ের একটা ঠিকঠাক না হলে আর ত চলে না। আপনার সন্ধানে কোন পাত্র আছে?”

সুবোধ অত্যন্ত চকিত হইয়া উঠিল। ভাল করিয়া মনের ভাব প্রকাশ করিতে না পারিয়া নিতান্ত অসংলগ্নভাবে বলিল “বিয়ে?—এখনি?—পাত্র—হাঁ—তা—কই?”

সুধুমারী মনে মনে হাসিয়া বলিল, “বাবা হু’ তিনটি পাত্র ঠিক করেছেন; এর মধ্যে কোনটি ভাল, বন্ধন দেখি।” এই বলিয়া সুধুমারী বাছিয়া বাছিয়া এায়ের নিত্য “সপাত্রভণির” নাম করিতে লাগিল। সুবোধ অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া বলিল, “না না! এরূপ পাত্রের সঙ্গে সুধাসিনীর বিয়ে কিছুতেই হতে পারে না”।

সুধাসিনী করুণায় বলিল, “বাবা পরিব মাহুদ টাকা মইলে কি আল কাল ভাল পাত্র মিলে?”

সুবোধ উচ্ছ্বাসভরে বলিয়া ফেলিল, “টাকা? কত টাকা হ’লে ভাল পাত্র হয়?”

সুধুমারী হাসিয়া বলিল, “অপনি দেবেন না কি?”

অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া সুবোধ বলিল, “না! না! আমি টাকা কোথায় পাব বন্ধন!”

সুধুমারী বলিল, “তাহ’লে একটু নজর রাখবেন। যদি কোন পাত্রের সন্ধান পান।”

সেই দিন হইতে সুবোধকে আরও অধিক ছুঁতাতাগ্র দেখাইতে লাগিল। সুবোধ সেই দিন রাজিতে পোপনে একখানি নূতন কাবতার খাতা প্রস্তুত করিল। খাতার উপরিভাগে লিখিত হইল “ছন্দ-দেবতা।” এক মাস পরে সুবোধনু আসিয়া অক্ষুণ্ণনেত্র মাষ্টার মহাশয়কে প্রণাম করিল। সুবোধ

বলিল, “আজট বাবে, সুহাসি ?” সুহাসিনী নতমুখে বলিল, “না ; কাল তোরে ।”

সুবোধের মুখ সহসা পাতুর হইয়া গেল । সে আর কথা কহিতে পারিল না । তাহার বুকের সমস্ত শিরশ্বলা যেন কঠোর বেদনার স্মারিমা উঠিল । সুহাসিনী অনেকক্ষণ ঠাড়াইয়া ঠাড়াইয়া নতমুখে চুপুয়া গেল । সুবোধের মনে হইল সুহাসিনী যাইবার সময় যেন অকণ্ঠে চক্ষু মুছিতে মুছিতে চলিয়া গেল । সুবোধের সমস্ত হৃদয় যেন সহসা আকুল আবেগে তরলিত হইয়া উঠিল । কিন্তু সে বহু কষ্টে হৃদয়বেগ সংযত করিল ।

সুহাসিনীর বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল । তাই সে পিতৃালয় যাইতে-ছিল ।

সুবোধ অনেকক্ষণ অন্ধকারে বসিয়া বসিয়া “বিসর্জিত প্রতিমা যথা দশমী দিবসে” ধীরে ধীরে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল । তাহার আলক্ষে সবার্দ্ধের ছিন্নশংখ্য দুইটি উল্ফল চক্ষু সহসা উল্ফলতর হইয়া উঠিল । সে স্নাতিক্তে সুবোধ সমস্ত দ্বাত্রি জাপিয়া আকুল হৃদয়ে গাথিল,

গোহুলিত অরুণিমা যায় যবে নিবি
বসুধাতী পরে শিরে তারার রতন ।
“সুখ্যমুখী যুগে যবে নরন-পল্লব
নিশাগন্ধা পূর্ণ করে সৌরভে গগন ॥
নরহৃদি হ’তে যবে সুখ যায় চলি
শান্তি নাই করে তার বেদনা হরণ ॥

সুবোধ পরাদন তাহার “জীবন-দেবতা” নামক ষাণ্ডাবানি আকুল চিত্তে পুনঃ পুনঃ ঘূর্ণিয়াছিল ; কিন্তু কোথাও তাহার সন্ধান পায় নাই ।

(৮)

সুহাসিনীর সঙ্গে সঙ্গে সুহাসিনীও পিতৃালয়ে গিয়াছে । বহুবোধের বিষল স্রোতে এখন আর বাধা দিতে কেহই নাই । কিন্তু জ্ঞানাপি বহুবোধের উৎস আর তেমন কারিয়া উজ্জ্বলিয়া উঠিতেছিল না । সুবোধের হৃদয়ে যে স্থানে সুধীরের স্মৃতি অপ্রতিবৃত্ত মাধবায় বিরাজ করিতেছিল, আজ তথায় কাহার নিবিড় ছায়া পড়িয়াছিল ? সুবোধ প্রাণপণে সে ছায়া অপসৃত করিতে চেষ্টা করিতে-ছিল, কিন্তু ছায়া বৃণ্ডান্ত না হইয়া আরও বৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল ।

কণ্ঠ নবীনচন্দ্র গাথিয়াছেন—

“অনন্ত সাগরবক্ষে ভাসে লুপ্তকরুছবি
 পিছুও ত পারে না তাহা মুছিতে কখন
 জুগিয়া রুপ স্বপ্ন প্রসারি ওরঙ্গকর
 জুগাইতে ছবি পিছু চাহে যদি আর
 এক ছবি হয় শীত হয় শতসংখ্যাতীত
 শত গুণ উজ্জলিত করে পারাবার।”

সুবোধের অদৃষ্টেও ঠিক তাহাই ঘটিয়াছিল। জন্মের এই আলোড়ন
 লুকাইবার জন্য সুবোধ যতক্ষণ পারিত সুদীরের নিকট হইতে দূরে থাকিবার
 চেষ্টা করিত। সুদীরও ইহাতে বাধা দিত না।

একদিন প্রাতঃকালে সুবোধকে ডাকিয়া সুদীর বলিল, “কাল থেকে ত
 তোমাঘের পরমের ছুটা। চলনা ছুটীতে নৌকা করে দিন কতক বেড়িয়ে
 আসা যা'ক।” সুবোধ জন্মের সংগ্রামে কতদিকৃত হইয়া উঠিয়াছিল।
 সে আগ্রহের সহিত বলিল, “বেশ ত”।

পরদিন প্রাত্বে মাঝিরা নৌকা ছাড়িয়া দিল। প্রত্যন্তের বায়ুচকল;
 উদ্ভিঙলি রবিকরে ছাদিতে লাগিল; জীরে পুষ্পবচিত তরুণ হইতে নয়ন-
 রঞ্জন বিধগকুল মধুর সঙ্গীত বর্ধন করিতে লাগিল; নীরবে শীতল বা
 আদিয়া চারিদিকে কুসুমপৌরত ছড়াইতে লাগিল।

বহুদিনের পর সুবোধচক্রে বেনাপৌড়িত জন্ম প্রকৃতির আনন্দ-সমুদ্রে
 অবগাহন করিয়া নিগ্রাম হইল।

মধ্যাহ্নে অহারাদির ধুম পড়িয়া গেল। দুই বন্ধুতে মিলিয়া হান্ত আনন্দ
 ও আবেগ মিশাইয়া রঞ্জন করিল এবং পরম ঐতিহ্যের উভয়ে তোজন কার্য
 সম্পন্ন করিল।

অপরাহ্নে তরুণী আবার নদীকূলে ভাসিয়া চলিল। সাত্তা রবিকরে
 পল্লিমাকাল অপূর্ণ সুখমাধারণ করিল। নদীকূলে তাহারই প্রতিবিম্ব বিচিত্র
 শোভাবিভার করিল। উজ্জ্বলচিতে চাহিতে চাহিতে সুবোধ আনন্দ সাগরে
 ভাসিয়া চলিল।

কখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে কেত লক্ষ্য করে নাই। জ্যোৎস্নার রক্তপ্রভা
 দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, নদীকূলে হুলিতেছে, তরুণিরে নাচিতেছে,
 আকাশে শুইয়া ঘুমাতেছে! বঠাৎ নৌকার গতি রুদ্ধ হইল।

সুবোধ বলিল, “বেশ রাত। আরও খানিক চলুক না।”

সুখীর হাসিয়া বলিল, “রাত্রি নহুট। বাজিয়া গেল। তোমরা কবি লোক তোমাদের না হয় কোথায় চলতে পারে, কিন্তু আমাদের মত অর-
সিকের জঠরানলে ককিৎ স্পর্শযোগ্য আছতি না দিলে ত চলিব না।
এইস্থলে এক খানা বড় গ্রাম আছে, দেখা যাউক যদি কোন খাদ্য দ্রব্য
পাওয়া যায়।”

..

সুখীর দুই জন মাথিকে কাণে কাণে কি বলিয়া গ্রামের দিকে পাঠাইয়া
দিল। সুবোধ চন্দ্রালোকিত ভীতের দিকে চাহিয়া মুগ্ধচেত বসিয়া রহিল।
কণকাল পরেই গ্রামপ্রান্তে সমুদুল আলোকশ্রী দেখা গেল। সঙ্গে সঙ্গে
বাদ্যধ্বনিও প্রতিগোচর হইল। বাদ্য ও আলোক ক্রমশঃ নৌকার দিকে
আসিতে লাগিল।

সুবোধ বলিল, “ও কিসের আলো সুখীর ?”

সুখীর নিভাস্ত অনাসক্ত ভাবে বলিল, “বোধ হয় বিবাহৎসব। আজ
একটা বিয়ের দিন আছে কি না।” বিবাহের কথা সুবোধের সুহাসিনীর
কথা বনে পড়িল। তাহার চন্দ্রালোকদীপ্ত মুখমণ্ডল সহসা বিবাদের
অন্ধকারে ঢাকিয়া গেল। অনেকক্ষণ শুকু হইয়া থাকিয়া সুবোধ বলিল,
“সুহাসিনীর কোন খবর পেরেছ ?”

সুখীর বলিল, “তারও আশ্রয়ে রাত্রিতে বিবাহের কথা। হ’বে কি না
ঠিক জানি না।”

সুবোধ আর কোন কথা কহিল না। তাহার অক্ষপূর্ণনেত্রে কাহার
অন্দন ছবি ফুটিয়া উঠিল।

বিবাহশোভাযাত্রা ক্রমশঃ নদীতীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। সুবোধ
বলিল, “এতিকে আসে কেন ?” সুখীর গম্ভীরভাবে বলিল, “বোধ হয় পারে
যাবে।” কিন্তু তাহাদের পারে ঘাইবার কিছুমাত্র উৎসাহ দেখা গেল না।
তাহারা ঠিক নৌকার সম্মুখেই সারি দিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর চারিজন
বলিষ্ঠ যুবক গলায় গামছা দিয়া সুবোধের নিকটে আসিয়া বলিল,
“মশায়, ভক্তলোকের জাতিরক্ষা করিতেই হইবে।”

সুবোধ নিভাস্ত বিম্বিত হইয়া বলিল, “সে কি ? আমি কি করিব ?”

তাহাদের কথা হইতে বুঝা গেল যে, গ্রামের গণ ভক্তলোকের কস্তার
সঙ্গে গ্রামান্তরে এক পাড়ের বিবাহসম্বন্ধ সমস্ত স্থির হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু
পাডপক্ষ ঠিক বিবাহের পূর্বেই নিভাস্ত অভ্যুত্থান করিয়া পাড উঠাইয়া লইয়া

গিয়াছে। এক্ষণে রাজির মধ্যেই কস্তার বিবাহ না হইলে ভ্রলোকের জাতি যায়। সুবোধচন্দ্র শুভানুষ্ঠানে যখন অঘাতিত ভাবে তাহাদের প্রায়ে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, তখন এ উপকার তাঁহাকে ক’রতেই হইবে।”

সুবোধ নিতান্ত বিপন্ন হইয়া বলিল, “সে কি, মশাই? আমি কিছুতেই বিবাহ করিতে পারিব না। বিশেষ পাঞ্জীর সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না—”।

মুলকরা হাসিয়া বলিল, “সে জন্য কোন চিন্তা নাই। আমরা এমন নিরোধ নই। গোত্র, কুল, পর্যায়ে সব ঠিকঠাক মিলিয়া গেছে। আমাদের পরম সৌভাগ্য। আমরা এতটা আশা করি নাই। ওরে পাঞ্জী নিয়ে আস।” পাঞ্জী আসিয়া উপস্থিত হইল। দ্বিতীয় ব্যক্তি উচ্চারিত হইবার পূর্বেই পাঞ্জী পাঞ্জীর মধ্যে স্থাপিত হইল।

কিংকর্তব্যাবিন্যাস সুবোধ চীৎকার করিয়া ডাকিল, “সুখীর”! কিন্তু সুখীরের কোনই সন্ধান পাওয়া গেল না।

যথাসময়ে শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। সুবোধ কোভে, রোবে কস্তার দিকে একবারও চাহিয়া দেখিল না।

বাসরঘরে প্রবেশ করিয়া সহসা সুকুমারীকে সম্মুখে দেখিয়া সুবোধ ভস্মিত হইয়া গেল। সুকুমারী এ স্থানে কেমন করিয়া আসিল?

সুকুমারী হাসিয়া একহস্তে সুবোধের খাতাবানি ধরিয়া এবং এক হস্তে সুহাসিনীর অন্তর্গত উঠাইয়া বলিল “দেখ দেখি, ‘জীবন দেবতাটি’ চিনা লোক কি না!”

সুবোধ সজ্ঞায় রক্তিম হইয়া উঠিল।

সুকুমারী হাসিয়া বলিল “সতীন, মনে রাখো যে, চোরের উপর বাটপাড়ও আছে।”

সুখীর হাসিতে হাসিতে আসিয়া বলিল, “কি সুবোধ, দ্বাত্রী পাঠ্য পুস্তকটা এইবার দোষ দয় একটু বদলে দিতে হ’বে!”

সুবোধ হাসিয়া বলিল “যাও। তোমাদের এই সব বড়বড়।”

দুই “সতীনে” আর কোন বিরোধ নাই। সুবোধ এখন জিলা আদালতে ওকালতী করে, এবং দুটি পাইলেই অবকাশের দিনগুলো সজীক “সতীনের” কাছে আসিয়া আমন্ত্রণ কাটাইয়া যায়।

ঐতিহাসিকমোহন গুপ্ত।

নাস্তিকের ধর্ম্ম স্থান ।

(২)

ইহার কিছুদিন পরে এই জলবাহকটি অপর একটি ক্রম সহকর্মীকে চিত্তিৎসার্য্য
সেমেটোর নিকট আনয়ন করিল । সে পরম সপ্রতিভভাবে নিজ উপকারককে আনাইল যে,
নাস্তিককে অপর কোনও ভাকারের নিকট লইয়া যাইতে তাহার মন মরে নাই । সেমেটোর
দুর্ভাগ্যে তা কোপনমতাব হইলেন এই ব্যক্তির চরিত্রের বিশেষণে মুগ্ধ হইয়া তাহার করকম্পন
করিলেন এবং তাহাকে বলিয়া দিলেন যে, তাহার সমবায়সারী কেহ পীড়াস্রম
হইলেই সে যেন তাহাকে তাহার নিকট লইয়া আইসে । তিনি পীড়িত
ব্যক্তিকে সরকারী হাসপাতালে পাঠাইয়া দিয়া বিশেষ মরমহকারে তাহার
ঔষধপথ্যাদির ব্যবস্থা করিলেন । বিজ্ঞানসংক্রমকবার লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, অত্যন্ত
সেবাসীদগকে, বিশেষতঃ তৎকালীণ জলবাহকসংকে, সেমেটোর বিশেষ অনুগ্রহের দৃষ্টিতে
বেচিয়া থাকেন । তিনি সরকারী হাসপাতালের সকল রোগীর রোগীদগকেই বস্ত্রের সহিত
পরীক্ষা করিতেই বলিয়া জলবাহক সম্মান্যের প্রতি তাহার যে বিশেষ কোনও
সহানুভূতির কারণ ব্যক্তিতে পারে বিজ্ঞানসংক্রমক মনে এক কথা প্রবলে উদ্ভিত হয় নাই । এক দিন
বিজ্ঞানসংক্রমক সেটোমারিণ পিঙ্কায় সম্মান্য হইয়া অতিক্রম করিবার সময় হইতে বেচিতে পাইলেন
যে, তাহার নিরীহরবাহী পৃষ্ঠপোষক ও শিক্ষাও হইয়া তৎকালপরে প্রবেশ করিতে-
ছেন । তখন পিঙ্কায় কোন পরলোকগত আত্মার উদ্দেশে মনোবলি অনুষ্ঠান হইতেছিল ।
বিজ্ঞানসংক্রমকবেলেন, সেমেটোর নতজানু হইয়া কুমারী দেবীর মর্মে পুরোহিতের উচ্চারিত
অন্তেষ্টিক্রিয়ায় স্রোতঃস্রমগুলি নিবিষ্টচিত্তে প্রবণ করিতেছেন । প্রকৃত এইরূপ মতপরিবর্তন
বেচিয়া লিয়া বড়ই আশ্চর্য্যবিত হইলেন । তিনি তাহাতে লাগিলেন, যোগ্য ক্যাবলিক
বর্ধসম্মান্যের মোতাযাত্রার যদি ইহাকে বহুতে পরিভ্রম আন্তর্য্য প্রবণ করিয়া লইয়া যাইতে
দেবিতাম তাহা হইলেও না হয় স্মৃতিতাম যে, ইহা তাযাযা মাত্র ক্রিষ্ট এতদ্ব্যবস্থানে নির্জনে
বর্ধসম্মান্যে রত থাকার নিম্ভটই কোন বিশেষ কারণ আছে । কুমারী মরিচবের বাস্তবের
স্বতন্ত্রতা আবিষ্কারের জন্য ইনি কিছু আর এখানে আইলেন নাহি । কোন পরিচিত ব্যক্তির
ক্রিয়াকলাপ এইরূপ শুভভাবে পর্য্যবেক্ষণ করা নিষ্টতানকত করে বলিয়া বিজ্ঞানসংক্রমক
না করিয়া চলিয়া গেলেন । সেইদিনই ঘটনাক্রমে সেমেটোর বিজ্ঞানসংক্রমককে আহ্বার্য্য কোন
ভোজনমাগরে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন । আহ্বার আর পরিসমাপ্ত হইবার সময় বিজ্ঞানসংক্রমক
পুরাতন ক্রিয়াই প্রকটকৃত্য একুজিত কথা উপাণিত করিলেন এবং এই রোগীর অনুষ্ঠানকে
মোটামোটা অহমনের সহিত তুলনা করিতে লাগিলেন । সেমেটোর ইহার প্রতিবাদ করা ঘুরে
ফারুক ইতিহাস হইতে এই সকল অনুষ্ঠানবর্ধিত বর্ধবিরোধবসন্তীর নানা ঘটনার উল্লেখ
করিয়া খীর নাস্তিকতার প্রতিপাদন করিতে লাগিলেন । ভোটেরের পন্থায় অনুসরণে তিনি
বর্ধবিরোধক এছাতির উল্লেখ করিয়া প্রকটভাবে অনর্গল ব্যকোক্তি করিতে লাগিলেন

ভাষাতে তাঁহার বর্ণনগুণবিবর্তনের কিস্থায় আভাস পাওয়া গেল না। বিদ্যামণি' মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "তাঁহা হইলে আমার আত্মকালের সেই বার্ষিকশ্রবণ অন্ত্রটি খেলেন কোথায় ?" তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে যেরূপ ঘনিষ্ঠতা তাহাতে সেসূত্রে'র যে তাঁহার সহিত মিথ্যাচরণ করিবেন তাহা তিনি কোন মতেই মনে করিতে পারিলেন না। তিনি যে ব্যক্তিকে নির্জ্ঞান অভ্যন্তরে দেখিয়াছিলেন তিনিই যে তাঁহার অধ্যাপক এ সম্বন্ধে তাঁহার বোঝার সম্বন্ধে জ্ঞানিল। ইতঃপূর্বে তাঁহার উভয়ে একাধিকবার অনেক পত্রীয় বর্ণনাবের পরসেই যে যে ব্যক্তিকতার ছুরিকাচালনা করিয়া তাঁহাদিগের অস্তিত্বের মত-বাদের সমর্থন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। সুতরাং সেসূত্রে'র যে হঠাৎ একগু পরিবর্তন হইবে তাহা বিদ্যামণি'র সম্বন্ধে বিশ্বাস হইল না।

ইহার পর আর তিন মাস কাটিয়া গিয়াছে। বিদ্যামণি' পূর্বোক্ত ঘটনাটি বিশ্বস্ত না হইলেও সে বিষয়ে আর কোন অনুসন্ধান করেন নাই। সেই বৎসরের মধ্যেই তিনি এক দিন হাঁসপাতালের অপর একজন টিনিংসককে যেন কোন কথা জিজ্ঞাসা করার হলে সেসূত্রে'র হস্তধারণ করিতে দেখিলেন। কথাক্রমে তাঁহার কণ্ঠে গেল। ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, "আপনি জান কি উদ্দেশ্যে সেস্ট মার্লিন নির্জ্ঞান গিয়াছিলেন?" সেসূত্রে'র তত্ত্বরে বলিলেন, "আমি আন্তলিনের ডিক্‌গপটীর অত্মরোপনত তথ্য একজন বৃদ্ধ বংশাধিককে দেখিতে গিয়াছিলাম। বেচারী জাহ্নতে অস্থায়ী রোগ হইয়া বড়ই কষ্ট পাইতেছে।" তাঁহার এই কৈফিয়তে চিকিৎসকটি সমস্তাৎ লাভ করিলেন বটে, কিন্তু বিদ্যামণি'র সম্বন্ধে ব্রূ হইল না। তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "চিকিৎসা করিলে যাওয়া কখনই সত্য নহে। ইনি নিশ্চয়ই সেদিনকার মত পারমলৌকিক অনুষ্ঠানে যোগদান করিতে গিয়াছিলেন।" বিদ্যামণি' নিজ স্বাক্ষর লিপিতে নিজের যাওয়ার ভাষণে তা সম্বন্ধে টুকিয়া রাখিলেন। ছিন্ন করিলেন, পর বৎসর পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, সেই তারিখে ও সেই সময় তাঁহার সহিত সেসূত্রে'র সেই স্থানে সাক্ষাৎ হয় কি না। যদি বৎসরান্তেও তাঁহাকে সেই স্থানে দেখা যায় তাহা হইলে তাঁহার ভক্তিভাবের এইরূপ নিয়মিত অভ্যাসের "আবোহ"-এপ্রণীকূলক বৈজ্ঞানিক পবেদনার বিষয়ীভূত হইতে পারিবে। কারণ তাঁহার জ্ঞান অজ্ঞানপন্ন ব্যক্তির চিত্তায় ও কার্যে যে বিকৃতভাব প্রকাশ পাইবে ইহা কোন মতেই সত্য নহে না। পরবৎসর সেই তারিখ ও সেই সময় বিদ্যামণি' দেখিলেন যে, তাঁহার পূজাপাণে বহুর কেরিগলেট গাড়ীখানি "লা ক্রপে জুঁন" ও "লা ক্রপে পেটালিও" নামক রাস্তায়- ১

যোড়ে দাঁড়াইয়া আছে। তিনি তথ্য দাঁড়াইয়া সেসূত্রে'র গন্তবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, সেসূত্রে'র অতি সন্তর্পণে পথিপাথর আঁচীরের ধারে ধারে অগ্রসর হইয়া সেস্ট মার্লিন বর্ণমালিকের অভ্যন্তরে অব্রণ করিলেন এবং সুখারী দেবীর বৈদিকার সক্রিকটে বসজাহ্ন হইয়া উৎসব-এক অনুষ্ঠানাদি যথোপাযের সাহিত এবং ও নূর্ণন করিলেন। বিদ্যামণি' আর সে সময় সেসূত্রে'র সহকারীরূপে নিমুক্ত ছিলেন না। এই ব্যক্তিই যে প্যারিসের সর্বপ্রথম অস্বাভিকিৎসক ইহাতে আর তাঁহার কোন সম্বন্ধে রহিল না। রহত ক্রমেই খনাইয়া আসিতেছিল এবং সেসূত্রে'র বিলম্বাভিগরে ইহা আরও জটিলতর হইয়া

উঠিল। বেসূরেন্জ পিৰ্জা ত্যাগ করিবার পর বিদ্যানন্দ পিৰ্জাকে কের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “এইমাত্র যে ভক্তলোকটি গেলেন, তিনি কি আছে? এ স্থানে আসিয়া থাকেন?” পিৰ্জারক্ষক ভবন জিনিষগত গুহাংগা রাখিতেছিল। সে উত্তর করিল, “আমি নিশ বৎসর কাল এই স্থানে চাকরী করিতেছি, মণীয় বেসূরেন্জ বৎসরে চারি বায় এইস্থানে আসিয়া ‘মাস’ সঙ্গীত (ঐক্যবৈদিক অনুষ্ঠানসংক্রান্ত মাসিক স্তোত্র) শ্রবণ করেন। বলিতে কি তাঁহারই এককালীন দত্ত অর্থদ্বারায় এই শ্রেতকৃত্যটি নিষ্পন্নিতভাবে হইয়া থাকে।” বিদ্যানন্দ পিৰ্জা ত্যাগ করিবার সময়ে তাবিতে লাগিলেন, বেসূরেন্জের নিজ অর্থদ্বারে স্থায়ী পাত্রাদ্বারা শ্রেতকৃত্য-অতিষ্ঠা সুব্যবস্থায় সম্ভবসম্ভাবনার দ্বারা অদৌকিক। অন্ততঃ কোন বিজ্ঞানবিদ চিকিৎসক ইহাতে সন্নিধান না হইয়া থাকিতে পারিবেন না।

এই ঘটনার পর বেসূরেন্জের সহিত বিদ্যানন্দ রোগীর গৃহে ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণে সাক্ষাৎ হইত বটে, কিন্তু সুযোগ না হওয়ায় তিনি এ প্রসঙ্গের উত্থাপন করিতে পারিতেন না। বিদ্যালয়পের অবসর না ঘটিলে ধোপনীর কথা পরস্পরের নিক প্রকাশ করা যায় না। বিদ্যানন্দ বৈঠকখানার আচান কে-রামার তেল দিয়া অস্ত্রকুণ্ডসমিহিত পানপীঠে গা রাখিয়া বিদ্যামুগ্ধভাবে আশ্রয়প্রাপ্ত করিবার অবসর কংকণবহুল চিকিৎসকজীবনে কদাচিত্র ঘটয়া উঠে।

সাত বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দ তীব্র বিক্রোহ লইয়া উপস্থিত। কিন্তু ন্যায়বিচার্য্য এমন দাজ্ঞকের আবাসগৃহ আক্রমণ করিতে উদ্যত, বর্ষ বসিরাশীর্ষ অধীনভিত পণ্ডিত “কুণ্ড”গুলি জলে করিয়া তাহার। আপনাদিগের সাধারণ-তত্ত্বগতগতীয় পত্রাকর্ষণে প্রবর্তনে লুপ্তে। রাজস্বোহ ও অবিবাসের প্রোতে দেশের সকল অংশ নব্যাক্রমে পরিব্যাপ্ত। এক্ষণ সময়েও বিদ্যানন্দ এক দিন বেসূরেন্জকে সেউগারিগ পিৰ্জার ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিলেন। কোনরূপ বিস্তারিত ভাব প্রকাশ না করিয়া তিনি দীর্ঘবে তাঁহার পঞ্চাঙ্গাবী হইলেন এবং কোন পরলোকপথ আশ্রয় বহুলোকে দীর্ঘ বর্ষজোহগুলি একত্রে শ্রবণ করিলেন। উভয়ে পিৰ্জা ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিলে বিদ্যানন্দ তাহার বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনার এইরূপ চলনার কি প্রয়োজন? আমি ত আপনাকে এইবার বহিরা তিনবার ভজনালয়ে অংগন করিতে দেখিলাম। আপনি সুখেই বা কেন একরূপ বলেন এবং কারোই বা কেন তাহার বিকৃতচরিত্র করেন তাহা সন্দেহ করিয়া বলিতে হইবে। আপনি ঐশ্বরের অস্তিত্ব মনে ন, অথচ বর্ষাশ্রমে রত—ইহাওই না কারণ কি? আজ আমি যথার্থ উত্তর না লইয়া আপনাকে ছাড়িয়া দিতেছি না।” বিদ্যানন্দ এই কথার উত্তরে বেসূরেন্জ বলিলেন, “ইহাতে আর বিস্তারিত বিবরণ কি? আজকাল আমার মত অনেক বার্ষিকই আছেন যাঁহারা বহিরে বর্ষভাব দেখান বটে, কিন্তু অন্তরে মনোবৈরাগ্য মত নাস্তিক।”

এই বর্ষের তিনি ভবানীজন রাজনীতিক্রে স্থবিখ্যাত করেন ব্যক্তির উদ্দেশে বিক্রপবাপ্য নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য, এই সকল বহাঙ্গবর্ণের চরিত্র এক্ষণ মত যে, তাঁহাদের সহিত বাইকেলের ভক্তদাম ও খোলিয়ারএ টাউন্টের চন্দ্রের বনেই সৌদাম্য

আছে। বিদ্যানন্দ বলিতে লাগিলেন, “এ সব কথা শুনিবার জন্য আমার বড় কৌতূহল নাই। আপনি এক্ষণে যে অনুষ্ঠানে রত ছিলেন তাহার উদ্দেশ্য কি? আর কেনই না আপনি নিজ ব্যায়ে এই শ্রেষ্ঠকৃত্যের ব্যবস্থা করিয়াছেন?”

সেন্দূরেন্দ্র বলিলেন—“আমি ত আর বরপের কুলেই উপনীত। এক্ষণে তোমার নিমিত্ত এ সব কথা গোপন করার লভ্য কি? যখন ভূমি আমার গুণ্ডাজ্ঞ আশ্রিত্যের জন্য এতই আশ্রয়প্রাপ্ত তখন তোমার কৌতূহলনিবৃত্তির জন্য সমস্ত বাণ্যেরই খুলিয়া বলিব।” এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে ঠাহারা পারসের একটা লক্ষ্য হস্তা বহিরা চলিতে লাগিলেন। সেন্দূরেন্দ্র একই জীব বসন্তল গৃহের সর্বোচ্চ কক্ষটি বেলাইয়া বলিলেন, “আমি এই স্থানে দুই বৎসর বাস করিয়াছি।” গৃহটি উচ্চ, কিন্তু পরিদর্শনবিহীন। একটি সরু পলির দ্বারা উদার প্রবেশদ্বার। হঠাৎ বাড়ীটি বেশিলে একটা বৃক্কের মত মনে হয়। উপরে উল্লিখিত লক্ষ্য একটিবাত্র ধরপারিসর সিঁড়ি। ভিতর হইতে যে সামান্য আলোক আইদে তাহাতেই আরোহণ ও অবরোহণের কিস্কিন্দ্র সহায়তা হইয়া থাকে। সিঁড়িটি এরূপ স্থগণ ও সুবিধাজনক বলিয়া যে বাকি অনেক চুপে ইহার “সুপলোপান” বলিয়া নামকরণ করিয়াছিল তাহার বুদ্ধিআচুর্বা অবশ্যই প্রশংসনীয়। বাড়ীটা এরূপ ভীতসেতে যে, ইহার উপর এক পর্দা কাঁচলা জব্বা দিয়াছিল এবং সেই কাঁচলার সমুদয় দপ্পে ঘূর্ণ হইতে মনে হইত, বাড়ীটি তৈয়ার করিবার সমস্ত গৃহকর্তা চূপকাস না করিয়া সাধা সন্দের পরিবারে সমুদয় ফলাইয়া দিয়াছেন। বাড়ীটা পুরাতন বেলাইয়া সেন্দূরেন্দ্র একটু দূর চড়াইয়া বলিলেন, “বলিব কি এইরূপ লক্ষ্য স্থানেও আবাক জীবনের ভিতরকাল অভিব্যাহিত করিতে হইয়াছে।” বিদ্যানন্দ বলিলেন—“আমি ইহা অবগত আছি। ডার্বেন এ স্থানে কিছুকাল বাস করিত। পাঠ্যাবস্থার আমি এ স্থানে আর এতাহই আসিতাম। আমার ইহার নাম রাখিয়াছিলেন, ভাগ্যবানের ভাগ্যধার।”

সেন্দূরেন্দ্র বলিতে লাগিলেন, “ঐ যে ভিলে কোয়ার জাশালার বাধা দড়ি হইতে শুকাইবার জন্য কাপড় বেলিয়া নেওয়া হইয়াছে, ঐ কুঠুরীতে বাস করিবার সময় যে দুলল ঘটনা ঘটে তাহার সহিত আমার গির্জায় বাইবার কিছু সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে। বিদ্যানন্দ বলিব কি আমি এখন বসন্তে এরূপ কষ্ট ভোগ করিয়াছি যে, পেরুগ আর কেহ করিয়াছে বলিয়া আমার মনে হয় না। অগ্রকষ্ট, অর্ধকষ্ট, ও বসন্তকষ্ট ইত্যাদি বসন্তকর কষ্ট আছে—
ঠাহারা সকলেই আমার সহিত বিলক্ষণরূপে পরিচিত না হইয়া ছাড়েন নাই। বলিতে কি, এখনও তোমার সহিত বাইয়া আমার সেই ঘরখানি বেশিবার অভিলেখ হইতেছে। কতদিন এখন গঠিয়াছে যে, স্নেহে বিহি করিতেছি, ঘরে অগ্নি নাই। বহুটি এমন ঠাণ্ডা যে, ভয়ক প্রায়শ বাশ্চাকারে আমার মস্তকের উপর এক পরণা যেথের স্রুটি করিয়াছে—মনে হইত, প্রথম চারিদিক ঘূষে পূর্ণ। ঠাণ্ডার হাত ছুঁবার বরফের মত জমটি হইবার লোপাড়ে—
উচ্চ কুলকরে কোন একারে জীববেশ শোণিতপ্রবাহের পতি অব্যাহত রাখিতেছি। আমি নিঃস্বায় ও কপর্দকবিহীন। কি দিয়া যে পুস্তকাদি ক্রয় করি, তিকিৎসা বিদ্যালয়ের যেতনাদি বা কিল্পে বহন করি, এসব চিন্তা যখন মনের মধ্যে উদ্ভিত হইত তখন যেন অতুল

স্বাধীনতা দায়িত্ব । সমসাময়িকের মধ্যে বহু বলিতে আমার কেহই ছিল না । আমার সমসাময়িক উৎকৃষ্ট তিন জনই আমার কাছে মৃত্যু করিয়া তুলিতেছিল । সমাজের নিরন্তর হইতে উচ্চতম স্তরে উন্নতির এই বার্ষিক চেষ্টাই যে আমার পক্ষে ব্যবহারের প্রধান কারণ এ কথা তখন কেহই বুঝিত না । এইরূপ সংস্কারীত বাবা-বিষয়ের সাহিত্য অবিরাম যুদ্ধ করিবার শক্তি যে মানুষ কোথা হইতে পায় তাহা আমি তখনও উপলব্ধি করিতে পারি নাই । তোমার নিকট আমার গোপনীয় কিছুই নাই । আমার চরিত্রে যত্ন সহায়কৃতি বা পরার্থ-পরতা অন্ততঃ সহগণ্য বলীর বিন কোন নিদর্শন দেখিতে পাত, তাহা আমার সেই কঠোর জাতকীয় হইতে অন্তর্য্যাহে বলিয়া আনিবে । যাহারা সারিত্রয়ের কঠোর ভাবের ভয়জনক না হইয়া নিম্ন শক্তিতে উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছে তাহাদের ভয়ভয়ে এই সকল সংগণ সমাক্রমে বিরাগিত থাকে । যাঁকে সে কথা । যাঁ হইতে যে সামান্য সাসহায়্য পাইতাম তাহা ব্যতীত আর অন্য কোন স্থান হইতে অর্থপত্রের সম্ভাবনা ছিল না । আমি যাহা হই পরমা ধরম করিয়াই কোনরূপে আত্মস্থান স্থাপন করিতাম । পেন্সিলির রাজ্যের একজন কলীওয়ালার লোকান ছিল । তথা হইতে সত্তার এক একখানি বাসি কলী কিনিয়া যৎসামান্য মুদ্রে কোবর দ্বয়ে ভিলাইয়া পলায়করণ করিতাম । যথাক্রমে অনেক অত্যধিক ভাগ্যে যত্নে উঠি ন । এক দিন সত্তার একটা সত্তা হোটেলের দিনের প্রধান আহারটি সংগ্রহা হইতাম । উহার মূল্য চারি আনা করিয়া দিতে হইত । এইরূপে গড়ে আমার অত্যধিক নয় পরসার অধিক ধরম হইত না । ছুতা যোমা কাপড়গোপড় যাহাতে দীর্ঘকালস্থায়ী হয় সে জন্য আমার কাছে যে কিরূপ সাধারণ হইতে হইত তাহা বলি বাহুল্য । এরূপ অবস্থায় হঠাৎ ছুতার অসুস্থতায় চামড়া কাটিয়া ছুতা ছোড়াটি বন্দ যথ্যাবান করিয়া বিক্রয়ের ছাপি দ্বাশিতে থাকিত বা গায়ের কোটটি বন্দ কৃত্রিম বস্ত্র সপনে সেলাইয়ের বন্ধন-যুক্তি জ্ঞান করিত তখন বেশর বনোকট হইত তাহার তুলনার জীবনের উন্নতরূপে বন্ধুগণের বিবাসনাভ্যন্তর যে কট পাইয়াছি তাহাও তেমন বর্ণন্য নহে । জল ব্যতীত কোনও পানীয় আমার ভাগ্যে ছুটিয়া উঠিত না । ককিপানসূত্র ও সাধারণ ভোজনাপারগুলিকে আমি যে কিরূপ সম্বাদের সৃষ্টিতে দেখিতাম তাহা বলিবার নহে । আমি যেন করিতাম যে, জলের হোটেলের কেবল লাজী পানীয় ভোজনালীলাই আবিষ্কারেরই অবশ্যবিকার আছে ।

— কখন কখন ভাবিতাম, ঐ স্থানে দিয়া ককিপান ও ভোমিনোক্রীড়ার সৌভাগ্য আমার এ গোড়া অধুষ্টে হরত যত্নে উঠিবে না । আমার সম্রাজ পরিষদের মূলে বিকরভ্রম রোষ্ট্র উত্তেজনার ন্যায় কি যেন এক দুর্ভবনীর চিত্তাবেগ বিস্ত্রিত ছিল । আমি সর্ব্বদা আমার পার্শ্ব পুস্তকগুলিতেই নিবিশ্রিত থাকিতাম । যাহাতে আমি এইরূপ অস্তির হীনাবস্থা হইতে সাধারণ্যে পরিচয় লাভে সমর্থ্য হই এইরূপ আমার পাঠের ব্যবস্তার অংশগুলি আমি সর্ব্ব-শেষ অবস্থার সন্তোষে আলোচনা করিতাম । যাহাতে আমার অভিজ্ঞতা মূল্যবান বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে এই উদ্দেশ্যে স্খান্দ্যস্বল্প বিদগ্ধগুলিও স্বয়ং পরীক্ষা না করিয়া ক্রান্ত হইতাম না । আমার আহার্য্য সংস্থানের ক্ষমতা যে বার হইত তাহা অশেষকি আমার দীর্ঘের তৈলের ব্যয় অধিক ছিল । আমার যে সামান্য আহার আবশ্যক হইত তাহা কোনরূপে সৎ-

এহ হইত বটে, কিন্তু স্থনীধরজনী অধায়েন প্রতিবাহিত করায় যে পরিমান তৈলের অগ্রোজন হইত তাহা ক্ষয় করা সহরসাধ্য ছিল না । এইরূপে নিগত সাধাবিষয়ের সহিত সংগ্রাম আবার শক্তিসাভ্যের পক্ষে অত্রাণ হওয়া পড়েইয়াছিল । আমি কখনও কাহারও সহানুভূতি লাভ করিতে সমর্থ হই নাই । সহপাঠিপত্রের সহিত বক্তৃতা সংস্থাপন করিতে হইলে অল্পতঃ পক্ষে হাতপরের জগৎ হইত চাহি আনাও সম্ভব । ইহার অন্তরে তাহাদের সহিত একত্রে গান ভোজন বা আশোকে আলোপন হয় না । পূর্বেই বলিয়াছি যে, আমি তখন একেবারে দ্বিত্ববদ্ধ এবং পারিপের আবেশিত্রিয় নাগরিকতা সকল একান্ত দৈবের মধ্যে অবস্থিততাটা যে কিরূপ ভয়াবহ তাহা একেবারেই উপলব্ধি করিতে পারে না । জ্ঞানসমাজে আনয় এই ধোর দারিত্র্য একাধ পাইতে পারে কোনও মুখে ইহার যদি বিশুমাত্র বৃদ্ধিতে পারিতাম তাহা হইলে দুঃখের শেখাবহার ন্যায় আহার কঠিনালীর একএকার বাসরোধকর প্রায়বিক সঙ্কোচন উপস্থিত হইত । বাহ্যদের জীবনরূপ কোণএক্রে অভাব ও ভৈনা এই দুইটি শব্দ দ্বান পায় নাই । এতদ্ব্যতীত অনেক বিনিসজ্ঞানের সহিত গবে আবার পরিচয় হইয়াছে । এই সকল অর্থশালী পত্ত-মুখরা কেহ কেহ আমাকে বলিত, এতদ্ব্যতীত অবস্থায় কণগ্রস্ত হওয়া বড়ই নিপল্লমক । তত্ব বরণে কোনও দায়িত্ব গ্রহণ করা কবাশি সম্ভব নহে । ইহাদের কথা শুনিলে আমার সেই মানসস্থারীর পক্ষ বনে পড়ে, যিনি একাধক অনাধারে বৃত্তান্তে পতিত হইতেছে আদিয়া বিজ্ঞান্য করিয়াছিলেন, ইহাও তত্ত্বপুলি বাইরা আনবার কবে না কেন ?

(ক্রমশঃ)

ঐক্যদান প্ররকার ।

অভয় ।

আপনার কেহ নহে—তবু নহি নিরাশ্রয়

যতদিন, প্রভু, তব পদছায়ে মতি রয় ।

বাতাসে ছিঁড়িলে পাল তুফানে টুটিলে হাল

তরঙ্গী ডুবে না তবু তব প্রেমে দগাময় ।

বিশ্বের খেলার যদি, হার হয় নিরবধি,

তোমার করুণা নিয়া মানিব না পরাজয় ।

বেহ যবে হবে শব শুনিব না কোনো রব

বিশ্বের আলোক শব নিবে বা'বে চোখে,

তোমার আলোক ভবে । দিগন্তে স্মৃতিত যবে

তোমার করুণাশক্তি উল্লিখে অতিময় ।

ঐনিনিমোহন যুগোপাধায় ।

বীরেশ্বর গোস্বামী ।

—১৯—

একজন লক্ষপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যসেবী বীর বালাকালের রচনার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন, কাগজে যোটা যোটা লক্ষের বীর নাম মুদ্রিত দেখিবার প্রলোভন প্রথম বয়সে বড়ই প্রবল । বাস্তবিক এই প্রকার প্রলোভনের হাত হইতে নিজের পাওয়া বড় সহজ নহে । আমাদের কবি বীরেশ্বর গোস্বামী ঠিক ইহার বিপরীত প্রকৃতির পুরুষ ছিলেন । তিনি বীর প্রকৃত নাম—অতুলচন্দ্র ঘোষ—গোপন রাখিয়া বীরেশ্বর গোস্বামী নামে বীরবে শোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া বাকীর সাধনা করিয়া গিয়াছেন । যাঁহারা বীরেশ্বর গোস্বামীর রচনা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা বোধ হয় অনেকই বীরেশ্বর গোস্বামী কে ও তাঁহার প্রকৃত নাম কি তাহা অবগত ছিলেন না । আবার যাঁহারা অতুলচন্দ্রকে জানিতেন তাঁহারাও জানিতেন না যে, এই অতুলচন্দ্রই বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে বীরেশ্বর নামে বিচরণ করিতেন । আর অতুলচন্দ্রের মৃত্যুতে বীরেশ্বর নামও লুপ্ত হইয়াছে । আমরাও আর বীরেশ্বর নামের উল্লেখ করিব না ।

অতুলচন্দ্রের জন্মস্থান কলিকাতা । কিন্তু তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময়ই নিত্য পদে পদে কাটিয়াছে । তাঁহার বর্ণবিচিত্র ও বিহার প্রদেশে প্রথম আগত হয় এবং বিহার প্রদেশে পাটনা । কলেজেই তাঁহার পাঠ সমাপ্ত হইয়াছিল । বিহারে থাকিয়া তিনি যে কি প্রকারে বঙ্গভাষার দিকে আকৃষ্ট হইলেন তাহা পিসরকর ব্যাপার । আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন বিহারের রাজধানী বাকিপুরের অবস্থা একদফাও যত ছিল না । তখন গলিতে গলিতে এত বাঙ্গালীর বাস ছিল না । যে ছুই এক ঘর বাঙ্গালী ছিলেন তাঁহাদের আচারব্যবহার রীতিনীতি চালচলন পোষাকপরিচ্ছদ, এমন কি, কটোচ্ছারিত অর্ধেক বা ততোহীন হিম্মিমিপ্রিত ভাষা তাঁহাদিগকে তাঁহাদের যৎসমস্ত আত্মীয়স্বজন হইতে একেবারে পৃথক করিয়া ফেলিয়াছিল । অপ্রসিদ্ধ উকীল গুরুপ্রসাদ সেন মহাশয় সর্বপ্রথম বিহারের উন্নতিসাধনে যত্ননিবেশ করেন । তৎপূর্ব্বে বিহারবাসী নীলকরদিগের অত্যাচারে, রাজপুরুষদিগের বেয়ালা সকলে সর্বদা উত্থাপ্ত থাকতেন । ভাড়ী (ভালদস) সহজলভ্য হওয়ার বিহারের গ্রাম্য ঘাট তখন মাতালদিগের দাসত্ব প্রাপ্ত বা অসলের সন্ধিতে প্রতিস্থানিত হইত । তখন ইংরাজী

ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତ



ବିରେନ୍ଦ୍ର ଗୋସ୍ୱାମୀ ।

শিক্ষার ভেতন প্রচলন হয় নাই; জ্ঞানীশ্রী ব্রহ্মোত্তর অগোচর ছিল। গুরুপ্রসাদ বাবু বিহারবাসীদিগের হিতকল্পে যেমন এক দিকে সাধকনিবাসী সত্য ও বালক ও বালিকা বিজ্ঞানের সংস্থাপিত করেন অপর দিকে ভেতনই উচ্চতর গুরুপুত্র ও অন্যান্য নীলকর্ণদিগের অন্যান্যরম্যন করিবার জন্য Behar Herald পত্রের প্রবর্তন করেন। আর বিহারবাসীরা যাহাই বলুন না কেন—বাঙ্গালার সংগ্রহ প্রতিষ্ঠাপন করিবার জন্য যতই চেষ্টা করুন না কেন—বাঙ্গালীই যে তাঁহাদের উন্নতির সোপান সংগঠিত করিয়াছেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অতুলচন্দ্র গুরুপ্রসাদ বাবুর নব-প্রাতিষ্ঠিত বিজ্ঞানপ্রথম বর্ণ-শিক্ষা লাভ করেন। এই বিজ্ঞানপ্রথম ইংরাজী সহিত হিন্দী ও বাঙ্গালা উভয় ভাষা শিক্ষা প্রদান করা হইত। তৎপূর্বে বিহার-প্রবাসী বাঙ্গালার বসতাবা শিক্ষা করিবার আর কোনও উপায় ছিল না। এই বিজ্ঞানপ্রথমের T. K. Ghose's Academy নামক বিজ্ঞানপ্রথম সহিত সম্মিলিত হইয়া যায়। এই স্থল অন্যান্য জীবিত ব্যক্তিগণ গুরুপ্রসাদ বাবুর উদ্দেশ্যসাধন করিয়া আসিতেছে। বালক অতুলচন্দ্রের প্রথম প্রবন্ধ “বাঙ্গালীর স্বাধীনতা” এই স্থলের সংস্থাপিত এক সভায় পঠিত হয়। গুরুপ্রসাদ বাবু এই সভার সভাপতি ছিলেন। বালক অতুলচন্দ্রের রচিত প্রবন্ধে গবেষণার পরিচয় পাইয়া সভাপতি ও উপস্থিত অন্যান্য ভ্রম্যহোদয়গণ তাঁহার বিশেষ প্রশংসা করেন। এই সময় হইতেই অতুলচন্দ্রের বক্তব্যের প্রতি আদারণ অগ্রগণ্য পরিগণিত হইত। সাহিত্যে অগ্রগণ্য অতুলচন্দ্রের বংশগত ছিল। তাঁহার কোট ভ্রাতা আবিনাশচন্দ্র যৌবন, এ, বি, এল মহাপণের বিস্তারিত ইংরাজী বলিবার ও লিখিবার ক্রীতি অন্যান্য বাঙ্গালীর বাগ্নীশ্রীতে অবদান-সময়ে আলোচনার বিষয় হইয়া রহিয়াছে। Calcutta Review পত্রের পাঠকবর্গের নিকটেও তাঁহার নাম অপরিচয় ছিল না। অতুলচন্দ্রের ব্রহ্ম-কোষ ভাষ্যের শ্রীকৃষ্ণ মনন-মতে ‘শৈবাল’ গ্রন্থের প্রণয়ক। তাঁহার রচিত কবিতা ‘নব্যভারত’ প্রভৃতি পত্রিকায় এখনও সময় সময় প্রকাশিত হইয়া থাকে। অতুল বাবুর পিতা কানীকৃষ্ণ যৌবন মহাপণেরও ব্রহ্মবংশে সাহিত্য-সুরাগ দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইতাম।

প্রবীণ কবি বঙ্গদেশ পালিত উদীয়মান লেখক অতুলচন্দ্রকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। তাঁহার ব্যাখ্যায় যেন হইত, বুদ্ধ কবি তাঁহাদের বয়স ও অবস্থার অনৈক্য বিস্মৃত হইয়া তরুণ দুবকের শাখা বহুবহুই আবদ্ধ

হইয়াছিলেন। বাঙ্গীর সেনকগণের মধ্যে তিরদিনই বুকি এ পার্শ্বক্য বিদূরিত হইয়া যায়। রবীন্দ্রনাথও ইংহাের সহিত সখ্যাত্মকভাবে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। অনিরাঙ্কি, রবীন্দ্রনাথের “ভক্তের প্রতি” কবিতা অতুলচন্দ্রের জীবদ্দশায় তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াই লিখিত হইয়াছিল। বাস্তবিক অতুল বাবু রবীন্দ্রনাথের একজন প্রাণন ভক্ত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় যাহুব যে এত মতিতে পারে, অতুল বাবুকে না দেখিলে তাহা বুঝা যাইত না।

অতুল বাবুর রচনাশক্তি বড় সাধারণ ছিল না। তিনি ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষায় প্রবন্ধ লিখিতে পারিতেন। অতি অল্প বয়স হইতেই তাঁহার ইংরাজী প্রবন্ধগুলি Calcutta Review নামক পত্র প্রকাশিত হইতে থাকে। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে উক্ত পত্রিকা প্রকাশিত তাঁহার Halayudha his Life and Times এবং ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের আশ্বিনয়ারী মাসে প্রকাশিত Military Weapons of the Hindus প্রবন্ধদ্বয় বিখ্যাত লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। বাঙ্গাী খ্রীষ্ট বিপিনচন্দ্র পাল কর্তৃক পরিচালিত New India পত্র অতুলচন্দ্রের লিখিত ইংরাজী বহু প্রবন্ধে এক সময় পৌরবাচিত হইয়াছিল। ‘সংস্কৃতচর্চিকা’ নামক মাসিক পত্রিকায় কখনও কখনও তাঁহার লিখিত সংস্কৃত প্রবন্ধদ্বয় হইত। কিন্তু অতুল বাবু বাঙ্গালা সাহিত্যের সাধনাতেই সর্বাপেক্ষা অধিক মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। এক সময়ে তাঁহার রচিত কবিতা, প্রবন্ধ ও সমালোচনার ‘প্রদীপ’ ‘দাসী’ ‘প্রবাসী’ ‘নব্য ভারত’ ‘সাহিত্য’ প্রভৃতি মাসিক পত্রগুলির কলেবর পুষ্ট হইত। সেই সময়ে লক্ষ-প্রতিষ্ঠ লেখক ব্যারিষ্টার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় অতুল বাবুর সহিত একত্রে সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। উভয়ের মধ্যে অকৃত্রিম অমুরাগ পরিচালিত হইত; উভয়েই প্রথম বয়সে কবিতা লিখিতেন। পরে প্রভাত বাবু ছোট গল্প এবং অতুলচন্দ্র ঐতিহাসিক প্রবন্ধ রচনার মনোনিবেশ করেন। ‘সাহিত্য’ ‘সুপ্রভাত’ ও ‘প্রবাসী’তে প্রকাশিত বহু প্রবন্ধ আমাদের এই অমুমান কত দূর মর্য্যাদা প্রমাণিত করিবে।

অতুলচন্দ্র যোগেশ সন্ন্যাসিন্যের বিবরণ সংগ্রহের জন্য পাশ্চাত্য বা শিক্ষা করিয়া জী ভাষায় লিখিত ইতিহাসসমূহ অধ্যয়নে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই অধ্যয়নের ফল উপভোগ করিবার সুযোগ বঙ্গবাসীর অদৃষ্টে আর ঘটিল না। তৎপূর্বেই তাঁহার মৃত্যু হয়। গত ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে তিনি ইহধাম পরিত্যাগ করেন।

বাল্যে অতুলচন্ডের ঘণ্টে স্বতিন্তির পরিচয় পাওয়া যাইত। সহপাঠী-
দিগের মধ্যে তিনি সর্বদা সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইতেন
বলিয়া তিনি শৈশবকালের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাঁহার ন্যায় বিনয়ী
ও বজ্রভাষী পুরুষ বড় কম দেখা যাইত। তাঁহার চিরকুমারের তাঁহার
সর্বপ্রকার উদ্ভিতির পূর্বে অন্তরায় হইয়াছিল। তিনি জীবন সাহিত্য
পরিষদের সভ্য ছিলেন। আশা করি, পরিষদ এই সাহিত্যসেবকের প্রতি
যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শনে উপেক্ষা করিবেন না।

ঐশ্বর্যমণ্ডল গুপ্ত।

নরে নারায়ণ।

স্বপ্নস্নেহে সিদ্ধ-স্থানে নারী এক আশে,
তনি স্মৃতাঙ্ক। চোখে দেখে সেই স্থান,
বায়ু তা'রে পরশিয়া স্তব্ধায় পরাণ,
রোমাঞ্চিত শিখ্র থাকে চেয়ে তা'রি আশে।
ভক্তিতরে চেউ নিয়ে যায় গৃহপানে,
অনাথ আতুর পথে যা বলে' দাঁড়ায়,
পূর্ণ বলি নিমিত্তেই পুত্র হয়ে যায় ;
নিত্য তা'র কাণ্ড দেখি ছল ছল প্রাণে।
বরনারী শিখ্র নেড়ে ধীরে বরে ফিরে,
পদতলে তরু বাগু জুড়াইয়া যায়,
একদিন সমী কহে,—‘নারায়ণ পায়
আজ দাও পূজা ; ওগো চল না মন্দিরে।’
নারী কহে,—‘চির ছেড়ে বুঝা তীর্থ বুঝা,
নরে পূজা দিলে পান নারায়ণ পূজা’।

ঐশ্বর্যমণ্ডল গায় চৌধুরী।

সবুজ পত্র । ❀

বন্ধিমত্ন বলিয়াছিলেন, আমাদের দেশে এক দল লোক আছেন যাঁহারা বিলাতী সবই ভালবাসেন, ইত্বক বিলাতী পণ্ডিত লাগায়ের বিলাতী হুজুর সবই তাঁহাদের প্রিয়। 'সবুজ পত্র'র প্রবৃদ্ধি ও পরিচালকবর্গ সেই দলের লোক। তাঁহারা পত্রের নামটাও বিলাতী করিয়াছেন। 'সবুজ পত্র'র সম্পাদক শ্রীশ্রবণ চৌধুরী। রবীন্দ্র বাবু ইহার প্রধান লেখক হইলেও পরিচালক নহেন। সেটা বোধ হয় ভালই হইয়াছে। কারণ, রবীন্দ্র বাবুর পরিচালনে পত্রের স্বাধীনস্বভবে সন্দেহ প্রথমেই মনে সম্ভূত হইত। ১২৯২ বঙ্গাব্দ হইতে এ সন্দেহের কারণ ঘটিতেছে। বর্ষমাত্রাকীর্ষী 'বালকে'র বিদায়-নিবেদনে কাৰ্য্যাব্যাক্ত রবীন্দ্র-নাথ বলিয়াছিলেন, "বালক কাৰ্য্যাব্যাক্ত সাহিত্য-ব্যবসায়ী, যথেষ্ট অবকাশ তাঁহার পক্ষে নিত্য আবশ্যক—তিনি কণ্ঠিষ্ঠতা ও কাৰ্য্যনিপুণতার লক্ষণ বিখ্যাত নহেন, তৎসঙ্গেও তাঁহার হাতে অস্ত্রস্ত্র কাণের ভার আছে, তরঙ্গ করি এই সকল বিবেচনা করিয়া বালকের গ্রাহকের প্রসঙ্গ মনে তাঁহাদের কাৰ্য্যাব্যাক্তকে 'বিদায় দিবেন।' দশ বৎসর পরে ১৩০১ বঙ্গাব্দে তিন বৎসর 'সাধনা' পরিচালিত করিয়া সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুশীলনাথ ঠাকুর রবীন্দ্র বাবুর "যোগাত্তর হস্তে সম্পাদকীয় কাৰ্য্যভার ন্যস্ত করিয়া" অবসর গ্রহণ করেন। এবং সেই যোগাত্তর হস্তের স্পর্শে বৎসর ফিরিতে না ফিরিতে সিদ্ধিপববর্ত্তিনী 'সাধনা' মধ্যপন্থেই অস্তিত্ব হইয়াছে। তাঁহার পর ১৩০৪ সালের আরম্ভেই "হুঃসময়ের" হুঃসময় দেখিয়া রবীন্দ্র বাবু 'ভারতী'র ভার লয়েন। কিন্তু বার বাস কাটিতে না কাটিতে তিনি "ললিটের বর্ষ যুঁহিয়া" বিদায় গ্রহণ করেন। সে বার তাঁহার অভিজ্ঞতা জন্মে—"আমাদের দেশের সম্পাদকের পত্রসম্পাদন হালপোকুর দ্বং দেওয়ার মত,—দশমু দিন হেতের কাছে বাড়িয়া রূপ প্রাণের রূপাণেটুকুতে প্রচুর পরিমাণে জল মিশাইয়া যোগান দিতে হয়।" দুই জল যে গাভী মিশায় এ তথা নূতন বটে। কিন্তু ১৩০৫ সালের এই অভিজ্ঞতা তিনি যেমন অল্প দিনে লাভ করিয়াছিলেন—এই অভিজ্ঞতার কথা তেরনট অল্প দিনে ভুলিতেও পারিয়াছিলেন। তাঁহার অনায়াসলভ অভিজ্ঞতা দীর্ঘকালস্থায়ী হয় নাই; কারণ, ১৩০৮ সালেই তিনি

শৈলশিখরে চরণ রাখিয়া ‘বলদর্শন’-বৈজয়ন্তী উড়াইয়া সদর্পে বলিয়াছিলেন—
“আমরা যখন বলদর্শনকে আশ্রয় করিয়া সাহিত্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছি,
তখন আমরা কঠিন বিচার প্রার্থনা করি।” কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার
স্বপ্ন পরিবর্তিত হয়। এবার তিনি যুগ্ম ভাবে পত্র পরিচালনভার লয়েন
নাই—মেঘনাদ যেমন যৈশ্বর অস্তরঙ্গ হইতে মুক্ত করিত—অর্জুন যেমন
শিবভীকে সম্মুখে রাখিয়া শরভ্যাগ করিয়াছিলেন তেমনই যুগ্ম লেখকরূপে
যতপ্রচার করিতেছেন।

পত্রের নামেই দ্বিলাতীর প্রতি অকারণ অতিরিক্ত অশ্রুগণের প্রমাণ
পরিষ্কৃত। যদিও “বীরবল” বেনামীতে সম্পাদক স্বাক্ষরিত চাষিয়াছেন,
বাঙ্গালা বেশ সবুজ—“তরাই হতে স্তম্ভরবন পর্যন্ত, একচালা সবুজ বর্ষ বেশ-
টিকে আদোপান্ত ছেয়ে রেখেছে * * * সেই রং বাঙ্গলার সীমানা
অতিক্রম করে”, উত্তরে হিমালয়ের উপরে ছাপিয়ে উঠেছে,ও দাঁকণে বকোপ-
সাগরের ভিতর চারিয়ে গেছে (?)—“তবুও তিনি যখন স্বীকার করিয়াছেন,
“সবুজ হচ্ছে নবীন পত্রের রং,—রসের ও প্রাণের যুগল লক্ষণ ও ব্যক্তি”
তখনই তাঁহার বিলাতী ভাবটি নিঃশঙ্কোচে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কারণ,
ইংরাজীতে ‘গ্রীনের’ অর্থ জীবন ভেজতগা—তাজা। কিন্তু ইংরাজীতে ইহার
আর একটা অর্থ আছে—শেটা কাঁচা—অপক্ব সে অর্থও যে পত্রপ্রবর্তকদিগের
মনে ছিল না, এমন নহে। ‘সবুজের আভিযানে’ প্রযোজ্য ব্যব প্রবশেই লিখিয়া-
ছেন—“ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা” আর “বীরবল” কবুল জবাব দিয়া-
ছেন, “সবুজ রং, ভালমন্দ দুই অর্থেই কাঁচা”। কিন্তু আরও একটা কথা
আছে,—ইংরাজী সাহিত্যে সবুজের সঙ্গে ঈর্ষার লব্ধকল্পনার প্রমাণও
আছে। সেক্সপীরের কথা, ঈর্ষা It is the green-eyed monster which
doth mock The meat it feeds on।

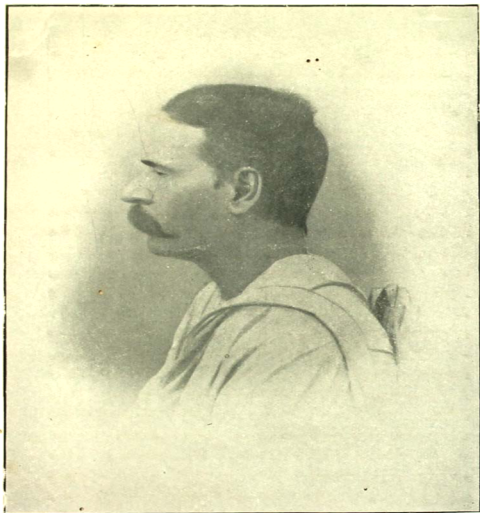
এ ক্ষেত্রে সে সম্মোহেরও যে একেবারে অবকাশ নাই, এমনই বা বলি
কেনন করিয়া? কারণ, পূর্ববর্তীদিগকে “অভিকার” আখ্যায় অখ্যাত
করিয়া এই সবুজ—এই কাঁচা ত বিদ্রোহের বিধাণ বাজাইয়াই বাঙ্গালার
আগরে দেখা দিয়াছে। সে বিদ্রোহ সমাজের বিরুদ্ধে—সে বিদ্রোহই ভাবার
বিরুদ্ধে।

বৈশাখের ‘সবুজপত্রে’র সর্দাঙ্গে এই বিদ্রোহের বিকাশ; কি প্রবন্ধে, কি
গল্পে সর্দাঙ্গ এই বিদ্রোহের পরিচয়। “সুবপত্রে” সম্পাদক বলিয়াছেন, তাঁহার

যে নতুন কিছু করিবার লক্ষ্যই এই পত্র প্রকাশ করিয়াছেন “এ কথা বললে সম্পূর্ণ সত্য কথা বলা হবে না।” তবে কি লক্ষ্য? বোধ হয় রবীন্দ্র বাবুর “বিবেচনা ও অববেচনা” প্রবন্ধে উত্তর মিলিতে পারে—“যে ধর্মীর কীর্তিও নাই, হাতে কোন কন্মও নাই * * * তাহাকে পরামর্শ দেওয়া উচিত যে, তোমার এই ধর্মেই হ্রাসের পৌরব করিবার জিনিষ নয়, যেমন করিয়া পার একটা কর্ণে লাগিয়া যাও।” তাই এই পত্রের প্রবর্ত্তকপণ এই বিস্তোহের কাণেই লাগিয়া গিয়াছেন।

সমাজের বিরুদ্ধে যে বিস্তোহ সে ব্যক্তিভাতন্ত্রের মহিমাকীর্ণনে ও জাতির বিরুদ্ধে যে বিস্তোহ সে “বারবলী” ভাবের আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। সম্পাদক কতোদূর দিয়াছেন, “সাহিত্য হচ্ছে ব্যক্তিত্বের বিকাশ”। সাহিত্যে সাহিত্যিকের ব্যক্তিত্বের প্রকাশ পড়ে অনিবার্য সন্দেহ নাই; কিন্তু সাহিত্য যদি সত্যের বা সুন্দরের বা উত্তরের অভিব্যক্তি না হয়, কেবল ব্যক্তিত্বের বিকাশই হয়, তবে তাহা রক্ষণ কাপলের ঘুড়ীর মত কিছুকণ আকাশে তাগিয়াই নিকলেশ হইয়া যায়—তাঁহা না থাকে উদ্দেশ্য, না থাকে সার্থকতা, না থাকে উপযোগিতা। সম্পাদক বলেন—“বুদ্ধি মানুষকে অস্তঃ উপরের দিকে চোরে দেখতে শেখায়।” সেটা যে একটা বড় শিক্ষা এখন মনে নাও করা যায়—কারণ, অকাগ্রে উপরের দিকে চাহিয়া কেবল “হোঁচট বাওয়া” কেবল যে অনাবৃত্তক এমন নহে, পরন্তু তাহাতে বিপদেরও আশঙ্কা আছে। “বীরবল” বলিয়াছেন, “আমাদের সমাজ ও শিক্ষা দুই আমাদের ব্যক্তিত্বের বিরোধী।” কেন বিরোধী তাহা যদি তিনি ভাল করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিতেন, তবে ব্যক্তিবিকাশের ব্যর্থ চেষ্টার সময় নষ্ট করিতেন না। “সমাজের ধর্ম হচ্ছে প্রত্যেকের স্বার্থ নষ্ট করা। সমাজের বা মন্ত্র, তারি সাধন-পদ্ধতির নাম শিক্ষা।” আমাদের সমাজ ও শিক্ষা কোনটিই ধর্মের প্রভাবে সংসা প্রবর্তিত হয় নাই। তাহারা যে বহুকালের বহুবিধ পরীক্ষার মধ্য দিয়া পরিবর্তিত বা পরিপুষ্ট, পরিবর্দ্ধিত বা পরিকল্পিত হইয়া বিকশিত হইয়াছে—সাহিত্যে ও সমাজে তাহা যথেষ্ট প্রমাণ আছে। তবে রক্ষণ ঘুড়ীর লক্ষ উপরের দিকে চাহিয়া যদি কেঁদে পেলি না দেখেন, তাহা হইলে আমরা নাগর। যে দেশে সমাজ পরিবারসমষ্টিতে গঠিত—ব্যক্তিসমষ্টিতে নহে, সে দেশে ব্যক্তিভাতন্ত্রের মহিমাকীর্ণনে বাহ্যঙ্গুরা হইতে পারে সার্থকতার সম্ভাবনা সর্ব্বদাই সুদূরপরা-হত। গত শতাব্দীতে যুরোপে ব্যক্তিভাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাকরে চেষ্টার ফল

ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତ



ଶ୍ରୀ ଅକ୍ଷୟ ଚୌଧୁରୀ ।

নাই। সুযোগের সমাজিক অংশ যে আমাদের দেশের সমাজিক অবস্থার অপেক্ষা ব্যক্তিগতভাবে প্রতিষ্ঠার পক্ষে অগ্রকূল তাহাতেও সন্দেহ নাই। কিন্তু তথাপি তথায় সে চেট্টা ফলবতী হয় নাই—বরং তাহার পরিণতি যে খেচ্ছাচারে তাহারই প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। পাশ্চাত্য যোয্যার জন্ম ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে গ্রাউট নামের 'বিশ্ববিদ্যালয়' নামে গঠিত। কিন্তু প্রাসিক আদিত সেখানে বাসিন্দার আশ্রয়ণে তাহার উপন্যাসের পরিমার্জিতই প্রমাণ হয়—সমাজের বিরুদ্ধে বিরোধী ব্যক্তিগতভাবে প্রতিষ্ঠাপ্রয়াসীর সাফল্য-সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। ইংলেন্ডে তাহার রচনার চেট্টা-কল্পিত এই সময়ের সামান্য পরিণতি পাইতে পারেন নাই। ভিক্টোরিয়া জন্মের মিশ্রবর্ণী কর্তৃক আদিত্য বিরোধের আশ্রয়িতা বলিয়া সমস্যাসম্মানের দায় এড়াইয়াছেন। আর 'সবুজ পত্র'র পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথ যে "হালদার পোজীর" পরিচয় দিয়াছেন সেই হালদার পোজীর বড় বাবু বনোয়ারাই বা সাফল্য লাভ করিতে পারিল কোথায়? পরিবারের চাপে তাহার সে স্বাভাবিক পথে পথে পীড়িত ও নিষ্পত্তি হইলেও সে স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই। "যে দিকেই সে ছুটিতে চায় সেই দিকেই হালদার পোজীর পাকা ভিত, নড়িতে গেলেই তাহার বাগা চুকিয়া যায়।" সমাজের আশ্রয়িতার সর্বপ্রধান গুণ—তাঁহা ব্যক্তিগতভাবে সাফল্যের "সবুজ পত্র" প্রায় দেয় না—মাত্রকে উচ্চ-অল হইতে দেয় না। আর ব্যক্তিগতভাবে সর্বপ্রধান দোষ—তাঁহা মাত্রকে উচ্চ-অলতার পথে সব বাগা দূর করিয়া দেয়। সত্যি "শিক্ষার বিধি হচ্ছে 'অপরের মত হও', আর তাঁর নিষেধ হচ্ছে 'নিজের মত হয়ো না'।" সেটা কেবল ব্যক্তির হিতার্থে। কারণ, মাত্র যখন সমাজিক জীব; তাহাকে যখন সমাজেই বাস করিতে হইবে তখন সমাজের শাসন শীকার না করা তাহার পক্ষে বিপদজনক ত বটেই, সমাজের পক্ষেও ভাগ নহে। তাহাতে যদি কোথাও কোন বিশেষ প্রতিষ্ঠাপ্রাণীর ব্যক্তিগতভাবে বাগা বটে, সে ক্ষতি লাভের পরিমাণতুলনায় নিতান্তই নগণ্য। যে শিক্ষার বিধি "অপরের মত হও" সে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট—অশিক্ষা। তাহাতে কেন যে "আমাদের মনে এই অদ্বৈত সত্যের বড়বুল হয়ে গেছে যে, আমাদের স্বার্থ এতই ভয়াবহ যে তাঁর চাইতে পরগণে নিধনও প্রের" তাহা আমরা বুঝিতে পারি না—"বীরবল" বুঝিতে পারেন নাই।

তাঁহার পর বিরোধী তাহার বিরুদ্ধে। চুচুড়া সাহিত্য-সমিতিতে প্রবৃত্ত

অকস্মৎ সরকার ঘণ্টাঘাটিলেন—“বাকাল্য ভাষার উপর বাকালীর অত্যাচার আজ বশ পনের বৎসর কিছু বেশী বেশী হইয়াছে ।

মাতৃভাষার সেবা করিতে হইলে মাতৃভাষাকে চিনিতে হয় ।

আমরা অনেক সময় মাতৃভাষাকে না চিনিয়া • • বিভ্রান্ত হই ও মাতৃদেহে আঘাত করি।” এই অত্যাচার ও আঘাত ‘সবুজ পত্র’ বৈষ্ণব প্রবল আর

কোথাও তেমন প্রবল কি না সন্দেহ । কিন্তু “বীরবল” বীরবর্ণে বসিয়াছেন,

“বাকাল্য সবুজ পত্রে যে সুসবাচার লেখা আছে, তা পড়বার ক্ষমতা প্রায়শ্চিন্ত হবার আবশ্যক নাই—কারণ সে লেখার ভাষা বাকাল্যের প্রাকৃত।” কিন্তু

‘সবুজ পত্র’ যদি কোন সুসবাচার আনিয়া থাকে তবে তাহা যে ভাষার ব্যক্ত হইয়াছে তাহা কোন অর্থেই বাকাল্যের প্রাকৃত নহে—তাই কোনরূপেই

সর্ব্বজনগ্রাহ্য হইতে পারে না। ‘সাহিত্য-পটী’ লেখক ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় যথার্থই লিখিয়াছিলেন—“কলিকাতাওয়ালা, হুগলীওটবাসীরা, পূর্ব্ব

বাকাল্যের (উত্তর বাকাল্যেরও বটে এবং দক্ষিণ বাকাল্যেরও কোন নয় ?) বাঙ্গালে কথা শুনিয়া যে হাসেন—বাঙ্গালে কথা লইয়া যে বিচক্ষণ করেন, সেটা

ভাঁদের আত্মসন্তোষের, অজ্ঞতার, অথবা কুপবৃত্তির ফল । নাহিলে, কলিকাতার ‘ককুনী’র কথা যদি বাঙ্গালী কথা হয়, কলকুনার ও মেঘনার মাঝীনের

কথাও বাঙ্গালী কথা বটে । একের কথা অপরের কণে যেমনই বাজুক, একের কথা অপরের কাছে যতই অবোধ্য হউক, উভয়েরই এক ভাষা বই

দুই ভাষা নয় । পরন্তু, কলিকাতার ককুনী ও কলিকাতা অঞ্চলের অধিবাসীরা যদি বাঙ্গাল না হন, তবে ঢাকা চাঁটগাঁর অজ পাড়ারোগ্রাও বাঙ্গাল নয়,—

অন্ততঃ যেভাল বাঙ্গাল নয় । চাঁটগাঁ যদি বাঙ্গাল হন, চুঁচুড়াকেও বাঙ্গাল বলিতে বাধ্য কি ? কবার আওয়াজ ও উচ্চারণটা আসলে আর কিছুই নয়,

কেবল কণের অত্যাস ও মনের ষট্কা । যে আওয়াজের ও যে উচ্চারণের কথাটা বা কথাতলা বাহ্যিক চিরকাল, আজন্ম শুনিয়া আনিতেছে, সেই

আওয়াজ ও উচ্চারণই তাদের কাছে ভাল লাগে, মিষ্ট লাগে, উপযুক্ত বোধ হয় । তাহার বিপণীত হইলেই হাসি পায়, অবোধ্য ও বিস্ময় বোধ

হয় । অতএব বলা অতিরিক্ত যে, কলিকাতা হাফড় হুগলী চুঁচুড়াই যে চাঁটগাঁ, চাঁদপুর, ঢাকা ও নোয়াখালীর উচ্চারণ আওয়াজে হস্তগত অব-

তারণার অধিকার পাইয়া অহরহ সেই অধিকার ব্যবহার করিতেছেন তাহা নয় । সেই অধিকার ও অধিকারের অভিনয় ও ব্যবহারই দুই দিকেই,

সমভাবে বিভক্ত।" এই আকাশের এই রকম "আকাশ" দেখালেও ছিল একালেও আছে। একটা পারিবারিক ও সামাজিক, সেটা প্রাদেশিক। আর একটা "কিতাবতী", সেটা সর্বজনগ্রাহ্য। বাংলা সাহিত্যের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকিলে সম্পাদক যুক্তিভেদে "কিতাবতী" বাংলার লিখিত হয় নাই বলিয়াই 'আকাশ'ের ঘরের দুলাল "মাছাট্টাডীচের" বাড়িরে দৃষ্টোৎ। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের সহিত পরিচয়ের পরিমাণ পরিমাপ করিতে হইয়া দেখিলাম, তিনি লিখিয়াছেন—“সুন্দরের আগমনে হীরামালিনীর ভাড়া মাগকে যেমন কুণ কুটে উঠেছিল, ইউরোপের আগমনে আশাদের বেশে তেমনি সাহিত্যের কুণ কুটে উঠেছে।” ইউরোপ নামক মহাদেশ যে ভারতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে এমন সংবাদ আমরা আজও অবগত নহি; কিন্তু এ সংবাদ আমরা ভারতের শুভ্রতা রাখি যে, সুন্দর যখন হীরা গৃহে বাসা লইয়াছিলেন তখন তাহার মাগক ভাড়াও ছিল না—সে মাগকে কুণের অভাবও ছিল না। মালিনীর বাড়ী—

“নানাজাতি কুটে কুণ উড়ি বৈলে অলিহুল

কুহ কুহ কুহেরে কোকিল।

মন্দ মন্দ সমাগ

রসায় লবণ মন

বসন্ত না ছাড়ে এক তিল।”

প্রাদেশিক ভাষা ব্যবহারের অসুবিধার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি, যযুৎসবনের অমর কাব্য 'মেঘনাদ বধে' যশোহরের কবি এক স্থানে লিখিয়াছেন,—“কি করে বুঝাব তারে? হায় রে, কি করে?” “দ্বিধেনে” চরিতকার যোগীন্দ্রনাথ “কয়ের” য যুক্তাকরপ্রয়োগবোধে সংশোধিত করিয়া লিখিয়াছেন,—“কি করে বুঝাব তারে? হায় রে কি করে করে?” যশোহরে “কয়েরে” বহুল প্রচাদের কথা চরিতকারের জানা ছিল না। এখন যদি 'নবাতারত'-সম্পাদক ফরিদপুরের, 'সাহিত্য'-সম্পাদক নবদ্বার, 'আর্য্যাবর্ত্ত'-সম্পাদক যশোহরের ও 'সমুদ্র পত্র'-সম্পাদক পাবনার ভাষা আমদানী করেন তবে পাঠকবিশেষের পলায়ন ব্যতীত সমস্তই থাকিবে না। নানা স্থানের নানা পণ্য এক বাটে আমদানী হয় সত্য; কিন্তু যেমন একই রকম সুপক্ক বহুতে শরীরের সর্বত্র প্রবাহিত হয় তেমনিই সর্বজনগ্রাহ্য এই ভাষা সাহিত্য-মন্দির হইতে দেশের সর্বত্র প্রবাহিত হয়।

কিন্তু যে ভাষায় 'সমুদ্র পত্রের' "সুন্দরচার" প্রচারিত হইয়াছে সে ভাষা

কি সম্পাদকের কল্পিত আদর্শাশ্রয় হইয়াছে ? কেবল কি “হুজু,” “কবুবে” “উঠছে” লিখিলেই যথেষ্ট হইল ? বাঙ্গালার ‘প্রাকৃতরূপ’ও ত এদেশে এদেশে বিভিন্ন । স্বয়ং সম্পাদকও যে ‘পুলিত’ ও ‘পল্লবিত’ ভাষা বর্জন করিতে পারেন নাট ; “হুজি” ও “হুজি” কোন্টো ব্যবহার করিলেন স্থির করিতে পারেন নাই । আর, তাঁহার সহকারী, চাকর ‘মুস্তাফা’ ও সানাইয়ের “পোঁপা”, রবীন্দ্রনাথও তাঁহার ভাষার ব্যবহার করিতে পারেন নাই ! এ তেজ্ঞে “গ্রে সৌভাগ্য” তাঁহার তরুণ ও চকস নকীটির সঙ্গে সমান সতিতে যাইতে পারিতেছেন না । দুই জনের ভাষা প্রমাণে গদ্য যমুনার মত একই পথে (পাথে ?) ভিন্ন ভিন্ন রূপে নিরাক্ত । সেও বোধ হয় ব্যক্তিব্যক্ত্যের অবশ্যস্বাবী কল ।

সাহিত্যিকসমাজ (বাঙ্গালী ?) সম্বন্ধে সম্পাদকের ধারণাটাও যে খুব উচ্চ তাহা বোধ হয় না । আরম্ভেই তিনি বলিয়াছেন,—“কথা দিয়ে কথা না রাখতে পারাটা সাহিত্য-সমাজেও উগ্রতার পরিচায়ক নয়।” কারণ, তাঁহার বিশ্বাস “সাহিত্য এদেশে অদ্যাবধি বাবসাবাগিজোর অঙ্ক হয়ে ওঠেনি * * * লেখা অংগদের অনিকাংশ লেখকের পক্ষে, কাজও নয় বেলাও নয়, শুধু অকাজ ।” বাবসাবাগিজো যে উগ্রতর প্রত্যবটা * প্রতিরুদ্ধ অধিক এ কথা কিয় সাহিত্যে বড় পাওয়া যায় না । বাবসাবাগী ইংল্যান্ডের রাব-কবি টেনিসনের মত—“Who but a fool would have faith in a tradesman's ware or his word ?” নিকোঁধ কাজী ত কে বাবসাবাগীর কথার বা পণের বিশ্বাস করে ? কিন্তু সাহিত্য-লেখাটা কি দরল লেখকেরই অকাজ ? ১৯২২ বঙ্গাব্দেই ত রবীন্দ্র বাব আপনাকে “সাহিত্য-প্ৰবাসী” বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন । আর সাংপ্রতি সেই বাবসাবাগী তাঁর যে লাভ হইয়াছে তাহাতে যে “পাটের হাটের মথুর কণ্ঠ শিশু শ্য” ঘড়ির পাটের বাজার চাড়িয়া সাহিত্যের হাটে ভিতর বাজার বুলি । কাটুয়া খেলিবে এমন আপক্য পরিবার কারণ ঘটয়াছে । কেন “বীরবল”ও ত সে নাতে বাঙ্গালী সাহিত্যের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া শঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন এই ত সেস বাবসাবাগীর কথা । সাহিত্যসাধনা বাহারা ব্যবসা হিসাবে না ধরিয়া জীবনের ত্রুত-বিসাবে—ধর্ম বলিয়া তাহাতে আত্মনিবেশ করিয়াছেন—এমন কাহাবুও কথা কি সবুজ পত্র-সম্পাদক শুনে নাই ?

সম্পাদকের কথা—“মন পদার্থটি (১) ** বিরোধের স্পর্শে জেগে উঠে।
এবং মনের এই জাগ্রত ভাব থেকেই সকল কান্না, সকল দর্শন, সকল
বিজ্ঞানের উৎপত্তি।” যে মতে—

“One God, one law, one element,
And one, far off divine event,
To which the whole creation moves”

সে মত সর্বজনগ্রাহ্য না হইতে পারে; কিন্তু বিরোধ ব্যতীত যে কান্না,
দর্শন, বিজ্ঞান উৎপন্ন হয় না, এ মতও সর্বজনগ্রাহ্য নহে।

সম্পাদক বলেন—“ইউরোপের কাছে আমরা একটি যশস্বী জ্ঞানসত্য
করেছি, সে হচ্ছে এই যে, ভাবের বীজ যে দেশ থেকেই আননা কেন, দেশের
মাটিতে তার চাষ করলে হয়।” এ কথা সত্যিই মনে হয়, তিনি যে
বলিয়াছেন,—“ইউরোপের এবল ফ্রান্সিসে আমাদের অধিকাংশ লোকের
মন ঘুরিয়ে গেছে” সে কথা সম্পূর্ণ সত্য। মরিগে তিনি ভাবের বীজ দেশের
মাটিতে চাষ করিবার শিক্ষা যে আমরা ইউরোপ হইতে পাইয়াছি এমন কথা
বলিতেন না—কারণ, ইংল্যান্ড ইহার বিরুদ্ধে কংই বলে; সাহিত্যে ও শিল্পে
—দর্শনে ও বিজ্ঞানে ইহার বিরুদ্ধে মতই সম্মেলন। বিজ্ঞানের গন্ডেনবর্গ
বলিয়াছেন—“The Indian nation, in a manner* scarcely
paralleled by any other nation in the civilised world, has
developed its life out of itself and according to its own laws,
far removed alike from the alien and the cognate peoples,
who in the West, within the compass of closer mutual
relations, have performed the parts to which history called
them.” কিন্তু ভাবের আদানপ্রদানে ভারতবর্ষ যে কোন দিকই উৎসাহের
অভাব দেখায় নাই তাহার প্রমাণ তাহার শিল্পে ও সাহিত্যে—দর্শনে ও
বিজ্ঞানে যথেষ্ট আছে। তবে ভারতবর্ষ। বদেশ ভাবকেও স্বাধীন্য করিতে—
আপনার বর্ণে রঞ্জিত করিতে পারিত বলিয়া সে সব প্রমাণ সহস্য দৃষ্টিপথে
পতিত হয় না। তাই বোধ হয় তাহা সম্পাদকের মত স্থপতিত্বেরও দৃষ্টি
অতিক্রম করিয়াছে। বৌদ্ধ শিল্প কিরূপে গ্রীক শৈল্যদর্শকে পরিবর্তিত করিয়া-
ছিল তাহা বোধ হয় সম্পাদক মহাশয়ের অবদান নাই।

সম্পাদকের উক্তি—“ইংরাজি শিক্ষার বীজ অতীত ভারতের ক্ষেত্রে

প্রথমে বপন করলেও, তার চালা ভুলে বাঙ্গলার মাটিতে বশাতে হবে, নইলে স্বদেশী সাহিত্যের ফুল ফুটবে না।” কিন্তু এ কথা যে একান্তই সত্য যে, বিদেশী বীজের গাছে স্বদেশী ফুল কোন দিনই ফুটে না—ফুটিতে পারে না! স্বদেশী বীজের গাছে বাতীত স্বদেশী ফুল ফুটিবে না।

“গৌড়কন্যে গাহে—আনন্দে করিবে পান সুখা নিরবধি” সেই ‘মেঘনাদ বধ’ কাব্যকে তিনি “পরগাছার ফুল” বলিয়াছেন—“তার সৌরভ কেই”—আর বিদেশী বীজে স্বদেশী সাহিত্যের ফুল ফুটাইতে চাতিয়াছেন! সব মাসিক পত্র যেমন ‘সুবুজ পত্র’ নহে—সব পরগাছার ফুল তেমনই সৌরভহীন নহে এ কথাটাও তিনি মনে করেন নাই।

সম্পাদক মহাশয় বলিয়াছেন—“আমাদের বাঙ্গলা সাহিত্যের ভোরের পাখীরা যদি আমাদের প্রতিষ্ঠিত সবুজপত্রমণ্ডিত সাহিত্যের নস নাথার উপর এসে অবতীর্ণ হন, তাহলে আমরা বাঙ্গালীজাতির সব চেয়ে বড় যে অভাব তা কতকটা দূর করিতে পার্ব।” বাঙ্গলা সাহিত্য কি ‘সুবুজ পত্র’ প্রকাশের পর হইতে সংগঠিত হইবে? তাহার প্রাগৈতিহাসিক প্রাচীনত্ব কি প্রথম-লীড়নে নষ্ট হইয়া গিয়াছে? আমাদের জানা ছিল, বাঙ্গলা সাহিত্য গৌতম বুকেরও পূর্ববর্তী। কাষেই সে সাহিত্যের “ভোরের পাখীরা” বহু শতাব্দী পূর্বেই গান শেব করিয়া অন্তর্হিত হইয়াছেন। তাহার যে কেমন করিয়া আনিয়া এই সবুজ সাহিত্য-নাথার উপবিষ্ট হইবেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। তাহাদের পক্ষে সে কাণ করা যেমন অসম্ভব, সম্পাদক মহাশয়ের পক্ষে তাহার উদ্দেশ্য সাধনও তেমনই অসম্ভব; কারণ, তাহার উদ্দেশ্য—“আমাদের বাঙ্গলা খবর বিড়কি-দরকার ভিতর প্রাচীন ভারতবর্ষের হাতী গলাবার চেষ্টা কর্তে হবে, আমাদের গৌড়-ভাষার হুং-হুস্তের মধ্যে সাত সবুজকে পাঠ কর্তে চেষ্টা কর্তে হবে।”

তবে এই সুদীর্ঘ “সুবুজপত্র” একটা বড় সত্য কথা আছে—“শব্দের শক্ত অপরিণীম।” নহিলে এই একাদশপৃষ্ঠাব্যাপী “সুবুজপত্র” রচিত হইত না। কেবল আমাদের চুঃখ, সম্পাদক মহাশয় যে বলিয়াছেন—“সাহিত্য গড়তে কোনও বাইরের নিয়ম চাইনে, চাই শুধু আত্মসংযম। লেখার সংঘত হবার একমাত্র উপায় হচ্ছে সীমার ভিতর আবদ্ধ হওয়া” এইটুকু যদি তিনি “সুবুজপত্র” রচনাকালে মনে রাখিতেন!

তবে তিনি যে বলিয়াছেন “বাঙ্গালীর জীবনে যে নৃতনত্ব এসে পড়েছে

তাই পরিহার করে প্রকাশ করবার জন্য "সবুজপত্র" প্রকাশিত হইয়াছে তাঁহার সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে আমাদের বিশেষ লাভের সম্ভাবনা। তিনি যে সর্বতোভাবে সে কার্যের উপযুক্ত সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নাই। আমরা তাঁহার "আফিম-খোর" রূপে (Opium-eater of Bagbazar) তাঁহাকে ভালবাসিয়াছি। তাঁহার "বৌবল" রূপে তিনি আমাদের কাছে যুক্ত করিয়াছেন। তাই আমরা আশা করি, তিনি "সবুজ পত্রে" বাঙ্গালীর জীবনের নূতনের স্বরূপ প্রকাশ করিতে পারিবেন।

"সবুজ পত্রের" পর "সবুজ পত্র"। এই সবুজ পত্রে "বৌবল" লিখিয়াছেন,—“সজীবতা ও সংস্কার হইছে বাঙ্গালীর মনের নৈসর্গিক দর্শন। সম্মান স্বরূপে দেখান যেতে পারে, যে আমাদের দেবতা হয় ভ্রাম্য নয় ভ্রাম্য। আমাদের জগদমন্দিরে রাজতগিরিসম্মিত কিবা জবাকুসুমসম্ভাষ দেবতার স্থান নেই; আমরা শৈবও নই সৌরও নই। আমরা হয় বৈষ্ণব নয় শাক্ত। এ উভয়ের মধ্যে বাঁশি ও অসির বা প্রভেদ সেই পার্থক্য! যত্মমান, তবুও বর্ণ-সামাজিকতার গুণে ভ্রাম্য ও ভ্রাম্য আমাদের মনের ঘরে নির্ঝিন্দে পাশাপাশি অবস্থিত করে।” ভ্রাম্য ও ভ্রাম্য, বাঁশি ও অসি কবিতার ভালই মানায়; কিন্তু নিজস্বা করি, এ আমরা কাহার? কলিকাতা বারলাইব্রেরীর ও বালিগঞ্জের বাবিরে যে বাঙ্গালা বিদ্যুত তাহাতে হিন্দু ব্যতীত—মুসলমানও অনেক—খুটান, জৈন, বৌদ্ধও যে নাই এমন নহে। মুসলমান, খুটান, জৈন বৌদ্ধ, ভ্রাম্য বা ভ্রাম্য কাহারও ভুক্ত নহেন বরং উভয়েরই বিদেষণী। তবে এ আমরা কি সম্প্রদায়ের we. আমরা গৌরবে বহুবচন? কিন্তু সে আশিতে ত ভ্রাম্য বা ভ্রাম্য কাহারও দখল নাই! আর বাঙ্গালী হিন্দু কি হয় বৈষ্ণব নহে ত শাক্ত? আরও একটা কথা, বিভ্রাতি বৈষ্ণবই হউন আর শাক্তই হউন জবাকুসুমসম্ভাষ মহাত্ম্যাতিকে ত ত্যাগ করিতে পারেন না! গায়ত্রী ত বিভ্রাতির সঙ্গের সাথী। সুতরাং “ধর্ম্ম স্থলকলেশ্বর গজমুখ লোচনদর” গণেশের অর্চনা ত “পূজা হোম যোগ যাগে” সর্ব্বাঙ্গেই হইয়া থাকে।

এ দেশের কবিদিগকে সম্প্রদায় মহাশয় “ভক্তিবোধী” বলিয়া অভিহিত করিয়া বলিয়াছেন, তাঁহার “কাঁচাকে কচি কর্ত্তে চান। এঁরা চান যে আমরা শুধু গদগদ ভাবে আধ আধ কথা কই।” এই কবিতা কাহার? এ দেশের প্রাচীন কবিতা ত কখন আধ আধ কথা কহেন নাই? মধুসূদন, ছেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্রও এ অপরাধে অপরাধী নহেন। তবে অপরাধী কাহার?

যদি সম্পাদক আত্মকালকার বাণবিল কাগজের কথ্য বলেন, তবে তাহাদের অল্প তাঁহার তুণীরের বাণবিল না করিলেই ভাল করিতেন। সম্পাদক “সবুজ পত্র” যুক্তি সাহিত্যের নব শাখার উপর” “বাগলা সাহিত্যের ভোরের পাকী” দ্বিগুণে অন্তর্ভুক্ত হইতে আহ্বান করিয়াছেন ; আর “বীচনা” রূপে তিনিই “বাগলা কালামন্দিরে বেণের মাটির চুটুপনা করে,” তার মধ্যে সবুজ পত্রের প্রতিষ্ঠা কর্ত্তে” চাহিয়াছেন। আমরা “কোন দিকে তাকাই” তাবিয়া পাইতেছি না।

ইহার পর রবীন্দ্র বাবু কবিতা—“সবুজের অভিধান।” কবিতার নিম্নে তারিখ আছে—১৫ই বৈশাখ ১৩১৫। তবে ৬ বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রবাবুর সবুজঐতি ছুটিয়াছিল। তিনি তখনই সবুজকে সাহরে বলিয়াছিলেন—“পুঙ্খটি তোর উড়ে ভুগে নাচ।” কিন্তু এত দিন সবুজের সে সুবিধা হয় নাই—এবার হইল। কবিতাটি বহু অংশের ভাবে সমষ্টি। তবে একটি তাব উল্লেখযোগ্য—“ভুলগুলো সব আনন্দে বাছা বাছা।” ভুলের অল্প এত আগ্রহ আমরা আর কখনও দেখি নাই।

“বিবেচনা ও অবিবেচনা” রবীন্দ্র বাবুর রচনা। রবীন্দ্র বাবুর কথা—“পৃথিবীর সমস্ত বড় বড় সভ্যতাই হুঃসাহসের সৃষ্টি। শক্তির হুঃসাহস, বুদ্ধির হুঃসাহস, আকাঙ্ক্ষার হুঃসাহস। * * * এই হুঃসাহসের মধ্যে একটা প্রবল অবিবেচনা আছে। আজ বাহারা আকাশখানে উড়ি; ও উড়িতে আকাশ হইতে পড়িয়া চুপচাপ হইয়া ঘরিতেছে তাহাদের মধ্যে এই দুর্বল অবিবেচনা কাজ করিতেছে। এমনি করিয়াই একদিন বাহারা সবুজ পার হইবার সাধনা করিতে করিতে হাজার হাজার জনে ভুবিয়া ঘরিয়াছে সেই অবিবেচনাই তাহাদিগকে ভাড়া করিয়াছিল। সেই দুর্বল অবিবেচনার উত্তেজনা হইতেই আগ ও মঃহুশ ভূবারদৈতের পাহারা এড়াইয়া কখনো উত্তর যেক কখনো দক্ষিণ যেকতে কেবলমাত্র দ্বিগুণের পরিবার অল্প ছুটিয়া চলিয়াছে।” ছোট বড় কোন সভ্যতাই হুঃসাহসের সৃষ্টি নহে। সভ্যতা অভিজ্ঞতা ও আদর্শের সম্মিলনে ও সংবর্ধে অভিযুক্ত হয়—তাহাতে হুঃসাহসের চিকমাএ থাকে না। আর রবীন্দ্র বাবু যত বাহারা অবিবেচনার ভাঙনার কাম করে, পৃথিবীতে তাহাদের যত বিবেচক লোক যোগ হয় অধিক নাই। বাহারা আকাশযান হইতে পড়ি তছে, তাহারা পড়িবার অল্প উড়ে না পড়িবে না মনে করিয়াই উড়ে। তাহারা এত বাহারা বেকসুরকানে যায় তাহারা—অল্প

কথিয়া হৃদয়ভিত্তিক বিচার করিয়া তবে ঘরের বাহির হয়—অবিবেচনা ভাষাধিপের নিকটেও আসিতে পারে না। বাহারা সমুদ্র পার হইবার সাধনা করিয়া শেষে জাহাজ গাড়িয়াছে তাহারা 'সবুজ পত্র' প্রচার অপেক্ষা অনেক অধিক বিবেচনা করিয়া, লাভক্ষতি খতাইরা তবে জলে নামিয়াছে। তাহারা বিবেচক—অবিবেচক নহে। সাধারণ কথায় দবীতির সেহদান বা পুষ্টের আশ্রয়লিকে emotional কাব্য বল; হয়, কিন্তু তাহার পক্ষে লোক-হিতের যে বিবেচনা ছিল, তাহাতেই তাহার গৌরব। ইতিহাসে যে সব দুঃসাহসের দৃষ্টান্ত দেখা যায়, তাহার মধ্যে ড্রেককর্তৃক "স্পেনের রাজ্য দাড়াই পোড়ান" উল্লেখযোগ্য। কিন্তু সে কাব্য কেবল এলিজাবেথের টেটের বিবেচনার উত্তরনাতেই সত্তা হইয়াছিল। এই অবিবেচনাবাদের স্বত্ব কি? অগ্রবিন্দিকে নমস্কার জানাইবার পর রবীন্দ্রনাথ বিশ্বপ্রেমের প্রচারকরূপে যে আত্মনির্ভর প্রচার করিয়াছিলেন—তাহা ত বিবেচনারই ফল? যদি তাহা হয়, তবে কি আবার তান সে মত ভাগ করিয়াছেন? বাহারা দুঃসাহসের লগ্ন বিবেচনা বিপর্যয় দিয়া অবিবেচনার উত্তরনার কাব্য করে, তাহারা কি সমাজের, ধর্মের সব শাসন ছাড়িয়া আইনের শাসনই নিঃসঙ্কোচে মানিয়া লইবে? অবিবেচনার পরিণতি কি?

"হালদার গোষ্ঠী" গল্প। বহুদিনপরে রবীন্দ্র বাবুকে আবার গল্প লিখিতে দেখিয়া বাহারা আবার "হৃদিত পাষণ" বা "যে ও রৌদ্রের" মত উজ্জল গল্প পাইবার আশা করিয়াছিলেন, এ গল্পে তাহারা হতাশ হইবেন। ইহা ব্যক্তিগত হস্তের মহিমকীর্তনের ব্যর্থ চেষ্টা। গল্পের মধ্যে দুইটি স্থানে অভিজ্ঞতার অভাবও সপ্রকাশ হইয়াছে। ক্রিপের "অনেক ঠাকুরকি অনেক মনদ।" ঠাকুরবাড়ীর ঠাকুরকিদিগের কথা ঠাকুরমাই বলিতে পারেন; কিন্তু হেন্দুর ঘরে ঠাকুরকি ও মনদে কোন প্রভেদ নাই। অগ্রজ—"বনোয়ারি যেন তাহার জ্বর জ্বরহর্ষের একজন ভাড়াটে—যতদিন বাড়ির কর্তা অল্পপন্থিত ছিল ততদিন সমস্ত বাড়িটা সে ভোগ করিত, কেহ বাধ দিত না—এখন গৃহস্থানী আসিয়াছে তাই ভাড়াটে সব ছাড়িয়া তাহার কোণের ঘরটি মাত্র দখল করিতে অধিকারী।" উপমাটা শোভনও নহে, সত্যও নহে। গৃহস্থানী স্বয়ং বাড়ীতে আসিলে ভাড়াটিয়াকে ত বাড়ী ছাড়িতেই হয়—তাহার আর কোণের ঘরে থাকিবার অধিকারও থাকে না। এ উপমা বোধ হয় ভাড়াটিয়া বাড়ীদখল লোকের অনভিজ্ঞতার ফল।

‘সবুজ পত্রের’ প্রথম সংখ্যার শেষে “সবুজ পাতান গান”—ঔপভোক্তাধ
নন্তের রচনা । ইহা নিম্নেরই কবিতা । কারণ, ইহাতে “বনস্পতি গো”র সঙ্গে
“জ্যোতি গো”র, “কিমাইনে”র সঙ্গে “নিবাইনে”র, এবং “মততা”র সঙ্গে
“পত্র তা”র মিল আছে । ইহাকেই “বীরবলের” ভাবায় বলে “গদগদ ভাবে
আব আব কথা” বলা, আর “রবিরাহ”র ভাবায়—“যা পত্র যা মিলে যা ।”

উপসংহারে সসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করি, এই “সবুজ” মত কত দিন স্থায়ী
হইবে ? “বীরবল” বলিয়াছেন—“আমাদের আশা আছে যে সবুজ ক্রমে
পেকে লাল হয়ে উঠবে ।” কিন্তু সে কত দিনে—আর তাহার পর সে যখন
কুহিয়াড়ি পড়িবে, তখন আবার কোন্ মত—ইঙ্গবঙ্গের সপ্তবর্ণের কোন্ বর্ণে রঞ্জিত
মত—এই দার্শনিক খেয়ালের খেয়াল পারি হইয়া বাজালা সাহিত্যের ঘাটে
অবতীর্ণ হইবে তাহা জানিতে পারিলে আমরা আশ্বস্ত হইব ।

পল্লী-সন্ধ্যা ।

—১-২—

স্নিগ্ধ-মেঘে বঁাকের মুখে হারিয়ে গেছে শ্রীর্ষা নদীর রেখা ;
শৈবালে আর কুমুদপাতায় রক্ত-অঙ্গের শ্যামল অধেকখানি ;
ঘাটের পারে নিলিয়ে গেছে অন্ত-রবির রক্ত-কিরণ-লেখা,
তিনটি ভাঙ্গা নয়ন যেনি, ছায়ায় ছায়ায় নাযছে লক্ষ্যরাণী ।

• • •

উত্তর ভেটের চিত্রপটে পাদপশ্চেকের ছ'তাপ করা ছবি
দাঁড়িয়ে আছে মুক্ত নীরব ; শুষ্ক খাড়াপ ; আকাশ গাঢ় নীল ;
এলিয়ে দিয়ে ক্রান্ত শরীর নৌকা 'পরে যৌন পল্লীকবি
চিত্রা নিয়ে জল দিয়ে একলা বসি খুঁজছে যনের মিল ।

• • •

চকু মূলে আসছে গাভীর গন্ত বহি' গড়িয়েছে তা'র জল—

- ষোল বিচালী লুটায় কুমে—রোমন্থনেই এখন যে তা'র মন ।
হারিয়ে কেলা হিমের স্মৃতি, বাল্য জগৎ অতীত কালের বল
একে একে ভাবছে-বুড়া উদাস ভাগে বসে রকের কোণ ।

• • •

মাহুর পাতিল' বাড়ীর ছাতে শুণছে তারা 'কচি-কাচার' মল ;
 "বা খাবি তাই মিথ্য" ভাবে উজ্জীরমান বাড়ুড় পানে চাহি'
 তিস্ত করি' দিচ্ছে কেহ নৈশচারীর আহাৰ্য্য সব ফল—
 বয়োজ্যোষ্ঠা স্মৃদ মনে বলছে, "আহা দরাত কি তোরা নাহি ?"

ক্ষেত্র হতে প্রতাপিত কৃষাণবৃন্দ — সামনে জলের ফেরো,—
 ছাড়িয়ে দিবে চরণবৃন্দল বাঞ্ছাে স্থবে শ-গুড় ছ'টি মুড়ি ;
 পরিহিত বশনটুকুর ছিন্ন অংশে তিনটি মাত্র গেরো—
 ছেণের জন্ত ভাষাক সাজি, কলকেতে হু । দ্বাঞ্ছাে কৃষাণ বুড়ী ।

আত্মকাননপ্রাপ্ত দিয়া উড়িয়ে ধূনা আসছে গরুর পাড়ী,
 হেলান দিবে কাটালগাছে চুষছে অঁটা মাংসটো একটি ছেলে ;
 পাড়ীর মধ্যে জামাইবাবু গ্রীষ্মের বস্ত্রে বাঞ্ছেন স্বস্তরবাড়ী,
 মনটা একটু এগিয়ে গেছে—বলছেন, "কি যে, গাঁয়ের ভেতর এসে ?"

'পদ্মসীমার' খুদর বাটে চরণচিহ্ন ছড়িয়ে জলের দাপে,
 ছিটিয়ে গারি সিন্ত ডুৱের লক্ষ-চিকুর-চেরা দি'বির পথে ,
 কুন্দ দীপ্তে পামছা চাপি'—লক্ষ্য প্রতি পদক্ষেপের আগে—
 আশায় আশায় অবিস্মানে মৌনী ঘেয়ে ফিরছে স্বপনরথে ।

তুলসীতগর দেবিঘে প্রবীণ মৃণালগ্রীবার জড়িয়ে অঁচলখানি,
 তৈকিয়ে ললাট মঞ্চস্থলে, তুলসী-মাটি ছুঁইয়ে বৃকে শিরে,—
 দীপ্তি-উজ্জল আননকমল, লক্ষ্য-শোভন স্তম্ভোল ছুটি পানি,
 নম্রপদে বাড়ীর বধু উঠান হ'তে আসছে বরে ফিরে ।

পল্লীপতিব প্রণয়মধু বৃকের আলো একটি মোমের ঘেয়ে
 মরম টুটি' বারিঘে মুটি' বছর খানেক জড়িয়ে ছিল মা'কে—
 ভাসিয়ে দিবে সে তুল জলে খুনা হাতে সঙ্গল চোখে চেয়ে
 কাড়িয়ে পতি—পত্নী শুধায়, "কোথায়, ওগো তইয়ে এলে তাকে ?" ;

ঐবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ ।

প্রতিশোধ ।

(বিশ্বভেদ্র আশ-কাহিনী)

—:—

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ নেপল্‌সের পক্ষে বড় হুঁৎসরী । দক্ষিণ গ্রীষ্মের অতিশয়ে নেপল্‌সবাসিনীগণ যে কিরূপ দুর্ভিক্ষগ্রস্ত হইরাছিলেন, তাহা কাগরও অবহত নাই । পৃথিবীর সকল সাময়িক সংবাদপত্রই এই বৎসর তাহাদের নিত্য নূতন দুর্ভিক্ষ সংবাদ সকলের নিকট প্রচার করত । বিশেষতঃ বিদ্যুৎকা ভীষণ দৈত্যের দ্বারা গৃহে গৃহে যে অত্যাচার করিতেছিল, তাহাতে সকলেই একেবারে ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল । কত নর-নারীই যে এই সময়ে অকালে মৃত্যুব্রূষে পতিত হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই । নেপল্‌স যেন স্নেহমমতাবঞ্চিত এক প্রেতভূমিতে পরিণত হইয়াছিল । মাতা পীড়িত পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়া প্রাণত্যাগে দূরে পলায়ন করিতেন ; পত্নী বীর পতিকে দূরে নিক্ষেপ করিতে হুঙ্কিত হইতেন না ; আত্মীয়স্বজন পীড়িত বন্ধুবান্ধবকে শৃগালকুলের দ্বারা গৃহবিভাঙত করতেন ; ঘরঘেহগুলি গৃহের সাধারণ আবর্জনার মত দূরে নিক্ষেপ হইত ।

আমি পূর্বের বলিয়াছি, আমার গৃহে নিদ্রাঘোর সজাপ ভেমন অশ্রুত হইত না । আমরা এ সময়েও স্নেহে আমাদের সেই প্রাণাধোপম গৃহে বাস করিতেছিলাম । আমার পত্নীও অধিক ভীত হইয়েন নাই । আমরা বাণীর আক্রমণ সহিতে রক্ষা পাইবার এক সন্মতিকার প্রতিবেশক উপায় অবলম্বন করিয়াছিলাম । গ্রান্ডকাসরণ—দুশাচা দ্রব্য আহার আবার গৃহে নিষিদ্ধ ছিল । তাহার বিত্তপ্ণ পানীয় জল গাঢ়ত্ব হইত । ভূতাসন গৃহের বাহরে গমনাগমন করিতে পারিত না । সহরের সহিত আমাদের সকল সংশ্রব একেবারে পরিত্যক্ত হইয়াছিল । গিডো এই সময় আমাদের সাহিত্য একত্র বাস করিতেছিলেন । আমরা দুই বৎসরব্যয়ক কষ্টা টেলো আমাদের আনন্দ-বর্জন করিতেছিল । আমার স্ত্রী অতি মিষ্ট গান গাহিতে পারিতেন । প্রতি দিন সন্ধ্যার পর আমরা দুই বন্ধু যখন ধূমপান করিতাম, তখন নীনা আমাদের নিকটে উপবেশন করিয়া অবিশ্রান্তভাবে গানের পর গান গাহিত । তাহার কণ্ঠস্বর কি মধুর ! গিডো সময় সময় গানে যোগদান করিতেন ।

উদ্যোগের কঠোর বিচিত্র সম্মিলন আমার নিকট বড় মধুর বলিয়া বোধ হইত। যেন ভীষণ জলপ্রপাতের কঠোর শব্দের সঙ্গিত বিহঙ্গের মধুর কণ্ঠের বিচিত্র সমাবেশ! আমি দ্বিধাও মনে সেই মধুর সূত্র কল্পনায় দর্শন করিয়া পুলকিত হই। আমার মনে হয়, জ্যোৎস্না-প্রাণিত নীল আকাশের নিম্নে বিপদ্রোহ দৃষ্টির ছুইখানি নুশ একত্র সম্মিলিত হইয়া কি অগাধ ঢালিতেছে, আর বিনিম পুষ্পের সৌরভ একত্র সম্মিলিত হইয়া কি মাদকতা-এই অস্টি করিয়াছে! হায়, সে স্নেহের দিন আজ কোথায়? আমার মনে হয়, ব্যস্তত্ব জগৎ অপেক্ষা ত্রাণের যত্ন কত মধুর। আমার সে যত্ন কেন ভাঙ্গিল?

ক্রমে আগষ্ট মাস আসিয়া উপস্থিত হইল। পৌড়ায় প্রবেশ ক্রমে বর্ধিত হইতে লাগিল। লোক ভয়ে একেবারে কিঞ্চিৎ আয় হইয়া গিয়াছে। নিত্য নূতন লোমহর্ষণ ঘটনা; নিত্য নূতন জ্বর-বিষাক্ত দৃষ্ট সংঘটিত হইতে লাগিল। আমরা তখনও আমাদের সেই গৃহে বাস করিতেছিলাম। এক দিন প্রত্যুষে আমি জাগরিত হইয়াছি, সত্যতঃ ঐতল বায়ু আমার লগাট স্পর্শ করিতে ছিল; বাহিরের সুন্দর দৃষ্ট আমাকে এতই মুগ্ধ করিয়াছিল যে, আমি আমার গৃহ মণ্ডল উত্তানে বিচরণ করিবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইলাম। পাশে আমার পত্নী সতীর নিদ্রায় নিমগ্ন। তাহাকে জাগরিত না করিয়া আমি অতি দ্রুতগে বেষণপ্রবস্তন করিলাম। আলুগায়িত কুস্তল স্নানার্থে মুখে আসিয়া; পড়ায় তাহার সৌন্দর্য যেন আরও বর্ধিত হইয়াছিল। ঈষৎ হান্ত-রেশা তাহার অবরপ্রায়ে কুটীয়া উঠিয়াছিল। আমি অনিমেষ নেজে তাহার সেই রূপসুখা পান করিতে লাগিলাম; তাহার পর দন্তঃসংস্ফুটিত কুস্তম্বের স্রাব কোবল বদনমণ্ডলে একটি চুখন অঙ্কিত করিয়া ক্রমশঃ বাহির হইলাম। ভবিষ্যতে আমার অদৃষ্টে কি লাবিয়া রাখিয়াছিলেন, আমি তখনও তাহা জানিতাম না।

সমস্ত রজনী দারুণ গাঢ় ভোগের পর প্রভাতের সুবিক্ত বায়ু আমার দেহ স্নানীভূত করিতোছিল। আমি পূর্বদিনের অবাধ দার্শনিক তলসমূহ চিন্তা করিতে করিতে জাণি না কখন গৃহের বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছি। সম্মুখে অনন্ত বিটপীশ্রেষ্ঠ মণ্ডলকোস্তালন করিয়া দণ্ডায়মান; অদূরে নেপলস উপদ্বীপের তরল ভঙ্গ করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গগুলি ইতস্ততঃ যাতায়াত করিতে ছিল। আমি গৃহে প্রত্যাপত্তনের জন্য প্রবেশ হইলাম। পাশে করুণ—

স্বয়ং একটি দলবিক্ষেপ্তা সালক ভূমিতে পড়িয়া ছুটফট করিতেছে। কারাবাহুল্যবশতঃ বৃষ্টিলাভ, সে দারুণ বিষমিতির আক্রান্ত হইয়াছে। বালক ভক্তন্য আশ্রমে তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিতে নিষেধ করিল। তাহার ভীতিবাহক স্বর, কাতর কণ্ঠস্বর, তাহার রোগবরণা আমার হৃদয় বাধিত করিয়াছিল। আমি নিজের ভক্ত কিছুমাত্র ভীত হইলাম না। আমি আমার স্ত্রী মীনা ও কস্তা টেলার কথা সুচুস্তকাল চিন্তা করিলাম। ইহাকে স্পর্শ করিলে পাছে তাহার এই সংক্রামক পীড়ায় আক্রান্ত স্বর এই আশঙ্কা বৃত্তিই আমার মনে উদ্ভিত হইয়াছিল। তথাপি আমি এই নিরাশ্রয় বালককে পরি-
ত্যাগ করিতে সমর্থ হইলাম না। আমি তাহাকে সাহায্য প্রদান করিয়া চিকিৎসকের উদ্দেশ্যে সঘরের দিকে বাধিত হইলাম। বালকের মনে কৃতজ্ঞতার ভাব ফুটিয়া উঠিল। তাহার কণ্ঠনালীর আবেগে আবদ্ধ হওয়ায় সে তখন একটি শব্দোচ্ছারণেও সমর্থ হইতেছিল না। সে শুধু যত্নবাহু ছুটফট করিতে লাগিল, আমি ক্রতপদে বন্দরে প্রবেশ করিলাম। অস্বাভাবিক উত্তাপে আমার চক্ষু মুগ্ধ করিয়া দাঁড়িতেছিল। পথে ঘাটে তেমন লোকসমাগম ছিল না। যে দুই এক জন লোক দৃষ্ট হইতেছিল, বহু অর্ধের প্রলোভন দেখাইয়াও তাহাদের কাহাকেও বালকের গুস্ত্রব্যয় নিবৃত্ত করিতে সমর্থ হইলাম না। যাত্রণের এইরূপ নিষ্ঠুর আচরণে আমি বৃত্ততাই বদ্ধ বাধিত হইলাম। আমি একজন করাসী চিকিৎসকের পরামর্শ হইলাম। তিনিও উপেক্ষার সহিত আমাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। সংক্রামকব্যাধির সংস্পর্শে আসিয়া নিজ জীবন বিপন্ন করিতে তিনিও স্বীকৃত হইলেন না। আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পরিশেষে দণ্ডায়মান রহিলাম। অস্বাভাবিক উত্তাপ ও অসহ্য দুর্গন্ধ আমাকে বড় পীড়িত করিতে লাগিল। আমি বড়ই ক্রান্তি অহুতব করিতে লাগিলাম।

বাগিবিপন্ন প্রদেশে এইরূপে দণ্ডায়মান থাকায় যে বিপজ্জনক, কিংবাকালের ভক্ত আমি তাহা একেবারে বিস্মৃত হইয়াছিলাম। কোথায় দাঁড়িলে বালকের ভক্ত সাহায্য পাইব, কেবল সেই চিন্তাই আমার হৃদয় অধিকার করিয়াছিল। এমন সময়ে আমি দেখিলাম, দীর্ণপদে একজন ধর্ম্মবাহক আমার নিকট উপস্থিত হইলেন। তাহার সুদীর্ঘ দেহ, প্রবাল বদন, ঐতিবিকারিত নেত্র আমার চোখে আকর্ষিত করিল। আশ্চর্যজনকরূপে খুঁটের প্রেম তাহাকে পীড়িতের সেবার নিবৃত্ত করিয়াছিল। তিনি লিজাসা করিলেন,—“এৎ ভূমি কি কোনরূপ সাহায্য প্রার্থনা করিতেছ ?” আমার মনে হইতে লাগিল, তাহার

এতি কথার বেন করুণা বিদ্যুত হইতেছে। আমি আনত যন্ত্রকে তাঁহাকে অভিযানন করিলাম ও তাঁহার নিকট সকল ঘটনা বিবৃত করিলাম। পণ্ডিত-কাতর বর্ষব্যাক্তের জ্বর করুণায় আর্জ হইল। তাঁহার মত্রে অশ্রুভাষাকান্ত হইল। বিলম্বে পাছে বাগকের অনিষ্ট ঘটে তদন্ত তিনি সূর্য বাগকের নিকট গমন করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বাগকের জ্ঞত আমার জ্বরও অত্যন্ত বাধিত হইয়াছিল। আমার মনে হইতেছিল, সাধান্ত একটা কুহুরকেও এইরূপ নিঃসহায় ভাবে মরিতে দেওয়া উচিত মনে। আর এই মানবসন্তান অসহায় ভাবে মৃত্যুনুর্বে পতিত হইবে, ইহা কোন প্রাণে সহ করিব? আমরা উভয়েই সেই বাগকের উদ্দেশে বাধিত হইলাম। বর্ষব্যাক্ত মহাশয় বারবার বিশ্বয়পূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাইতে লাগিলেন। আমার বোধ হয় তিনি আমাকে নেপল্‌সের মদাগত পথিক বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন। আমার পরিচয়প্রদানে তাঁহার সে ভ্রান্তি বিদ্যুত হইল। আমার নাম নেপল্‌সের জনসাধারণের নিকট অপরিজ্ঞাত ছিল না। আমি বলিলাম, আমি আমার মূহে এত দিন আবদ্ধ থাকার সহরের এ দুর্দশা সম্বন্ধে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই নাই। মাতৃবৎ যে মাতৃশ্বের প্রতি এত নিষ্ঠুর হইতে পারে, পূর্বে আমি ইহা জানি নাই। স্ত্রীদ্বার প্রকোপ মাতৃবৎ একেবারে কাপুক্ষ্যে পরিণত করিয়াছে।

বর্ষব্যাক্ত মহাশয় ইহাতে কিছুনাএ বিশ্বয় প্রকাশ করিলেন না। তিনি বলিলেন, জগতের স্বাধার নরনারী তিরতিনই স্বার্থের অধেষণে উন্নত। এই জীবনের সহিত সকল সুবদুঃখের অবগান হয়, ইহাই তাহাদের বিবাহ। পরলোকের মধুর আভাস তাহাদের জ্বরে প্রকাশিত হয় নাই। তাই মৃত্যুর করালছায়া তাহাদিগকে এত ভীত করে। জগৎ হইতে বর্ষবিবাহ বহুতঃই বেন লুপ্ত হইয়াছে।

“কিন্তু পিতা আপনি”—আমার এই অসম্পূর্ণ বাক্য অর্ছোজ্ঞারিত হইতে না হইতেই আমি আমার যন্ত্রকে তাঁর হস্তীবিদ্ধমৎ বেদনা অনুভব করিলাম। আমার মূখের কথা মুখেই রহিয়া গেল। বর্ষব্যাক্ত মহাশয় তাহা বুঝিতে না পারিয়া বলিতে লাগিলেন—মৃতের দাস তিনি, তাঁহার দাসা জগতের কোন কার্যই সাধিত হয় নাই। নরসেবার তাঁহাকে প্রাণ নিপল্‌কন করিতে হইলে তিনি আপনাকে বহু মনে করিবেন। তাহাও প্রু তাহাতে পরিতুষ্ট হইবেন। তাঁহার প্রত্যেক কথাই আমি তাঁহার দৃঢ় বর্ষবিবাহের পরিচয় পাইতেছিলাম।

আমি প্রশংসাপূর্ণ নেত্রে তাঁহার নিকে তাকাইয়া দেখিলাম । আমার মস্তকের বেদনা অদ্বয় তাঁর বোধ হইতে ছিল । আমার মনে হইতেছিল, সমস্ত সুখিণীটা যেন আমার চতুর্দিকে ঘুরিতেছে । আমার পদব্রজ কল্পিত হইতেছিল । আমি কিস্তি ভেঙে সেই মহাশয়র হস্ত ধারণ না করিলে নিশ্চয়ই ভূপতিত হইতাম । তিনি ব্যাকুল ভাবে আমাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় আমি অস্বাভাবিক উত্তরই ইহার কারণ বলিয়া নির্দেশ করিলাম ; কিন্তু আর অধিকক্ষণ স্থির থাকিতে পারিলাম না ; ভগবানের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে স্তম্ভিত হইয়া পরিলাম । বালকের কথা তখনও আমি বিশ্বাস হইত নাই ; তাই ধর্ম্মবাজক মহাশয়কে সরস তাহার নিকট গাইতে অগ্রসর করিলাম । আমার হস্তপদ তখন অত্যন্ত শীতল বোধ হইতেছিল—সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে দারুণ বেদনা অনুভূত হইতেছিল । আমার সমস্তব্যবহারী মহাপুরুষ আমাকে জড়াইয়া ঘরিয়া নিকটবর্তী এক পাছনিবাসে লইয়া গেলেন । আমি তথায় একখানি কাঠামনে শয়ন করিলাম । গৃহস্থানী পিটো আমার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইল । ধর্ম্মবাজক মহাশয় তাহার নিকট আশ্রয় পরিচয় প্রদান করিতেই সে চমকিত হইল, আমার মত ধনবান ব্যক্তিও যে বিঘটিকা রোগাক্রান্ত হইতে পারে ইহাই তাহার বিষয়ের বিষয় । সে তদনুরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিতেই ধর্ম্মবাজক মহাশয় তাহাকে ভয়ঙ্কর করিলেন এবং ইহা যে সর্দিশর্শি নহে সে তাহা কিরূপে সুক্লিণ তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন । পিটো কতক ধর্ম্মবাজকের অভিশপ্তাদের ভয়ে, কতক ভবিষ্যৎ পুরস্কারের আশায় আমার স্তম্ভনায় মনোযোগ প্রদান করিল । আমি ধর্ম্মবাজক মহাশয়ের প্রদত্ত ঔষধ সেবন করিতে লাগিলাম । তিনি ইতোমধ্যে একবার বালকের অতুলনানে গমন করিতে প্ররত হইলেন । আমি কি সত্যই ওলাউঠায় আক্রান্ত হইয়াছি ?—এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করায় তিনি আমাকে নানারূপ সাস্থনা প্রদান করিতে লাগিলেন । আমার বনিষ্ঠ দেহ সকল প্রকার ব্যাধির সহিত সংগ্রাম করিতে সমর্থ হইবে, ইহাই তাঁহার বিশ্বাস । আমি সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া আমার পত্নীকে আমার পীড়ার সংবাদ জ্ঞাপন করিতে নিবেশ করিলাম । আমার মণ্ডলর্শে আমার গৃহের কেহ ব্যাধি কর্তৃক আক্রান্ত হইবেন, ইহা আমার অতিশ্রুত ছিল না, তাই ব্যর্থতার আমার স্বতঃস্ফূর্ত্ত বৈরাগ্য ঐ গৃহে নীত না হইত অতঃপাশি তাঁহাকে অগ্রসর করিলাম ।

ধর্ম্মবাজক মহাশয় আমার অগ্রসর হইতে প্রতিবন্ধ হইলেন । আমি

জনয়ে নিঃশূল আনন্দ অহুতব করিলাম। বসন্তই যুহুতয়ে আমি ভীত হই নাই। আমি আমার প্রিয় বন্ধ, সাধ্বী পত্নী ও শিশু কঙ্কাকে নিরাপদে রাখিবার জন্যই ব্যাকুল হইয়াছিলাম। দর্শনাত্মক মহাশয় বালাকের তত্ত্বাবধায় চলিয়া গেলে আমার বাকশক্তি ক্রমে তিরোহিত হইতে লাগিল; সংজ্ঞা যেন অড়তা প্রাপ্ত হইতে লাগিল। কত কালনিক চিন্তা আসিয়া আমার জনন অধিকৃত করিল। ভীত গৃহস্থানী অহুত উপবেশন করিয়া তাহার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা পরিচাল্য করিতেছিল ও তরুণকিত নেত্রে আমার দিকে এক এক দ্বার দৃষ্টিপাত করিতেছিল; অপর লোকগুলি দূর হইতেই আমার অবস্থা দেখিয়া সন্তরে পলায়ন করিতেছিল। আমি সমস্তই বেশ অহুতব করিতে পারিতেছিলাম; অথচ আমার মনে হইতেছিল, আমি আলপাইন পর্বতের শিখরদেশে আরোহণ করিয়াছি, ধবল তুষারমালা আমার পদযর আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে, সহস্র জলপ্রপাতের ভীষণ ধ্বনি আমার কর্ণকূহর বধির করিতেছে; রক্তিম মেঘমণ্ডল তুষারগিরির চতুর্দিক্ বিরিয়া রহিয়াছে, আর তাহারই মধ্যস্থলে নীনার উজ্জ্বল মুখমণ্ডল। নীনা। নীনা। আমার প্রাণের নীনা। আমার প্রিয়তমা নীনা। বলিয়া চীৎকার করিয়া আমি তাহাকে ধরিতে গেলাম। গৃহস্থানী পিট্টে বাধা প্রদান করিল। আমি বলিলাম, “মুখ, আমার নীনাকে দেখিতেছ না? সে যে তাহার সুকোমল ওষ্ঠাধর বিস্ফারিত করিয়া আমাকে চুখন প্রদানে উদ্ভত হইয়াছে। আমাকে ছাড়িয়া দাও।” গৃহস্থানীর এক ভৃত্য তাহার প্রহর সাহাব্যের লজ অগ্রসর হইল; আমাকে কঠিন শয্যায় পুনরায় শায়িত করিল।

“মাধা হুত্বা নিশ্চিত”—তাহাদের উচ্চারিত এই বিলাপবাক্য আমি শ্রবণ করিলাম। হুত্বা। হুত্বা অসম্ভব। আমি এই কথা ভাবিতে লাগিলাম। স্ববাক্যের কথা দিয়া প্রথম হৃদয়ের আলোক তখন গৃহস্থানী পতিত হইয়াছিল; মল্লিকাগুলি শুণ শুণ রবে সেই স্থানে জীড়া করিতেছিল। আমি যেন শুনিলাম কে গাহিতেছে—

“স্বার্থের হৃদয়-রাশি।

বাসনা লভ্য হয় তোমা পাশে

আতুল পরাণ তব মুখ্য পানে

তুমি এ দ্বিত ছুটিতে নিয়ত

ফেন গো নাহিক জানি ।

আমার জনর রাণি !

জগতে নাহিক তুলনা তোমার

সকল সুখের তুমি সে দাঁপার* ।

উৎসল বিহব স'নে পোহব

তোমার মহিমা জানি*

আমার জনর রাণি !

সত্যই নীনা,—এ সন্ধ্যাতের উজ্জ্বল ঘনাবে । পিডো ত বলিগাছিন, নিতনক
 বীরকণ্ঠের জায় তুমি উজ্জ্বল—সুদূর নক্ষত্রের ন্যায় নিম্পাপ ? মূৰ্খ পিডো
 কিন্তু তখনও তাহার মনে গোতগুণি পরিষ্কার করিতেছিল । তাহার যুব
 বৃদ্ধার আচ্ছন্ন ছিল । পিডো এ স্থানে কিরূপে আগমন করিল ? আমি যে
 এক্ষণে উচ্চপ্রধান দেশে এত সুবিস্তৃত নদীর তীরে বাস করিতেছি ! রাণি
 রাণি তাল তালকে শোভা পাইতেছে । নিদ্রালয় নরনে ভয়ঙ্কর কুতীরগুলি
 যৌনে শয়ন করিয়া রহিয়াছে । তাহাদের বদন সুবিগল—বিজুত, সুদ চক্ষু
 তলি উজ্জ্বল । একবারি ক্ষুর নৌকায় আরোহণ করিয়া কে ঐ বাইতেছে ?
 পিডো কি ? তাহার হাতে তীক্ষ্ণ শাণিত অস্ত্র । পিডো, বস্ত তোমার সাহস ।
 তুমি এই ভীষণকায় কুতীরগুলিকে একাকী শিকার করিতে প্রস্তুত হইয়াছ
 কি ? কই সে দিকে ত তাহার লক্ষ্য নাই ! সে যে একে একে শেগুলিকে
 আক্রমণ করিয়া আমার দিকট উপস্থিত হইল । আমাকে হত্যা করাই কি
 তাহার অভিপ্রেত ? এক—হই—তিন, তিনবার সে আমাকে অংঘাত করিল,
 আমার হৃদয়িত্ত ভেদ করিল । আমি ত তথাপি মরিবার না—কেবল যন্ত্রণার
 ছটকটি করিতে লাগিলাম ! কাহার শাস্ত উজ্জ্বল তরু-ভারকা-সম্বন্ধিত চক্ষু
 আমার উপর স্থাপিত ? আমি তাহার আগ্রহ গ্রহণ করিলাম—প্রাণ
 ছুড়াইল । তিনি দীর্ঘ মগ্ধ গভীর স্বরে বলিলেন, “বৎস ছিন্ন হও ; অঙ্গভেদ
 পরিমিতা ধূতের উপর বিশ্বাস স্থাপিত কর ।” আমি কুশিলাম, সত্যই আমার
 ধর্মবান্ধব বন্ধ আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন । আমি কষ্টে বালকের
 বিষয় অহুসন্ধান করিলাম । তিনি বলিলেন, সে আজ বাণবিযুক্ত, তাহার
 পবিত্র আত্মা সকল সুখভোগের অতীত রাখে প্রবেশ করিয়াছে । এত শীঘ্র
 এই বালক এইরূপে এস্থান করিল ! আমি, উজ্জিত হইলাম । আমার আমার

বুদ্ধি বিপর্যয় ঘটিল। নানাপ্রকার কল্পনা আশ্রিয়া পুনরায় আমার স্বপ্ন অধিকৃত করিল। আমি সে সময়ের অবস্থা এক্ষণে কিছুমাত্র স্মরণ করিতে পারিতেছি না। আমার মনে হইতেছে, আমি তখন অশেষ ব্যস্ততা ভোগ করিতেছিলাম। আমার সঙ্গীতবল্লব যেন কোন ঘরে নিশ্চেষ্ট হইতেছিল। আমার জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেচনাক্রান্তি সমস্তই যেন সেই নিশ্চেষ্টে ক্রমে বিকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছিল। তাহার পরে আমি শুনিলাম, অষ্টুট জনিতে কে যেন প্রার্থনা করিতেছে, কে যেন অস্ত্রযন্ত্রাদির ঘণ্টা নিনাদিত করিতেছে। আমার মস্তিষ্ক আরও বিবৃণ্ডিত হইতে লাগিল; আমি যেন চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলাম, “না—না। আমার পূর্বে আমাকে লইয়া যাইও না, আমার আদেশ লঙ্ঘন করিলে আমার অভিসম্পাত চিরদিন তাহার পশ্চাতে ঘুরিয়া বেড়াইবে।”

সম্মুখে কি ভয়ঙ্কর দৃশ্যবর্ত্ত। কে আমাকে উহার মধ্যে টানিয়া নাগাইতেছে? আমি আমার হস্ত প্রসারিত করিয়া আমার হিঁতবী ধর্ম-মাকড়কে ধরিতে চেষ্টা করিলাম। আমার সম্মুখে কে যেন রৌপ্যান্বিত কুণ্ডল বাণিত করিল। আমি শাহাবোর জন্ত চীৎকার করিতে লাগিলাম। আমি যেন ক্রমেই স্বতল সমুদ্রে ডুবিতে লাগিলাম। তথায় শুধু স্বচ্ছকার—
স্বচ্ছকার ভীষণ শব্দকার।

ঐশ্বর্যলেশু গুপ্ত।

মালিকর।

বহি আমি মালিকর—তখন-মালিক,
মনি—মুক্তা লয়ে আমি বাহি করি যব;
যাটে যোম বাহি বাবা বাণিজ্যে তরী,
আমি হু! হালকের দীন মালিকর।
মুক্ত করবীর যোম পরমাণু মনি,
মোহান্তির কিপলয়—পল্লব নদর
ময়কত! পত্রপুষ্প লবল আবার,
ভাই ল'য়ে বাঁধি মালা আমি মালিকর।
মর্ষিত নাহি যোম সত্য নিশিত
তলবল করে যোম পত্রপুষ্প পর,
তনিত তনিত মুখ মধুর গুপ্তন—
লতাযুগে পাঁচি মালা আমি মালিকর।
কোণু হালক মালিকর মতনৈতলে
লাভিবে করুণ গুপ্তি,—মুকোবল কর-
পরশন পাবে, হবে বস্ত্র যোম মালি,—
আমি লাগি পাঁচি মালা আমি মালিকর।

ঐশ্বর্যলেশু গুপ্ত।

সমালোচনা ।

কণ্ঠ-কথা । "

এই পুস্তকখানি অনেক দিন হইল আমাদের হস্তগত হইয়াছে । কিন্তু নানা কারণে আমরা যথাসময়ে ইহার সমালোচনা করিতে পারি নাই । তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রধান কারণ এই যে, পুস্তকের লিখিত বিষয়গুলি জটিল এবং ছত্রহ — পুষ্টি-বীর্য পণ্ডিতরা যে সকলের মীমাংসা করিতে পারেন নাই সহসা সে সকলে হস্তক্ষেপ করিতে সঙ্কোচ বোধ হয় । আর একটি বিশেষ কারণ এই যে, রামেন্দ্র বাবু স্থলেখক ও স্থপণ্ডিত ; সুতরাং তাঁহার লিখিত প্রবন্ধাদিসম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিতে হইলে একটু বিবেচনা করিরাই করিতে হয় ।

সমালোচ্য গ্রন্থখানিতে মোট ১১টি প্রবন্ধ আছে । যথা মুক্তির পথ, বৈরাগ্য, জীবন ও ধর্ম, বার্ষ ও পরার্থ, ধর্মপ্রবৃত্তি, আচার, ধর্মের প্রমাণ, ধর্মের অহুতান, প্রকৃতি পুণা, ধর্মের জয়, বজ্র । প্রবন্ধগুলি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে 'সাহিত্য' 'সাধনা' ও 'ভারতী' পত্র প্রকাশিত হয় । এতদিনপরে লেখক মহাশয় সেগুলি একত্রিত করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিয়াছেন । প্রবন্ধগুলি পাঠ করিলে ইহাদের ভিতর পুনরুক্তিদোষ সহজেই লক্ষিত হয় ; মনে হয় সকলগুলি ছাঁটিয়া অনেক সংক্ষেপ করা যাইতে পারিত । লেখক মহাশয় নিজেও যে তাহা উপলব্ধি করেন নাই তাহা নহে ; কারণ, তিনি নিজেই ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, প্রবন্ধগুলি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে রচিত বলিয়া বহুস্থলে পুনরুক্তি এবং কোথাও বা অসঙ্গতিদোষ দেখা যাইতে পারে । এই ক্রটিগুলি লেখক মহাশয় বুঝিতে পারিয়াও কেন সংশোধন করিয়া দেন নাই আমরা তাহা বুঝিলাম না । সাময়িক সাহিত্যে বাহ্য চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়া ছিল তাহা যদি আবার ছুড়াইয়া একত্রিত করিতে হয় তাহা হইলে তাহা যত্নের সহিত সূক্ষ্ম ও পরিপাটি করিয়া করিতে হয় ।

রামেন্দ্র বাবু বঙ্গসাহিত্যে লক্ষপ্রতিষ্ঠ ; সুতরাং তাঁহার পরিচয় আর অধিক দিবার প্রয়োজন নাই । তিনি দর্শন ও বিজ্ঞানবিষয়ক ভাবাসকল অতি সুন্দর প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝাইতে পারেন । তিনি যাহা কিছু লিখেন সার্বিকভাবে তাহা সকল সময়েই বহুমূল্য । সমালোচ্য পুস্তকখানিও সেই হিসাবে বঙ্গসাহিত্যে আমাদের জিনিষ । লেখক মহাশয়ের বিশেষত্ব এই যে,

আর্য্যাবর্ত —



শ্রীগুরু রামেন্দ্র আনন্দ সিংহ।

তিনি পাক্কা মত ও চিত্তা স্তম্ভরূপে উপপদ্ধি করিয়াছেন; কিন্তু সেই সঙ্গেসঙ্গে সেগুলি বোলঝানা গ্রহণ না করিয়া তাহাদের মধ্যে যেগুলি বর্জনীয় মনে করিয়াছেন সেগুলি সম্পূর্ণ বর্জন করিয়াছেন এবং যেগুলি গ্রহণ করিবার বোধ্য বিষয়না করিয়াছেন সেগুলি গ্রহণ করিয়াছেন। এক কথায় বলিতে গেলে, প্রবন্ধগুলি ইংরাজী মতামতের বাকাগা তর্জমা নহে। সেই অল্প বিষয়গুলির প্রতি পাঠকের মন সহজেই আকৃষ্ট হয়।

বর্তমান পুস্তকে রামেন্দ্র বাবুর প্রধান বক্তব্য এই যে, কর্তৃত্বভাগে মানুষের ক্ষমতাও নাই এবং অবিকারও নাই। “ঐহিক বা পারত্রিক বার্ষপন্নতা হইতে যে বৈরাগ্যের জন্ম, যবারা মানুষে জীবনের কর্তৃত্বের গ্রহণে কুণ্ঠিত হয়, বার্ষপন্ন শাস্তির আশায় পরার্ধপন্ন অশাস্তি স্বীকারে কুণ্ঠিত হয়” সেই বৈরাগ্যই তাঁহার কটাক্ষের বিষয়। “আমার বিশ্বাস আমাদের বর্ণশাস্ত্র এই বৈরাগ্যের কখনই প্রসঙ্গ দেন নাই এবং সেই জন্যই গৃহস্থপ্রমুখকে সকল আগ্রহের উচ্ছেদ স্থান দিয়াছেন।” “ভগবান তথাগত, ভগবান শঙ্করাচার্য্য বা খ্রীঃনতজ্ঞ এবং তাঁহাদের অন্তর্গত অনেক মহাত্মা অকাণ্ডে গৃহস্থ্যাপন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা কর্তৃত্ব্যাপ করেন নাই, বরং তাঁহারা ক্ষুদ্র কণ্ঠের স্থলে বৃহৎ কর্ত্ত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁহাদের কৃতকর্ম্মের ফল সমস্ত মানবজাতি অস্ত্রাণি ভোগ করিতেছে এবং চিরকাল ভোগ করিবে। বস্তুতঃ শাস্ত্রাহুযোজিত বিভ্রান্ত ঠাংরাগা নিকায় কর্ত্ত্বপন্নতা হইতে অভিন্ন,” যে বৈরাগ্য আমাদের দেশে সহস্র বৎসর ধরিয়া এই সমগ্র জাতির অস্থিমজ্জার প্রবেশ করিয়া তাহাকে নিশ্চেষ্ট ও কর্ত্ত্বহীন করিয়াছে, সেই বৈরাগ্যকে ববার্ষভাবে আমাদের চক্ষুর সমক্ষে ধরিয়া লেখক মহাশয় আমাদের প্রকৃত উপকায়সাধন করিয়াছেন। বর্ধের প্রমাণ, বর্ধের অস্থটান ও বর্ধের জর প্রকৃতি প্রবন্ধে রামেন্দ্র বাবু স্তম্ভর সরল ভাষায় বিষয়গুলির ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সচরাচর এই জাতীয় প্রবন্ধের বাক্যবাহু ভেদ করা পাঠকের পক্ষে নিত্যত দুঃস্বপ্ন হইয়া উঠে। কিন্তু রামেন্দ্র বাবুর রচিত প্রবন্ধগুলি বিষয়ের জটিলতা সবেও ভাষার মাধুর্য্যে মনোরম হইয়াছে। তবে লেখক মহাশয়ের মতামতের সহিত আমাদের সকল মতগেই যে ঐরা আছে এমন নহে। রামেন্দ্র বাবু ‘অচোর’ নামক প্রবন্ধের এক স্থলে বলিতেছেন—“যে সকল পুণ্ড্রিত অস্থটান আবহমান কাল হইতে সমাজমনো আচরিত হইয়া আসিতেছে, তাহাদের সহিত সমাজ-শরীরের রক্তমাংসের অস্থিমজ্জার একগ একটা সঘর্ষ দাঁড়াইয়া গিয়াছে। যে,

তাহাদিগকে বর্জন করিয়া নূতন অমুষ্ঠানের প্রবর্তন স্বর্গুন্দির কাণ বলিয়া বিবেচিত হয় না। পুরাতন মন্দির হইতে পারে; কিন্তু নূতনের ভিতর কি আছে কে জানে? পুরাতন মন্দির দেখিতে পাইতেছি না, উপযোগিতা দেখিতে পাইতেছি না। কতি নাই—এতকাল ত একরকম চলিয়া আসিতেছে এখনও চলিতে থাকে।” প্রাচ্যবাসুর প্রায় একজন বিজ্ঞানবিৎ স্বর্গুন্দিদের নিকট এইরূপ মত আনয়ন আশা করি নাই। পুরাতনকে যদি মন্দির বলিয়া স্বীকার কর, যদি তাহার কোনও অর্থ ও উপযোগিতা না দেখিতে পাও, যদি পুরাতন অমুষ্ঠান-জন্য লম্বা-শরীরের হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করিয়া তাহার জীবনীশক্তিকে সম্পূর্ণ নিষ্কর করিয়া তাহাকে মৃত্যুস্থবে আনয়ন করে, তাহা হইলে তাহাকে বর্জন করাই প্রেরণ; কেবল পুরাতন বলিয়া তাহাকে থাকাইয়া থািলে চলিবে কেন? নূতনের বিভীষিকা দেখিয়া ভয় পাওয়া স্বর্গুন্দির লক্ষণ নহে। মৃত্যু-শরীরে ও সমাজ-শরীরে এ বিষয়ে কোন প্রভেদ দেখা যায় না। প্রাণ বাঁচাইতে হইলে নরপতি অস্ত্রুলি কাটিয়া ফেলতেই হইবে। অকল্যাণ মল বৎসরের পুরাতন হইলেও তাহার প্রতি মমতা প্রকাশ করিয়া তাহাকে যেহে পুষ্টিয়া রাখিল কে কবে নিঃশেষ হইয়া থাকিতে পারিবে? বহুকাল ধরিয়া “ডিং, ডং” শব্দ করিয়া পুরাতন অঙ্গের উপশম না হইলে নূতন ঔষধের ব্যবস্থা করিতেই হয়।

আর এক স্থলে রামেন্দ্র বাবু বলিতেছেন—“সমাজের ধর্ম্মবুদ্ধির নিকট আপন ধর্ম্মবুদ্ধিকে বলিদান বিবে। হইতে পারে তোমার মার্জিত ধর্ম্মবুদ্ধি ও তোমার বিস্তৃত ধর্ম্মনীতি প্রচলিত নিকট সামাজিক বুদ্ধির ও নিকট সামাজিক ধর্ম্মের অনুবোধন করে না। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, প্রথমে তোমার সার্বজনিকতা, পরে তোমার ব্যক্তিগত ভাব। সমাজ-ধর্ম্মের সমীপে ব্যক্তিগত ধর্ম্মের আসন নাই।” কেহ কেহ বলেন—এ সকল কথা কি সর্ব্বব্যাপী? অনেক সময়ে দেখা যায়, সমাজে ধর্ম্মের নামে অনেক দুঃখ-আতঙ্ক আচরণ হইতেছে এবং ধর্ম্মবুদ্ধির ব্যাপ্তি প্রণোদিত বলিয়া অনেক প্রাণের অর্পণ হইতেছে। এইরূপ সামাজিক নীতি ও সামাজিক ধর্ম্মবুদ্ধির নিকট যে নিজের ধর্ম্মবুদ্ধিকে বলিদান দিতে হইবে, এমন কথা কি করিয়া স্বীকার করিব? আমেরিকার দাসত্ব প্রথা প্রচলনপথে ক্রীতদাসদিগকে বহন করিবার একটি আহারের নাম Jehovah রাখা হইয়াছিল, এবং দাস-ব্যবসায়ীরা দাসত্ব হইতে শ্রমিককে কাড়িয়া লইবার পূর্বে জাহ্নু অবনত

করিয়া ভগবানের নিকট স্বীয় কৃতকাণ্ডের সফলতার জন্য প্রার্থনা করিত।
 বর্ষের নামে সমাজে কত পাপের অঙ্কুরোদয় সন্দেহে সন্দেহকালে অঙ্কুরিত
 হইয়াছে। কিন্তু বর্ষবৃদ্ধির দ্বারা প্ররোচিত হইয়াই এক এক জন মনুষ্য-
 পুরুষ সেন্সতলের সাহায্যে বুদ্ধ করিয়া জয়ী হইয়াছেন। সেই জন্যই যুগ্ম-সমাজ
 আজ এতদূর উন্নত হইতে পারিয়াছে। এবং এখনও এখন লোক সমাজের
 মধ্যে ঘেঁষতে পাওয়া যায়, যাঁহারা আপনারা বর্ষবৃদ্ধিকে সমাজের বর্ষবৃদ্ধি
 সামাজিক নীতির নিকট বলিদান দিতে প্ররোচিত নহেন। সেই জন্যই আমরা
 সমাজের দিন দিন উন্নতি হইবে এইরূপ আশা করিয়া থাকি। বুদ্ধবোধ,
 ঐক্যেতচ্চ কিম্বা বীত বহি আপন আপন বর্ষবৃদ্ধিকে সমাজ-বৃদ্ধির নিকট
 বলিদান দিতেম তাহা হইলে যুগ্ম-সমাজ আজ কোথায় থাকিত?

কিন্তু সন্দেহ বহি বেজবাক্য কথ্য করে—সমাজের বর্ষবৃদ্ধির নিকট
 আপনার বর্ষবৃদ্ধিকে ও সমাজের নীতির নিকট আপনার নীতি বলি দিতে
 অসম্মত হয়, তখন সমাজের শৃঙ্খলা থাকে না। বিশেষ যাহায্যের পক্ষে
 প্রতি হওগাও অসম্মত নহে। সমাজে কদাচার প্রবেশ করে—বর্ষের মানি
 ঘটে। তখন সংস্কার প্রয়োজন হয়, সংস্কারও হয়। কিন্তু সকলেই সে
 সংস্কারের অধিকারী নহে। তাই পীঠার ভগবানের উক্তি—

যদা হি বর্ষস্ত মানির্ভবতি ভারত।
 অত্যাখানমবর্ষস্ত তদাখানং স্বভাম্যহমঃ
 পরিভ্রাণয়ে সাধুনাং বিনাশায় চ হুঙ্করাম্।
 বর্ষসংস্থাপনার্থং সত্ত্বামি যুগে যুগে ॥
 “যখন যখন ঘটে ভারত অবর্ষের মানি,
 অবর্ষের অত্যাখান, আপনাদের স্বভি আমি;
 সাধুদের পরিভ্রাণ বিনাশ হুঙ্কর
 করিতে সাধন;
 স্থাপন করিতে বর্ষ করি আমি যুগে যুগে
 জনম গ্রহণ।”

সংস্কারে অধিকারী এই যুগাবতার। তিনি অন্যায়-প্রণয়-পদোবিজল
 হইতে বর্ষকে উদ্ধার করেন; তিনি পণ্ডিত-ক্লিয়াকাতা-অধীনবহল বর্ষের
 সত্যরূপ দেখাইয়া দেন; তিনিই ধর্মকে সূর্য যত আবিস্কৃত হইয়া রক্তসিক্ত

ভূমিতে বর্ষের প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন। একরূপে সমাজের প্রাধিক্ত দৃষ্টা না করিলে সমাজ টিকিতে পারে না। ইহাই রামেন্দ্র বাবুর মত।

রামেন্দ্র বাবুর মতে—“ভারতবর্ষের হিন্দু সমাজে যে কিছু বন্ধন, যে কিছু একতা, যে কিছু জাতীয়তা বর্তমান, তাহা এই বর্ষাহুতানেরই একতাপত্ত। সেই প্রথম জাতীয়ত্ব কোন বাহুশক্তির নিকট অস্তাঙ্গি। সঙ্কুচিত বা পরাক্রান্ত হয় নাই।” বাস্তবিক ‘প্রথম জাতীয়ত্ব’ বলিয়া কি কিছু আমাদের আছে? আমাদের “বন্ধন” নিতান্ত শিথিল, “একতা” ক্ষীণ “জাতীয়তা” নাম শব্দ। প্রকৃত জাতীয়তা আমাদের নাই, সেই জন্যই আমাদের এই হৃদয়শূন্য।

সমালোচনা দীর্ঘ হইয়া পড়িল সেই জন্য আর অস্তাঙ্গ বিবরণের অবতারণা করিলাম না। লেখক মহাশয়ের বিশ্বাস, “কর্মকাণ্ডে ও জ্ঞানকাণ্ডে আপাততঃ যে বিরোধ দেখা যায়, সেই বিরোধের মূলে সামঞ্জস্য আবিষ্কার, গুণবদ্গুণীত্যাদি বটিরাছে। Legality ও Morality এই উভয়বিধ বিরুদ্ধ বর্ষের মূলগত ঐক্য সংস্থাপনে—সম্বন্ধসাম্যবনে গীতার মাহাত্ম্য।” কিন্তু তাহা এই সামঞ্জস্য বটিরাছে তাহা লেখক মহাশয় দেখান নাই। আশা করি, ভবিষ্যতে তাঁহার এই বিষয়ে যাহা বক্তব্য তাহা আমাদের কাছে জানাইবার অবসর তিনি পাইবেন। আমরা ঔৎসুক্যের সহিত সেই দিনের প্রতীক্ষায় রহিলাম।

ঐ—

কিশোরীচাঁদ মিত্র।

—:—

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

রাজকর্ম।

—•—

হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠানের অব্যবহিত পরেই কিশোরীচাঁদ তদানীন্তন লিগাল রিসেম্বলান্সার মিঃ আলেকজান্ডারের অধীনে কিয়ৎকাল কাব করিয়াছিলেন। পরে তিনি ইষ্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ের সেক্রেটারী মিষ্টার বিওবোন্ডের অধীনে কিছুদিন কাৰ্য্য করেন। কিন্তু এসকল কাৰ্য্য তাঁহার ক্রটির অমূৰ্ত্তপ ছিল না। সুতরাং তিনি এই কর্ম প্রতিষ্ঠান করিয়া কিয়ৎকাল ২৪ পরগণার তদানীন্তন প্রধান সদর আমীন, প্যারীচাঁদের একজন পরমবন্ধু শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সহিত আলিপুর বিচারদ্বারে বিচারবিভাগীয় কাৰ্য্যসম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টি লাভার্থ গভার্নমেন্ট করিতে লাগিলেন। এইরূপে তিনি বিচার-বিভাগীয় কাৰ্য্যসম্বন্ধে কিছু জ্ঞানলাভ করেন। ইহার কিছু পরে মিষ্টার হেনরী টরেল এলিয়টিক সোসাইটির সহকারী সম্পাদকের কাৰ্য্যে নিযুক্ত একজন উপযুক্ত লোক অনুসন্ধান করিতে অসুযোগ করার প্যারীচাঁদ তাঁহার জ্ঞাতার সঙ্গতি লইয়া তাঁহার নান প্রস্তাব করিলে কিশোরীচাঁদ উক্ত পদ গ্রহণ করেন। এই কর্ম তাঁহার ক্রটির সম্পূর্ণ অমূৰ্ত্তা ছিল এবং তাঁহার জ্ঞানচর্চারও বিশেষ সহায়তা করে। তাঁহার কাৰ্য্য তদানীন্তন সম্পাদক ও কাৰ্য্যনির্বাহক সমিতির বিশেষ মনঃপূত হইয়াছিল।

এই সময়ে কিশোরীচাঁদ তাঁহার জীবনের আদর্শ, উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের সর্গশ্রেষ্ঠ সংস্কারক রাজা রামমোহন রায়ের জীবন-বৃত্তান্ত প্রণয়ন করেন। ১৮৪৫ বৃষ্টাব্দে ‘কলিকাতা রিভিউ’ পত্রের অষ্টোবর সংখ্যার উহা প্রকাশিত হয়। তাঁহার মাধুর্য্য, রচনার পরিপাট্য, ইচ্ছাপূর্ণ গভীরতার ও বর্ণনার অকৃত্রিমতার ঐ প্রবন্ধ পাঠকমাত্রেয়ই নিকট অতি উপাদেয় বলিয়া বোধ হয় এবং বাঙ্গালার তদানীন্তন ডেপুটী গভর্নর ভগ্নস্বামী মিষ্টার (পরে সাহ ডেপুট্রিক) ছািলিডে উহা পাঠ করিয়া এত প্রীত করেন যে, তিনি কিশোরীচাঁদকে আজ্ঞান করিয়া তাঁহাকে ডেপুটীম্যাজিষ্ট্রেটের পদ গ্রহণ করিতে অসুযোগ করেন। তখন এ কাৰ্য্যে ভাবভীরগণকে প্রায়

নিখুঁত করা হইত না এবং এই পদ অভ্যন্তর সন্ধানের বলিয়া বিবেচিত হইত । কিশোরীচাঁদ এই অবাচিত দায়িত্বপূর্ণ পদ গ্রহণ করিলেন । প্রকাশক রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের আন্তরিক্যে এই বিষয়ে লিখিত হইয়াছে, “ইংরাজী ১৮৪২ সালে ‘কলিকাতা রিভিউ’ নামক সাময়িক পত্রিকায় ঐহুঁক কিশোরীচাঁদ মিত্র রায়মোহন রায়ের জীবনী লিখেন । কিশোরীচাঁদ মিত্র বিখ্যাত টেকচাঁদ ঠাকুরের (গারীচাঁদ মিত্রের) কনিষ্ঠ ভ্রাতা । তিনি মিডেও একজন বিখ্যাত লোক । আমি যে বৎসর হিন্দু কলেজের প্রথম প্রবীণে উঠি সেই বৎসর তিনি কলেজ পরিভ্রমণ করেন । প্রথম হওয়া গিয়াছিল যে তাঁহার ঐ জীবনী-প্রণয়নে মহাখ্যাতিাপন্ন ঐষ্ট্রিয় বর্ষপ্রচারক ডাক্তার ডক্ সাহায্য করেন । ঐ জীবনী কিশোরী বাবুর সংসারিক উন্নতির কারণ হয় । তাঁহার ঐ লেখা বেঙ্গল সেক্রেটারী হেলিডে সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করে । হেলিডে সাহেব তাঁহাকে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটী পদ দেন । আমি উক্ত জীবনীরচনার বিলম্ব সাহায্য করি । রায়মোহন রায় সখদীর অনেক গল্প আমার পিতার নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া তাঁহাকে দিই ।”

ডাক্তার ডক্ যে উক্ত প্রবন্ধরচনার সাহায্য করেন এই জনশ্রুতির মূল্য কতদূর সত্য নিষিদ্ধ আছে তাহা বিবেচ্য । ডাক্তার ডক্ ঐ সময়ে ‘কলিকাতা রিভিউ’ সম্পাদন করিতেছিলেন । প্রাকৃত সংখ্যায় ভারতবাসীর শিক্ষা— (The Education of the People of India its political importance and advantages) নামক একখানি পুস্তিকার সমালোচনার ইংরাজী শিক্ষার কত দূর উন্নতি হইয়াছে ও হইতেছে তাহ; প্রদর্শন করাইয়া উপসংহারে তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন :—

“And when, in the spirit of the remarks there made, we simply state that the article in the present number, on RAMMOHAN ROY, is bona fide the production of an educated Hindu, we think we have furnished a fresh argument to the friends of sound education to persevere more earnestly than ever in their philanthropic labours.”

এই উক্তি হইতে বোধ হয় যে, কিশোরীচাঁদ ডাক্তার ডকের নিকট বিশেষ কোনও সাহায্য লয়েন নাই । ডাক্তার ডক্ তৎকালে ‘কলিকাতা রিভিউ’ পত্রের সম্পাদক এবং কিশোরীচাঁদের একজন অকৃত্রিম বন্ধু ও সহযোগী ছিলেন ।

এই ছই কারণে এবং-উক্ত প্রবন্ধের ভাষায় লালিত্যে ও বিস্তৃতিতে বিশিষ্ট তৎকালীন ব্যক্তিত্বের কল্পনা উক্ত জনজ্ঞতির জনক বলিয়া অনুমান হয়। রাজনারায়ণ বাবুর আশ্রয়িত হইতে উক্ত অংশটির শেষভাগে বাহা লিখিত আছে তাহা কিশোরীচাঁদের প্রবন্ধরচনামধ্যে একটি বৈশিষ্ট্যের উদাহরণ। কিশোরীচাঁদ কোনও বিষয়ে লিখিবার পূর্বে তৎসম্বন্ধে যতদূর সম্ভব বিবরণ সংগ্রহ করিয়া নোটবুকে লিখিয়া রাখিতেন। বহু স্থান হইতে এবং বহু ব্যক্তির নিকট হইতে তাঁহার রচনার উপকরণ সংগৃহীত হইত। পরে অবশর মত তিনি সেইগুলি মনোনিবেশ সহকারে লেখিতেন ও চিত্রা করিতেন। উহার অনেক পরে প্রকৃত রচনা আরম্ভ হইত। এই জ্ঞাত কিশোরীচাঁদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তকগুলির মধ্যেও এক একখানি বৃহৎ গ্রন্থের উপকরণ লুক্কায়িত আছে। অথচ তাঁহার রচনার মধ্যে ভাবগুলি এতদূর ভাবে বিস্তৃত আছে যে, তাহা বহু চিত্রার পর সম্যকলিখিত গোথনা হইয়া নিত্যকাল স্বাভাবিকতার সহিত লিখিত বলিয়া অনুমানিত হয়। বাঙ্গালা ভাষায় রামমোহন রায়েয় সর্বোৎকৃষ্ট চরিত্রলেখক নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই জ্ঞতই কিশোরীচাঁদের উক্ত সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত হইতে অনেক উপকরণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। * বলা বাহুল্য ‘কলিকাতা রিভিউ’ পত্রে প্রকাশিত কিশোরীচাঁদের এই সর্বপ্রথম প্রবন্ধটি সাতিশয় বর ও পরিভ্রমের সহিত লিখিত।

প্যারীচাঁদের রচিত ডেভিড্ হেয়ারের ইংরাজী জীবনচরিত হইতে প্রতীয়মান হয় যে, ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে ২০ মে এপ্রিল তারিখসম্বলিত একখানি পত্রে কিশোরীচাঁদ রাজশাহিদমণের জ্ঞাত হেয়ার স্বত্বসভার সম্পাদকের পরামর্শ কাৰ্য্যনির্বাহক সমিতিরকে জ্ঞাপন করেন। সুতরাং উক্ত সময়েরই যে তিনি রাজশাহিতে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ গ্রহণ করিয়া প্রথম ভদ্রায় পদন করেন তাহা বিবরণে সন্দেহ নাই।

এই সময়ে তিনি আর একটি সাময়িক স্থানের অধিকারী হইলেন। ১২৪২ বঙ্গাব্দে ১লা বৈশাখ কিশোরীচাঁদ একটি পুত্র লাভ করেন। কিন্তু ইহার ঠিক এক বৎসর পরেই বৈশাখ মাসে তাঁহার পুত্র উপেক্ষণাল অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। কিশোরীচাঁদের কোমল জন্ম পুত্রলোকে নিত্যকাল কাটা হইয়া পড়ে এবং তাঁহার শিক্ষিতা-অবস্থার কড়ক লিখিত একখান

* বঙ্গোদ্যোগ রামমোহন রায়েয় জীবন বৃত্তান্ত, “বিত্তীয় বাহুর বিজ্ঞাপন”।

অসমাপ্ত জীবনচিহ্ন হইতে বুট হয় যে, তখন তিনি এতদূর শোকান্বিত হইলেন যে, ১৯১২ দিন লম্বাগত থাকেন এবং তিনি ও তাঁহার বন্ধু 'নবনারী'-প্রদেতা ৮ নীলমণি বসাক মহাশয় (যাঁহার বাসায় কিশোরীটাদ তৎকালে অবস্থান করিতেছিলেন) উভয়ে কয়েক বিবস কোনও কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন নাই । •

কিছু কৰ্ম্মবোঝা আত্মান যাঁহার কর্ণকূহরে^{*} প্রবেশ করিয়াছে তিনি কত দিন নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারেন ? কৰ্ম্মের কি মহিমা ! যখন কোনও কর্ণব্রত মহাত্মা হৃদয়ের একাগ্রতা ও আন্তরিকতার সহিত কৰ্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন তখন তাঁহার সংসারিক সকল চিন্তা; দূর হয় । কিশোরীটাদ কৰ্ম্মের আত্মান প্রবণ করিলেন । অবসাদ উদ্ভবে পরিণত হইল । কিশোরীটাদ অবিচলিত উৎসাহের সহিত দেশের কল্যাণক্ষেত্রে সচেষ্ট হইলেন ।

কিশোরীটাদ সর্বপ্রথমে রামপুর বোয়ালিয়ায় সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেটের কৰ্ম্ম প্রাপ্ত হইলেন । রামপুরে বিজ্ঞান প্রভৃতির উন্নতিকল্পে তিনি অশেষ চেষ্টা করেন । ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পরামর্শে বাবু লোকনাথ মৈত্র রামপুর বোয়ালিয়ায় একটি বিজ্ঞানপ্রতিষ্ঠা করেন । কিশোরীটাদ এই স্থানের সম্পাদক ছিলেন । তিনি কেবল বালকগণের উন্নতি-নিবন্ধে ব্রতবান ছিলেন না ; পরন্তু বালিকাগণের শিক্ষার জন্য একটি বৃত্ত প্রবর্ত্তিও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন । যে সময়ে ব্রিটিশভারতের রাজধানীতেও বঞ্চিত হিন্দুগণ বালিকাশিক্ষাকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতে ইতস্ততঃ করিতে ছিলেন, যখন কলিকাতা বালিকা-বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া যখনমোহন তর্কালঙ্কারকে অতিচ্যুত হইতে হইয়াছিল, সেই সময়ে সত্যতার কেন্দ্র হইতে পুরে রামপুর বোয়ালিয়াতে বালিকা-বিদ্যালয়প্রতিষ্ঠা যে কতদূর দুঃসাধ্য কাৰ্য্য ছিল তাহা আলিফার দিনে অল্পতব করা অসম্ভব । ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে এই স্থানের দ্বিতীয় বার্ষিক পরিতোষিক বিতরণকালে কিশোরীটাদ কর্তৃক পঠিত কাৰ্য্যবিবরণী হইতে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত অংশ হইতে বুট হইবে যে, দেশে জ্ঞানিকা বিজ্ঞানরূপ কল্যাণের কার্য্যে স্থানীয় সমাজ লম্বাগরণ বিশেষ বাধা প্রদান করিয়াছিলেন ।

"It now numbers six girls but the committee expect many* accessions soon, several respectable natives having

নীলমণি বাবু তৎকালে কম্বিনারের পার্শ্ববাল ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন ।

promised to send in their daughters. The committee are fully aware of the difficulties inseparable from the introduction of female education in this district. The prejudices of some of the most respectable zemindars here would oppose—a formidable resistance. They will have also to contend against the apathy of not only their ignorant and illiterate countrymen but many of those who appreciate it and should lend them their co-operation. The successful example, however, set by the Hon'ble Mr. Drinkwater Bethune in Calcutta is very encouraging and ought to be followed in every part of the country. The recognition of female education by Government will, they also believe, greatly facilitate the accomplishment of this great object."

কিন্তু কেবল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই কিশোরীচাঁদের দেশসেবাইতরফা সীমাবদ্ধ ছিল না । বাহ্যতে জনসাধারণের মনে ধর্মতাব উদ্দীপ্ত হয় তদ্ব্যতীত তিনি ১২৫৪ বঙ্গাব্দে ফাওয়ান মাসে একটি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত করেন । প্রতি বুধবার ইহার অধিবেশন হইত । কিশোরীচাঁদ এই সভার প্রাণবহুত্ব ছিলেন এবং প্রতি সপ্তাহে ধর্ম ও নীতিবিষয়ক বক্তৃতাাদি প্রদান করিতেন । স্থানীয় শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণেই এই সভার উপস্থিত থাকিতেন । বোধ করি, এই সভাটি Hindu Theophilanthropic Societyর অন্তর্গত হইয়াছিল । ইহার প্রকৃতিসম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ জানিবার জন্য আমরা কিছুকাল পূর্বে বোয়ালিরা ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক মহাশয়কে পুরাতন কাগজপত্রাদি দেখিয়া এবং প্রাচীন ব্যক্তিবর্গের নিকট অনুসন্ধান করিয়া সবিশেষ তথ্যসংগ্রহ করিতে অক্লান্ত্য করিছিলাম । প্রত্যাশ্য ব্রহ্মসমাজ দ্বারা মহাশয় ১৫ই জুন ১৯১০ তারিখ সম্বন্ধিত একখানি পত্রে লিখিয়াছেন—

"In compliance with your letter of the 7th ultimo, I made a thorough search in the old records of the Somaj and consulted, with the old friends of the time of your great-grand-father, the late Babu Kissory Chandra Mitra; but I regret to let you know that this 'Rampur Boalia Brahmo Samaj' was

not established by him. The late Maharsi Devendranath Tagore of Calcutta laid the foundation stone of the Somaj in 1273 B. S. Mr. Mitter was the Sub-Divisional Officer of Nator in this District ; and what he did, he did possibly at Nator. He used to come here occasionally for his official business and delivered lectures in the meetings then held at the Somaj."

আমাদের বোধ হয়, ব্রজলাল বাবু সমাজের পুরাতন কাগজপত্রে দেখিয়া থাকিবেন যে, বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১২৭০ সালে সমাজের প্রতিস্থাপন করেন এবং কিশোরীচাঁদের পুরাতন বস্ত্রবর্ণের নিকট প্রত্ন হইয়া থাকিবেন যে, বোয়ালিয়া ব্রাহ্মসমাজে কিশোরীচাঁদ মথো মথো বক্তৃতা দি প্রদান করিতেন । কিন্তু তাঁহার পত্রাংশে পরস্পরবিরুদ্ধ বাক্য সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । কারণ, কিশোরীচাঁদ ১২৭০ সালেঃ বহু পূর্বে রাজকর্ম ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং ইহার প্রায় ২০ বৎসর পূর্বে রাজশাহিতে ছিলেন । সুতরাং তিনি সমাজে বক্তৃতা দিতেন, স্বীকার করিলে ১২৭০ সালের বহু পূর্বে সমাজের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে । আমাদের উপরিলিখিত বিবরণ কিশোরীচাঁদের সহধর্মিণী কর্তৃক লিখিত প্রাণলিখিত জীবনচিত্র হইতে গৃহীত । এবং তিনি যখন সে সময়ে রাজশাহিতে ছিলেন তখন তাঁহার লিখিত বিবরণের সত্যতাসন্দেহ সন্দেহ করিবার কোনই কারণ বিদ্যমান নাই । মফঃস্বলস্থ অধিকাংশ ব্রাহ্ম-সমাজের ইতিহাসে দৃষ্ট হয় যে, তাহাদের প্রতিষ্ঠার পর স্থানীয় ব্যক্তিবৃন্দের আশ্রয়ের অভাবে সমাজ লুপ্ত এবং পরে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় । রামপুর বোয়ালিয়া সমাজের ইতিহাসেও এইরূপ ঘটনা হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় ; এবং সন্তদত্তঃ কিশোরীচাঁদ কর্তৃক তথায় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইবার পর উহা বিলুপ্ত হয় এবং পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইলে ১২ বৎসর পরে দেবেন্দ্রনাথ কর্তৃক সমাজগৃহের প্রতিস্থাপন হয় ।

রাজশাহিতে অবস্থানকালে ১২৫৪ বঙ্গাব্দে বৈশাখ মাসে কিশোরীচাঁদের একটি কল্পা সন্তান জন্মগ্রহণ করেন । তাঁহার আর কোনও সন্তানাদি হয় নাই ।

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে লবডিভিসন/প্রাণালী প্রবর্তিত হইলে কিশোরীচাঁদ ম্যাগি-স্ট্রেটের পূর্ণ কর্মতা প্রাপ্ত হইয়া নাটোর লবডিভিসনের ভার গ্রহণ করিলেন ।

রোভারেও লালবিহারী দে ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ‘বেঙ্গল ম্যাগাজিনে’ কিশোরীচাঁদ মিত্র শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন, “যে পঞ্চ বর্ষ কয়েক মাস কিশোরীচাঁদ নাটোরের ডেপুটী ম্যাগিস্ট্রেটের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন সেই সময়টি তাঁহার জীবনের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণকর ও গৌরবময় বলিয়া আমাদের বোধ হয়। একজন উচ্চশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত দেশবাসী উদার মত, সর্বব্যাপী সহানুভূতি ও উচ্চতম আশা লইয়া দেশের একটি সর্বাঙ্গীণ হীনাবস্থাপন্ন জিলার শাসনভার গ্রহণ করিলেন। এই স্থানে, অনেকে যাহা প্রাপ্ত করেন না কিশোরীচাঁদ তাহা পাইলেন। তাঁহার শক্তি সর্বোৎকৃষ্টভাবে এবং স্বাধীনগের সহিত তাঁহার ভাণ্ডা বিলম্বিত হইল তাঁহাদিগের সর্বাঙ্গীন কল্যাণার্থ পরিচালন করিবার অপূর্ণ সুযোগলাভ ঘটিল। কিশোরীচাঁদ সে সুযোগ ছাড়াইলেন না। প্রথম হইতেই তিনি জিলার উন্নতিকল্পে সর্বাঙ্গীণরূপে আপনাকে নিয়োজিত করিলেন। শীঘ্রই তিনি জিলার মধ্যে একজন মহাপ্রভাভাপনালী ব্যক্তি হইয়া উঠিলেন এবং তিনি তাঁহার সমস্ত ক্ষমতা দেশবাসীর মঙ্গলার্থ ব্যয় করিতে লাগিলেন। বর্গীয় রাজা প্রসন্ননাথ রায়ের সাহায্যে তিনি বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠা, ঔষধালয়-স্থাপন, জলাশয়-খনন, পথ-নির্মাণ প্রভৃতি কার্যের অমুষ্ঠান করিলেন এবং দেশবাসীর শারীরিক ও সামাজিক উন্নতির জন্য সর্বপ্রকারে চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। রাক্ষসাহিত্যে তাঁহার নাম আজিও সকলে স্মরণ করেন এবং বহুদিন স্নেহ ও কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিবেন।”

নাটোরে অবস্থানকালে কিশোরীচাঁদের সহিত দীর্ঘপরিমার রাজা (তখন বাহু) প্রসন্ননাথ রায়ের ঘনিষ্ঠতা জন্মে। অতি শুভকরূপে এই দুই জনে বন্ধুত্ব সংঘটিত হইয়াছিল। দুই জনের সম্মিলিত চেষ্টায় রাজশাহি কয়েক বৎসরের মধ্যে হেয়তম অবস্থা হইতে দেশের একটি সর্বাঙ্গীণ উন্নতিশীল জিলার পরিণত হইয়াছিল। প্রসন্ননাথ ববার্খই একজন মহাত্মা ছিলেন। “রাজশাহির রাজগণ” (Rajas of Rajshye) নাম প্রদিত ঐতিহাসিক গ্রন্থে কিশোরীচাঁদ তাঁহার সম্বন্ধে ববার্খই লিখিয়াছিলেন,—“The unselfish life of the Raja, devoted to patriotic objects, challenges our unqualified admiration. The ancestors of Raja Prasanna Nath Roy were no doubt charitable. But his charity was discriminating. It was not exercised on Sradhdhas and Naches. It was not

displayed is ostentatious manifestations. It sought proper objects and aimed at proper means.” অর্থাৎ “এই রাজ্যের দেশবিশেষে চিরনিরোদ্ধিত নিঃস্বার্থ জীবন আবাদিগণের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা আকৃষ্ট করে। রাজ্য প্রসঙ্গনাথের পূর্বপুরুষগণও দাতা ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার দান অতি বিপৈশ্যের সহিত প্রবৃত্ত হইত। শ্রাদ্ধ এবং নাচে ইহার অর্থ ব্যয়িত হইত না। বৃথা আড়ম্বরে ইহা ব্যয় হইত না। ইহা উপযুক্ত পাত্র অবেশণ করিয়া ব্যয়িত হইত এবং উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিত।”

কিন্তু প্রসঙ্গনাথ যে তাঁহার অর্থ কখনও অশুপযুক্ত বিবরণে অপব্যয়িত করেন নাই তাহার কারণ, কিশোরীচাঁদ তাঁহার দানের উপযুক্ত পথ তাঁহাকে প্রদর্শিত করিয়াছিলেন। প্রসঙ্গনাথের দান যে উপযুক্ত পথে আকৃষ্ট হইয়াছিল, তাহার কারণ কিশোরীচাঁদ সেই পথ আবিষ্কৃত করিয়া দিয়া ছিলেন। পক্ষান্তরে, প্রভুত ঐশ্ব্যশালী ও অসীম ক্ষমতাপন্ন বহু প্রসঙ্গনাথ তাঁহার সাধাবার্ষিক প্রদানের না হইলে কিশোরীচাঁদের যৎসং উদ্দেশ্য-সমূহ, তাঁহার অসাধারণ আত্মত্যাগ, অলস উৎসাহ ও অবিচলিত উদ্যম সত্ত্বেও ছয় ও আশাত্তরপ সাকল্যলাভ করিত না।

যাহা হউক, আমরা রাজশাহির উন্নতির ইতিহাসে কিশোরীচাঁদ বা প্রসঙ্গনাথের পারম্পরিক স্থান কোথায় তাহা নির্দেশ করিতে প্রয়াস পাইব না। এই পরিচ্ছেদেই আমরা সরলভাবে তাঁহাদিগের অনুষ্ঠিত কার্য্যাবলী লিপিবদ্ধ করিব মনস্থ করিয়াছি। এবং আশা করি, পাঠকগণ এই সংকল্প বিবরণ হইতে এই মহান কর্ম্মবীরগণের মহত্ত্ব ও বিশ্বপ্রেমের যথেষ্ট পরিচয় পাইবেন। এই বিবরণ প্রথমতঃ কিশোরীচাঁদ-রচিত “রাজশাহির রাজগণ” নামক প্রবন্ধ হইতে সংলিখিত হইয়াছে।

শ্রীঅঙ্গনাথ বোস ।

সংগ্রহ।

—:—

ভ্রমণ।

—:—

সেকালে সিকিম।

সিকিম ও তিব্বতবাসীরা তিরদিনই অল্প বেণের লোককে বেশবধো এবধন করিতে দিতে অনিচ্ছুক। তাই বহুকাল এই দুই দেশ রহস্যহৃদেদিকাজ্ঞর ছিল। কিন্তু ইংরাজ-পন তিরদিনই বিবেশের রসভভেবগ্রাণী। ইংরাজ নাবিকপন জলপথে ও ইংরাজ পর্বাটক-পন স্থলপথে নানা বেশ আবিষ্কার করিবার ও সেই সকল বেণের আবিবাসীদিগের আচার-ব্যবহায অবগত হইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ১৮৪০ খ্রষ্টাব্দেও দুই জন ইংরাজ সিকিমে এবধন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। শুৎপূর্বে আর কোন দুয়োণীয় সিকিমে গিয়াছিলেন কি না জানা যায় না। ১৮৪০ খ্রষ্টাব্দের পর্বাটকযয়ের মধ্যে একজন 'বেঙ্গল হারকরা' পত্রে তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত বিবৃত করিয়াছিলেন। তাঁহারো দুখীয় পথে হিবালয় অতিক্রম করিয়া লাসার বাইবার কলন্যও করিয়াছিলেন।

ঔহায়া যে দুর্বল পথে গমন করিয়াছিলেন, তাহার তুলনার ঔহাদের সঙ্গে জ্ঞাব্যি অতি স্নাত্যই ছিল। ঔহায়া তিন জন ভৃত্য ও যাত্রণ জন লেগটা স্থলী লইয়াছিলেন। সঙ্গে ছিল একটী ছোট পাইল (তাছু) ও ত্রিশ সের আটা, চারি বৎ বাসে, আটে সের চাউল এক টিন ময়ত্র, দুয় বোতল মদ্য, তিনটি বন্ধুক, আটটি স্ক্রু, কিছু তামাক এবং পথে লোকে বিবায় লস্ত কিছু লাল নীল কাল পাণা পুঁথি, কিছু ব্যগ্রণ ও অন্যান্য জ্বা। ঔহায়া অতি অল্পপরিমাণে খাদ্যজ্ঞাব্যি লইয়াছিলেন সত্য; কিন্তু ঔহানিগের বিবাস ছিল, পথে আবস্তক জ্বা কিনিতে পাওতা নাহবে। সেই জস্ত ঔহায়া পাঁচ পত টাকা ও কয় পত সিকি সঙ্গে লইয়াছিলেন। কিন্তু সিকিমের রাজার বিশেষীয় বিধেবধনতঃ ঔহাদের সঙ্গে পর্বাটন দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। ঔহায়া দুইবার সিকিম অতিক্রমের চেষ্টা করেন এবং রাজার কর্মচারী সূবা ও কালীনিগের চেষ্টায় দুই বারই বিকল মনোরণ হইলেন।

এই ভ্রমণকারীদ্বয় আপনাদিগের নাম একাণ করেন নাই। ঔহায়া ১৮৪০ খ্রষ্টাব্দের ১৫ই মার্চ তারিখে মার্জিলিং হইতে যাত্রা করিয়া টুকতায়ের পথে শাবিরা মলীৎ ও দ্যমান মলী-যরের সন্মমস্থলে উপনীত হইলেন। তাহার পর চাং-এ উঠিয়া ঔহায়া উত্তর-পশ্চিম যুখে যাত্রা করেন ও ২-শে মার্চ তারিখে চাকুং ও ডেটাবের মধ্যবর্তী দিকজিগং পাহাড়ের উপর উপনীত হইলেন। এই স্থানে একজন সূবা ঔহাদিগকে বলিয়া পাঠান যে, তিনি ঔহাদিগকে আর অগ্রসর হইতে দিতে পারেন না। কারণ, তিনি সেন্ত্রণ কোন আদেশ পারেন নাই। সূবা ঔহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, ঔহায়া কেন এই অললাকীর্ণ পার্বত্য এদেশে আসিয়া-ছেন? এ স্থানে কেবল অলৌকা আছে। তাহাতে পর্বাটকযর উত্তর বেধ, ঔহায়া কাকম-

অজ্ঞান পানমূলে বধ্য বেন শীকার করিতে আশিষ্টাছেন। এই বলিয়া পর্বাটকবর অগ্রসর হইলেন। পরদিন প্রাতে ভুটিয়ারা পুনরায় আদিয়া তাঁহাদিগের সন্দের লোকদিগকে বলিল, তাহারা যদি পর্বাটকদিগের ত্রুণাদি বহন করিতা যার তবে তাহাদিগকে অক্ষীযন ভিকতে দাসত্ব করিতে হইবে। এক জন লেপচা তথাপি অগ্রসর হইলে ভুটিয়ারা তাহাকে ধরিয়া আনিла। এইরূপ অবস্থায় পর্বাটকবর অগত্যা দিনত্রিত্যে (ফিরিয়া আইসেন)। ভুটিয়ারা একতশকে পর্বাটকবরের পননে বাগা দিলেই ত্রুণে বিনয় অগণে ক্রটি করে নাই। কিন্তু পর্বাটকবর তাহাদের একতশ উল্কেত হুতিতে পারিত্যাহিলেন এবং অগত্যা বিবর জনয়ে হতান হইয়া চাকু এ পৌছেন ও তথা হইতে দাখিলিংএ ফিরিয়া আইসেন।

এইরূপে বাগা প্রান্ত হইয়াও পর্বাটকবর আগমনের সতর ভাণ করিলেন না, বরং ইহাতে তাহাদের দিকনিগমনস্বাধা বেন বন্ধিই হইল। দাখিলিংএ তিন দিন মাত্র অবস্থানের পর তাঁহারা অবার দিকনিগতিমুখে যাত্রা করিলেন। এবার তাঁহারা দাখিলিংএর সুপারিটে-ওট ভাঙ্গার ক্যানবেলের নিকট হইতে ছাড়পত্র লাইলেন। সে দেশের লোক দুই বার তাঁহাদিগের সতিবোধ করিবার চেষ্টা করিলেও তাহারা বলপূর্বক অগ্রসর হইয়া গিনত্রিহ, পৌছিলেন। তথায় সুবা প্রথমে তাঁহাদিগকে অগ্রসর হইবার আবেশ দিলেন না। ছয় দিন বয় চেষ্টার পর তাঁহার আবেশ পাওয়া গেল। সেই আসেপ-প্রতির পর তাঁহারা অবার অগ্রসর হইতে লাগিলেন ও ক্রমে সুলাইত উপত্যকার উপনীত হইলেন।

বহন তাঁহারা নদীতীরে শিবিরপ্রবেশ করিয়া অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময় বাহার কাছীর নিকট হইতে কয়জন ভুটিয়া আসিয়া সাফাৎসার্থী হইল। ভুটিয়াদিগের মধ্যে কাহারও গকে কোন অপরিত বাস্তির নূরে প্রবেশ করা শিষ্টাচারবিরুদ্ধ, তাই পর্বাটকবর একটি তুণতিত বুককাণ্ডের পাথে দাঁড়াইলেন। তখন দুই দলে কথাবার্তা আরম্ভ হইল। ভুটিয়ারা ছইখানি পর বাহির করিল। পত্র দুইখানিই ভুটিয়া অক্ষরে নিষিদ্ধ, ছইখানিতেই তাহার মোহরের ছাপ ছিল। ভুটিয়ারা বলিল, পত্রবয়ের একখানি পুরাতন ইয়াহার, তাহাতে লক্ষিগতি পার্শ্বভাষ্যনেপ শীকার-নিবেদের আবেশ লিপিবদ্ধ আছে; অপরখানি পুর্নিন তাহাদের হস্তগত হইয়াছে, তাহাতে পর্বাটকদিগকে অতিরিক্তিয়া দিবার আবেশ আছে। পর্বাটকবর ঐ পত্রবয়ের সকল চাহিলে ভুটিয়ারা কাছীর গুরু বাতীত মঙ্গল দিতে অস্বীকৃত হইল। উভয় দলে কথাবার্তা চলিতে লাগিল, কোনরূপ বীমাংসা হইল না। সেবে বধ্য ও ত্যাক দিয়া তাহাদিগকে ছুই করা হইল। পর্বাটকবর তাহাদিগকে বধ্য ও ছুই দিলে তাহারা সন্তুষ্ট হইল, ও বলিল, পরদিন তাহাদিগকে সর্ববিধ বাসজয়া, ভারবাধী অস্ত্র ও অন্যান্য আবস্তক ত্রয়া আনিয়া দিবে। তাহারা প্রত্যহই এইরূপ আশাস দিত বটে, কিন্তু দুই দিন কটিয়া গেল, তথাপি তাহারা কোনরূপ বাসজয়াদি আনিয়া দিল না। এ দিকে বাসজয়া সুহাইয়া আসিল। অগত্যা ইংরাজের সুরপেই হুটক অগ্রসর হইতে কৃতগত হইলেন। তখন তাহারা ভুটিয়াদিগকে বলিলেন, তাহারা যদি তাহাদের দলের কাহারও অস্ত্র স্পর্শ করেন তবে তাহারা বিপন্ন হইবে। এই বলিয়া তাহারা অগ্রসর হইবার উদ্যোগ করিলেন।

কিন্তু তাঁহারই পোষাক কেহই অগ্রসর হইতে সম্মত হইল না। কারণ যে সর্দারের
খাইতে ভুট্টারাদি তাহার উপরই অধিক ক্ষুদ্র হইবে। এই ভয়ে কেহই অগ্রসর হইল না
কেনিহা তাঁহার তাহারদিকে ত্রৈলোক্য দিলেন। তখন সকলেই অগ্রসর হইতে লাগিল, আর
ভুট্টারাদি এই যিনেই “কিরিকীঘরের” হুঃশব্দে বিবরে স্তম্ভিত হইয়া রহিল। কিন্তু
তাঁহারাই হইল বাইল অগ্রসর হইতে না হইতে আরও অনেকগুলি ভুট্টা আসিয়া উপস্থিত
হইল। তাঁহারদের পতিরোধ করাই তাহারের উদ্দেশ্য। তাহার অত্যন্ত ভয়ভীতহকরে
তাঁহারদিকে ঘনীতে ফেলিয়া বিহার প্রস্তাব করিল। আর সঙ্গে সঙ্গে বলিল, পাছে
তাঁহার সন্তরণে নিভার পারেন, সেই জন্য তাঁহারদের হস্তপদ বঁধিয়া তবে তাঁহারদিকে
জলে ফেলিবে। কিন্তু ইংরাজের ভীতির চিহ্নযাত্র না দেখিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে,
তাঁহারের সঙ্গে বাসাসের আরও; তাঁহার বাসা না পাইলে নিগূত হইবেন না।
ভুট্টারাদি সুস্থি, বাসাসের না পাওয়া পর্যন্ত তাঁহার অগ্রসর হইবেন, নিগূত হইবেন না।
তখন ইংরাজের সেই স্থানে তাহা বাড়িলেন এবং ভুট্টারাদি পাত হইয়া আসক্ত ধান্যাদি
বিল ও ছই জন পথপ্রবর্তক আসিল; তাহার তাঁহারদিকে তাঁহারদের পথের স্থানে লইয়া
হাইবে। সেবে এই বন্দোবস্তই উভয় পক্ষ সম্মত হইলেন। তাঁহার সিংহাসিন্য হাইতে
চেই। কয়েক কিন্তু তাঁহার বা তাঁহারের সঙ্গীত সে পথ ভিত্তিহীন না। পথপ্রবর্তকদের তাঁহা-
দিকে হুর্ন পার্শ্বতা পথে পতীর অন্ধকার বাতের মধ্য দিয়া মূঢ় দেহের উপর দিয়া লইয়া
চলিল। তাঁহার হুর্নিত পাইলেন, তাহার ইচ্ছা করিয়া তাঁহারদিকে অস্ত্র পথে লইয়া
হাইতেছে। অবার পথে সকলের প্রতি আদেশ ছিল, কেহ যেন তাঁহারদিকে কোনরূপ
ধামাধম্য না দেয়। এইরূপে তিন সত্ত্বাহ কাটিয়া গেল, তাঁহার একই উপত্যকায় হুর্নিত
লাগিলেন। তখন পথপ্রবর্তকদিকে বিদায় দিয়া প্রত্যাবর্তন ব্যতীত পতাস্তর রহিল না।
পর্ষটকরয়ের একজন উপত্যকার উত্তানে স্তবধা হইয়াছিলেন। তিনি দাঙ্গিলিএ
ফিরিলেন। আর এক জন বাথান কালীর কাছে আসিলেন। তিনি আর বন বিন দিকিএ
ছিলেন। কারণ, তিনি যে স্থানেই পাইতেন সেই স্থানেই আনাত্তে বিহার হইতেন।
তাঁহাকে সর্দারই হোণাঘাতে মারিয়া হইত এবং বন্দুক গুলিবার আদেশ দেওয়া হইত না।
তথাপি তিনি মারার নিবিত আদেশ ব্যতীত কিরিয়া হাইতে অধীকৃত হইলেন। সেবে
২০ নে এপ্রিল মারার পত্র আসিল এবং ছই বিন পরে তিনি ভুট্টারাদি কর্তৃক লাঞ্চিত হইয়া
দাঙ্গিলিএ ফিরিলেন।

তাঁহার বিবরণে জানা যায়, ভুট্টারাদি সভ্যতার সংস্পর্শে আসেন নাই। তাঁহারের
ত্ববিকার্য্য অত্যন্ত “সেকেন্সে” হরণের। তাঁহার এখনে কোনরূপে তৃপ্ত অঁতড়াইয়া লয়।
তাঁহার পর এক জন ছই হাতে ছইটি মল্লাস গঠি লইয়া সেই স্থানেই প্রস্থ করে—এক জন।
ত্রীলোক প্রত্যেক বর্গে করটি করিয়া বীজ স্থাপিত করে। তাঁহার পর গুলি ছইলে বর্গের উপর
সঙ্গী পড়ে ও পত্ন জন্মে। তবে ভূমির উর্বরতা বনতঃ ইহাতেই প্রচুর দল উৎপন্ন হয়।
কোন পরিবারেই অভাবের বা অসন্তোষের ভীক নাই। এতি গৃহস্থ রাজাকে সার্বিক এক
টাকা বা এক টাকা দুগের ভিনিষ দেয়। কয় আশায় কলিয়ার পত্ন পর্যন্ত নাই—দুগের

কেহ রাজধানীতে বাইরা কর দিয়া আইসে । ইহা অবশ্য তাহাদের সরলতার ও সাদুতারই পরিচায়ক । এ বেশে লোক বৎসরের অর্ধেক কাল কোনরূপ শ্রম করে না । অবশ্যই কার্য। আর শ্রীলোকদিগকেই করিতে হয় ; সে-ও অতি সাহস্য ।

তবে এ বেশে দাসপ্রচার এতলম আছে । সেই অল্প লোকচরীত হইয়া থাকে । বাড়িখিলে হইতে চাউল লইয়া যাওয়া অন্ততঃ, কারণ, গণে বাহকগণ হুত হইয়া বিক্রীত হইবে । দাসব্যবসারীদিগের ব্যবহারও চমৎকার । দুই জন লোকে দাস খরিজে বাহির হয় ; অবিক লোক বাইলে লোক সংগ্রহ করে । তাহারা গণের পার্শ্বে দুরিতে থাকে ও পশ্চিম ঘেবিলে দুই জনে তাহাকে ধরিয়া—বাঁধিয়া কুড়ীতে পুরিয়া বহন করিয়া বিক্রয়ের স্থানে আনিয়া বিক্রয় করে । হুত ব্যক্তি যদি চীৎকার করে, তবে তাহার মূখে আঘাত করা হয় । আবার হুবিয়া পাইলে দাসব্যবসারীরা গৃহস্থের গৃহে প্রবেশ করিয়া বালকবালিকা অপহরণ করিয়া তাহাদিগকে বিক্রয়ও করিয়া থাকে ।

এই দেশের লোকদিগের বর্জনস্বভে পর্যটকগণ বিশেষ কিছু অবগত হইতে পারেন নাই । তবে তাহারা কৃত্রিম সমর এক কর্ণকারের দোকানে আশ্রয় লইয়া ভূত-তামাস দেখিয়াছিলেন । একজন লোক পীড়িত হইয়াছিল । তাহাকে ভূতে পাইয়াছে স্থির করিয়া, একজন লামা সেই ভূত ছাড়াইতেছিলেন । লামা একটি মৃৎমূর্তি প্রস্তুত করিয়া মন্ত্রপাঠ করিতেছিলেন । সঙ্গে সঙ্গে বস্তা বায়ান চলিতেছিল । বহন দ্বারা অত পেল—অন্ধকার হইয়া আসিল, তখন স্থির হইল ভূত রোঙ্গির বেধ হইতে বাহির হইয়া কুন্মূর্তিনেও প্রবেশ করিয়াছে । মূর্তিটি বনের দিকে লইয়া যাওয়া হইল । তাহার পর সেটি কেলিমা একটা পুরাতন বন্ধু দিয়া গুলী করা হইল এবং প্রভেদের ও হৃদয়ের আঘাতে ছূর্ণ করা হইল । এইরূপে ভূত ত্যাগ হইয়া পেল ।

নায়কের প্রতি নায়িকা ।

বঁধু ! তোমা না রাখিব দূরে ।

কাঙালিনী ঘন, ভূমি যে এমন,

ভূলে কেন যদি ঘুরে' ?

ভকতি-প্রেম-আসন পাতিয়া

বশা'ব তোমারি মুরতি গড়িয়া

এ মদন-মধুপুরে ;

বঁধু ! তোমা না রাখিব দূরে ।

ঐধু! তুমি যে হিয়ার হিয়া ;
 হিয়া কি লাগিয়া রহিবে ঝাচিয়া
 ও হিয়া বিদায় দিয়া ?
 ঝাচে কি আশের তাজিয়া আবার ?
 ব্যগ্রিগুণত মীন নেকি কহু আর
 ঝাচে বারি ভেয়াগিয়া ?
 ঐধু! তুমি যে হিয়ার হিয়া !
 ঐধু! সাধনা শুন হে মোর,
 রবে আঁধি, তব আঁধি-আলো মানি'
 আলোকে পুলকে তোরা ?
 হয় 'আমিময়' তোমারে হেরিব,
 নয় 'তুমিময়ী' মূর্ত্তি আঁকিব,
 মধিব মমতা বোঝ ;—
 ঐধু! সাধনা শুন হে মোর ।
 ঐধু! কেন এ জীবন দিলে ?
 স্বপনে স্বপনে হরবে রোদনে
 বহি' চলে ভিলে ভিলে ।
 স্রব-স্রব-তুমি ভবের বেলার,
 বিবাহ-স্বপ্নানে, প্রেমোদ-মেলায়—
 তোমায়ে যদি না মিলে, —
 ঐধু! কেন এ জীবন দিলে ?
 ঐধু! বাধী যদি হয় মন,
 ও পদ-পরশ রতন পরশ
 লভিব কি কদাচন ?
 উষাতে আসিতে প্রিয়-মহশন ?
 বলবে লুকা'বে, কঁাদাবে নয়ন ;
 নাশ মন, নাশায়ন !—
 বাধী যদি হয় মন ।

ঐদত্তীশচন্দ্র চক্রবর্তী ।

শৈলেশচন্দ্র মজুমদার ।

বাঙ্গালা সাহিত্য-সমাজে শৈলেশচন্দ্রের সংখ্যা অধিক নহে । তাহার মূলধন অল্প সে সামান্য মোকদমানেই কাতর হয় ; তাই আমরা আমাদের কোন এক জন শ্রুতগুরুকে সিরোভাবেই বাধিত হই । বিশেষ বাক্যলার সাহিত্যিক সম্ভার সন্নিবিষ্ট—সাহিত্যিকদিগের মধ্যে বহুতর প্রয়োগ অত্যন্ত অধিক । শৈলেশচন্দ্রের মৃত্যুতে আমরা একজন বহু হারাইয়াছি । তাঁহার মৃত্যুশোক আমাদের পক্ষে বহুশোক । তাঁহার মত বহু ও মনোহর দেখা যায় না—তাঁহার বহুতর আন্তরিকতা, প্রগাঢ়তা ও মনোবৃত্তা সংসারে হ্রাসিত ।

শৈলেশচন্দ্র সাংবাদিক ছিলেন । সাহিত্যেই তাঁহার বাস্তব উপযোগী ছিল । তাঁহার দ্ব্যেতা ঐশ্বর্য্য ও নিপুণ সাহিত্যশিল্পী ছিলেন ।

শৈলেশচন্দ্র ছোটের পদের পথিক হইয়াছিলেন ; স্বদেশনাগ তাঁহার আদর্শ ছিলেন । কিন্তু প্রকৃত প্রতিভা, স্বভাবতঃই স্বতন্ত্ররূপকে পরিহার করিয়া-
 থাকে । শৈলেশচন্দ্রের প্রতিভাও তাহাই করিয়াছিল । ‘বাক্য’-সম্পাদক হইয়া কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর শৈলেশচন্দ্রের ‘চিত্র-বিচিত্র’ পুস্তকের সমালোচনা করিতে হইয়া লিখিয়াছেন—“বাগ্জ্যোতের যেমন অনেক বিভাগ আছে, সাহিত্যেরও তেমন অনেক শাখা আছে । আমরা শৈলেশ বাবুর এই একগাণি পুস্তক পাঠ করিয়াই বুঝিয়াছি, তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের আখ্যান-রঙ্গ-বিভাগে আঁচরেই মহাধনের গদি পাঁহবেন । সাহিত্যে বাহা সাধারণতঃ সৌখিন লেখা বলিয়া কথিত হইয়া থাকে, শৈলেশচন্দ্র তাহাতে সিদ্ধহস্তবৎ—অল্প বয়সেই আচরণ । শৈলেশচন্দ্রের রচনা যেমন সুন্দর, তেমন বিস্তৃত । বাক্যলার শুদ্ধি ও সৌন্দর্য্যের এইরূপ সুখমিশ্রণ প্রকৃতই এতটুকু বিরল ।”

এই ‘চিত্র-বিচিত্রের’ অনেক নক্সাই নানা মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল । ১২৯২ বঙ্গাব্দের ‘সাপনা’র যখন ‘তাঁহার “পূজার ছুটি” নক্সা প্রকাশিত হয়, তখনই তাঁহার প্রতি অনেকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল । তখনও শৈলেশচন্দ্রের হাত ‘কাঁচা’ । কিন্তু সেই কাঁচা হাতেও নক্সাটির বৈশিষ্ট্য ও মনোবৃত্তা কুটিরায় উঠিয়াছিল । বাঙ্গালা সাহিত্যের এক বিভাগের বিকপাল ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই সব নক্সা-পাঠ করিয়াই শৈলেশচন্দ্রকে বলিয়া-
 ছিলেন—“অগম্য হাত বড় মিঠে ।” ঐতিহাসিক ‘সাপনা’র প্রকাশিত বহু প্রসিদ্ধ লেখকের নক্সার মধ্যে এক ঐশ্বর্য্যবৎসুমারী চৌধুরী নক্সা

ব্যতীত আর কাহারও নম্র। বৈশেষ্যচন্দ্রের নম্রতার মত মনোহর হইত না।

এই সব নম্রায় যে বাস্তবাহুগরন পরিমলিত হয় বৈশেষ্যচন্দ্রের অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ "ছোট গল্প"-টঙ্কুতে তাহার বিকাশ দেখা গিয়াছিল। কিন্তু তিনি তাহার আর কোন বড় রচনায় তাহার "সুগমচেতা" করেন নাই। কেন করেন নাই তাহা আমরা বলিতে পারি না। তবে তিনি যে বাস্তবাহুগরী রচনাতেও চূর্নান্তির পুতিগত বর্জন করিয়া তাহার স্বরণ পাঠকদিগের সম্মুখে, উপস্থাপিত করিতে পারিতেন তাহার পরিচয় 'ইন্ডু'তেই পাওয়া গিয়াছিল।

প্রথম বঙ্গবীর 'প্রাণপে' তাহার একখানি উপস্থাপিত ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। বোধ হয় দেখে 'কলিকাল' তাহার সর্বপ্রথম উপস্থাপিত। তিনি তাহা পুস্তকাকারে প্রচারিত করিয়া যানেন নাই। তবে আমরা অবগত আছি, আর একজন ঔপস্থাপিত তাহার কিয়দংশ আত্মসাৎ করার তিনি সুদূর কিছু দিন পূর্বে তাহা পুস্তকাকারে প্রচার করিবার উত্তোষ করিতেছিলেন। এইরূপ ব্যাপারেই টেনিসন তাহার The Lover's Tale পুনর্মুদ্রিত করিয়াছিলেন—কিথিয়াছিলেন "Seeing that what I had deemed scarce worthy to live is not allowed to die"—তিনি তাহা পুনর্মুদ্রিত করেন। আমরা আশা করি, বৈশেষ্যচন্দ্রের আরও কার্য অসম্পূর্ণ রহিবে না। কেবল 'কলিকাল' কেন, তাহার সকল রচনাই সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হইলে ভাল হয়। সে সব রচনাই সংগৃহীত হইবার উপযুক্ত।

ছোটগল্প-রচনায় বৈশেষ্যচন্দ্র সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাহার অনেকগুলি ছোটগল্প বাংলা সাহিত্যের অলঙ্কাররূপে পরিগণিত হইবে।

১৩০৮ বঙ্গাব্দে যখন শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীচন্দ্র মজুমদার 'বঙ্গদর্শনের' পুনঃপ্রচার করেন, তখন বৈশেষ্যচন্দ্রই সে কার্যে সর্বপ্রধান উত্তোষী ছিলেন। তিনিই 'বঙ্গদর্শনের' সকল ভার লইয়া দীর্ঘকাল 'বঙ্গদর্শন'-পরিপালনা করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ 'বঙ্গদর্শনের' সম্পাদন-ভার ত্যাগ করলে সে ভারও বৈশেষ্যচন্দ্র গ্রহণ করেন।

১৩০৮ বঙ্গাব্দের মাঘ মাস হইতে তিনি আর একখানি পত্র প্রচার করেন। 'সবাণোচনী'ও সাহিত্য সম্বন্ধে সমাদর লাভ করিয়াছিল; কিন্তু দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই।

তিনি সাহিত্যালোচনার জন্য "আলোচনা সমিতি"

সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন তাহাতে রবীন্দ্রনাথের বহু উৎকৃষ্ট এবং পণ্ডিত হইয়াছিল ।

ঐশচন্দ্র সঙ্কমদায়ের মত ঐশলেশচন্দ্রেরও ছোট ছোট জিনিষকে সুন্দর করিয়া দেখাইবার—অতি সাধারণ জিনিষের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্য দেখাইবার ক্ষমতা ছিল । এ বিষয়ে কেবল সঙ্কমদাত্র তাঁহাভেদ পূর্ব্বগামী । ছোট ছোট বিষয় নিপুণতা-সহকারে সাজাইয়া শুছাইয়া—সুন্দর করিয়া দেখাইতে ঐশলেশচন্দ্রের যে নিপুণতা ছিল তাহার পরিণতির অবকাশ যে ঘটিল না ইহা বাদ্যালীর দুর্ভাগ্য ।

ঐশলেশচন্দ্র ঐশচন্দ্রের বহু বিকল্প রচনা সংগ্রহিত করিয়া প্রকাশিত করিতেছিলেন । সে কার্য্যও তিনি সম্পূর্ণ করিয়া বাইতে পারেন । এসিদ্ধ ঔপন্যাসিক উইল্কি কলিন্সের কথার বিখ্যাত কবি হুইনস্বর্থ বলিয়াছিলেন—লোক নুপতিবৃন্দের অকৃতজ্ঞতার কথা বলিয়া থাকে ; কিন্তু পাঠক সন্দ্রদায়ের অকৃতজ্ঞতাও অসাধারণ । যে সব লেখক আমাদের চিস্তরঞ্জন করিয়া আমাদের অঙ্গকে অবসর বিনোদনে সাহায্য করেন আমরা—পাঠকগণ কত শীঘ্র তাঁহাদিগকে বিস্মৃত হই ! এ কথা আমাদের দেশের পাঠক সন্দ্রদায়ের প্রতি বিশেষভাবে প্রযোজ্য । আমরা ইহারই মধ্যে বহু স্বরণ যোগ্য সাহিত্যিককে বিস্মৃত হইয়াছি । সুখের বিষয় বঙ্গীর সাহিত্য পরিষদের মাঝিরে তাঁহাদের অনেকের স্মৃতিরক্ষার চেষ্টা হইয়াছে । আমরা আশা করি, বাদ্যালী পাঠক ঐশলেশচন্দ্রের স্মৃতি সাধরে রক্ষা করিবার উদ্যোগ করিবেন ।



अ.श.व.ह.



मधुसूदन मड ।

Sree Goumanga Press.

মাইকেল মধুসূদন দত্ত ।

—:~:~:~:—

ছন্ন'ত অমিরছন্দে দিলে হে অঙ্কলি,
তুমি এ ভারতবর্ষে ভারতী-মন্দিরে ।
তব শিক্ষা বীক্ষা, কবি, অদ্বুত সকলি !
একাশ নতন সৃষ্টি প্রতিভা-মিহিরে ।

প্রথমে নাটক রচি' প্রাঞ্জল ভাষায়
'মেঘনাদে' মেঘমস্ত্রে কাপে ক্ষিত্তিল ;
হাস্তরসে প্রহসন সৃজিলে হেলার,
গীতিকারো গোস্বামীর ধারা নিরমল ।

লিপিকাব্য-প্রবর্তক পুঙ্গবপ্রধান,
সুটালে তারকাদীপ্তি সনেটে তোমার ।
আছিলে মহান্ হিরা—বিপুল বিদ্বান্ ;
তব স্মৃতি চিরদিন পূজিবে সংসার ।

বিচিত্র রহস্য, দুঃখ সহিলে ভূতলে,
রাখিতে অক্ষয় কীর্তি এ মহীমণ্ডলে ।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম ।



মধুসূদন দত্ত ।

—•••—

বঙ্গালী সাহিত্যিকের পক্ষে—কেবল সাহিত্যিক কেন—সমগ্র বঙ্গালী জাতির পক্ষে আশাঢ় মাসের সর্বপ্রধান দ্বয়দীয় ঘটনা “বঙ্গ-কবিকুলেশ্বর” মধুসূদনের বার্ষিক স্মৃতিসভা । গত ১৫ই আশাঢ় কবির মৃত্যুদিনে কবির বহু ভক্ত তাঁহার সমাধিপার্শ্বে সমবেত হইয়াছিলেন । এই স্মৃতিসভার বঙ্গালীর ভবিষ্যৎ উন্নতি স্থচিত হয় ; প্রমাণিত হয়, বঙ্গালী জনের আদর করিতে শিখিয়াছে । মধুসূদনের মৃত্যু উপলক্ষ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল ।—

“আজ বঙ্গভূমির উন্নতি সম্বন্ধে আর আমরা সংশয় করি না—এই ভূমণ্ডলে বঙ্গালী জাতির গৌরব হইবে । কেন না বঙ্গদেশ রোদন করিতে শিখিয়াছে—অকপটে বঙ্গালী বঙ্গালী কবির দ্রষ্ট রোদন করিতেছে ।

যে দেশে একজন স্মৃতি জন্মে, সে দেশের সৌভাগ্য । যে দেশে স্মৃতি বশঃপ্রাপ্ত হয়, সে দেশের আরও সৌভাগ্য । বশঃ মৃতের পুরস্কার—জীবিতের যথাযোগ্য বশঃ কোথায় ? আর দেখা যায়, যিনি মৃতের পাত্র, তিনি জীবিতকালে বশবী নহেন ; যিনি মৃতের অপাত্র, তিনি জীবিতকালে বশবী । • • • যে দেশের শ্রেষ্ঠ কবি বশবী হইয়া জীবন সমাপন করেন, সে দেশ প্রকৃত উন্নতির পথে দাঁড়াইয়াছে । মাইকেল মধুসূদন দত্ত যে বশবী হইয়া মরিয়াছেন, ইহাতে বুঝা যায় যে, বঙ্গালা দেশ উন্নতির পথে দাঁড়াইয়াছে ।

“বঙ্গালা প্রাচীন দেশ । • কিন্তু এই প্রাচীন দেশে ছই সহস্র বৎসর মধ্যে কবি একাজরদেব গোস্বামী । • অজরদেব গোস্বামীর পর শ্রীমধুসূদন ।

“যদি কোন অধুনিক ঐশ্বর্য্য-গর্ভিত ইউরোপীয় আনাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদের আবার ভরসা কি ? বঙ্গালীর মধ্যে মনুষ্য জন্মিয়াছে কে ? আমরা বলিব, ধর্মোপদেশকের মধ্যে শ্রীচৈতন্যদেব, দার্শনিকের মধ্যে রঘুনাথ, কবির মধ্যে শ্রীজরদেব ও শ্রীমধুসূদন ।

“দ্বয়দীয় বঙ্গালীর অভাব নাই । কুসুমকান্ত, রঘুনন্দন, জগন্নাথ, গদাধর, জগদীশ, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, মুকুন্দরাম, তারতচন্দ্র, রামমোহন রায় প্রভৃতি অনেক নাম করিতে পারি । অবনতাবস্থারও বঙ্গমাতা রক্তপ্রসবিনী । এই সকল নামের সঙ্গে মধুসূদন নামও ~~সঙ্গত~~ ^{সঙ্গত} থক হইল । কেবলই কি বঙ্গদেশে ?

“আমাদের ভরসা আছে । আমরা স্বঃ নিঃশ্বঃ হইলেও রক্তপ্রসবিনী

অগ্নিবর্ষ



সন্তান। সকলে এই কথা মনে করিয়া জগতীভূলে আপনার যোগ্য আসন গ্রহণ করিতে বস্তু কর। আমরা কিসে অপটু? রণে? রণ কি উন্নতির উপায়? আর কি উন্নতির উপায় নাই? রক্তশ্রোতে জাতীয় তরঙ্গ না ভাসাইলে কি স্বর্ষের পায়ে ঘাওয়া ঘার না? চিরকালই কি বাহুবলই এক-মাত্র বল বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে? মহাবীর জ্ঞানোন্নতি কি বৃথা হইতেছে? দেশভেদে, কাল ভেদে কি উপায়ত্তর হইবে না।

“ভিন্ন ভিন্ন দেশে জাতীয় উন্নতির ভিন্ন ভিন্ন সোপান। বিদ্যালোচনার কারণেই প্রাচীন ভারত উন্নত হইয়াছিল। সেই পথে আবার চল, আবার উন্নত হইবে। কাল প্রসঙ্গ—ইউরোপ মহার—সুপবন বহিতেছে দেখিয়া জাতীয় পতাকা উড়াইয়া দাও—তাহাতে নাম লেখ—‘শ্রীমধুসূদন’।” •

মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

কাবাকুলে বাশরীই বাজিত সতত,
অশ্রুকারি' বাঙ্গালীর নারী-কণ্ঠ স্বগীত;
তুমি সেবা স্বাক্ষরিতা দিলে রক্ত বীণ,
দেখাইতে বীণাতন্ত্রী শক্তি ধরে কত।
গঙ্গীরে অধরে যেন মেঘনাদ শত,
গর্জিয়া উঠিল বীণ মধুরে কঠিন;
জানাইল, বঙ্গবাসী নহে কতু হীন,
প্রাণে তা'র আছে বজ্র শব্দ অনাহত।
তোমার সে মেঘরাগ তানে মূর্ছনার,
কণ্ঠে দিল ভাষা, বাহে স্বদেশ-জীবন,
সম্মিলিত গৌড়জন জদরে আঘাত,
ঘোষণা করিল তা'র নব জাগরণ।
তোমার যে রক্ত বীণা বাজে নি বৃথা,
হে বরেন্দ্র মহাকবি শ্রীমধুসূদন।

শ্রী নবকুমার ঘোষ।

• এই সংখ্যায় মধুসূদনের যে অপ্রকাশিতসূক্ত, প্রতিষ্ঠিত প্রকাশিত হইল, তাহা কবির প্যারিসে বাসকালে গৃহীত। মূল কটোমাত্র আমবা গ্রন্থক প্রমথনাথ ঘোষ মহাশয়ের নিকট হইতে পাইয়াছি।

৩

অশ্রু ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

একা ।

অশ্রু একা । সঙ্গী কেবল ভাবনা । মৈত্র-পরিবারের মহিলারা বড় কেহ তাহার নিকটে আইসেন না । মৈত্র মহাশয়ের সব রাগটাই তাহার উপর পড়িয়াছে । এই যে অশোক জানিবা গেল, তিনি বাড়ীর সবটাই দখল করিয়াছেন, আর গৃহসজ্জা প্রায় সবই বিক্রয় করিয়াছেন ; এই যে চার টাকার চাকর পরি সময়ে অসময়ে তাহাকে চাটাং চাটাং কথা শুনায ; এই যে বৃদ্ধা বয়সে অর উঠিবার আশঙ্কা—এ সবই শু অশ্রুর জন্ত ! সে আসিয়াই ত ঘত বিপদ ঘটাইয়াছে ! মৈত্র মহাশয়ের এই রাগটা মৈত্র-পরিবারের ব্যবহারে প্রতিকলিত হইত । মৈত্র-গৃহিণী “অজ্ঞাতে”র ঘরে ঢুকিলে কাপড় ছাড়িতে হইবে বলিয়া তাহার ঘরে ঢুকিতেন না বটে ; কিন্তু তাহার পরিচেষ্মকে তিনি যে সব প্রর করিতেন তাহার শাপিত ও স্থূলপট অশিষ্ট সন্দেহ তাহার হৃদয় বিদ্ধ করিত । পরি তাহার সব অণ্ডাঘ বখাকালে—না বলিতেই—দূর করিয়া যার বটে ; কিন্তু সে-ও যেন কলের মত, তাহার কাণেও আন্তরিক শ্রদ্ধার বা স্নেহের অভাব । সে অশোকের সঙ্গে ঘাইতে পার নাই ; তাহাতে অশোকের হর ত অল্পবিধা হইতেছে—আর তাহার নিশ্চয়ই কিছু উপরি পাওনা যারা গেল বলিয়া সে-ও একটু “মনমরা”—অশ্রুর উপর তাহারও বিশেষ প্রীতি নাই ।

এ অবস্থায় বাস করা কষ্টকর । অশ্রু যদি কটে অভ্যস্তা না হইত—আর সে যদি এই সময় আপনার ভবিষ্যৎ চিন্তায় তন্ময় না থাকিত, তবে সে এ অবস্থায় বাস করিতে পারিত না । ইহারই মধ্যে সে এক দিন ভাবিয়াছিল, সে কেন অশোকের কাছে বিয় হইয়া থাকিবে—কেন তাহার জন্ত অপেক্ষা করিতেছে ? সে ত চলিয়া যাইলেই পারে ! কিন্তু আপনার চিন্তায় সে আপনি হাসিয়াছে । এ অধীরতা ত তাহাকে শোভা পায় না । আর যে অশোক তাকে এত বহু করিয়াছে ও করিতেছে, তাহার অনাবিল স্নেহের স্বাদ তাহার তপ্ত জীবনে বিদ্ধ শাব্বির মুকায় করিয়াছে তাহার নিকট একবার বিদায় না লইয়া—তাহার দ্বারা জন্ত তাহাকে একবার আন্তরিক কৃতজ্ঞতাও না জানাইয়া সে কি যাইতে পারে ? তাই আজ সাত দিন সে কেবল ভাবনা লইয়াই আছে ।

অশোক যে দিন সদর কাছারীতে গিয়াছিল সেই দিনই অশ্রু একখানা টেলিগ্রাম ও একখানি পত্র পাঠাইয়াছিল। দুই দিনপরে টেলিগ্রামের জবাব আসিয়াছিল; আর পত্রের উত্তর আসিরাছে। আর সেই পত্র পড়িয়া তাহার চিত্তে যে বিরাট শূন্যতা অনুভূত হইয়াছিল তাহা তাহার হৃদয়বনাকে আরও ঘনীভূত করিয়া দিয়াছিল। আর মধ্যাহ্নে সে একা বসিয়া ভাবিতেছিল।

বহুক্ষণ ভাবিয়া সে যেন ভাবনা হইতে কণিক বিভ্রামের আশায় একটা মুক্ত বাগানতনে আসিয়া পড়িয়াছিল। গৃহ নিস্তরঙ্গ—গৃহবাসীরা মাধ্যাহ্নিক নিদ্রার নিমগ্ন। চারি দিকেই শান্তির—অবসাদের চিহ্ন। গৃহসংলগ্ন ভূমিতে প্রসন্নসলিলা সরসীর জলে রবিকর জ্বলিতেছে; জল স্থির—যেন একখানি কাচ পতিত রহিয়াছে। কয়টি হংস কূলে বিভ্রাম করিতেছিল; তাহাদের মধ্যে একটি জলে নামিয়া সেই স্থির জল একটু কেঁপ করিয়া আহাদের সন্ধান করিতে লাগিল। বাতাস পুরুষ্টিগ্ন কূলে সরল সুপারী তরুর সুপত্র শীর্ণ কাপাইতেছে—আর সুপারীর ফুলের নৌরত চারি দিকে ছড়াইয়া দিতেছে। একটু দূরে শিমূল গাছের রিক্তপল্লব শাখায় রাশি রাশি বড় বড় রাঙ্গা রাঙ্গা কোমল ফুল। একটা পাড়কাক পুরুষ্টিগ্ন জলে পক্ষ ভিড়াইয়া আসিয়া শিমুলের উচ্চ শাখায় বসিয়া চক্ৰচালনা করিয়া প্রসাধনে প্রবৃত্ত হইল, আর মধ্যে মধ্যে শিমূল ফুলে আঘাত করিতে লাগিল; সেই আঘাতে ফুল ঝরিয়া তরুকাণ্ডবেষ্টী মদনকীর উপর পড়িয়া তাহার রৌদ্রগ্লান যেত কুসুম বরাইয়া তরুফুলে পড়িতে লাগিল। সুপারী-কূলে কয়টি ঘুঘু ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। অদূরে নদী—নদীকূলে গাব গাছগুলি নবপত্রের রক্তাশ্রয় পরিয়া পড়িয়া পড়িয়া আছে। নদীর পরপারেও নানা বৃক্ষ; কতকগুলি শিমূল গাছে ফুল ফুটিয়াছে—কে যেন হরিতের মধ্যে জলদল্লাররাশি ঢালিয়া দিতেছে।

তখন নদীতে জোয়ার আসিতেছে; জলের চাকলা বর্ধিত হইতেছে; প্রবাহপ্রেরিত তরঙ্গগুলি অস্থির হইয়া উঠিতেছে। অশ্রু সরিয়া আর একটা জানালায় গেল—সে জানালা হইতে নদী আরও ভাল দেখা যায়। নদীর জল বাড়িতে লাগিল—ভাঁটার সময় সে সব নৌকা কর্দ্দমের উপর পড়িয়া ছিল—সেগুলি জলে ভাসিয়া উঠিল। ক্রমে জল নদীর কূল পর্য্যন্ত ভরিয়া উঠিল; জল সহরের পথঃপ্রণালীগুলিতে প্রবেশ করিল। অশ্রু দেখিতে লাগিল। কিন্তু সে সন্তমনর। ক্রমে নদীতে নৌকার সংখ্যা বাড়িতে লাগিল—সব খাল ভরিয়া উঠিয়াছে—সব নৌকা পাড়ি জমাইয়াছে। কত নৌকার কত পণ্য—বুৎপাত্র, লত, শাক, তরকারী, গুড়। মাহুকের কি এত অভাব! সে দিন হাট-বার—অশোকের

গৃহ হইতে হাট দূরে নহে। অনেক নৌকা নিকটেই ঘাটে ঘাটে—নদীকূলে তিড়িতে লাগিল; পথে পথিকের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। পথে লোক কত কথা কহিতে কহিতে—হাসিতে হাসিতে ঘাইতেছে। তাহাদের কি কোন ভাবনা নাই!

অশ্রু বসিয়া ভাবিতে লাগিল। তখন যে দিন শেষ হইয়া গেল—আবার তটকুমিকে নয় করিয়া রাখিয়া জোয়ারের জল নামিয়া গেল—নদীর পরপারের ক্রামশোভার উপর অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল—আকাশে দুই একটি করিয়া তারকা ফুটয়া উঠিতে লাগিল তাহা সে জানিতেও পারিল না। পরি দীপ লইয়া গৃহে আসিয়া যখন তাহাকে বাতাসনে দেখিয়া বলিল, “জানালাগুলা খোলা থাকিবে কি?” তখন সে চমকাইয়া উঠিল। তখন হাট ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; হাট করিয়া লোক গৃহে ফিরিতেছে—পথে কত লোকের কলরব। অশ্রু ফিরিয়া দাঁড়াইল; বলিল, “এখন খোলা থাকুক; আমি বন্ধ করিব।” পরির বোধ হইল, অশ্রুর দুই চক্ষুতে সে জল দেখিতে পাইল। “ছাত্রে কাপড় কাচিবার জল আমি রাখিয়া গিয়াছি। একটা লষ্ঠন আনিয়া দিতেছি।”—বলিয়া পরি নামিয়া গেল। অশ্রু দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া অকলে চক্ষু মুছিল—ভাবনার যে শেষ নাই!

সেই দিন রাত্রিকালে শব্দ আর শব্দ করিয়া অশ্রু ভাবিল—কেবল ভাবিয়া আর কি দিয়া ফল কি? বাহা ছিল—বাহা হইতে পারিত—সে সব ভাবিয়া ছুঃখ করা কেবল একটা উদ্দেশ্য—লক্ষ্য স্থির করিতে বিলম্ব করা, মনের সঙ্গে চাতুরী করা। তাহার আর সে চাতুরীর অবসর নাই। সে যে পত্র পাইয়াছে, তাহাতেই ত সে বুঝিয়াছে, সেই রাত্রির ঝড় তাহাকে কেবল অসহায় অবস্থার নদীকূলে ফেলিয়া দেয় নাই; পরন্তু সংসারেও অসহায়—একক অবস্থার ফেলিয়া দিয়াছে। এখন তাহাকে নিজের ভবিষ্যৎ কর্তব্য স্থির করিয়া কাৰ্য্য করিতে হইবে—আপনার সব ভার আপনি লইতে হইবে। তবে সে একেবারে নিঃশব্দ নহে। সে কলিকাতার বাইরা আপনার কার্য্যক্ষেত্র খুঁজিয়া লইবে।

তখনই তাহার মনে পড়িল, আর এক দিন সে এমনই অসহায় অবস্থায় একা এই বিশাল বিশ্বের অন্ধনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তখন পিতার মৃত্যুশব্দ আর শব্দ তালকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। তখন মৃত্যুই তাঁহার পক্ষে মুক্তি। ভুও তিনি মরিতে চাহেন নাই—মৃত্যুর সঙ্গে কেবলই সংগ্রাম করিয়াছিলেন। সে কেবল তাঁহার মাতৃহীন ছহিতার জন্ত। যখন তাঁহার বয়সকাতর মুখে মৃত্যুর বিধি প্রশান্তি ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছিল তখনও তিনি কেবল তাহারই দিকে

চাহিয়া অশ্রুপাত করিয়াছিলেন। যে পিতার স্নেহগণ্ডে সে কোন দিন মার অভাব অনুভব করিতে পারে নাই সেই পিতার কণা মনে করিয়া আজ অসহায় অশ্রু কীমতে লাগিল।

তাহার পর হইতে তাহার জীবনে যত ঘটনা ঘটয়াছে—সবই যে ঘৃণিতা ! তাহার পর হইতে তাহার জীবন যেন একটা দারুণ ভ্রম !

বহুকণ কাঁদিয়া সে একটু শান্ত হইল। তখন পিতার কথা তাহার মনে পড়িল। তিনি তাহাকে বলিয়াছিলেন, “মা, তোমাকে তোমারই হাতে দিয়া চলিলাম। তোমার ভাব তোমার। তোমার মা তোমার নাম রাখিয়াছিলাম— অশ্রু। অশ্রুর মত পবিত্র থাকিও।”

আজ আবার তাহার ভাব তাহার উপর। তাহাই পিতার অভিপ্রেত— তাহাই বৃষ্টি দেবতার অভিপ্রেত। অশ্রু যেন ছদয়ে বল পাইল; সে আবার নতুন উত্তমে জীবনে প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে পারিবে। পিতার আশীর্বাদ তাহাকে সকল বিপদ হইতে রক্ষা করিবে। সে উদ্দেশে পিতাকে প্রণাম করিল; চক্ষু মুছিল।

তাহার পর সে অশোকের কণা মনে করিল। সেই ব্রহ্ম-বিড়—সরল— নিঃসঙ্কোচ ব্যবহার—সেই অনাবিল পুত যত তাহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। সে সংসারের অনাদৃত্য হুহিতা, পিতা ব্যতীত আর কাহারও কাছে তেমন ব্যবহার— তেমন যত পার নাই। কিন্তু অশোক তাহার কেহই নহে—ঘটনার স্রোত তাহাকে অন্তর্কিত বিপদের মধ্যে তাহার নিকটে আনিয়া দিয়াছে; যখন সে একান্ত অসহায় তখন তাহার আশ্রয়ে আনিয়াছে। সে অপরিচিতা, কিন্তু তাহার অস্ত্র অশোকের কত ভাবনা—তাহাকে অশোকের কত যত্ন ! তাহার পত্রম্পর অপরিচিত; কিন্তু তবু যেন উভয়ে কত দিনের পরিচয় ! জন্মের পর কি জন্মান্তর আছে ? কৰ্ম্মহুত্র কি জন্মান্তরের ঘটনার আকৃষ্ট হয় ? কে বলিবে ? অশোকের কাছে তাহার কৃতজ্ঞতার স্বপ্ন সে কি বিদ্যা শোধ করিবে ?

অশ্রু উঠিয়া বলিল। কক্ষের এক প্রান্তে একটা বড় পুলিন্দা পড়িয়া ছিল। অশোক তাহার অস্ত্র যে সব জামা জুতা প্রভৃতি আনিতে দিয়াছিল, সে সব আনিয়াছে। কিন্তু এ দুই দিন সে পুলিন্দাটা খুলেও নাই; মনে কুরিয়াছিল, সেগুলো ব্যবহার করিবে না। কিন্তু আজ তাহার মনে হইল, তাহা হইলে অশোক ভ্রান্ত হইবে। সে লীপখিা উজ্জল করিয়া দিল, আপনায় হাত বাগ্ন খুলিয়া কাঁচি লইয়া পুলিন্দা খুলিল, তাহার পর সেই জামা পরিয়া

আসিয়া শয়ন করিল। তাহার মনে হইল, সে একটু শান্তি পাইল। তাহার পর আবার কত কথা ভাবিতে ভাবিতে শ্রান্ত হইয়া সে ঘুমাইয়া পড়িল।

যখন তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন একটু বেলা হইয়াছে, বাতায়নপথপ্রবিষ্ট দিবালোকের দীপ-নিখা স্নান হইয়া গিয়াছে। তখন অশোক ঢকল চিত্ত শান্ত হইয়াছে।

—:—

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

ভাবনা ।

অশোকের পাখী কাছারীর দিকে চলিল। পথের দুই পার্শ্বে ধাত্তক্ষেত্র। ধান কাটা হইয়া গিয়াছে ; মাঠ শূন্য। মাঠের কর্ত্তিতাবশিষ্ট ধাত্তমূল ও নবোদগত-কৃণগ্রাসরত গাভীকুল অস্থিচর্ম্মসার—তর্জল। দুই একটি গাভী পথের পার্শ্বে নালায় নামিয়া জলপান করিতেছে—অশোকের পাখীর বাহকদিগের চীৎকারে মুখ তুলিয়া দ্বিধ নেত্র বেলিয়া চাহিয়া দেখিতেছে। গোশাবকগুলি মাঠে ছুটাছুটি করিতেছে। মধো মধো গ্রাম ; নারিকেল ও স্থপারী গাছের স্তান শোভার মধ্যে অবস্থিত। মধো মধো আশ্রবৃক্ষ—মুকুলে পূর্ণ, অলিগুঞ্জে মুখরিত। পথের পার্শ্বে অশ্বখ শত দিকে শত মূল নামাইয়া ভূমিকে ধরিতে উদ্ভত। আর গাছে, মাঠে, পথে কত পানী। অশোকের মনে হইল, তাহার দুইচারিটা আলিপুরের চিড়িয়াখানার রাখিলে চিড়িয়াখানার শোভা বাড়িত। বাজারার পল্লীর এই প্রসঙ্গ মুষ্টি—এই ঘনজ্যোত্সব শোভা—এই জলকুলসারিধাসজ্জাত উর্জয়তা—এই বসন্তবৈতালিকগীতধ্বনিত সৌন্দর্য্যরাজ্য অশোকের নিকট এত দিন অপরিচিতই ছিল। আজ সে বৃষিল, যা কেমন “কুম্ভকুম্মিতক্রমদগলোভিনীম্” “স্বহাসিনীম্” “স্বমধুরভাবিনীম্”। সে মনে করিল, আমরা বেশকেই চিনি না। সে উঠিয়া বসিল, মুহুনেত্রে সেই সৌন্দর্য্যরাজ্যের সৌন্দর্য্যস্থধা পান করিতে লাগিল। আশ্রয়ের বায়ুর স্পর্শ স্থব্দ—পল্লীর শোভা দ্বিধ।

পাখী গন্তব্য স্থানে আসিল। অশোক পাখী হইতে নামিয়া আপনায় কাছারীর প্রাঙ্গণে পাড়াটল। বাহকদিগের চীৎকার শুনিয়া নায়েব, মুহুরী, সকলেই রোয়াকে আসিয়া পাড়াইয়াছিলেন। অশোক রোয়াকে উঠিয়া তাঁহাদিগকে নমস্কার করিল। কাছারীঘর তাহার আগমনপ্রতীকার চূণের প্রাঙ্গণে আপনায় মগ্নিতা আবৃত করিয়া সুসজ্জিত হইয়াই ছিল। অশোক উপবিষ্ট হইলে তাঁহার।

নম্র দিলেন। যে দুই চারিজন প্রজা উপস্থিত ছিল তাহারাও নম্র দিয়া মনিব দেখিল। বিপিনবিহারীর পৈতৃক গৃহের যে অংশ তাঁহার ভাগে পড়িয়াছিল অশোকের কাছারী সেই অংশেই অবস্থিত ছিল। সুতরাং তাহার জ্ঞাতিগণের আসিয়া উপস্থিত হইতে বিলম্ব হইল না। তাঁহার্য্য তাহার পরম আশ্বীর হইলেও অশোক তাঁহাদিগের অনেককেই চিনিত না; নায়েব মহাশয় পরিচয় করাইয়া দিলেন। বুদ্ধর্য্য বলিলেন, “দেখাশুনা নাই; মহিলে তুমি কি আমাদের পর।”

কিছুক্ষণ সকলের সহিত আলাপ করিয়া অশোক দ্বানের স্তম্ভ উঠিবে এমন সময় ভৃত্য আসিয়া বলিল, “নায়েব মহাশয়, তবে বাদুর খাওয়ার ব্যবস্থা কিরূপ হইবে?”

নায়েব অশোকের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “মেজ মাঠাকরূণ, আমাদিগকে কোন ব্যবস্থা করিতে দেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, তিনি আপনার খাওয়ার ব্যবস্থা করিবেন।”

অশোক বলিল, “কিন্তু আমি ত—”

নায়েব মহাশয় বলিলেন, “তিনি বলেন, তাহাতে কি? আপনি বাহাই হউন, তাঁহার ত পূত্রস্থানীয়।”

অশোক বলিল, “তবে তাহাই হউক।” সে একটু নিশ্চিত হইল। বাচাসের সঙ্গে দেখা করিতে হইবে যা তাঁহাদের একটি সুদীর্ঘ ফিরিতি দিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অন্ততঃ এক জনের সন্ধান মিলিল। অশোক নায়েব মহাশয়কে বলিল, “মেজ জ্যেষ্ঠাইমা’র সঙ্গে একবার দেখা করিতে যাইব।”

নায়েব বলিলেন, “তিনি এখন পূজার বসিয়াছেন।”

অশোক হান করিতে গেল।

মধ্যাহ্নের কিছু পূর্বেই ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, মেজ মাঠাকরূণ ভাত ব্যক্তিরা বসিয়া আছেন। তিনি বিপিনবিহারীর মধ্যমাগ্রজের বিধবা। একমাত্র সন্তান পুত্রের মৃত্যুর পর তিনি নানা তীর্থ ভ্রমিণী হুন্দাবনে ঘাইয়া বাস করেন। কিছু দিন তথায় বাস করিয়া তিনি সংবাদ পাবেন, সন্নিকটগিরের মধ্যে বিবানে “ভাগের মা গঙ্গা পায় না” বলিয়া গৃহ-বিগ্রহ গোপালের সেবা হইতেছে না। তাই তিনি হুন্দাবন হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। ফিরিয়া আসিয়া তিনি যেন গোপালকে লইয়াই পুত্রশোক কুলিয়াছেন। গোপালই তাহার পুত্রের স্থান অধিকৃত করিয়াছেন।

অশোককে মা বলিয়া দিয়াছিলেন, “দ্বিদিবের সঙ্গে—ঠাকুরঝিদের সঙ্গে দেখা

করিস্ ; কিন্তু যেন ছুট করিয়া ঘরে ঢুকিস্ না । তুই যে অবুখ ছেলে ! আর প্রণাম করিবার সময় কাহারও পায়ে হাত দিস্ না ; আমরা ছুইলে তাঁহাদের মান করিতে হয় ।” তাই অশোক মনে করিয়াছিল, নিশ্চয়ই বারান্দার এক পার্শ্বে তাহার জন্ম অন্নবাচন রক্ষিত হইয়াছে এবং জ্যোঠাইমা অনেকটা দূরে পাড়াইয়া তাহাকে কুশলপ্রদ করিবেন । সে ঘাটগা দেখিল, কক্ষমধ্যে বহুবিধ আহাৰ্য্য সজ্জিত করিয়া জ্যোঠাইমা বসিয়া আছেন । অশোককে দেখিয়া তিনি বলিলেন, “আটস, বাবা ।”

অশোক একটু বিপদে পড়িল । সে কি করে ? শেষে সে জিজ্ঞাসা করিল, “ঘরে ঘাটব ?”

প্রশ্নমুখে জ্যোঠাইমা বলিলেন, “আসিবে বই কি, বাবা ? ছেলে কি কখন মা’র পর হয় ?”

অশোক বারান্দার ছুতা খুলিয়া ঘরে ঢুকিল ও জ্যোঠাইমা’কে প্রণাম করিয়া আহাৰ্য্য করিতে বসিল । জ্যোঠাইমা তাহাকে ব্যঞ্জন করিতে করিতে বলিলেন, “বাবা, ছোট ঠাকুরপো যখন পৈত্রিক ধর্ম ত্যাগ করেন, তখন সমাজে সকলে স্বধর্মের সব আচার মানিরা চলিত । এখন ত কেহই কিছু মানে না ! তবে তোমরাই কি মোঘে মোঘী ?”

ক্রমে আর একজন মহিলা তথায় আসিলেন । মেজ জ্যোঠাইমা বলিলেন, “ন’বৌ দেখ, মুখখানি ঠিক রম্যর মুখের মত । রম্যর পোকেই ছোট ঠাকুরপো বেশ ছাড়েন—ধর্ম ছাড়েন ।”

তিনি বহুব্যব বলিলেন, অশোক “লজ্জা করিয়া” খাইতেছে । কিন্তু তিনি যে পরিমাণ আহাৰ্য্য সজ্জিত করিয়াছিলেন—তাহার এক চতুর্থাংশ আঙ্গাশং করাও অশোকের সাধ্যাতীত ।

জ্যোঠাইমা জিজ্ঞাসা করিলেন, “ছোট বৌ কেমন আছে ?”

অশোক বলিল, “ভাল আছেন ।”

“কত দিন দেখা নাই ! কতবার মনে করি, একবার মা গঙ্গার জল মা’র দিয়া আসিব, আর ছোট বৌ’র সঙ্গে দেখা করিয়া আসিব । তাহা আর হইয়া উঠে না ; বাড়ী ছাড়িয়া ঘাইতে পারি না । মা গঙ্গা যে দিন শেষ ডাক দিবেন, সেই দিন নহিলে যে আর যাওয়া ঘটে, এমন ত বোধ হয় না ।”

অশোক বলিল, “একবার চলুন না ?”

“বাইব। আর ছোট বৌ’র সঙ্গে ঝগড়া ও আছে। আজ ও ঘরে বৌ আনিগ না—আমাদের আর কয় দিন আছে?”

অশোক মুখ নত করিল; লক্ষ্য তার মুখ লক্ষ্যতুলা কিশোরীর মুখের মত রাসা হইয়া উঠিল।

মেজ জোঠাইমা’র দৃষ্টান্ত অশোকের আত্মীয়গণের মধ্যে এত অনুরক্ত হইতে লাগিল যে, নিম্নবর্ণের বাহ্যণে অশোকের দুই বেলা এক ঘরে আহার কর্তব্য হইয়া উঠিল। ঠাহাদের বোঁটে বিপিনবিহারী বাড়ী আসা বন্ধ করিয়াছিলেন, ঠাহাদের ঘরেও অশোকের পাত পড়িতে লাগিল। কিন্তু মিঠাবতী মেজ জোঠাইমা’র আদরে যে আত্মরিক রেহ সঙ্গ্রকান ছিল অশোক অল্প সকলের আদরে তাহার অভাবই অনুভব করিতে লাগিল। সে সব আদর আত্ম-রিকতাহীন। এই আদরের অতিশয়ো অশোক বিরত হইয়া উঠিল।

এ দিকে সে বত সন্ধ্যা সম্ভব কাণ শেষ করিতে বাস্ত হইল; অল্প একা রহিয়াছে, তাহার হৃৎ কত অনুরোধ হইতেছে—তাহার চিন্তিতার ত অন্ত নাই। যখন তখন অশ্রু কণা তাহার মনে পড়িত। সে যে নিশ্চয়ই বিবন বিপদে পড়িয়াছে—হয় ত সংসারে সব হারাইয়াছে অশোকের তাহাতে আর সন্দেহ ছিল না। কিন্তু এই বিপদেও সে পৈঙ্গ্য চারায় নাই; পরন্তু টীমারে জ্ঞানোন্মেষ হইতেই যে ধীরতার পরিচয় দিয়াছে—যেদূর ভাবে সব কাণ করিয়াছে তাহাতে অশোক বিম্বিত হইয়াছে। সে বিষয়ের সঙ্গে মিশ্রিত প্রশংসার পরিমাণও অল্প নহে। আবার তাহার পুরুষোচিত নিঃসঙ্কোচ ভাবে ও সরল দৃঢ়তায় সে প্রশংসা বর্দ্ধিত হইয়াছিল। এই রহস্যময়ী নারী-প্রকৃতি অশোকের চক্ষুবে নারীজাতিসম্বন্ধে একটা নূতন ভাব জাগাইয়া তুলিয়াছিল। সে ভাবের বিশ্লেষণ করিয়া অশোক দেখিল, সে এত দিন যে সকল কিশোরীকে ও যুবতীকে দেখিয়াছে তাহারা হয় ত অতিরিক্ত সঙ্কোচে তাহার প্রশংসা আকৃষ্ট করিতে পারে নাই—নহে ত অতিরিক্ত লজ্জাহীন নিঃসঙ্কোচহেতু তাহার বিরক্তি উৎপাদিত করিয়াছে। অল্প তাহাদের কাহারও মত নহে। তাহার মনে হইল, সে ভূমির নিকটে পত্রাজ্জাদনতলে লুকাহিত কুম্ব বা উচ্চ নয়নাখার অত্যাচ্ছল শিমূল কোন ফলাই অলবাসে না; কিন্তু ভূমি হইতে কিছু উচ্চে ‘পরজ্ঞান নাখার প্রফুটিত—আপনার সৌরভের ও গৌরবের মর্যাদাসম্বন্ধে অত্রান্ত ধারণাশালী গোলাপ তাহার ভাল লাগে। তাই এই অপরিচিতা তাহার প্রশংসা আকৃষ্ট করিয়াছিল।

নায়েবের তলব তাগাদার প্রজারা আসিতে বিলম্ব করিতে লাগিল—গ্রামে গ্রামে মওলদিগের বাওদার জটলা চলিতে লাগিল। জমীদার তাহাদের প্রতিগত ছিলেন ; তিনি আসিরাছেন, তাঁহার সহিত দেখা করিতে বাওরা কর্তব্য কি না ? তিন চারি দিন সিলিমের পর সিলিম তামাকু পুড়িতে লাগিল ; কিন্তু কোন মতলবই হ্রি হইল না। শেষে করতল অসমসাহসী প্রজা বলিল, “মাসুখ বটে ত—বাব তলুক নহে ! কাঁচা গিলিবে না। আর এ মগের মুলুকও নহে যে হাতে মাথা কাটিবে !” তাহার অশোকের সঙ্গে দেখা করিতে গেল। তাহাদের কপট বিলাপে প্রভাবিত হইয়া অশোক তাহাদিগকে হুদ খরচার দ্বারে অব্যাহতি দিল। এ সংবাদ প্রচারিত হইতে বিলম্ব হইল না। তখন সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত পালে পালে প্রজা আসিয়া আপনাদের দারিদ্র্যাহংস ও খাজনা প্রদানে অক্ষমতা জানাইতে লাগিল। আর অশোক তাহাদিগের উপর একান্ত অকারণ অসুগ্রহ দেখাইয়া আদেশ দিতে লাগিল। নায়েব চিন্তিত হইলেন ; শেষে সহকারীদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া তিনি অশোককে বলিলেন, “আপনি এ দেশের প্রজাদিগকে চিনেন না। ইহার কৌচার এক দফা ও কাছার এক দফা টাকা লুকাইয়া আনিয়াও বলে, টাকা দিবার ক্ষমতা নাই—পেটে খাইতে পার না। জোর তাগাদা নহিলে এ দেশে টাকা আদায় হয় না।” অশোক বলিল, “তাই না কি ? ইহারা কি মিথ্যাবাদী ?” নায়েব বলিলেন, “মিথ্যার ইহাদের আপত্তি নাই—ঐতি আছে। আপনি এমন ভাবে দয়া দেখাইলে, এবার লাট-খাজনা সংগ্রহ হওরাই দায় হইবে।” অশোক বলিল, “তবে আমি চলিয়া যাই। আপনারা আদায় করুন। কিন্তু প্রজার উপর যেন অত্যাচার না হয়।” নায়েব তাহার যাইবার ব্যবস্থা করিলেন ; অশোক নিষ্কৃতি পাইল। নায়েবও যেন হুর্ভাবনা হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন।

অষ্টম দিন জমীদার অশোকসিংহ জমীদারীপরিদর্শন শেষ করিয়া—নবপরিচিত আদীয়ারদিগের নিকট বিদায় লইয়া—যেজ জোঠাইয়া’কে সফর গভাঝানের জন্ত কলিকাতার বাইতে বলিয়া, তাঁহার আশীর্ব্বাদ লইয়া আবার পাকীতে উঠিল। পাকীতে উঠিয়া সে আপনার কর্ণপটুতার আপনি হাসিয়া ফেলিল।

সখা।

মুখের কৃষ্ণ, হৃদয়ের কৃষ্ণ, বুকের কৃষ্ণ সে ;
 মীনের কৃষ্ণ, হীনের কৃষ্ণ, মূড়ের কৃষ্ণ রে !
 জ্ঞানগুণহীন আমি রে বাউল
 ত'র লাগি নাহি রচিব দেউল ;
 পূজা-আয়োজন সাধ্য-সাধন করিব না কিছু যে ।
 আমার বন্ধ, আমার মিত্র, প্রাণসহচর সে ।

তপ-আচরণ করিব না আমি তা'র কৃপা-অভিলাষে,
 একেবারে ছুটে বকে জড়াব জনরের বাহুপাশে ;
 গলে দিব তা'র বনকুলহার,
 গুজার রাশি দিব হাতে তা'র
 শিখিচূড়া তায় দিব পরাইয়া থসিয়া পড়িলে রে !
 আমার কৃষ্ণ, প্রাণের কৃষ্ণ, লীলাসহচর সে ।

উদ্দেশে তা'র ফুলচন্দন রচিব কি উপহার ?
 কনকপাত্রে সাজাইয়া স্তোত্র বেদীপাশে দিব তা'র ?
 চিবুক তাহার হাতে করে' ধরি'
 অঁকিব তিলক গণ্ডের প'রি
 শুনিব না মানা, ক্ষীর ননী ছানা মুখে দিব তার পূরে ।
 রাগ ত জানে না, ছাড়ি' রেহপাল পলাইবে কোথা দূরে ?

প্রহরীর কাছে প্রবেশ যে মাগে সে দলের আমি নই ;
 তা'র সনে আমি করি রসিকতা কাশে কাশে কথা কই ।
 জ্ঞানি না'ক আমি বন্দনাপান
 চাটুবাণী আর অর্থ্যপ্রদান
 প্রয়োজন হ'লে করি অভিমান, ভৎসনা করি তা'র ;
 মুখের উপর উচিত বলিব, তাহে কিবা আসে দার ?

কেড়ে লই তা'র গোষ্ঠের পাঁচনি, ঠেলে দি যমুনাজলে ;
 ছুরি করি' তা'র মোহন বাশরী লুকাই ভমাগতলে ;
 চোখ চিপে ধরি পিছু হ'তে তা'র,
 দেই না জবাব সকল কথার,
 উৎসব-দিনে দোল দেই তার বৃক্ষে কুলনা বাধি'
 দুঃখের দিনে চকুর জলে গলা ধরে' তা'র কাঁদি ।

দোলের দিবসে পায়ে দিবে ফাগ প্রণমিব কিগো পার ;
 কুছুম আর বঙের খেলার কৃত সাজাটব তার ?
 ঘাটে ব'সে সে কি বাশরি বাজা'বে ?
 কন্দিব না যদি গোষ্ঠে নাহি যাবে,
 স্নান রেখে' সে গো কোথায় পলা'বে খেলার হারিহা রে ?
 কদের কৃষ্ণ, সাধের কৃষ্ণ, দ্বৈধের কৃষ্ণ সে ।

আর রে কৃষ্ণ, আর রে বন্ধু আর রে মোদের মাঝে,
 পাড়া একবার বন্ধিমঠাটে নব-নটবর-সাজে ;
 তুই বিনা বে রে সকলি আঁধার,
 মোদের গোকুল যায় ছারে-খার
 তুই ছাড়া সব অলস অবশ, কচে না অন্নজল ;
 হারাই পাঁচনি চোখের জলে যে, বাহুতে নাহিক বল ।

জানিস ত, ডাই, ধারি নাক মোরা জ্ঞানগরিমার ধার ;
 তুই আমাদের প্রাণের ঠাকুর এই বুঝিয়াছি সার ;
 আর বে রাখাল, নন্দভাল,
 কাঙালের হরি, আর বে কাঙাল
 গোষ্ঠের বেলা যে বরে বার, ডাই, পড়াটি পরায়ে দি,
 বাহুহার দিয়ে কণ্ঠ জড়ারে বদনের চুমা নি ।

শ্রী কার্লিদাস রায় ।

ব্যাধি ও তাহার প্রতিষেধ।

ডিপ্‌থিরিয়া।

গ্রীক ভাষায় ডিপ্‌থেরা শব্দের অর্থ আবরণ। এই রোগে গলায় অভ্যন্তরে এক প্রকার পর্দা পড়ে। এই ক্ষুদ্র ডাক্তাররা ইহাকে ডিপ্‌থিরিয়া নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই ব্যাধির জন্মস্থান ও সময় নির্ণয় করা এখন সহজসাধ্য নহে। তবে প্রাচীন ভীষকদিগের গ্রন্থে দেখা যায় যে, হোড়ল, সপ্তদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে ইহা পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আবির্ভূত হইয়াছিল। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ফরাসীদেশে ইহা একবার জনগণব্যাপকরূপে প্রকাশ পায়। ঐ সময়ে ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ড দেশের মধ্যেও ইহার আগমনের কথা শুনা গিয়াছে। কিন্তু তৎকালে ইংরাজ বৈদ্যগণ এই রোগের প্রভাব সম্যক উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে বলোন নামক স্থানে ডিপ্‌থিরিয়া বলায় ব্যাদান করিয়া লোকগ্রাস করিতে আরম্ভ করিলে প্রতিভাশালী বিজ্ঞানবিদগণের চিত্ত ইহার প্রতি প্রথম আকৃষ্ট হইয়াছিল। পূর্বকালে মনোবিগণের মধ্যে কেহ কেহ এই রোগকে স্কারলেট অরের রূপান্তর (Scarlet fever without eruptions) বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু পরবর্তী যুগে গবেষণা দ্বারা সে ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমবিজ্ঞপ্তিত বলিয়া দ্বিগীকৃত হইয়াছে।

ডিপ্‌থিরিয়া জীবাণুঘটিত ব্যাধি। এই রোগের জীবাণু সেথিতে ঈষৎ বক্র অথবা সরল রেখার স্থায়; কিন্তু উহাদের দুই মুখ গোলাকার। ফ্রেডস্ ও লিওফ্রার নামক দুইজন বৈজ্ঞানিক সর্ব প্রথমে এই জীবাণু আবিষ্কৃত করেন। এই দুই মহাত্মার নাম চিরস্মরণীয় রাখিবার জন্ত ডাক্তাররা অঙ্গ্যাবধি ডিপ্‌থিরিয়া রোগের জীবাণুকে Klebs-Löffler bacillus বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকেন। যে ভাবে এই অণুদেহিগণ মানবদেহে অস্থপ্রবিষ্ট হইয়া রোগ আনয়ন করে তাহা বিশদরূপে বর্ণনা করিয়া ফরাসীদেশবাসী বীমান ইয়ারসিন্ ও ইংলণ্ডবাসী দৃষ্টিদলী সিড্‌নি মার্টিন মহোদয়গণ বিচ্ছিন্ন-সমাজের ধস্তবাদার্দ হইয়া রহিয়াছেন। সাধারণতঃ গলনলী ও নাসিকার মধ্যেই এই রোগ জন্মিয়া থাকে। কিন্তু বাহিরের প্রদাহবৃত্ত স্থানেও এই রোগ জন্মিতে পারে। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে বিলাতের পেক্‌হাম্‌ সহরে এক গৃহস্থের কতিপয় শিশু-সন্তানের ডিপ্‌থিরিয়া রোগ হয়। শিশুদিগের মাতা প্রথম হইতেই তাহাদের

পরিচর্যা করিয়াছিলেন, কিন্তু নিজে রোগাক্রান্ত হইলেন নাই। সম্ভানগণ রোগমুক্ত হইলে এক দিন মাতা মনে করিলেন, তাঁহার "গ্রন্থকাইটিস্" রোগ জন্মিয়াছে। রোগশাস্ত্রের অস্ত্র তিনি চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ না করিয়াই নিজে বক্ষোদেশে এক বৃহৎ স্ফিটার প্রদান করেন। কয়েক দিন পরে স্ফিটারের ক্ষতমধ্যে ডিপ্‌থিরিয়া পর্দা পড়িতে দেখা গিয়াছিল। ডিপ্‌থিরিয়া জীবাণু অনেকগুলি পুঞ্জীকৃত হইয়া এক স্থানে অবস্থান করে। ইহারা অবিকাংশ কেবল বায়ুদ্বারা পরিবাহিত হইয়া রোগীর গলমধ্যে প্রবিষ্ট হয়, এবং তথায় দলপুষ্টি হইতে থাকে। ইহাদের গাত্রনিঃসৃত রস হইতেই এই সাংঘাতিক রোগ উৎপন্ন হয়। এই সকল জীবাণু সম্পূর্ণ স্বয়ং ব্যক্তিকে প্রায়শঃ আক্রমণ করিতে পারে না। যে কোন কারণে মুখ, গলনলী বা নাসিকামধ্যস্থ মিউকাস ষ্মিরা (Mucous membrane) জন্ম হইলে প্রাপ্ত জীবাণুগণ তথায় আশ্রয় গ্রহণ করিবার সুযোগ পায়। ডিপ্‌থিরিয়া রোগীর গলমধ্যে যে পর্দা পড়ে তদ্ব্যধোই ইহারা অবস্থিতি করে। এই পর্দার নিম্নস্তরে অথবা রক্তমধ্যে ইহাদের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয় না। এই রোগ প্রথমে স্থানিকরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। পরে জীবাণুর গাত্ররস শোষিত হইয়া রোগীর রক্ত ছুট হইলে একে একে পার্শ্বাঙ্গিক লক্ষণনিচয় পরিচুট হয়।

Pseudo-Diphtheria bacillus নামে এই জাতীর আর এক প্রকার জীবাণু আছে। ইহারা অনেক সময়ে স্বয়ং মনুষ্যের মুখাত্তরে বসতি করে; অথচ আশ্রয়হীনতার কোন অনিষ্ট করে না। কোন একটি সমুদ্রকুলবর্তী স্বাত্ম্যকর স্থানে ৫০ জন স্বয়ং ছাত্রের মুখ পরীক্ষা করিয়া ২৬ জনের মুখমধ্যে এই জীবাণু পাওয়া গিয়াছিল। ঐ স্থানে বহুকাল হইতে কাহারও কখন ডিপ্‌থিরিয়া রোগ হয় নাই। গণকৃত রোগে ক্ষতমধ্যে এই সকল জীবাণু বর্তমান থাকে।

ইহারা ডিপ্‌থিরিয়া জীবাণুর স্তায় সঞ্জনালী নহে। কোন কোন বিচ্ছ চিকিৎসক বলেন যে, কোন কারণে মনুষ্যের স্বাস্থ্যহানি ঘটিলে ও গলমধ্যে ক্ষতাদি প্রকাশ পাইলে ইহারা বলবান হইয়া ডিপ্‌থিরিয়া রোগ আনিতে পারে। কিন্তু এই মত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় নাই। ডিপ্‌থিরিয়া সংক্রামক ব্যাধি। গলকৃত, মুখ ও গলনলীর স্বাস্থ্যহানির অবস্থা, টন্সিলের বিবৃদ্ধি, দন্তমাড়ির ক্ষীতি, নাসিকাত্রে পুরাতন সর্দি প্রভৃতি ইহার উদ্দীপক কারণ। বসন্ত ও শরৎকালে এই রোগ অধিক হয়। শিশুদিগের, মধ্যেই ইহার আধিক্য। ছোট বৎসর হইতে ছয় বৎসর বয়স শিশুদিগের এই রোগ বড়ই মারাত্মক। ইহার নিকট স্ত্রী-পুরুষ

বিচার নাই। হৃৎ, বায়ু, বস্ত্র, সার্জিকেল অন্ত্রাবির সংযোগে এই জীবাণু গলমধ্যে প্রবিষ্ট হয়। রোগীর প্রস্থান গ্রহণ করিলেও এই রোগ হওয়ার অসম্ভব নহে। ডিপ.পিরিয়া বিব শরীরে প্রবিষ্ট হইলে ২ হইতে ৭ দিন-মধ্যেই রোগ প্রকাশ পাইয়া থাকে। কোন দ্রব্য গলাধঃকরণ করিতে কষ্ট বোধ, গলমধ্যে প্রদাহ ও তৎসঙ্গে অল্প এই রোগের প্রথম লক্ষণ। তাহার পর পীড়িত স্থানে এক প্রকার পর্দা পড়ে। প্রদাহ-স্থানে এক বা বহু পর্দা যুগপৎ উৎপন্ন হইয়া পার্শ্ববর্তী স্থানসকল আক্রান্ত করিয়া ফেলে। এই পর্দা উঠিয়া গেলে নিয়ে ক্ষত দৃষ্ট হয়। ঐ ক্ষত হইতে অল্প অল্প রক্তস্রাব হইতে থাকে। পর্দা একবার উঠিয়া গিয়া আবার নূতন পর্দা পড়িতে আরম্ভ হয়। শ্বাসকষ্টই এই রোগের প্রধান লক্ষণ। রোগ মুহূর্ত্তাব্যাপন্ন হইলে চতুর্থ অথবা পঞ্চম দিনে পর্দা উঠিয়া যায় এবং নূতন পর্দা পড়ে না। এই সঙ্গে অল্প ও অন্ত্রান্ত্র লক্ষণগুলি দূর হইয়া ২।১০ দিনে রোগী আরোগ্য লাভ করিতে পারে।

রোগ কঠিন ভাব ধারণ করিলে উপরোক্ত পর্দা প্রসারিত হইতে থাকে এবং সাংঘাতিক লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়। অত্যধিক শ্বাসকষ্ট, প্রবল অল্প ও গলার ঘর্ষণায় রোগী অস্থির হইয়া পড়ে। সামান্য তরল বস্তুও গলাধঃকরণ করিবার শক্তি তাহার থাকে না। গলার উভয় পার্শ্বের লিম্ফেটিক্‌ গ্যাংগ্লুম্‌ ঐ সঙ্গে ক্ষীণ ও বেদনাক্রম হয়। এতদ্ব্যতীত অপরাপর মারাত্মক লক্ষণসকল উপস্থিত হইয়া শীঘ্রই রোগীর জীবন নষ্ট করে। এই রোগের আর এক প্রধান লক্ষণ—পক্ষাঘাত। এই পক্ষাঘাত গলমধ্যে প্রথম আরম্ভ হয়। রোগীর স্বর অস্বাভাবিক হইয়া যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে রোগারম্ভের অল্প দিন পরেই এই উপদ্রব উপস্থিত হয়। কিন্তু সচরাচর দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় সপ্তাহের পূর্বে এই লক্ষণ প্রকাশ পায় না। পক্ষাঘাত প্রকাশ পাইবার সঙ্গে সঙ্গে রোগীর হস্তপদ অবশ হইতে থাকে। হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশী পক্ষাঘাতগ্রস্ত হওয়ার নাকী হ্রস্ব, মুহু ও ক্ষুণ্ণবিশিষ্ট হইয়া পড়ে। ক্রমে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বিলুপ্ত হইয়া হঠাৎ রোগীর মৃত্যু হয়। ডাক্তার রজার বলেন, ৩।৪ জন রোগীর মধ্যে অন্ততঃ এক জনেরও এই পক্ষাঘাত প্রকাশ পাইয়া থাকে।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে পারিসের কোন এক হাসপাতালে ২১০ জন ডিপিরিয়া-গ্রস্ত বালকবালিকা প্রবিষ্ট হয়। উহাদের মধ্যে ৩১ জনের পক্ষাঘাতের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল। কিন্তু এই লক্ষণ প্রকাশ পাইবার নির্দিষ্টকালের মধ্যে

অনেক রোগীকে স্থানান্তরিত করা হয় সকল রোগী একত্র বাস করিলে বোধ হয় পক্ষাঘাতগ্রস্তের সংখ্যার আরও বৃদ্ধি হইত ।

বাড়ীতে কাহারও ডিপথিরিয়া হইলে বালকবালিকাদিগকে তৎক্ষণাৎ স্থানান্তরে পাঠাইয়া দিবে ; নিত্যই অল্পবিধা হইলে রোগীর ঘর হইতে তাহাদিগকে দূরে রাখিবে । প্রত্যহ কোন একটি জীবাণুনাশক জলে বাড়ীর স্নান জনগণকে তিন চারিবার কুন্নি করিতে বলিবে । পটাস্ ফ্লোয়াস্ ও গরম জল এতদ্বর্থে উত্তম । তদভাবে নিষয়ক সিদ্ধি জল ব্যবহার্য্য । রোগীর গৃহ প্রশস্ত ও বাতাসোকপূর্ণ হওয়া আবশ্যক । গৃহে বাহাতে দূর্য্যাক্রিয়ণ প্রবিষ্ট হয়, তাহার সূচ্যবস্থা করিবে ।

ডাক্তার ক্রুস ও ইয়ারসিন্ বলেন,—ডিপথিরিয়া-জীবাণু তাপ আদৌ সহ্য করিতে পারে না । রোগীর কফ, কাশ ও নাসিকানিঃসৃত সন্ধির সহিত রোগ-জীবাণু বহির্গত হইয়া শয্যা, বসন ও নিকটস্থ তৈজসপাত্র লিপ্ত থাকে । স্তত্রাং রোগীর গৃহে অনাবশ্যক দ্রব্য কখনই রাখিতে নাই । পুস্তক, খেলনা প্রভৃতি যে সকল দ্রব্য পুড়াইয়া ফেলা যাইবে না, এমন সামগ্রী রোগীকে দিবে না । রোগীর কফ, কাশ, সর্দি প্রভৃতি ফেলিবার জন্য একটি নির্দিষ্ট পাত্র রাখিবে । ঐ পাত্রে পরিশোধক জল রাখা আবশ্যক । এক খণ্ড বস্ত্রে কফ, কাশ ফেলিয়া তাহা মধ্যে মধ্যে পুড়াইয়া ফেলিলেই ভাল হয় । যে দ্রব্যাদ্বারা রোগীর গলমধ্যে ঔষধ প্রবৃত্ত হইবে তাহা তৎক্ষণাৎ দত্ত করিবে । রোগীর গৃহে বিড়াল, কুকুর প্রভৃতির প্রবেশ নিষিদ্ধ । বিড়ালের গলার মধ্যে ডিপথিরিয়ার স্তায় এক প্রকার সংক্রামক রোগ জন্মে । ঐ সকল রোগগ্রস্ত বিড়াল শিশুদিগের মধ্যে এই রোগবিস্তারে সাহায্য করে, ইহা সর্ব্বদা মনে রাখিবে । রোগীর গৃহে ঘাহাতে মক্ষিকার উপদ্রব না হয়, সে পক্ষে যত্নবান হইতে হইবে ; কারণ, মক্ষিকাসকল রোগজীবাণু বহন করিয়া রোগবিস্তারের হেতুকৃত হইয়া থাকে । রোগীর গৃহে পরিচর্য্যাকারী ব্যতীত সাধারণ লোকের যাতায়াত নিষিদ্ধ । ঐ গৃহ হইতে কোন দ্রব্য বাহিরে আনিতে হইলে উহা কুটস্থ ও পরিশোধক জলে ধৌত করিয়া গ্রহণ করা কর্তব্য । রোগীর গলমধ্যে ঔষধ লাগাইতে হইলে ঔষধদাতা একখণ্ড বস্ত্রদ্বারা নিজের নাক ও মুখ বদ্ধ করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিবেন । কারণ, ঐ সময়ে রোগী কাশিলে বা হাঁচিলে রোগদীক্ষ ঔষধদাতার মুখে বা নাসিকামধ্যে প্রবিষ্ট হওয়া অসম্ভব নহে । পরিচর্য্যাকারী হস্ত ও পরিধের বসনাদি উত্তমরূপে পরিশোধক জলে ধৌত করিয়া অগ্নিপানাদি গ্রহণ করিবেন । রোগীর গৃহে মধ্যে মধ্যে ইউ-

কেলিপটাস্ বা তাপিন তৈল ছিটাইয়া দেওয়া আবশ্যিক। নোবাণ, অগুরু প্রভৃতি বাড়ীতে পুড়াইলেও গৃহব্যয় বিস্তৃত হয়। একখানি বস্ত্র জলে ভিজাইয়া রোগীর গৃহের দরজার খুলাইয়া রাখিলে ভাল হয়। বস্ত্র শুষ্ক হইলেই ঔষধজলে নিমজ্জিত করিয়া লইবে। রোগী নিরাময় হইলেও তাহাকে কিছুকাল পৃথক রাখিতে হইবে। ইয়ারসিন বলেন, পর্দা বিলুপ্ত হইয়া গলনশীল স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইলেও এই রোগের সংক্রামকতা নষ্ট হয় না; রোগজীবাণু দীর্ঘকাল রোগীর মুখাভ্যন্তরে বর্তমান থাকে। ডাক্তার লিথোক্রানের মতে রোগী স্নহ হইলেও কয়েক মাস পর্যন্ত রোগজীবাণু তাহার মুখে অব্যাহতি করে। এই সময় ঠাণ্ডা লাগিয়া বা অল্প কোন কারণে রোগীর মুখমধ্যস্থ মিউকাস্ ফিল্ম (Mucous Membrane) আবার পীড়িত হইলে, ঐ সকল জীবাণু তথায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়া পুনর্বার রোগোৎপাদন করিতে পারে। নাসিকামধ্যস্থ ডিপথিরিয়া রোগে রোগলক্ষণ তিরোহিত হইলেও নাক হইতে একপ্রকার রসস্রাব হইতে থাকে। ঐ স্রাবমধ্যেও জীবাণু লক্ষিত হয়। এই সময়ে রোগী পৃথক বাস না করিলে রোগবিস্তারের সম্ভাবনা থাকে।

এমনে ডিপথিরিয়া হইতে আরম্ভ হইলে বাড়ী সর্বদা পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন রাখিবে। ড্রেনের গ্যাস বাহ্যতে বাড়ীতে প্রবিষ্ট হইয়া বায়ু দূষিত না করে, তৎপক্ষে বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত। অনেকে বলেন, ড্রেন হইতে উখিত গ্যাসের মধ্যে ডিপথিরিয়া-জীবাণু দূষিত থাকে। খাদ্যদ্রব্যের বিতৃষ্ণিত্য প্রতি ধরদৃষ্টি রাখিতে হইবে। এই সময়ে গৃহে কোন খাদ্যদ্রব্য খেলা রাখিবে না। দুগ্ধসম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। যেহেতু দুগ্ধ বায়ুর রোগজীবাণু সকলকে অত্যধিক পরিমাণে আকৃষ্ট করে। রাজিঙ্গাগরণ, শীতসেবা, আর্দ্র কুমিতে শয়ন প্রভৃতি সর্বথা পরিত্যজ্য। পানীয় জল ও দুগ্ধ স্নানিত না ফুটাইয়া পান করিবে না। গলার মধ্যে অন্ন বেদনা হইলেই তৎক্ষণাৎ চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত। এই সময়ে প্রত্যহ জীবাণুনাশক জলে কুমি করা সুব্যবস্থা। সম্প্রতি ডিপথিরিয়া-নাশক একপ্রকার রক্ত-রস (Anti-toxin) আবিষ্কৃত হইয়াছে। উপযুক্ত সময়ে বিধিপূর্বক এই রস সূক্ষ্ম পিচকারীর দ্বারা হাইপোডার্মিকরূপে প্রয়োগ করিলে অতিরিক্তমধ্যেই ডিপথিরিয়া-জীবাণুর ধ্বংস হয়। মহাত্মা ককের ছাত্র অধ্যাপক বেরিং সর্বপ্রথমে এই প্রণালীর দ্বারা ডিপথিরিয়া রোগীর চিকিৎসা করেন। এক্ষণে সকল বিজ্ঞ চিকিৎসকই ইহার উপকারিতা স্বীকার করিতেছেন। এই চিকিৎসা প্রণালী হইবার পর হইতে এই রোগে মৃত্যুর হারের অনেক হ্রাস হইয়াছে। বার্লিন শহরের “ফ্রেডারিক হোসপাতালে” এই প্রণালীদ্বারা ডিপথিরিয়া

রোগীর চিকিৎসা করিয়া ডাক্তাররা মৃত্যুর হার শতকরা ১৩ হইতে দেখিয়াছেন । এলিক, কেসেল ও ওয়াডল্যান্ড ২২০ জন রোগীকে এই প্রশালীষায়া চিকিৎসা করেন । রোগাক্রমণের প্রথম বা দ্বিতীয় দিনে এই রস ঘাহাদের মধ্যে প্রবিষ্ট করান হয়, তাহাদের মধ্যে শতকরা ৯৭ জন শীঘ্রই নিরাময় হইয়াছিল । সম্প্রতি পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণীকৃত হইয়াছে যে, মল্লুবাদেহে এই রস কেবল ডিপ্-থিরিয়ানাশক নহে, ইহা ঐ রোগের প্রতিবেধকও বটে । ডাক্তার কার্ল ডিপ্-থিরিয়া রোগপূর্ণ স্থানে ৭২ জন বালকবালিকাকে রোগপ্রকাশের পূর্বে এই বিষয় রসদ্বারা টিকা দিয়াছেন, টিকাধারিগণের মধ্যে ৮ জন মাত্র খুব মৃদুভাবে রোগাক্রান্ত হইয়াছিল ।

এই টিকা সম্পূর্ণ নির্দোষ । ইহা বালকদিগকেও নিরাপদে দেওয়া যাইতে পারে । দেশে বা বাড়ীতে ডিপ্-থিরিয়ার প্রাদুর্ভাব হইলে উপযুক্ত চিকিৎসকের সাহায্যে সকলেরই এই টিকা গ্রহণ করা উচিত । যে সাংঘাতিক রোগ এত-দিন দুরারোগ্য বলিয়া গণ্য হইত, আজ বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতিতে তাহা চিকিৎসকের করায়ত্ত হইয়া পড়িয়াছে । শ্রবতি বিজ্ঞতমঃ ক্রমশো জনঃ ।

শ্রীহরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ।

মুক্তদ্বার ।

তোমারি ত গৃহ এ যে ! আপনার করে
দ্বার খুলে' বেধে গেছ ; তাই তো এ আমি
নাথি বন্ধ করিবারে ! সবে মোর ঘরে
পশিয়াছে মুক্ত পেরে ; হে জীবনস্বামী,
বসে আছি সেই আশে তোমার লাগিয়া
দিবে এরে বন্ধ করি আপনি আসিয়া ।
যতদিনে কিরে তুমি না আসিবে নাথ
ততদিন সকলেরি হবে যাতায়াত !

শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ।

মুসলমান কবির বাঙ্গালা রচনা।

—•••—

অতি প্রাচীনকাল হইতেই বাঙ্গালীর একটা সাহিত্য ছিল এবং তাহা এই বিশাল বঙ্গভাষার মতই বিস্তীর্ণ ছিল; এ কথা এখন বিশেষ করিয়া বলা নিশ্চয়োজ্ঞান। আমাদের প্রাচীন সাহিত্যসুস্রাণী মাতৃভাষার সেবকবৃন্দের প্রযত্নে প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের অক্ষকারাকৃত কক্ষ যে পরিমাণে আলোকিত হইয়াছে, তাহাতেই আমরা পূর্ণ করিয়া এই কথা বলিতে পারি। প্রথমাবধি সেরূপ একটা সাহিত্য ছিল বলিয়াই আজ আমাদের বঙ্গসাহিত্য আপন প্রভাবে প্রতীচ্য জগৎ পর্যন্ত মাতাইয়া তুলিতে পারিয়াছে। চণ্ডীদাস বিভ্রাণতির সেবিত সাহিত্যের এই পরিণতি একটু আশ্চর্যের বিষয় বলিয়া মনে হইলেও অসম্ভব ছিল না।

এ পর্যন্ত প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের হতটা জানা গিয়াছে, তাহা প্রায় হিন্দুর কীৰ্ত্তি বলিলেও অত্যাুক্তি হয় না। মুসলমানগণ শত শত বৎসর ধরিয়া বঙ্গদেশকে মাতৃভূমি ও বঙ্গভাষাকে মাতৃভাষারূপে বরণ করিয়া ও মাতৃভাষার প্রতি একেবারে উদাসীন ছিলেন, ইহা কদাপি বিশ্বাস-যোগ্য হইতে পারে না। বস্তুতঃ বাঙ্গালার মুসলমানগণেরও স্বদেশভাষার উপযোগী একটা সাহিত্য ছিল এবং সেই সাহিত্যের ভিতর দিয়া তাঁহারা আপনাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। সেই সাহিত্যের গতি যদি আজ পর্যন্ত অভয় প্রবাহে চলিয়া আসিত, তবে মুসলমান সাহিত্য হিন্দু সাহিত্যের মতই বিশূল আকার ধারণ করিত এবং তাহা বঙ্গীর মুসলমানের জাতীয়তা বিকাশের পক্ষেও বিশেষ সহায়তা করিতে পারিত সন্দেহ নাই। কিন্তু মুসলমানের গ্রহ-বৈগুণ্য এবং বঙ্গভাষারও হুর্ভাগ্যবশতঃ তাহা হয় নাই। তাহা হয় নাই বলিয়াই আজ মুসলমানগণ সকলের পক্ষেতে পড়িয়া বঙ্গভাষা হিন্দুর ভাষা বলিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিতেছেন। কিন্তু কেবল নাসিকা-কুঞ্চেই বঙ্গভাষা মুসলমানের ভাষা হইতে পারে না। তাহা করিতে হইলে একনিষ্ঠ সাধকের প্রাণের সাধনা চাহি, সারস্বত তীর্থে মহাকবি আলাওলের মত আত্মহুতি দিতে হইবে এবং হৃদয়ের অন্ধ ও ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি দিয়া সাহিত্যের সেবার প্রবৃত্ত হইতে হইবে। কিন্তু কৈ মুসলমানগণের মধ্যে সেরূপ চেষ্টা কেঁথায়?

আমাদের পূৰ্ণপুরুষগণ বঙ্গভাষাকে আপনাদের ভাষা জ্ঞানে তাহার সাহায্যে যে সাহিত্যসৌধের ভিত্তিপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের দুৰ্ব্বুদ্ধিবশতঃ সম্পূর্ণ হয় নাই সত্য; কিন্তু সেই অসম্পূর্ণ পরিভাষ্য সৌধের আরতন নিত্য

সামান্ত নহে। বাঙ্গালার প্রাচীন সাহিত্যের বিপ্লবাত্মক চিরদিনের জন্ত কাল-সাগরে বিলীন হইয়া গিয়াছে। যাহা কোনরূপে আজও বিস্তারিত থাকিয়া “শেষের সে দিনের” প্রতীক্য করিতেছে, তন্মধ্যে হিন্দু সাহিত্যের উদ্ধারের জন্ত বিস্তর চেষ্টা ও উদ্যোগ আরম্ভ হইয়াছে। তাহার ফলে উহার বহুলাংশ লোক-লোচনের গোচরীভূতও হইয়াছে। কিন্তু মুসলমান-সমাজের পক্ষ হইতে আজ পর্য্যন্ত প্রাচীন সাহিত্যোদ্ধারের কোন চেষ্টাই হয় নাই। মুসলমানী সাহিত্যের উদ্ধারের জন্ত মুসলমানগণেরই যত্নবান হওয়া উচিত; কিন্তু চরিত্রগোপনতঃ অত্ৰাপি তাঁহাদের মতিগতি সে দিকে সম্যকষ্ট হয় নাই। যাহাদের মহাযশাঃ পূর্বপুরুষরা এক সময়ে শুধু সাহিত্যের বলেই—সাহিত্যের অশ্রুপ্রাণনাভেই বড় হইয়াছিলেন, আজ তাঁহারা সেই সাহিত্য-সেবা ছাড়িয়া কেবল স্বত্তি ও তোষামোদেই বড় হইবার আশার আশাবিত! ইহা অপেক্ষা অদৃষ্টের শোচনীয় বিড়ম্বনা আর কি হইতে পারে, জানি না। বাঙ্গালার প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনার প্রবৃত্ত হইয়া মুসলমানী সাহিত্যের যতটা আমরা হস্তগত হইয়াছে, তাহাতে এ পর্য্যন্ত ২২ জন মুসলমান কবির বিবর জানা গিয়াছে। তাহাও আবার এক চট্টগ্রামের অংশ বিশেষেই সীমাবদ্ধ। এই হিসাবে বিশাল বঙ্গদেশে কত মুসলমান কবির আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। এ স্থলে আমরা বঙ্গীয় মুসলমান কবি ও তাঁহাদের রচনাবলীর একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা পাঠকবর্গের সমীপে উপস্থিত করিতেছি :—

- ১। সৈয়দ আলী ওল—(১) পদ্মাবতী ; (২) সরস্বতী মুহূর্বদিয়ুজ্জামাল ; (৩) সেকান্দরনামা ; (৪) সপ্তপরকর ; (৫) সতী মরনা ও লোরচক্রাণী (উত্তর ভাগ) ; (৬) তোহফতেয়েছা ; (৭) রাগনামা ; (৮) বৈষ্ণব কবিতাদি ।

২। দৌলত কালী—সতী মরনা ও লোরচক্রাণী (পূর্বভাগ) ।

৩। দৌলত উল্লাহ—সরলা-মজলু ।

৪। কবির আলী—(১) রাধার সংবাদ—স্বকৃত বারমাস ; (২) বৈষ্ণব কবিতা ।

৫। সেখ জালাল—সবীর বারমাস ।

৬। মোহম্মদ হারি পণ্ডিত—(১) জৈন্তেশ্বর বারমাস ; (২) মেহের নেগারের বারমাস ।

মতি উল্লাহ—রসরসের বারমাস ।

৮। মোহাম্মদ খান—(১) মুকাল হোসেন; (২) কেয়ামতনামা;
(৩) কাসিম বৃদ্ধ।

মুজাক্কর—(১) ইউনান দেশের পুঁথি; (২) হানিকার পত্রের উত্তর।

সৈয়দ সুলতান—(১) জ্ঞানপ্রদীপ; (২) লবোমোয়ারাজ;
(৩) জ্ঞানচৌতিশা; (৪) অকাত বহুল; (৫) হজরত মোহাম্মদ-
চরিত।

নছরউল্লা খান—জঙ্গনামা।

সাহ বদিউদ্দিন—(১) ফাতেমার ছুরতনামা; (২) দরবেশী ও
বৈষ্ণবপদ।

আলিরাজা ওরফে কাহু ককির—(১) জ্ঞানসাগর; (২) ধ্যানমালা;
(৩) সিরাজকুলুপ; (৪) যোগ কালন্দর; (৫) দরবেশী ও বৈষ্ণব
কবিতা।

হুস মোহাম্মদ—মদনকুমার ও মধুমালায় পুঁথি।

চান্দ—সাহাভুল্লা পীর পুঁথি।

নছরউল্লা—মুসার সওয়ার।

জীবন আলী (পণ্ডিত)—রাগতালের পুঁথি।

মোহাম্মদ আকবর—জৈবল মুদ্রক-সানারোগের পুঁথি।

চাম্পাগাজী (পণ্ডিত)—(১) বৈষ্ণবকবিতা; (২) রাগতালের পুঁথি।
(৩) সৃষ্টিপতন।

কাজি হাসমত আলী চৌধুরী—(১) ফগকর সাহ; (২) আরব্যোপকাস।

সত্রিক—লালমতী-সরফলমুদ্রক।

করিমউল্লা—যামিনীভান।

মোতালেব—কিফায়তুল-মোছল্লিন।

সৈয়দ হুরউদ্দিন—(১) রাহাতুল কুতুব; (২) দাকারেৎ।

সেখ মনসুর—আমীরজঙ্গ।

আব্রিক—লালমনের কেছা।

মোহাম্মদ রাজা—তমিম গোলাল—চৈতন্তসিলালের পুঁথি।

হামিদউল্লা খাঁ বাহাধুর—(১) রীবক-মোচন; (২) আগপথন।

মোজায়েল—ছাহাৎনামা।

বালক ককির—নামহীন খণ্ডিত পুঁথি।

- ৩১। মোহম্মদ আলী—(১) ফিকরতুল-মোছল্লিন ; (২) মুরসিদের বারমাস ;
(৩) পারমার্থিক সঙ্গীত ।
- ৩২। মোহম্মদ কাসিম—মুলতান জম্মনার পুঁথি ।
- ৩৩। মোহম্মদ সফি—মুর-কান্দিল ।
- ৩৪। সেরবাজ—মল্লিকার হাজার সওয়ালা ।
- ৩৫। জৈনউদ্দিন—নামহীন পুঁথি ।
- ৩৬। হাসিম পণ্ডিত—(১) রাধিকার বারমাস ; (২) বৈষ্ণব ও দরবেশী
কবিতা ।
- ৩৭। সেখ কয়ছুল্লা—গোর্খ-(গোরক) বিজয় ।
- ৩৮। রফি উদ্দিন—জেবল মুন্সুক-সামারোথের পুঁথি ।
- ৩৯। হাজি মোহম্মদ—নামহীন পুঁথি ।
- ৪০। কবির মোহম্মদ—রঙ্গমালা ।
- ৪১। সমসের আলী—রেজ্-ওয়ান সাহা ।
- ৪২। ফকির হোসেন—আমছেপারার ব্যাখ্যা ।
- ৪৩। করম আলী (২য়)—নামহীন পুঁথি ।
- ৪৪। বদিউদ্দিন কাজী—চিষ্ট ইমান ।
- ৪৫। গোলাম মাওলা—মুলতান জম্মনার পুঁথি ।
- ৪৬। সম্মুদ্দিন ছিদ্দিকী—ভাবলাভ ।
- ৪৭। আবদুল হাকিম—(১) ইউসুফ জেলে খাঁ ; (২) লালমতী-সয়ফল মুন্সুক ।
- ৪৮। বনিজ মোহাম্মদ—ইমামসাগর ।
- ৪৯। সেরতুল্লা—ফাতেমার ছুরংনামা ।
- ৫০। দানিস কাজী—(১) সৃষ্টিপত্তন ; (২) দরবেশী সঙ্গীত ।
- ৫১। আবদুল করিম—মুর ফরাসিস নামা ।
- ৫২। আবদুল হাকিম (২য়)—মুরলামা ।
- ৫৩। হামিদউল্লা—ভেলুহাঙ্গলরীর পুঁথি ।
- ৫৪। মোহাম্মদ হানিফ—বৈষ্ণবপদাবলী ।
- ৫৫। বীর্জা ফরেনজউল্লা—
- ৫৬। - বীর্জা কাজালী—
- ৫৭। আবাল ফকির—
- ৫৮। সৈয়দ মঈনুল্লা—

- ৫২। পীর মোহাম্মদ— বৈষ্ণব পদাবলী।
- ৬০। সের চান্দ—
- ৬১। সৈয়দ আবদুল্লা—
- ৬২। নাছির মোহাম্মদ—
- ৬৩। সৈয়দ আইনুদ্দিন—
- ৬৪। নাছির উদ্দিন—
- ৬৫। মোছন আলী—
- ৬৬। আমান—
- ৬৭। বক্শা আলী—
- ৬৮। এবাদুল্লা—
- ৬৯। লাল বেগ—
- ৭০। আবদুল মালী—
- ৭১। সেখ ভিখন—
- ৭২। মাল বেগ—
- ৭৩। স্ববীর—
- ৭৪। আকবর সাহ—
- ৭৫। সেখ ফতন (পোতন)
- ৭৬। আলিমদ্দিন—
- ৭৭। ছলা মিঞা—
- ৭৮। মনোহর—
- ৭৯। আকবল—
- ৮০। সমসের আলী—
- ৮১। আবদুল ওহাব—
- ৮২। এসাদ উল্লা— দরবেশী সঙ্গীত।
- ৮৩। সর্কত উল্লা—
- ৮৪। আমীর আলী—
- ৮৫। আলী মিঞা—
- ৮৬। দেওয়ান আলী সাহ
- ৮৭। আব্বাস আলী—
- ৮৮। সৈয়দ জাকর— শাক্তসঙ্গীত।

৮২। আলি আকবর—

শাক্তসঙ্গীত ।

২০। শীর্ষা হোসেন আলী ।

২১। সৈয়দ নাছির—নামহীন পুঁথি ।

২২। হামজা—আবীর হামজার পুঁথি ।

এতদ্ব্যতীত অনেকগুলি পুঁথিতে রচয়িতার নাম উল্লিখিত না থাকায় তাঁহাদিগকে এই তালিকাক্রমে কল্পা বাইতে পারে নাই । সুতরাং এই তালিকা যে সম্পূর্ণ নহে, তাহা বলাই বাহুল্য ।

সম্প্রতি আর এক জন নূতন মুসলমান কবির বাঙ্গালা রচনা আমাদের হস্তগত হইয়াছে । তাঁহাকে লইয়া মুসলমান কবির সংখ্যা মোট ২৩ জন হইল । প্রাচীনকালে মুসলমানগণ যে বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যকে আপনাদের জাতীয় ভাষা ও সাহিত্য-রূপে পরিগণিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, ইহা তাহারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ নহে কি ?

আমাদের প্রাপ্ত নূতন মুসলমান কবির নাম ছাদক আলী । তাঁহার রচিত ‘রানচন্দ্রের বারমাস’ নামক একটি বারমাস্তা মাত্র পাওয়া গিয়াছে । ইহা ব্যতীত তিনি বঙ্গভাষার আর কিছু রচনা করিয়াছিলেন কি না, জানিবার উপায় নাই । এই ক্ষুদ্র নিবন্ধের মোট পদসংখ্যা ৩৬ মাত্র । প্রাচীন তুলত কাগজে লিখা ; কিন্তু কাগজের অবস্থা দেখিয়া বড় বেশী দিন পূর্বেই বলিয়া বোধ হয় না । কেবল নামটুকু ভিন্ন কবির আর কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই ।

এক সময়ে বঙ্গসাহিত্যে “বারমাস্তার” বড়ই প্রাচুর্য্য ছিল । সে কালের আর সকল কাব্যেই একটা না একটা বারমাস্তার অন্তর্ভুক্ত দেখা যায় । এই বারমাস্তাটিও তৎকালে রচিত হওয়া বিচিত্র নহে ।

এই কবি তেমন উচ্চশিক্ষিত ছিলেন কি না বলা যায় না, কিন্তু কোমলতা ও মধুরতায় তাঁহার সন্দর্ভটি অস্বন্দ্র নহে । সেকালের কবিগণ একের পর এক বারমাস্তাগুলি চর্চণ করিতে করিতে একেবারে অস্থির করিয়া তুলিয়াছিলেন । এইজন্য তৎকালীণ রচনার কোন নূতন ভাব বা কবিত্ব থাকিলেও অত্যধিক পরিচিত বলিয়া তাহা এখন আর আমাদের নিকট নূতন বোধ হয় না । এরূপ ক্ষুদ্র সন্দর্ভসম্বন্ধে আর বৃথা বাগাড়ম্বর না করিয়া আমরা এই স্থলে সমগ্র বারমাস্তাটি পাঠকগণকে উপহার দিতেছি । প্রাচীন কবিতা বলিয়া সে কালের বর্ণবিজ্ঞান-প্রণালী অনেক স্থলেই অবিকৃত রাখা গিয়াছে ।

মুসলমান কবি রানচন্দ্রের বারমাস্তা রচনা করিয়াছেন,—এই বিশেষত্বের জন্য ও ইহা আমাদের সমাজের যোগ্য সন্দেহ নাই । বারমাস্তাটি এই :—

রামচন্দ্রের বারমাস।

হাঃ পুত্র রামচন্দ্র কমল লোচন।
 আর নি দেখিব মাএ চন্দ্রবদন ॥
 মাঘ মাসেত রাম গেলা বনবাস।
 সেই ধরি অভাগী মাএ ছাড়ে গৃহবাস ॥
 দিনে বিনে কীপ তহু পাজর শুখাএ।
 রামের লাগিআ মাএ বড় দুঃখ পাএ ॥
 কান্দএ কৌলল্যা মাএ বিবাস ভাবিআ।
 অরণ্যেত গেল পুত্র কে দিব আনিআ ॥ ১।
 ফাল্গুন মাসেত রাম ফাউ খেল দোলে।
 হেনকালে রামপুত্র নাহি মাএর কোলে ॥
 কথাএ* গেল রামচন্দ্র ছাড়ি নিজ দেশ।
 জানকী সহিতে রাম অরণ্যে প্রবেশ ॥
 কান্দএ কৌলল্যা মাএ গদ গদ বাণী।
 অরণ্যেত গেল পুত্র কেবা দিব আনি ॥ ২।
 চৈত্র মাসেত রাম অতি সে ধরান।†
 অবিরতে পোড়ে চিত্ত মাএর পরাণ ॥
 কান্দএ কৌলল্যা মাএ বিবাস ভাবিআ।
 অরণ্যেত গেল পুত্র কে দিব আনিআ ॥ ৩।
 বৈশাখ মাসেত রাম বৈসে তরুতলে।
 অতি ক্ষীণ ধনুর্ধরী তুলি লৈল কোলে ॥
 পাপিষ্ট কেকৈর লাগি হইলুম সর্বনাশ।
 জগতের প্রভু রাম পাঠাইলুম বনবাস ॥ ৪।
 জ্যৈষ্ঠ মাসেত রাম গাছে পাকে আম।
 অবোধ্যা ছাড়িআ গেল পুত্র রে শ্রীরাম ॥
 অবোধ্যার রাজ্য হইয়া উঃ না ধরাইলা।
 স্বর্ণের মুগ লাগি জানকী হারাইলা ॥

* কথাএ—কোথায়।

† ধরান—গ্রীষ্ম। এই শব্দটি আজও এ গ্রন্থে প্রচলিত আছে।

: উঃ—খঃ।

কান্দএ কৌশল্যা মাএ বিবাদ ভাবিআ ।
 অরণ্যেত গেল পুত্র কে দিব আনিআ ॥৫।
 আবাড় মাসেত রাম মেঘের গর্জন ।
 বৃক্ষের কোটরা করি বকে তিন জন ॥
 ফলফুল আনি রাম করেন ভক্ষণ ।
 হাহা রে দাক্ষিণি বিধি এত বিড়ম্বন ॥
 কান্দএ কৌশল্যা মাএ গদ গদ বাণী ।
 মুকুতা করনি করে ছই নম্বানের পানি ॥৬।
 শ্রাবণ মাসেত রাম বৃষ্টি অতি দেখি ।
 নানান মতে দ্বব করে বনচর পক্ষী ॥
 পক্ষিরাহ রতি সুনিতে বিপরীত ।
 ধর্ম্মর্ষণ ছাড়ি রাখে শয়ন ভূমিত ॥
 কান্দএ কৌশল্যা মাএ বিবাদ ভাবিআ ।
 অরণ্যেত গেল পুত্র কে দিব আনিআ ॥৭।
 চাত্র মাসেত রাম গাছে পাকে ডাল ।
 কে মোরে আনিআ দিব উদয়ের শাল ॥
 শয়ন ভোজন মোর বঞ্চিত কৈল বিধি ।
 কে মোরে আনিআ দিব রাম শুপনিমি ॥৮।
 আশ্বিন মাসেত রাম শরভের কাল ।
 সর্ক বস্ত্র এড়ি রাখে পৈরে ধনু শাল ॥
 পাপিষ্ট কৈকের লাগি লইলুম সর্কনাশ ।
 ত্রিভুগতের শ্রদ্ধে রাম পাঠাই বনবাস ॥
 কান্দএ কৌশল্যা মাএ বিবাদ ভাবিআ ।
 অরণ্যেত গেল পুত্র কে দিব আনিআ ॥৯।
 কার্ত্তিক মাসেত রাম হেমন্ত বিহার ।
 হেনকালে রামচন্দ্র নাহিক আমার ॥
 কার ধন হস্তিআ নিলুম কিবা কৈল চুরি ।
 কেবা মোরে গালি দিল পুত্রশোকী (বুলি) বোলি ॥
 কান্দেরে কৌশল্যা মাএ গদ গদ বাণী ।
 মুকুতা করনি করে ছই নম্বানের পানি ॥১০।

আগ্রাণ মাসেত রাম রজনী না পোসাএ ।
 দাকনি হুদের আমল কি দিলে ছুড়াএ ॥
 কোশল্যাএ বোলে কেঠেক বড় নিদারুনি ।
 কেমতে ধরাইমু চিত্ত মুই অত্যাগিনী ॥
 হাহা পুত্র রামচন্দ্র কমল লোচন ।
 আর নি দেবিব মাএ এ চন্দ্রবদন ॥১১।
 পোষ মাসেত রাম আইলা মাএর কোলে ।
 রামলক্ষণ সীতাদেবী দেখিল সকলে ॥
 দিবা খাট দিবা পাট দিবা সিংহাসন ।
 আনন্দিতে কেলি করে কোশল্যানন্দন ॥
 যেবা পড়ে যেবা শুনে শ্রীরামের বারমাস ।
 পাপ ছাড়ে পুণ্য বাড়ে বৈকুণ্ঠে নিবাস ॥
 হীন ছাদক আলী কহে সবার গোচর ।
 অশুদ্ধ হইলে শুদ্ধ করিবা সত্তর ॥১২।

অধুনা হিন্দু মুসলমান শিক্ষিত হইয়া পরস্পরের গলা কাটাকাটিতে কুণ্ঠিত
 হইতেছেন না ; কিন্তু সেকালে তাঁহাদের মধ্যে বৈরূপ সম্প্রীতির বন্ধন ছিল, তাহা
 ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। পল্লীগ্রামে এখনও সেই মধুর ভাবের একবারে
 অভাব ঘটে নাই। এই মুসলমান কবি রামচন্দ্রের বারমাস রচনা করিয়া দেশের
 তাৎকালীন একটা শাস্ত্রময় চিত্র ও হিন্দুমুসলমানের সম্প্রীতির নিদর্শন রাখিয়া
 গিয়াছেন, সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ এই দুই জাতির মিলন ভিন্ন কদাপি ভারতের
 মঙ্গল নাই ; কনিক স্বার্থের উত্তেজনায় এই সহজ কথাটুকু যে আমরা বুঝিয়াও বুঝি
 না, ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কিছুই হইতে পারে না।

আবদুল করিম।

নাস্তিকের ধর্ম্মানুষ্ঠান ।

“আজকাল অনেক অর্থশালী লোকের মুখেই শুনিবে, আমি বড় অধিক ‘ভিক্সিট’ (বন্দী) আদায় করিয়া থাকি । ইহাদের মধ্যে কাহাকেও যদি কখনও আমার ভ্রাতৃ একক নিঃস্বল নিরাশ্রয় ও পসার-হীন অবস্থায় শুধু নিজ বক্ষিণ হস্তের বন্ধতার উপর নির্ভর করিয়া জীবিকা নির্বাহের চেষ্টা করিতে হইত, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই আমার অর্থপুঙ্খতাসম্বন্ধে সমালোচনা করিবার পূর্বে কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ না করিয়া পারিতেন না । অন্ততঃকাৎক্ষুণ্ণ রকমের অবস্থা না হইলে লোক সহজে সফরের আবশ্যকতা বৃত্তিতে পারে না । বিদ্যার্না, যদি কখনও কাহারও প্রতি আমার কঠোর ব্যবহার বেধিয়া আমাকে দয়ামমতাহীন বলিয়া মনে করিয়া থাকে, জানিও, উহা আমার প্রকৃত বক্তাবের পরিচায়ক নহে । হুঃসময়ে প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিগণের নিকট আমি বেঙ্গল স্বার্থান্বেষতার পরিচয় পাইমাছি, হিংসাত্মকের বশীভূত হইয়া লোক আমার উন্নতির পথে যেসকল বাধাবিঘ্ন স্থাপিত করিয়াছে, তাহা স্মরণ হইলেই আমার ঐক্লপ চিত্তবিমল ঘটিয়া থাকে । এই পারী নগরটি বড় আশ্চর্য্যই স্থান । এ স্থানে যদি তুমি কোনও দিন অথারোহণে প্রবৃত্ত হও, দেখিবে, রেকাবে পা দিতে না দিতেই কেহ তোমার পক্ষাৎ হইতে তোমার কোট বরিয়া টানিতেছে, কেহ জ্বিনের পেটী আশ্রয় করিয়া বিতেছে, কেহ বা সস্তূর্ণনে ঘোড়ার পাঠের নালগুলি ধুলিয়া কেলিবার চেষ্টা করিতেছে । বাহ্যর প্রকৃতি নিত্যই সরল দেখিবে, সে-ই কেবল সমুখে পিছল তুলিয়া তোমার প্রতি লক্ষ্য করিতেছে । তুমি নিজে হুঁচিহীন বহ, অন্তরঃ অক্ষয় জনসাধারণ কিরণ নির্মলভাবে প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিগণের বিলম্বাক্ষরণ করিয়া থাকে তাহা তোমার অবদিত নাই । যদি তুমি কোন দিন বাজী রাখিয়া পাশা খেলিতে বসিয়া ছুই টাকার সম্বল হারিয়া থাক অমনই শুভব রটাবে, তুমি একজন পাকা জুয়াড়ী—মত রাত্রিতে প্রোয়াগর পাঁচ মত টাকা হারিয়াছ । যদি তোমার মাথার একটু অস্থির হইয়া থাকে, অমনইই প্রচার হইবে, তুমি পাগল হইয়া পিছাই । যদি ঘটনাক্রমে কোন দিন তোমার মেজাজ একটু গারাপ হয়, অমনইই সকলে তার ঘরে চীৎকার করিয়া উঠিবে যে, তোমার ব্যবহার একেবারেই অসহনীয় । যদি এই সকল ‘কুৎ’ পত্র দমন করিতে তোমার উচ্চতর মানসিক শক্তির আশ্রয় লও—তাহা হইলে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধুগণও বলিতে আরম্ভ করিবে যে, তুমি সকলের মুখের হাসি কাড়িয়া লইয়া নিজ ব্যবসারে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইবার চেষ্টা করিতেছ । যদি তোমার চিকিৎসার কেহ সারিয়া উঠে—প্রচার হইবে, সে মরিয়া পিছাইছে । যদি কেহ আসল মুক্ত হইতে তোমার কৃপার রক্ষা পায়—অমনই তোমার শুভানুধ্যায়ীরা বলিবেন, লোকটা অ্যাপাততঃ আরাগ হইল বটে, কিন্তু পরে ইহার অস্ত ইহাকে অনেক যোগ জুগিতে হইবে । সে বাড়িয়া আছে বটে, কিন্তু তাহার মুক্তা যে সুনিশ্চিত সে সম্বন্ধে—কেহ বিধা যাত্র প্রকাশ করিবেন না ।

“এরূপ ক্ষেত্রে তোমার যদি সাব্যস্ত পদধ্বলন হয় তাহা হইলে পতন অবিবাধ । তুমি বড়ই নুতন বৈজ্ঞানিক প্রণালীর আবিষ্কার কর না কেন, তোমার ভ্রাতা এগা বড়ই ভয়ভীরুর সহিত দাবী কর না কেন, সকলেই একবাক্যে বলিবে, তুমি বড়ই চতুর লোক—তোমার সহিত পারিয়া

উঠ। দায়—তোমার ছালায় নূতন ত্রুটিদিগের উদ্ভিষ্টলাভের পথ একেবারেই বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। তাই বলিতেছি, শুধু ঈশ্বর কেন, মানুষের প্রতিও আমার কোনও আস্থা নাই।

“তুমি এতক্ষণে অবশেষে বৃত্তিতে পারিহাস্য, লোক আমাকে বেগুন মনে করিয়া থাকে আমি কখনও সেগুন নহি। কাহাকেও ভালরূপ না জানিয়া পরোক্ষ গালিবেশ করা যে কত অস্বাভাবিক তাহা কে ভাবিয়া দেখে? বাউক, এ সকল অশ্রুতিকর কথাই আমার আলোচনা করিব না। দুর্ব্বল পুরুষপ্রাণীর কাহা বাঁচিয়া আর লাভ কি?”

“আমি ঐ বাড়ীটাতে থাকিতাম, আর আত্ম পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইতে হইবে বলিয়া কঠিন পরিশ্রম করিতাম। তখন আমি একেবারে রিক্তহস্ত; অর্থত্যাগের কথা আর কি বলিব—পরম পরমও যেন সেগুন অবস্থা কখনও না হয়। একগুণ অবস্থায় পড়িলে লোক বাধা হইয়া পেটের দ্বারে কোঁজে ভর্তি হইয়া থাকে। বেশ হইতে আমার এক পিতৃবন্য এক বাস্তব কাশ্মীরচাপড় পাঠাইবেন লিখিয়াছিলেন। তাহাই তখন আমার একমাত্র তরঙ্গ। পিসিয়া আমার অস্ত্রের কথা না জাবিয়া বস্ত্রের ডিম্বাভেই যাত হইয়াছিলেন। তাহার দ্বন্দ্ব দ্বন্দ্ব ছিল যে, তাহার আত্মপুত্র মদন মন টাকা দাসিক সাহায্যে সহরে গোলাও কোর্দা বাইয়া বন্ধুকে বিভ্রাত্যাস করিতেছে। বাস্তব এখন আমার বাসায় আসিয়া পৌঁছে আমি তখন বিভ্রান্ত। আমনের বাসা-বাড়ীর একজন চামার ভাতীর দ্বারবান ছিল। আমার অশ্রুপঙ্খিতিতে সে দাণ্ডল দিয়া বাস্তব লইয়া নিজ হেঁকাতে রাখিয়াছিল। বান দুই কাপড় বন্ধক নিলেই আমি দাণ্ডলের টাকা সংগ্রহ করিতে পারিতাম; কিন্তু বাস্তব তখনই হস্তান্তর করি কিরূপে? বন্ধক রাখার রাখার ঘুরিয়া একটু উপায় স্থির করিতে চেষ্টা করিলাম; কিন্তু কোন মতেই সাফল্য বৃদ্ধি খেলিল না! সেই দিন হইতে বৃত্তিতে পারিলাম, আমার মত সংসারজ্ঞানানভিজ লোকের অস্ত-চিকিৎসা ভিন্ন অপর কোনও ব্যবসারে জীবিকা লাভের সম্ভাবনা নাই।

“বাহ্যের পুঙ্খ মানসিক বৃত্তি কেবল উচ্চ আশ্রয় সংবেদনার অভ্যস্ত তাহার কখনও কুট বৃত্তির উদ্ভাবনে পরিণত হইতে পারে না। তাহাঙ্গিরের বৈশুণ্য সম্পূর্ণ বৈবল্লভ। তাহার কঠোর-নির্ভীকতার ক্ষমতা বাহার না, তাহাঙ্গিরের বুদ্ধি আপনা হইতেই সমস্ত উপস্থিত হয়।

“রাত্রি অধিক হইলে আমি বাসায় ফিরিয়া আসিলাম; ভিতরে প্রবেশ করিব, এমন সময় সমস্ত দরজার কাছে সেগুনের নিবাসী সুর্জিয়াং নামক একজন জলবাহকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। সেও তখনই বাসায় ফিরিতেছিল। মোকট্ট আমার পানের ঘরেই থাকিত। এক বাড়ীতে পাশাপাশি থাকিতে গেলে বেগুন জানাওনা হইয়া থাকে আমাদের উভয়ের মধ্যে সেইরূপ হইয়াছিল। আর না চাইবেই বা কেন—ঘরগুলি বেগুন অপরিহার্য তাহাতে সুখখোয়া, গলাকাড়া হইতে আশ্রয় করিয়া বাসিকাগর্ভে পঞ্চাশ দশকল নবই পরম্পরের কর্ণসোচর না হইয়া উপায় ছিল না। সুর্জিয়াঙের মুখে শুনিলাম যে, বাড়ীওয়ালার ভাবার কাছে নয় মাসের ভাড়া পাওনা হইয়াছে বলিয়া আমাদের বাড়ী হইতে উঠিয়া বাইবার জন্য নোটিশ দিয়াছে। সে আরও জানাইল যে, সে হীনবাবদায়বলদী বলিয়া তাহাকেও বাধা হইয়া সে ছান ত্যাগ করিতে হইবে। সে রাত্রিটা বেগুন বনোকাঠে ও দুর্জিয়াঙের অভিবাহিত করিয়াছিলেন আমার ধীরে আর সেগুন ঘটে নাই। আমার পুত্রকানি ও বাহা কিছু সামান্য তৈজসপত্র ছিল পাড়ীতাড়া বা মুটে

বলুণী দিয়া যে সেগুলি হানাহারিত করিব এমন সঙ্গতি আমার ছিল না । আর আমি বাইব-ই বা কোথায় ? আমার কি মাথা গুঁজিবার স্থান আছে ? কলা কোথায় আশ্রয় লইব, এই চিন্তাবনের আমি অস্থির হইয়া পড়িলাম । উদ্ভাসরা যেমন একই কথা বার বার আবৃত্তি করিতে থাকে, আমিও তেমনি চকুর জলে ভাসিতে ভাসিতে গল্পচালিতের ভ্রাতৃ সেই একই চিন্তার পুনরাবৃত্তি করিতে লাগিলাম । অবশেষে সর্বসম্প্রাপহারিণী মিত্রাবেরী ঔহার হুকোমল ক্রোড়ে আশ্রয় দান করিয়া অন্ততঃ কিয়ৎকালের জন্য আমাকে সকল চিন্তাবনার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি দান করিলেন । এইরূপ স্বর্ণ স্ববদারী মিত্রাহৃৎলাভ পরিত্রাণীবনই সম্ভবে ।

“সে সন্নিহিতে আর আমার আহোর হুত নাই । পরদিন প্রাতঃকালে জটীর টুকরাগুলি ছুঁতে তিলাইয়া কোন সকারে কুহিকৃতি করিতেছি এমন সময়ে বুদ্ধিগাং আমার কণ্ঠে প্রবেশ করিয়া তাহার অপোভন গ্রাসা কলীতে বলিতে লাগিল, ‘বলি ও হাতের মশায় ! আমাদের দুজনকেই ত এ বেটারা এখান থেকে তাড়িয়ে দিলে । তুমি যদি তালি হও ত চল, দুজনকেই একটা বাসার খোঁজে বা’র হয়ে পড়ি । বটা হিসেবে একখানা টেলা পাড়ী ভাড়া করে আমি পথের উপর রেখে এসেছি । তোমার ও আমার যে জিনিষপাতি আছে তা তাতেই সলুদান হবে । তোমার যে এখানে বড় কেউ আপনার জন আছে তা’ বলে ত মনে হচ্ছে না । আমার কথা আর কি বলব ; বাপ যা যে কি বস্তু তা কখনও জানি না । পথে ফুড়ান হেলে—সেউল্লরের অন্যধাত্রনে মানুষ হুচেছি । আমাদের দুজনকেই এখন সমান বশা ; চল, দুজনকেই এক জায়গায় বাসা নিয়ে থাকাক থাক’ ।

“আমি বুদ্ধিগাং কে বলিলাম, ‘এ লক্ষ্মীছাড়া স্থান হইতে বাহির হইতে পারিলে আমিও নিশাস কেলিয়া ঠাটি । কিন্তু কি করিব, বড়ই দুর্কিলে পড়িয়াছি । দ্বারবানের ঘরে আমার এক বায়ল কাপড় আটকান রহিয়াছে বিক্রয় করিলে উহার দান অন্ততঃ ৫০।৫০ টাকা হইতে পারে । বায়লটি একবার ভালাস করিতে পারিলে বাড়ীওয়ালার বাকি টাকা মিটাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিতাম । কিন্তু আপাততঃ মাগুল দিয়া ছাড়াইয়া লইব আমার এতপ সাধ্য কোথায় ?’ বুদ্ধিগাং এতদূর-বদনে নিজ পকেট হইতে একটা মল্লো চামড়ার থলি বাহির করিয়া বলিল, ‘তুমি কি মনে করহ, আমার মোটেই রেশ নাই ? এই দেখ, যা’ আছে তা’তেই আমাদের আপাততঃ খরচ চলবে । তুমি আর মিছামিছি কেন কাপড়ের বায়লটা বেহাত হ’তে বাও ?’ সে তাহার সঙ্গিত অর্থ হইতে তৎক্ষণাৎ বাকি ভাড়া মিটাইয়া দিল এবং দ্বারবানের কবল হইতে বায়লটি উদ্ধার করিয়া অস্ত্রান্ত ব্রহ্মাদির সহিত টেলা পাড়ীতে বোঝাই করিল ।

“বুদ্ধিগাং রাত্তার উপর দিয়া বাড়ী টেলিয়া লইয়া চলিল ; আমিও তাহার পাশে পাশেই ছুটপাখের উপর দিয়া বাড়ীর খোঁজ করিতে করিতে চলিলাম ; যে স্থানেই গরুভাড়ার বিজ্ঞাপন দেখি, সেই স্থানেই প্রবেশ করিয়া বাড়ীবাশি আমাদের থাকিবার উপদ্রুত কিনা সম্ভান লই । অনেক বাড়ী মিলিল, বটে ; কিন্তু বর ভাড়ার কেহই রাজী হইল না বোশা বিস্ময় হইয়া গেল ; তবুও আমাদের আহ্বারাদি হইল না । আমি ক্রান্ত হইয়াছি সেবিয়া বুদ্ধিগাং বলিল, ‘আর বিলম্ব কাব নাই ; আইল এই বোকানটার বসিয়াই কিছু জলযোগ করিয়া লওয়া যাউক ।’

“প্রায় সম্ভার সময় ‘কুরানে তেঁহা’ পত্রীতে ‘পাসের দু ক্যাস’ নামক রাস্তার উপর আমাদের অবস্থার উপযোগী বাসার সম্মান পাওয়া গেল। মোটে দুইটি ঘর, তাহাও বাড়ীর ছাতে উঠবার সিঁড়ির দুই পার্শ্বে অবস্থিত। শুদ্ধ। মাসিক পাঁচ টাকা মাত্র—এই দুইই সুবিধা। বায়সংক্ষেপের জন্য আমি ও বুদ্ধিগাং একত্রেই আহার্যি করিতাম। বুদ্ধিগাং নিজে প্রায় দশ বার আনা উপার্জন করিত। তাহার এই সামান্ত পারিশ্রমিক হইতে সে বহুকষ্টে প্রায় ৬-১০ টাকা জমাইত। আর কিছুদিন হইলে সে অবশ্যসেই একখানি জলবহনোগ্যোগী পাড়ী ও একটি ঘোড়া ক্রয় করিয়া তাহার বহনিনের আকাশ্য পরিভ্রম করিতে পারিত। কিন্তু আমার অবস্থার কথা জানিতে পারিয়া সে তাহার জীবনের এই সর্বপ্রধান অভিলাষও স্থবীর্ণ কালের জন্য বিসর্জন দিতে সূচিত হইল না। বাইশ বৎসর বয়স হইতে পারী নগরীর পথে পথে জলবহন করিয়া সে যাহা কিছু সংগ্রহ করিয়াছিল, আমার অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশায় সেই কষ্টসঞ্চিত অর্থ সে অকাতরে ব্যয় করিয়া ফেলিল। আমার মনের কথা বাহির করিয়া তাহার এক আশ্রয় ক্ষমতা হ্রাসিয়াছিল। সে একজন কৌশলের সহিত আমার সুবিধা অসুবিধার কথা জানিয়া লইত যে, অনেক সময় আমি তাহার পুত্র উদ্বেগ ঘৃণাকরেও জানিতে পারিতাম না। তাহার সেই অকপট সেহসূর্ণ ব্যবহারের কথা মনে করিলে এখনও আমার হৃদয় কৃতজ্ঞতার উদ্বেলিত হইয়া উঠে।

“আমার পুত্রক ক্রয় ও পরীক্ষাদির জন্য অর্থ প্রয়োজন হইলেই বুদ্ধিগাং তাহা কষ্টে জিত প্রদান করিত। আমার জীবনের যে একটা বিশেষ উদ্বেগ আছে—আমি যে একটি মহান ত্রুটি লইয়া ভ্রমগ্রহণ করিয়াছি এ কথা যেন সে ভালরূপেই বুঝিয়াছিল। আমার উচ্চতর মানসিক শক্তির উদ্বোধনের জন্য যে অর্থ-ব্যয় অনিবার্য্য এ সম্বন্ধেও তাহার সন্দেহনাত্মক ছিল না। সে নিজেই আমার সকল ভার গ্রহণ করিয়াছিল। অসন বসন বা গৃহস্থালীর সমস্ত আমাকে মোটেই ব্যত হইতে হইত না। সে আমাকে পুত্রবৎ রেহ করিত এবং নানা রূপ সেহসঙ্কামণে তাহার হৃদয়ের অকৃত্রিম বাৎসল্যভাব প্রকাশ করিত। আমি যখন অনন্তচিন্তে পাঠাভ্যাসে নিরত থাকিতাম, সে তখন দীক্ষণে আমার কক্ষে প্রবেশ করিয়া আমার তদ্ব্যবধান করিত। এ ধাবৎ কদম্ব ও অপুষ্টিকর আহাৰ্য্য গ্রহণ করিয়া আমার যে ব্যাধাহারি সজ্জাবনা ঘটাইয়াছিল তাহা বিহার্য্যের জন্য সে সেহসীলা আকর্ষণীয় জায় আমার নিমিত্ত নানারূপ হুপখা ও মৃচ্চিকর আহার্য্য সাবিত্রী প্রস্তুত করিয়া রাখিত।

“বুদ্ধিগাং তখন প্রৌঢ়াবস্থার প্রথম যোগ্যানে উপনীত। তাহার বয়ঃক্রম প্রায় চল্লিশ বৎসর। তাহার ধরণধারণ অনেকটা সেকালে গৃহস্থের স্তার। তাহার প্রণত ললাট বেধিয়াযাত্রা দার্শনিক পণ্ডিত লাইকার্গনের মুষ্টি বৃত্তিই মনে পড়িত।”

(ক্রমঃ)

ঐগুরুদাস সরকার।

ফুলঝুরি ।

—:~:—

()

বৈকালবেলাটার অলসভাবে বসিয়া বসিয়া মনে হইল, একখানা মাসিক পত্র বাহির করিলে কি হয় ? কাঁখে চামর কেলিয়া উঠিলাম ; ওত ইচ্ছা যখন আপনা হইতেই জাগিয়াছে, তখন ইহাকে সহজে উড়াইয়া দেওয়া চলিবে না । উমেশের নিকট প্রস্তাবটি উপাধিত করিবামাত্র সে একেবারে নাচিয়া উঠিল ; বলিল, “আর দেবী করা নব ; আজ হইতেই কাণ্ড আরম্ভ হ’ক্ ।”

পত্র বাহির করাই যখন একরূপ স্থির হইয়া গেল তখন আমি বলিলাম—
“বেশ কথা ; এখন চল, হরিহর বাবুর সঙ্গে একবার পরামর্শ করে আসা যা’ক্ ।”
হরিহর বাবুকে একজন নীরব সাহিত্যিক জানিয়া আমরা এতকাল ভক্তি করিয়া আসিয়াছি—এ সকল বিষয়ে তিনি যে একজন পাকা ওস্তাদ হইবেন, এমনি একটা বিশ্বাস আমাদের বরাবরই ছিল ।

কথাটা তাঁহার কাছে গিয়া পড়িবামাত্র তিনি যথেষ্ট উৎসাহ দিলেন, এবং ইহার অন্তর্ধানকল্পে কতকটা ব্যয়ভার বহন করিতেও প্রস্তুত হইলেন । তাঁহার অপর্য্যাপ্তরূপা রচনাবলী, যাহা লোকলোচনের অন্তরালে এতকাল থাতার সঞ্চিত হইয়াছে, তাহাও যে ধারাবাহিকরূপে আমাদের প্রস্তাবিত পত্রে প্রকাশের জন্ত পাওয়া যাইবে এ ভরসা যখন পাইলাম তখন পত্র-প্রকাশ-সম্বন্ধে আর সন্দেহই রহিল না ।

সে দিন সন্ধ্যার পর হরেনদের বহির্বাটাতে রীতিমত গুলতান চলিল । পত্রের নামকরণ লইয়া প্রথমেই মতভেদ ঘটিতে লাগিল । উমেশ বলিল—“অরুণ নামটা মন্দ কি ?” হরেন বলিল—“বড় ক্ষতিকাব্যগন্ধী ।” পুরাতন বিবেচিত হওয়ার ও নাম নাকচ হইয়া গেল ।

হরেন প্রস্তাব করিল—“যখন ধুবড়ী থেকে বেরুচ্ছে তখন ‘বীরভূমি’র অনুরূপে ওর নাম ‘ধুবড়ী’ই রাখা হোক ।” “দূর—দূর—ও বড় বিটকেল নাম ; ‘ড’ অক্ষরটাই কেমন বেন কড়মড়ে ধরণের ।”—প্রস্তাবটা আমি একবারেই উড়াইয়া দিলাম ।

ঠিক এই সময়, দীর্ঘনিশ্বাস-শব্দে উচ্চারিত “হ” কথাটার ভিতর এতক্ষণের

চিন্তাতাপ নিঃশেষে চালিয়া দিয়া হরিহর বাবু মুহূর্তান্তে চোখ তুলিলেন এবং উভয় হস্ত কোলের উপর নিশ্চেষ্ট করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“কি নাম ঠিক করলে তোমরা?”

“কৈ আর ঠিক করলুম, আপনিই বা’ হর বলল না?” উত্তর-প্রতীকার আমরা তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলাম।

অর্ধপূর্ণ ভঙ্গীতে হরিহর বাবু বলিলেন—“পত্রের নাম হইবে ফুলঝুরি।”

“ফুলঝুরি?” “কোকিল—কালো কোকিল রচে সুরের ফুলে ফুলঝুরি?” হ্যাঁ, এ নূতন বটে। বাজীর নাম আছে, কিন্তু এ নামের কোন পত্র—কৈ মনে পড়ে না ত! আমরা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওরি করিতে লাগিলাম।

হরিহর বাবু বলিলেন—“কালীপূজার রাত্রিতে ‘ফুলঝুরি’ যেমন অমাবস্তার অন্ধকার দূর করে, আমাদের এই বাণীপূজার মন্দিরেও ‘ফুলঝুরি’ সেইরূপ অজ্ঞানতামস দূর করিয়া পূজা-প্রদান আলোকপূর্ণে শোভাময় করিবে।”

“ভাবটা চমৎকার লাগল মনে হচ্ছে যে হে! তাই ত এটা ত কারও মনে আসছিল না।” একটা হর্ষদাঁড়িতে আমাদের চোখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। উমেশ বলিল,—“এই ত চাই, হরিহর বাবু নহিলে এমন আবিষ্কার করে কে?” না, আর বিধা নয়—সর্ববাদিসম্মতিক্রমে ঐ ‘ফুলঝুরি’ নামই মঞ্জুর হইয়া গেল।

অতঃপর কে কি লিখিবে তাহারই কথা। কথাটা পড়িবামাত্র সকলেরই বুকের ভিতর গুরুগুরু করিতে লাগিল। উঃ, কি সে আমোদ! আমরা লেখক হইব; সমস্ত দেশ আমাদের রচনাবলী পড়িয়া ধস্তা ধস্ত করিবে; কোন অনতিদূর ভবিষ্যতে এই ‘ফুলঝুরিই’ হর ত আমাদেরিগকে বঙ্কিম-রবির সহিত একাসনে বসাইয়া দিবে! এই জগতের অবজ্ঞাত বর্জমান আমাদের ভিতর সেই মহা-ভবিষ্যতের মঙ্গলবীজ যে নিশ্চয়ই নিহিত আছে, এ কথা যতই ভাবিতে লাগিলাম, ততই যেন কেমন হইয়া ঘাইতে লাগিলাম।

“ফুলঝুরি!” আহা হা, কি গভীর অর্থ উহার ভিতর রে! নামটিকে বেড়িয়া বেড়িয়া সকলেরই মন যেন উৎসাহে উৎফুল্ল হইতেছিল। বিশেষতঃ আমি ত ঐ অক্ষর কয়টির ভিতর নানাদিক দিয়া নানাভাবে একটি গভীর তাৎপর্য্য হৃদয়কন করিয়া ক্ষণে ক্ষণে আশাবিত ও পুলকশ্রীত হইতে লাগিলাম।

নৈবেদ্যসজ্জা কিরূপ হইবে তাহা স্থির করিয়া কেলিতে আর্য্যো বিলম্ব হইল না, যেহেতু সকলেরই মুখে এক বাণী—“গুভস্ত শীঘ্রং।” প্রথম সংখ্যার অস্ত্র নিম্নলিখিত রূপ রচনার ব্যবস্থা হইয়া গেল :—

১। উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	ছোট গল্প	৮ পৃষ্ঠা ।
২। হরেন্দ্রনাথ সোম	ঐতিহাসিক প্রবন্ধ	৫ পৃষ্ঠা ।
৩। হরিহর বাবু	দ্রম-কাহিনী ও	
	‘সাংখ্য দর্শনের কবিতা ব্যাখ্যা’	৩ + ৫ পৃষ্ঠা ।
মণীন্দ্রনাথ গুপ্ত (খোদ)	প্রথম পৃষ্ঠার কবিতা ও	
কমলাকান্তি রচনা		$১\frac{১}{২} + ৩\frac{১}{২}$ পৃষ্ঠা
শীলারতী সোম		
(হরেশের কবি-পত্নী)	কবিতা	১ পৃষ্ঠা ।
নিবেদন প্রভৃতি		২ পৃষ্ঠা ।
মোট—৩২ পৃষ্ঠা ।		

প্রথম সংখ্যা ক্ষুদ্র কলেবরই হইল ; প্রকাশ থাকিল যে, গ্রাহক হইলে এবং সাহিত্যসমাজের সহায়ত্বকৃতি পাইলে দ্বিতীয় সংখ্যা হইতেই কলেবরবৃদ্ধি হইবে । গ্রাহক সংগ্রহের জন্য প্রতি সংখ্যার তিনখানি করিয়া চিত্র মিবার ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইলাম ; এবং ভিন্ন ভিন্ন পত্রে পাঠাইবার জন্য বিজ্ঞাপনের সুসাবিধা করিয়া ফেলিলাম । আজ ২৭শে ফাল্গুন ; ১২ই চৈত্রের মধ্যে সকলকেই আপন আপন রচনা হরিহর বাবুর নিকট পৌছিয়া দিতে হইবে ; কারণ ছাপা বাধাইয়ের জন্য ১৮ দিন Margin না রাখিলে ১লা বৈশাখে প্রথম সংখ্যা বাহির হওয়া অসম্ভব । অতঃপর “১২ই চৈত্র” এই কথাটি বিশেষভাবে সকলের মনে মুদ্রিত করিয়া দিয়া, সে দিনকার সম্মিলন ভঙ্গ হইল । আর কি—পত্র বাহির হইতে আর বাকি কি ? চকুর সম্মুখে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দেখিতে দেখিতে আমি গৃহে ফিরিলাম ।

(২)

তিন দিন কাটিয়া গিয়াছে । পরীক্ষা সন্নিহিত বলিয়া নূতন কবিতা লিখিতে পারি নাই । পৌষ মাসে যেবার প্রথম ধুবড়ীতে আসি সেই সময় প্রভাত-সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া এক কবিতা লিখিয়াছিলাম ; ছন্দ যথাসম্ভব আধুনিক ; স্তব্ধরাং মালিক-পদের যে উপযোগী তাহাতে সন্দেহই নাই । একটু আধটু পরিবর্তন করিয়া এইভাবে গাড়াইল :—

ধুবড়ীতে ।

দৃষ্টিসীমার চতুর্দিকে রাত্রিশেষের ঘোর কুয়াশার
পথহারানো পথিক একা গাড়িয়ে গেছি ধোঁয়ার তলে ;

ধমকে আছে ভোরের আলো আকাশ-পারের কোন্ অসীমায়
 বিষকুবন গুটিয়ে যেন বিষ্ণু-নাভি-পদ্ম-বলে !
 কোন্ কামনার কনক আভা চমকে গেল স্থিতি ছুটে ;
 উদার পুরী-প্রবেশ-ভেরী উঠলো বেজে কাকের ডাকে
 দীর্ণ করি বোমকে যেন ব্রহ্মপুত্র উঠলো ফুটে
 সকল-জোড়া বাস্প-শ্রেণীর জমাটবাধা ধূমের কাঁকে ।
 জনম লভি' জলের কোলে বাতাস অধীর আকাশ হুঁড়ি'
 পরকণেই দীপ্ত অনল পুরবকোণে কিরণ-মেবে !
 রশ্মিতে তা'র মিলিয়ে এল আবছা-যন জলের গুঁড়ি
 অবাক-করা শৃঙ্গি হঠাৎ আঁবির আগে উঠলো জেগে !
 সত্য না এ স্বপনপুরী ? লতায় পাতায় শিশির-স্রা
 'আইজি' ঢাকা হাজার কাঁচে দোণার বলক উপলে পড়া ?

রূপায় মোড়া মদীর চড়ায়, বুনে ঝাউএর ধূসর বেলায়
 শিশুগাছের কুচো পাতার আড়াল-জোড়া নীল-কুচিতে,
 আলোক-ছায়ার উর্দ্ধিখেলায় দিবস-নিশার মিলন-মেলায়
 অমন করে ছড়িয়ে কে গো গড়িয়ে এলে জদয়টিতে ?
 বালির চরে চূর্ণ হীরক, উর্দ্ধিশিরে অলছে মানিক
 পথের বাকৈ শালের কাঁকে এমন সাতক কে আজ এলে ?
 পাড়াও ওগো সকল ভুলে মউলমূলে পাড়িয়ে থানিক
 চোখ বুলিয়ে মন ভরে নিই তুলির বালাই গুঁড়িয়ে ফেলে ।
 কুছাটিকার অপুর কণার ছলিয়ে দিলে এই যে পুরী
 কোন্ দিকে এর তাকাই বল, কোন সখাকে দেখাই ডাকি ?
 সম্ভিত এই চিত্রশালার যে পথ দিয়ে যতই ঘুরি
 হতাল হয়ে ঘাই যে ততই, কোনটা রাখি কোনটা আঁকি ?
 নূতন দেশে নবীন বেশে পাড়িয়েছ আজ মধুর হেসে
 বিভোর হয়ে দেখছি চেয়ে নির্নিমেমে নির্নিমেবে !

হেথা, বাংলোসারির মুক্তমালা পল্লীপ্রিয়ার বক্ষদেশে
 ছলিয়ে দিয়ে নগরবধু আনন্দে তার হাত ধরেছে ;

আধেক সোহাগ আধেক লাজে পরীয়াণী মধুর হেসে
 হাওদার-দোলা কানন-মালা কদর-রাজার গলায় দেছে !
 হেথা খেজুর গাছের বকল্লুখা আকট-পান-তৃপ্ত-অধর
 ঠাণ্ডমুখে বারার ধারার গড়িয়ে পড়ে বজ্র হাসি ;
 কাড় বেধেছে নদের ধারে তল্‌দাবাশের শরীর নগর
 রক্ত-পথে প্রভাতবাসু মধুরহরে বাজার বাসী !
 হেথা, লম্পসবুজ 'আইল'-পেড়ে গাঢ়হলুদ-বসন কাহার
 মুকুমারের ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে সর্বেফুলে ;
 ক্রোড়িনমূলে ঢেউখেলানো বিচিত্র-রং গাঁদার বাহার
 মেদির বেড়ার বেলের কুঁড়ি মুহূর্হ হাওদার সোলে !
 'কুফচূড়া' পরার হেথার নিষাখার মিলন-রাখি,
 'জল-পাহাড়ের' পাবান-বুকে লুটিয়ে পড়ে প্রোতের ধারা ;
 কানন-কোলে কুজন তোলে লক্ষ তরুর কঠ-পাখী,
 তাল-হুপারীর কুহুছারে নিটোল-গঠন কলার চারা ।
 হেথা, রৌদ্র-পারদ-লিপ্ত-পথের মুকুর পরে শুবাক-ছারা—
 কোথায় কুমি, কোথায় কুমি, এ সব যদি কেবল মারা ?

আরও কয়েকটি লাইন বাড়াইয়া কবিতাটাকে শেষ করিব মনে করিতেছি, এমন সময় দল সিং চোবে একখানা চিঠি দিয়া গেল । উমেশ লিখিয়াছে—“গল্পটার শেষ লইয়া বড় বিপদে পড়িয়াছি । বৈকালে একবার আসিও, পরামর্শ লইব । শীলাবতীর কবিতা পাঠাইলাম—সন্ধ্যার স্মরণটি অল্পকথার বেশ ব্যক্ত হইয়াছে । না ?”

পড়িয়া দেখিলাম, এ কবিতাটিও ধুবড়ীর খণ্ডস্থল লইয়া ; তবে দূতের খুঁটা-নাটীর দিকে মন না দিয়া লেখিকা সন্ধ্যার স্মরণটিকেই প্রাণের ভিতর ধরিতে চাহিয়াছেন :—

“বেলা যায়—বেলা যায় !”

পটে-অঁাকা শতশাখা শিরীষ-তরুত মূলে
 চেয়েছিহু পরপারে ঝাড়াইয়া নদীকূলে ;
 হৃদয় বেধের মত পাহাড়ের পানে চাহি’
 কোথা ছুটেছিল মন অকূলে তরঙ্গী বাহি’
 সহসা চমকি তুমি—কারা বেন পান গায়

“বেলা যায়—বেলা যায় !”

“বেলা বার, বেলা বার”—ছুটি কথা নহে আর—
 ছবি হ’য়ে গেল ছায়া, কবিচিত্ত চুরমার !
 আধপথে শিহরিয়া থানিল ঢপল গান
 আকুল অশীর হিরা পলকে পাতিল কাণ
 নিথর জনমপুরে ; কি-বেন-কি গেল শোনা !
 কোথা দিবে কি যে হ’ল কেহ তাহা বুলি না—
 কাঁদিয়া উঠিল হাসি, কাঁদিয়া উঠিল বাঁশী
 বাজিয়া উঠিল বৃক্ষে কি-লুপ্তনা কোথাকার !

শুধরিয়া ওঠে প্রাণ—কি করিহু সারাক্ষণ
 উড়ো ছবি, উড়ো গান ; শ্রীতি কোথা, শুধু তান
 আশাতরা তৃষাতরা তারা গাঁপি ছেলেবেলা !

ছায়াঢাকা দুটি তীর, মসীমাখা নদীনার
 গভীর নিখিল প্রাণ—কবি নাই, ছবি নাই !
 নয়নে হলিছে জল, টলমল্ টলমল্,
 এই থানে গান শেষ—কিরে যাই, কিরে যাই !
 হৃদয় যদি পেরে থাকো, তবে সখা বৃক পাতি
 বেদনাটুকুও ধর, পাশাপাশি রাখো গাঁথি ।

কবিতাটি শেষ করিয়া মনে হইতে লাগিল, এ যেন আমার ছন্দমোহন চিন্তের প্রতি কোন নেপথ্যবাসিনীর তিরস্কার ! বহুক্ষণ ধরিয়া স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিলাম—বার বার কবিতাটুকু পড়িলাম—এতক্ষণ যে মাধুরীকে আমি ফুটাইতে চাহিয়াছিলাম, তাহা গুঢ় বেদনাটুকুর ভিতর দিয়া এত সহজে এমন বিড়ম্বন হইয়া উঠিতে পারে ? তবে কি আমার হৃদয় কান্নকলার তুলনার এই নৃত্যমোলহীন পংক্তি করটিই অধিকতর মনোরম ? পাগল আর কি !—সন্ধ্যার সুর এ হয়ই নাই !—এ সুর নাচে কৈ ? ‘সন্ধ্যার সুর’ ত এইরূপ :—

“ওই গো সন্ধ্যা আসিছে আবার, স্নানিত সচেতন
 বৃক্ষে বৃক্ষে ধূপাধারসম ফুলগুলি ফেলে হাস ;
 ধ্বনিতে গড়ে শূণি লেগেছে, বাহু করে হা হতাশ,
 সান্ত্র কেনিল সূর্য্যশিখিল নৃত্য-আবর্তন !”

এমনই করিয়া সন্মোহটা আমি উড়াইয়া দিলাম বটে ; তথাপি মনের মধ্যে কেমন একটু ‘কিস্ত’ রহিয়া গেল ।

(৩)

উমেশদের বাড়ী যাইয়া দেখিলাম, ছোঁড়া অনেকখানি লিখিয়াছে ; স্ট্রটো এই :—

বালিকা নায়িকা ও অবিবাহিত পুলমাষ্টার নায়ক ; উভয়ের মধ্যে ভালবাসা জন্মিয়াছে । দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এক সপত্নীক চাকরে বাবুর সহিত নারিকার বিবাহ হইয়া গিয়াছে ; কিন্তু তাহার প্রাণ মাষ্টারের কাছে পড়িয়া আছে । তৃতীয় পরিচ্ছেদে নায়িকা ধুবতী ; ভালবাসায় সে সপত্নীকে পর্য্যস্ত বশ করিয়াছে । নারিকার কর্তব্যজ্ঞান তাহার পত্নীত্বকে প্রেমের উপর তুলিয়া ধরিয়াছে ; এক্ষণে পিত্রালয়ে আসিয়া, ব্রাহ্মদ্বিতীয়া উপলক্ষে উক্ত প্রণয়ীকে ভাইবোঁটা দিয়া করেক কিন্তু অশ্রদ্ধায়ে সে অতীতকে ভাসাইয়া দিতে চাহে । এ ক্ষেত্রে, অভিনয়টি কিরূপ উজ্জ্বল হইবে ও কিরূপ করিলে চিত্রটি বেশ শোভন হইবে, তাহাই পরামর্শ-সাপেক্ষ ।

পরামর্শ দেওরা কাণটা চিরদিনই সহজ ঠেকিয়া আসিয়াছে, সুতরাং যাহা মনে আসিল বলিয়া দিলাম । হাতে-কলমে যখন করিতে হইতেছে না তখন আর ভাবনা কি ?

অতঃপর, এক অভাবনীয় সুযোগে আমার গল্পরচনার একটা খোরাক যোগাড় হইয়া গেল । আমার এক প্রতিবেশিনী বৃদ্ধা ঠান্দিদি ছিলেন ; আমাদের উপর যে তাঁহার বেহের অভাব ছিল না তাহা, শীতের পরিবর্তে কান্ডন মাসের শেষাংশেই সমরটাতে মহাপ্রস্থান করিয়া তিনি মৃত্যুকালেও দেখাইতে তুলিলেন না । বৃদ্ধার একটি হুড়ি ছিল ; সেটি তাঁহার শিবঠাকুর । রোগশয্যায় থাকিয়াও দিনেকের জন্ত তাঁহার শিবপূজা বন্ধ হয় নাই । শেষ বয়সে বদ্বিশ নাজীর বন্ধনে তিনি ঐ শিবটিকেই ধারণাছিলেন বলিয়া তাঁহার সাধের ঠাকুরটিকেও সহস্রগুণে পাঠাইবার জন্ত আমরা শ্রমানে আনয়ন করিলাম । এই স্থানেই আমার প্রবন্ধ আরম্ভ করা গেল ।

যথোচিত ভূমিকার পর শিলাখণ্ডকে কথা কহিতে বাধ্য করাইলাম । সে বলিতে লাগিল :—

“পৃথিবীগর্ভ ভেদ করিয়া যে দিন আমি জন্মগ্রহণ করি সে দিন পাহাড়ের অঙ্গবিশেষ হইয়াই জন্মিয়াছিলাম, স্বতন্ত্র অস্তিত্বের কামনা করি নাই । দিনে

দিনে, মাসে মাসে, বৎসরে বৎসরে কত যুগ কাটিয়া গেল, শরীরের উপর দিয়া কত শীত বর্ষা কাটিয়া গেল, তাহার সীমা নাই—সংখ্যা নাই । এই দীর্ঘ যুগ ধরিয়া একটিমাত্র খেলায় আমার বড় আনন্দ হইত ; মেঘের কোল শূন্য করিয়া, ঈতল কোমল তুলতুলে শরীরগুলি লইয়া, মেঘ-নিঃসৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বারিবিম্বগুলি যখন বর্ষে বর্ষে আমাদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িত, তখন আমার (তথা পারিপার্শ্বিক অঙ্গগুলির) রোদ্রতপ্ত কঠোর হৃদয় যেন কোনোমতেই তাহাদিগকে ছাড়িতে চাহিত না—আমরা আদরে তাহাদিগকে বন্ধে স্থান দিতাম ।

“যুগযুগান্তর ধরিয়া ঐ বারিবিম্বগুলি আমাদের বুকের ভিতর সমবেত হইতে লাগিল । ফুলফুল কলকল ছলছল করিয়া আমাদের বক্ষনীড়ে যখন তাহার সহস্র সরস হাস্ততরঙ্গ ছুটাইত, তখন যেন আমরা আনন্দে আটখান হইয়া পড়িতাম ! পাবাণের বুকে সে কোমলতা যে কী হৃৎকেরই বোধ হইত তাহা আর কী বলিব !

“সবত্রে হৃদয়কারণে যে জগদলকে প্রেমসীর মতো আবদ্ধ রাখিতেছিলাম, তাহার উপর দিনে দিনে ভালবাসা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । আহা, আমাদের তব্বকঠোর হৃদয়গুলিতে তাহারাই যে শাস্তির অনিয়ন্ত্রা ! হায়, তখন যদি জানিতাম যে, ভালবাসা লইয়া খেলা চলে না, তাহা হইলে কি আজ এত নীচে নামিয়া আসিতে হইত ?

“সহসা এক দিন বক্ষপঙ্ক্তরে সলিলাঘাত বড় প্রবল বোধ হইতে লাগিল ; এত দিন আদরে বাহ্যকে বুকে ধরিতাম, সে আজ নিশ্চয় আঘাতে হৃদয় ভাঙ্গিয়া দিবে না কি ? ভাবিতে ভাবিতে সত্যি তাই ঘটিল ! আমার বুকের ধন আমার প্রাণ কাঁদাইয়া, আমার বুক ফাটাইয়া প্রবল ধারার পাবাপগাত্র বহিরা পৃথিবীর মৃত্তিকা আনিদান করিতে ছুটিল ! প্রেমের মোহ তখনও ফাটে নাই—আনি উন্মত্তের মতো প্রেমসীর উদাম স্রোতাবর্তে কাঁপ দিলাম—পাহাড়ের অঙ্গ বিচ্ছিন্ন হইয়া সে-ই প্রথম পৃথক সত্তা বরণ করিয়া গেল । শুধু আমি বলিয়া নয়, সহস্র সহস্র প্রতিবেশী প্রস্তরস্তূপের আমারই দশা ঘটিয়াছিল ।

“এক দিন যে আমার বক্ষে লালিত হইয়াছিল, আজ হইতে তাহার বক্ষেই আমি দলিত হইতে লাগিলাম—কঠোর নিম্পেষনে দিনে দিনে শরীর ক্ষয় হইতে লাগিল—প্রেমসীর অন্তরবিবে প্রতিমূর্ত্তে ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতে লাগিলাম ! হায় বিধি !”...

এইরূপে কাটাকাটি হাটাহাটি করিয়া লেখাটা খাড়া করিয়া তুলিলাম ।

অনুগ্রাসের সমাবেশ, ‘কী’ আর ‘মতো’র বানান-বিশেষত্বে, রচনাটি মন্দ লাগিল না—‘মন্দ নয়’ কেন, খুবই ভাল লাগিল। মনে হইতে লাগিল, ছাপায় অক্ষরে যখন ইহা ‘ফুলঝুরি’ শ্লোডিত করিবে তখন না জানি কি শোভাই হইবে !

করিত ছাপায় অক্ষরগুলির ভিতর দিয়া শত শত সলজ্জ টানা-চোখের প্রশংসাপূর্ণ চাহনি ক্ষণে ক্ষণে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল ! কল্পনার মোহ আনন্দের বেগকে এত বাড়াইয়া তুলিল যে, তাহা লুকাইবার ক্ষমতা আমরা পরম্পরের নিকট বখাসাধা গম্ভীর হইয়া, ঔদাত্তের ভাবটার উপরই জোর দিয়া ফিরিতে লাগিলাম ।

(৪)

হরিহর বাবুর দরবারে যে দিন আমাদের রচনারত্নের বিশ্লেষণ হইতে লাগিল, সে দিনটি কি আশার ও আনন্দের ! আমার রচনা হইতে হরিহর বাবু যে গভীর অর্থ বাহির করিলেন তাহা শুনিয়া মনে হটতে লাগিল,—“করিয়াছি কি ! এত বড় আধ্যাত্মিক ভাবটা এত সহজের মধ্যে ধরিয়া কেলিয়াছি !” সত্য কথা বলিতে কি, নিজেই তখন আর কোনমতেই সামান্য মাহুয বলিয়া মনে হইতেছিল না ; কেবলই মনে হইতেছিল :—

“আমি বাহা কিছু বলিবারে চাই

বলিতে দিতেছ কৈ !

অস্তরমাত্রে বসি অহরহ

মুখ হ’তে তুমি তাহা কেড়ে লহ”—ইত্যাদি ।

পরে শুনিয়াছি, এইরূপই না কি হয় ; প্রতিভাশালী ব্যক্তিরা বিশেষ করিয়া নিজের মধ্যে একটা দৈবশক্তির উত্তেজনা অনুভব করিয়া থাকেন ।

হরিহর বাবু বলিলেন—“এই যে পাষণ্ডের শিবস্তম্ভ উপলক্ষে তুমি শিলাখণ্ডের মুখ দিয়ে বলিরেছ, ‘যে দিন বেলাতুমি, হইতে আনীত হইয়া বিধবার বস্ত্ররক্ষিত কাঃসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইলাম এবং আমার পাষণ্ডপঙ্কজের উপর চন্দনরিক্ত বিষদল ও পঙ্কমধুর পুষ্পরাপি বর্ষিত হইল, সেই দিন সর্ব প্রথম আমার প্রাণের ভিত্তির এমন কিছু পাইলাম বাহাতে আমার জীবনগতি যুহুস্তেই কিহিয়া গেল”—এটা বড় শুক্লময় কথা ; ভাববার জমিই এখানে এত বেশী তুমি দিরেছ যে, তাই নিয়ে একখানা বই লেখা যায় ।”

সমবেত বন্ধুসংগী উত্তরোত্তর বিম্বিত হইতে লাগিল । হরিহর বাবু

অর্থপূর্ণ হাতের সহিত বলিলেন—“তা’রপর শোন, আমাদের মণীনের রচনা-চাকুরীটা শোন :—

‘কি কুহকে জানি না, মা’ম যেন আর পাবাণ বলিয়া আপনাকে ভাবিতে পারিতেছিলাম না—যনে হইতেছিল, আমার মধ্যে কোথায় যেন বিশ্বকল্লোলের ক্রত-স্পন্দন চলিতেছে—আমার হৃদয়ের সহিত মানবজগতের গোপন মিলনের যেন একটা রাস্তা খুলিয়া গিয়াছে ! কেমন এক অনাস্বাদিতপূর্ণ আনন্দশিহরণ আমাকে মুহূর্হঃ চঞ্চল করিতে লাগিল ! সেই দিন হইতে প্রভাহ পুণ্যচন্দনের ভিতর দিয়া, তক্তিকরা হৃদয়ের অলস্র ধারা আমার মধ্যে নূতনতর জীবন গড়িয়া তুলিতে লাগিল। বিধবা বধন সমস্ত অন্তরধানি আমার উপর কেন্দ্রীভূত করিয়া, শিবজ্ঞানে আমাকে পুণ্যচন্দনরঞ্জিত করিত, তখন বিশ্বের অজ্ঞাত এক গোপন পথে ঠিক তাহার অন্তর্জ্যোতিরই অমূরুপ শিখা আমার এই কাঠিন্তের আবরণে বীণ্ডি পাইত—তাহার আলোকে স্পষ্ট পড়িতাম, উজ্জ্বল অক্ষরে আমার পাবাণ-পঙ্করে ক্ষোদিত রহিয়াছে—শিবোহং শিবোহং।”

সহসা ধামিয়া হরিহর বাবু আমার দিকে এমনই ভাবে চাহিলেন, যেন এত দিন আমাকে বিশেষভাবে সমাদর করেন নাই বলিয়া তিনি কতিগ্রস্ত ! তাহার সেই চাহনিটিকে আশ্রয় করিয়া এক লক্ষে আমি অনেকটা বড় হইয়া উঠিলাম।

বিস্ফারিত নভদৃষ্টিতে খানিকটা ভাবিয়া হরিহর বাবু প্রচার করিলেন—“নাঃ, আমাদের মণীনের ভেতর জিনিষ আছে।” পরে হরেনকে বলিলেন—“কি বল, হে হরেন ? তোমরা এটা থেকে কি বুঝেছো বল দেখি ?”

হরেন বলিল—“আমি শু দেখছি এই, নদীর উৎপত্তিটা কেমন করে হয়, সেই কথাই বিজ্ঞানসম্মত করে, গুণচ গল্পচ্ছলে এতে দেখান হচ্ছে আর কি।”

তাড়াতাড়ি হরিহর বাবু বলিলেন—“আহা হা, তা’ কেন ? গোড়াতে সেটুকু আছে বটে, কিন্তু শেষ দিকটা যে একটি নিগূঢ় ভাবের ভেতর দিয়ে পথ করে’ চলেছে, তা’ দেখতে পাচ্ছ না ? সমস্ত রচনাটাই যে বীণ্ডিমত রূপক গো !”

“রূপক !” কৌতূহলী সভাসদবৃন্দ সবিস্ময়ে প্রতিধ্বনি করিল।

“তা’ নইলে আর এককণ বলছি কি ?” বলিয়া হরিহর বাবু বিজ্ঞাননৌচিত হাতের সহিত আমার দিকে একবার আঙে চাহিলেন।

আমি ইতোমধ্যে অনেকখানি গম্ভীর হইয়া পড়িয়াছিলাম ; হৃদয়ঃ গাম্ভীরা-টুকু বগাসাধা বজার রাখিয়া মুহূহান্তে মুখ নত করিলাম। আমার এই বিনয়-

ব্যবহারের প্রকৃত কারণ যে কোনখানে, আশা করি, তব্জ পাঠক আমার কৈফিয়ৎ না লইয়াও তাহা বুঝিতে পারিবেন । হরিহর বাবু বলিলেন—“জীবাশ্মার স্বর্গচ্যুতি ও পুনরায় অস্থগীলন-ফলে শিবজ্ঞানভের কথাই এ প্রবন্ধে গল্পছলে বর্ণিত । প্রথমতঃ দেখ, জীবাশ্মার পৃথক সত্তা গোড়াগুড়ি থেকেই কিছু আর থাকে না, আকাঙ্ক্ষাই আশ্মার পতনের কারণ—শাস্ত্রের কথা এ সব ; এখানেও দেখ, প্রেমমোহে শিলাখণ্ডের পতন ঘটেছে । সে প্রেম আবার জন্মেছে কি করে ? না—ক্রীড়াচ্ছলে । Goldsmith বলেছেন—If you place your affection on trifles at first that trifle will at last become your most serious concern—নদীস্বন্ধে শিলারও ঐ অবস্থা ; ঘটেছে আর কি ! এখানে ঐ তথ্যটি পরিষ্কৃত । এ দিকে, ঐ যে নদী, ওটা হচ্ছে জাগতিক মায়ার রূপক ; রবি বাবুর কবিতার পড় নি—

“ভুবন হইতে বাহিরিয়া আসে ভুবনমোহিনী মায়

মৌবনভরা বাহুপাশে তা’র বেঠেন করে কায়া”—

ঐ মায়ার বাহুপাশে আবদ্ধ হয়েই দিন দিন আশ্মার অবনতি হ’তে থাকে, কায়েই নদীস্বন্ধে নিশ্চেষ্ট হ’য়ে শিলাখণ্ড দিন দিন ক্ষয়প্রাপ্ত হ’য়েছে—হিল দেখছ কেমন ? তা’রপর, শিলাখণ্ড উন্নত হ’তে আরম্ভ করলে কি করে ? না—তা’র মৎস্বস্বন্ধে অপরের বিশ্বাসের জোরে ! বিধবা যখন তা’কে শিবজ্ঞানে পূজা করতে লাগলো তখনই তা’র মোহ ছুটে গেল ; সে বুঝলে যে সে স্মৃৎ-স্থঃধের অতীত—বুঝলে, যে সে বাস্তবিকই শিব ! এই যে শেষ কথা কয়টি, এ বড় খাঁটা কথা ; আমি যে বড়, এ কথা যখন পাঁচ জনে নিজেদের বিশ্বাস ঢেলে বুঝতে চায়, তখন তা’দের সেই বিশ্বাস আমার মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে আমাকে ঐ বড় হবার জন্তে যে সাধনা, তা’রই পথ দেখিয়ে দেয় ।” হরিহর বাবু এইরূপে অনর্গল ব্যাখ্যা চালাইতে লাগিলেন এবং উমেশ প্রভৃতি মধ্যে মধ্যে প্রশ্ন করিয়া সে ব্যাখ্যাকে অনেকদূর অগ্রসর করিয়া দিল ।

এ ব্যাখ্যা আমার মধ্যে কাণ করিল অনেক ; আমার মন যেন একেবারে পাখা মেলিয়া আশার রাজ্যে উড়িয়া গেল । উমেশ প্রভৃতি কতটা উপকৃত হইয়াছিল জানি না ; কিন্তু হরিহর বাবু ঐ যে বলিলেন, অপরের বিশ্বাসে মানুষ বড় হয়, ইহার সত্যতা তাহার সেই প্রশংসাভাষণ দৃষ্টি হইতে মর্মে মর্মে অনুভব করিয়া সহসা আমি তাহার ভক্ত হইয়া উঠিলাম । মনে হইতে লাগিল—“ঠিক, সবই ঠিক, এই ব্যাখ্যাই আমার প্রবন্ধের উদ্দিষ্ট ছিল বটে !”

এই ঘটনার পর হইতে, উম্মেদ হরেন প্রভৃতিও যখন আমাকে কতকটা সন্ত্রাসের দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল, তখন আমি অন্যায়দেই ভাবিয়া গইলাম যে রবি বাবু হইতে আমার আর বেশী বিলম্ব নাই।

(৫)

প্রথম সংখ্যা পত্র বাহির হইয়া গিয়াছে; সভা করিয়া, নামভাদা সমালোচক ও সম্পাদকবর্গের নিকট যথারীতি পত্র পাঠাইয়াছি; এখনও কোন সমালোচনা বাহির হয় নাই—তাহারই প্রতীক্ষার আছি। হরিহর বাবুর অভিমত পাইয়া আশা মিটে নাই; ইচ্ছা আছে, ছাপার অক্ষরে কাগজে কাগজে যখন আমাদের রচনামাহাত্ম্য প্রচার হইবে তখন দেশের বিত্ত-মণ্ডলীকে অতর্কিতভাবে বুঝাইয়া দিব, এই অবজ্ঞাত আমাদের উপর দেশের কতখানি গৌরব নির্ভর করিতেছে!

পরীক্ষা শেষ হইয়া যাওয়ার আজকাল সময়েরও অভাব নাই, স্মৃতিঃ প্রভাবে সন্ধ্যায়, নিশীথে দ্বিপ্রহরে, রীতিমত প্রকৃতি-পরিদর্শন আরম্ভ করিয়া দিয়াছি। তারকামাণার ভিতর নিতানূতন রহস্য দেখি, সমীরপ্রবাহে সৃষ্টির আনিয়ুগের গন্ধ পাই, প্রাতঃসৌন্দর্য্যে শত শত অনাবিল্লত বিশ্বকাহিনীর খণ্ডচিত্র দেখিয়া অবাক হইয়া যাই! মাথার ভিতর যেন কল্পনাকীটরা একেবারে মোরসী পাড়ী লইয়া বসিয়াছে।

হরিহর বাবুর সহিত যে অনেক বড় বড় সম্পাদকের বিশেষ আলাপ ছিল, তাহা তাঁহার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিবার শক্তি দেখিয়া পাঠকরা সম্ভবতঃ অসুস্থমান করিতেই পারিয়াছেন। এ অবস্থায়, তাঁহার উদ্ভবে এমন কতকগুলি অভিমত আদায় হইয়া গেল দ্বাহাতে আমাদের পত্র ও তাহার লেখকবর্গ টেকিয়া যাইবার যোগ্যতালাভে সমর্থ হইল। ছ' পাঠখানা কর্তব্যপূরণ কাগজ অবশ্য আলাপের খাতির রাখা করে নাই—এবং কতকগুলি পত্র (যাহাদের নিকট এ পক্ষ অপরিচিত) বেশ তীব্র বিদ্বেষই করিয়াছিল। আমার কবিতাসম্বন্ধে কোন সমালোচক বলিয়াছিলেন—“খেজুর-রসের ভাঁড় দেখিয়া লেখকের মনে যে ভাব জাগিয়াছে তাহাতে আমাদের সহানুভূতি নাই—আমরা হইলে লিখিতাম, ‘খেজুর-গাছের বক্ষমুখা আকর্ষণ-পান-ভৃগু-অধর, রাঙ্গুনে-কঁদি ভাঙুলোর দ্রুদস বেয়ে পড়ছে ধারা’ অথবা ‘আকর্ষণ-পান-ভৃগু-অধর, ভাঙমুখে কেনিবে ওঠে পূর্ণিম্বের স্তব্ধ হাসি’—এবং তাহা হইলে বোধ হয় সভা কথা বলা হইত।” বুঝিলাম, সমালোচক হয় ‘চাপক্য-ধর্ম্মী’ আর না হয় ‘ভাড়িখোর’। বলাবাহুল্য,

তাঁহার প্রস্তাবে হাসি চাপিতে পারি নাই । ইনি বোধ হয় নূতন সমালোচনা করিতে শিখিতেছিলেন ।

আমরা ‘কী’ আর ‘মতো’ সম্বন্ধে কিন্তু দেশের অনেক বড় বড় লেখক বার বার আপত্তি জানাইলেন । আমি মনকে বুঝাইলাম, “যাহারা কেবলই প্রচলিত বিধি মানিয়া চলে তাহারা” ভাবাকে “বহন করে মাত্র, তাহাকে অগ্রসর করে না”—এই সহজ কথাটা যাহারা বুঝেন না তাহারা আমার প্রতিভাও হৃদয়ঙ্গম করিতে অক্ষম ; আমার প্রতি তাঁহাদের এই অবিচারের উপযুক্ত শাস্তি আপন বিশেষত্বকে অটল রাখা ও তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত না করা । হয় যে, তখন যদি বুদ্ধিমান, প্রতিভা ঐ তুচ্ছ আপত্তির কারণ দূর করিয়াও আপনাকে কুটাইয়া তুলিতে পারে এবং আঘাত না করিয়াও আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে !

সে এক দিনের একটি মেঘনির্মুক্ত হ্রদের প্রভাত । শুধু প্রভাত বলিলেই যথেষ্ট হয় না, কেন না আমার হৃদয়ঙ্গমদী বধন কল্পনার জোয়ারে কানার কানার পূর্ণ, সেই সময়ের প্রভাত সেটি । এ হেন প্রভাতে ক্রুদ্ধে আমি বসন্তের বাকী বেড়াইতে গিয়াছিলান । বসন্ত আমা হইতে ১০ কংসরের ছোট ; একই স্থানে ভিন্ন ভিন্ন পাড়ার আমরা থাকি । বেড়াইতে যাইবার কারণ আর কিছুই নহে—একখানি বই ছাপাইয়াছিলাম, হরিহর বাবুর সুপারিশে একজন প্রতিষ্ঠাবান লেখক তাহার তুমিকা লিখিয়া দিয়াছিলেন । বক্তৃত্তকে তত্বকে সোণার অলে নাম লিখা সেই বইখানি তাহাকে উপহার দিবার প্রয়োজন ছিল । প্রয়োজন এই সত্ত্বে, সে ছোঁড়াটা আমার রচনাসম্বন্ধে চিরদিনই উদাসীন ছিল ; প্রশংসা ত করেই নাই, অধিকন্তু কেমন একটা অবজ্ঞার সহিতই সে সমস্ত গ্রহণ করিত ।

বহিধানা হাতে দিতেই বসন্ত বলিয়া উঠিল,—“ ‘উৎসঙ্গ’ পত্রে আপনাদের নূতন কাগজের সমালোচনা বেরিয়েছে যে”—

“কই—কই ?” আমি সাগ্রহে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম । ‘উৎসঙ্গ’ খুবই একখানা নামজাদা কাগজ, সুতরাং আমার রচনাসম্বন্ধে বসন্তের মত অবজ্ঞাই পরিবর্তিত হইয়া থাকিবে ।

গম্ভীরভাবে বসন্ত কাগজখানা আমার হাতে আনিয়া দিল । সে না কি শুদ্ধ ঐ সমালোচনার লম্বট নগদ আট আনা দিয়া উহা ক্রয় করিয়াছে ! শুকমুখে, দৃষ্টি মন্তকে পাঠ শেষ করিয়া ব্রাহ্মণে বলিলা—“আমার উপর কি তোমার রাগ আছে ?”

বসন্ত বলিল—“বিস্ময়াজ্ঞা না; রাগ আছে, আপনার কতকগুলো গোয়ার্ত্ত্বমির উপর; আপনার যশস্কার উপর; আপনার অশ্রুস্রবিতার উপর। ইহাদের প্রভাব হইতে যখন আপনি মুক্ত হইয়া পাড়াইবেন, তখন আমি আপনার পায়ের ধূলা লইব।”

আমি অত্যন্ত চট্টা উঠিলাম; বলিলাম—“আমার জীবনগতি তোমার ভক্তির মুখাপেক্ষী না হইলেও চলিবে।”

“তা’ জানি” বলিয়া বসন্ত ক্ষুণ্ণচিত্তে নীরব হইল।

বাড়ী আসিয়া সেই দিনই আরও কয়েকখানি কাগজ পাইলাম। প্রত্যেক পত্রেই কাগজের সমালোচনা! প্রত্যেকটি অক্ষরের অন্তরালেই নিপুণ-হস্তে তীক্ষ্ণদার বিদ্রূপবাণ—যথো যথো হাস্তোচ্ছ্বাস; ব্যঙ্গ তীক্ষ্ণ, অবজ্ঞা ক্রুর! প্রাণের অবস্থা অত্যন্ত মরিয়া হইয়া উঠিল—“দিক্ গালাগালি, যত পারে।

মনে হইল, উমেশ কি করিতেছে দেখিয়া আসি; তাহার অবস্থাও যখন আমারই অনুরূপ তখন আমার সাধনা এখন তাহারই কাছে।

এ কি! উমেশ কবিতা লিখিতেছে! কখনও যে তাহাকে কবিতা লিখিতে দেখি নাই! এ অবস্থার কবিতা বাহির হয়? পশ্চাৎ হইতে ‘আচম্কা’ কাগজ-খানা টানিয়া লইয়া পড়িলাম :—

“চলিল ছাড়িয়া আজ তব পাপপুরী
ভিখারীর বেশে দাস, অরি মাতৃভাষা,
নিদারুণ অপমানে! সমালোচকের
ঘোর অভ্যাচার কথা কহিল বাখানি’
সর্ব্বজীবে! যা’রে তা’রে বলিব ডাকিয়া
পরম অধর্ম্মচারী ইহাদের দল!”

বড় ছঃখেও হাসি আসিল; উমেশ কিন্তু আমাকে দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল!
আহা বেচারী!

সমালোচকবর্গের উপর তখন এত রাগ হইয়াছিল যে, সম্মুখে কাহাকেও পাইলে হয় ত হাতাহাতি বাধাইতাম। এত আয়োজন, এত উন্নাস, এত আশা—
তাহারা কি অন্ধ! প্রত্যেক অক্ষরের ভিতর দিয়া ‘ফুলঝুরি’ প্রবন্ধমালায় আমাদের কত সভার উন্নাস, কত উদ্যমের ছবি ফুটিয়া উঠিতেছে, তাহা কি তাহারা দেখিতে পায় না? উমেশের চোখের জলে ছঃখ ভুলিলাম, সহসা লুপ্ত গর্ষ কিরিয়া অঙ্গিল, সমালোচকদিগকে শান্তি দিবার অস্ত্র লেখনীধারণ করিতে ছুটিলাম।

বাড়ী আসিয়া দেখি—সর্ব্বনাশ ! টেবিলের পার্শ্বে অগ্নিকুণ্ড করিয়া পতি-
গতপ্রাণাঃ পত্নী ‘ফুলফুরিতে’ আশ্রম লাগাইয়া দিয়াছেন ! ব্যাপার বুঝিতে
বিলম্ব হইল না ; কোন হৃদয়সিক সমালোচক লিখিয়াছিলেন—“বৃদ্ধা ঠান্ডির
সহিত শিলাখণ্ডকে সহমরণে না পাঠাইয়া, কাগজ বাহির করিবার পূর্বে যদি
লেখকই স্বয়ং ঘাইতেন, তাহা হইলে এই ১০ মাস ধরিয়া বঙ্গসাহিত্যকে গর্ভবরণা
ভোগ করিতে হইত না এবং তাঁহার কীর্তিও অধিকতর হ্রাসীয় হইত ।” হৃদয়
হুঁষ্টা পত্নী সেইট পড়িয়া বসিয়াছেন এবং স্বভাবতঃই সমালোচকের ব্যবস্থা
মনোনীত না হওয়ায় স্বামীর পরিবর্তে তাঁহার দত্ত অপরাধের মূল ঐ
রচনাবলীর চিতাসঙ্কার ব্যবস্থা করিয়া সমালোচক মহাশয়ের মন রাখিতেছেন ।

দেখিয়া স্বীর উপর মহা চটয়া গেলাম ; সাথে কি বস্ত্রমরাবু বলিধাছেন
“স্ত্রীলোকের বুদ্ধি মালার মাপে” ?

(৬)

এই কাণ্ডের পর উপকার হইল কিন্তু অভাবনীয় ! নিম্মা ও প্রণঃসার
মাকথানে পড়িয়া আমার বহিখানা হ হ করিয়া কাটিতে লাগিল । হরিহর বাবুর
পরামর্শে কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন দিলাম—“বাহ্যর রচনা লইয়া দেশের
খ্যাতনামা পত্রসমূহে গভীর আলোচনা চলিতেছে ; বাহ্যর সানাজ ‘কী’ ও
‘মতো’ লইয়াও সুপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকবর্গ দীর্ঘ দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়া ফেলিয়াছেন,
বাহ্যর রচনার দোষগুণ বিচারে বর্ত্তমানে কোন মীমাংসাই হইল না, সেই
প্রতিভাবান মূলধক ও কবি ঐক্ল মণীন্দ্রনাথ গুপ্তের ‘ভারাবাজী’ ! পাঠকবর্গ
ইহার সর্ব্বেকুলের বর্ণনায়, চক্ষুর সম্মুখে সর্ব্বেকুল দেখিতে পাইবেন ।”

এই সনরে সহসা একটা কাণ্ড ঘটয়া গেল, বাহাতে আমার কবি-জীবনের
তিষ্ঠিমূল আচর্ষিতে টলমল করিয়া উঠিল ; তাহা বলিবার জরুই, আজ জীবনের
এই অধ্যায়ট প্রকাশ করিয়া বসিয়াছি ; তাহা, আমার চিন্তাধারাকে ভিন্নপথে
পরিচালিত করিয়া দিয়াছে ।

প্রাতঃ-ভ্রমণ-পথে ‘ফুলফুরি’ অফিসে আসিয়া দেখিলাম, টেবিলের উপর
আমার শিরোনামা লিখা একখানি পত্র প্রবন্ধসমূহের পার্শ্বে পড়িয়া আছে ।
খুলিতেই স্বাক্ষর দৃষ্টিতে পড়িল—‘বসন্তকুমার রায়’ ! বসন্ত—বসন্ত ? অত্যন্ত
কোতুললী হইয়া ভাঁজ খুলিয়া পড়িলাম :—

—প্রকাশ্যদেশ—

একটি কবিতা পাঠাইতেছি—আমার সর্ব্বপ্রথম রচনা । ‘ফুলফুরি’তে প্রকাশ

করিবেন, এ আশা আমার নাই এবং ততটা উদারতা আপনার নিকট প্রত্যাশাও
করি না। অল্পরোধ, সমস্ত কবিতাটি পাঠ করিয়া আমার ভ্রম সার্থক করিয়া
দিবেন। ইতি—

মিনীত—বসন্ত

বসন্ত কবিতা লিখে ? বসন্ত লেখক ? কৈ সে কোন কাগজে ত লিখে নাই !
বা রে মজা ! পত্রখানির তলায় ‘পুনশ্চ’ দিয়া সে লিখিয়াছিল—“এই আমার
সর্বপ্রথম মনের কথা, সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ আদ্যাত ; যদি পারেন, মার্জনা
করিবেন—না পারেন আরও উত্তম।” কবিতাটি পড়িলাম :—

আসরে অবতরণ।

(১)

ছুটিস্ নে আর, ছুটিস্ নে আর, ওই আলোরার পিছে পিছে
হৃদয় আমার ! কেন্ রে এবার কেন্—
মতের প্যাঁচে জড়িয়ে পড়ে কাল কাটাচ্ছি মিছে মিছে
প্রত্যাহ কি পাচ্ছি নি তুই টের ?
কোথায় মিথো জানান্ তুবা ? শীতল বারি কে দেয় ঢালি’ ?
এ যে মরুর দারুণ মরীচিকার .
সলিল-ভ্রমে এগিরে চলিস্ ; দেখিস্ শেষে ‘শুকনো বালি’
অলাছে তীর ‘রবির’-কিরণ-শিখায় !
‘আশ্চর্য্য এই, ‘রবির’-কিরণ উর্ধ্ব করে হৃদয়-কেন্দ্র
স্বর্ণ ফলায় ; জড়ের প্রাণ ও নাচার ;
কিন্তু তাহার কিরণ-তপ্ত ‘বালুর’ নীপ্তি পোড়ায় নেত্র,
হাঁকিয়ে উঠি এঁদের ‘সোণার খাঁচার’ !

(২)

ওরে আমার বস্ত্র হৃদয় ! বনলো না তোর এঁদের সঙ্গে,
চল ফিরে চল বনের দিকেই যাই—
কাজ নেই তোর নৃত্যভঙ্গ ছন্দলীলার জলতরঙ্গে,
এটার ভেতর আর সে হৃদয় নাই !
বর্ষে বর্ষ মিলিয়ে কেবল কর্ণটাকেই তৃপ্ত করা,
এই আদর্শে কাব্য এঁদের তৈরি ;

এ নর কবির গভীর মন্বন বিশ্ব-ছন্দর-গলিরে-গড়া,
 পাঠকদের বন্ধ না এ—বৈরী ।
 এসে লক্ষ্য, পাণ্ডিত্যটাই ছুতোয় নাতায় জাহির করা,
 মনের ভাবটা, 'দেখ তোমরা মশজ্ঞান
 কত রকম বই পড়েছি,'—ছন্দ দিয়ে ছন্দ গড়া
 মথুরে হয়ে সেটাই করি' বর্জন !

(৩)

ঘাত্যার দলের কংস যখন জুড়ীর সঙ্গে গান গায়,
 হেসেই এঁরা গড়িয়ে পড়েন মজার—
 কাদতে কিন্তু পরের দুঃখে, রাখেন তীক্ষ্ণ সতর্কতায়—
 নাচের তালটা বিশেষভাবে বজায় !
 গুণের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি, শক্তির চাইতে গর্ভ বেশী,
 কারণ, সেটা আভিজাত্যের লক্ষণ,
 'নূতন কিছু' বলবার ক্ষেত্রে একটা বিঘ্ন রেবারেঘি
 সত্যের মাথা নিত্যা করছে উদ্ধণ !
 "আমার লেখা, আমার লেখা" এই গুমরেই সবাই মাতে
 আনন্দসন্ধান নেই কারো এক বিপ্লু—
 প্রমাণ চাহ ? দেখতে পাবে কেতাব খুলেই প্রথম পাত্তে,
 ডিক্শন-করা ভূমিকার এক সিদ্ধ !

(৪)

'কী' আর 'মতো' অন্তরুটো নগণ্য তার সম্বন্ধ নেই
 বৃত্তে এটা হয় না তবু কষ্ট,
 অভিযোগের ভেতর দিয়ে ছুটেছে 'বুনো-মোবের-গো' এই
 প্রমত্ত এক দাস্তিকতার স্পষ্ট !
 কেউ বা বলে নির্ভাবনার চালিরে কলম ভীষণ তোড়ে,
 বিনিরে বিনিরে লিখে যাচ্ছেন গল্প—
 দেখছি তাঁদের চেষ্টা-করা শুদ্ধী-ভরা তাবার মোড়ে
 গন্ধ ছাড়ছে অশ্রুপ্রাসের মত্ত ।
 ত'ড়ির সাক্ষী সমালোচক (ক্যাজ নেই আর খুলে বলার
 যে, তাঁহার। গ্রন্থকারের মিত্র)

পরম্পরের কেতাব পড়ে রায় দিচ্ছেন উচ্চ গলায়,
“মধুর—নূতন—শ্রেষ্ঠতম চিত্র !”

(৫)

হার রে মোড়ী—এরি করে’ এঁড়ে গরুর ল্যাঙ্গ ধরে ভুই
দেশের ছনয়-স্বর্গে চাহিস্ নখল !
বুঝিস নে, এ কম্প্রদান হুমকী খেয়ে পড়তে শুধুই
আসল-ব্রমে ক্রয় করা এ নকল ?
নয় সে শুণে, পাটোয়ারী এই বুদ্ধিতে তোর গ্রন্থ বিকাশ
ভূজং দিয়ে লভিস কিছু বিত্ত,—
এতেও তোদের গর্ভ আসে ? কপট এহি বাণীর সেবায়,
মর্মে মর্মে যার না মরে চিত্ত !
বিন্দু দূরদৃষ্টি যদি থাকতো তবে বুঝে নিতিস্
গর্ভ সে নয়, স্বাবলম্বনশক্তি—
মানব-কৃপয় তারই কাছে অসম্বোচেই লুটিয়ে পড়ে
অজলি দেয় ছনয়-ভরা ভক্তি ।

(৬)

গান গেয়ে চল আপন মনে মধুর যদি লাগে কারু,
আসবে ছুটে নিজেই সে তোর কাছে ;
হয় যদি তা’ হারী হবার, স্ততির মাথায় মেরে ঝাড়ু
ঘাবেই টেকে মানব-সমাজ-মাঝে ।
ছিঁড়ে ক্যাল ঐ ছবির বাহার, বিজ্ঞাপনের রঙীন নিশান,
‘সোনারজলে’ ঢাকিস নে আর লজ্জা ;
পুরুষ টোপর সোনার ফুলের, স্ত্রীলকটা সে শিরালকটাই
বিষপত্র—কি হবে তার সজ্জা ?
প্রতারণায় বুগই এটা ?—মিথ্যে কথা !—কিন্তু যদি
সত্য তা’ হয়, সে সত্য নয় সূতের ;
ফিরিয়ে নিতে হবেই তবে নিদারুণ এই শ্রোতের গতি
সংঘাতে এক নূতনতর সুপের !

(৭)

কিন্তু রোসো—বুঝছি আমি অন্তর্যামী পাঠকবর্গ ;
 ‘এই লেখকের গর্ভ যে নয় একটুখানি নেহাৎ,’
 এমনি একটা তর্ক নিয়ে কর্ছ তোমরা আশ্চর্য্যকর্ক,
 এবং ভাবছো, ‘ইনিই বড় কর্ছেন নাকো রেয়াৎ’
 ধরোছো ঠিক—তবে কি না মনস্তবে কারণ দেখায়
 (অতি সরল, এবং তাহা অতি চমৎকারও)

দেখলে গর্ভ একের মধ্যে, নিরুটে যে ভরই সে পায়
 শ্রেষ্ঠ কিন্তু হলে অপর আগবে গর্ভ তারও ।

প্রশ্ন এখন—কি সে বৃত্তি, যাহার হৃদয়বিধানবলে,
 আপনাকে আজ ভাবছি আমি এঁদের শ্রেষ্ঠ সমান ?

আছে ডায়া বৃত্তি আছে অকাটা এক ইহার তলে
 একটিমাত্র কথায় তাহা দিচ্ছি করে, প্রমাণ :—

(৮)

তোমরা জানো সকলেই যে কারণ ছাড়া হয় না কার্য্য,
 তবেই দেখ, গর্ভ যখন আগ্ছে
 তখন মনস্তবের হৃদয়ে শ্রেষ্ঠ হওয়াই আনিবার্য্য—

এও জলের মতন সহজ ; কেমন ? প্রাণে লাগ্ছে ?
 আরও ধর—বর্তমানের শ্রেষ্ঠ নীতিই যখন ‘সাম্য’

কোন সাহসে নিকনীর হব তখন স্পষ্ট ?
 কোন আনাদী নিরেট বোকার হবে যে তাই তখন কাম্য
 “ধাটো হওয়া”—অর্থাৎ করা নিজের আখের নষ্ট ?

আশা করি, খটকা কারো ইহার পরে থাকবে না আর ;

ধাকলে ক’রো এই কথাটি বিশেষভাবে স্মরণ—

অভিজ্ঞাত্যের লক্ষণ যেটি, সেই গরবের পরম বাহার

বক্ষে ধরে আসরে আজ কর্ছি অবতরণ !

শ্রীবসন্তকুমার রায় ।

— পাঠশেবে কিয়ংকালের ক্ষুদ্র এমন হইয়া গেলাম, যেন আমার জন্মের
 স্পন্দন একেবারে থামিয়া গিয়াছে—যেন সহসা কোন উচ্চ মঞ্চ হইতে
 মৃত্তিকা-পৃষ্ঠে পতিত হইয়া আমার বাক্শক্তি রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে—যেন চকিত

ইহার পর আরও বোলটি পংক্তিতে কবিতাটিকে এই ভাবে ছুটাইয়া তুলিলাম, যেন কোন জ্যোৎস্না-উৎস-মুখে উথলিয়া-পড়। সৌন্দর্য্য-রাজ্যের সীমায় আসিয়া অল্পতাপে লেখকের হুই চক্ষু জলে ভাসিয়া বাইতেছে—বাহিরকে সে যত আঘাত করিয়াছে তাহার প্রত্যেকটি কাটা তাহার নিজেরই বুকের ভিতর বিধির। বিধির। উঠিতেছে—সে অল্পভব করিতেছে, আঘাতের অর্থ আঘ-নিপীড়ন, উত্তেজনার পরিণাম অল্পশোচনা, দুগার প্রারম্ভিত ক্রমা প্রার্থনার। সর্ব্বশেষে তাহারই মুখ দিয়া বাহির করিয়া দিলাম :—

“সকল বিরোধ সকল গর্ষ নিভা আসছে খেমে

অনাদি এক অবিনশ্বর প্রেমে” ।

তাহাকে এই অপূর্ণ শান্তি দিতে গিয়া এ দিকে আবার নিজের দৈন্তও স্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল ; মনে হইতে লাগিল, তাহার তীব্র অভিযোগগুলির সর্ব্বাঙ্গে বাস্তবিকই যেন কঠোর সত্য জড়াইয়া আছে—নতুবা এতখানি তীব্রতা কি অকারণে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে ? রচনা শেষ করিয়া সমস্ত কবিতাটি আর একবার আগাগোড়া পাঠ করিলাম ; যথাস্থানে ‘বসন্তকুমার রাব’ নাম স্বাক্ষর করিবার সময় মনে হইল, যেন আমারই প্রাণের কথা উপর আর একজনের নামের ছাপ পড়িল ।

* * * * *

তিন বৎসর কাটিয়া গিয়াছে । এখন আর কোকিলের হৃদয় ‘ফুলকুন্ডিত’ রচনা করে না, কিন্তু ‘বসন্ত’ আমাকে বেরিয়া রাখিয়াছে । এখনও আমি ভুল করি, অপরাধ করি—কিন্তু তাহার ক্ষমতা দায়ী আমার অজ্ঞতা, বিজ্ঞতা নহে । এতদিনে আমি বুঝিয়াছি, যে প্রতিভা ভাবকে অগ্রসর করে সে প্রতিভা আমার নাই, সেইজন্য তাহাকে বহন করিয়াই আমি এখন চরিতার্থ । আমার দেশবাসীর আপত্তি যে অনাথাচরণকে উজ্জল করিয়া তুলে, তাহাকে অটল রাখিবার মত স্পর্ধা প্রকাশ করা আর আমি প্রয়োজন মনে করি না, এবং এরূপ মনে করাতেই যেন আমার আত্মদামন গরিমান্য হইয়া উঠে । বসন্ত বিধ ঢালিয়া ভিতরকার অমৃত অনাবৃত করিয়া দিয়াছে । কেমন করিয়া আমার সহিত তাহার মিলন হইল, তাহা আর বলিব না ; শুধু এইটুকু বলিতে চাহি যে, সে তাঁহার কথা রাখিয়াছিল—অন্ধরে অন্ধরে রাখিয়াছিল । সে একটি আশ্চর্য্য চরিত্র !

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ ।

কিশোরীচাঁদ মিত্র।

কিশোরীচাঁদ যখন নাটোর মহকুমার তার গ্রাম হরেন তখন বোয়ালিয়া ও দীঘাপতিয়া দুটো প্রধান নগরের মধ্যে কোন স্থান পথ না থাকায় উক্ত নগরবাসিগণের বাতাসাঘের নিত্যস্থ অসুবিধা ছিল। কিশোরীচাঁদ এই অসুবিধা নিবারণার্থ কেরী কণ্ড কমিটির নিকট একটি প্রস্তাব পথনির্মাণের জন্য আবেদন করেন ও আত্মনামিক ব্যয়নির্দেশ করিয়া দেন। কিন্তু উক্ত কমিটি অবিলম্বে এই লোক-হিতকর প্রস্তাবের অনুমোদন না করিয়া অসুস্থকালে ও আলোচনার সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। কিশোরীচাঁদ এই বিলম্ব দর্শন করিয়া তাহার বন্ধু প্রসন্ননাথকে এই বিষয় জ্ঞাত করাইলেন। প্রসন্ননাথ তৎক্ষণাৎ (১৮৫০ খৃঃ অব্দে) কিশোরীচাঁদের দ্বারা প্রকাশ করিলেন যে, যেহেতু দীঘাপতিয়া হইতে বোয়ালিয়া পর্য্যন্ত একটি বিস্তৃত পথ নিত্যস্থ অসুবিধা ও জিলার অত্যন্ত দলদলকর বলিয়া বোধ হয় এবং সংগৃহীত অর্থ ও সরকারের প্রতিক্ষিত সাত হাজার টাকা এই পথ নির্মাণের জন্য যথেষ্ট নহে, তিনি স্বয়ং উক্ত পথ ও পথের সেতু প্রভৃতি নির্মাণের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিতে ইচ্ছুক। এই দান ধন্যবাদের সহিত গৃহীত হয় এবং উক্ত লোকসমাজ তুমাদিকারী এতদর্থে সর্বসম্মত প্রায় পক্ষাংশ সহস্র টাকা ব্যয় করেন। প্রথমে বোয়ালিয়া হইতে নাটোর পর্য্যন্ত উক্ত পথ নির্মিত এবং পরে দীঘাপতিয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়।

এই সময়ে নাটোরে বালকগণের শিক্ষার কোনও সুব্যবস্থা ছিল না। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড বেকিঙ্ক কর্তৃক নিযুক্ত স্পেন্সিয়াল কমিশনার মিষ্টার স্যাদাম মকঃসলে শিক্ষাবিস্তার-বিষয়ক রিপোর্টে যে কথা প্রকাশ করেন তাহাতে দেখের নিত্যস্থ শোচনীয় অবস্থা প্রকটিত। তখন শতকরা ৮ জন বালকও বিদ্যালয়ে প্রেরিত হইত না এবং দ্বাভায়া বিদ্যালয়ে বাইত তাহার কিরূপ শিক্ষিত হইত বুঝাইবার জন্য এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, বিদ্যালয়গামী ছাত্রগণের বয়স গড়ে ৫ হইতে ১০ বৎসর এবং বিদ্যালয়ভ্যাগী ছাত্রগণের বয়স ১৫ হইতে ১৬ বর্ষ মাত্র এবং শিক্ষকগণ সরলচিত্ত হইলেও নিত্যস্থ দরিদ্র ও বিদ্যাহীন, তাহার তাহাদের গুণ ও আশার অসুখারী ব্যবসায় বলিয়া শিক্ষকতাপ্রেরণ করিতেন এবং তাহাদের মহৎ ব্রতসম্বন্ধেও অত্যন্ত উদ্দাসীন। উক্ত রিপোর্ট প্রকাশিত হইবার পর রাজশাহিতে একটি জিলা স্কুল স্থাপিত হয় এবং ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে বাবু লোকনাথ মৈত্র কর্তৃক রানপুর বোয়ালিয়ার একটি ইংরাজী-বাঙ্গালা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

কিন্তু নাটোরবাসিগণের পুত্রদিগকে শিক্ষা দিবার কোন সুযোগ ছিল না। বাহারা আপন আপন পুত্রদিগকে গ্রামপুরে রাখিতে পারিতেন তাহারা সম্ভ্রানদিগকে যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষা দিতে পারিতেন। বাহাদিগের সে ক্ষমতা বা সুযোগ ছিল না, তাহাদিগের পুত্রগণ নিরতম শিক্ষাও প্রাপ্ত হইত না। কি ভয়ানক অবস্থা ! সমাজে অজ্ঞতার সহিত সর্ব্বপ্রকার পাপ ও অনাচারও বৃদ্ধি পাইতেছিল।

নাটোরের অধিবাসিগণের এষ্ট প্রধান অভাব মোচনের জন্ত কিশোরীচাঁদ উক্ত স্থানে নিজ্বায়ে একটি বিদ্যালয় স্থাপিত করিলেন। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে ২৪শে জানুয়ারী তারিখে উক্ত বিদ্যালয় নবপ্রতিষ্ঠিত প্রেসবনাথ অ্যাকাডেমীর সহিত সম্মিলিত হয়। এই ঘটনা উপলক্ষে একটি মহতী সভার অধিবেশন হয়। বহু সম্ভ্রান্ত যুরোপীয় ও এতদেশীয় ব্যক্তিবর্গ তথায় উপস্থিত ছিলেন। কিশোরীচাঁদ উক্ত সভার সভাপতি নির্বাচিত হইলে নিম্নলিখিত সারবান্ বক্তৃতা করেন—

“ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা আমাকে সভাপতি পদে বৃত্ত করিয়া আমাকে যে সম্মান প্রদান করিয়াছেন তজ্জন্ত আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। যদিও আমার ইচ্ছা ছিল, আপনারা কোনও যোগ্যতর ব্যক্তির প্রতি এই ভার অর্পিত করেন, তথাপি আপনাদের প্রদত্ত এই কৰ্ম্মভার গ্রহণ করিতে আমি পশ্চাৎপদ হইব না। আমি আপনাদিগকে অভিবাদন করিতেছি। যে বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার জন্ত আমরা অদ্য সমবেত হইয়াছি সেই বিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষিত স্বত্বাধিকারীর নামে, অদ্য যে বালকগণ ছাত্রশ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন তাহাদের নামে এবং সর্ব্বোপরি শিক্ষার নামে আমি আপনাদিগকে অভিবাদন করিতেছি। আমার বোধ হয়, শিক্ষাবিত্তারবিষয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করা দেশেহিতসাধনে ইচ্ছুক প্রত্যেক ব্যক্তির, বিশেষতঃ এতদেশবাসীর, কর্তব্য। লোকের সুখ এবং ঐশ্বৰ্য্যের সহিত শিক্ষা দৃঢ়রূপে সম্বন্ধ। আমি এমন কথা বলি না যে, আমাদের দেশ যে পাপসমূহাব্যাপ্ত আক্রান্ত শিক্ষাই সে সকলের একমাত্র মহৌষধ; কারণ, ভাব্যত নানা ব্যাধিতে পীড়িত এবং সে সকলের জন্ত নৈতিক ও শারীরিক উদ্ভাবন প্রক্রিয়াধিকার প্রয়োজন। আমি আরও জ্ঞাত আছি যে, এতদেশীয় অলবায়ু ও বহুশতাব্দী-ব্যাপী মুসলমানের অভ্যাসের আমাদের অধঃপতনে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে; কিন্তু আমার দৃঢ় প্রতীতি যে, অজ্ঞতা ও কুসংস্কার এই অধঃপতনের প্রধানতম কারণ। কেন জিন্দগধারণ জমীদারগণকর্তৃক উৎপীড়িত, মহাজনকর্তৃক হৃতদৰ্শন এবং নগরবক্ষকগণ কর্তৃক লাঞ্চিত হইতেছে? কেন চাপরাসীর আবির্ভাব সমস্ত গ্রামকে সন্ত্রস্ত করে এবং চাপরাসধারী অন্তর উপায়ে অর্থ আদায় করিতে পার?

কেন সর্পাঘাতে বা জলমগ্নে মৃত্যুবরণকর অহুসকানের জন্য প্রেরিত থানার বরকন্দাজ মফঃস্বলে এত ভীতি উৎপাদন করে এবং ঐরূপ মৃত্যু ইচ্ছাকৃত হত্যা বলিয়া প্রকাশ করিবে ও নির্দোষ গ্রামবাসিগণকে এই অপরাধের অমুচান ও অপরাধ গোপনজন্য ‘হুকুমের’ নিকট ‘চালান’ দিবে, এই বিতীষিকা দেখাইয়া তাহাদিগের নিকট হইতে উৎকোচ গ্রহণ করে? কারণ, জনসাধারণ তাহাদের অধিকারসম্বন্ধে অজ্ঞ। তাহাদিগের অধিকার কি শিক্ষা দাও, তাহারা সপৌরুষে অধিকার-প্রতিপাদন করিবে। তাহাদিগকে জ্ঞান বিতরণ কর, তাহারা বেকনের উপদেশ প্রত্যাখ্যাত করিবে। তাহাদিগকে বিদ্যাদান কর, তাহারা আর অত্যাচারিত ও পদমলিত হইবে না। অনেকে শিক্ষার বিরুদ্ধে এই যুক্তি উপস্থাপিত করেন করেন যে, ইহা জনসাধারণকে জীবনের স্বাভাবিক অবস্থার ও কর্তব্যের অহুপভুক্ত করিবে। কিন্তু আমি এই বৃহৎ জনসাধারণের জন্য সারবান্ এবং শিল্পবিষয়ক শিক্ষার সমর্থন করিতেছি—উচ্চ শিক্ষার নহে। আমি তাহাদিগকে কার্য্যের শিক্ষা দিতে চাহি; বাক্যশিক্ষা দিতে চাহি না। উচ্চবর্ণের বালকগণ, দ্বাংহারা আজীবন জ্ঞানচর্চায় অবসর পাইবেন এবং দেশবাসীর মানসিক উন্নতিক্রমে উচ্চ জ্ঞান ব্যবহৃত করিতে পারিবেন তাহাদিগের জন্য আমি উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করিতে চাহি; কিন্তু আমি সকল শ্রেণীর ব্যক্তিরই মনে সর্বসম্প্রদায়সম্মত এবং সকলের প্রয়োজনীয় ধর্ম ও নীতিবিষয়ক উদার ও উচ্চ ভাবসমূহ সঞ্চারিত করিতে চাহি।

“এই সকল ভাবে প্রবুদ্ধ হইয়া রাজশাহির ভবিষ্যৎ সুদিনের অগ্রদূত বলিয়া প্রসন্ননাথ আকাডেমীর প্রতিষ্ঠা আমি আনন্দের সহিত অতিবাদন করিতেছি। এই জিলার একজন সমৃদ্ধিশালী এবং প্রতাপাবিত জমীদার এই বিরাট আয়োজনের সহিত এই বিদ্যালয় রক্ষা এবং সম্বর্ধনের জন্য তাঁহার আয়ের এক অংশ বৎসে বিনিয়োগিত করিলেন তাহা দেশের এই ক্রমঃবর্দ্ধনশীল বিশ্বাসের আনন্দদায়ক ও শুভদায়ক উদাহরণের সমর্থন করে যে, দ্বাংহারা সেই আলোকে পথ চলিবেন তাঁহারাই বৃত্তিকা ধরিবেন। সুখের বিষয়, এ দেশে শিক্ষাবিস্তার-বিষয়ে দেশবাসীর পোষকতা আর অসামান্য ঘটনা নহে। কিন্তু বাবু প্রসন্ননাথ আর একটি প্রশংসনীয় এবং লোকহিতকর কার্য্যদ্বারা এই জিলার অধিবাসিগণের চিরস্থায়ী কৃতজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন। আমি নাটোর পথ-সংস্কারের কথা বলিতেছি। সেই পথনির্মাণের সমস্ত ব্যয়ভার—প্রায় পঞ্চত্রিংশ সহস্র মুদ্রা—তিনি একাকী বহন করিয়াছেন। এইরূপে তিনি অন্যান্য জমীদারবর্গের

সম্মুখে সমুদ্র বনানীভার উচ্ছল আদর্শ উপস্থিত করিয়াছেন । যদি পুরাতন কলহ লইয়া পরস্পর যুদ্ধবিগ্রহের বদলে অথবা এক বিদ্যা বা এক কাঠা জমী লইয়া বিবাহবিসম্বাদের পরিবর্তে এবং শ্রদ্ধা, নাচ, ও ‘নাম কা ওয়াত্তে’ পূজার অপরিমিত ধনব্যয়ের বিনিময়ে তাঁহার জমসাদারগণের কল্যাণকর এবং তাঁহানের বিন্যাস ও স্বাক্ষরের জন্য নিরন্তরপ্রস্রমশীল হীনাবস্থাপন্ন ও দরিদ্র রায়তগণের উন্নতিবিধারক বিষয়ে জমীদারগণ প্রতিযোগিতায় পরস্পর পরস্পরকে অতিক্রম করিতে চেষ্টা করেন তাহা হইলে আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, দেশের অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাব ধারণ করিবে । তাহা হইলে আমরা অন্নসময়ের মধ্যেই দেখিতে পাইব যে, প্রত্যেক জিলা তাহার নিজের বিদ্যালয়ের, নিজের চিকিৎসালয়ের ও নিজের অতিথিশালার এবং নিজের সত্রাইয়ের গর্ব করিতে পারিবে । তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইব, আজ যে সহস্র সহস্র ক্ষতচরণ যাত্রী ভাগীরথীর পথে ওলাউঠায় প্রাণত্যাগ করিতেছে, পণিপার্শ্বে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, প্রিয়তম পরিবারবর্গের আনন্দদায়িনী উপস্থিতি ও সেবার স্বযোগ পাঠিতে না—তাঁহার স্থানীয় পাশ্চনিবাসে আশ্রয় এবং উপযুক্ত বস্ত্র ও সেবা পাইবে । আমরা দেখিতে পাইব, প্রত্যেক গ্রামের দরিদ্র, কন্ন ব্যক্তি—কবিরাজগণের হুশিকিৎসা (!) হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া উপযুক্ত চিকিৎসা প্রাপ্ত হইবে । বেক্রপ ‘গঙ্গামারীর’ অনিবার্য ও কল্যাণকর প্রবাহ প্রাচুর্য্য এবং মঙ্গল্য বহন করে আমরা দেখিতে পাইব, সেটরূপ জ্ঞানের প্রবাহ দেশের প্রতি অংশ পূর্ণ করিবে, মানসিক ক্ষেত্র প্রাবৃত ও উর্বর করিবে ।”

এই প্রসঙ্গনাথ অ্যাकाডেমীতে অনেক ব্যক্তি শিক্ষিত হইয়াছেন এবং শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতেছেন ।

কিশোরীচাঁদ নাটোরে ত্রীশিকাবিস্তারের জন্ত ও যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন ; এবং প্রসঙ্গনাথ রায়ের সাহায্যে তথায় একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন ।

রাজশাহিতে শিক্ষাবিস্তারের জন্ত কিশোরীচাঁদের এই সকল চেষ্টা ও যত্ন শিক্ষিত ব্যক্তিগণের আন্তরিক প্রজ্ঞা আকৃষ্ট করিয়াছিল এবং তাঁহার দৃতিরক্ষাকন্নে করাচনারিয়ার জমীদার বাবু রাজকুমার সরকারের প্রযত্নে কিশোরীচাঁদের একখানি প্রতিষ্ঠিত রাজশাহি কলেজে স্থাপিত হইয়াছে ।

১৮৪২ খৃষ্টাব্দে কিশোরীচাঁদ নাটোরে একটি চিকিৎসালয় স্থাপিত করেন । রাজা আনন্দনাথ রায় বাহাদুর, বাবু প্রসঙ্গনাথ রায় প্রভৃতি স্থানীয় জমীদার ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ এই চিকিৎসালয়ের ব্যয়নির্বাহার্থ মাসিক টাঙ্গা প্রদান করিতেন ।

কিশোরীচাঁদ কেবল অর্থসাহায্য করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না, পরন্তু ইহার কমিটির সম্পাদক নিযুক্ত হইয়া পরিভ্রমসহকারে ইহার অশেষ উন্নতিসাধন করেন। এই চিকিৎসালয়ের প্রথম সর্বাংসরিক সভার ডাক্তার জে. আর. বেডফোর্ড কিশোরীচাঁদের অস্বস্তিত কাণ্যাবলী দেখাইয়া তাঁহাকে “Man of Ross” এর সহিত তুলিত করেন। ডাক্তার বেডফোর্ড একজন মহাশয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি এতদেক্ষে স্বাস্থ্যোন্নতিবিষয়ে যথেষ্ট পরিভ্রম করেন এবং সরকারে তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। দ্বিতীয় সর্বাংসরিক সভায় তিনি অনিবার্য কারণ বশতঃ উপস্থিত হইতে না পারিয়া ও দেশের স্বাস্থ্যোন্নতির উপায় নির্দেশ করিয়া কিশোরীচাঁদকে যে সুবীৰ্ঘ পত্র প্রেরণ করেন তাহার এক অংশে লিখিত ছিল—

“You have the proud satisfaction of feeling that you are in advance in that mighty social change which is now working in Hindustan and that the wheel of progress has received one of its earliest impulses from your hand”

অর্থাৎ “হিন্দুস্থানে যে মহান সামাজিক পরিবর্তন সংসাদিত হইতেছে আপনি তাহার অন্ততম অগ্রণী এবং উন্নতির চক্র বাহাদের হস্ত হইতে প্রথম আবর্তন-বেগ প্রাপ্ত হইয়াছে আপনি তাঁহাদের অন্ততম। এই কারণে আপনি গৌরব ও সম্ভোগ অস্বত্ব করিতে পারেন।”

নাটোরে উত্তম জলাশয় না পাকা তদুপায় রোগাধিক্যের একটি প্রধান কারণ জন্মদ্রব্য করিয়া কিশোরীচাঁদ অশেষ চেষ্টায় তদ্রূপ সন্ধান মহাশয়গণের সাহায্যে কয়েকটি জলাশয়-খনন করাইয়া নাটোরবাসীর কৃতজ্ঞতা অর্জন করেন।

কৃষি ও পুষ্ণপ্রদর্শনীয় উপকারিতা উপলব্ধি করিয়া তিনি নাটোরে একটি প্রদর্শনীর অস্থান করেন। ইহাতে অনেক যুরোপীয় ও এতদেশীয় সন্মান ব্যক্তি তাঁহাকে সাহায্য করেন।

কিশোরীচাঁদ নাটোরে যে সকল কল্যাণকর কার্যের অস্থান করেন তাহাতে মুর্শিদাবাদ বিভাগের তদানীন্তন কমিশনের মিঃ টি, টেলর, রাজশাহির ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এ, এ, হুইষ্টন, অজ মিঃ জি, সি, চিপ্ প্রভৃতি উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীরা ও স্থানীয় জমিদারগণ ও কৃষ্টিয়াল যুরোপীয় ব্যবসায়ীরা সহায়ত্ব প্রকাশ করিতেন। তাঁহার অপূর্ণ পরহিতৈষণা ও অসামান্য কর্তব্যশীলতা সকলেরই প্রশংসা ও প্রীতি আকৃষ্ট করিয়াছিল। বাস্তবিক কর বৎসরের মধ্যে কিশোরীচাঁদ রাজশাহি জিলার এত উন্নতিসাধন করেন যে তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। আজিও উচ্চশিক্ষিত

সদ্বাস্থবংশীর রাজকর্ষসারীরা প্রকৃতক্ষমতাসহ মফঃস্বলে প্রেরিত হইতেছেন ; আজিও মফঃস্বলের অবস্থা ঈশ্বিত আদর্শ হইতে বহু নিম্নে ; কিন্তু করজন এইরূপ অবিকলিত উৎসাহ, দৃঢ় অধ্যবসায় ও অক্লান্ত পরিশ্রমের সহিত দেশের উন্নতিসাধনার্থ যত্নবান্ ? আজ চতুর্দিকে দেখিতে পাই, তুলাদণ্ড লইয়া কার্য্য চলিতেছে । যতটুকু পরিশ্রমের আর্থিক মূল্য পাওয়া যায় তাহার, অধিক কেহ ব্যয় করিতে চাহেন না । সকল কার্য্যই স্বার্থের উপর প্রতিষ্ঠিত—মহুযাক্ষের উপর নহে । যে দেশে নিকাম সাধনার আদি মন্ত্র উচ্চারিত হইয়াছিল, সে দেশের অভিধান হইতে বুঝি বা “নিকাম” শব্দ বিলুপ্ত হয় !

১৮৫২ খৃষ্টাব্দে কিশোরীচাঁদ জাহানাবাদে স্থানান্তরিত হইলেন । জাহানাবাদ সবভিত্তিসন তখন ডাকাইতি ও অমাত্র ভীষণ পাপের লীলাক্ষেত্র ছিল এবং স্বদক্ষ কর্ষচারিগণের উপরেই এই মহকুমার ভার অর্পিত হইত । এই স্থানেও কিশোরীচাঁদ উপরত্ব কর্ষচারিগণের প্রশংসা ও স্থানীয় জমীদার ও প্রজাদিগের প্রীতি ও বিশ্বাস অর্জন করেন । কিশোরীচাঁদের নিয়োগসম্বন্ধে ‘প্রত্যাকর’ লিখিয়াছিলেন—
“আমাদের পরম বন্ধু কার্য্যকুশল নবোদ্যোগ ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র জাহানাবাদ এলাকাবণ্ডের ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন । তিনি হুগলী ও বর্ধমান জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্পূর্ণ ক্ষমতার উক্ত স্থানে কার্য্য নির্বাহ করিবেন ।”
‘প্রত্যাকরে’ই দেখা যায়, জাহানাবাদে কিশোরীচাঁদ নবপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন । তিনি বিদ্যালয়সংস্থষ্ট পুস্তকালয় স্থাপনের চেষ্টা করিলে “বিদ্যালয়দ্বাঙ্গী উত্তরপাড়ানিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু জরকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও কলিকাতানিবাসী প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয়দ্বারা” তাহাতে বিশেষ সাহায্য করিতে সম্মত হইলেন ।

কিশোরীচাঁদের অসামান্য কার্য্যদক্ষতা দেখিয়া বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর তাঁহাকে ৩০০ টাকা বেতনে তাঁহার সদস্তপদে নিযুক্ত করিবার জন্ত প্রকাশ অভিপ্রায় করেন এবং পরে আরও উচ্চ পদ প্রদান করিবার আশা দেন । যদিও সরকারী চাকরীতে কিশোরীচাঁদ এই সময়ে অপেক্ষাকৃত অল্প বেতন পাইতেন তথাপি তিনি নীর অর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্ত রাজকর্ষত্যাগে প্রস্তুত ছিলেন না । তাই তিনি এই পদ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন ।

কিন্তু যে অপূর্ণ উৎসাহ ও কর্তব্যশীলতার সহিত কিশোরীচাঁদ নাটোরে এবং জাহানাবাদে রাজকর্ষসমূহ সম্পাদন করেন এবং দেশবাসীর সর্ববিধ কল্যাণের জন্ত যে অদ্বুত পরিশ্রম ও প্রবৃত্ত করেন তাহা শুণগ্রাহী লোকটেনাষ্ট গবর্ণর

সাব ফ্রেডরিক হালিডের দৃষ্টি অতিক্রম করে নাই। তিনি এই এই কৰ্মনিষ্ঠ যুবককে উপযুক্ত পুরস্কার দিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। মগন ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে রমনর দত্ত মহাশয়ের মৃত্যু হইলে রায় হরচন্দ্র ঘোষ ছোট আদালতের জজ নিযুক্ত হইলেন তখন সকলে বিশ্বাসের সহিত দেখিলেন, কলিকাতা ম্যাজিষ্ট্রেটের হুর্দ পদে পুরাতন কৰ্মচারীগণকে অতিক্রম করিয়া, মাত্র আটবৎসরের অভিজ্ঞতালব্ধ কিশোরীচাঁদ প্রতিষ্ঠিত হইলেন। এই পদের বেতন তখন মাসিক ৮০০ শত টাকা ছিল। বলা বাহুল্য কিশোরীচাঁদ সর্বপ্রকারে এই পদের সন্মাপেক্ষা উপযুক্ত ছিলেন।

১৮৫৪ খৃঃ অব্দে ৬ই জুলাই (২৩শে আশাঢ় ১২১১ বঙ্গাব্দ) তারিখে কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র শুক্ল তাঁহার 'প্রভাকরে' কিশোরী চাঁদের পদপ্রাপ্তি বিষয়ে বাহা লিখিয়াছিলেন তাহা পাঠকগণের অবগতির জন্ত নিয়ে উদ্ধৃত হইল :

“আমরা পূর্বে ইংলিসম্যান-পত্রদ্বয়ে লিখিয়াছিলাম, আমাদিগের সুবিজ্ঞতম রাজনীতিজ্ঞ কার্যাত্মক ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র ৬০০ টাকা মাসিক বেতনে কলিকাতা পুলিশের কনিষ্ঠ ম্যাজিষ্ট্রেটিপদে অভিষিক্ত হইয়াছেন, এইক্ষেণে আবার উক্ত পত্রেই দৃষ্ট হইল, ঐ পদের বেতন কিছুমাত্র নান হয় নাই, বাবু হরচন্দ্র ঘোষ যে ৮০০ টাকা বেতন পাইতেন, কিশোরীচাঁদ মিত্র তাহাই পাইবেন। যাহা হউক, এতৎ সুসংবাদে আমরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম, আমাদিগের মিত্র মিত্রবাবু পূর্বে ৩৫০ পাইতেন অধুনা ৪৫০ টাকা বৃদ্ধি হইল। রাজপুরুষেরা এতদেবীর কৃতবিদ্যা উপযুক্ত রাজকৰ্মচারীদিগের পদোন্নতির প্রতি এক্রপ প্রসন্নতা প্রকাশ করিতে অত্যন্ত যত্নবী হইবেন, তাহাতেই সন্দেহ নাই।”

শ্রীমদ্বন্দ্যনাথ ঘোষ।

সংগ্রহ ।

বিবিধ ।

জেব-উরিসা ।

বহির্মন্ত্রণা তাঁহার 'রাজসিংহ' উপন্যাসে জেব-উরিসার সহিত বাঙ্গালী পাঠককে পরিচিত করিয়াছেন । জেব-উরিসার পরিচয় দিতে বাইরা তিনি লিখিয়াছিলেন—“ভারতবর্ষীয় মহিলারা রাজ্যশাসনে হৃৎক বলিয়া বিখ্যাত । পশ্চিমে, কদাচিত্ একটা জেনোবিয়া, ইসাবেলা, এলিজাবেথ বা কাথারাইন পাওয়া যায় । কিন্তু ভারতবর্ষের অনেক রাজকুলজারাই রাজ্যশাসনে হৃৎক । মোঘলসম্রাটবিশেষের কস্তারূপ এ বিষয়ে বড় বিখ্যাত । = * ঔরঙ্গজেবের ছুই ভগিনী, জাঁহানারা ও রৌশনারা । জাঁহানারা শাহজাঁহার বাল্যসাহায্য গ্রহণে সহায় । শাহজাঁহা তাঁহার পরামর্শ ব্যতীত কোন রাজকাব্য করিতেন না, তাঁহার পরামর্শের অনুবর্তী হইয়া কাযে সফল ও ধন্য হইতেন । তিনি পিতার বিনয় হিঁটখিঁট ছিলেন । = * * * রৌশনারা পিতৃষেখিষ্ট, ঔরঙ্গজেবের পক্ষপাতিনী ছিলেন । তিনিও জাঁহানারার মত রাজনীতিবিদ্যাতে ও হৃৎক ছিলেন । = * * * এখন পিতাকে পরচ্যুত ও অবরুদ্ধ করিয়া, তাঁহার রাজ্য অশ্রুহরণে ঔরঙ্গজেব অধৃত, তখন রৌশনারা তাঁহার প্রধান সহায় ! ঔরঙ্গজেবও রৌশনারার বড় বাধ্য ছিলেন । ঔরঙ্গজেবের বাসনাধীনে রৌশনারা দ্বিতীয় বাসনাধ ছিলেন । কিন্তু রৌশনারার হৃৎকইসে তাহার একজন মহাপ্রতিনিধিনী প্রতিদ্বন্দ্বিনী তাঁহার বিরুদ্ধে রাখা তুলিল ।” আত্মার মোটা কস্তা—জেব-উরিসাই সেই প্রতিদ্বন্দ্বিনী । কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতাহেতুই রৌশনারার পুণিব, হইতে অধৃত হইলেন—জেব-উরিসাই তাঁহার পরমখ্যাতি হতমত করেন ।

জাঁহানারা ও রৌশনারা কেহই বিবাহ করেন নাই । কিন্তু উভয়ের অসুখিগ্রাবল্যের নানা কথার ইতিহাসের পৃষ্ঠা কলঙ্কিত হইয়াছে । জেব-উরিসার বিলাস-লালসা ও অসুখিপরিচরিত্যের কথাও ইতিহাসে উল্লেখিত হইয়াছে—বহির্মন্ত্রণা ও ‘রাজসিংহে’ তাহার উল্লেখ করিয়াছেন । যদি সে সব কলঙ্ককথা সত্য হয় তবুও সে কথা আর তুলিয়া কাষ নাই—কবরের মাটিতে সে কলঙ্ককথা ঢাপা থাকুক ।

জেব-উরিসা গুপতী ছিলেন । বহির্মন্ত্রণা বলিয়াছেন, তিনি “একজন প্রধান politician মোঘলসাম্রাজ্যের আধারের হাল এক প্রকার তাঁর হাতে । তিনি মোঘলসাম্রাজ্যের ‘নিয়ন্ত্রক মন্ত্র’ বলিয়াও বর্ণিত হইয়াছেন ।”

কিন্তু কেবল রাজনীতিকক্ষেত্রে মধে, পরন্তু সাহিত্যক্ষেত্রেও তাঁহার প্রতিভা বিকশিত হইয়াছিল । সংপ্রতি ভূপালের বেগম সাহেবা জেব-উরিসার লুপ্ত কথার পুনরুদ্ধারচেষ্টা করিতেছেন । বেগম সাহেবা রাজ্যশাসনে হৃৎক—শিকাগ্রচারকাযে উৎসাহশালিনী—পারন্ত সাহিত্যে দুপাতিতা—স্বঃ হুসেবিলা ও শিরী । অসুখিগ্রাবল্যে তাঁহার এই প্রথম পরামর্শ ।

দিল্লীতেই জেব-উরিসা সমাহিতা বলিয়া শুনা যায় । তথায় একটি দল্যাবৃত্ত সমাহিতসেই তাঁহার শব সমাহিত বলিয়া একাধ । কোনরূপ আড়ম্বরহীনতার এই সমাহি “বীন আত্মা

জাহানারা সম্রাট কস্তার" ভূগাত্ত সমাধিই গ্রহণ করাইয়া দেয়। কিন্তু বিতোর এই সমাধিই অকৃতপক্ষে জেব-উরিসার সমাধি কি না, সে বিষয়ে বহুকাল হইতেই লোকের সন্দেহ ছিল। অনুসন্ধানকালে বেগম সাহেবা এই সিদ্ধান্তে উপনীতা হইয়াছেন যে, লাহোরেই জেব-উরিসার শব সমাধিত। তাই তিনি বহু ব্যয়ে লাহোরে জেব-উরিসার শ্রুতিমন্দির নির্মিত করাইবেন—স্থির করিয়াছেন।

বেগম সাহেবা জেব-উরিসার শিক্ষা ও সাহিত্যসেবা সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন। জেব-উরিসা সম্রাট ঔরঙ্গজেবের প্রথম সন্তান। অল্পবয়স হইতেই জেব-উরিসা কলনার পরিচয় দিতেন। মোগল শুদ্ধান্তের সকল কথাই গোপনে রক্ষিত হইত—তাই অনেক সময় জনরব কেবল অস্তিত্বেরই ব্যাপ্ত হইত। মোগল অন্তঃপুরে যে রাজপুত্রীদিগের শিক্ষিত্রীনিয়োগ হইত, এক কথা বড় গুনা যায় না। কিন্তু কথাটা ঠিক। হাকিমজা মির্জান নামী একজন বর্ধপরত্যা বিদূষী জেব-উরিসার শিক্ষিত্রী নিযুক্তা হইলেন। শিক্ষিত্রীর শিক্ষাগুণে রাজপুত্রী শ্রুতি হইতে সমগ্র কোরাণের আবৃত্তি করিতে পারিতেন। ইহাতে ঐশ হইয়া ঔরঙ্গজেব কস্তাকে ২০ হাজার মোহর উপহার দিয়াছিলেন।

তাহার পর রাজপুত্রীর কস্তা শিক্ষকনিয়োগের কথা উঠিল। মোনা আশরফ নিযুক্ত হইলেন। তিনি দার্শনিক ও কবি। মোনার শিক্ষাকালে রাজপুত্রীর বাস্তবিক প্রতিভানীতি সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল—দিকে দিকে ঔহার খ্যাতি ব্যাপ্ত হইল—নানো হান হইতে লোক তাহার জ্ঞানবর্ধক কথা শুনিবার জন্য সমাগত হইতে লাগিলেন। অল্পকালমধ্যেই তাহার নিকট বহু ভূমির ও জ্ঞানীর সমাগম হইতে লাগিল। এই বহুমুখ্য বৈশিষ্ট্যগুণ, প্রত্যক্ষকারবিশুদ্ধিতা রাজকস্তার জ্ঞানগৌরব-কথা প্রবাসের মত রাষ্ট্র হইয়া উঠিল। তাহার যুক্তিতর্কে ও বাখ্যার লোক মুগ্ধ হইত। তাহার সাহায্যে ও সহায়তায় বহু সাহিত্যিক সাহিত্যের নানো বিভাগের উন্নতিসাধনে সচেষ্ট হইলেন।

কিন্তু জেব-উরিসার সর্বোৎকৃষ্ট রচনাসমূহ লোকলোচনের অন্তরালে বিলম্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। তিনি যে সব কবিতা রচনা করিতেন একজন লেখিকা সেগুলি লিখিয়া লইত—তাহাই তাহার নিহিত কাব্য ছিল। এক দিন জেব-উরিসার কবিতা লিখিতে লিখিতে তাহার সঙ্গে সঙ্গে বাইবার সময় লেখিকা উদ্ভাবনময়্য বখসেলিয়া পুচ্ছবিধির মতো পড়িয়া যায়। কবিতার খাতা তাহার হস্তচ্যুত হইয়া ভগ্নতলপত হয়। সে খাতা আর পাওয়া যায় নাই। জেব-উরিসার দৃঢ়বিশ্বাস অসিদ্ধাছিল, তিনি সেই সব কবিতার মত কবিতা আর লিখিতে পারিবেন না।

ইহার পর ভারতের রাজনীতিক গদন ঘনঘটাচ্ছন্ন হইল। ঔরঙ্গজেব এক পুত্রকে রাজপুত্র-দ্বিগের সহিত যুদ্ধ করিতে পাঠাইয়াছিলেন। সে রাজপুত্রদ্বিগের পক্ষে যোগ দিয়া পিতার বিরুদ্ধাচারা হইয়া উঠে। তাহার সহিত পত্রব্যবহার করার জেব-উরিসা ঔরঙ্গজেবের বিরোধ-ভাঞ্জন হইয়া উঠিলেন। তিনি আর এক ভ্রাতার দীর্ঘকালব্যাপ্তি পীড়ার সময় অকাতরে তাহার সেবাওজ্ঞা করায় মুলমানগণ তাহাকে পারিবারিক সঙ্কটের আশ্রয় বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন। জাহানারা যেমন বড়ো বুদ্ধ—বন্দী পিতার সেবাওজ্ঞা করিয়াছিলেন জেব-উরিসা তেমনই বড়ো রোগকতার ভ্রাতার সেবাওজ্ঞা করিয়াছিলেন।

জৈব-উন্নতির কৃতি হাঙ্গিন ছিল । তিনি আপনায় অল্প কান্দীয়ে একটি মনোরম প্রাঙ্গণ
বুড়িত করিয়াছিলেন ।

সৌন্দর্য্য ও কবি ।

উষা সন্ধ্যা আসে যায় নিত্য হাসি' হাসি',
আকাশে করিয়া নত সৌন্দর্য্য বিকাশ,
তরুণতিকার অঙ্গে কুল রাশি রাশি
কুটি' ঝরি' করে কত সৌন্দর্য্য প্রকাশ ।
অলু জলু দীপ্তরবি দিবার আকাশে,
কলমলু তারা নীল নিশীথ অন্ধরে ;
ইন্দুর মধুর হাসি ভোহনা বিকাশে—
দিবানিশি কি মাধুরী নিত্য হেথা ক্ষরে !
মাগরে প্রান্তরে বনে কুধরে নিখরে
নিভা কত সৌন্দর্য্যের লীলা বহি' যায়,
নর, নারী,—মানবের মধুময় ঘরে
কত সুবনার সাজি নিরত সাজার ।
বিষভরা সৌন্দর্য্যের অন্তর মাঝার
গে বিচিত্র ভাবরাশি উথলিয়া পড়ে,
কবি তাই ঢালি' দিরা বক্ষে কবিতার
চিরদিন মানবের মনপ্রাণ হয়ে ।
না বহিলে সমীরণ রহিত গোপন
কুহুমের হাসিতরা মধুর সৌরভ ।
না থাকিলে মধুর হইত স্বপন—
কুহুমের বক্ষে মাথা মধুর গৌরব ।
কবি না থাকিলে লোকে কে করিত আর
সৌন্দর্য্যহরের ধন ভাবের প্রচার ?

শ্রীযতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ।



হরিদাস ঠাকুরের পাট ।

হরিদাস ঠাকুরের পাট।*

নামমাহাত্ম্যের প্রচারক পরমভক্ত হরিদাস বৈষ্ণব-সমাজে সুপরিচিত। তখনও নিমাইকর্তৃক প্রকৃষ্টসঙ্গীতজ্ঞান বাজিয়া উঠে নাই, তখনও নবদ্বীপে প্রেমের মধুরলহরী প্রবাহিত হয় নাই, সেই সময় ভক্তকুলনিরোমণি মহা-প্রভু হরিদাস বঙ্গভাষায় বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেন।

যশোহর জিলার অন্তর্গত বনগ্রাম মহকুমার সন্নিকটে বুঢ়ন নামে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। অনেকে বলেন, বৈষ্ণবগ্রন্থাদিতে হরিদাসের জন্মভূমি বলিয়া যে বুঢ়নের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, সেই বুঢ়ন এবং উল্লিখিত বুঢ়ন-গ্রাম এক ও অভিন্ন। (১) ‘চৈতন্তভাগবতে’ আছে, “বুঢ়নগ্রামেতে অবতীর্ণ হরিদাস।” অভিন্নামচন্দ্রের ‘শাখানির্গণ’ গ্রন্থেও আছে—

বুঢ়নগ্রামেতে হরিদাসের বসতি।

হেলাগ্রামে পাখীরা গোপালদাসের স্থিতি ॥

কিন্তু জ্ঞানন্দ লিখিয়াছেন—

স্বর্ণনদীতীরে ভাটকলাগাছী গ্রামে।

হীনকূলে জন্ম হয় উপরি পূর্বনামে ॥ (২)

এই শ্লোকদ্বয়ে শ্রদ্ধের শ্রীবৃদ্ধ নীলেশচন্দ্র সেন মহাশয় ধরিয়া লইয়াছেন, “প্রচলিত মত হরিদাস ঠাকুরের জন্মস্থান বুঢ়নগ্রামে। কিন্তু জ্ঞানন্দের মতে নদীতীরস্থ ভাটকলাগাছী গ্রামে।” (৩) আবার বঙ্গীয়সাহিত্য পরিষদ হইতে প্রকাশিত ‘চৈতন্তমঙ্গল’ গ্রন্থের ভূমিকায় উক্ত গ্রন্থের সম্পাদক হিরসিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ভাগবতীতীরবর্তী কলাগাছী গ্রামে ভাটবাংশে হরিদাস ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু বলা বাহুল্য, এ মত সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। যশোহর বনগ্রাম গবর্ণমেন্ট স্কুলের সূযোগা হেডমাষ্টার শ্রদ্ধের শ্রীবৃদ্ধ চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিবিধ প্রমাণ দ্বারা দেখাইয়াছেন প্রচলিত মতই সত্য। (৪)

হরিদাসের জাতি লইয়াও অনেকে অনেক মত প্রকাশ করিয়াছেন। কথিত আছে, তিনি ব্রাহ্মণের পুত্র ছিলেন, পরে পিতৃমাতৃহীন বলিয়া মুসল-

* তথ্যাবলী সাহিত্য সমিতির সাধারণ অধিবেশনে পঠিত।

(১) অমিচন্দ্রনিমাই চরিত—১ম খণ্ড ১১৭ পৃষ্ঠা। (২) শ্রীচৈতন্তবঙ্গল।

(৩) বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—৬১০ পৃষ্ঠা।

(৪) সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা—অষ্টাদশভাগ, দ্বিতীয় সংখ্যা।

মান গৃহে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, সেইজন্য তিনি জাতিচ্যুত এবং “যবন-হরিদাস” আখ্যা প্রাপ্ত হইলেন । কিন্তু বাদসাহ তাঁহাকে “মহা বংশজাত” বলিয়া উল্লেখ করার তিনি মুসলমান বংশোদ্ভব ইহাও প্রমাণিত হইতেছে । অপর পক্ষে হরিদাস যে খ্রিস্টসন্ধান এ কথা প্রাচীন ‘শিবগীতা’ গ্রন্থে, ভগীরথ বদ্ধকৃত ‘চৈতন্যসংহিতায়’ এবং উদ্ধবপ্রণীত ‘হরিনামামৃত লহরী’ গ্রন্থে দৃষ্ট হয় ! প্রচলিত খ্রীষ্টকৃত অচ্যুতচরণ চৌধুরী মহাশয় আধুনাবিলুপ্ত ‘দাসী’ পত্রিকায় চতুর্থভাগে সবিত্তারে ইহার আলোচনা করিয়াছেন ।

কথিত আছে, হরিদাস হরিসঙ্কীৰ্ত্তন করিতে করিতে ব্রহ্মা বৃন্দন পরিত্যাগ-পূৰ্ব্বক বেনাপোলে আসিয়া বেনাকুলে কুটারনিৰ্ম্মাণ করিয়া কিয়ৎকাল ন্যাস-মৃতপানে অতিবাহিত করেন । (৫)

বেনাপোলে তৎকালে রাজা রামচন্দ্র খাঁ নামে এক প্রবলপরাক্রান্ত ভূস্বামী বাস করিতেন । তিনি নিরতিশয় পরীক্ষিতর ও ভক্তবোধী ছিলেন হরিদাসের অন্ততদমান নামগান তাঁহার কর্ণে বিবের স্থায় প্রতীয়মান হইল । (৬) তিনি যবন হরিদাসের তপস্তাভঙ্গ করিবার নিমিত্ত একটি সুন্দরী বার-বিলাসিনীকে প্রেরণ করিলেন । কিন্তু সাধুসঙ্কল্প এমনই মহিমা যে সেই পানীয়সীর কলুবুদ্ধয়েও ভক্তির গঙ্গা বহিল, শুদ্ধতর মুকুরিত হইল । ক্রমে সেই রমণীর

(৫) হরিদাস যবে নিজ গৃহত্যাগ কৈলা ।

বেনাপোলের বনমধ্যে কতদিন রহিল । ‘খ্রীষ্টচৈতন্যচরিতামৃত’—অন্ত্যলীলা ।

(৬) সহজেই অবৈক্য রামচন্দ্র খান ।

হরিদাসের অপরাধে হৈল অল্পর সনান ।

দেববর্ধ নিশা করে বৈক্য অপমান ।

বহুদিনের অপরাধে পাইল পরিণাম ।

সেই সেনাধ্যক্ষ নাম রামচন্দ্র খান ।

বৈক্যবোধেই সেই পাপও প্রধান ।

হরিদাসে লোক পূজে সহিতে না পারে ।

তার অপমান করিতে নানা উপায় করে ।

রামচন্দ্র খাঁও অবশেষে তাঁহার পাপের সমুচিত প্রতিফল পাইয়াছিলেন । হুসেন শাহের অত্যাচারে তাঁহার রাজধানী শ্রবানে পরিণত হইল । ‘চৈতন্যচরিতামৃত’ গ্রন্থ দ্রষ্টব্য ।

রামচন্দ্র খাঁর রাজধানীর ভগ্নাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায় । অধ্যাপক খ্রীষ্টকৃত বোম্বাইপ্রবাস সমাচার ১০১৯ সালের ‘ভারতী’ পত্রিকায় এই সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন ।

“ইঞ্জিরদমন হৈল প্রেমের প্রকাশ ।”

হরিদাস তাহার পর বেনাপোল পরিত্যাগ পূর্বক শান্তিপুরের নিকটবর্তী ফুলিয়াগ্রামে গমন করেন। চৈতন্তমহাপ্রভুর পার্বদগণের বসতিস্থান বৈষ্ণব-সমাজে ‘পাট’ নামে পরিচিত। “হরিদাস ঠাকুরের দুইটি পাট-বাটি নিশ্চিষ্ট আছে। একটি ফুলীন গ্রামে এবং অপরটি ফুলিয়ার!” (‘শ্রীমৎ হরিদাসঠাকুরের জীবনচরিত’ ১৮ পৃষ্ঠা) প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে যশোহর জিলার চাঁচুড়ি পুঁড়ুরি গ্রামের জগদানন্দ গোস্বামী বহু অমূল্যকালে হরিদাস ঠাকুরের আশ্রম ও ভজন গোসা অবিকার করেন। কোন দানশীলা মহিলার অর্থসাহায্যে তিনি শুধাটিকে কৃপাকারে সংরক্ষিত করিয়াছেন। হরিদাসের আশ্রমের সারিধো গঙ্গার প্রাচীন গর্ভ দৃষ্টিগোচর হয়। (৭)

হরিদাস ফুলিয়ার আসিয়া ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক সমাদৃত হইলেন—

ফুলিয়া-গ্রামের যত ব্রাহ্মণ সকল !

সবেই তাখানে দেখি আনন্দে বিহ্বল ॥ ‘চৈতন্ত ভাগবত ।’

কিন্তু সেই স্থানের কতকগুলি গোড়া মুসলমান ঠাহার বিরোধী হইয়া উঠিল এবং তত্ৰত্য মূলকপতির নিকট গিয়া জানাইল যে, হরিদাস মুসলমানদ্বন্দ্ব ত্যাগ করিয়া হিন্দু হইয়াছেন। মূলকপতি জুহু হইয়া হরিদাসকে বন্দী করিলেন। পরদিন কাজি সাহেবের নিকট বিচার আরম্ভ হইল। কাজি বলিলেন, “হরিদাস, তুমি পবিত্র মুসলমান বংশে জন্ম লইয়া, কেন বৈষ্ণবদ্বন্দ্ব গ্রহণ করিবে ? তুমি কল্যা পড়িয়া পবিত্র হও, হরিদাস পরিত্যাগ কর।” (৮) কিন্তু হরিদাস অটলভাবে উত্তর করিলেন—

যও যও হয় দেহ, বায় যদি প্রাণ ।

তবু আমি বনেন না ছাড়ি হরিদাস ॥ ‘চৈতন্ত ভাগবত ।’

জুহু হইয়া কাজি তাহাকে বাইশ বাজারে বেত্রাবাদের আদেশ দিলেন। তখন পাইকগণ হরিদাসকে নির্দয়ভাবে প্রহার করিতে লাগিল। কিন্তু তাহার মানসব্রাহ্মণ্যে যে সুবিমল প্রেমসুধা ভরসারিত হইয়া উঠিতেছিল তাহা বিন্দুমাত্র প্রভাহত হইল না—ধানানন্দে সকল বাহুবলনা লীন হইয়া গেল, ভগবানের প্রশান্ত ভ্যোতির্পররূপে সমগ্র জগৎ ব্যাপিয়া দীপ্তি পাইতে লাগিল, ভগবানের স্বগতীর অস্তিত্বের মধ্যে ভক্ত আপনাকে হারাইয়া ফেলিলেন। যখন হরিদাসের

(৭) ‘বদীয়াকাহিনী’—২১ পৃষ্ঠা, পাহলীক।

(৮) ‘ভক্তি ও ভক্ত’—১৩০-৩১ পৃষ্ঠা।

ধ্যানানন্দ মহাসমাধিতে গিয়া পৌছিল, নিশ্বাস রুদ্ধ হইল, চেতনা লুপ্ত হইয়া গেল, তখন মুসলমানরা হরিদাসকে মৃত মনে করিয়া গঙ্গাতীরে ডাসাইয়া দিল। বহুকাল পরে হরিদাস চেতনা-পাইয়া তীরে উঠিলেন।

চৈতন্ত পাইয়া হরিদাস মহাশয় ।

তীরে আসি উঠিলেন পরানন্দময় ॥ ‘চৈতন্তভাগবত ।’

তিনি কোন্ স্থানে আসিয়া উঠিয়াছিলেন ঠিক অবগত হওয়া যায় না। বৈষ্ণব গ্রন্থাদিতে কুত্রাপি তাহার উল্লেখ নাই। বনগ্রাম মহকুমার সন্নিকটে হরিদাসপুর নামে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। ইহা পুরাতন বুঢ়ন গ্রাম হইতে অন্যান আড়াই ক্রোশ দূরবর্ত্তী। স্থানীয় প্রবাদ এই যে, হরিদাস ঠাকুর এই স্থানে আসিয়া উঠিয়াছিলেন। প্রচলিত প্রবাদের মূলে কতখানি ঐতিহাসিক সত্য নিহিত রহিয়াছে তাহা অবধারণ করা যায় না। মুলুকপতির পাইকগণ হরিদাসের মৃত্যু-কল্প দেখে গঙ্গাসলিলে ডাসাইয়া দেয়; চৈতন্তসঙ্কার হইলে হরিদাস তীরে উঠেন। শান্তিপুত্রের নিকটবর্ত্তী হরিদাসপুরে আসিয়া পৌছান অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। কোন্ ভিত্তির উপর আশ্রয় করিয়া এই প্রবাদটি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে তাহার স্থিরীকরণ সম্ভাষ্য নহে। পরন্তু ইতিহাসে এক্ষণ নিদর্শন যে নাই তাহাও নহে; পাঠকগণ অবগত আছেন, সূত্রসিদ্ধি ত্রৈলোক্য স্বাধীন জীবনেও এক্ষণ ঘটনা ঘটয়াছিল। নিম্নে হরিদাসপুরের বৃত্তান্ত সংক্ষেপে আলোচিত হইল।

হরিদাসপুরের উপকণ্ঠদিয়া ‘নাভাঙ্গা’ নদী বহিয়া গিয়াছে। ইহা ইচ্ছামতীরই একটি শাখা। সূত্রসিদ্ধি ছয়ঘরিয়া গ্রামের উত্তরপ্রান্ত দিয়া প্রখ্যাতনামা কালী পোন্ধারের প্রপত্ত রাজপথ বশোহরের বগচর পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। উক্ত রাজপথ নদীর নিকট আসিয়া যে স্থানে শেষ হইয়াছে সেই স্থান হইতে পর-পার অবধি একটি স্রুতহং সেতু বর্ত্তমান। (২) এই সেতুর নিকটেই হরিদাসপুর গ্রাম। চতুর্দিকের ঘনসরিষিষ্ট বৃক্ষবনরী এই স্থানের প্রাকৃতিক শোভা অতিশয় মনোরম করিয়া তুলিয়াছে। গ্রামের মধ্যদিয়া প্রবহমানা কীর্ণালী তটিনী কলস্বন তুলিয়া পূর্বদিকে বক্রভাবে ঘুরিয়া গিয়াছে। সেতুর নিম্নভাগের জল গভীর, অস্তান্ত স্থানে নদীটি বিস্তৃতপ্রায়। এক সময় যে এই নদী বিপুলকার্য ছিল তাহা দেখিলেই বেশ বুঝা যায়; এখন তাহার যৌবনচাক্ষুয্য ধামিরা গিয়াছে।

(২) ‘আর্য্যাবর্ত্তে’ শ্রীযুক্ত অধিনীকুমার দেব মহাশয় “কালীপোন্ধার-স্মৃতি” প্রবন্ধে এই সেতুর উল্লেখ করিয়াছেন—‘আর্য্যাবর্ত্ত,’ কাঙ্ক্ষন ১৩১৮।

হরিদাসপুর গ্রাম কত প্রাচীন তাহা বলা যায় না। হরিদাসপুরের সহিত যখন হরিদাসের পবিত্র স্মৃতি বিজড়িত আছে শুনিয়া আমরা বিগত দোলপূর্ণিমার ঐতিহাসিকতথ্যসঙ্কলন হইয়া তথ্য গমন করিয়াছিলাম। ছয়ঘরিয়া গ্রামের পশ্চিমপ্রান্ত হইতে প্রব্রতস্বিং শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপধ্যায়ের ধ্বংসাবশিষ্ট বাটার পার্শ্ব দিয়া একটি বিসর্পিত পথ উন্নতানত কুমির উপর দিয়া হাইয়া প্রজ্জ্বল-শীতল-আশ্রয়ন অতিক্রম করিয়া কালীপোন্ধারের রাজপথের সহিত মিশিয়াছে। রাজপথ ধরিয়া কিয়দূর পূর্বমুখে গমন করিলে হরিদাসের পাটবাড়ী নামক স্থানে উপনীত হওয়া যায়। আমরা ইতঃপূর্বে গ্রন্থান্তর হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি, বঙ্গদেশে হরিদাসের দুইটি পাটবাড়ী বর্তমান আছে—একটি কুলীন গ্রামে এবং অপরটি কুলিয়ার। কিন্তু অনেকেই সম্ভবতঃ অবগত নহেন যে, যখন হরিদাসের আর একটি পাটবাড়ী বশোহরের হরিদাসপুরে অবস্থিত আছে। প্রসঙ্গক্রমে এই স্থানে বলিয়া রাখা উচিত যে, হরিদাসের কোন পাটবাড়ীতেই তাঁহার বরবপু সন্নিহিত নাই, কেন না আমরা বৈষ্ণবগ্রন্থপাঠে অবগত হই, তিনি চৈতন্যমহাপ্রভুর সহিত বাসকালে শ্রীক্ষেত্রধামে মোক্ষলাভ করেন এবং সেই স্থানেই সাগরের কমলোদগমীতের মধ্যে বেলাভূমিতে সন্নিহিত হইলেন। (১০)

হরিদাসপুরে প্রবাদ শুনিলাম, হরিদাসঠাকুরের অবস্থিতিহেতুই গ্রামের হরিদাসপুর নাম হয়। জনশ্রুতি, হরিদাস এই গ্রামে তিন দিন অবস্থান করেন। অগ্নিসন্ধান করিয়া আনিলাম, নিকটবর্তী করেখানি গ্রামে কতিপয় ঘর বৈষ্ণবের বাস আছে। তাঁহার্য প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—গোড়ীয় ও বাউল সম্ভাদায়। গোড়ীয় সম্ভাদারের হস্তেই হরিদাসের পাটবাড়ীর সেবাদির ভার রহিয়াছে। পাটবাড়ীর অধিকারী ছয়ঘরিয়া গ্রামের শ্রীযুক্ত রাখাল চৌধুরী মহাশয়। তিনি ইহার স্বয়ং বৈষ্ণবদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছেন।

শুনিতে পাই, পূর্বে হরিদাসপুরের পাটবাড়ীতে বৈষ্ণবদিগের একটি আখড়া এবং ভোগগৃহাদি বর্তমান ছিল; কিন্তু এক্ষণে তাহার চিহ্নমাত্র দেখিলাম না।

চতুঃপার্শ্ববর্তী পল্লীতে প্রধানতঃ ভোম চণ্ডাল প্রভৃতির বাস। হরিদাস ঠাকুর যে স্থানে আসন পাতিয়া বসিয়াছিলেন সেই স্থান নির্দেশ করিবার নিমিত্ত একটি

মুন্সের 'জালা' অর্ধ-প্রোথিত রহিয়াছে । ইহারই এক পার্শ্বে একটি তুলসীমঞ্চ বিস্তার করিতেছে, মঞ্চটি কথেক বৎসর মাত্র নিশ্চিন্ত হইয়াছে । হরিদাসের পাটবাটী পূর্বে অনেকটা স্থান লইয়া অবস্থিত ছিল, প্রবল বস্তার তাহা ক্রমশঃ নদীগর্ভে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে ।

১৪৪৭ শকের ভাদ্রমাসে শুক্লা অনন্ত চতুর্দশীদিবসে হরিদাস ঠাকুর গৃহত্যাগ করেন । তদ্বিধিত উক্ত দিবস হরিদাসপুরের পাটবাটীতে “মহোৎসব” হইয়া থাকে । এই উপলক্ষে বঙ্গের বহুস্থান হইতে ভাষ্য বৈষ্ণবগণের সমাগম হয় । হরিদাসপুরে একজন বৈষ্ণবের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইয়াছিল ; তিনি বলিলেন, “হরিদাসের পাটবাটীর সেবার নিমিত্ত পূর্বে অধিকারীর অধীনে অনেক দেবোত্তর সম্পত্তি ছিল, কিন্তু এখন সে গুলির সীমানির্দেশ করা যায় না । এই স্থানের বৈষ্ণবদিগের অবস্থা পূর্বে নিতান্ত মন্দ ছিল না । কিন্তু কালক্রমে তাহারা দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছে । আমরা কেবল গোবিন্দের ভরসার এখনও এ ম্যালেরিয়া প্রসীড়িত স্থানের মারা কাটাইতে পারি নাই, আমাদের এখন ভিক্ষাবৃত্তিমাত্র অবলম্বন হইয়াছে । মহোৎসবের সময়ও টাকাকড়ি দিয়া আমাদেরকে কেহ সাহায্য করিতে চাহেন না । তজ্জন্ত আমাদের ক্লেশের সীমা থাকে না ।” আমরা বৈষ্ণবের কথা মর্মে মর্মে অশ্রুভব করিলাম । যে স্থান একদিন হরিদাস ঠাকুরের পাদম্পর্শে পবিত্র হইয়াছিল সে স্থানের আজ কি শোচনীয় পরিণাম ! কালের ভীষণ অভ্যাচারে হরিদাসের পাটবাটীর ভিটাটুকুমাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে,— আর সব স্থিতি কালের তুলিকাসম্পাতে মুছিয়া গিয়াছে । পাঠকগণের কৌতুহল নিবৃত্তির জন্ত হরিদাসপুরের পাটবাটীর একখানি আলোকচিত্র প্রদত্ত হইল । ছয়ঘরয়ার ত্রিধুস্ত বাবু সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই চিত্রখানি অশ্রুগ্রহপূর্ণক তুলিয়া দিয়াছেন, তজ্জন্ত আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ ।

শ্রীমনীগোপাল মজুমদার ।

প্রতিশোধ।

(বিশ্বজয়ের আত্মকাহিনী)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সে অন্ধকারের আদি অন্ধ নাই। নিশ্চয়তা সে অন্ধকারের ভীষণতা আরও বর্ধিত করিয়াছিল। আমার মনে হইতেছিল, আমি যেন কি এক গভীর বিক্ষতির অন্তলম্পর্শ রূপে ডুবিয়াছি। আমার চতুর্দিকে যেন কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাল্পনিক মূর্তি নৃত্য করিতেছিল। স্বচ্ছ অন্ধকারের মধ্য দিয়া আমি যেন কাহাদের ঘোষণাবাহিত নেত্রের দৃষ্টি অনুভব করিতেছিলাম। কঙ্কালসদৃশ শুষ্ক হাতগুলি দীর্ঘ অঙ্গুলীসকল যেন আমাকে জীতিপ্রদর্শন করিতেছিল। আমি যেন গাড়ী স্রুতির ক্রোড়ে নিম্নিত ছিলাম। ক্রমে আমার চৈতন্তের সঞ্চার হইতে লাগিল। আমি দেখিলাম, প্রবল ঝটিকার পর অন্তর্গমনোন্মুগ্ন রক্তিম সূর্যের চতুর্দিকের কৃষ্ণাটিকার মত লোহিত কৃষ্ণাটিকা আমাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। তাহা ভেদ করিয়া একখানি কৃষ্ণবর্ণের হস্ত ক্রমে আমার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। উহা যেন আমার কণ্ঠ ও বক্ষস্থল চাপিয়া ধরিল। আমি সমস্ত শরীরে যেন পাবাণের গুরু ভার অনুভব করিতে লাগিলাম। আমি সে দাক্ষিণ ঘরণা হইতে মুক্তিলাভের জন্য যতই চেষ্টা করিতে লাগিলাম, আমার কণ্ঠ যেন ততই রুদ্ধ হইতে লাগিল; আমার সঞ্চলনশক্তি যেন ততই লুপ্ত হইতে লাগিল; ততই যেন সেই কঠিন হস্ত আমাকে কঠিন নিগড়ের মত আবদ্ধ করিয়া রাখিতে লাগিল! আমি কোনরূপ শলোচ্চারণে বা পার্শ্বপরিবর্তনেও অশক্ত হইয়া পড়িলাম। তথাপি আমি চেষ্টায় বিরত হইলাম না। ক্রমে সে গুরু ভার তিরোহিত হইল; মুক্তির আনন্দে আমার হৃদয় উৎফুল্ল হইল। চতুর্দিকের ভীষণ অন্ধকার দেখিয়া আমি স্তম্ভিত হইলাম। আমি যে কোথায়—কি ভাবে আছি কিছুক্ষণ তাহা বুঝিতে সমর্থ হইলাম না। আমার প্রথম জ্ঞানোন্মেষের সহিত আমার স্মৃতিও পুনরায় ফিরিয়া আসিয়াছিল; আমার ব্যাধি ও তৎসংক্রান্ত আত্মপুঙ্খিক সমস্ত ঘটনা একে একে আমার স্মৃতিপথে উদ্ভিত হইতে লাগিল।

সেই ধর্মবাক্যক বন্ধ, সেই হিতৈষী পিট্টো সকলের কথাই আমার মনে হইতে লাগিল। তাহারা বর্তমানে কোথায়, জানিবার জন্য মন ব্যাকুল হইল। আমি ক্রমে বুঝিতে পারিলাম, আমি এক কঠিন পথ্যার শরিত; আমার মস্তকের উপাধান

অপসারিত হইয়াছে । আমি শরীরে তীব্র বেদনা অহুভব করিতেছিলাম । স্বীয় মণিবন্ধে নাকী পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, উহা অত্যন্ত প্রবলবেগে প্রধাবিত হইতেছে । দারুণ শ্বাসকষ্ট আমাকে বিবম যন্ত্রণা প্রদান করিতেছিল । বিপুল বায়ুশাভের জন্ত আমি ব্যাকুল হইয়া উঠিলাম । আমি উর্ধ্বে হস্তোত্তলন করিতেই কঠিন পদার্থের সংস্পর্শ অহুভব করিলাম । আমি বুঝিলাম, আমি জীবিত অবস্থাতেই সমাধিগহবরে নিহিত হইয়াছি—আমি শবধারে রক্ষিত । ভয়ে ও বিদ্বে আমি আকুল হইয়া উঠিলাম । কি যে করিব কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না । ক্রমে আমার মনে নিরাশাজনিত বলের সঞ্চার হইল ; আমি এই কারাগারের দ্বার ভঙ্গ করিতে বস্ত্রবান হইলাম ; স্বক ও বাহুদ্বয়ের সাহায্যে প্রবলবেগে শবধারে ধাক্কা দিতে লাগিলাম । আমার মুখমণ্ডলে উচ্চ রক্তস্রোত সঞ্চারিত হইল ; নিশ্বাস রুদ্ধপ্রায় হইয়া আসিল ; চক্ষুঃ যেন বাহির হইয়া পড়িবে এইরূপ অহুভব করিতে লাগিলাম । তথাপি আমি সে চেষ্টায় বিরত হইলাম না । শবধারের এক পার্শ্ব কতকটা বিনীর্ণ হইল ; কিন্তু নুতন আশঙ্কা আমাকে বিব্রত করিয়া তুলিল । আমার মনে হইতে লাগিল, মৃত্তিকার অভ্যন্তরে প্রোথিত হইয়া থাকিলে, আমার সকল চেষ্টাই বৃথা । শবধার ভাঙ্গিয়া কেলিলেই মৃত্তিকার স্তূপ আসিয়া আমাকে চাপিয়া ধরিবে—চিরদিনের মত আমার কণ্ঠ নীরব করিয়া দিবে । হৃদয় যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল, সকল উৎসাহ মুহূর্ত্তের জন্ত তিরোহিত হইল । আমি উন্মাদের মত চীৎকার করিতে লাগিলাম । আমার চীৎকার আমারই কর্ণে মূর্খমূর্খ শব্দ কাতরধ্বনির মত শ্রুত হইতে লাগিল । আমি ক্রোধে—হুঃখে একেবারে অধীর হইয়া পড়িলাম । এই সময় আমার শ্বাসকষ্ট যেন কতক প্রশমিত হইতেছিল । আমি বুঝিলাম, আমার কারাগৃহে আমারই কৃত বন্ধুপথে অপেক্ষাকৃত বিপুল বায়ু প্রবেশ করিতেছে । আমি দ্বিগুণ উৎসাহে পুনরায় উহা ভাঙ্গিতে চেষ্টা করিলাম ; পুনরায় সজোরে উহাতে ধাক্কা দিতে লাগিলাম । শবধারের এক পার্শ্ব উন্মুক্ত হইল—মৃত্তিকার পরিবর্তে বিপুল বায়ু আমার নাক মুখ স্পর্শ করিতে লাগিল । আমি মনের আনন্দে শবধারের বাহিরে লাফাইয়া পড়িলাম ও কঠিন প্রস্তরমণ্ডিত স্থানে পতিত হওয়ার হস্তপদে দারুণ আঘাত প্রাপ্ত হইলাম । মানসিক উত্তেজনা ক্রমে শান্তভাবে ধারণ করিল । অতীতের স্মৃতি আসিয়া আমার হৃদয় অধিকৃত করিল । আমি সকল ঘটনা পৃথাকপৃথাকরূপে পর্যালোচনা করিতে লাগিলাম । আমি যে ব্যাধির যন্ত্রণা সহ করিতে না পারিয়া সংজ্ঞাহীন হইয়াছিলাম তাহা বেশ উপলব্ধি করিতে পারিলাম এবং পাঙ্খশালানিবাসীরা যে তখন

আমাকে মৃত মনে করিয়া এই শব্দধারে আবদ্ধ করিয়াছিলেন তাহাতেও আমার আর সন্দেহ রহিল না।

মহামারীর একোপহেতু নেপল্‌সের ত্রুণগঠিত শব্দধারগুলি তেমন স্বুদৃ হইত না ; তাই আমি সহজেই তাহা ভাবিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। নতুবা আমার অদৃষ্টে যে কি ঘটিল, তাহার চিন্তায় আমার হৃদয় বড় উবেলিত হইয়াছিল। আমি কোথায়, তাহার নির্ণয় করিতে যত্নবান্ হইলাম। আমার মনে হইল, আমি ধর্ম্মযাজক মহাপরকে আমার পরিচয় দিয়াছিলাম। আমি যে সুবিখ্যাত রোমানীয় পরিবারের একমাত্র বংশধর, তাহাও তাহার অবদিত ছিল না। তিনি নিশ্চয়ই আমাকে আমার পৈতৃক সমাধিমন্দিরে সমাহিত করিয়াছেন। আমার পিতার মৃত্যুর পর ইহার দ্বার আর কখনও উন্মুক্ত হয় নাই। পিতার শব্দ যে দিন মহাড়ঘরে ঐ স্থানে নীত হয়, সে দিনের কথা আজ বিশেষরূপে আমার স্মৃতিপথে উপস্থিত হইল। মনে হইল, সে দিন কি ভীতিব্যঞ্জক বিষয়ের সহিত আমি এই মন্দির নিরীক্ষণ করিয়াছিলাম! সেই বিষয় ও ভীতি আসিয়া আমার হৃদয় আধিকৃত করিল। আমি এই ভীষণ কারাগৃহ হইতে কিসে মুক্তি পাইব, সেই কথা চিন্তা করিতে লাগিলাম। আমি জানি, ইহার দ্বার স্বুদৃ লৌহকপাটে আবদ্ধ। প্রবেশ-পথ হইতে প্রস্তুত সোপানাবলী ক্রমে নিম্নে মন্দিরের অভ্যন্তরে আসিয়া পৌছিয়াছে। এই গভীর অন্ধকারে দিগ্‌নির্ণয় করিয়া সে সোপানাবলী আরোহণ করা অসম্ভব বোধ হইতে লাগিল। বিশেষতঃ সমাধি-মন্দিরটি যেরূপ নির্জন প্রদেশে নির্মিত, তাহাতে সহর কোনও লোকের, এমন কি মন্দিররক্ষকেরও সাহায্য-প্রাপ্তির আশা করা বৃথা। অনশনে পাছে প্রাণত্যাগ করিতে হয়, আমি সেই ভয়ে ভীত হইলাম। আমার পরিধানে সামান্ত ক্লানের পরিচ্ছদ ছিল। গৃহের শীতল প্রাক্কণের সংস্পর্শে আমার পাদুকাহীন পদম্বর বড় শীতল বোধ হইতেছিল। কঠে হস্তার্ণণ করিয়া দেখিলাম, তখনও তথায় ক্ষীণ স্বর্ণহারসংলগ্ন লটেকটি স্থলিতেছে। উহাতে আমার পত্নীর প্রতিকৃতি ছিল। আমার নেত্রদ্বয় অশ্রু-ভারাক্রান্ত হইল। আমি নীনার চিন্তায় বিভোর হইলাম ; বাস্তব্য সেই প্রতিকৃতি চূষন করিতে লাগিলাম। আমার অভাবে নীনা না জানি আমার মস্ত কত ক্লানন করিতেছে! সেই চিন্তা আমাকে ব্যথিত করিল। আমি কল্পনামেত্রে তাহার আনুলায়িত কুন্তল—অশ্রুপূর্ণ নেত্র—বিবধ বদন ও তাহার সন্নিধানে বিশ্বদাবিষ্টা ঠেলাকে সন্দর্শন করিতে লাগিলাম। আমার চিরস্বপ্ন গিডোর বিবধ বদনও আমার নয়নসমক্ষে ভাসিগা উঠিল। আমার প্রত্যাবর্তনে তাহার যে কত আনন্দিত

হইবে, তাহা করনা করিয়াও আমার চিত্ত আনন্দে মৃত্যু করিতে লাগিল। নীনাও নিশ্চয়ই আসিয়া আমাকে দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিবে। ঠেলা আসিয়া না জানি, কত কথাই বলিবে। আর প্রিয়বন্ধু গিডোরত আনন্দের সীমাই থাকিবে না। এ সকল স্নেহের করুণাও কত সুখকর। বসন্তঃঈ বসন্তর প্রীতি ও পতীর প্রেম আমার গৃহকে আমার নিকট স্বর্গতুল্য করিয়াছিল। আমি যে প্রকারেই হউক, এই অক্লুপ হইতে বহির্গত হইবার ভ্রম ভ্রতসঙ্কর হইলাম।

এই সময়ে এক—দুই—তিন করিয়া ঘাদশবার ঘণ্টার ধ্বনি ক্রম হইল। বুঝিলাম, অদূরস্থিত কোন গির্জায় ঘণ্টাধ্বনি সমর নির্দেশ করিতেছে। আমার করুণাস্রোতের গতি রুদ্ধ হইল। আমার বর্ত্তমান অবস্থা পুনরায় আমার চক্ষুতে জাগরিত হইল। আমি এক্ষণে ভাবি কি দিন, তাহা নিরূপণ করিতে যত্নবান হইলাম। দিবসের প্রারম্ভে আমি পীড়িত হইয়াছিলাম; কলবিক্রেতা বালকটি সেই দিন মধ্যাহ্নে মৃত্যুসুখে পতিত হয়; আমার সংজ্ঞা যে তাহার পর বিলুপ্ত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই; এইরূপ অবস্থায় স্বর্গ্যাপ্তের পূর্বে যে আমি সমাধিগর্ভে নিহিত হইয়াছি, ইহা সম্ভবপর নহে। সুতরাং এই ঘণ্টাধ্বনি রাজ্যের ঘাদশ ঘটিকা নিরূপণ করিতেছে। আমি বিলক্ষণ সাহসী হইলেও আমার শিক্ষা চিরপোষিত কুসংস্কার বিদূরিত করিতে সমর্থ হয় নাই। আমি এই মৃতদেহ-পরিবেষ্টিত স্থানে উপবিষ্ট থাকিতে ভীত হইতেছিলাম। রজনীর অন্ধকারে নির্জন সমাধি-মন্দিরে এইরূপ অবস্থায় পড়িলে কোন্ সাহসি-হৃদয় না কম্পিত হয়? তথাপি আমি অসীম সাহসে নির্ভর করিয়া দ্বারের অস্থসন্ধানে নিবৃত্ত হইলাম। আমি বাহ্যিক প্রসারিত করিয়া ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। সম্মুখে ও কি ভীষণ নিনাদ! সমস্ত মন্দির যেন এককম্পিত হইয়া উঠিল! আমার হৃৎপিণ্ড তাহাতে ক্রমশঃ স্পন্দিত হইতে লাগিল; নিশ্বাস প্রায় রুদ্ধ হইয়া আসিল; সমস্ত শরীর ভয়ে ঘর্ম্মসিক্ত হইয়া উঠিল। আবার সেই ভীষণ চীৎকার ও তৎসহ ক্রম পক্ষসকালনের শব্দ! বুঝিলাম, ইহা পেচকের নিনাদ। আপনার ভীতিতে আপনি লজ্জিত হইলাম; অতিশয় সতর্কতার সহিত পুনরায় অগ্রসর হইতে লাগিলাম। অন্ধকারের অভ্যস্তরে অস্তু অগ্নিকণার স্তার দুইটা চক্ষু নেত্রগোচর হইল। আমি ভয়ে কিঞ্চিৎ পশ্চাতে সরিয়া আসিলাম। ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্র-শাবকের স্তায় ঐ ভীষণ পক্ষী বেগে আমাকে আক্রমণ করিল; পক্ষ্মদ্বারা বারংবার আমার নাকে মুখে চক্ষুতে আঘাত করিতে লাগিল ও আমার চতুর্দিকে উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল। ভীষণ মৈত্রেয় মত উহার চক্ষু দুইটি জলিতেছিল;

আমি উহা লক্ষ্য করিয়া দক্ষিণে বামে বারংবার উহাকে প্রহার করিতে লাগিলাম। অবশেষে উহা দূরে পলারন করিল। আমি এই সংগ্রামে একটু পরিশ্রান্ত হইয়াছিলাম; তথাপি সোপান অবধানে বিরত হইলাম না। বাহুর প্রসারিত করিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইতেই একটা কঠিন পদার্থ আমার গতিরোধ করিল। প্রথমে উহা সোপান বলিয়াই অনুমান করিয়াছিলাম; পরিশেষে যখন উহা শবাধার বলিয়া বুঝিতে পারিলাম, তখন আমার হৃৎকের আর সীমা রহিল না। উহার উপরিস্থিত মক্‌মলের আচ্ছাদন ও স্বর্ণরৌপ্যের কারুকার্য স্পর্শ করিয়া উহা আমার মাতার কিংবা পিতার শবাধার বলিয়াই অনুমান করিলাম। এই সময় আমার হৃদয় আবার নিরাশায় অবসর হইল;—আমার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল বলিয়া আমার মনে হইতে লাগিল। আমি সমাধি-মন্দিরের দ্বারপ্রান্তির আশায় জলাঞ্জলি দিলাম। আমার কণ্ঠ শুষ্ক বোধ হইতে লাগিল। আমি সকল আশার মূল—সেই দয়াময় পিতার শরণাগত হইলাম, তাঁহার চরণে কল্পনা ভিক্ষা করিতে লাগিলাম। আমার স্বর্গীয়া জননীর আত্মা সন্নিহিত উপলব্ধি করিয়া তাঁহার নিকটও শুভ আশীর্বাদ প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। মৃত্যু বা মুক্তিই তখন আমার আকাঙ্ক্ষার বিষয়। বস্তুতঃ এই ভয়ঙ্কর অবস্থা আমার পক্ষে বড়ই অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। আমার মনে হইতেছিল, আমি সুদীর্ঘ কাল এ যন্ত্রণা ভোগ করিলে উন্মাদ হইব। এইরূপ ভীষণ অন্ধকারে মৃতের সহিত একত্র আবদ্ধ থাকিলে কাহার হৃদয়ের অবস্থা এইরূপ না হয়? আমি ভগবানের চরণে শরণ লইলাম। বাহিরে পাপিয়া তখন স্তম্ভলিতকণ্ঠে গান গাহিতেছিল। উহার চিরপরিচিত কণ্ঠের আমার হৃদয়ে নূতন আশার সঞ্চার করিল; আমি ভগবানকে ধন্তবাদ দিয়া গায়ত্রোপান করিলাম।

আমার হৃদয়ে এক নূতন সঙ্কল্প উপস্থিত হইল। আমি বুঝিলাম, এই কুপ্ত পক্ষী সমাধি-মন্দিরের বহির্ভাগে, দ্বারের নিকটস্থ কোন বৃক্ষে উপবেশন করিয়া এই সুধাধারা বর্ষণ করিতেছে। আমি তাহা লক্ষ্য করিয়া ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিলাম; ক্রমে সঙ্গীতলহরীও আমার নিকটবর্তী হইতে লাগিল। আমার হস্ত-পদ কম্পিত হইতেছিল। আমি অস্বাভাবিক চঞ্চলতা অনুভব করিতেছিলাম। কি এক মোহিনী শক্তি যেন আমাকে টানিয়া লইয়া যাইতেছিল। অশ্রি অবশেষে সত্য সত্যই দ্বারের সম্মুখে আসিয়া উপনীত হইলাম; প্রস্তর-নির্মিত কঠিন সোপানে আহত হইয়া পতিত হইলাম। আমার হস্তপদ যেন অসাড় হইয়া গেল, বেদনামুক্তি যেন লুপ্ত হইল। চক্রেয় সিঁদু রশ্মি কপাটের মধ্য দিয়া

স্বপ্নের মত আসিয়া তখন ঐ স্থানে পতিত হইয়াছিল। আমি আনন্দে অধীর হইলাম। আমার চলচ্ছক্তি তখন রহিত হইয়াছিল; আমি আর অগ্রগত হইতে পারিলাম না; ঐ স্থানেই পড়িয়া রহিলাম। অদূরে সেই গির্জার পুনরায় চং করিয়া ১টা বাজিল। প্রভাতের আর বিলম্ব নাই। আমি প্রান্তরে গিয়া ও অবসরক্ষমতায় তথায় শুইয়া পড়িলাম; বিরামদায়িনী নিদ্রা কিছুকণের অন্তর আমার চক্ষু মুদ্রিত করিয়া দিলেন—কিছুকণের অন্তর আমি শান্তিস্থ অহুতব করিলাম।

কিছুকণ এই ভাবে অতিবাহিত হইল। গ্রীষ্মের পশ্চাতে তীব্র শংশন ষাটনা অহুতব করিয়া আমি সহসা জাগরিত হইলাম। পশ্চাতে হস্ত প্রদান করিয়া বুঝিলাম, একটা কীট। ভয়ে ও আতঙ্কে চীৎকার করিয়া উঠা দূরে নিক্ষেপ করিলাম। তখন চন্দ্র অন্তমিত হইয়াছিল, তৎপরিবর্ত্তে এক প্রকার অস্পষ্ট আলোকে সোপানগুলি আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। আমি সর্বোচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়া ঘরের রক্তপথে বাহিরের তুল ও বৃক্ষ-লতাদি দর্শন করিতে লাগিলাম; উষ্মস্তের মত কপাট ধরিয়া ধাক্কা দিতে লাগিলাম। পূর্বাংশে তখন উবার কিরণ ফুটিয়া উঠিয়াছিল; ঈতল বায়ুর সংস্পর্শে ত্র্যাকালভার পত্রগুলি আন্দোলিত হইতেছিল। আমি যেন নূতন জীবন পাইলাম।

আমার নিকটস্থ বৃক্ষের পত্র হইতে সজিত শিশিরবিন্দু অতি কষ্টে সংগ্রহ করিয়া জিহ্বাগ্রে প্রদান করিলাম। স্বর্গের অমৃতকণাও বৃক্ষি এত মধুর নহে! আমার কণ্ঠের শুষ্কতা বিদূরিত হইল। অশ্রুট দিবালোকের সংস্পর্শে আমার হৃদয় হইতে সকল বিতীবিকা পলায়ন করিয়াছিল। আমি পুনরায় পশ্চাদ্বিকে দৃষ্টিপাত করিলাম। অনতিদূরে সিঁড়ির উপর শুত্র কি একটা পদার্থ দেখিয়া তাহা সংগ্রহ করিতে যত্নবান্ হইলাম। উহা সমাধিক্রিয়াধ্যক্ষ ক্যাথলিক ধর্ম্মবাজকদিগের হস্তচ্যুত অর্ধমণ্ড বস্ত্রিকা ব্যতীত আর কিছুই নহে। আমি উহা প্রদান করিবার অন্ত অত্যাশংকিত: স্বীয় পরিচ্ছদের অভ্যন্তরে হস্ত প্রদান করিলাম। আমার পকেট হইতে চাবীর শুদ্ধ, টাকার থলি, নামের কার্ড বাহির হইল—অবশেষে দীপশলাকা প্রাপ্ত হইলাম; কিন্তু বহু অহুসন্ধানও বড়ি ও রোপ্যানির্ষিত বহুমুখ্য চুকটের ব্যয়টি পাইলাম না। সম্ভবতঃ এই সমস্ত বহুমুখ্য পদার্থ ধর্ম্মবাজক মহাশয় আমার পত্রকে প্রদান করিয়া থাকিবেন। অপর জিনিসগুলি ত্রস্ততা-বশতঃ আমার পরিচ্ছদের অভ্যন্তরেই রহিয়া গিয়াছিল। সূর্য্য তখনও উদিত হয়

নাই । বাহিরে লোক-সমাগনের তখনও বিলম্ব ছিল । ইতোমধ্যে আমার সেই শবাধারটি দেখিবার জন্য কেমন কৌতূহল হইল । আমি দীপশলাকার সাহায্যে আলোক প্রজ্জ্বলিত করিয়া সোপানাবলী অতিক্রম করিয়া পুনরায় অন্ধকার প্রদেশে প্রবেশ করিলাম ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

আমার পাদবিক্ষেপে কত গিরগিটী টিকটিকি আমার পদের নিকট হইতে সড়িয়া বাইতে লাগিল । আমি কত বাতুড় ও পেচকের চীৎকার ও পক্ষসঙ্কলনের শব্দ শুনিতে লাগিলাম । ইহারাই মৃতের নৃত্য সহচর । অন্ধকারে যে পপ অতি সূক্ষ্ম বসিরা অল্পভূত হইরাছিল আলোকের সাহায্যে তাহা আর তেমন সূক্ষ্ম বসিরা মনে হইল না । বস্তিকার আলোক সর্বত্র পতিত হওয়ায় মন্দিরের অভ্যন্তর স্পষ্টরূপে দৃষ্টিগোচর হইল । উহা উচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত একটি সমচতুষ্কোণ কক্ষ-বিশেষ । প্রাচীরগায়ে তাকে তাকে আমার পূর্বপুরুষদিগের মৃতসেহ সনাক্ত শবাধারগুলি বিপণিতে বিক্রয় দ্রব্যসম্ভারের মত সজ্জিত রহিয়াছে । আমার শবাধারটি অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতেও বড় বিলম্ব হইল না ।

ওই কি আড়াই গজ উচ্চ একটা তাকের উপর উহা রক্ষিত ছিল । উহার ভদ্রাংশ স্বাধীনতার জন্য আমার কঠোর সংগ্রামেরই পরিচয় দিতেছিল । আমি আরও নিকটে অগ্রসর হইয়া উহা ভাল করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলাম । উহা কারুকার্যবিহীন অতি সাধারণ রকমের একটা বাস্তব মাত্র । উহার অভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত করিতেই একটা রৌপ্যানির্মিত ক্রুশ আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইল । আমি বুঝিলাম, আমার হিতৈষী ধর্ম্মযাজক মহাশয় আমার পারলৌকিক হিতার্থ কোন অহুষ্ঠানের ক্রটি করেন নাই । আমি উহা সাগ্রহে গ্রহণ করিলাম ; ব্যবহার ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত উহা চুম্বন করিতে লাগিলাম । মনে হইতে লাগিল, ধর্ম্মযাজক মহাশয়ের সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ হইলে তাঁহার নিকট আমার এই বিচিত্র কাহিনীর বর্ণনা করিয়া তাহার বাথার্থ্যের নিদর্শনস্বরূপ এই ক্রুশ তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিব । আমার ঐ শবাধারে আসার নাম, জন্ম তারিখ ও মৃত্যু তারিখ—১৫ই আগষ্ট ১৮৮৪ স্পষ্টরূপে লিখিত হইরাছিল । ইহা কেবল পূর্বদিনের ঘটনা । তবু মনে হইতে লাগিল যেন ইহারই মধ্যে এক শতাব্দী অতিবাহিত হইয়াছে ।

আমি আমার পিতার শবাধারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলাম । উহার মকমলের আচ্ছাদনটা স্থানে স্থানে ছিন্ন হইরাছিল । কিন্তু উহা আমার মাতার শবাধারের মত জীর্ণ বা কীটদষ্ট হয় নাই । যা আমার, তোমারই ফ্রেড হইতে আমি বিশ্বের

সৌন্দর্য্য প্রথম উপভোগ করিয়াছিলাম ; তোমারই ক্রোড় হইতে আমি উহার প্রথম আলিঙ্গন অনুভব করিয়াছিলাম । আজ তুমি কোথায় ? আমার পুস্তকাগারে রক্ষিত আমার মাতার প্রতিচ্ছবি তখন আমার মানসপটে ছুটিয়া উঠিল । কি স্নানর তাঁহার চক্ষু, কি মনোরম তাঁহার কেশরাশি, কি উজ্জল তাঁহার গায়বর্ণ ! সেই সঙ্গে যখন তাঁহার বস্ত্রবস্ত্র এই পরিণাম মনে হইল তখন হৃদয় বড়ই ব্যথিত হইতে লাগিল । আমি তখন উত্তর শব্দধারের মধ্যবর্ত্তী শীতল গৃহ-প্রান্তরে জাহ্নু পাতিয়া উপবেশন করিলাম ; আমার হিতৈষিণীর পরলোকগত আত্মার কৃপাভিক্ষা করিতে লাগিলাম । আমার হস্তস্থিত বস্ত্রিকার আলোক তখন একটা উজ্জল পদার্থে প্রতিবিম্বিত হওয়ার আমার দৃষ্টি সেই দিকে আকৃষ্ট হইল । আমি দেখিলাম, উজ্জলমণিসুভাষিত একটা কর্ণাভরণ সেই স্থানে পতিত রহিয়াছে । এই নিম্নদেশে প্রবেশে এইরূপ বহুমূল্য রত্নের আবির্ভাবে আমি বিস্মিত হইলাম । অমূল্যকিন্তু হইয়া আমি চতুর্দিক নিরীক্ষণ করিতেই সম্মুখে একটা প্রকাণ্ড শব্দধার পড়িয়া রহিয়াছে দেখিতে পাইলাম । তাহার চতুর্দিকে কতকগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ইষ্টক । আমার শব্দধারের নিম্নবর্ত্তী তাকের কতকাংশ সমাভ্র বলিয়া প্রতীতি হইল । আমার মনে পড়িল, আমি যখন শব্দধারের বাহিরে লক্ষ দিয়া পতিত হই তখন একটা গুরুভার পদার্থও আমার সম্মুখে পতিত হইয়াছিল । উহা এই নিম্নবর্ত্তী তাকের শব্দধার ব্যতীত আর কিছুই নহে । ইহা মৈথো প্রায় সাত ফিট ও প্রস্থেও প্রায় সেইরূপ । আমার পূর্ণপুরুষদিগের মধ্যে এইরূপ ভীমকার ব্যক্তির অস্তিত্ব করনা করিয়া আমি সত্যই আনন্দিত হইয়াছিলাম । এষ্ট কর্ণভূষণ হস্ত তাঁহার দেহপঙ্কজ হইতে স্থলিত হইয়া থাকিবে । আমি সাগ্রহে উক্ত শব্দধার পরীক্ষা করিতে লাগিলাম । উহাতে কাহারও নামের পরিবর্ত্তে রক্তবর্ণের একখানি ছুরিকার প্রতিচ্ছবি অঙ্কিত ছিল । আমি এই গুপ্তরহস্য উন্মোচনে বস্ত্রবান হইলাম । আমি আমার হস্তস্থিত বস্ত্রিকাটি ও কর্ণভরণখানি সম্মুখস্থ তাকে রাখিলাম ও শব্দধারের ভগ্নাংশে উত্তর হস্ত প্রবেশ করাইয়া উহা ভগ্ন করিতে চেষ্টা করিলাম । স্বর্ণমুদ্রা পরিপূর্ণ একটি বলি বাহির হইয়া আসিল । আমি আরও বিশদ্রাবিষ্ট হইলাম । সম্মুখে পতিত প্রস্তরখণ্ডের সাহায্যে চাড় দিয়া শব্দধারের আবরণটি খুলিয়া ফেলিলাম ।

ভীষণ নরককালের পরিবর্ত্তে নৃপতিবাহিত অমূল্য ধনরত্ন আমার দৃষ্টিগোচর হইল । আমি স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইলাম । প্রথমে অসংখ্য সূবর্ণমুদ্রার ও অতুল মণিসুতার পরিপূর্ণ বলিগুলি শ্রেণীবদ্ধভাবে সজ্জিত ; তারিণে বহুমূল্যরত্নখচিত কঙ্কণ,

বলয় ও কণ্ঠাতরণ প্রভৃতি অলঙ্কার ; তরিয়ে কোশের কিংখাপ প্রভৃতি বহুমূল্য বস্ত্রসমূহ ; সর্বশেষে অশেষ কারুকার্যধচিত্ত নানা প্রকার স্তব্ধপাত্র, গজদন্তনির্মিত গৃহসজ্জা, রত্নধচিত্ত সুকর ও অসিকোপ এবং স্ত্রীকৃত অসংখ্য নোট ! এই সব আমাকে বিদ্রববিহ্বল করিয়া ফেলিল। আমিই বর্তমানে এ সকলের অধিকারী ! কিন্তু আমার অজ্ঞাতসারে এ সকল সম্পত্তি কে এই স্থানে রক্ষা করিল ? আমি বারবার তাহা পর্যালোচনা করিতে লাগিলাম। সিন্ধুকের উপরের অঙ্কিত রক্তচিহ্ন এই অদ্ভুত রহস্যভেদে আমাকে সাহায্য করিল। আমি বুঝিলাম, প্যালায়নো এসেনের নরবাতী দহ্মা কার্শেলো নেরী তাহার লুপ্তিত বস্তু এই নির্জন প্রদেশে সমরে রক্ষা করিয়াছে। রক্তবর্ণ ছুরিকা তাহারই সজ্জিত-চিহ্ন।

সে ত এখনও মনে করে নাই, মৃত পুনর্জীবন প্রাপ্ত হইয়া তাহার অকুল সম্পত্তি আয়সাৎ করিবে। তাই সে মৃতের আবাসভূমিকে নিরাপত্তা স্থান মনে করিয়াছিল। কিন্তু তাহার সকল সতর্কতা ব্যর্থ হইল। আমি মনে করিলাম, অসতৃপারে অঙ্কিত এই অকুল সম্পত্তি অসংকার্যে ব্যয়িত হওয়া অপেক্ষা আমারই হস্তগত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

আমি নানা প্রকার নিদর্শনে ইহা যে জলপথে প্যালায়নো হইতে এই স্থানে আনীত হইয়াছিল তাহা স্পষ্ট বুঝিতে সমর্থ হইলাম। আমি ইহাও বুঝিলাম যে, অনুন চারিজন বলিষ্ঠ দহ্মা শব্দাধার বহনজ্বলে ইহা এক দিন এই স্থানে আনয়ন করিয়াছিল। কিন্তু তাহার কি প্রকারে এই গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল ইহাই বিশ্ববের বিবর।

এই সময় হঠাৎ দমকা বাতাসে আমার বস্তিকাটি নির্জাপিত হইল। দীপ-শলাকার সাহায্যে ইহা পুনরায় প্রজ্জ্বলিত করিলাম। দীপশিখা কম্পিত হইতে লাগিল। আমি ইহার কারণ অল্পসন্ধানে ব্যাপ্ত হইলাম। যে স্থানে ঐ বস্তিকাটি রক্ষিত হইয়াছিল তাহারই সন্নিহিতে রক্তপথে বায়ু প্রবেশ করিতেছে, ইহা বেশ অল্পভব করিলাম। বিশেষ অল্পসন্ধানে দেখিলাম, প্রাচীরের গাত্র হইতে চারিখানি প্রস্তরকলক অপসারিত হইয়াছে এবং সেই স্থানে কতগুলি কাষ্ঠখণ্ড স্ত্রকোশলে সজ্জিত রহিয়াছে। ঐ গুলি ভেদন দৃঢ়রূপে আবদ্ধ ছিল না। আমি অল্প আয়াসেই সে গুলি অপসারিত করিলাম। মাহুকের প্রবেশোপযোগী একটা প্রকাণ্ড ছিদ্র-পথ আবিষ্কৃত হইল। আমি আনন্দে উৎফুল্ল হইলাম ; ভগবানকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিলাম। ছিদ্রপথে বাহিরের ক্রামল দৃষ্ট ও স্থানীল গগন আশ্রয় নয়নপথে পতিত হইল। আমি ২।০ মিনিটেই বাহিরের কোমল কৃষ্ণের উপর

আসিয়া দণ্ডারমান হইলাম । অনন্ত নভোমণ্ডল আমার মস্তকের উপর বিস্তৃত, নেপল্‌স উপসাগর আমার নরনসমক্ষে । আমি স্বাধীন ! আমি মুক্ত ! আমার স্বাধীন জীবনের উদ্ভাস স্রুণ ও আমার নীনার প্রেমালিঙ্গন লাভের পথে আর কোনও বাধা নাই ।

আমি আজ প্রকৃতই স্বাধীন, প্রকৃতই মুক্ত । মুক্তির আনন্দ আমার হৃদয়কে স্পর্শ করিল । আমি আনন্দে হর্ষধ্বনি করিলাম । আঃ কার্শ্বেলো নেত্রী আমার কি উপকারই না সাধিত করিয়াছে । ঐশ্বর্য্য ও স্বাধীনতা উভয়ই আমি তাহার কৃপায় প্রাপ্ত হইলাম । ঐ ছিত্র-পথ যে তাহারই রচনা সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । সে দম্ভা হইলেও আমার নিকট মহিমময়—আমার পরম উপকারী বস্তু । এই বিখ্যাত দম্ভ্যের বিরুদ্ধে পুরস্কার ঘোষিত হইয়াছিল । সে হরত কোনও নির্জন প্রদেশে বা গুপ্তস্থলে লুকাইয়া আছে । তাহার অহুসঙ্কান পাইলেও আমার দ্বারা তাহার কোনও অনিষ্ট সাধিত হইবে না । সে আমার যে মহোপকারসাধন করিয়াছে শত বস্তুর দ্বারা ও তাহা সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব । বিপদে পড়িলেই মানুষের লক্ষ্য মিত্রের পরিচয় পাওয়া যায় । স্বার্থে আঘাত লাগিলেও যে স্থির থাকিতে পারে সে-ই প্রকৃত বস্তু ।

আমি প্রভাতালোকে দণ্ডারমান হইয়া সদ্যোশুদ্ধ মুক্তির আনন্দে এইরূপ কত চিন্তা—কত কল্পনাই করিতেছিলাম, কত আকাশকুসুমই রচনা করিতেছিলাম ।

নীনার চিন্তা সত্যসত্যই এই সময় আমাকে উদ্ভ্রান্ত করিয়াছিল । আমাদের এই কণিক অবদর্শন বসন্ত রক্ত সময়ের জন্তই কেন সংঘটিত হউক না ইহা যে আমাদের হৃদয়কে বাধিত করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই । হরত এই অবদর্শন আমাদের প্রেম শতগুণ বদ্ধিত করিবে । আর আমার চুহিতা—তাহাকে বক্ষে ধারণ করিবার জন্ত আমার হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল । যুদ্ধশাখায় লগ্নমান তাহার দোলাখানিতে তাহাকে দোলাইবার জন্ত আমার চিত্ত অধীর হইয়া উঠিল । আজ তাহার মধুর হাসি আমাকে মুগ্ধ করিবে, তাহার মধুর সম্ভাষণ আমাকে প্রীত করিবে । অকৃত্রিম বস্তু গিডো নিশ্চয়ই আমাকে প্রেমভরে আলিঙ্গন করিবে । নীনা বখন আজ আমার বক্ষে মণ্ডক স্থাপিত করিয়া ঘুমাইবে তখন শত সহস্র চুহনে আমি তাহার কপোল রঞ্জিত করিয়া দিব । এইরূপ কত স্নেহকর চিন্তাই যে আমার হৃদয়ে উদিত হইয়াছিল তাহার ইয়ত্তা নাই । সবুজ বৃক্ষের অগ্রভাগে তখন প্রাতঃসূর্য্যের প্রথম কিরণ পতিত হইয়া কি স্নেহের শোভাই না ধারণ করিয়াছিল ! নেপল্‌স উপসাগরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিশুলি কিরণবর্তিত হইয়া কি

আনন্দেরই না নৃত্য করিতেছিল। ক্ষেপনীর তালে তালে দুরগত নাবিকগণের
সঙ্গীত তখন আমার মন মোহিত করিতেছিল। কে যেন গাহিতেছিল—

ওগো প্রেরণী আমার,

হৃদয় উদাসী মোর কেন হতে চায় ?

কেন দিবানিশি অঁধি জলে ভাসি

বিবাহ-তিমির কেন ঘিরে গো আমার ?

কেন এ দাতনা হৃদয়-বেদনা

আকুল পরাণ কেন ? কিসেরি মারায় !

কত সুখ দুঃখ উরিয়াছে বুক

প্রাণের পিণাস কেন মিটল না তার ?

তব রূপরাশি মধুর সে হাসি

না জানি কখন মরনে প্রবেশি

জেলগেছে অনল হৃদয়ে আমার

ভুবনে নাহিক তুলনা তাহার

ওগো প্রেরণী আমার।

নীনা ! হৃদয় উদাসী মোর কেন হতে চায় ? আজ সন্ধ্যাসন্ধ্যায়ে দ্বিচ্ছ
চন্দ্রালোকে পাশিয়া যখন প্রস্ফুটিত কুসুমের নিকট স্বীয় প্রেম মধুর স্বরে ব্যক্ত
করিতে থাকিবে তখন আমিও আমার প্রেমের ব্যর্থতা তোমাকে জ্ঞাপন করিব।
আমার চিত্ত এই সময়ে আশায় ওঁতানন্দের উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। আমি প্রভাতের
বিগুহ বায়ু কিছুক্ষণ সেবন করিয়া পুনরায় সেই সমাধিমন্দিরে প্রবেশ করিলাম।

(ক্রম্ভঃ)

শ্রীঅমলেন্দু গুপ্ত।

বঙ্গভাষা ।

সপ্তবর্ণ সমাহারে যার

অমল গুণ সেহের দ্বাতি ;

শব্দত্রয় যার করবীণাতলে

মুগ্ধি করিছে আদেশে নতি ;

মোহনছন্দ মর্যাদা ঐবায়

যে পদে নিত্য বেধেছে বাসা ;

জগতে বাগীশা বাগ্দেরী সে যে

মৃত্যুজয়িনী বঙ্গভাষা ।

রসের সপ্ত জলধিতে ফোটা

ভাবের কমলগন্ধ প'রে

অধিকৃত যার অটল আসন

স্বষ্টি-মৃণালবৃত্ত ধরে'

বাজনে পবন শত সেবকের

পূজাগৌরবঅর্ঘ্য আনি'

জগতে বাগীশা বাগ্দেরী সে যে

মৃত্যুজয়িনী আমার বাগী ।

নারায়ণ যার প্রাণের দহিত,

চিরচকলা কমলা সভা

শব্দ বাহার ব্রহ্ম নিত্য,

সঙ্গীত যা'র মুখের কথা ;

রাগরাগিণীরা জীবিত দাসদাসী

যে চরণদেবা করিছে আশা ;

জগতের মাঝে শ্রেষ্ঠ সে দেবী

মৃত্যুজয়িনী বঙ্গভাষা ।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ।

সমালোচনা।

গোপালন।*

ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। সত্য বটে যে দেশ কেবল কৃষিকার্যের উপর নির্ভর করে, সে দেশ দুর্ভাগ্য; কারণ কৃষিকার্য প্রধানতঃ বারিবর্ষণের উপর নির্ভর করে এবং বারিবর্ষণ কোনরূপেই নিশ্চিত হইতে পারে না। কিন্তু একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, বর্তমানে কৃষিই ভারতবাসীর প্রধান অবলম্বন। এককালে ভারতে শিল্প ও বাণিজ্য ছিল—ভারতের পণ্য বহিয়া ভারতীয় তত্ত্বী হুদুর সমুদ্রপারেও যাইত ও পণ্য-বিনিময়ে ধন লইয়া প্রত্যাগত হইয়া দেশের সমৃদ্ধিবৃদ্ধি করিত। নানাকারণে সে অবস্থার পরিবর্তন ঘটয়াছে—সে সকল কারণের মধ্যে রাজনীতিক কারণও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দেশে শিল্প-বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠা বাতীত যে দেশের দারিদ্র্য-সমস্যার সমাধান হইবে না—একথা এক্ষণে দেশের শিক্ষিত লোক সকলেই বুঝিয়াছেন। কিন্তু শিল্প-বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠা এক দিনে হয় না—তাহা সময়সাপেক্ষ। এ অবস্থার আমাদিগকে এখনও বীর্ধকাল কৃষির উন্নতিবিধয়ে সচেষ্ট হইয়া দারিদ্র্যের সচিৎ সংগ্রাম করিতেই হইবে।

আলোচ্য গ্রন্থের আরম্ভে গ্রন্থকার—বঙ্গদেশের পণ্ড-চিকিৎসা-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীহুস্ত সত্যেন্দ্রনাথ মিত্র—লিখিয়াছেন, “ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ এবং গোজাতিই কৃষকের প্রধান অবলম্বন। গোজাতিকে নিয়মিতরূপে যত্ন ও গুজরা করিলে তাহার অধিক কার্যক্ষম ও দৃঢ়বতী হয় এবং শীঘ্র ব্যাধিগ্রস্ত হয় না। আমাদের দেশে অনেকেই গরু পুখিয়া থাকেন; কেহ কেহ আমোদের জন্ত, কেহ ছুড়ের জন্ত, কেহ বা ব্যবসায়ের জন্ত। হুদু আমাদের দেশে প্রধান পুষ্টিকর খাদ্য। অগ্ন হইতে সূত্বার দিন অবধি সমভাবে ব্যবহৃত হয়, শিশু হুবা বৃদ্ধের সমভাবে পুষ্টিসাধন করে, এরূপ খাদ্য আর দ্বিতীয় নাই। বিশুদ্ধ হুদুপানের সহিত আমাদের বল, বীর্ঘ্য ও স্বাস্থ্যের অতি নিকট সম্বন্ধ। অনেকে হুদুপান করেন না, কিন্তু হুদু হইতে প্রস্তুত ঘৃত, মাখন, ছানা, দধি প্রভৃতি ব্যবহার করেন। হুদু বিশুদ্ধ না হইলে তাহা হইতে ভাল ঘৃত মাখন প্রভৃতি প্রস্তুত হয় না এবং বিশুদ্ধ হুদুপান না করিলে অনেক সংক্রামক ব্যাধি উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা। গোপালন বাতীত বিশুদ্ধ টাটকা হুদু পাঠিবার আশা ছাড়া। গোয়ালারা হুদুের সহিত

* গোপালন—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত। ৩০১৯, বহুপাড়া লেন, কলিকাতা হইতে শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত। দ্বিতীয় ১০ আনা।

নানাপ্রকার ভেজাল মিলাইয়া দেয় ; এমন কি সময়ে সময়ে নিজেদের অপরিষ্কার দুর্গন্ধযুক্ত গামছা কোন আবর্জনাপূর্ণ পুকুরিণীর জলে বা নালায় বা ডোবায় ডিকাইয়া ছুড়ে নিংড়াইয়া দেয় । কেহ বা খড়িগুড়ার জল, ময়না ও বাতাসা প্রকৃতি মিশ্রিত করিয়া দেয় ।”

কিন্তু গোজাতির উন্নতির উপায় কর' ত দূরের কথা আমরা গৃহপালিত গাভীরও আবশ্যক যত্ন করি না । হিন্দুগৃহে গাভী ভগবতী বলিয়া পুজিতা হইতেন ; গৃহলক্ষ্মীরা গোপালন পূণ্য ও কর্তব্য কার্য্য মনে করিতেন । তখন—আর সে বড় অধিক দিনের কথা নহে—হিন্দুগৃহে গাভীর ঘরের অস্ত ছিল না । কলে গৃহে গৃহে ঘটোয়ী গাভীরও অভাব ছিল না—বলিষ্ঠকার শিশু ও বিয়ল বলিয়া মনে হইত না । এক্ষণে সে অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে । এখন কেবল গোচরশুল্ক সহরে নহে, পরন্তু পরীগ্রামেও গৃহস্থ ছুড়ের জন্ত ছুড়বাবসারীর উপর নির্ভর করিয়া থাকেন ।

সহরে ছুড় যোগাইবার ব্যবস্থাও শোচনীয় । তাহারই কলে দেশে উৎকৃষ্ট গাভীর অভাব হইতেছে । সরকার হইতে প্রকাশিত মেজর মিরেগার ও মেজর ডন প্রণীত ভারতে গোশালা সম্বন্ধীয় বৃহৎ পুস্তকে লিখিত হইয়াছে—বৎসর বৎসর কলিকাতার বাজারে বহু ছুড়বতী গাভী লইয়া বাওয়া হয় । ছুড়বাবসারীরা মাসে মাসে কিস্তি কিস্তি টাকা দিবার কড়ারে গাভী ক্রয় করে । কিন্তু ছুড় কমিয়া যাইলেই সেই সব গাভী কসাইদিগের নিকট বিক্রীত ও বিনষ্ট হয় ; কারণ, সহরে গোচর নাই—গোশালার ভাড়াও অধিক । এইরূপে দেশে উৎকৃষ্ট গোজাতির সর্জনশ ঘটতেছে । কোথায় উৎকৃষ্ট গাভী-বৎসগুলি হইতে গোজাতির উন্নতির উপায় হইবে, না সেগুলি নষ্ট হইতেছে । আর অন্যান্য দেশে লোক গোজাতির উন্নতির উপায়ই করিতেছে ; নানা বিদেশ হইতে উৎকৃষ্ট গাভী বা বও লইয়া খাইয়া পরীক্ষা করিতেছে । উৎকৃষ্ট গাভীর অভাবহেতু গাভী দর বাড়িয়া চলিয়াছে—পূর্বে ৫০।৬০ টাকার উৎকৃষ্ট গাভী পাওয়া যাইত ; এখন শতাধিক টাকারও উৎকৃষ্ট গাভী পাওয়া দুরূহ ।

বঙ্গালা দেশের মকঃস্থলের কথা যাহারা সবিশেষ অবগত আছেন, তাহার জানেন—এ দেশে গোজাতির অঘটনের অস্ত্র নাই । বর্ষাকালে চাষের গরুগুলি কর্ম্মমাক্ত ফেঁরে লাঙ্গল টানিয়া লইয়া শীর্ণকার হয়—পর্য্যাপ্ত খাদ্য প্রায় পায় না । আর কি চাষের গরু কি গাভী কাহারও ভাগ্যে শুক গোশালায় বাস ঘটে না—পশুপূর্ণ মশকবাস গোশালায় বাস করিয়া তাহার অস্থিচর্শসায় হয় । ইহার উপর

আবার কোন কোন স্থানে জলৌকার অত্যাচার আছে। বর্ষার আরম্ভ হইতে শীতের শেষ পর্য্যন্ত মাঠে ধান থাকে। ততদিন গরুগুলি মাঠে ঘাইতে পায় না। এই দীর্ঘকাল অপর্ণায়াপ্ত আহায়েও যে সকল দীর্ঘকাল গরু জীবিত থাকে, সেগুলি কতকাংশ ইহার পরই মৃত্তি পাইয়া মাঠে চরিয়া অতিরিক্ত আহায়ে মুতুমুখে পতিত হয়। একথা মিষ্টার হিউম তাহার ভারতে কৃষিবিবরণ পুস্তকে বিশেষভাবে লিখিয়াছেন। বাঙ্গালার স্থানে স্থানে অবস্থা এমন যে উপযুক্ত ঘেওর অভাবে গাভী গর্ভবতী হয় না। বেশে গোচর নাই। পূর্বে হিন্দুরা শ্রাচ্ছে বৃষ উৎসর্গ করিতেন; সেই সকল বৃষ স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিত; সংখ্যাধিক্য ঘটিলে প্রাকৃতিক নিয়মে তাহারা পরস্পর লড়াই করিত—চর্কল পরাজিত হইয়া স্থানত্যাগ করিত, যোগ্যতম টিকিয়া থাকিত। এখন বৃষ আর উৎসৃষ্ট হয় না—হইলেও বড় থাকে না।

আর গোনড়কে স্থানে স্থানে গরু উজাড় হইয়া যায়। ফুরে (Foot and mouth disease) ও পশ্চিমা (Rinder pest) গোজাতির সংক্রামক ব্যাধির মধ্যে সর্বাধিক ভয়ানক। ব্যাধিগ্রস্ত গরুর নিকট হইতে স্তন্য গরুর নিকটে ঘাইলে স্তন্য গরুর পীড়িত হইবার সম্ভাবনা। অথচ আমাদের দেশে লোক কোনরূপ সতর্কতা অবগতন করে না। পশ্চিমায় মৃত গরুর শব দগ্ধ করিয়া ফেলাই কর্তব্য। তাহা না করিয়া শব মাঠেই ফেলিয়া দেওয়া হয়। তাহাতে ব্যাধিবিস্তারে আর বিলম্ব হয় না। আর সেই মৃত গরুর চর্শ বিক্রীত হয়—তাহাতে দেশে দেশে ব্যাধির বিস্তার সংসাদিত হয়। গোচিকিৎসার কথাও এ দেশে অধিকাংশ লোক অবগত নহেন। বতদিন এইরূপ অবস্থার প্রতীকার না হইবে, ততদিন দেশে গোজাতির দিন দিন অবনতিই হইবে।

যুরোপে দুগ্ধ ও দুগ্ধোৎপন্ন নানা প্রকার ব্যবসারে প্রচুর অর্থান্বয় হইয়া থাকে। ইংলণ্ডের কৃষির আয়ের এক ষষ্ঠাংশ অর্থাৎ ৪৮ কোটি টাকা গোশালার দ্রব্য হইতে পাওয়া যায়। ইহার উপর প্রতি বৎসর বিদেশ হইতে ৩০ কোটি টাকার ঐ সকল মাল ইংলণ্ডে আমদানী হয়। ইংলণ্ডে ও জার্মানীতে এ বিষয়ে বৃহৎ বৃহৎ গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। সে সকলের মধ্যে জার্মান ডাক্তার ক্রিস্টিয়ানের পুস্তক বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বোম্বাই সরকার এ দেশে গোশালাসম্বন্ধে একখানি পুস্তিকা প্রচার করিয়াছেন। এ দেশেও দুগ্ধ ও দুগ্ধোৎপন্ন দ্রব্যের কাটতি কম নহে। বহুং এ দেশে মাংসের ব্যবহার অল্প এবং এই সকল দ্রব্যের ব্যবহারই অধিক। এরূপ অবস্থায় এ দেশেও বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে গোশালা প্রতিষ্ঠিত করিয়া ব্যবসা চালান

লোকের কর্তব্য । সম্প্রতি বোম্বাইয়ের গভর্ণর স্বয়ং এই কার্য্যে লোককে বিশেষ উৎসাহ দিয়াছেন । বাঙ্গালা সরকারও একটি বৃহৎ কৃষিক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তপার গোষ্ঠাতির উন্নতিসাধনে সচেষ্ট হইয়াছেন । আমাদের দেশে এরূপ অনুষ্ঠান নূতন—নানা কারণে আমাদের দেশের লোক ব্যবসা-বিমুখ—আমাদের মূলধন অল্প ; এই সকল কারণে এ দেশে কোন নূতন অনুষ্ঠানে প্রথমেই সরকারের উদ্যোগ দেখিলে আমরা সেই পথের পথিক হইতে পারি । এই কার্য্যে সরকারের উদ্যোগ দেখিয়া আমরা আশার অবকাশ পাইতেছি ।

এ দেশে গোচরের অভাবও সরকারের উদ্যোগ ব্যতীত দূর হইবার সম্ভাবনা অল্প । এ বিষয়ে জমীদারদিগের সাহায্য লইতে হইবে । কিন্তু অদিকাংশ হলে ভীষাণদিগের সাহায্য সরকারের ইচ্ছিতে ঘত সহজে পাওয়া যায় অল্প কোন কারণে তত সহজে পাওয়া চুকর । গোচরে ঘাসের চাষ করিলে বার মাস গরুর উপযুক্ত আহার দেওয়া যাইতে পারে । “যদি সম্ভব হয়, গোচারণ ভূমির অতিরিক্ত এক টুকরা জমি গরুর ঘাস উৎপন্ন করিবার জন্য নিজ আবাসী জমি হইতে পৃথক্ করিয়া রাখা উচিত । তাহা হইলে গরুর কাঁচা ঘাসের অভাব সর্ব্বংসরে হইবে না । কাহারও কাহারও মতে ঘাসের আবাস না করিয়া, ছোলা ও দানার আবাস করা উচিত এবং গরুকে গোচরে চরিতে না দিয়া ঘরে খাওয়ান ভাল ।” গরুকে গোচরে চরিতে দেওয়ায় রোগসংক্রমণশঙ্কা থাকে বটে, কিন্তু গরুর পক্ষে এ শ্রম অভাবশূন্যক । গরুকে গোচরে চরিতে দিলে সে কাম হয় । এমন কি বংশোৎপাদনার্থ গোশালার রক্ষিত বগুকেও শ্রম করিতে না দিলে তাহার স্বাস্থ্য ক্ষুদ্র হয় । চুর্কা ও গিনি ঘাস এ দেশের পশুদিগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী । দুগ্ধবতী গাভীর পক্ষে কাঁচা গম, ঘব, কলাই উত্তম খাদ্য ও দুগ্ধবর্দ্ধক ।

এ দেশে নানাপ্রকার গরু আছে । বাঙ্গালার “দেবী” গরু অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রকার—কর্দমান্ত ভূমিতেও অনায়াসে গভায়াত করিতে পারে । পূর্বে এই জাতীয় গরুর মধ্যেও প্রচুর দুগ্ধবতী গাভী পাওয়া যাইত । এক্ষণে অবশ্যে সে অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে—দেবীর গরুর মধ্যে প্রচুর দুগ্ধবতী গাভী চূর্ণভ ভাওয়ালপুরী গরু বৃহদাকার । মাদ্রাজের নেলোর অঞ্চল উৎকৃষ্ট গরুর জন্ম প্রসিদ্ধ । পশ্চিমা বা তত্ত্বির কাবিবাড়ি ও মহীশূরেও উৎকৃষ্ট গরু পাওয়া যায় । মণ্টগ মরীরে ও পাটনার ইংরাজী বণ্ড দিয়া স্থানীয় গাভীর গর্ভে যে গরু উৎপাদিত হইয়াছে সে দুই জাতীয় গরুই ভাল হইয়াছে । মণ্টগমরীর গাভী দৈনিক ১৬।১৭ সের দুগ্ধও দেয়, দেখা দিয়াছে । পাটনার টেলারস ব্রিড গরুও উৎকৃষ্ট ॥

স্বতরাং দেখা ঘাইতেছে, চেষ্টা করিলে এ দেশে গোজাতির উন্নতি সহজেই হইতে পারে।

ব্যবসা হিসাবে গোপালনের কথা ছাড়িয়া দিলেও এ দেশে গৃহস্থের পক্ষেও গোপালনবিধি অবগত থাকা প্রয়োজন। কারণ—“গৃহপালিত পশুদিগের মধ্যে উপকারিতার গোজাতি সর্বাধিক। সেজন্য সকল সভ্যসমাজেই তাহার পালন ও রক্ষণ সম্বন্ধে দেশকালানুযায়ী বিশেষ বিধি-বিধান সম্বন্ধে অবলম্বিত হইয়া থাকে। নিত্য মাংসাহারবর্জিত দেশে গোজাতি মনুষ্যের জীবনধারণ বলিণেও অত্যাশ্রিত হয় না; তাহার পালন, রক্ষণ ও উন্নতির প্রতি দৃষ্টি রাখা গৃহস্থের অবশ্য কর্তব্য।”

সরকার পশুচিকিৎসা বিভাগ গঠিত করিয়া গবাদি পশুর উন্নতির ও চিকিৎসার উপায় করিয়াছেন। আমাদের আলোচ্য গ্রন্থের লেখক মহাশয় সেই বিভাগে কাৰ্য করিয়া অতিশ্রদ্ধা লাভ করিয়াছেন। তাঁহার এই পুস্তকখানি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। ইহাতে আমাদের আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত হয় নাই। ইহাতে বহু অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের সন্নিবেশ থাকিলেও এ দেশে আরও বিস্তৃত পুস্তকের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়। আমরা আশা করি, সত্যোক্ত বাবু আমাদের সে আশা পূর্ণ করিবেন। আর তিনি কেবল ইংরাজী পুস্তক হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়াই নিরস্ত হইবেন না; পরন্তু আমাদের দেশে গোজাতির নানা ব্যাধিতে যে সব ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সে সকলের গুণাগুণের ও পরীক্ষা করিয়া পরীক্ষাকৃত তাঁহার পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিবেন।

ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତ



ଦିବ ।

প্যারীচাঁদ মিত্র ।

—:—

যে সকল বাঙ্গালীর চোঁটায় বঙ্গভাষা উন্নতির পথারুণ হইয়াছিল—যে সকল বাঙ্গালীর চোঁটায় বাঙ্গালা সাহিত্য আজ বঙ্গদেশের সর্বত্র সমাদৃত ও সম্পূর্ণতাপ্রাপ্ত, সেই সকল বাঙ্গালীর মধ্যে প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান অতি উচ্চে । গত ৩৫ শ্রাবণ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চোঁটায় তাঁহার শত বার্ষিক জন্মদিনে তাঁহার স্মৃতিসভার অনুষ্ঠান হইয়াছিল ।

১২৯৯ বঙ্গাব্দে ক্যানিং লাইব্রেরী হইতে খ্রীষ্টক বোম্বেশক্তি বন্দোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত প্যারীচাঁদের গ্রন্থাবলীর ভূমিকায় বক্তৃতাশ্রী লিখিয়াছিলেন,—

“গদ্য বস্তু সুখবোধ্য হইবে, সাহিত্য ততই উত্তমিকারক হইবে । যে সাহিত্যের পাঁচ লাভ জন মাত্র অধিকারী, সে সাহিত্যের জগতে কোন প্রয়োজন নাই ।

“প্রাচীন কালে অর্থাৎ এ দেশে মুজাফফ স্থাপিত হইবার পূর্বে, বাঙ্গালার সচরাচর পুস্তকরচনা সংস্কৃতের ভাষা পদ্ধতি হইত । গদ্য-রচনা যে ছিল না, এমন কথা বলা যায় না, কেন না, হস্ত-লিখিত গদ্যগ্রন্থের কথা শুনা যায় । সে সকল গ্রন্থও এখন প্রচলিত নাই, সুতরাং তাহার ভাষা কিরূপ ছিল, তাহা এখনে বলা যায় না । মুজাফফ স্থাপিত হইলে, গদ্য বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রথম প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইল । প্রবাদ আছে যে, রাজা রামমোহন রায় সে সময়ের প্রথম গদ্য-লেখক । তাঁহার পর যে গদ্যের সৃষ্টি হইল, তাহা লৌকিক বাঙ্গালা ভাষা হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন, এমন কি, বাঙ্গালা ভাষা দুইটি স্বতন্ত্র বা ভিন্ন ভাষায় পরিণত হইয়াছিল । একটির নাম সাধুভাষা অর্থাৎ সাধু জনের ব্যবহার্য্য ভাষা, আর একটির নাম অপরা ভাষা অর্থাৎ সাধু ভিন্ন অপরা ব্যক্তিদিগের ব্যবহার্য্য ভাষা । এ স্থলে সাধু অর্থে পণ্ডিত বুদ্ধিতে হইবে । আমি নিজে বাল্যকালে ভট্টাচার্য্য অধ্যাপকদিগকে যে ভাষায় কথাপকথন করিতে শুনিয়াছি, তাহা সংস্কৃতব্যবসায়ী ভিন্ন অন্য কেহই ভাল বুঝিতে পারিতেন না । তাঁহার কদাচ ‘বহের’ বলিতেন না,—‘বদির’ বলিতেন ; কদাচ ‘চিনি’ বলিতেন না—‘শর্করা’ বলিতেন । ‘বি’ বলিলে তাঁহাদের রসনা অন্তঃ হইত, ‘আজাই’ বলিতেন, কদাচিৎ কেহ ‘বৃত্তে’ নামিতেন । ‘চুপ’ বলা হইবে না,—‘কেশ’ বলিতে হইবে । ‘কলা’ বলা হইবে না,—‘রঙা’ বলিতে

হইবে। ফলাফলে বসিঙ্গা ‘দই’ চাহিবার সময় ‘দধি’ বলিয়া চীৎকার করিতে হইবে। আমি দেখিয়াছি, একজন অধ্যাপক একদিন ‘শিশুমার’ ভিন্ন ‘শিশু’ শব্দ যুখে আনিবেন না, শ্রোতার ও কেহ ‘শিশুমার’ অর্থ জানে না, হুতরাং অধ্যাপক মহাশয় কি বলিতেছেন, তাহার অর্থবোধ লইয়া অতিশয় গওগোল পড়িয়া গিয়াছিল। পণ্ডিতদিগের কথোপকথনের ভাবাই বেধানে এইরূপ ছিল, তবে তাঁহাদের লিখিত বাঙ্গালা ভাষা আরও কি ভয়ঙ্কর ছিল, তাহা বলা বাহুল্য। একরূপ ভাষার কোন গ্রন্থ প্রণীত হইলে, তাহা তখনই বিলুপ্ত হইত, কেন না, কেহ তাহা পড়িত না। কাজেই বাঙ্গালা সাহিত্যের কোন শ্রীবৃদ্ধি হইত না।

“এই সংস্কৃতভাষাশ্রিত ভাষা প্রথম মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তের হাতে কিছু সংস্কার প্রাপ্ত হইল। ইহাদিগের ভাষা সংস্কৃতভাষাশ্রিত হইলেও তত ভ্রষ্টোদ্যম নহে। বিশেষতঃ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা অতি সূক্ষ্ম ও মনোহর। তাঁহার পূর্বে কেহই একরূপ সূক্ষ্ম বাঙ্গালা গদ্য লিখিতে পারে নাই এবং তাঁহার পরেও কেহ পারে নাই। কিন্তু তাহা হইলেও সর্বজন-বোধগম্য ভাষা হইতে ইহা অনেক দূরে রহিল। সকল প্রকার কথা এ ভাষার ব্যবহার হইত না বলিয়া, ইহাতে সকল প্রকার ভাব প্রকাশ করা বাইত না এবং সকল প্রকার রচনা ইহাতে চলিত না। গদ্যে ভাষার ওজস্বিতা এবং বৈচিত্র্যের অভাব হইলে, ভাষা উন্নতিশালিনী হয় না। কিন্তু প্রাচীন প্রণয় আবহু এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষার মনোহারিতায় বিমুগ্ধ হইয়া কেহই আর কোন প্রকার ভাষার রচনা করিতে ইচ্ছুক বা সাহসী হইত না। কাজেই বাঙ্গালা সাহিত্য পূর্ব্বমত সঙ্কীর্ণ পথেই চলিল।

“ইহা অপেক্ষা বাঙ্গালা ভাষার আরও একটি গুরুতর বিপদ ঘটয়াছিল। সাহিত্যের ভাষাও যেমন সঙ্কীর্ণ পথে চলিতেছিল, সাহিত্যের বিষয়ও ততোধিক সঙ্কীর্ণ পথে চলিতেছিল। যেমন ভাষাও সংস্কৃতের ছায়ামাত্র ছিল, সাহিত্যের বিষয়ও তেমনই সংস্কৃতের এবং কদাচিৎ ইংরাজির ছায়ামাত্র ছিল। সংস্কৃত বা ইংরাজি এতদ্বয়ের মারসঙ্কলন বা অম্লবাদ ভিন্ন বাঙ্গালা সাহিত্য আর কিছুই গ্রন্থ করিত না, বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রতিষ্ঠাশালী যথেষ্ট ছিলেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু তাঁহার শক্ততা ও সীতার বনবাস সংস্কৃত হইতে, ত্রাস্তিবিলাস ইংরাজি হইতে—এবং বেতাগ-পঞ্চবিংশতি হিন্দি হইতে সংগৃহীত। অক্ষয়কুমার দত্তের ইংরাজি একমাত্র অবলম্বন ছিল। আর সকলে তাঁহাদের অম্লকারী এবং অম্লবর্তী। বাঙ্গালী লেখকেরা গতানুগতিকের বাহিরে হস্ত প্রসারণ করিতেন না। অগতের

অনন্ত ভাণ্ডার আপনাদের অধিকারে আনিবার চেষ্টা না করিয়া, সকলশেষে ইংরাজি ও সংস্কৃতের ভাণ্ডারে চুরির সন্ধানে বেড়াইতেন। সাহিত্যের পক্ষে ইহার অপেক্ষা গুরুতর বিপদ আর কিছুই নাই। বিজ্ঞানাগর মহাশয় ও অক্ষর বাবু বাহা করিয়াছিলেন, তাহা সময়ের প্রয়োজনানুযায়িত, অতএব তাহারা প্রশংসা ব্যতীত অপ্রশংসার পাত্র নহেন; কিন্তু সমস্ত বাঙ্গালি-লেখকের দল সেই একমাত্র পথের পথিক হওয়াট বিপদ।

“এই দুইটি গুরুতর বিপদ হইতে প্যারীচাঁদ মিত্র বাঙ্গালা সাহিত্যকে উদ্ধৃত করেন। যে ভাষা সকল বাঙ্গালীর বোধগম্য এবং সকল বাঙ্গালী কর্তৃক ব্যবহৃত, প্রথম তিনিই তাহা গ্রন্থপ্রণয়নে ব্যবহার করিলেন এবং তিনিই প্রথম ইংরাজি ও সংস্কৃতের ভাণ্ডারে পূর্কগামী লেখকদিগের উচ্ছিষ্টাবশেষের অহুসন্ধান না করিয়া, স্বভাবের অনন্ত ভাণ্ডার হইতে আপনার রচনার উপাদান সংগ্ৰহ করিলেন। এক ‘আলালের ঘরের দুলাল’ নামক গ্রন্থে এই উত্তর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। ‘আলালের ঘরের দুলাল’ বাঙ্গালা ভাষার চিরস্বামী ও চিরস্বরীর চইবে। উহার অপেক্ষা উৎকর্ষ গ্ৰন্থ তত্পরে কেহ প্রণীত করিয়া থাকিতে পারেন অথবা ভবিষ্যতে কেহ করিতে পারেন, কিন্তু ‘আলালের ঘরের দুলালের’ দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের যে উপকার চইয়াছে, আর কোন বাঙ্গালা গ্রন্থের দ্বারা সেকপ হয় নাই এবং ভবিষ্যতে চইবে কি না সন্দেহ।

“আমি এমন বলিতেছি না যে, ‘আলালের ঘরের দুলালের’ ভাষা আদর্শভাষা। উহাতে গাঙ্গীর্ণের এবং বিস্তৃতির অভাব আছে, উহাতে অতি উন্নত ভাব সকল, সকল সময়ে, প্রতিফলিত করা যায় কি না, সন্দেহ। কিন্তু উহাতেই প্রথম এ বাঙ্গালা দেশে প্রচারিত হইল যে, যে বাঙ্গালা সর্লভনমণে কথিত এবং প্রচলিত, তাহাতে গ্রন্থরচনা করা যায়, সে রচনা স্বন্দর ও চর এবং যে সর্লভন-ভঙ্গ-প্রাচীনা সংস্কৃতানুযায়িনী ভাষার পক্ষে চলিত, এ ভাষার তাহা সচছ গুণ। এই কথা জানিতে পারা বাঙ্গালী জাতির পক্ষে অল্প লাভ নহে এবং এই কথা জানিতে পারার পর হইতে উন্নতির পথে বাঙ্গালা সাহিত্যের গতি অতিশয় ভ্রাতবোণে চলিতেছে। বাঙ্গালা ভাষার এক সীমার তারান্বয়ের কাদম্বরীর অনুবাহ, আর এক সীমার প্যারীচাঁদ মিত্রের ‘আলালের ঘরের দুলাল।’ ইহার কেহই আদর্শ ভাষার ব্রুচিত নয়। কিন্তু ‘আলালের ঘরের দুলালের’ পর হইতে বাঙ্গালী লেখক জানিতে পারিল যে, এই উত্তর জাতীয় ভাষার উপযুক্ত সমাবেশ দ্বারা এবং বিষয়-ভেদে একের প্রবলতার ও অপরের অল্পতার দ্বারা আদর্শ বাঙ্গালা গঠে উপস্থিত হওয়া

বার। প্যারীচাঁদ মিত্র আদর্শ বাঙালী পণ্ডের নৃত্তিকর্তা নহেন, কিন্তু বাঙালী গদ্য যে উন্নতির পথে যাইতেছে, প্যারীচাঁদ মিত্র তাহার প্রধান ও প্রথম কারণ। ইহাই তাঁহার অক্ষর কীর্তি ।

“আর তাঁহার দ্বিতীয় অক্ষর কীর্তি এই যে, তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, সাহিত্যের প্রকৃত উপাদান আশ্বাদের ঘরেই আছে, তাহার জন্য ইংরাজি বা সংস্কৃতের কাছে ভিক্ষা চাহিতে হয় না। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, যেমন জীবনে, তেমনই সাহিত্যে, ঘরের সামগ্রী বড় সুন্দর, পরের সামগ্রী তত সুন্দর বোধ হয় না। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, যদি সাহিত্যের দ্বারা বাঙালী দেশকে উন্নত করিতে হয়, তবে বাঙালী দেশের কথা গঠিয়াই সাহিত্য পড়িতে হইবে। প্রকৃতপক্ষে আশ্বাদের জাতীয় সাহিত্যের আদি ‘আশালোর ঘরের ছন্দাল’। প্যারীচাঁদ মিত্রের এই দ্বিতীয় অক্ষর কীর্তি।”

নব-বরষায় ।

—:~:~:~—

আবার আসিল স্ত্রাম বৃষ্টি শুভ লগনে
দিক্শেবে ভাতি তা’র জাগে বৃষ্টি গগনে ।

বহুনার কূলে কূলে

ছুটায় কদম-কূলে,

বেণু বনে সমীরণে ধানী বাজে সঘনে,

ফিরিয়া আসিল স্ত্রাম বৃষ্টি শুভ লগনে ।

জাগে তা’র শিখিচূড়া ঐ রামধনুতে,

বকুলকূটজমালা ছলে তা’র তনুতে,

মধুমাধা দুটি করে,

ধানীটি শিছলি পড়ে,

পুনঃ ধরে হাত মাঝি’ কেতকীর রেণুতে,

স্নাধা রাধা বাজে ধানী ঘন বন বেগুতে ।

আর্যাবর্ত ।



বহিঃমন্ত্র চট্টোপাধ্যায় ।

ঐ রে, তমাল-ডালে মাতিল কি দোলনে ?

তড়িতের পিচকারী লালে লাল রঙনে ।

গোঠশেবে শাদা বেবে,

ধেহুগুলি আছে জেগে,

রাখালেরা বসি ঐ ঘন ভূগ-নয়নে,

অনিমেখে চেয়ে মেখে কিবা বীন-নয়নে ।

আবার গোকূলে এস ক্রামরায় ফিরিয়া,

গোপিকারা গা'বে গান তব তম্বু দিগ্বিয়া,

এস গোষ্ঠে, এস মাঠে

এস কিব্বি' বনবাটে,

ঘনুনা হু'কূলে এস পীতধড়া পরিয়া,

চেউপরি নাচি নাচি এ গোকূলে ফিরিয়া ।

রাধিকার দাহ হরি' হৃদীভল পরশে,

প্রেমবীরে ভরি' দাও তাম্র ছদি-কলসে,

বিরহ অনল-জ্বালা,

জুড়াও, নিভাও, কালা,

অভিসারে গুরু গুরু বুকভরা হরবে ;

হৃদীল নিচোল পরি তেয়াগিবে গৃহ সে ।

আহুঁরী দাহুঁরী ডাকে কিছিবী ঘুঙুরে,

কুঞ্জে ফিরিয়া এস কিল্লীর নুংুরে ।

নাচাইয়া মধুরীয়ে,

আঁচলা দোলাবে ধীরে,

নটবর, এস কিরে জিরে লতাতকরে

তুফ ধরায়ে ভরি হৃদীভলে-মধুরে ।

শ্রীকালিদাস রায় ।

অশ্রু ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ।

—••••—

প্রত্যাবর্তন ।

—•—

অশ্রু জানিত, অশোক সেই দিন কিরিয়া আসিবে । অশোক সেই দিন কিরিয়া আসিয়াই কলিকাতায় রওনা হইবে বলিয়া বন্দোবস্ত করিবার জন্য মৈত্র মহাশয়কে সংবাদ পাঠাইয়াছিল । সে দিন সকাল হইতে অশ্রু তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল ; কোন শব্দ শুনিতে সে বাতায়নে আসিয়া দাড়াইতেছিল—বুঝি, অশোকের পাকী আসিতেছে । তাহার মনে বাসনা জাগিতেছিল—অশোক আহুক ।

সহসা পল্চাৎ হঠতে অশোক ডাকিল,—“অশ্রু !”

অশ্রু কিরিয়া চাহিল । সম্মুখে অশোক ! অপ্রত্যাশিত আনন্দের আবেগ বিদ্রোহের মত তাহার হৃদয়মধ্যে বহিয়া গেল । সে কণা কহিতে পারিল না । কিন্তু তাহার মুখে—চক্ষুতে সে আনন্দ ফুটিয়া উঠিল ।

অশোক পাকী হঠতে নামিয়া খানিকটা পথ হাটিয়া আসিয়াছিল । সে কখন আসিয়াছে—অশ্রু জানিতে পারে নাই । অশোক জিজ্ঞাসা করিল, “এ কয় দিন তোমার খুব অসুবিধা হইয়াছে ?”

অশ্রু বলিল, “না । তোমার কাব শেষ হইয়াছে ?”

অশোক হাসিয়া ফেলিল ; বলিল, “আমার কাবের শ্রী দেবিয়া নাথের গোমস্তা আমাকে তাড়াইয়া দিয়াছে ।”

অশ্রু বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, “কেন ?”

“তাহারা বলিল, জমীদার অশোক সিংহের প্রজা-চরিত্র-জ্ঞান এমনই ত্রাস্ত যে, তিনি অধিক দিন জমীদারীতে থাকিলে, তাঁহাকে জমীদারী বিক্রয় করিয়া কলিকাতা হইতে রেলভাড়া আনাইয়া তবে কলিকাতায় ফিরিতে হইবে ।”

সে সংক্ষেপে নাথের কথার অশ্রুকে বলিল । তাহার পর “জমীদার সাজা আমার কাব নহে” বলিয়া সে হাসিতে হাসিতে একথানা চেয়ারে বসিয়া পড়িল, খুব হাসিতে লাগিল ।

অশ্রু ও হাসিল। অশোক লক্ষ্য করিল, অশ্রুর পাণ্ডু গণ্ডে আবার স্বাস্থ্য-লাবণ্য ফিরিয়াছে।

তাহার পর যাতার উদ্যোগ হইতে লাগিল। অশোক নৌকার ঘাইয়া ট্রেন ধরিবে। মৈত্র মহাশয় বলিয়াছিলেন, মধ্যাহ্নের পূর্বেই যাত্রা না করিলে, ট্রেন ধরা ঘাইবে না; কারণ, পথে একটা থাল আছে—জোয়ারের সময় বাতীত সে থালে নৌকা চলে না; জোয়ার সরিয়া যাউলে আবার জোয়ারের জল আপেক্ষা করিতে চইবে। এই সংবাদে শঙ্কিত অশোক মধ্যাহ্নের বহু পূর্বেই যাত্রা করিতে বাস্তব হইয়াছিল। ক্রমে জিনিষপত্র সব নৌকার উঠিল। অশোক ও অশ্রু যাত্রা করিল। তখনও জোয়ার আসিতে বিলম্ব আছে, নৌকা কূলে ভিড়িতে পারে না; কর্দমাক্ত পিচ্ছিল তট অতিক্রম করিয়া নৌকার উঠিতে হইবে। অশোক অশ্রুর দিকে চাহিল। অশ্রু ইতস্ততঃ না করিয়া অগ্রসর হইল। অশোক ও অগ্রসর হইল। সে আপনি অভ্যস্ত সতর্কতাসহকারে পদক্ষেপ করিতেছিল; আর অশ্রুর দিকে চাহিতেছিল, পাছে পিচ্ছিল কর্দমে তাহার পদাশ্রয় হয়। একবার অশ্রুর পা একটু পিছলাইয়া গেল। তখন অশোক ক্ষিপ্রে তাহার কোমল—মাংসল উষ্ণ—হস্ত ধরিয়া তাহাকে স্থির করিল। স্থির হইয়া সে হাসিয়া অশোককে বলিল, “পিচ্ছিল পথে কেহ খলিতপথকে ব্রহ্মা করিতে যাইলে উভয়েরই পতনের সম্ভাবনা।” অশোক বলিল, “কিন্তু এক জনকে পড়িতে দেখিয়া নিশ্চেষ্ট থাকা ব্রাহ্মণের কাৰ্য্য নহে।” উভয়ে ঘাইয়া নৌকার উঠিল। নৌকা ছাড়িয়া দিল। বর্তমানের হুর্ভাবনা হইতে মুক্ত হইয়া ভবিষ্যতের জন্ত চিন্তিতচিন্ত মৈত্র মহাশয় ঘাসার ফিরিলেন।

নৌকা অগ্রসর হইতে লাগিল। নৌকার মধ্যে স্থান অল্প। উপরে যে আবরণ, তাহাতে রৌদ্র-তাপ নিবারিত হয় না। নৌকামধ্যে অতিরিক্ত তাপ অধুত হইতে লাগিল। অশোক লক্ষ্য করিল—অশ্রুর মুখ রক্তাক্ত হইয়া উঠিয়াছে, তাহার ললাট ও কণ্ঠ বর্ণাক্ত—অবসন্নচিত্ত কবরী-বন্ধনচ্যুত দুই চারিট কেশ তাহার ললাটে আবদ্ধ হইয়াছে। সে বলিল, “তোমার বড় কষ্ট হইতেছে। তুমি একটু শয়ন কর।” অশ্রু হাসিয়া বলিল, “আর তোমার কি বড় আশ্রয় বোধ হইতেছে?” অশোক একটা বালিসের উপর আর একটা বালিস দিয়া অশ্রুর দিকে ঠেলিয়া দিল; বলিল, “তোমার এখনই অশ্রু করিবে।” অশ্রু হাসিল; বলিল, “আমি সার ফিলিক সিডনির মত বলিতেছি—তোমার প্রয়োজন আমার প্রয়োজন অপেক্ষা অধিক।” অশোক হারি মানিল;

শেষে বাহির হইয়া পাইলটা ভিজাইয়া ছাত্তের উপর দিবার ব্যবস্থা করিয়া আসিল ।

নৌকা ঘরন খালের মুখে আসিল, তখনও খালে জোয়ারের জল প্রবেশ করে নাই । বহু নৌকা খালের মুখে অপেক্ষা করিতেছে । অশোকের নৌকাও কূলে ভিড়িল । বহুক্ষণ নৌকার মধ্যে বসিয়া অশোক নামিবার জন্য চকল চাইয়া উঠিয়াছিল । প্রায় এক বণ্টা অপেক্ষা করিতে হইবে শুনিয়া সে বলিল, “আমি একটু হাটিয়া যাই ।” অশ্রু বলিল, “আমিও হাটিব ।” অশোক বলিল, “চল ।”

দুই জনে নামিল । অশোক পত্রিকে বলিল, “পত্রি, আমরা একটু হাটিয়া যাউতেছি,—জোয়ার আসিলেই নৌকা খালে লইয়া মাঝিদের তাড়া দিস্—দেবী না হয় ।”

“হাঁ” বলিয়া পত্রি বিড়ি ও সেলাইয়ের সন্ধানে কোটের পকেটে হাত দিল ।

খালের ধার দিয়াই পথ । অশোক ও অশ্রু সেই পথ দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল । তখন অপরাহ্ন—রৌদ্রের আর সে ভেজ নাই—সূর্য প্রাস্তরের পবনে আর অনল-শ্বাস নাই । নৌকার মধ্যে উত্তাপে অশোকের বিবম ক্রান্তি বোধ হইতেছিল ; আর নৌকার আন্দোলনে তাহার বিবিধবার উল্লেখ হইতেছিল । বাহিরের এই বাতাসে আদিয়া সে হৃদ্য বোধ করিল ।

পথের পার্শ্বে নানা জাতীয় বৃক্ষ ও গুল্ম । অশ্রু অশোককে নানা বৃক্ষের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেছিল । একটি তরুর প্রাচুর্ভূতি শুদ্ধ শুদ্ধ রক্ত কুহুম দেখিয়া অশ্রু বলিল, “কি সুন্দর !”

অশোক বলিল, “চিকণ জ্ঞান পত্রের মধ্যে ফুলগুলি আরও সুন্দর দেখাইতেছে ।”

“কি ফুল ?”

“অশোক ”

অশ্রুর ওষ্ঠাধর বৃত্ত হাতে কুণ্ডিত হইল । সে হাসিয়া বলিল, “অশোক স্বভাব-সুন্দর ।”

অশোক উত্তর দিল, “কিন্তু অশ্রুর মত স্নিগ্ধ নির্মল মনে ।”

তখন রবি দিক্চক্রবালের নিকটে নামিয়াছে ; তাহার স্বর্ণবর্ণ কিরণে উজ্জ্বলিত অশ্রুকে দেখিয়া অশোকের মনে হইল—তাহার সৌন্দর্য্য সত্যই সম্বোধন ।

একটু নিঃ কৃমিতে পথের পার্শ্বে কতকগুলি খনচিত্রণ গুল্ম দেখিয়া অশ্রু জিজ্ঞাসা করিল—“এ কি গাছ ।”

অশোক বলিল, “বেত ; মধুসূদনের ভাষায় ‘বহুল মঙ্গল’ ।”

অশ্রু বলিল, “‘বহুল মঙ্গল’—সাধারণ স্তম্ভের বস্তুকে এমন স্তম্ভের ভাবে স্তম্ভের করিয়া বর্ণনা করিবার ক্ষমতা বাঙ্গালার আর কোন কবি, শুধু কবির কেন, লেখকের আছে ? মধুসূদনের কাব্যকীর্তি কালজয়ী ।”

“কিন্তু তাহার রচনায় কি চেষ্টার চিহ্ন স্থম্পষ্ট নহে ? তাহা কি ক্রটি নহে ?”

“চেষ্টার চিহ্ন মাহুকের সব উল্লেখযোগ্য কায়েটে দেখা যায়। তাহাকে কি ক্রটি বলা যায় ? চেষ্টা ব্যতীত কোন বিষয়ে উন্নতি হয় না। আজ যে গোলাপ আদর আদর করি, তাহা যে স্বচ্ছন্দ-বনজাত গোলাপকে আকারে ও সৌরভে পরাজিত করিতেছে, সেও ত চেষ্টার ফল। তাই বলিয়া আমরা কি আজিকার উদ্যমজাত গোলাপ ফেলিয়া দেই বনজাত ফুলেরই আদর করিব ?” তর্কের উৎসাহে তাহার মুখে দীপ্তি কুটিয়া উঠিতেছিল।

অশোক বলিল “কিন্তু কবিতায় কি স্বচ্ছন্দাগত ভাব ও ভাষা আদরণীয় নহে ?”

“চেষ্টার প্রমাণ সকল কবিতাতেই লক্ষিত হয় ; কোথাও অধিক, কোথাও অল্প। কিন্তু আমরা যে কারণে গৃহের পশ্চাতে কণ্টকগুণ্ড কাটিয়া কেলি, আর বন্ধ করিয়া টবে জাপানী চন্দ্রময়িকা রোশিত করিয়া ফুল দেখিয়া মুগ্ধ হই, সেই কারণেই মানিক গাঙ্গুলীর ‘ঐধর্মমঙ্গল’ ছাড়িয়া মধুসূদনের ‘মেঘনাদবধ’ পাঠ করি ; যে পুস্তক লোক বিদ্বত হয়—তাহারই মধ্যে স্বাধিকোপযোগিতার অভাব। সেম্প্রিয়ারের রচনার দ্বার্ষে যে কষ্টকল্পনার চূড়ান্ত লক্ষিত হয়।”

অশোক মুগ্ধ হইয়া অশ্রুর যুক্তি শুনি। সে ক্রমেই অশ্রুর প্রতি আকর্ষণ হইতেছিল। তবে সে আকর্ষণ জন্মের নহে—মতিকের ; ভাবের নহে—বৃদ্ধির ; সেই আকর্ষণ তাহাকে প্রবলভাবে অশ্রুর দিকে আকর্ষণ করিতেছিল, সে আকর্ষণের বেগ প্রতিহত করিবার সাধ্য বা ইচ্ছা কিছুই তাহার ছিল না।

কিছু দূর অগ্রসর হইয়া অশ্রু যখন ভাটীরের ব্রহ্মমধ্য খেত কুহ্ম দেখিয়া তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিল, তখন অশোক স্বীকার করিল, তাহার অজ্ঞতা অশ্রুর অজ্ঞতা অপেক্ষা অল্প নহে।

সেই কথা লইয়া অশ্রু বলিল, “আমরা আমাদের আপনার জিনিষগুলি চিনিতেও চেষ্টা করি না। আমাদের পূর্বপুরুষরা এ বিষয়ে আমাদের অপেক্ষা ভাল ছিলেন ; প্রাচীন সাহিত্যে তাহার বর্ণনা প্রমাণ আছে।”

অশোক বলিল, “এ বিষয়ে আমি ভোঁমার সহিত একমত, আমরা দেশকেই চিনি না।”

তাহারা চাহিয়া দেখিল, খালে জোয়ারের জল প্রবেশ করিতেছে—
কর্দমাবশেষ প্রবাহপথ আকৃত করিয়া ক্রমে জল বাড়িয়া উঠিতেছে । খালের
ধারে প্রান্তর হইতে নামিয়া গাভীগুলি সমর দিনের পর জল পান করিয়া
তৃষ্ণানিবারণ করিতেছে । নৌকাগুলি ক্রমে অগ্রসর হইতেছে ; মাঝিরা লগি
ঠেলিয়া নৌকা চালাইতেছে ।

অন্নকণ পরেই তাহারা খালের অপর প্রান্তে উপনীত হইল । তাহাদের
নৌকা তথায় আসিলে তাহারা আবার নৌকায় উঠিল ও খণ্ডানয়ে গন্তব্য স্থানে
পৌছিল ।

অশোক ট্রেনে একটি কামরা ভাড়া করিয়াছিল । ট্রেনে উঠিয়া পথভ্রম-
শ্রান্তা অশ্রু অন্নকণমধোই গভীর নিদ্রায় অভিহৃতা হইয়া পড়িল । অশোক
বসিয়া ভাবিতে লাগিল ।

কিছুক্ষণ পরে অশোক অশ্রুর দিকে চাহিয়া দেখিল । তাহার স্মৃতিশ্রান্ত মুখে
উজ্জ্বল আলোক পতিত হইয়াছে । অশোক সে মুখে কোমলতার সঙ্গে সূচতার
অপূর্ণ সন্মিলন দেখিতে পাইল ; সে মুখে রমণীর কমলীর সৌন্দর্য্যে যেন পুরুষোচিত
ভাবের অভিভাব্তি স্পষ্ট বোধ হইল । সত্যই অশ্রু তাহার নিকট রহস্যময়ী ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ ।

—: :—

গৃহে ।

ট্রেন যখন কলিকাতায় প্রবেশ করিল, তখন প্রভাতের আলোকে কলিকাতার
ধূমলিন আকাশ রৌণীর গগের মত পাহু দেখাইতেছে—সৌধারণো আলোক
পড়িয়াছে, কেবল সোধ—যেন নিত্যন্তই নিরবচ্ছিন্ন । অব্যাদি গাড়ীতে তুলিয়া,
ভূতাদিগের ঘাইবার ব্যবস্থা করিয়া অশ্রুকে লইয়া অশোক গৃহান্তিমুখে চলিল ।
গাড়ী ষ্টেশন হইতে রাজপথে আসিলে—সেই পরিচিত আকাশ ও বাতাস,
শব্দ ও গন্ধ, যান ও জনতা—এই সকলের মধ্যে আসিয়া অশোকের মনে হইল
হেন; তাহার এই করদিনের কার্য্য ও অহুত্ব,—স্মরণবন, পল্লীগৃহ, গ্রাম্য-জীবন
—সবই স্বপ্নমাত্র ; আর সমুদ্রমহনের মধ্যে সুধাই যেমন সত্য, তাহার এই সুখ-
স্বপ্নের মধ্যে অশ্রুই তেমনই সত্য ।

গাড়ী গুল্মঘারে আসিয়া থির হইল । মনোমোহিনী প্রত্যাহ হইতেই পুস্ত্রের অঙ্গ অপেক্ষা করিতেছিলেন । তাহার চার জল তিন বার গরম করা ও ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে, চতুর্থ বার কেটল উনানে চড়িয়াছে । গাড়ীর নগ্ন শুনিয়াই তিনি নানির আসিলেন ।

অশোক মা'কে দেখিয়া হাসিয়া বলিল, “মা, এ কর দিন ত্র্যাক্ষিতে বুঝাইতে পারিয়াছিলে ত ?”

পুস্ত্রের কৃণল জিজ্ঞাসা করিয়া মনোমোহিনী শ্বেতবর্ণ-মুখে তাহার দিকে চাহিলেন ; সত্য সত্য তাহার কষ্ট হয় নাই ত ? তাহার পর তিনি অশ্রুর হাত ধরিয়া বলিলেন, “মা, আইগ ।” অশোকের পক্ষে তিনি অশ্রুর কথা জানিয়াছিলেন ; তাহার দৃষ্টিতে তিনি বাধিত হইয়াছিলেন, এখন প্রথম মনেই তিনি তাহাকে বৈশাখিক করিয়া আপনাত করিয়া লইলেন । অশোককে “মাহুধ-করা” ঝি—খোকায় ঝি—অশ্রুর দিকে চাহিয়া বলিল, “যেন মা লক্ষ্মী !” মনোমোহিনী তাহাকে বলিলেন, “খোকায় ঝি, যা, গায় চার জল আনিতে বল ।” পরিততক্ষণ জিনিষ নামাইয়া, গাড়োগানের ভাড়া চুকাইয়া—দস্তুরী পকেটস্থ করিয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল ; সে বলিল, “আমি জল লইয়া যাইতেছি ।” বৈজ্ঞানিক মতামতের বিরুদ্ধে সেকারের করিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইল বলিয়া সে একটু দ্বিধিত হইল ।

“তোমার মনের সব ঠিক আছে”—পুস্ত্রকে এই কথা বলিয়া মনোমোহিনী অশ্রুকে লইয়া দ্বিতলে চলিলেন ; আদার, ওয়াশিংল, প্রজা, গৃহ—কিছুরই কোন কথা তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন না । অশোক স্বয়ং বাহা করিয়া আসিয়াছে, তাহাতে আবার জিজ্ঞাসা করিবার কি আছে ? বৈষয়িক কার্যের তিনি কি জিজ্ঞাসা করিবেন ? আর করদিন পরে সে আসিয়া কেবল দাঁড়াইল, এখন কি জিজ্ঞাসা করিবার সময় ? তাই তিনি বাতা ও মননাদিগের কথাও জিজ্ঞাসা করিলেন না । কেবল যে স্থির “খোকায় ঝি” নামে অশোকের বিগত শৈশবের স্মৃতি জড়িত ছিল, সে অশোককে জিজ্ঞাসা করিল, “দাদাবাবু, কত টাকা আনিলে ?” অশোক খুব গম্ভীর ভাব দেখাইয়া বলিল, “লাট না যাইলে কি টাকা আনা যায় ?” মনোমোহিনী ভাবিলেন, “ঠিকই ত ।” অশোক কিন্তু অশ্রুর দিকে চাহিয়া হাসিয়া ফেলিল ।

মধ্যাহ্নের পর অশোক তিন দিনের অনাধীত সংবাদপত্রগুলি লইয়া অনায়াসে সর্বদেশের আবশ্যক অনাবশ্যক সর্ববিধ সংবাদ সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিতেছে, এমন সময় মা আসিয়া ব'ললেন, “অশোক, মোস্তার না কি বাড়ীর কাঠ-কাঠরা—আসবাব-পত্র সবই বিক্রয় করিয়াছে ?”

অশোক হাসিয়া বলিল, “তুমি বৃষ্টি পরির কাছে এ সংবাদ সংগ্রহ করিলে ? পরিতী সংবাদপত্রের ও অধম ; কোন খবর গোপন রাখিতে পারে না ।”

“ছিঃ ! ছিঃ ! বাড়ী ভরা আসবাব, সে কি কম ? আমি তখনই বলিয়াছিলাম, যখন কলিকাতায় চলিলাম, তখন এ সব লইয়া চল । তা’ তিনি শুনের নাই ; বলিয়াছিলেন, টানাটানিতে জিনিষ নষ্ট হইবে । আসল কথা, সে সব জিনিষে রম্যর স্বতি জড়ান ছিল—সে সব সে যেমন দেখিয়া গিয়াছিল, তিনি তেমনই রাখিয়াছিলেন”—মা’র কষ্টের অশ্রুজড়িত হইয়া আসিল ।

অকস্মে চক্ষু মুছিয়া না বলিলেন, “অমন লোক রাখিস না ।”

অশোক বলিল, “কিন্তু না, সে ত যাহা করিবার, তাহা করিয়া চুকিয়াছে । এখন তাহাকে তাড়ান না তাড়ান সমান ; কেবল চোর পলাইলে বে বুদ্ধি বাড়ি, তাহারই প্রমাণ দেওয়া ।”

“বলি কি ? একবাৎসর চোর আর বাতের ডাকাইত । অমন লোক সব করিতে পারে ।”

“পারে বটে ; কিন্তু আর কি করিবে ? এখন অবশিষ্ট রাখিয়াছে বাড়ীটা ; সত্য সত্যই আর চাড়া দিয়া কড়ীগুলো বেচিতে পারিবে না !”

“না, ও লোক সব সর্ব্বনাশই করিতে পারে । শুনিলাম, তোদের বাহিরের ঘরেই বসাইয়া রাখিয়াছিল ; তোদের খাওয়ার সংবাদটা ও লয় নাই !”

“সেটা তাহার অপরাধ নহে । চাকরী করে বলিয়া কি আমাদের ঘরে লইয়া হাড়ি ফেলিবে ? সকলেই শু আর মেজাজাঠটনা হইতে পারে না ।”

“মেজদি বৃষ্টি তোকে খুব মেহ যন্ত্র করিয়াছেন ?”

“খুব ।” তাহার পর অশোক হাসিয়া বলিল, “আমি কিন্তু তাহার পদের খুলা লইয়াছি ।”

না বলিলেন, “যাহা বারণ করিয়াছিলাম, তাহাই আগে করিয়াছিলাম !”

“আগে নহে, না, আগে তিনিই ত আমাকে ঘরে ঢুকিতে বলিলেন ; বলিলেন, ছেলে কি কখন মা’র পর হর ?”

“তাহার পর ?”

“তাহার পর তিনি বলিলেন, বাবা যখন ব্রাহ্ম হয়েন, তখন সমাজে সকলে হিন্দুধর্মের সব শাসন মানিয়া চলিত ; এখন কেহই সব শাসন মানে না, তা’ব আমাদের দোষ কি ? তিনি আমাকে সব ঘরে লইয়া বাড়ী দেখাইয়াছেন ।”

“অবচ মেজদিবির মত নিষ্ঠা আর কাহারও নাই । শুনিয়াছি, গোপালের

সেবার আর পূজার তীহার দিন কাটে। আহা, এমন লোকের কপালেও এত কষ্ট থাকে! অল্প বয়সে বিধবা হইয়া ছেলোটিকে ‘মাহুম’ করিয়াছিলেন; কপালে সেও থাকিল না! কত দিন দেখা হয় নাই!”

“তিনিও বলিলেন, কতবার মনে করেন, গঙ্গা-দ্রাবন করিতে কলিকাতার আসিবেন; আর তোমার সঙ্গে দেখা করিয়া যাইবেন, কিন্তু হইয়া উঠে না।”

“কি বলিস্, একবার বাড়ী যাইব?” বলবৎরূপে তিনি যে গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন, যে গৃহে তীহার সেই সময়ের কত ভাব ও ভাবনার স্মৃতি অঙ্কিত, যে গৃহ তীহার স্বামীর স্মৃতিপূত, যে গৃহে রমার অক্ষুট কাকলী তীহার মাতৃহৃদয় আনন্দে পূর্ণ করিয়াছিল—এত দিন পরে—বার্দ্ধক্যে—বহাঘাতের পূর্বে সে গৃহ দেখিবার বাসনা মথ্যে মথ্যে তীহার মনে বলবতী হইত। আজ পুত্রকে এই জিজ্ঞাসার সেই বাসনাই বিকশিত হইয়াছিল।

অশোক বলিল, “তোমার যাওয়া ত সহজ নহে। তুমি বাটলে আমাকেও যাইতে হইবে। এ দিকে সব ফেলিয়া যাইতে হইবে—কাষেই দুই চারি দিনের অধিক থাকিতে পারিবে না; পণও ভাল নহে; কষ্টের একশেষ হইবে। বরং তুমি যেক ভোঁঠাইমা’কে একবার আসিতে লিখ, আমিও লিখি।”

“একবার যাইলে সকলের সঙ্গে দেখা হয়।”

“সকলে কি আর আছে, মা? না সকলে তোমার সঙ্গে দেখা করিতে ব্যস্ত? ইচ্ছা কর, একবার লইয়া যাইব। কিন্তু এখন গরম পড়িতে চলিল, আবার শীত-কাল না আসিলে ত যাওয়া ঘটিবে না।”

“ওনিলাম, সকলেই তোকে আদর-বহু করিয়াছেন!”

“করিয়াছেন। তবে সরিকে সরিকে পালা দিয়া লোক-দেখান ঘটা করিয়া বন্ধ করা এক, আর আন্তরিক বন্ধ এক। মেজ ভোঁঠাইমা’র বন্ধে যে আন্তরিকতা ছিল, আর কাহারও বন্ধে তাহা ছিল না। আমার বোধ হয়, তিনি প্রথমে আমাকে ঘরে না লইলে আর কাহারও ঘরে আমার পাত পাতা ঘটিত না।”

তীহার পর মা একে একে বাত্যা ও ননন্দাদিগের কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। অশোক এই কয়দিনে মা’র ফর্দভুক্ত সকলের সংবাদ সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারে নাই। তবে যেক ভোঁঠাইমা’র নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া যতদূর পারিয়াছিল, সংবাদ লইয়া আনিয়াছিল। কাহারও স্বখসৌভাগ্যের সংবাদে মা আনন্দিত হইলেন, কাহারও দুর্ভাগ্যের বা মৃত্যুর সংবাদে তীহার হৃদয় ব্যথিত হইল।

বাড়ীর কথা জিজ্ঞাসা করিয়া মা যখন শুনিলেন, ভাগবাতোন্নয়ন হইয়া তাগে তাগে প্রাচীর উঠিয়াছে, তখন তিনি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন—তবে সে গৃহের যে চিত্র তাঁহার চক্ষে রহিয়াছে, সে চিত্র এখন বিকৃত হইয়াছে । তিনি বলিলেন, “প্রাচীর তুলিয়া বাড়ীখানাকে পায়রার খোপ না করিয়া কি সম্ভবে যে বাহার অংশে বাস করা যায় না ?”

অশোক বলিল, “এই ভাগ্যভাগির হাতামার ঠাকুর-সেবাও বন্ধ হইবার মত হয়, তাই ত মেজ জোঠাইমা বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন ।”

মা বলিলেন, “আপনার জনের অপেক্ষা পর ভাল । লোক কথায় বলে জ্ঞাতিপত্র ।” বিনিবাহিত্রীর উত্তিতে ঈর্ষাক্রিষ্ট জ্ঞাতিরা তাঁহার স্বধর্মত্যাগে বিরূপে তাঁহাকে অপমানিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, সে কথা মা’র মনে পড়িল । সবে সবে তাঁহার মনে পড়িল, তাঁহার ভ্রাতারও কেহ কেহ তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন, কেবল তাঁহার মধ্যমাগ্রজ বলিয়াছিলেন, “ভাই স্বধর্ম ত্যাগ করিয়াছে বিশ্বাসবশে ; আমি তাঁহাকে ত্যাগ করিব কেন ?”

এই সমর ধোকার কি আসিয়া বলিল, “মা, আমি ফলসা বাছিয়া রাখিয়া আসিতেছি ; বরফ আনিতে বলিব কি ?”

“বল”—বলিয়া মা উঠিলেন ।

অশোক বলিল, “আজই ফলসা আনাটয়াছ ?”

“কয় দিন রপ্তানি—পেপের কষ্ট ; তুই ফলসার সববৎ ভালবাসিস বলিয়া ফলসা আনাটয়াছি । তোকেও দিব আর অশ্রুকেও দিব । আচ্ছ ! বাছাকে দেখিলে কষ্ট হয় । উহার সংসারে আপনার কেহ নাই ?”

“বাপ মা, তাই ভগিনী কেহই নাই । পিতার পরিত্যক্ত পাইয়াছি—তিনি বড় ভক্তার ছিলেন—বামনধাস বহু । বোধ হয়, যে আত্মীয় ছিলেন, তিনিও নৌকাডুবিতে মরিয়াছেন । সে কথা জিজ্ঞাসা করিলে বড় চকল হয় ; বোধ হয়, বড় কষ্ট পায় । আমি তাই সে কথা আর তুলি না—তুমিও তুলিও না ।”

ধোকার কি বলিল, “তবে ত কার’হই বটে ।”

“বাছা বড় শান্ত—বড় ধীর”—বলিয়া মা প্রশ্রয় করিলেন ।

কিছুক্ষণ পরে অশোকের কস্ত পাতরের রেকাবীতে ফল ও কাঁচের স্নানে ফলসার সববৎ লইয়া অশ্রু অশোকের কক্ষে প্রবেশ করিল ।

ত্যাগের জয় ।

হারাটয়া গেছে একশত বিঘা দেবোত্তরের 'ছাড়,'
 জানিতে পারিয়া করে কাড়াকাড়ি ধরাহীন অরীহার ।
 বহু বহু ঘুরে মহারাজকাছে বহু 'মন্ত্রবার' করি,
 নথ 'ছাড়' পুনঃ পেলো ব্রাহ্মণ ভূগি' বহুদিন ধরি ।'
 কোণায় তাহার পল্লী-ভবন কোণা সেট রাজধানী,
 বাহিরিল দ্বিজ নামাবলীসনে বাধিয়া কাগজবানি ।
 সখ পথিকের মাঝে মাঝে চলে, চলে অতি সাবধানে,
 কোন্ পথ দিয়া আসে যে বিপদ বশ কে গণিতে জানে ?
 এক দিন এক মহার দল পথিকে করিল তাড়া,
 প্রাণভয়ে ছুটি' চলে ব্রাহ্মণ নামাবলী হয়ে হারা ।
 মূর্ছিত হয়ে পথিপাশে এক ভরতলে রয়ে পড়ি,'
 লজিয়া চেতন 'সব গেল বলি' কাঁধে হাহাকার করি ।
 দেখি তা'র দশা পথিক অনেক বলে, "শুন, ব্রাহ্মণ,
 অদূরেতে হের সাধুর আবাস, হের ওই তপোবন ।
 তাঁহার কুপার হারাইলে মিলে, যাও তুমি তাঁ'র কাছে,
 তোমার দুঃখ নিবারিতে শুধু তাঁহারি শক্তি আছে ।"
 ব্যাকুল হইয়া গিয়া তাঁ'র পায়ে নিবেদিল মনোবাথা ;
 সাধু শুধু হাসি বলিলেন, "বেটা ছাড় তোর পাবি কোথা ?
 ব্রাহ্মণ হয়ে লিখ নাই ত্যাগ, হার এত মারা-হত,
 ছার 'ছাড়'বানা হারাইয়া ফেলি কাঁদিলে বাগকমত ।
 হে অবোধ ছেলে, ভেবে দেখ দেখি হাত পা'টা আছে কি না,
 দেবতার সেবা চালাতে নাগিবে রাজার করুণা বিনা ?
 ঠাকুরের নামে চাহ ভোগহুখ এ কিরে দুনিয়াদারী,
 রাজার দত্ত 'ছাড়' রাজরাজ তাই লয়েছেন কাড়ি ।"
 শুনি ব্রাহ্মণ সজ্ঞ-মনে কাতর-বচনে কর,
 "ধন্য হইল নূতন ধীক্ষা মিলে তুমি মহাশয় ।"
 এক মাস পরে রিক্তহস্তে এক নিজ গৃহে ফিরে,
 রজনী-প্রভাতে পত্নীরে সব জানাইল ধীরে ধীরে ।

আসিবার পথে সহ্যার দল কাড়িয়া লয়েছে ‘ছাড়,’
 ডিঙ্কা করিয়া ঢালাইব পূজা ভাবিয়া কি হবে আর ।
 পত্নী তাঁহার বলিলেন, “নাথ, করিও না কোন ভয়,
 ভক্তিতে বাধা মদনমোহন সেবা উঠিবার নয় ।
 ভোগ আমাদের নহে ত ধর্ম, চিরদিন জানি মনে,
 কালিকার লাগি’ এক মুঠা চাল র খিব না গৃহকে’ণে ।
 হুটুটি পরশা সক্ষম আছে, তাগতেই কিবা কাজ,
 তুণদীর তলে ‘হরি’র লুটেতে’ ছড়াইয়া দাও আজ ।”
 মহা উল্লাসে ‘বাতাসা’ আনিতে বলি’ পুত্রেরে ডাকি’,
 দান করিবারে গেল ব্রাহ্মণ ; শাস্তির নাহি বাকি ।
 কিংবা আসিয়া শেব করি পূজা, তুণদীতলার গিয়া,
 দেখেন বোধক বাতাসা দিয়াছে কাগজেতে জড়াইয়া ।
 বলে ব্রাহ্মণ, “হার রে অণোধ, এনেছ কাগজে মুড়ে,
 এ জিনিষ আমি মদনমোহনে নিবেদি কেনন ক’রে ;”
 কাগজ হইতে বাতাসা তুলিয়া না করিয়া নিবেদন,
 ‘হরি হরি’ বলি’ তুণদীর তলে ছড়াইল ব্রাহ্মণ ।
 সহসা বারেক কাগজের দিকে দৃষ্টি পড়িল তাঁ’র,
 দেখিল চাহিয়া—একি এ যে সেই তাঁহারি হারাগো ‘ছাড়’ !
 তস্তিত বিজ্ঞ পত্নীরে ডাকি’ বসি’, বন্দিরঘারে,
 কানে আর বলে, “দীন জনে কত ছলিবে হে বায়ে বায়ে ।
 যাহারে চাহিয়া পথে পথে আমি বেড়ালাম আমি খুঁজি,
 সেই ছার ছাড়’ কিরাটরে দিগে তুলাইবে ঘোরে বৃষ্টি ?
 তুচ্ছ কাগজে উঠিবে না মন, তুমি সব লহ, স্বামি,
 ডিঙ্কা করিয়া বাপিব জীবন জেনো, অন্তর্গনি !”
 তৃপ্তি-নয়নে রহে ধোহে চাহি মদনমোহনপানে,
 দরদর ধারে স্বরে আখিয়ারা কোন বাধা নাহি মানে ।

ঐকুম্ভরঞ্জন বল্লভ ।

ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ।

—•••—

সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস, বহরমপুরের (পুরাতন ব্রহ্মপুর) গোরাবারিকগুলি ক্লাইবের কীর্তি। খাগড়া ও কাসিমবাজারের দক্ষিণে পতিত জমীই ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে পলাশির যুদ্ধের পর গোরাবারিকের জন্ত নির্দিষ্ট হয়। মূর্খিবাবাদের ঐতিহাসিক ওয়াল্‌স বলেন, নীরজাকর এই চম্ভট্ট ইষ্টা কোম্পানীকে ৩৯৯ বিঘা জমী দেন। কিন্তু বিলাতে কোম্পানীর ডিরেক্টরবর্গ বারিকনির্মাণে সম্মতি দেন না। শেষে তাঁহাদের সম্মতিক্রমে ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে কার্য আরম্ভ ও দুই বৎসর পরে শেষ হয়। মিষ্টার হিল বলিয়াছেন, বারিকের সম্মুখে পুকুরিণী খনন করিলে পানীয় জল সরবরাহের সুবিধা ও বারিক সুরক্ষিত করিবার ব্যবস্থা উভয়ই হয়। তাই ক্লাইব বহরমপুরে বারিকের চারিদিকে কতকগুলি পুকুরিণী খনন করাইয়াছিলেন। এ ক্ষেত্রে কিন্তু মিষ্টার হিলের কথা প্রমাণসহ নহে। কারণ, পুরাতন কাগজে দেখা যায়, ১৭৭০ খৃষ্টাব্দের ২৪শে জানুয়ারি তারিখে বহরমপুরের গোরাবারিক বেষ্টিত করিয়া বৃতি গঠনের ও তাহার পরিধা খননের ব্যয়ের খসড়া হিসাব প্রস্তুত হয়। ৬ই মার্চ কাষ্ট ও তক্তা আনিতে দেওয়া হয়; ইহাতে বুঝা যায়, তখনও কার্য অধিক দূর অগ্রসর হয় নাই। ১৪ই মার্চ ইষ্টকের দর বাচাই করিবার উল্লেখ দেখা যায়, ১৭৭২ খৃষ্টাব্দের ১লা মার্চ হেনরী ওয়াটসন বারিক ও হাসপাতাল নির্মাণের ব্যয়ের আত্মনানিক হিসাব উপস্থাপিত করেন। ঐ বৎসর ১৮ই এপ্রিল কাসিমবাজারের ইংরাজ কর্তৃপক্ষকে কোন নতুন গৃহ নির্মাণ করিতে নিষেধ করা হয়। ২১শে আগষ্ট তারিখে চিক এভিনিয়ার কাম্বেল গৃহ-গুলি সম্পূর্ণ করিবার আত্মনানিক ব্যয়ের খসড়া প্রতীতি দাখিল করেন। এই সময়ে আরও দুইখানি পত্র দাখিল করা হয়। শেষে ১৭৭২ খৃষ্টাব্দের ১০ই সেপ্টেম্বর কাষ কিম্বুপ হইবে, নির্দিষ্ট করা হয় ও পরবৎসর ২২শে মার্চ গৃহনির্মাণতত্ত্বাব-ধায়ক গৃহনির্মাণের সমগ্র ব্যয়ের হিসাব দাখিল করেন। সুতরাং ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দের পূর্বে বহরমপুরের গোরাবারিক শেষ হয় নাই।

• • • • •

খাগড়া মরদান, রেল কোম্পানীর জমীর কতকাংশ ও মরদানের নিকটবর্তী অনেকগুলি বৃহৎ গৃহ পূর্বে একই জমাকৃত ছিল। বর্তমান আবালতগৃহ ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে বা সেইরূপ সময়ে মদের (রম) ভাঁটির জন্য প্রস্তুত করা হয়।

অল্পকাল পরে সমস্ত সম্পত্তি মিটার লান্ডেটের হস্তগত হয় ও লান্ডেটের বাগান বলিয়া খ্যাত হয় । ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে উহা বিক্রীত হয়—তখন বিক্রয়ের বিজ্ঞাপনে দেখা যায়, ইহাতে ১৬০ বিঘা ১১০ কাঠা জমী ছিল । মিলিটারী অরকান সভা ৬৫ হাজার টাকার ইহা ক্রয় করেন । সরকার সভাকে কিছু অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন । এই স্থানে উক্ত ও নিম্ন উক্তগণের ছাত্রগণই বাস করিত । ১৭৯০ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে উক্তগণের ছাত্রদিগকে আলিপুরে বারওয়েলের পুরাতন বাড়ীতে স্থানান্তরিত করা হয় । এই বাড়ী আলিপুর পশুশালায় পার্শ্বে অবস্থিত । ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে ছাত্রদিগের “চোক উঠার” নির্যাতনের ছাত্রদিগকে কিছুদিনের জন্য বারাসতে পরিত্যক্ত সেনাবিভাগের কন্স্টাবলদিগের নিবাসে স্থানান্তরিত করা হয় । তাহার পর গৃহাদি বিক্রয়ের প্রস্তাব হয় । কিন্তু দুই বৎসর পরে কলিকাতা এবং তিন্ন রাজ্যধীন চুঁচুড়া, শ্রীরামপুর ও চন্দননগরের মধ্যে বিনা মাঙ্গুলে গোপনে মাল আদানী রপ্তানী বন্ধ করিবার জন্য তথায় একজন কন্স্টাবলকে রাখা হয়—কতকালে শুধামও করা হয় । সেই সময় এই স্থানে আহাজের জন্য ডাক নিষ্পাদনের কথাও হইয়াছিল । তখন সমগ্র জমায় একটি বৃহৎ গৃহ, ছইটি হাসপাতাল-গৃহ, ১২টি বন্ধন-কক্ষ ও ১২টি “বাঙ্গলো”, ১৮২টি কুক, ৫টি পুকরিণী ও ১টি সমাধিক্ষেত্র ছিল । এই সময় ইহাকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয় এবং অপর দুই ভাগের এক ভাগে ২৪পরপনার ম্যাজিষ্ট্রেট সময় সময় বাইরা কাছারী করিতেন । আর এক অংশে বিশপস কলেজের পাদরী হাবড়ার গির্জার যাজনার জন্য থাকিতে পাইতেন । কিছুদিন পরে ম্যাজিষ্ট্রেটের জন্য নির্দিষ্ট অংশে শালকিয়ার দেওয়ানী আদালত স্থানান্তরিত করা হয় । ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে হাওড়ার নতুন ম্যাজিষ্ট্রেট-নিয়োগ সাবান্ত হইলে ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছারীর জন্য এই স্থান নির্দিষ্ট হয় । কয় বৎসর পরে পাদরীরা তাহাদের অবিকৃত অংশ ত্যাগ করিলেন এবং গৃহগুলির মধ্যে একটি ম্যাজিষ্ট্রেটের আবাসে ও দুইটি আদালতগৃহে পরিণত হইল ।

১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে তত্ত্বাবধিনী সভা হুগলীর নিকটে বাঁশবাড়ীয়ায় একটি ইংরাজী বিদ্যালয়ের সংস্থাপিত করেন । তাহাতে প্রায় দুই শত বালক অধ্যয়ন করিত । নানা কারণে উহা উঠিয়া যায় । এই সময় ডাক্তার ডাক পদ্যার পশ্চিম কূলে খুইবর্দ-প্রচারে প্ররাসী করেন । তিনি ঐ বিদ্যালয়ের জমী ও বর ক্রয় করেন, কিন্তু অর্থাভাবে বিদ্যালয়ের জন্য পাকা গৃহ নির্মাণ করিতে

অসমর্থ হয়েন। এ দিবে সার জেমস্‌ আউটরাম সিদ্ধ প্রদেশ জয় করিয়া সৃষ্টিত অর্থের ভাগের ভাগ ৪৫ হাজার টাকা পায়েন। খুইধর্মদাজক ডাক্তার ডাক অপেক্ষা বয়োভ্যেষ্টি ও উত্তরে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়বৃত্ত হইলেও সার জেমস ডাক্তার ডাককে শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি ঐ অর্থ লইতে অস্বীকৃত হইয়া ডাক্তার ডাকের নিকট প্রস্তাব করিলেন, সরকার ঐ অর্থ নিগূহীত সিদ্ধ আমীরদিগের ক্ষত বায় করিলে ভাল হয়। ডাক্তার ডাকের এই প্রস্তাব বড় লাট লর্ড এলেনবরো বিরক্তিসহকারে প্রত্যাখ্যান করিলেন; কারণ, এ কথা প্রকাশ পাইলে অত্যন্ত কুল কলিবার সম্ভাবনা, আর সরকার আমীরদিগের সুবাবহাই করিয়াছেন। সরকার এ অর্থ গ্রহণ করিলে লোক বলিবে, সরকার আমীরদিগের সহকে সুবাবহা করেন নাই। ইহাতে কিন্তু আউটরামের মন উঠিল না। তিনি বলিলেন, এ অর্থ লইলে তিনি প্রত্যাভায়ব্রত হইবেন। সুতরাং ইহা তিনি বোঝাইয়ের জনহিতকর কার্যে ব্যয় করিবেন। সার চার্লস নেপিয়ারও বলিয়াছিলেন,—“We have no right to seize Sind, yet we shall do so, and a very advantageous, useful and humane piece of rascality it will be.”

আউটরাম নানা জনহিতকর অহুষ্ঠানে অর্থ দিয়াও ৬ হাজার টাকা হস্তে স্থিত দেখিয়া গঙ্গার কূলে অর্থাৎ বঙ্গদেশে এ অর্থের সম্ভাবহারের কোন উপায় হয় কি না, ডাক্তার ডাককে তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরে ডাক্তার ডাক লিখিলেন, তিনি গঙ্গাতটে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন। গৃহনির্মাণার্থ টাকার প্রয়োজন। আর বিশ্বয়ের বিষয় এই যে, তিনিও ঠিক হয় হাজার টাকা চাহেন। আউটরামের অর্থে বাশবাড়ীয়ার খুইধর্মদাজকদিগের বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে এই বিদ্যালয় উদ্বিগ্না যায়। ইহার পর বাশবাড়ীয়ার রাজা পূর্ণেশ্বরদেব রায় ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে যে কুল স্থাপিত করেন, তাহা ম্যালেরিয়ার আধিক্যহেতু উদ্বিগ্না যায়। তিনিই আবার ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে একটি কুল স্থাপিত করেন।

শ্রীঅরুণেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

দাশরথি রায় ।

—:~:~:~—

বংশাবলী—জন্মকাল—আদ্যজীবন ।

শ্রীশ্রীবাগ্বেবীর বঙ্গসন্ধানগণের মধ্যে দাশরথি রায় মহাশয় ঈর্ষহানীর না হউন, একজন বিশেষ আদরপ্রিয় এবং মাননীয় বটেন । যদি ৭ বছরদিন হইল, দাশরথির লোকান্তর হইয়াছে, তথাপি তাঁহার রচিত বহুসংখ্যক পাঁচালী গ্রন্থ, তৎসংলগ্ন গীত, বিশেষতঃ “দ্বাপ্ত রায়ের স্মরণ” বঙ্গ আদরের সহিত আলোচিত হইতেছে । যত দিন বঙ্গসন্ধান কাব্যাদির আলোচনা ও বঙ্গ-সঙ্গীতের আদর থাকিবে, তত দিন দ্বাপ্ত রায়ের নাম বিলুপ্ত হইবার নহে । দেশের গতি দেখিয়া বোধ হয়, লিখনপঠন এবং বঙ্গকাব্য ও বঙ্গীয় সঙ্গীতের আলোচনা দিন দিন উন্নতিপথেই ধাবিত হইতেছে । এ জন্ত ভরসা হয়, আনন্দের দাশরথির নাম ক্রমে উজ্জ্বল হইতে থাকিবে । সেই স্বভাবকবি সরস্বতীর আদরের পুত্র দাশরথি রায় মহাশয়ের বংশজীবনী এবং পাঁচালী কাব্যের সমালোচনার প্রস্তুত হইলাম ; কতদূর কৃতকার্য্য হইব, বলিতে পারি না ।

দাশরথির শিশুকালের বিবরণ প্রায় অপ্রাপ্য । তবে আমি তাঁহার জন্মস্থান বাকুমুড়া গ্রামের অতি নিকটে বাস করি এবং বাকুমুড়ার জমীদারীসংক্রান্ত কার্য্যাদিও কিছু দিন করিয়াছি । এই জন্ত ঐ বাকুমুড়ার আমি বিশেষ পরিচিত, সেই পুত্রে দাশরথি রায় মহাশয়ের ভাস্কর্য্য শ্রীযুক্ত হরহরমঙ্গলী দেবী মহাশয় নিকট গিয়া, তাঁহার আখ্যায়িকাপরিবেষ্টিত হইয়া যে সকল তথ্য অবগত হইয়াছি, নিয়ে সে সকলের বিবরণ বিবৃত করিতে প্রতী হইলাম । আমিও দাশরথি রায়কে দেখিয়াছি ।

দাশরথির পূর্বপুরুষ কালীনাথ রায় হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে গোপালচন্দ্র, জগন্নাথ, ধরদীধর ও দেবীদাস রায় । দেবীদাসের চারি পুত্র—এক কস্তা । তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র দাশরথি ও তৃতীয় পুত্র ভিনকড়ি রায় এই প্রবন্ধের নায়ক এবং উপনায়ক । ঐ ধরদীধরের বংশে উত্তরপুরুষ শ্রীযুক্ত জ্ঞানকীনাথ রায় অদ্যাপি বর্ত্তমান প্রহিয়াছেন । এই জ্ঞানকীনাথ দেখিতে দাশরথির স্তায় দীর্ঘকায়, কীর্ণদেহ । ইনি পাঁচালী ছড়া বেশ বলিতে পারেন, অনেক মুখস্থ করিয়াছেন । এক্ষণে ইহার বয়ঃক্রম ৬০।৬২ বৎসর ।

দাশরথির স্মৃতি ভ্রাতা ভগবানচন্দ্র কৃষিকার্যের তত্ত্বাবধান করিতেন। অল্পতদার অবহাতেই তাঁহার লোকান্তর হয়। সর্বকনিষ্ঠ রানধন শিশুকালেই দেহত্যাগ করেন। তগিনী গয়ানথির বিবাহান্তেই দেহান্ত ঘটে। দাশরথি রায় মহাশয় সন ১২১২ সালের মাঘ মাসের কৃষ্ণা চতুর্দশীতে বর্তমান জিলার অন্তর্গত কাটোয়া মহকুমার মণ্ডো সাহাবাদ পরগণার সামিল বাকুমুড়া গ্রামে জন্মিত হইলেন। কেহ কেহ বর্ণনা করিয়াছেন যে, তাঁহার পিতার নাম দেবীদাস রায়, গর্ভধারিণীর নাম শ্রীমতী দেবী। এ কথা বৈঠক নহে, তবে দেবীদাস বা দেবীপ্রসাদ এই দুই নামে তাঁহার পিতা অভিহিত ছিলেন। তাঁহার লিখন-পঠনের ক্ষমতা ছিল না, এই কথাই প্রবাদ আছে। তবে সবিশেষ কেহ বলিতে পারেন না। শিশুকাল হইতে দাশরথি মাতুলালয়েই প্রতিপালিত হইয়াছেন, এ কথাও কেহ লিখিয়াছেন। তাহা প্রকৃত নহে। দাশরথি শৈশবে বাকুমুড়া নামক ঐ অল্পভূমিতেই প্রতিপালিত হইয়াছিলেন এবং তদানীন্তন গুরু মহাশয়ের নিকট ঐ স্থানেই বাঙ্গালা লিখাপড়া সাগর আকারে শিক্ষা করেন। তবে যৌবন প্রাপ্তির পূর্বেই দাশরথির পিতৃমাতৃবিয়োগ হয়; তখন ৩ বৎসরের অববাহিত কনিষ্ঠ তিনকড়ি মাত্র দাশরথির আপনায় বলিতে থাকিল; বাকুমুড়া গ্রামে জাতি ভিন্ন অপর কেহ আশ্রয় রহিল না। এই সময় পীলানিবাসী গ্রামজীবন চক্রবর্তী ভাণ্ডারের দাশরথি ও তিনকড়ির তত্ত্বাবধান করিতে বাধ্য হইলেন। মাতুলের সঙ্গে ভ্রাতৃত্বের ঘনিষ্ঠতা বাড়িতে লাগিল। হস্তপ্রাণ মধ্যে মধ্যে মাতুলালয় পীলাগ্রামে বাতায়ত এবং বসবাস হইতে লাগিল। দাশরথি যেমন মাতুলালয়ের প্রিয় হইলেন, তিনকড়ি তেমন হইলেন না। ছোটের প্রতি মাতুল-মাতুলীর প্রিয়তাব দর্শনেই হউক বা যে কোন কারণেই হউক, তিনকড়ি আর মাতুলগৃহ-গমন ত্যাগ করিলেন। তিনি বাকুমুড়ার বাটীতে কোন দিন আশ্রয়প্রতিবাসীর বাটীতে অথবা স্বহস্তে পাক করিয়াও আহার করিতেন এবং ভাগ ছোটের কৃষিকার্যের তদারক করিতেন। তিনকড়ির কঠোর অতি স্মৃতি ছিল, দাশরথির তেমন মিষ্ট স্বর ছিল না। যাহার কঠোর মধুর, সে যে গীত গাহিতে অস্বস্ত হইবে, তাহা স্বাভাবিক। কারণ, মধুর কঠোরের গায়ক সর্বপ্রাণে আপনি মুগ্ধ হইলেন—আপনি মুগ্ধ না হইলে অন্তে বিষৃষ্ট হইবে কেন? আপনাকে কৃতার্থ করিবার অভিপ্রায়ে স্বকণ্ঠ ব্যক্তি প্রথমে তপ তপ করিয়া গান গাহিয়া থাকে। তিনকড়ি পান ধরিলে নিকটস্থ ব্যক্তিকে কার্য ত্যাগ করিয়া সেই স্থানে কিছুক্ষণ বসিতে হইত—কলত: তিনকড়িকে অনেকে ভালবাসিত।

তিনকড়ি বান্ধুভাতেই প্রায় থাকিতেন ; পীলার অর্থাৎ মাতুলালয়ে আর যাইতেন না । মাতুল গ্রামজীবন মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন, তিনকড়ি গান গাহিয়া গাহিয়া ওড়ষা—বেলেলা—ফচকে হইয়া গিয়াছে ; তাহার তত্ত্ব করা অনাবশ্যক । পল্লীগ্রামে গীতবাদ্যকারীকে অস্বাভাবিক অনেকে ঘৃণা করিয়া থাকেন ; অতএব মাতুল গ্রামজীবন যে ভাগিনেয় তিনকড়ির গীত-বাদ্যে বিরক্ত হইবেন, তাহা বিশ্বাস কর নহে । যাহা হউক, বালক তিনকড়ি প্রায় যে স্থানে গীত-বাদ্য হইত, সেই স্থানেই গিয়া উপস্থিত হইতেন ; ভৃত্য করিতেও বিমুখ ছিলেন না । যে কোন প্রকারে কোন গায়কের কাছে কালধাপন করাই তিনকড়ির সম্মিলিত কার্য্য হইয়া উঠিল । বলা বাহুল্য, ইহাতে মাতুল অধিক বিরক্ত হইয়া উঠিলেন । তিনকড়ির কঠোর তনিয়াই হউক বা তিনি সুরূপ বলিয়াই হউক অথবা তাহার চাহযোগ্য জমীন্দার যাহা আছে, তাহা ভরণপোষণক্ষম এত ভাবিয়াই হউক—নদীয়া জিলার অন্তঃপাতী ঘূর্ণাসেনপুরনিবাসী শিবপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় স্বতঃপ্রসূত হইয়া নিজকন্যা হরপ্রসন্নীর সচিব তিনকড়ির বিবাহের প্রস্তাব করিলেন । কিন্তু ষোষ্ঠ দাশরথির বিবাহ না হওয়ার কনিষ্ঠ তিনকড়ির বিবাহে বাধা পড়িয়া গেল । তখন গ্রামজীবন লঙ্ঘিত হইয়া দাশরথির বিবাহে উদ্যোগী হইলেন এবং বিশেষ চেষ্টা করিয়া বান্ধুভার পশ্চিম ও কোশ দূরস্থিত সিংওং (সিঙ্গোং বা সিংহোত) গ্রামে অব্যাবধি প্রসিদ্ধ রাহবংশে হরিনাথ প্রায়ের কন্যা প্রসন্নীর সঙ্গ দাশরথির বিবাহ-কার্য্য সুসম্পন্ন করাইলেন । তাহার পর অবিলম্বেই তিনকড়ির বিবাহ পূর্বপ্রস্তাবমত সম্পন্ন হইয়া গেল । অতঃপর ব্রাহ্মণ ও মাতুল গ্রামজীবনের মধ্যে আর কোন বৈরক্তির লক্ষণাদি থাকিল না । সকলেরই পীলা ও বান্ধুভার যাতায়াত চলিতে লাগিল ।

দাশরথির বাল্যকাল হইতেই পাচালী বা ছড়া অথবা ছন্দোবদ্ধ করিয়া সচরাচর কথা কহা অভ্যাস ছিল । আনন্দস্থলে তিনি সে সব মুখে মুখে রচনা করিতেন । শুক মহাশয়ের নিকট বিদ্যাভ্যাসের সময় দাশরথি বলিয়া-ছিলেন,—“দয়া কর শুক মহাশয় মোর পানে, অত প্রহারে বুকি বাঁচিব না প্রাণে ।” আরও আছে—কোন সঙ্গী সহাধ্যায়ী বালককে তিনি বলিয়াছিলেন,—“আমার কলম কেন তোমার পরোতে ? দাও তাই দিব না যুগদানে ভরিতে ।” এককালে পাঠশালার ছাত্ররা কলম রাখিবার স্তম্ভ কাগজের পরো (লেফাফা) করিত অথবা স্তম্ভকাঁচার একপ্রকার ছোট থলিরা প্রস্তুত করা হইত ; তাহাকে যুগদান বলিত । দাশরথি বলিতেছেন, আমার কলম তোমার পরোতে কেন ?

এ স্থানে “আমার” এ “তোমার” পদদ্বয় সুখপাঠ্য—দ্বিতীয় চরণে ছন্দের দোষ থাকিলেও সে কালের পাঠশালার ছাত্র কণা-প্রসঙ্গে যে এমন কবিতা রচনা করিয়াছে, তাহাই বিশেষ আদরশীল।

দাশরথির বিবাহ হইয়া গেল; জ্ঞানকম্বুধীর সকলের সঙ্গে নানা প্রকার কথার পাশ্চাৎ বা বাক্‌বুদ্ধ হইতে লাগিল। কল্যা বাহলা, দান্তর মুখে নানাবিধ নৃতন ছন্দে নৃতন কথা শুনিবার জন্যই জ্ঞানক-বন্ধগণ একটা একটা কথা তুলিয়া বসিতেন। এক দিন মাঠে বেড়াইতে বেড়াইতে একটি টাকসোনা পক্ষী দেখিয়া কোন জ্ঞানকবন্ধ বলিল, “ব্রাহ্মী! ঐ দেখ, কেমন টাকসোনা।” শুনিবা মাত্র দান্ত বলিয়া উঠিলেন,—“কৈ? যার না তো তা’র ডাক শোনা।” উত্তর শ্রবণে সকলে পরম আত্মলাভে হাসিয়া বলিলেন,—“ঐ দেখ ভাই, টাকসোনা পাখীটি বসিয়া আছে; ডাকে নাই বটে, কিন্তু ঐ দেখ, ঐ টাকসোনা।”—আবার তৎক্ষণাৎ দান্ত বলিলেন,—“একবার ডাকুক না কেনে যাক শোনা।” সহযাত্রীরা হাসিয়া উঠিলেন এবং যে যেমন সম্পর্কীয়, সে তেমন কৌতুক করিতে লাগিল। একজন ব্রহ্ম করিয়া বলিলেন,—“হা হে ব্রাহ্ম মহাশয়! ঐ তো টাকসোনা পাখীটা ডাকিয়া উড়িয়া গেল, শুনিতে পাঠিলেন না? তবে কি আপনার কাণ নাই নাকি?” দান্ত তৎক্ষণাৎ বলিলেন,—“তা’তে আপনার এত কান নাই বা কি?” অর্থাৎ আমার কান নাই বলিয়া এত কারাকাটা ঊঃখ হইতেছে কেন?

কম্মুর্জীবন।

দাশরথির কথার কথার মুখে মুখে কবিতারচনার কথা ইহার পূর্বে উক্ত হইয়াছে। কোন বাক্‌পটু ব্যক্তিকে পাইলে দাশরথি আত্মলাভে আটখানা হইতেন, কিরংকণ ব্রহ্ম পরিহাস বাক্‌বুদ্ধ না করিয়া ছাড়িতেন না। তাহার এই প্রবৃত্তি যে অতি বলবতী, তাহা দেশে অনেকেই জানিতেন। সেই জন্য ইচ্ছা করিয়া অনেকে দাশরথির সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হইতেন। তাই বরোবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দাশরথির এই প্রবৃত্তির প্রাবল্য হইয়া উঠে। এ প্রবৃত্তি প্রবল না হইলে কবির দলে মুহুরীগিরি করা ঠিক হয় না। কারণ, কবির দলের প্রথা এই যে, এক পক্ষ পৌরাণিক বা সামাজিক যে কোন একটা প্রশ্ন করিয়া বসিবে, অপর পক্ষকে তৎক্ষণাৎ পাচালী বা ছড়ার ছন্দে ও গান করিয়া তাহার উত্তর দিতে হইবে। ইহা দাশরথীর ক্ষমতা নহে। এই সব ব্যক্তি যে প্রকৃত কবি, তাহাতে আর অণুমান্য সন্দেহ নাই। এই সময় এ দেশে

প্রকৃত সঙ্গীতের চর্চা প্রায় ছিল না বলিলেই হয় ; কিন্তু কবির গানের অভিশয় আসন্ন ছিল । “কবির গান” এই কথাটি ব্যাখ্যা করিলে বুঝা যায়, এই গানে বিশেষ কবিত্ব প্রকাশ করিতে হয়, এই জন্তই ইহার নাম কবির গান । একপক্ষ প্রায় করিল, “সভার মাঝে এই কথাটি বলে দাও ভাই, উনিশ চক্ষু নয় বদন কার’ দেখতে পাই ?” এই প্রশ্ন (চাপান) শ্রোতৃবৃন্দ তুলিলেন, নয়টি বদন আর উনিশটি চক্ষু কাহার আছে ? এ প্রশ্নের উত্তর তুলিতে কোন্ ব্যক্তির কোতুল না আছে ? আর এট প্রশ্নের উত্তর দুই চারি দিন পরে নহে, তৎক্ষণাৎ দিতেই হইবে ; সম্ভব না হইলে বিশেষ লক্ষ্যের কথা—পরাজয় স্বীকার করিতে হইবে । “ধন্যবাদ” প্রভৃতি শুল্লগর্ভ পুরস্কারের প্রথা সে সময় ছিল না,—ইত্যাচার প্রশ্নের উত্তর যে কবিদার সম্ভবতাবে দিতে পারিতেন, তাহাকে তৎক্ষণাৎ মূল্যবান শাল ভামেয়ার বা নিকর তুনিও পারিতোষিক দেওয়া হইত । অর্থাৎ প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর গীত ও ছন্দের সঙ্গে তুলিতে আপামর সাধারণ সকলেই বিশেষ আগ্রহ করিতেন । কোন কবির আসরে দাশরথির প্রতি ঐ চাপান (প্রশ্ন) হইল । শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে ভাবগ্রাহী মাজেই সোৎসাহে অর্থাৎ কোতুলকাবিষ্ট হইয়া দাস্ত্র্য কি উত্তর দেন, শুনিবার জন্ত ব্যগ্র হইলেন । প্রশ্ন শুনিয়া দাশরথির কল্পনা-ভাণ্ডার যেন উৎসাহের আলোকে দীপ্তিমান হইল । মহা আড়ম্বরে দাস্ত্র্যের দল উঠিয়া নৃত্য আরম্ভ করিল । কিছুকণ পরে দাশরথি ছাড়া কাটিয়া উত্তর দিলেন ; যথা,—

উনিশ চক্ষু নয়টি মাথা, এ ত নবপত্রিকার কথা,
কলাবউ নামে ভগবতী ।

সপ্তমী পূজার দিনে, পূর্ব্বাহ্নে শুভক্ষণে,
যতন করে আনা আছে রীতি ॥

সাক্ষাৎ দুর্গা তিনি, নয়টি বদন ধরেন যিনি.
নয় দু’গুণে অঠারো চক্ষু হলো ।

ভগবতীর একটি মুখে, তিনটি চক্ষু সবাই দেখে,
তবেই উনিশ চক্ষু মিলে গেল ॥

এই উত্তর শুনিয়া সকলেই ধস্ত ধস্ত করিতে লাগিল । সকলে বেশ বুঝিল যে, সপ্তমী পূজার দিনে যে নবপত্রিকা আনা রীতি আছে, তাহা কদলী প্রভৃতি নয়টি গুণবাহী বাক্তিয়া প্রস্তুত করিতে হয় । অনেক হলে কেবল তাহারই পূজা প্রকৃত দুর্গোৎসবের জায় হইয়া থাকে । তবেই ঐ নবপত্রিকা

সাক্ষাৎ ভগবতীস্বরূপা। ঐ নয়টি শুদ্ধকে নয়টি মূর্তি জ্ঞান করিলে নয়টি বদন হইল, আর ঐ নয় মূর্তির সমষ্টি যে একটি হুর্ণা মূর্তি, সে মূর্তিতে একটি উর্দ্ধনেত্র ধরিতেই হইবে, কারণ হুর্ণা কালী প্রভৃতি মহাদেবী মূর্তি মায়েই ত্রিনেত্রা; অতএব উনিশ চক্ষু, নয় বদন বেশ সম্ভব হইল। কোন্ স্থানের আসরে ঐ ছড়ার বুদ্ধ হইয়াছিল, তাহার প্রশ্নান দেওয়া বড়ই কঠিন। কারণ, দাশরথির কবির দলের কার্যকলাপের কোন পুস্তক বা চোতা নাই। তবে কাটোয়ার নিকট কালিকাপুর গ্রামবাসী ৮ চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় একজন ভাবুক বঙ্গভাষাবিদ্বৎ স্নেহক ছিলেন। বিশেষতঃ দাশরথির সঙ্গে তাহার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। উক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয় দাশরথির একখানি জীবনচরিত লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। সে আঙ্গ ৩০।৩৫ বৎসরের কথা। আমরা অনেক অনুসন্ধান করিলাম; ঐ কালিকাপুর-নিবাসী কাটোয়া মিউনিসিপালিটির ভাটস চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত বাবু মন্থননাথ চট্টোপাধ্যায় মহোদয়ও উহার জন্ত অনেক সন্ধান করিতেছেন, কোথাও একখানিও পাওয়া যাইতেছে না। তবে উক্ত চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মূখে আমরা দাশরথির অনেক কথা শুনিয়াছি এবং উক্ত জীবনচরিতও রহসীন হইল, পাঠ করিয়াছি। এখন যতদূর শরণ হইতেছে তাহাই লিখিলাম।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরমানাথ মুখোপাধ্যায়।

কিশোরীচাঁদ মিত্র ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

কলিকাতা ম্যাজিষ্ট্রেটসী শিল্প শিক্ষা ও সমাজোন্নতির শিক্ষা ।

যে সময়ে কিশোরীচাঁদ কলিকাতার উত্তর বিভাগের ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ গ্রাপ্ত হইলেন অনেকে সেই সময়ই তাঁহার জীবনের সৰ্ব্বাপেক্ষা গৌরবময় কাল বলিয়া নির্দেশ করেন । যদিও আমরা তাঁহার প্রতিভাদীপ্ত জীবনের প্রতি পূৰ্ব্ব অপূৰ্ব্ব গরিমায় উদ্ভাসিত ও অহুপম মহিমায় পরিপূর্ণ দেখি এবং কোন অবস্থা সৰ্ব্বাপেক্ষা গৌরবময় তাহা নির্দেশ করিতে অক্ষম, তথাপি কতিপয় কারণে আমরা তাঁহার জীবনের এই সময়ের বৈশিষ্ট্য স্বীকার করিতেছি এবং বোধ হয় কিশোরীচাঁদ স্বয়ংও এই সময়টাই জীবনের সৰ্ব্বাপেক্ষা সুখময় ও গৌরবময় কাল বলিয়া অহুত্ব করিয়াছিলেন । সুখময় কেন ?—পার্শ্ব ঐশ্বৰ্য্যের জন্ত নহে ; কারণ, কিশোরীচাঁদ জীবনে কখনও পার্শ্ব ঐশ্বৰ্য্যের জন্ত আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই । পেকালে যখন মানবের আবশ্যক দ্রব্যাদি এত মহার্ঘ্য ছিল না এবং একপ পদে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিগণ কয়েক বৎসরের মধ্যে প্রকাণ্ড বিহর রাখিয়া যাইতে পারিতেন তখনও কিশোরীচাঁদ রাজকর্ষ করিয়া এক কপর্দকও সঞ্চিত করেন নাই । তাঁহার অকৃত আতিথা ও লোকহিতার্থে দান তাঁহার ডাওয়ার শূন্য করিত । তিনি কখনও ভবিষ্যতের জন্ত চিন্তা করিতেন না । সঙ্গীপ স্বার্থের দিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল না । গৌরবময় কেন ? লোকবাহিত হুর্নভ পদ গ্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া নহে—কারণ, কিশোরীচাঁদ কখনও পদগর্জে গর্জিত করেন নাই এবং যে পদের জন্ত লোক লাগানিত এবং আপনায় বিবেকবিরুদ্ধ কার্য্য করিতেও কুণ্ঠিত হয় না, কিশোরীচাঁদ আপনায় স্বাধীনতা রক্ষায় নিমিত্ত সেই পদ তুচ্ছজ্ঞান করিয়াছিলেন । তবে কিসের জন্ত ? কিশোরীচাঁদের জীবনের স্বপ্ন সফল হইল বলিয়া—তিনি দেশহিতকর কর্ম্মানুষ্ঠানে আপনায় জীবন উৎসৃষ্ট করিবার অপূৰ্ব্ব সুযোগ গ্রাপ্ত হইলেন বলিয়া । যে অতিবীত আমার অথবা আপনায় সমর্থনে রাজা অথবা প্রজা গ্রাহ্য করিবেন না তাহা উন্নপদাধিষ্ঠিত কোনও শিক্ষিত ব্যক্তির স্বীকৃত হইলে বিশেষ আলোচনায়

বিষয় হইয়া পড়ে। কন্দ্বীর কিশোরীচাঁদ এট স্বযোগ গ্রাপ্ত হইবেন বলিয়াই এই সময় অতি স্বল্পময় বলিয়া বিবেচনা করিলেন। তিনি তাঁহার লোকহিতৈচ্ছা পরিপূর্ণ করিবার হুঁচিট উপায় দেখিতে পাইলেন। প্রথম, উচ্চশ্রেণীর ঠংরাঙ্গ-দিগের সহিত আলাপ করিয়া তাঁহাদিগকে নিয়ত দেশের অবস্থা বুঝাইয়া দেওয়া এবং এট প্রকারে দেশহিতকর বিষয়ে তাঁহাদিগের সচাস্থুতী ও সহকারিতা লাভ করা। দ্বিতীয়—দেশের প্রধান প্রধান ব্যক্তি ও সামাজ্যের নেতা, ঐহার্য্য সমাজের কলঙ্ককালনে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন তাঁহাদিগের মনে কর্তব্যজ্ঞানের উদ্রেক করিয়া দেওয়া—তাঁহাদিগকে কন্দ্বীভাবে প্রবুদ্ধ করা।

কিশোরীচাঁদ কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়া প্রথমে কাশীপুরে গঙ্গাতীরে একটি উদ্যান বাটিকায় অবস্থান করেন। তখন চীফ জাষ্টিস, পুলিশ-ম্যাজিস্ট্রেট প্রভৃতি উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীরা অনেকে কাশীপুরে অবস্থান করিতেন। কিশোরীচাঁদের ইচ্ছা, পূর্বোক্ত প্রথম উদ্দেশ্য সাধন করা। নিকটবর্তী কামারহাটী গ্রামে বিখ্যাত বাগ্মী রানগোপাল ঘোষ বাস করিতেন এবং দেশের অনেক প্রধান প্রধান ব্যক্তি তাঁহার নিকটে অবস্থান করিতেন। কিশোরীচাঁদের অমারিকতার মুহূর্ত্ত হইয়া সকলেই তাঁহার বাসস্থানে সতত সম্মিলিত হইয়া নানা প্রকার সমালোচনা সময় অতিবাহিত করিতেন।

কিশোরীচাঁদ প্রায়ই তাঁহার চম্বুরোপীয় ও দেশীয় বন্ধুগণকে নিমন্ত্রিত করিয়া পরস্পরের সহিত পরস্পরের আলাপ করাইয়া দিতেন এবং প্রায় প্রতি সপ্তাহে বিরাট আয়োজনে ভোজ দিতেন। তাঁহার ডাবেরী হটতে উদ্ভূত নিম্নলিখিত অংশ হইতে তাঁহার কয়েকজন বিশেষ বন্ধুর নাম পাওয়া যায় :—

2nd Nov. 1855. Gave a small party in the evening. There were Theobold, Major A. Broome, my brother P. C. Mitra and my colleague Mr. Fagan and the Rev. Prof. K. M. Banerjee : Krishna was very chatty and jocose and we passed a pleasant evening.

3rd Nov. 1855. Had another party which was more gay than that of last evening and would have concluded as pleasantly but for a " * * " in the shape of Old Raj who was more than jolly and less than amicable. I had Gopaul Lall Tagore, Digumber Mitter, Rajendra Lall Mitra, Nil Comul Banerjee, Chunder Nath Chatterjee, Dwarkanath Goopta, Gour Dass Bysack, Nundo Lall

Sen and Raj. I hate all large parties. I consider all parties large which consists of more than half a dozen people but this evening I asked a larger number because I wished to see as many clever youngmen as my table could accommodate.

উক্ত ডায়েরী হইতে উদ্ধৃত লিখিত অংশ হইতে দৃষ্ট হয় যে, ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ১নং নম্বর রোডবিশিষ্ট উদ্যানগৃহে ক্রয় করিয়া তথায় বাস করিতে আরম্ভ করেন :—

17th June, 1855. Removed early in the morning to my new house at Paickpara. Brother and myself drove at 5 P.M. We both thanked God Almighty for it and I pray that I am allowed to enjoy it. My enjoyment might not be merely animal and made up of comfortable living—safety as under a hot sun in summer and an inclement sky in the autumn but result from my moral and intellectual improvement. Almighty and everlasting God, if it be Thy will that I should be settled in this house, grant that I may live happy. Grant that I may learn to appreciate more Thy living goodness. Grant that I may shake off the lethargy that has lately seized me and devote myself to study and reflection. Grant that I may devote my energies to the promotion of my own moral and intellectual improvement and that of my fellow countrymen. Grant that the cause of the social reform of Bengal which I have espoused may gather new strength every day and enlist the active sympathies of the enlightened portion of the native community. Grant that I may labour in that cause with unwearrying zeal.

এই রোজনামচার শেষাংশে তাঁহার সমাজোন্নতি বিষয়ে চেষ্টার উল্লেখ আছে । তিনি সমাজ-সংস্কারের জন্য বাহ্য করিয়াছিলেন তাহা বলিবার পূর্বে তাঁহার দেশীয় শিক্ষোন্নতি ও শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা সম্বন্ধে আনন্দের কিছু বলিতে চাহি ।

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণেল গুডউইন বেথুন সোসাইটিতে “Union of Science, Industry and Art” নামে প্রবন্ধ পাঠ করেন ও এক্ষণে একটি শিল্পবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন । ঐ বৎসরে মার্চ মাসে ইহারই চেষ্টায় মিঃ হক্‌সন গ্র্যাটের বাটীতে ভারত গবর্ণমেন্টের রাজস্ববিভাগের তদনীন্তন

সেক্রেটারী মি: আলেনের সভাপতিত্বে একটি সভা হয় এবং—Society for the promotion of Industrial Art নামে একটি সমিতি সংগঠিত হয়। সার সিল বিডন ইহার সভাপতি এবং রোবের্ট ডে, লর্ড, উইলিয়ম মনি, কিশোরীচাঁদ মিত্র, ব্রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ প্রভৃতি মহোদয়গণ ইহার কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্য হইলেন। * এই সমিতির চেঁয়ার The Calcutta School of Industrial Arts নামক শিল্পবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই বিদ্যালয়ে গঠিত দ্রব্য (Models) এবং স্বাভাবিক বস্তুনিচয় (natural objects) দৃষ্টে অঙ্কন ও স্থাপত্য অঙ্কন (architectural drawings) দাঁতুর উপর কোদাই কার্ণা (etching) কাঠের উপর কোদাই কার্ণা (wood engraving) লিথোগ্রাফি, মৃৎপাত্র নিৰ্মাণ (pottery) প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হইত। পরে প্রাষ্টরের ছাঁচ নিৰ্মাণ (moulding) ফটোগ্রাফি প্রভৃতি বিষয়ও শিক্ষা দেওয়া হইত। মুসে রিগো, মি: ফাউলার, মি: জর্জ হুইটলি, মুসে ম্যালিয়েট প্রভৃতি শিক্ষক ঐ বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান করিতেন।

কিশোরীচাঁদ এই সমিতির প্রায় সকল অধিবেশনেই উপস্থিত থাকিতেন এবং মধ্যে মধ্যে বিদ্যালয়পরিদর্শন করিয়া ছাত্রগণকে উৎসাহ দিতেন। তাঁহার ডায়েরী হইতে দুইটি অংশ এই স্থলে উদ্ধৃত করিতেছি :—

- 20th Sept. 1855. Drove down early in the morning to the Industrial School to attend a meeting of the Committee. It was convened for considering the propriety of having an exhibition in the Town Hall in celebration of the first anniversary of the School. I expressed my strong opposition to this proposition of Col. Goodwin and suggested that the exhibition should be on a small scale and held at the school premises. My suggestion was adopted. Government has just granted 200 per mensem to the school but this grant-in-aid is inadequate and it is necessary to retrench. The new Secretary of the School, Revd. C. H. G. Dall takes a zealous interest in the School and though newly arrived from Boston and ignorant of Calcutta will soon make a capital Secretary.
- 23rd Sept. Drove to the Industrial Art School early in the morning, was much pleased with the progress of the pupils

* ঐশ্বরচন্দ্র দেবেদর কলিকাতার ইতিহাস—শিল্পপুস্তকালি ১ম বর্ষ ১৮৮৬।

in modelling and drawing. Professor Rigaud showed me some basereliefs he is working for Mr. Halliday. which are really very tastefully executed. I gave orders to him to make a Venus de Medici and a Hercules. They would be of life size and bronzed over for being placed in my garden. I selected Venus and Hercules because the one is the embodiment of elegance and the other of manly and muscular power.

কিশোরীচাঁদের উদ্ভাবন স্বাভাবিক বৈটকখানা গৃহের প্রস্তোতের কাণ্ডও রিগোয় ছাত্রগণ কর্তৃক নিম্পন্ন হইয়াছিল ।

যাহাতে বেশে শিক্ষোন্নতি হয় তজ্জন তিনি বহুদিন হইতে চেষ্টা করিতেছিলেন । তাঁহার উচ্চা ছিল, এসিয়াটিক সোসাইটী এই বিষয়ে মনোযোগ প্রদান করেন । ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ১লা নভেম্বর তারিখে তিনি তাঁহার ভাষণের লিখিয়াছেন :—

"Attended the meeting of the Asiatic Society and was proposed a member by Ram Gopaul. I wish to renew my connection with this body as I was its Assistant Secretary and Librarian before I proceeded to Rajshye. I am anxious to see this institution organised. I conceive the Society is not fulfilling its object by lending itself to the promotion of objects alien to those for which it has been instituted. * * * I would suggest an exhibition of arts to be opened in connection with the Society. Why does it not take the lead in Col. Godwin's proposed Industrial Exhibition. I must communicate my views to Krishna, Ram Gopaul, Radhanath, Rajendralala, Long, Colebrooke and Jadub and try to obtain their co-operation in my endeavour to re-organize the Society.

বহুদিন হইতেই এতদ্বশে শিক্ষাবিস্তারের জন্য কিশোরীচাঁদ চেষ্টা করিতে ছিলেন । আমরা দেখিয়াছি, তিনি কলিকাতার রেভারেন্ড ডাক্তার ডব্বে তাঁহার সাধ্যমত সাহায্য প্রদান করিয়াছিলেন, এবং রামশাহিতে ধূল প্রকৃতি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন । কলিকাতার প্রত্যাগমন করিয়া তিনি প্রায়ই বেসরকারী ধূলসমূহ পরিদর্শন করিতেন, পারিতোষিকাদি প্রদান করিয়া ছাত্রগণকে উৎসাহ দিতেন এবং মধ্যে মধ্যে ধূল ফণ্ডে অর্থসাহায্যাদি প্রদান করিতেন । •

• ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর তারিখের 'Hindoo Patriot' হইতে একটা প্যারাগ্রাফ নিয়ে উদ্ধৃত হইল—

"We are glad to inform our readers and the public that our worthy

পাইকপাড়ায় একটি বিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টাও তিনি চেষ্টা করেন। তিনি স্কুল-সমূহে নিম্ন শ্রেণীর লোকদের কৃষি এবং শিল্প বিজ্ঞা শিক্ষা দিবার চেষ্টা করিতেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ২২শে আগষ্ট তারিখের ডায়েরীতে তিনি লিখিয়াছেন :—

Had a long conversation with Brother and Radhanath about a vernacular School which we propose to establish in this quarter. It ought to be for the poor and the Gurreeb-Vadro or the respectable destitute class which is numerous and peculiar to this country. A plain vernacular education is to be imported. The first stage will constitute reading, the second writing and arithmetic—but it must be followed up by an industrial and agricultural education. The boys must be taught the elements of Agriculture and Botany—they must be taught things and not words. I must visit Long's School at Tacorpooker and inspect minutely the Botanic School. I must set about in the next cold weather. Life is short and must not be wasted as I am wasting now.

কিশোরীচাঁদের ডায়েরী হইতে দেখা যায় যে, এতদ্ব্যতীত তিনি ব্রাহ্মই মেডিক্যাল কলেজ বট্যানিক গার্ডেনের তৎকালীন সুপারিন্টেন্ডেন্ট ডাক্তর টমসনের উদ্ভিদবিজ্ঞা বিষয়ক বক্তৃতাও শুনিতে যাইতেন। রেভারেন্ড ডল ও লংও তাঁহার সহিত যাইতেন। মিস্টাঃ লংই টমসনের সহিত কিশোরীচাঁদের আলোপ করাইয়া দেন। সেই অবধি ডাক্তর টমসন মধ্যে মধ্যে কিশোরীচাঁদের বাটীতে আসিতেন এবং উভয়ে এতদ্ব্যতীত কৃষিশিক্ষাবিস্তারের উপায় সম্বন্ধে আলোচনাদি হইত :—

25th Oct. 1855. Had a small breakfast party at home. Dr. Thomson, the new Superintendent of Botanic Gardens, the Revd. J. Long, Agabeg, Brother and Raj. After breakfast I took Dr. T. Long and Brother and Kumud to the Seven Tanks. The Doctor admired the appointments of the house indicating not only great wealth but good taste. From the Seven Tanks we drove to Raja Nursing's Garden adjoining mine. Dr. Thomson was most agreeably surprised at the magnificent collection

Junior Magistrate Roy Kissory Chand Mitter has given a handsome donation to the Calcutta Seminary and has also expressed his desire of visiting the school one day.

of plants. He surveyed it and it was also a treat to me to examine these in his company. But unfortunately the weather being very foul we could not take a round in the garden but were obliged to return home after a hurried survey of the conservatory. We dined at 3 p.m., and passed the day most pleasantly. We had a long conversation on the botany of India, the Bengalee Medical class established at the Medical College, the necessity of establishing Agricultural Schools and other interesting subjects. We separated at dusk.

27th Oct. I have long been thinking of Agricultural Schools and the conversation I had yesterday with Thomson and Long confirms my conviction of their necessity and feasibility. I must draw up a skeleton plan and submit it to my friends. I must also often visit the Bengalee Medical class and the Female School. Must see Beadon on the subject of the latter institution. I must also make it a point to see the Industrial School as often as possible.

কিশোরীচাঁদের এই কৃষি ও শিল্পবিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টা কতদূর বলবতী হইয়াছিল আনন্স তাহা অবগত নহি। কিন্তু তিনি আজীবন লিখিত প্রবন্ধে, বক্তৃতায় এবং কপোপকথনে যাহাতে এইরূপ বিদ্যালয় সর্বত্র স্থাপিত হয় তাহার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে প্রধানতঃ কিশোরীচাঁদের উদ্যোগে এবং প্রযত্নে কুমার কালী-কৃষ্ণ রায় কর্তৃক পাটকপাড়ার একটি ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। কিশোরীচাঁদ এই স্কুলের পরিদর্শক ছিলেন। তিনি প্রায়ই স্কুল পরিদর্শন, পরীক্ষাগ্রহণ ও পারিতোষিক প্রদান করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেন। শুধু তাহাই নহে, ছাত্রগণ এবং শিক্ষকগণকে উৎসাহ দিবার নিমিত্ত তিনি মধ্যে মধ্যে যুরোপীয় ও দেশীয় পণ্ডিতগণকে বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে আনয়ন করিতেন। ইহাদের মধ্যে চিরস্মরণীয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়দ্বিগের নাম উল্লেখ করা ঘাটতে পারে। বিদ্যাসাগর মহাশয় মধ্যে মধ্যে বাঙ্গালান্যায় পরীক্ষা লইতেন এবং পুস্তকাদি প্রদান করিয়া ছাত্রগণকে উৎসাহ প্রদান করিতেন। এই স্কুলের প্রথম বার্ষিক কার্য্যবিবরণীতে কুমার কালীকৃষ্ণ কিশোরীচাঁদের নিকট যে সাহায্য পাইয়াছিলেন তাহা এইরূপে স্বীকৃত হইয়াছে :—

আম্ভাবত্



"I have been always warmly assisted by Roy Kissory Chand Mitter, the Magistrate of the Northern Division, Calcutta. He has always evinced a deep interest in the welfare of the School and is one of its sincere friends."

শ্রীমদ্রথনাথ ঘোষ।

প্রকৃতি ও কবি।

—•••—

জটিল রহস্তে পূর্ণ করি' আপনারে,
ধাড়ায়েছে দার্শনিক সম্মুখে, প্রকৃতি !
ভেদিতে রহস্ত শুধু, মনীষার বলে,
নিমুক্ত রেখেছ তা'রে, দিবে মহাধ্বতি।

যে বিচিত্র উপাদানে, অনন্তরূপিণী,
গঠিত বিহাট কারা, প্রকৃতি তোমার ;
শুধু তাই ল'য়ে মত্ত সদা বৈজ্ঞানিক,
রেখেছে কঙ্কাল শুধু নেত্র'পরে তা'র।

অপরূপ যে বিচিত্র সৌন্দর্য্য তোমার
অন্তরে বাহিরে তব বিলসে রঙ্গিনী !
বঞ্চিত রেখেছ তা'রে সে সৌন্দর্য্য হ'তে,
রেখেছ চিরাক্ষ করি' কি দোবে মানিনি ?

কেবল কবির নেত্রে রেখেছ, স্নানরী,
সকল সৌন্দর্য্য তব চির-লগ্ন করি'।

শ্রীবিভূতিভূষণ মজুমদার।

প্রতিশোধ ।

(বিস্মৃতের আত্মকাহিনী)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

সেই স্থানে আমার নূতন আবিষ্কৃত ধনরাশি পুনরায় সম্বন্ধে সেই ব্যক্তি রক্ষা করিলাম ; কেবল স্বর্ণ ও মণিমুক্তাপরিপূর্ণ দুইটি থলি আমার নিকট রহিল । বান্ধাটির উপরের ডালা কতক ভয় হইলেও উহা বেশ স্বপৃচ্ছ ছিল । আমি সম্বন্ধে উহা আবদ্ধ করিলাম । মন্দিরের নিকৃত কন্দরে উহা টানিয়া লইয়া বড় বড় তিনখণ্ড প্রস্তরদ্বারা চাপিয়া রাখিলাম । এই সময়ে আমার পরিহিত সামান্য পরিচ্ছদের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষিত হইল । আমি কিরূপে এই সামান্য পরিচ্ছদ লইয়া লোকসমক্ষে বহির্গত হইব, তাহাই আমার চিন্তার বিষয় হইল । আমার বহুগুণ ব্যস্ততাবশতঃ আমার সকল দ্রব্য লইয়া যাবেন নাই । আমার নামের কার্ড, চাবীরগুচ্ছ ও টাকার থলি আমার পরিচ্ছদের অভ্যন্তরে তখনও লুকাইয়া ছিল । আমি পকেটে হাত দিতেই ঐ সকল বাহির হইয়া পড়িল । আমি টাকার থলিটি পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, উহাতে যে পরিমাণ অর্থ এখনও আছে তাহাতে একটা স্বর্ণের পরিচ্ছদ ক্রয় করা অসম্ভব হইবে না । কিন্তু তাহা ক্রয় করিবে কে ? একবার মনে হইল, সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এই স্থানেই অপেক্ষা করি । আবার মনে হইল, এই নির্জন সমাদি-মন্দিরে স্থগীর্ণকাল অবস্থান করা বড়ই ক্লেশকর হইবে ; তাই সম্বন্ধে উহা পরিত্যাগ করিবার মন্ত কৃতসঙ্কল্প হইলাম । নেপল্‌সের রাজপথ-সমূহ নিরন্তরই ত জীর্ণবস্ত্র-পরিহিত অসংখ্য ভিক্ষুকে পরিপূর্ণ থাকে ; কে আমাকে তদ্ব্যতীত চিনিয়া লইবে ? বস্তু প্রকার বাণ্যবিষয়ই কেন উপস্থিত হউক না, আমি সে সকল নিম্নতরই অতিক্রম করিতে সমর্থ হইব ।

আমার প্রথম প্রাপ্ত কণ্ঠাত্তরগণি আমার স্ত্রীকে উপহার প্রদান করিবার আশায় আমার কণ্ঠস্থিত হারে উহা সংবদ্ধ করিয়া লইলাম । আমি পুনরায় রক্তপথে বহির্গত হইলাম ; রক্তমুখ কাষ্ঠ ও প্রস্তরখণ্ডে আবৃত করিলাম । উহা এমন কোশলে রচিত যে, বাহির হইতে উহার অস্তিত্ব নিরূপণ করা একেবারে অসাধ্য ছিল । আমি সহরে প্রবেশ করিয়া সর্বপ্রথম আহাৰ্য ও পরিচ্ছদ সংগ্রহে যত্নবান হইব ; পরে বস্তু সম্বন্ধে গৃহে প্রত্যাগমন করিব ।

নিকটেই একটা ক্ষুদ্র অছন্নত পাহাড় ছিল। আমি জানিতাম, আমার সমাধি-মন্দির সহরের এক প্রান্তদেশে অবস্থিত। আমি পাহাড়ে আরোহণ করিয়া দিক-নির্ণয়ে যত্নবান হইলাম। একটি সংকীর্ণ পথ বুরিগা ফিরিয়া আমার দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইয়াছে; আমি অল্পমানে নির্ভর করিয়া সেট পথের অনুসরণ করিলাম।

ষিপ্রহরের প্রথম আলোক তখন চতুর্দিকে অধিবর্ণ করিতেছিল। তখন-তাপে তপ্ত বালুকণা আমার নয় পদস্থয়ে অগ্নিকণার স্তায় ক্ষুদ্র হইতেছিল। আমার অনাবৃত মস্তক ভীষণ রোদ্রে পুড়িয়া যাউতেছিল। আমার সে সকলে ক্রোধান্বিত নাই। আশার ও আনন্দের আনন্দের তখন পূর্ণ। আমি অগ্রসর হইতে লাগিলাম। লক্ষ্য আমার কর্ত্তরোধ না করিলে আমি হর ত চীৎকার করিয়া তখন আমার মনের আনন্দ জ্ঞাপন করিতে গান করিতে থাকিতাম। দুর্ভাগ্যতানিধন আমার হস্তপদ তখন কম্পিত হইতেছিল। আমি চক্ষুতে ও মস্তিষ্কে একরূপ দারুণ যন্ত্রণা অনুভব করিতেছিলাম। আমি বুঝিলাম, ইহা আমার অতীত পীড়ার শেষ পরিণাম। নীনার যন্ত্র এক দিন অবশ্য আমার এ সকল উপসর্গ তিরোহিত হইবে। আমি সেই আশার আশ্রয় সাহসে নির্ভর করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। প্রথমে কোনও জন প্রাণীর সহিত বড় সাক্ষাৎ হইল না। পরে এক শকট-চালক আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। তাহার গাড়ীখানি নানাবিধ স্তম্ভসাল ফলে পূর্ণ ছিল। সে নিভ্রালস নেত্রে গাড়ীতে উপবেশন করিয়া চলিতেছিল, আর তাহার অঙ্গগুলি এই সুযোগ পাইয়া পশ্চি-পার্শ্বস্থ ভূগুণ্ডাদির হৃদয় সন্ধ্যাবহার করিতেছিল ও সময় সময় গ্রীবাসকালন-পূর্বক মধুর বর্ণনাধ্বনি করিয়া মনের আনন্দজ্ঞাপন করিতেছিল। আমি ক্ষুণ্ণিপাসায় বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। সরস আব্রুগুলি আমার হৃদয় আকৃষ্ট করিল। আমি শকট-চালককে আগ্রহিত করিলাম। সে আতঙ্কে চমকিয়া উঠিল। তাহার বদনমণ্ডলে দারুণ ভীতির চিহ্ন প্রকটিত হইয়া উঠিল। সে নানা দেবদেবীর নাম উচ্চারণ করিতে করিতে জানুপবিষ্ট হইয়া আমার নিকট জীবন-ভিক্ষা করিতে লাগিল। তাহার এই অস্বাভাবিক ভীতি দেখিয়া আমি হাস্ত সঞ্চরণ করিতে পারিলাম না। আমার পরিচ্ছদের সামান্য অসামঞ্জস্য বাতীত আমাকে ভয় করিবার কারণ কি?

আমি তাহার হস্তধারণ করিয়া তাহাকে উত্তোলিত করিলাম। অর্থের বিনিময়ে কয়েকটি আব্রু বাতীত আমার যে আশ্রয় কিছুই প্রার্থনার বিষয় নাই, তাহা তাহাকে বুঝাইয়া দিলাম। সে ভীত ও কম্পিত হস্তে মুদ্রা কয়টি গ্রহণ করিয়া

আমাকে কয়েকটি আঙ্গুর প্রদান করিয়াই দ্রুতগতিতে অথ ধাবিত করিয়া দূরে পলায়ন করিল। আমি তাহার এই বিসদৃশ ব্যবহারে স্তম্ভিত হইলাম। সে আমাকে চোত্র—না দহ্ম—না প্রেত মনে করিয়াছিল আমি বুঝিতে পারিলাম না। আমি আঙ্গুরগুলি আহার করিতে করিতে সহরের দিকে পুনরায় অগ্রসর হইতে লাগিলাম। আঙ্গুরগুলি এই সময় বস্তুতঃই আমার নিকট বড় তৃপ্তিপ্রদ হইয়াছিল। আমি বন্দরের সরিকটে উপস্থিত হইলে বহু লোকের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। তাহারা কেহই আমার দিকে বড় দৃষ্টিপাত করে নাই; আমিও যথাসম্ভব তাহাদের দৃষ্টি অতিক্রম করিয়াই যাইতেছিলাম। আমি সহরে আসিয়া উপনীত হইলাম। চতুর্দিকে আবর্জনারাশি হইতে দারুণ দুর্গন্ধ আমাকে ক্রেশ প্রদান করিতে লাগিল। আমি একটা সন্ধ্যা অন্ধকার গলি দিয়া ক্ষুদ্র একখানি দোকানে উপস্থিত হইলাম। দোকানের প্রত্যেক দ্রব্য দোকানীর দারিদ্র্যের পরিচয় দিতেছিল। দোকান একখানি ক্ষুদ্র প্রাচীন স্ত্রীর্ণ গৃহে অবস্থিত। তাহার গবাক্ষের মধ্য দিয়া গৃহভাষ্যের সজ্জিত বিক্রয় পুরাতন পরিচ্ছদগুলি দৃষ্ট হইতেছিল। আমি এইরূপ দোকানেরই অহুসঙ্কান করিতেছিলাম। আমি জানিতাম, বিশেষ-প্রত্যাগত দরিদ্র নাবিকগণ এই স্থানে উপবেশন করিয়া থাকে। তাহাদের সংগৃহীত নানা প্রকার লব্ধ, প্রবাল, নারিকেল মালায় প্রস্তুত নানাবিধ পানপাত্র, নানাবর্ণের বিচিত্র শুভ মূর্তিকা, অশ্বাভাবিক পশুশৃঙ্গ, নানাবিধ মৃত শুভ পক্ষী, নানা প্রকারের পাখা ও প্রাচীন মুদ্রা এবং অদ্বুত আকৃতির কাষ্ঠপুতলিকা এই স্থানে বিক্রীত হইয়া থাকে। বিপণির উন্মুক্ত দ্বারে ধূমপাননিরত বৃদ্ধ দোকানদারকে সর্বদাই এই সকল দ্রব্যের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত থাকিতে দেখা যাইত। তাহার কুঞ্চিত অধর, বহরেখাসম্বিত লগাট, মলিন বক্ তাহার প্রাচীনত্বের সাক্ষ্য প্রদান করে। তাহার সংলগ্নাকুল নেত্র সর্বদা সন্নিহিত ভাবে ইতস্ততঃ ঘূরিয়া বেড়ায়।

আমাকে ঘরে প্রবেশ করিতে দেখিয়াই দোকানদার প্রথমে অন্যমনস্কভাবে স্থলীল আকাশের দিকে তাকাইয়া রহিল; সে যেন আমার আগমন জানিতেই পারে নাই এইরূপ ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল। আমি তাহার মনোযোগ আকৃষ্ট করিলাম; প্রকৃত তত্ত্ব গোপন রাখিয়া আকস্মিক ছুঁটনা আমার পরিচ্ছদহানির কারণ নির্দেশ করিয়া তাহার নিকট একটা পরিচ্ছদ চাহিলাম; এবং তাহাকে ইহাও বলিলাম যে, যে কোন রকমের একটা পরিচ্ছদ পাইলেই আমার উদ্দেশ্য হ্রাসিত হইবে।

বৃদ্ধ তাহার মুখ হঠাতে চুপুট সরাইয়া লইল; আনাকে জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি কি এই মহানারীকে ভয় কর?”

আনি প্রশান্তভাবে তাহার কথার উত্তর দিলাম; তাহাকে বলিলাম, “অতি অল্পদিন হইল আমি এই মহাব্যাধির আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইয়াছি। আমি আর উহার ভয়ে ভীত নহি।”

বৃদ্ধ অত্যন্ত মনোযোগের সহিত আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল, পরে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া অশ্রুটন্তরে বলিতে লাগিলেন, “বেশ, বেশ! আমার ন্যায় দ্বিতীয় ব্যক্তিও এ জগতে আছে। আমার ন্যায় তাহার ক্ষয়ও মহানারীভয়ে ভীত নহে। দেবতারা আমাদের মঙ্গলের নিমিত্তই এই মহানারী প্রেরণ করিয়াছেন। আমরা তাঁহাদের নিকট ক্লতস্ত। তাঁহাদের প্রতি দোষারোপ করিবার কোনও কারণ আমার নাই। আমি বরং প্রার্থনা করি, এই মহানারীর আক্রমণ দীর্ঘকালস্থায়ী হউক। শত শত নরনারী প্রতিদিন ইহাতে আক্রান্ত হইতেছে; শত শত নরনারী প্রতিদিন ইহাতে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। আমি প্রতিদিন তাহাদের পরিত্রিত পরিচ্ছদ স্বল্পমূল্যে ক্রয় করিতেছি এবং প্রতিদিন সেগুলি পরিশোধিত না করিয়াই দ্বিগুণ মূল্যে অস্ত্রের নিকট বিক্রয় করিতেছি। তাহাতে সংক্রামক ব্যাধির পরাক্রম প্রতিদিন বর্দ্ধিত হইতেছে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাতে কতি কি? মানুষ মরিতে আসিগাছে—মরিবে। সে শত শত মৃত্যুমুখে পতিত হয় ততই মঙ্গল। বিধাতারও তাহাই অভিপ্রায়। তিনি তজ্জন্তই এই ব্যাধিও প্রেরণ করিয়াছেন। আমি তাঁহার কার্যের সহায়তা করিতেছি মাত্র।” অধিবাসী বৃদ্ধ সত্যই এই কথা বলিয়া যেন মহাস্তুতিসহকারে মস্তক অবনত করিল।

আনি তাহার কথার বড় বিরক্ত হইলাম। তাহাকে স্পর্শ করিতেও যেন আমার যুগা বোধ হইতেছিল। সেই সমাধি-মন্দিরে আমার গ্রীবাঃশনকারী যে কীটের সংস্পর্শে আমি শিহরিয়া উঠিগাছিলাম এই বৃদ্ধের সংস্পর্শও যেন আমার নিকট তেমনই অপ্রীতিকর বোধ হইতে লাগিল। আমি পক্ষ্য কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলাম, “আমাকে কি একটা পরিচ্ছদ প্রদান করিবে?”

এবার বৃদ্ধ সত্তর তাহার আসন পরিত্যাগ করিল। তাহার অপূর্ণ—বন্ধ—ধর্ম দেহখানি গৃহমধ্যস্থিত অশ্রুপট্ট আলোকে একখানি বন্ধ বৃক্ষকাণ্ডের ন্যায় প্রতীক্ৰমান হইতেছিল। সে আমাকে গৃহের অভ্যন্তরে ডাকিয়া লইয়া আমার পসন্দের অল্পস্থল পরিচ্ছদ মনোনয়ন করিয়া গইতে অগ্ররোধ করিল। সে একটা পরিচ্ছদ হাতে

লইয়া তাহার অথবা প্রশংসা করিতেছিল। উহা তাহার মতে বড় হৃদুস্ত্র এবং মনোরম পশমে নির্মিত। এক জন ধনবান যুবক এক সময়ে উহা পরিধান করিত। সে ঘোর মদ্যপায়ী ছিল। এই মহামাত্রী তাহাকেও ইহাঙ্গত হইতে অপসারিত করিয়াছে। সে জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্যন্ত মদ্যপানে বিরত হয় নাই। বৃদ্ধ সোকানদারের মতে তাহার মৃত্যু বড় হৃৎকর। সে তাহার প্রস্তুত মূল্যের দ্বিগুণ মূল্যে ঐ যুবকের পরিচ্ছদ আনার নিকট বিক্রয় করিতে প্রস্তুত হইল। সে দরিদ্র; এইরূপে অর্থ উপার্জন না করিলে সে কিরূপে আপন প্রাসাদোদন সংগ্রহ করিবে, ইহাই সে তাহার ঐক্লপ দ্বিগুণ মূল্যে বিক্রয় করিবার উপযুক্ত কারণ বলিয়া নির্দেশ করিল।

আমি কিন্তু উহা দারুণ বিরক্তির সহিত দূরে নিষ্কিপ্ত করিয়া বলিলাম, “যদিও মহামাত্রীর ভরে আনার ক্ষমতা জ্ঞাত নহে, তথাপি মদ্যপায়ী ইংরাজ যুবকের মদিরাসিক্ত মূল্যবান পরিচ্ছদ অপেক্ষা সাধুচরিত্র দরিদ্রের ব্যবহার্য্য স্থল পরিচ্ছদ আনার প্রিয়।”

বৃদ্ধ আমার কথায় অটুহাস্ত করিয়া উঠিল। আমি সে বিকট শব্দে চমকিয়া উঠিলাম। সে মনে করিয়াছিল, আমি তাহাকে বিজ্ঞপ করিতেছি মাত্র; কারণ, নীতিজ্ঞান বাহার ক্ষমতা স্থান পাঠিতে পারে না, সে অপরের নীতিজ্ঞানও ক্ষমতা ধারণা করিতে পারে না। সে আমার কথাগুলি বিজ্ঞপ মনে করিল; আমাকে বলিল, “বৃদ্ধ তুমি ত বড় আনন্দপ্রিয়! আমিও এইরূপ আনন্দ বড় ভালবাসি। পৃথিব্যাতে মানুষ শুধু আনন্দে দিন যাপন করিতে আসিয়াছে। তাহার শুধু হাসিবে। মৃত্যুর করালছায়াও সে হাসি লুপ্ত করিতে পারে না। মানবের কঙ্কালগুলিও সর্ব্বদা দস্তবিকসিত করিয়া হাস্য করে। আমরা কেন হাসিব না?”

সে দেহের খুলিয়া নানা প্রকারের পরিচ্ছদ আমাকে দেখাইতে লাগিল। আমি নীরবে তাহার পশ্চাতে দণ্ডায়মান হইয়া শুধু ভাবিতে লাগিলাম, বৃদ্ধ আমাকে আনন্দপ্রিয় বৃদ্ধ বলিয়া কেন সোধোদন করিল? আমাতে বার্ব্ধক্যের এমন ক'টিল একটিও হইয়াছে? হয় বৃদ্ধের দৃষ্টিশক্তি বার্ব্ধক্যহেতু দুর্ব্বল হইয়াছে, নহেত তাহার বুদ্ধির বিপর্য্য ঘটয়াছে। এই সময় হঠাৎ বৃদ্ধ আমার দিকে চাহিল; মহামাত্রীর প্রেক্ষাপেক্ষের কথাই উল্লেখ করিয়া বলিতে লাগিল, “গত কল্যা সত্যই বড় একটা ক্ষমতা-বিদায়ক ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে। সেপলসের একজন বলবান ও ধনবান যুবক গতকল্য এই ব্যাধিতে আক্রান্ত

হইয়া সন্মার পূর্বেই মৃত্যুদণ্ডে পতিত হইয়াছে। তাহার পৈত্রিক সমাধি-মন্দিরে তাহার দেহ রক্ষিত হইয়াছে। মহানারীকে এই নির্মূলুজিতার জন্য প্রশংসা করা যায় না। এমন লোকপ্রিয় কাউন্ট ফ্যাবিও রোমানিকে এত সদর দোকচক্ষুর অন্তরালে গইয়া ভগবান ও মহানারী তুল্যরূপে নিশ্চিত হইয়াছেন।”

বৃদ্ধের কথায় আমি চমকিত হইলাম; কিন্তু সদর আশ্রয় হইয়া এই ঘটনার সহিত আমার কোন সংশ্রব নাই এইরূপ ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলাম। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “জগতের সমগ্র নরনারী মৃত্যুদণ্ডে পতিত হইলেও তুমি বাহার মৃত্যু আকাঙ্ক্ষা কর না এমন সৌভাগ্যবান পুরুষ কে?” বৃদ্ধ তাহার বদনমণ্ডল হইতে শুভ্র কেশগুচ্ছ অপসারিত করিয়া হস্ত প্রসারিত করিয়া বলিতে লাগিল, “আহা! সে যে বড় স্বন্দর ও সবল ছিল! এমন নরনাভিমান মুষ্টি কচিং পুষ্ট হইয়া থাকে। সে যে তোমারই মত সুদীর্ঘ—তোমারই মত সবল—তোমারই মত উন্নতকায় ছিল। তোমার চক্ষু কোটরে প্রবেশ করিয়াছে, তাহার চক্ষু উজ্জ্বল ও প্রোতজাদীপ্ত ছিল। তোমার বর্ণ মলিন, তাহার বর্ণ উজ্জ্বল—সুপক কদলীসদৃশ ছিল। তোমার কেশ তুঘাঘের স্তায় শুভ্র, তাহার কেশরাশি মেঘের মত ঘোর রক্তবর্ণ ছিল।”

বৃদ্ধের কথায় আমি স্তম্ভিত হইলাম। সত্যই কি আমার এত পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছে? সমাধি-মন্দিরের বিভীষিকা সত্যই কি এক রজনীতে আমাকে এত পরিবর্তিত করিয়াছে? সত্যই কি আমার কেশরাশি শুভ্র হইয়াছে? নীনা ও আমাকে তাহা হইলে আর চিনিতে পারিবে না! আমাকে দেখিয়া সে নিশ্চয়ই ভীত হইবে! গিডোও আমাকে সম্মেলনের দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিবে! আমি আমার পরিত্যক্ত শবাব্যায় দেখাইয়া কি তাহাদের নিকট আমার স্বরূপ প্রতিপন্ন করিতে সমর্থ হইব না? এইরূপ চিন্তা আমার হৃদয় উজ্জ্বলিত করিতে লাগিল। বৃদ্ধ তখনও অনবর্ণ তাহার কথা বলিয়া যাঁহতে লাগিল। সে বলিল, “আর সে কি স্বন্দর বলিষ্ঠ মুখ পুরুষই ছিল! তাহার শক্তির কথা মনে করিয়া আমি কত সদর আনন্দিত হইতাম। আমার আশা ছিল, এক দিন সে তাহার সুদৃঢ় অনুলীর সাহায্যে তাহার স্ত্রীর কণ্ঠদেশ নিশ্চিহ্নিত করিবে। তাহার স্ত্রীর সর্বপ্রকার মিথ্যা আচরণ তাহাভেই লুপ্ত হইবে, সে আকাঙ্ক্ষাও আমি হৃদয়ে পোষণ করিতাম। সে জীবিত থাকিলে আমার আশা এক দিন পূর্ণ হইত সম্ভব নাই। তাই তাহার অকাল-মৃত্যুতে আমি এত দুঃখিত।”

এই হতভাগ্য বৃদ্ধ কি বলিতেছে ! আমি অতি কষ্টে আপনাকে সংঘত করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “রোমানির স্ত্রীর প্রতি তোমার এ বিধেব কেন ? তিনি কি তোমার কোনও অনিষ্ট করিয়াছেন ?” আমার কণ্ঠস্বরে কিছু দৃঢ়তা ছিল ।

বৃদ্ধের অধঃপ্রান্তে বিক্রপের হাসি ফুটিয়া উঠিল । সে সোজা হইয়া পাড়াইয়া আবার বলিতে লাগিল, “হাঁ ! আমি তাহাকে ঘৃণা করি । অস্ত্রেরে দস্তুরতম প্রদেশ হইতে আমি তাহাকে ঘৃণা করি । তুমি সবল ; সবল লোককে আমি বড় ভালবাসি । তাই তোমার নিকট আমার সে ঘৃণার কারণ ব্যক্ত করিব । সবলরা সময় সময় এই সকল দুর্ব্বলা অবলা কর্তৃক প্রযুক্ত হইয়া থাকে এবং সবলগণই তাহার প্রতিবিধান করিতে সমর্থ হয় ; সময় সময় প্রতিশোধও লইয়া থাকে । আমিও এক সময় সবল ছিলাম । আমার দেহও এক দিন বলিষ্ঠ ছিল । তুমি বৃদ্ধ, তুমি বৃহত্তপ্রিয়, তুমি আমার সকল কথাই মন্দ্র উদ্ঘাটনে সমর্থ হইবে । রোমানির স্ত্রী আমার কোন অনিষ্টসাধন করে নাই । সে আজ বহু দিনের কথা, তাহার ঘোটকের পদাঘাতে আমি এক দিন পতিত হইয়াছিলাম । সে আমার দিকে চাহিয়া বিক্রপের হাসি হাসিয়া চলিয়া গেল । তাহার গোলাপসদৃশ অধরোষ্ঠমধ্যে সুন্দর স্নায়ু গুলু দস্তগুলি বড়ই শোভা ধারণ করিয়াছিল । কাউন্ট রোমানি তথায় উপস্থিত ছিলেন না । তিনি থাকিলে নিশ্চয়ই আমি অতুল্য ব্যবহার প্রাপ্ত হইতাম । তাহাতে হুঃখ নাই । কিন্তু সে বিক্রপের হাসির মধ্যে আমার আর একখানি মুখ মনে পড়িয়া গেল । এ হাসি যেন সেই হাসিরই অনুরূপ ।”

বৃদ্ধের এই উপাখ্যান আমাকে বাধিত করিল । আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “কাহার হাসির সহিত তুমি বিবি রোমানির হাসির তুলনা করিতেছ ?”

“সে যে আমারই স্ত্রী” নির্ভর বোকানদার তাহার দৃষ্টি আমার মুখে নিবদ্ধ করিয়া এই উত্তর প্রদান করিল । সে বলিল, “ভগবান স্ত্রীজাতির সৃষ্টি করিয়া আপনার ভুল বুদ্ধিতে বোধ হয় সমর্থ হইয়াছিলেন, তাই পরিশেষে রমণীয়ত্ব মেডোনা দেবীর সৃষ্টি হইয়াছিল । ভালবাসা কি আমি তাহা জানি । আমিও এক দিন বিবাহ করিয়াছিলাম । আমার স্ত্রীও অসামান্য রূপসী ছিল । বসন্তের স্ত্রুপ্রভাতের মত তাহার সৌন্দর্য্য মানবের চিত্তহরণ করিত । শিশুর মত নিষ্কল তাহার দৃষ্টি দ্বারা কি উদ্ভাসনারই সঞ্চার করিত ! তপনতাপতপ্ত কুসুমের মত বিনরাবনত তাহার মস্তক মানুষের দৃষ্টি আকর্ষিত করিত । আমি

বহুকাল অস্থপস্থিত ছিলাম। গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া দেখি, ভেনিস শহরের এক বলিষ্ঠ যুবক গায়কের আঁকে মস্তকস্থাপন করিয়া সে স্বখে নিমিত্তা ! আমাকে দেখিয়াই সেই সঙ্গীত-বাবনাদী লক্ষ্য দিয়া উঠিল, আনাকে আক্রমণ করিল। আমি কোণে তাহাকে পরাজিত করিলাম ; দৃঢ়রূপে তাহার হস্ত-পদ বন্ধন করিলাম। আমার স্বী তপন জাগ্রিত হইয়াছিল। ভয়ে ও বিদ্বেষে তাহার বাক্যশক্তি লুপ্ত হইল। নীরবে সে আমার দিকে তাকাইয়া রহিল। তাহার দেহ কম্পিত হইতেছিল। তাহার সেই দৃষ্টি আমার কৃপাভিক্ষা করিতে লাগিল। আমি তাহাতে জ্বরেণ করিলাম না। আমি গায়ক যুবককে অস্ত্র প্রদান করিলাম। তাহার কি অপরাধ ছিল ? এই পাপীয়সী তাহাকে অধিকার প্রদান না করিলে সে কি এই স্থানে আসিতে সমর্থ হইত ? আমি তীক্ষ্ণ ছুরিকা বাহির করিলাম, পাপীয়সীর কোমল বক্ষঃস্থলে সম্মুখে তাহা বিদ্ধ করিলাম। সে পুনরায় তাহার শয্যায় পতিত হইল। উক্ত প্রস্রবণের দ্বারা ন্যায় শোধিতধারা তাহার ক্ষতস্থান হইতে নির্গত হইতে লাগিল। তাহার প্রণয়ী চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহাকে ঐ ছুরিকাখানি উপহার প্রদান করিয়া আমি বলিলাম, মৃতের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ টেহা গ্রহণ কর। আনার মত তুমিও এক দিন এই বিশ্বাসহরী নারী কর্তৃক প্রবঞ্চিত হইতে সন্দেহ নাই। যুবকের চীৎকার আমি রাজপুরুষগণ কর্তৃক ধৃত হইলাম ; হত্যাপরাদে অভিযুক্ত হইলাম। বিচারক আমার অবস্থা বুঝিতে সমর্থ হইয়া আমাকে মুক্তি প্রদান করিলেন। তাহার গৃহেও বোধ হয়, স্ত্রলয়ী স্বী বর্তমান ছিল ; তাই বুঝি আমার হৃদয়ের বেদনা তাহার আবোধ ছিল না। আমার সেই মৃত পত্নীর সহিত এই রোমানি বিবির বিলম্ব সাপুষ্ট আছে। সেই মধুর হাসি, সেই বালোচিত দৃষ্টি ! তাই আমি তাহাকে স্থগা করি। তাহার স্বামী জীবিত থাকিলে সে-ও এক দিন তাহার হস্তে নিহত হইত। আমি তাই কাউন্ট রোমানির মৃহাতে এত ব্যথিত।”

শ্রীঅমলেন্দু গুপ্ত ।

কন্যা ।

আমি কৃষ্ণনগরে বাইতেছিলাম । পিতা পশ্চিমে চাকরী করিতে করিতে পরলোকগত হইলেন ; মাতা তাহার পূর্বেই ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিলেন । তখন মিসির বিবাহ হইয়া গিয়াছে । আমি পশ্চিমেই আমার কাছে থাকিয়া লিখাপড়া করিতেছিলাম । ছয় বৎসর পরে পাঠ শেষ করিয়া উকীল হইয়াছি । এই ছয় বৎসরে মিসি অনেকবার আমাকে দেখিতে চাহিয়াছেন—মাথার দিয়া দিগা তাহার কাছে বাইতে লিখিয়াছেন । কিন্তু পথ অল্প নহে—যাহ অনেক, আমি একাকী গমনাগমনে অনভ্যস্ত ইত্যাদি কারণে শঙ্কিত-শব্দাব মাতুল এতদিন আমাকে লাইতে দেন নাই । এবার ওকালতী করিতে বসিবার পক্ষে আমিও স্নিগ্ধ ধরিলাম, মিসির কাছে বাইব, মামাও আর তেমন আপত্তি করিলেন না । তাই আমি কৃষ্ণনগরে মিসিকে দেখিতে বাইতেছিলাম ।

তখন রাণাঘাট হইতে লালগোলা পর্য্যন্ত রেলপথ বিস্তৃত হয় নাই, কৃষ্ণনগরে বাইতে হইলে বগুলায় রেল হইতে নামিয়া বোড়ার গাড়ীর পথে চুর্নীনদী পার হইয়া, পরপারে হাসখালিতে আবার বোড়ার গাড়ী লইয়া কৃষ্ণনগরে বাইতে হইত । আমি সেই পথেই বাইতেছিলাম । চুর্নীনদী পার হইয়া আনাকে গাড়ীর জন্য একটু অপেক্ষা করিতে হইল । এ দিকে একটু বারিষাত আরম্ভ হইল । যে ভারবাহী আমার ভোরঙটি খেয়ানোকা হইতে নামাইয়াছিল, সে বলিল, নিকটে দোকানে অপেক্ষা করাই আমার পক্ষে কর্তব্য, ভিজিয়া লাভ নাই । তাহার কথা সঙ্গত বোধ হইল । আমি তাহার সঙ্গে চলিলাম । আমার মনে পড়িতে লাগিল, নীলকমল এক দিন এই পথে গিয়াছিল ।

ভারবাহী আমাকে একখানি ক্ষুদ্র ঘরে আনিয়া উপবিত্ত করিল । ঘরখানি পরিষ্কার—এক পার্শ্বে তক্তপোষে একখানি সতরঞ্চের উপর আজিম পাতা । আমাকে তথায় বসিতে বলিয়া ভারবাহী ডাকিল, “ঠাকুর মশায় !” তাহার ডাক শুনিয়া গৃহস্থানী বাহির হইয়া আসিলেন ; আমাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি কোথায় বাইবেন ?” আমি কৃষ্ণনগরে বাইব শুনিয়া তিনি বলিলেন, “গাড়ী এখনই আসিবে । আপনি কি এখনই বাইবেন, না আহায়াদি করিয়া আপনীর কন্যা বাইবেন ?” আমি তখনই বাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম । তাহার পর গৃহস্থানী আমাকে হাতে মুখে অল দিয়া কিছু এলাযোগ করিতে অল্প-

রোধ করিলেন। দীর্ঘ পথ অতিক্রান্ত করিয়া আমি শ্রান্ত ও ক্ষুধিত হইয়াছিলাম; সে অল্পরোধ রক্ষা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম।

দাওয়ার এক ঘটি জল রাখিয়া ব্রাহ্মণ নামিয়া গেলেন। আমি তোরঙ্গ হইতে তোয়ালে বাহির করিলাম। আমি হাতে মুখে জল দিয়া হাতমুখ মুছিয়া আসিয়া ঘরে বসিতে না বসিতে ব্রাহ্মণ বাটীর ভিতরের দিকের দ্বারটি মুক্ত করিয়া ঘরে আসিলেন ও তরুপোথের সম্মুখে একটি কেবরসিন টিনের কাঠের বাস্ন রাখিয়া তাহার উপর একখানি বাস্কাল্য সংবাদপত্র পাতিয়া ডাকিলেন, “মা, খাবার আন।”

মুক্ত দ্বারপথে একটি কিশোরী খাবারের থালা লইয়া আসিলেন। তিনি থালাটি বাস্নের উপর রাখিতে যাওয়া তুলিয়া লইলেন ও ব্রাহ্মণকে বলিলেন, “বাবা, এ যে এট সপ্তাহের খবরের কাগজ—এখনও পড়া হয় নাই।” “তাই ত”—বলিয়া ব্রাহ্মণ সে কাগজখানি তুলিয়া লইলেন ও আর একখানি কাগজ আনিয়া বাস্নের উপর পাতিয়া দিলেন। কিশোরী তাহার উপর থালাখানি রাখিয়া বাইলেন ও একটি মাসে জল লইয়া আবার আসিয়া জল দিয়া গেলেন।

কল্পা যখন পিতাকে সংবাদপত্রের কথা কহেন, তখন বিষয়বশে স্বাভাবিক শিষ্টাচার তুলিয়া আমি তাঁহার দিকে চাহিয়াছিলাম। তাঁহার মুখের বিষম ভাব ও নয়নের প্রতিভাবীর্ণি আমার নিকট নিত্যই অপ্রত্যাশিত মনে হইয়াছিল। তাঁহার বেশ তাঁহার বৈধব্যের পরিচয় দিতেছিল।

কিশোরী চলিয়া যাইলে আমি ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “যেয়েটি কি আপনায় কল্পা?”

ব্রাহ্মণ উত্তর দিলেন, “হাঁ, আমার কল্পা, সংসারে আমার সকল সুখ ও সকল দুঃখ।”

আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, “যেয়েটি বিধবা?”

ব্রাহ্মণ বলিলেন, “হাঁ। অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সের সন্তান কল্পাটিকে রাখিয়া উহার মাতা যখন ইহলোক ত্যাগ করেন, তখন উহার বয়স পাঁচ বৎসর। আমি ধর্ম্ম, কিন্তু উহার কোনরূপ অংগ হইতে দিই নাই—মুকে করিয়া উহাকে ‘মাহু’ করিয়াছিলাম। তাহার পর সর্ব্বদা দিয়া উহাকে স্নানাত্রেই দান করিয়াছিলাম। কিন্তু উহার অন্তঃ—আর আমার অন্তঃ—ছয় মাসের মধ্যে—” বলিতে বলিতে ব্রাহ্মণ কঁদিয়া ফেলিলেন।

আমি সে কথা চাপা দিয়া অল্প কথা পাড়িবার জন্ত বলিলাম, “বোধ হইল, যেয়েটি লিখাপড়া জানেন!”

“আমি বতটুকু জানি, উহাকে ততটুকুই শিখাইয়াছি । সংবাদপত্র বা বহি লইয়া উহার সময় কাটাইবার উপায় হয় । উহার যে কাৰ্য নাই !”

এই সময় আমার ভারবাহীটি আসিয়া সংবাদ দিল, গাড়ী আসিয়াছে । আমি তাহাকে তেরঙ্গটি দিলাম ; তাহার পর ব্রাহ্মণের নাম জানিয়া লইয়া তাহাকে একটি টাকা দিয়া ঘাইয়া গাড়ীতে উঠিলাম । ব্রাহ্মণের ও তাহার কন্ডার কথা ভাবিতে ভাবিতে আমি কৃষ্ণনগরে চলিলাম ।

২

আমি পশ্চিমটে ওকালতী করিতেছিলাম । দুই বৎসর দ্বিধিকে দেখিতে ঘাইতে পারি নাই । তৃতীয় বৎসর সংবাদ পাইলাম—দ্বিধির দেহ ম্যালেরিয়ায় জীর্ণ হইয়াছে । একান্ত পরিচিত হইলে ব্যাধিও আর ভীতিশূন্য থাকে না ; তাই ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে বাঙ্গালী ম্যালেরিয়াকে আর ভয় করে না—জ্বর গ্রাসা করে না ; শেষে পীড়া যখন প্রবল হয়—কুইনাইনে আর ফল হয় না, তখন মরিতে বাসে । দ্বিধিও প্রথমে জ্বরকে বড় আনন্দ দেন নাই । বিশেষ তাহার সংসারে তিনিই গৃহিণী ; তাহাকে দেখিবার—সতর্ক করিবার—শুশ্রূষা করিবার কেহ ছিলেন না । কায়েই ব্যাধি নিত্যস্বই নিরুপদ্রবে অনায়াসে বাড়িয়া গিয়াছিল । শেষে যখন রোগের সঙ্গে রোগী আর পারিয়া উঠিল না—যখন রোগ চাপিয়া রাখা অসম্ভব হইয়া পীড়াটল, তখন চিকিৎসার ব্যবস্থা হইল । কিন্তু চিকিৎসকগণ স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন, রোগ চিকিৎসার বাহিরে গিয়াছে কি না, সন্দেহ । তখন দ্বিধিকে স্বাস্থ্যকর স্থানে লইয়া যাওয়াই সঙ্গত মনে হইল । আমি সংবাদ পাইয়া দ্বিধিকে আনিতে চলিলাম । আমি যে স্থানে থাকি, সে স্থানটি স্বাস্থ্যকর—আর সেবা-শুশ্রূষার ভার আমিই লইতে পারিব ।

পরিচিত পথে অগ্রসর হইয়া চুণী পার হইয়া হাঁসখালির খেয়াঘাটে উঠিলাম । গাড়ী ভাড়া করিয়া ভারবাহীকে বলিলাম, “নবীন ঠাকুরের ঘরে চল—হাতে মুখে জল দিয়া কিছু জলযোগ করিয়া যাত্রা করিব ।”

ঠাকুর দাওয়ার বসিয়া ছিলেন । কিন্তু তাহার কি পরিবর্তন ! সেই সুগঠিত দেহ বেন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে—গৌর বর্ণ মলিন হইয়াছে—মুখে বেন মুহূর্ত নিবিড় ছায়া ! ঘরে সেই তক্তপোষে সতরকের উপর জাজিম পাতা আছে । কিন্তু ঘর অপরিষ্কার—জাজিম মলিন ।

আমি জল চাহিলে ব্রাহ্মণ জল আনিয়া দিলেন—খাবার চাহিলে খাবার আনিলেন ; কিন্তু সবই বেন কলে চালিত পুত্তলের মত । আজ আর তিনি

কাহাকেও খাবার আনিয়া দিতে বলিলেন না—কেহ সময়ে খাবার শুছাইয়া আনিব না। সমস্ত গৃহে—সকল কার্যে পরিচিত নিপুণ হস্তের স্পর্শের অভাবই অস্বস্তি হইতেছিল।

খাবার খাইতে খাইতে আমি ব্রাহ্মণকে বলিলাম, “আপনার শরীর ত বড়ই শীর্ণ দেখিতেছি।”

ব্রাহ্মণ বলিলেন, “এখন মরিলেই নিষ্কৃতি।” তাঁহার কথা বিস্ময়জনক।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “আপনার মেয়েটি কোথায়?”

“মেয়ে—” বলিয়াই ব্রাহ্মণ কাঁদিয়া ফেলিলেন।

আমি অপ্রস্তুত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, “কি অসুখ হইয়াছিল?”

ব্রাহ্মণ বলিলেন, “অসুখ! সে মরিলে আমার সাক্ষ্যের অবকাশ থাকিত। কিন্তু এ যে সাক্ষ্যের উপায় নাই!” তাহার পর তিনি বলিলেন, “কিন্তু দোষ আমার। আমি তাহাকে কেবল আমার দিয়াছি, শিক্ষা দিই নাই—সংবাদপত্র উপভোগ পড়িতে দিয়াছি, ব্রত-পূজা করিতে শিখাই নাই। দোষ আমার। আমি ত বিধবা কস্তার পিতার কর্তব্য পালন করি নাই।”

ক্রমে ব্রাহ্মণ আমাকে তাঁহার গৃহের কথা বলিলেন,—“সে আজ ছয় মাসের কথা। শীত কাল। শীতের বেলা শেষ হয় হয়, এমন সময় থেয়া পার হইয়া একজন যুবক হাস্থালিতে আসিল। কক্ষনগরে তখন গাড়ীর লাইসেন্স হইতেছে—অধিক গাড়ী বাহির হয় নাই। বাজারে জুইখানি মাত্র গাড়ী ছিল। যুবক তাহারই একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া ঘাইবার উদ্দেশ্যে করিতেছে, এমন সময় একজন ভদ্রলোক সপরিবারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আর গাড়ী নাই। তাঁহাকে বিপন্ন দেখিয়া যুবক গাড়ী হইতে নামিয়া ভদ্রলোকটিকে গাড়ী দিয়া আপনি হাস্থালিতে অপেক্ষা করিবে—প্রস্থ করিল। সন্ধ্যার মধ্যে আর গাড়ী আসিল না। যুবক আমার গৃহে অতিথি হইল। তাহার প্রকৃতির পরিচয় পাইলে কি আমি তাহাকে আশ্রয় দিতাম? তাহার বিনয়নম্র ব্যবহার, স্নিগ্ধ আলাপ—ছলনার সেই সব অস্ত্র আমার সন্দেহ বিনষ্ট করিয়াছিল। আপনাদের শিক্ষা বৌদ্ধিক ভদ্রতা—ছলনাই বিকশিত করে।

“প্রত্যাহ্বান যুবক বলিল, তাহার শরীর বড় অসুস্থ। সে পীড়ার ছলনা করিয়া ডাক্তার ডাকিতে বলিল। চিকিৎসা চলিতে লাগিল। আমি আর নির্মলা যথাসম্ভব তাহার সেবাশ্রদ্ধা করিতে লাগিলাম। কক্ষনগর হইতেও ডাক্তার আনিতে হইল। পক্ষকাল পরে সে সুস্থ হইল।”

“আমি বলিলাম, “তবে তাহার অস্থখ ছলনা নহে।”

ব্রাহ্মণ বলিলেন, “ছলনা নহে ? তবে সে ছলনার সিদ্ধবিদ্যা, তাই ডাক্তারকেও ছলিতে পারিয়াছিল। সে অস্থ হইয়া যাত্রার উদ্যোগ করিল। আমিও ভগবানকে ধন্যবাদ দিলাম। সে ত আর আমাদের মত হুখীর ঘরের কষ্টে অভ্যস্ত নহে—সে ঘরের ছেলে ঘরে কিরিলেই আমি নিশ্চিন্ত। সে প্রথমে কৃষ্ণনগরে বন্ধুর কাছে গেল—কিরিয়া কলিকাতায় যাইবে। যে দিন সে কিরিবার পরে আসিয়া উপস্থিত হইল, সে দিন কৃষ্ণনগরের আদালতে একটা মোকদ্দমার সাক্ষী বলিয়া আমার ডাক পড়িল। আমি সকালে কৃষ্ণনগরে গেলাম, অপরাহ্নে কিরিয়া আসিলাম—আসিয়া দেখিলাম—ঘরে কেহ নাই !

“ঘর শূন্য—হৃদয় শূন্য—ভগৎও শূন্য বোধ হইল। আমি সারা রাত্রি কাটিলাম। যখন রাত্রি পোহাইল, তখন আমার বৃকের বেদনা অসহনীয়, তখন কন্ডার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া আমার পিতৃহৃদয় ব্যাকুল ; তখন কৰুণায় আমার সব রাগ ভাসিয়া গিয়াছে। সে যে আমার মা-হারা মেয়ে—আমার সর্ব্ব ! যে গাড়ীতে সে কৃষ্ণনগরে গিয়াছিল, সেই গাড়ীর চালককে ধরিয়া আমি তাহার বন্ধুর সন্ধান পাইলাম ও বন্ধুর নিকট হইতে তাহার ঠিকানা সংগ্রহ করিয়া কলিকাতায় গমন করিলাম।

“কলিকাতায় সৌধারণ্যের মধ্যে অনেক খুঁজিয়া অপরিচিত আমি তাহার বাড়ী বাহির করিলাম। দ্বার মুক্তই ছিল ; আমি প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, সম্মুখের একটি কক্ষে সে বসিয়া পড়িতেছে। আমাকে দেখিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল, আমাকে প্রণাম করিল। কিন্তু আমি আর ছলনাও ভুলিলাম না, বলিলাম, ‘তুমি আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছ। আর ভক্তির ভাণে কাষ নাই।’ সে বলিল, ‘আপনি একটু স্থির হউন।’ আমি বলিলাম, ‘তুমি কি আমার স্থির হইবার উপায় রাখিয়াছ ? আমার সর্ব্ব্ব তুমি চুরি করিয়াছ।’ বলিতে বলিতে আমারও অজ্ঞাতে আমার ঘেহ উছলিয়া উঠিয়া আমার কঠোর ক্রোধ ভাসাইয়া লইয়াছিল ; আমি কাদিয়া ফেলিলাম ; বলিলাম, ‘দাছ। হইবার হইয়াছে, তুমি নির্ধলাকে কিরাইয়া দাও। আমি লোকনিন্দ্য়ার স্পর্শ হইতে দূরে—বৃন্দাবনে যাইয়া তাহাকে লইয়া বাস করিব।’ সে আমাকে বলিল, ‘আমি নির্ধলাকে বিবাহ করিব।’ আমার হৃদয়ে যেন অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল—বিবাহ ! বিধবার বিবাহ ! এখনও ছলনা !”

আমি বলিলাম, “কেন বিধবার কি বিবাহ হয় না ?”

ব্রাহ্মণ বলিলেন, “ওঃ! আপনাত্মা সকলেই সমান!”

আমি সে কথা আর না তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, “তাহার পর কি হইল?”

ব্রাহ্মণ বলিলেন, “তাহার পর আমি চলিয়া আসিতে উদ্যত হইলে সে বলিল, ‘নির্ম্মলার সঙ্গে দেখা করিবেন না?’—দেখা! আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ‘সে কি তোমাকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছে?’ সে উত্তর দিল, ‘হাঁ।’ আমি আর কোন কথা না বলিয়া সে স্থান ত্যাগ করিতেছি, এমন সময় সে বলিল, ‘আপনার হাগ পড়িলে আপনি সব বুঝিয়া অবশুই আনানিগকে ক্ষমা করিবেন—আনীর্কাদ করিবেন। আপনার বাহাতে কোনরূপ কষ্ট না হয়, সেই জন্ত এই করটি টাকা লউন।’ সে টেবলের টানা হইতে বাহির করিয়া এক তাড়া নোট আমার হাতে দিল। হার—কস্তুর কলঙ্কের অর্থ আমি লইব! আমি নোটগুলি ছুড়িয়া কেলিয়া রাজপথে বাহির হইলাম। উন্মাদের মত বহুকণ পথে পথে ঘুরিবার পর ক্ষুধায় পিপাসায় আমি যেন আবার বাস্তবশ্রোত্র্যে ফিরিয়া আসিলাম।

আমি এখন কেবল মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছি। আমার কেহ নাই—কিছুই নাই—কোন আশা নাই। তবু আমি বাচিয়া আছি। কিন্তু—কিন্তু যতই কেন চেষ্টা, করি না তাহাকে যে ভুলিতে পারি না; জাগ্রতে ও স্বপ্নে তাহার মুখ তবুও হৃদয়পটে ফুটিয়া উঠে।”

ব্রাহ্মণ কাদিতে লাগিলেন। আমারও নয়নপন্নব সিক্ত হইয়া উঠিল। হার রেহ! তোমাকে জয় করিতে পারে, মাহুঘের এমন শক্তি কোথায়?

৩

দশ বৎসর কৃষ্ণনগরে ঘাই নাই। দ্বিদিগে রোগমুক্ত করিবার জন্ত আমার কর্মস্থানে আনিয়াছিলাম, আর কিরিতা পাঠাইতে পারি নাই। সেই প্রবাসেই তিনি জীর্ণ দেহ রক্ষা করিয়াছিলেন। আমিও বিবাহ করিয়া সংসারে ও ব্যবসারে জড়াইয়া পড়িয়াছিলাম। আর কৃষ্ণনগরে বাওয়া হয় নাই। এবার ছোট ভাগিনেয়ের বিবাহ। ভাগিনীপতি বাইবার জন্ত পত্র লিখিয়াছিলেন, আমি সম্পর্ক তুলিয়া দিতে ও তুলিয়া বাইতে বসিয়াছি বলিয়া দৃংথ করিয়াছিলেন। তাই দীর্ঘ দশ বৎসর পরে দ্বিদিগ শোক বক্ষে লইয়া আবার কৃষ্ণনগরে পমন করিলাম।

এবার কলিকাতায় টেপে উঠিয়া কৃষ্ণনগরে নামিলাম।

ভাগিনেয়ের বিবাহ—বৌভাত সব শেষ হইয়া গেল। আমি ফিরিবার উদ্যোগ

করিলাম। কৃষ্ণনগরে আসিবার পথ হইতেই আমার হাসখানির সেই ব্রাহ্মণের কথা মনে পড়িতেছিল। আমি হাসখানীর পথে যাইব বলিলে ভাগিনেরগণ বলিলেন, সে পথ এখন পরিত্যক্ত, সে পথে যাওয়া হইতে পারে না। তাঁহাদের ভাব দেখিয়া বোধ হইল, তাঁহার। মাতুলের মস্তিষ্কের বিকার হইয়াছে কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ করিতেছিলেন। আমি সেই পরিচিত পথে যাইবার বিশেষ ইচ্ছা প্রকাশ করার শেষে স্থির হইল, আমি এক দিন গাড়ীতে হাসখানি দেখিয়া কৃষ্ণনগরে আসিয়া ট্রেনেই কলিকাতার যাইব।

তাহাই হইল। একদিন প্রাতে আমি গাড়ীতে আবার সেই পরিচিত পথে চলিলাম। সেই বৃক্ষচ্ছায়াচ্ছত পথ—কিন্তু পথে আর অধিক পথিক বা যান নাই—যেন পরিত্যক্ত মেষের পথ। দেখিতে দেখিতে কত পরিবর্তন হয় !

গাড়ী হাসখানিতে পৌছিল। বাজার ঐহীন। যে পথে লোকের গভ্যাত নাই সেই পথে বাজারের ঐ থাকিবে কিরূপে ? আমি সেই ব্রাহ্মণের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলাম। দুই জন দোকানদার কোন সংবাদ দিতে পারিল না। তাহার পর আমি এক জন বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলাম ; জানিলাম—দশ বৎসর পূর্বে একমাত্র কস্তার পিতৃগৃহত্যাগে ভয়দ্বয়ের বৃদ্ধ কোন তীর্থে চলিয়া পিয়াছিলেন। কোথায় গিয়াছেন কেহ জানে না। তাঁহার নিরুদ্দেশ যাত্রার দুই বৎসর পরে একখানি গাড়ীতে একজন যুবক একটি যুবতী ও একটি শিশুকে লইয়া হাসখানীতে আসিয়া তাঁহার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তাঁহার সংবাদ না পাইয়া যুবতী তাঁহার পরিত্যক্ত ভিটার বসিয়া বহুক্ষণ রোদন করিয়াছিলেন। তাহার পরে—তাঁহার। চলিয়া যাইবার 'কছু দিন পরে জেলাবোর্ডের এজিনিয়ার আসিয়া জমী দেখিয়া নাপিয়া যানেন। শেষে ভিটায় একটি মন্দির নির্মিত হয়। খেয়াঘাট বাধান হয়। সে নাকি সেই যুবকের অর্থে—আর নবীন ঠাকুরের নামে।

আমি অগ্রসর হইয়া বাটে চলিলাম—তথায় দেখিলাম, প্রস্তরকলকে ক্ষোদিত—নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে তদীয় কস্তা নির্মলা কর্তৃক এই বাট উৎসৃষ্ট হইল। মন্দিরে কেবল নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম ক্ষোদিত।

আমার মনে হইল, আমার পথপ্রদ সার্থক হইল। আমি হৃদয়ে পরম শান্তি অনুভব করিলাম। যেহে, ভক্তি, ভালবাসা, প্রেম এই সবই মানবের হৃদয়কে স্বর্গ করে—এই কথা ভাবিতে ভাবিতে আমি সেই পরিচিত ও পরিত্যক্ত পথে কৃষ্ণনগরে ফিরিলাম।

নাস্তিকের ধর্ম্মানুষ্ঠান।

“এজ্ঞর রেহে তাহার জনর-কলর পরিপূর্ণ ছিল। জীবনে একটি ছোট কুহুর ছাড়া আর কাহারও নিকট সে ভালবাসা পায় নাই। কুহুরটিও আমার কিছুদিন পূর্বে মরিয়া যাওয়ার সে নিত্যমু সঙ্গহীন হইয়া পড়িয়াছিল। সে বলিত, তাহার কুহুরটি যথার্থ শ্রীচরান ছিল। বার বৎসর ধরিয়া সে ক্রমাগত তাহার সহিত নির্জায় দিগকে, কিন্তু একবারও কোনরূপ গল বা চীৎকার করে নাই। নির্জায় গলন অর্থাৎ প্রকৃতি বাসায়র বাজান হইত, কুহুরটি তখন তাহার পার্শ্বে ঝিরভাবে মূখ বুজিয়া বসিয়া থাকিত—বেশিলে মনে হইত, সেও যেন নীরবে আর্থনা করিতেছে। নির্জায় পুরোহিতগণ কোনও মানবেতর জন্তর আশ্বাস কল্যাণার্থ অস্তোষ্টিক্রিয়ার তার গ্রহণ করিতে সম্মত হইতে পারেন কি না, মুর্জিয়াং আমাকে প্রোতই তাহা জিজ্ঞাসা করিত। এ যেন য়েহীলা ব্যক্তি আমার উপর তাহার সমস্ত রেহবর্ধন করিয়াছিল। বিশর পরশাগতের জ্ঞার সে আমাকে জনরে গ্রহণ করিয়াছিল। কর্কবোধী য়েগর ফনের প্রত্যাদী না হইয়া কর্ক করিয়াই আনন্ লাভ করেন, সে সেইরূপ শুধু আমার উপকার করিয়াই অপার আনন্ লাভ করিত। পরম রেহীলা জননী র জ্ঞার সে সর্কবাই আমার বাজেন্দা-বিধানের ব্যাপ্ত থাকিত। বাস্তবিক এরূপ চতুলজ্ঞা-কাতর মাংসর্যাহীন উপকারী এ কলিযুগে ব্রহ্মবৎ অলৌক বলিয়া মনে হয়। পশিমধ্যে সাক্ষাৎ হইলে সে আমার প্রতি কি অপার রেহবাজ্রক বৃষ্টই নিক্রিষ্ট করিত। সে বৃষ্টে তাহার অন্তরের মহত্ব কতই না কুটিয়া উঠিত! এরূপ সমস্ত ক্ষে জনতার থাকিলেও সে তারহীন মানুষের মত কজুতাবে ষীটিয়া বাইত। আমি যে হুহ-য়েহে উৎকৃষ্ট বসনে সজ্জিত হইয়া বেড়াইতেছি, ইহাতেই যেন তাহার কত আনন্। মুহু নাগরিকার প্রেম গোপিকার আধ্যাত্মিক অমুরাগে তপাত্তবিত হইলে য়েগর হয়, এ রেহও অনেকটা সেই একর। সে এককই আমার সমস্ত কাইকরদাস ষাটিত; আমাকে রাত্রিতে অধারনের জন্ত জাপাহিয়া দিত; আমার গৃহদার মার্জনা করিত ও আমার পড়িবার আলো পরিচার করিয়া দিত। সৌধীন ইংরাজ-কলনাগণও য়েগ হয়, এরূপ পরিচরতারপ্রিয় নহেন। সে একাধারে আমার শিতা ও কুতোর স্থান অধিকৃত করিয়াছিল। কাঠকাড়া হইতে আরম্ভ করিয়া গৃহদালীর সন্ধ্যার কর্ক সে একাই সম্পন্ন করিত। ইহাতে কিন্তু খাতাবিক মধ্যাদার কিছুমাত্র ব্যত্যয় ঘটিত না। য়েগ হয় সে মনে করিত, সে যে উৎক্রে এই পরিচর্যাতার গ্রহণ করিয়াছে, তাহাতে কোনক্রমেই হীনতা বর্জিতে পারে না। ব্যবহারিক শিক্ষার জন্ত সর্করূপ হাসপাতালে থাকিতে হইবে বলিয়া আমি যখন বাসাবাটী ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলাম, তখন মুর্জিয়াং আমাকে যে কিরূপ বিবরভাবে বিদায় দিয়াছিল, তাহা তোমার নিকট কি একরারে বর্ণনা করিব? আমার অমুগহরিত-কালে অর্ধসকর করিয়া সে যে আমার “তাকার” উপাধির জন্ত লিখিত মৌলিক গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থটির হাপার বরজা যোগাঠিতে সর্ক হইবে, ইহাতেই সে বাধ্য কিছু সাধনা লাভ করিয়াছিল। আমি ছুটি পাইলেই যে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিব, এ অঙ্গীকার না করাইয়া সে আমাকে ছাড়িয়া য়েগ নাই। আমার সাক্ষ্যে সে বাস্তবিকই দ্রাধ্য য়েগ করিত।

“তুমি যদি আমার সেই প্রথম প্রকাশিত প্রবন্ধটি উঠাইয়া দেখ, তাহা হইলে নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিবে যে, উহা আমি বুদ্ধিমানকেই উৎসর্গ করিয়াছিলাম । ইদম্পাতাল-দুখে ছাত্র-চিকিৎসক-রূপে অবস্থানের শেষ দুই বৎসর আমি যে টাকা উপার্জন করিয়াছিলাম, তাহাতে একখানি কলবহনের গাড়ী ও একটি ঘোড়া কিনিয়া দিয়া আমি বুদ্ধিমানের নিকট হইতে পুণীত সমস্ত অর্থ পরিশোধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম । তাহার লজ্জা নিজের উপার্জিত অর্থ ব্যয় করিয়াছি বলিয়া সে এক দিকে যেমন হাস্যবিস্মিত হইয়াছিল, অপর দিকে তেমনি তাহার বহু ঈর্ষিত গাড়ীখানি লাভ করার তাহার আনন্দের অবধি ছিল না । তাহার সেই দুঃশয় হর্ষ ও অসন্তোষ প্রকাশ—একবার আমার দিকে চাহিয়া অনুযোগ—“দেখ তোমার এ কাণটি ভাল হয় নাই, এ তোমার বড়ই অজ্ঞান”; আমার পরদৃষ্টিতেই আনন্দ্যস্ত্র যোচন করিতে করিতে গাড়ীখানির দিকে কিরিয়া অল্প প্রণাম—“বাঃ ! কি সুন্দর গাড়ী ! ঘোড়াটা যেন সোশোয়ালী জোয়ানের মত মজবুত”—সে কথা আমি কখনই ভুলিব না । বাস্তবিক এরূপ মর্ষণশীল দৃষ্ট বড়ই বিরল । তাহার সেই কথাগুলি এখনও যেন আমার কাণে বাজিতেছে । আমার পড়িবার ঘরে রূপা-বীথানে যে ভাস্কর্য্য অস্ত্রগুলি দেখিয়াছ, তাহা বুদ্ধিমান আমাকে জোর করিয়া কিনিয়া দিয়াছিল । বাস্তবিক নিবেদন করিলেও সে আমার কথার কর্ণপাত করে নাই । আমার বাহা কিছু আছে, তাহার মধ্যে আমি এই অস্ত্র কয়টিকেই সর্গাপেক্ষা মূল্যবান বলিয়া মনে করি । আমার পৌরবে পৌরবাসিত হইলেও আমি যে তাহার সাহায্যেই “মানুষ” হইয়াছি, এ কথা সে কাহারও নিকট ঘৃণাকরেও প্রকাশ করে নাই । অথচ সে যদি তখন এরূপ তাপসীকর করিয়া আমাকে সাহায্য না করিত, তাহা হইলে সামান্যিক উত্তীর্ণ হ্রের কথা, আমি নিশ্চয়ই অবশ্যে বৃত্ত্যুদ্যে পতিত হইতাম ।

“আমার লজ্জা সে তিলে তিলে আনন্দ করিয়া অকালে বৃত্ত্যুদ্যে পতিত হইয়াছিল । আমি কতি পান না করিলে রাজি জাগরণ করিয়া অগারন করিতে পারিব, না বলিয়া সে কত দিন শুণু রতন-বাধা জটা বাইয়াই প্রাণধারণ করিয়াছে । এইরূপ অর্দ্ধাশনে দিনপাত করিতে হইত বলিয়া সে কঠিন শ্রীড়াশ্রম হয় । আমি সাধারণতঃ জাগিয়া চিকিৎসা ও গুজ্জবা করিয়া প্রথমবার তাহাকে বাচাইয়াছিলাম বটে, কিন্তু দুই বৎসর পরে কালরোগ পুনরায় তাহাকে আক্রমণ করিল ।

“অল্প প্রয়োজ্য—অল্প চিকিৎসা সবেও আমি তাহাকে রক্ষা করিতে পারিলাম না । চিকিৎসা-বিজ্ঞানের কোন চিকিৎসা-প্রণালীই কার্য্যকরী হইল না—সকল উপায়ই সেবার নিষ্ফল হইয়া গেল । তাহার যেমন গুজ্জবা হইয়াছিল, সে রূপ ঘোড় হয়, কোন রাজার ভাগ্যেও ঘটে না । আমি তাহাকে বৃত্ত্যুদ্যে কল হইতে ছিনাইয়া লইবার লজ্জা যে সকল উন্নত চিকিৎসা-পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছিলাম, পাঠ্য চিকিৎসকগণের পূর্বে বোধ হয়, সে সকল কাণেও শুনে নাই ।”

এই সকল কথা বলিতে বলিতে বিচলিত হইয়া যেসময় কিছুক্ষণের লজ্জা নিবৃত্ত হইলেন ; তৎপরে হাস্যকলকর্তে বলিতে লাগিলেন, “বুদ্ধিমান—আমার আশ্রয়ভাষা পালক পিতা বুদ্ধিমান আমারই আবে প্রাণত্যাগ করে । সারা জীবন ব্যস্তিহাঙ্কর বৃত্তি অবলম্বন করিয়া

সে বাহা। কিছু সন্ধ্যা করিয়াছিল; সে সবই আমার নামে উইল করিয়া রাখিয়া যায়। উইলের তারিখ বেছিরা আমি বুঝিলাম, যে বৎসর আমার উত্তরে 'হুদ দে রোঁচা' পতীহ বানায় পদন করি, সেই বৎসরই সে এই চরম পত্রখানি আমার নামে প্রস্তুত করাইয়াছিল। তাহার ফলতঃ বর্ধবিবাহল প্রখ্যাত হঠাৎনের জ্ঞান ছিল। লোক বেতন ভীষত অনুব্রাহ্মণে বীর বর্ধগতীকে ভালবাসে, সেইজন্য জীবন্ত প্রেম সে বীর আরাধ্য দেবতার উপর প্রত্ন করিয়াছিল। স্বঃ নিষ্ঠাবান্ ক্যাপলিক হইলেও সে আমার নাস্তিকতার প্রত্ন কখনও আমাকে একটি কথাও বলে নাই। শুধু কোন বিপদে পড়িলে সে বাহাতে বাস্তবসম্মতদের সহায়তা হইতে বলিত না হয়, এই প্রত্ন সে আমাকে যথো যথো সাগ্রহ অনুব্রাহ্মণ করিত। নির্জ্ঞায় তাহার প্রত্ন বাহাতে প্রত্নই নিরুদিতপ্রণে বর্ধ-প্রোত্র পাঠ করা হয় আমি সেইজন্য ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাহার পরকালে কি বণা হইবে, এই ভাবনা। সে রাত্রিকালে বিনিম্ন অবস্থায় প্রায়ই আমার নিকট ব্যস্ত করিত। তাহার সর্বসাই মনে হইত, বর্ধজীবন বেতন পবিত্র ভাবে ধাপন করা উচিত, সে বুঝি তাহা করিয়া উঠিতে পারে নাই। আহা, বেচারাকে প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি পর্যন্ত পরিভ্রম করিতে হইত; সে যে কোনজন পাণ চিত্তা করিবে, তাহার সে অবদর কোথায়? যদি স্বর্গ বলিয়া কিছু থাকে, তাহা হইলে একজন ব্যক্তি ছাড়া আর কে স্বর্গের অবিকারী হইতে পারে? প্রকৃত সাধু পুরুষের জ্ঞান বুঝিরাং সত্ত্ব বর্ধগতঃ-ভুলিই অকপটচিত্তে গ্রহণ করিয়াছিল। তাহার মৃত্যুও তাহার পবিত্র জীবনেরই অঙ্গুলপ হইয়াছিল।

"আমরা বর্ধায় শুভানুধ্যায়ীর শবের অনুগমন করিতে আমি ছাড়া আর কেহই ছিল না। তাহার সমাধিক্ষেত্র হইতে কিরিয়া আসিয়া আমি ভাবিতে লাগিলাম, বুঝিরাংকেও প্রমত্তের মত হারাষ্ট্রালাম; এখন তাহার শেষ বণ কিরূপে পরিশোধ করি? তাহার বন্ধু নাই—বান্ধব নাই—স্রী-পুত্র কস্তা-পরিজন কেহই নাই। আমি ক্রিয়াকাওহীন নাস্তিক বটে; কিন্তু তাহার ত গুণবন্তজির অভাব ছিল না। সেই অটল বর্ধবিবাহের ভিত্তিসম্বন্ধে বিচার করিবার আমার কি অবিকার আছে?

"বুঝিরাং প্রত্নতঃ সন্ধ্যাক্তে প্রীতির শাস্ত্রানুধ্যায়ী পারলৌকিক ক্রিয়াবিধির একবার যাত্র আমার সহিত আলোচনা করিয়াছিল। কিন্তু পাছে আমি মনে করি, সে তাহার উপকারের প্রতিদান চাহিতেছে, এই ভয়ে সে এ সম্বন্ধে মৃত্যুকালে কোনজন নির্দেশ প্রাপন করে নাই। তাহার মৃত্যুর পর আমি বহু সময় সত্ত্ব অবস্থক অর্থানি সংগ্রহ করিয়া সেট লিঙ্গ নির্জ্ঞায় এই ঐশ্বর্যাসিক অনুষ্ঠানটির ব্যবস্থা করিয়াছি। ইহা চিরস্থায়ী ভাবে প্রতিষ্ঠিত, স্তত্রাঃ আমার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই যে ইহা লোপ পাইবে, প্রত্ন সম্ভাবনা নাই। বল দেখি, তাহার সেই প্রবল বর্ধজীব-প্রণোদিত আন্তরিক ইচ্ছার অনুকূলে কায্য করা অপেক্ষা তাহার মৃত্যুর ঐতিহ্যসম্পাদনের আর কি প্রকৃষ্টতর উপায় আছে? এই প্রত্নই ঐশ্বর্যানি মৃত্যুর প্রায়ন্তে বধন এই অস্ত্রোষ্ট্রক্রিয়ামূলক প্রোত্রাদি পাঠ করা ইহা থাকে, তখন আমি স্বঃ নির্জ্ঞায় উপস্থিত থাকিরা—আবস্ত্রা ক্রিয়াগুলি তাহার উদ্দেশ্যে যথারীতি সম্পাদন করিয়া থাকি। আমি অবিশ্বাসীর সরল বিশ্বাসের সহিত বলিরা 'থাকি,—'যে ভগব, তোমার যদি অবিশ্বাস্

যাকে, তুমি এ জগতে বাহ্যিক পবিত্র ভাবে জীবন বহন করিয়াছে, তাহাদের নিষ্কলক আত্মার জন্ত যদি কোনও বিশেষ ক্রানের ব্যবস্থা করিয়া থাক, তাহা হইলে একবার সুক্ষ্মচাতুর্যের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিও । কৃত কণ্ঠের জন্ত সুক্ষ্মচাতুর্যের যদি পরলোকে কোনও চুঃখ ভোগ করিতে হয়, তাহা হইলে সে শাস্তি আত্মার জন্ত রাখিয়া স্বর্গপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ যে স্থানকে স্বর্গ বলিয়া উল্লেখ করে, সেই স্থানেই উহাকে আশ্রয় দাও ।’

“বহু হে! আত্মার জ্ঞাত মস্তাবলম্বী ব্যক্তির ইহার অধিক আর কি করা সম্ভব? ভগবান্ বোধ হয়, নিভান্ত মন্দ নহেন । তিনি যে ইহাতে আত্মার উপর বিরক্ত হইবেন, ইহা আমি মনে করি না । আত্মার সমস্ত ঐশ্বর্য দিয়াও যদি সুক্ষ্মচাতুর্যের জ্ঞাত সরল ও অকপট বিশ্বাস লাভ করিতে পারি, তাহাতেও আমি পশ্চাৎপদ নহি ।”

বিদ্যানন্দ ডাক্তার দেসদেঞ্জের অগ্নিসমকালে তাঁহার নব্যশাস্ত্রার্থে উপস্থিত ছিলেন । তাঁহার শুধুবেশ যে দুহ্মকালেও ঐশ্বর্য আত্মস্থাপন করিতে পারেন নাই, এ কথা তিনি আর বলিতে প্রস্তুত নহেন । কৃপাসিদ্ধির অপার কল্পণায় বাহ্যিক সজ্জাধনে অধিকারী, তাঁহারা অনেকেই বিশ্বাস করেন যে, যে অস্ত্রায়ত্তমগনবাদী বিবাহীন ব্যাবিবাহক এ জগতে দেসদেঞ্জকে যশোমন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়া তাঁহাকে স্বদেশ ও পলাতনের কৃতজ্ঞতাভাজন করিয়াছিল, পরপারে অমহার স্বর্গদ্বার উন্মোচিত করিয়া সে-ই তাঁহাকে অত্যাধীন করিয়া লইবে ।

শ্রীগুরুদাস সরকার ।

বিনাশক ।

(ইংরাজী অবলম্বনে)

জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, কত না বতনে, কত সাবধানে, আলা, সে

হিংসার বিবে দিচ্ছ কালের সায়কে রোখিয়াছিল গো!—

জগায় দত্তে রেখেছিল দুঃরে; পেবে অন্তর-আবাসে

পশি' বল রিপু, এক দিনে তা'রে বৃদ্ধা করিয়া দিল, গো!

শ্রী বিভূতিভূষণ মজুমদার ।

সমালোচনা।

পর্ণপুট।*

‘গৃহস্থ’ পত্র কিছুদিন পূর্বে বর্তমান কালের বাঙ্গালা কবিতার গতির প্রতি লক্ষ্য করিয়া আক্ষেপ করিয়াছিলেন। আক্ষেপের প্রধান কারণ—বাঙ্গালা সাহিত্যে অন্তঃসারশূন্য শব্দবহুল কবিতার প্রাচুর্য এবং বস্তুতন্ত্র-প্রকৃত কবিতার অভাব। এই অভিযোগের মূলে সত্য আছে। বাঙ্গালা দেশে গীতি-কবিতার নামে এমন অনেক জিনিষ চলিয়া যাইতেছে, যাহাকে কবিতা নামে কিছুতেই গণ্য করা উচিত নহে; সাহিত্যে তাহা কোন কালেই স্থায়িত্ব লাভ করিবে না।

নাটক ও মহাকাব্য হইতে গীতিকবিতার ইহাই প্রধান পার্থক্য যে, গীতি-কবিতার মধ্যে স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিত্বের স্থান যে পরিমাণে আছে, নাটকে ও মহাকাব্যে সে পরিমাণে নাই। নাটককার এবং মহাকাব্যলেখক আপনাকে যথাসম্ভব প্রচ্ছন্ন রাখেন, কতিং আপনাদের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ও সম্পূর্ণ আশ্রয়ের ভাবকে লেখকের সম্মুখে উপস্থিত করেন। তাঁহাদের অহুত্ব ও ভাব পরোক্ষভাবে লিখিত বিষয়গুলিকে রঞ্জিত করে। কিন্তু যিনি গীতিকবি, তিনি তাঁহার কবিতার মধ্যে আপনাকে প্রকাশিত করিবার প্রচুর অবসর পানেন। অবস্থা ও ঘটনার বিশেষত্বের মধ্য দিয়া আপনায় চিত্তা ও ভাবকে হৃদয়ের নিপুণভাবে পরিষ্কৃত করিয়া তুলাই তাঁহার প্রধান কাৰ্য। বাহ্য ও অন্তর্ভূতের মধ্যে প্রতি মুহূর্তে যে আকর্ষণ ও সংঘাত চলিতেছে—প্রকৃতির সহিত মানুষ্যের যে চিরন্তন ঘনিষ্ঠ সংঘর্ষ, সমাজের সহিত ব্যক্তির যে ভাবের আদান-প্রদান, আদর্শের জন্ত বাস্তবের যে সনাতন আকুলতা—তাঁহারই এক একটি অবস্থাকে খণ্ড-কবিতাকার আপনায় অহুত্ব ও চিত্তার মধ্য দিয়া প্রকাশিত করেন।

কিন্তু ঠিক এই কারণেই গীতি-কবিতার মধ্যে আশ্রয়ের স্থান যথেষ্ট পরিমাণে থাকিলেও শ্রেষ্ঠ গীতিকবিতা নিরবচ্ছিন্ন আশ্রয়ের (Subjectivity) উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। কবিতা যে স্থলে সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিত্বের গভীর মধ্যে ঘুরিয়া বেড়ায়, কবির ভাব ও চিত্তা সে স্থানে সম্পূর্ণভাবেই তাঁহার নিজেকে লইয়া বাস্তব থাকে, মানুষ্যের সহিত মানুষ্যের যে হৃদয়ের গভীর ঐক্য, যাহা Subconsciously মানুষ্যের সমস্ত ব্যবহারের উপর প্রভাব বিস্তৃত করে, সেই ঐক্যকে যখন কবিতা ধরিতে অক্ষম হয়, তখন তাহা সাহিত্য-জগতে অতি অল্পদিনই স্থায়িত্ব লাভ করে। সেক-

* পর্ণপুট ঈশ্বরানন্দ রায় এম্বিট; কলিকাতা, ২০১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট হইতে ঈশ্বরানন্দ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। দ্বিতীয় ভাগ।

শ্রীরের সুবিখ্যাত সমালোচক রালে সত্যই বলিয়াছেন,—গীতি-কবিতা আমিত্ত্ব অথবা ব্যক্তিগত ভাব ও অহুত্বের মধ্য দিয়া সার্বজনীন সত্যকে বিকশিত করে । যাহা কবির নিজস্ব ছিল, যে চিন্তা ও ভাব প্রথমতঃ কবি-হৃদয়েরই বিশেষ অবস্থা হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল, তাহাকে কবি যখন Idealise ও Universalise করিয়া সেখান, তখন তাহার সহিত আমাদের প্রত্যেকের হৃদয় সহানুভূতি করিয়া উঠে—তখন সেই ছন্দে মানুষের প্রত্যেকের মন-বীণাই বাজিয়া পাকে ।

গীতিকবিতা যখন এই সার্বজনীনতা হইতে ভ্রষ্ট হয়, যখন তাহা সম্পূর্ণভাবেই আত্মকেন্দ্রাভিমুখী হইয়া পড়ে, তখন তাহা শিল্প হিসাবে সুন্দর হইলেও বিশ্ব-মানবের ইতিহাসে নিম্ন স্থান অধিকৃত করে । সত্য, শিব অথবা সুন্দরকে আপনার ভাবের মধ্যে ধরিতে না পারিয়া তাহা হয় উগ্র আত্মগম্বী হইয়া যায়, নতুবা সম্পূর্ণ কিছুত-কিনাকার হইয়া পড়ে ; তখন হয় তাহা আপনার সুখ-দুঃখকে অতিশয় বৃহৎ করিয়া দেখিয়া চকল হইয়া পড়ে, না হয় পরী ও ইন্দ্রধনুর রাস্যে আপনাকে লইয়া গিয়া নোহের স্বপ্নকাল রচনা করে । তাহা হয় তখন ভাষা ও ছন্দের আবরণের মধ্যে আপনার ভাবদৈন্তকে গোপন করিতে চেষ্টা করে, না হয় স্বাতন্ত্র্যের নামে বেজ্ঞাচারী হইয়া উঠে ।

বাল্লা কাব্য-সাহিত্যে কিছুদিন হইতে এই জাতীয় গীতি-কবিতার যে প্রাচুর্য দেখা গিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই । স্বাতন্ত্র্যের মোহাই দিয়া বেজ্ঞাচার ও তারল্যকে বর্তমান কালের অনেক কবিই এক্রপভাবে প্রভ্রম দিতেছেন যে, দ্বারী সাহিত্য-সৃষ্টি অতিশয় বিরল হইয়া উঠিয়াছে । ইহাদের অধিকাংশেরই আদর্শ বর্তমান কালের কোন ইংরাজ অথবা ফরাসী কবি । Fancy ও imaginationএর মধ্যে যে প্রভেদ, তাহা ভুলিয়া গিয়া fancyকেই এই সকল কবি উচ্চ স্থান প্রদান করিয়া গীতি-কবিতার প্রকৃত যে আদর্শ—কৃত্র ঘটনার মধ্য দিয়া একটি আদর্শকে সূটাইয়া তুলি অথবা একটি ব্যক্তিগত অহুত্বের মধ্য দিয়া একটি সার্বজনীন ভাবকে বিকশিত করা—তাহাকে বিস্মৃত হইয়াছেন ।

এই সময় কবি শ্রীবৃদ্ধ কালিদাস রায়ের নবপ্রকাশিত ‘পূর্ণপুট’ নামক একখানি গীতি-কবিতার পুস্তক পড়িয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি ।

কালিদাস বাবুর পুস্তকখানি ক্ষুদ্র হইলেও টাহাতে উপভোগ্য উপাদান যথেষ্ট পরিমাণে বর্তমান । কবির—বিশেষতঃ গীতিকবিতা-লেখকের যে বিশেষত্বের কথা আমরা উল্লেখ করিয়াছি, কালিদাস বাবুর রচনায় তাহা বিশেষভাবে দেখিতে পাওয়া যায় ।

তিনি বাহা দেখিয়াছেন, তাহাকেই ব্ৰহ্ম করিয়া দেশ-কালের গভীর বহির্ভূত করিয়া দেখিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই স্থানেই তাঁহার কৃত্তিব—এই স্থানেই তাঁহার বৈশিষ্ট্য। প্রাকৃত জনের সহিত কবির দৃষ্টির ইহাই প্রভেদ যে, প্রাকৃত জনের দেখা যখন শেষ হইয়া যায়—কবির দৃষ্টি তখনই আরম্ভ হয়; প্রাকৃত জন বাহাকে সসীম বলিয়া “পড়া পুণি সন” কেসিয়া দেয়, কবি তাহারই মধ্যে অসীমবের আভাস পান এবং তাহাকেই আপনার ছন্দ ও শিরনৈপুণ্যের সাহায্যে মাহুকের সম্মুখে প্রকাশিত করেন। এই গভীর অন্তর্দৃষ্টি—কৃত্তের মধ্যে ব্ৰহ্মকে দেখিবার ও দেখাইবার এই শক্তি আলোচ্য কবিতা-গ্রন্থখানির অনেক কবিতাতে পরিদৃষ্ট হইয়াছে। অথচ ইহাদের অধিকাংশ কবিতাই আবার শির হিসাবে অতি উচ্চশ্রেণীর। এই জন্তই এই সকল কবিতা পাঠকের মনকে বৃগপৎ প্রকুর এবং উন্নত করে। কেবলমাত্র শ্রবণের উপরেই মাহাজাল বিস্তার না করিয়া, কেবলমাত্র কল্পনাতেই ব্রত্ন করিয়া না তুলিয়া ইহার। হৃদয়ের উপরে প্রভাব বিকৃত করে।

“বিশ্ব ও বিশ্বনাথ” কবিতার কবি বিশ্বকে বিশ্বনাথরূপে দর্শন করিতেছেন। দর্শন হয় ত বিশ্বকে জড় পদার্থ বলিয়া অবজ্ঞা করিবে, যিনি Mystic, তিনি হয় ত ইহাকে শূন্য মায়া বলিয়া উড়াইয়া দিবেন; কিন্তু যিনি কবি, তিনি সৌন্দর্যের উপাসক—তিনি তাঁহার ধ্যাননেত্রে যখন ইহার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তখন ত ইহাকে তুচ্ছ করিতে পারেন না। এই নরী-গরি-বনের গভীর সৌন্দর্য্যপূর্ণ, এই মেঘ-বস্ত্র-বস্ত্রার লীলা-নিকেতন, এই শতশ্রাবণ, কুহন-সুরভিময় এই সারস-চন্দ্রিকার রক্ত-জ্যোৎস্না-সুত্র, এই অগণিত প্রাণীর আশ্রয়দাতা, চিরপুরাতন অথচ চিরনূতন বিশ্বসংসারকে কবি ত কখনও নিষ্কর্ষ বলিয়া সম্বোধন হইবেন না। তাঁহার নিকট ইহা মিথ্যা নহে—ইহা অথও বিরাট সত্য। সৌন্দর্য্য ও গাভীর্ঘ্যে আশ্রয় হইয়া আমাদের কবিও তাই বলিয়াছেন,—

“তুমি ত জড় বিশ্ব নহ—তুমি যে নিজে বিশ্বনাথ।

পাগল ভোলা ! এ কি এ খেলা, দৃষ্ট হেরি দিবসরাত !”

কবি এই বিশ্ববৈচিত্র্যের মধ্যে আপনাকে স্থাপিত করিয়া যখন চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, তখন তিনি বিস্মিত হইলেন। তিনি দেখিলেন, ইহার মধ্যে কেবল সত্যের মধুর মৃষ্টিই বিকশিত হয় নাই; সত্যের রক্তরূপও ইহার মধ্যে তুল্যরূপে প্রকটিত। তাই শান্ত্র বাহাকে শিব ও সংহার উভয়েরই দেবতা বলিয়াছেন, যিনি একই কালে মঙ্গলকে বিশ্বমাঝে বিলাইয়া অমঙ্গলের গরল নিজে গ্রহণ করিয়াছেন, আবার প্রলয়কালে আপনার রক্তমৃষ্টিতে আবির্ভূত হইয়া

বিশ্বকে বিনষ্ট করিতেছেন, যিনি একই কালে অন্নপূর্ণাকে লইয়া বিধে অন্নদান করিতেছেন এবং পিণ্ড্যকের রবে ত্রিভুবন কাপাইয়া তুলিতেছেন, সেই বিশ্বনাথ শিব বলিয়া কবি ইহাকে সম্বোধন করিলেন । তিনি তাই—

“জ্যোত্স্নাজ্যোতিঃ তারার ভাতি বিকৃতি উড়ে তোমার গায় ।”

অথবা—“তোমার পাশে গৌরী হাসে বিস্তরি যবে অন্ন-জল ।

শস্ত শিরে আঁচল উড়ে চরণে ফুটে কমল-দল ।

বলিয়াই নিবৃত্ত হইলেন নাই । তিনি বলিয়াছেন,—

“পিণ্ড্যক ভব অশনিরবে কাপায় তুলে ভুবন তিন ।

কানন ভেদি বাজিছে শিলা ঝঞ্জনিলে রজনী দিন ॥”

প্রকৃতি অথবা বাহুল্যগৎকেই দেবতা বলিয়া পূজা করিবার ভাব ইংরাজ কবি জুইনবার্ণ বিকশিত করিয়াছেন । কিন্তু তাঁহার কবিতার প্রবৃত্তির উদ্বেজনা— ভোগহুখপ্রীতির কথা অনেক সময় একটু বেশী মাত্রায় প্রকাশিত হইয়া পড়ে । আমাদের কবি বিশ্বকে যে বিশ্বনাথ বলিয়াছেন, তাহার কারণ, তাঁহার ভোগহুখ-প্রীতি নহে । কেন না, তিনি কমলীয়তা ও মাধুর্যের দিক্‌ও যেমন দেখিয়াছেন, কঠোরতার দিক্‌ও সেই ভাবে দেখিয়াছেন ।

কিরিচ্ছ গলে হাড়ের মালা করোটি করে শ্মশান-মাথ

শুন্নে মেঘপক্ষ মাথা বুঝত তব ভৃথরাজ ।

তৃতীয় আঁখি লম্বাটে থাকি দীপ্ত ভাষ কুশাছন্ন,

পঞ্চশরে ষড়ুপতির করিয়া তুলে ভ্রমচর ॥

যিনি প্রকৃতির এই চিত্র দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন, তিনি নিরবচ্ছিন্ন পার্থিব সৌন্দর্য্যোপাসক জড়বাদী নহেন ।

“দুর্য্যাসার” মধ্যে কবি সত্যের ত্রুটুমুষ্টি দর্শন করিয়াছেন । দুর্য্যাসাকে কবি “বিধাতার শাপনদণ্ড” বলিয়া ওয়ার্ডসওয়ার্থের ভাব প্রকাশিত করিয়াছেন । দুর্য্যাসা সাধারণতঃ অতিশয় উগ্র কোপনস্বভাব ঋষি বলিয়া পরিচিত । কিন্তু তাঁহার রোষ যে অসত্য ও মোহের বিরুদ্ধে, তাঁহার ত্রুটুটি যে অলস ও বিলাসী কর্তব্যব্রতের উপর—কবি সে কথা এত স্পষ্টরূপে বাক্য করিয়াছেন যে, দুর্য্যাসা আমাদের নিকট অতি নবীনভাবে প্রকাশিত হইলেন । ইহাকে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা বলিলে অত্যন্ত ভুল করা হইবে । ইহা কবির ঘটনাবিশেষের মধ্য দিয়া সার্বজনীন সত্যকে পরিষ্কৃত করিয়া তুলিবার অপূর্ণ কৌশল । দুর্য্যাসার মধ্য দিয়া কবি সমস্ত বিশ্বব্যাপারকে যাহা বিধান ও শৃঙ্খলার পথে রাখিয়াছে,

সেই সত্যকেই বাস্তব করিয়াছেন। সে সত্য ত মধুরমুষ্টি নহে—তাহা ত মানুষকে ভোগের মনো আশ্বাসহারা হইতে দেয় না, তাহা ত মানুষকে প্রেমের নোহে অথবা যৌবনের স্বপ্নে বিভোর হইলে কমা করে না, তাহা মানুষকে অন্ধ—মূঢ় আনন্দের পথ হইতে বেদনার কশাঘাত করিয়া কিরাইয়া লইয়া আইসে—তাহা যে চিরদিন ধরিয়াই আপনার উগ্র মুষ্টি ও ক্রূর তেজ লইয়া আসিয়া কর্তব্যানুষ্ঠে মানুষকে অভিশপ্ত করিতেছে। আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক অথবা আধিভৌতিক শাস্তিরূপে কখন যে সে মানুষের সমক্ষে উপস্থিত হইবে, তাহার ত কিছুমাত্র হিরতা নাই। অতএব হে ক্রূর চরুলাচেতা মানুষ! সতর্ক থাক—সর্বদা কর্তব্য-পালন কর।

“সত্য” কবিতাটিতে কবি প্রজ্ঞাপনের উপাখ্যানের যাহা মূল কথা, তাহা অতি সূক্ষ্মরূপে বলিয়াছেন। যাহা সত্য, তাহা যে চিরদিনই সমস্ত বেদনা ও বিপ্লব সহিয়াও অটল ও আশ্বসনমাহিত থাকে, কবি তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন। “রূপ ও ধূপে” সত্যের জন্ত সাধকের যে কঠোর সাধনা, আদর্শের জন্য বাস্তবের যে সনাতন আঘবলিদান, তাহাই কুটিয়া উঠিয়াছে।

ঈশ্বরের মধ্য দিয়া কবি সুনীতি ও সূক্ষ্মচির শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ের মধ্যে যে সনাতন বিরোধ, তাহাকেই প্রকাশ করিয়াছেন এবং মানুষ যখন শ্রেয়ঃকে পরিত্যাগ করিয়া প্রেয়ের প্রতি দাবিত হয় তখন যে সে ঈশ্বর সত্যকে হারাইয়া ফেলে এবং আপনার জীবনের লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হয়, তাহাই শুনাইয়াছেন।

“মধুরার মূর্তে” কবির ক্ষুদ্রের মধ্যে সত্যকে দেখিবার অন্তর্মুষ্টি সূক্ষ্মরূপে কুটিয়া উঠিয়াছে। মানুষ যখন প্রেমের স্বপ্নরাজ্যে জ্যোৎস্বা ও কুহন-স্বপ্নের মধ্যে প্রিয়তমাকে লইয়া বিচরণ করে এবং সংসারের সমস্ত সৌন্দর্য আহরণ করিয়া আপনাদের নীড় নিৰ্মাণ করিয়া মূঢ়চিত্তে জীবন বাপন করিতে চাহে—জ্ঞোগ ও প্রেমের সেই বৃক্ষাবনে তখন মাঝে মাঝে বাহিরের কক্ষজগৎ হইতে তাহার জন্ত আহ্বান আইসে। সে আহ্বান নীড়িতের কল্প আশ্রিতাদেশ, অভ্যাচারিতের স্বপ্নরূপ ক্রন্দনের; সত্যের সহিত মিথ্যার যে অবিভাঙ্গ্য সংগ্রাম চলিয়াছে, তাহারই মধ্যে সত্যের পক্ষ লইয়া প্রবেশ করিবার জন্ত সে আহ্বান। যখন সে আহ্বান প্রবণে প্রবেশ করে, তখন সংসারে অন্তত ততকে পরাকৃত করিতে উদ্বৃত্ত হইয়াছে। তখন—

“পিতামাতা কাদে পাষাণবকে

নাহিক নিভ্রা প্রজ্ঞার চক্ষে

ডাকে পুণ্যের পরামর্শ মানি,
নিরীহের আঁধি লোর ।”

তাই সে আহ্বান তুচ্ছ করিবার নহে । যিনি প্রকৃত মানুষ প্রকৃত কর্মী, তিনি ও এই সত্যের বিগাণ-বান্দনে, ধর্মের এই পাকজন্তু-নির্নামে স্থির থাকিতে পারেন না । মধুরাকে বিদ্বত হইয়া চিরদিন মানুষ বৃন্দাবনে থাকিতে পারে না । তাহার অন্তরের অন্তরে যুগ-যুগান্তর ধরিয়াই ভোগের মধ্যে আত্মবিস্কৃত হইয়া থাকিবার বিরুদ্ধে একটি আহ্বান বাজিতেছে । তাই যখন এই সম্মীত গম্ভীর ও উচ্চ হইয়া উঠে, কর্তব্য যখন তাহাকে কর্তব্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার জন্ত আপনায় দূত দ্বারা আহ্বান করিয়া পাঠায়, তখন সে আর স্থির থাকিতে পারে না । সে দিন তাহাকে বলিতেই হইবে,—

“বিদায় চন্দ্রাননে !

এসেছে আভিকে মধুরার দূত আনার বৃন্দাবনে ।

সাম্রাজ্যিকে বাশরীর গান প্রেম-অভিনয় চল অবদান

কত অভিসার মান অভিনান উজ্জল রসবেগ ।”

সে দিন কর্তব্যের আহ্বানের নিকট তাহার সমস্ত লুপ্ত-স্বর্গকেই বলিদান করিতে হয় ।

কবি ভারতবর্ষের প্রাচীন কাহিনী অবলম্বন করিয়া এইরূপে তাহার মধ্যে আপনায় কবিত্ব ও অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে সত্যকে প্রতিভাত করিয়া তুলিয়াছেন ।

“বিরহ-তপের শেষে” কবিতাটিতে কবি হর-পার্বতীর প্রাচীন উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া এক সনাতন সত্য ফুটাইয়া তুলিয়াছেন । রূপের মোহ বতদিন বর্তমান থাকে, যৌবন-মূলভ ভোগ-পিপাসার বতদিন নিবৃত্তি না হয়, বিরহের অশ্রুধারে বিধৌত হইয়া জন্মের বতদিন নিশ্চলতর না হয়, ততদিন পর্যন্ত বাহ্যিক প্রেমাস্পদকে মানুষ সত্যভাবে পাইতে পারে না । এই জন্তই বিরহে প্রকৃত প্রেমের বিকাশ হইয়া থাকে । কবি এই সত্যটি এই ক্ষুদ্র কবিতার স্বকোশলে ও স্নানধূর ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন । বিরহকে কবি তপস্তা বলিয়া বিরহের স্বরূপ অতি সূক্ষ্মরূপে প্রকাশিত হইয়াছে । প্রিয়তমের জন্ত জন্মের কতখানি ব্যাকুলতা, প্রেমের কতটুকু সত্য এবং কতটুকু অসত্য, তাহারই পরীক্ষা বিরহের দ্বারা হইয়া থাকে । তাই বিরহের অবদানে তপস্যায় অন্তে প্রিয়তমের মূর্তি যখন-মানস নরনে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, তখন প্রেমিক তাহারকে সমস্ত অস্তঃকরণের সহিত আহ্বান করিয়া ধন্ত হয় । কবি এই কথায় তাহার “স্বর্গমণি” কবিতার বলিয়াছেন ।

পিতৃল রোক্ততপ্ত অলস মধ্যাহ্নের স্বচ্ছতার মধ্যে হৃদয়মণির সে তেজোমীপ্ত ডাঙর মৃষ্টি আপনাকে অতি প্রবলভাবে প্রকাশিত করে। তাহার চতুঃপার্শ্বের অবসাদ ও অলসতা হইতে সে যেন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তাহার সহিত যেন বিশ্বের অস্ত্র কাহারও সঙ্গতি নাই। কবি বলিয়াছেন,—

“ইওনিক হারা সকলের মাঝে গতাঃগতিক নও,
তেজোবৈভব স্বাধীন সত্তা গৌরবে বৃকে বও।”

কিন্তু এই “তেজোবৈভব” স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে কবি যখন অন্তর্দৃষ্টি করিলেন, তখন ইহা নানা ভাবে নানা উদ্বেগ লষ্টয়া তাহার নগ্ননে প্রতিভাত হইল। কবি দেখিলেন, বিরহের ব্যাকুলতা ও একাগ্রতা ‘তাপসীমূর্ত্তিতে ইহার মধ্যে প্রকাশিত।

“কুস্ত্র তাপসী সাজে

তুমি ফুটিয়াছ রক্তবসনা রোদ্ভের তেজোমাঝে।”

কিন্তু হৃদয়মণির এই তপস্বী গুধু যে প্রিয়তমকে পাইবার জন্য, তাহা নহে,— প্রিয়তম যখন আহ্বান করিবেন, তখন তাহার সেই প্রাণীপুত্র প্রচণ্ড প্রভাবের নিকট আপনাকে স্তির রাখিবে বলিয়া

“তাপোবল বিনা তার

কাহ্নর সাহস তপনের প্রেম-চূষন-কামনা?”

কিন্তু কবি হৃদয়মণিকে কেবলমাত্র প্রেমিকা তপস্বিনীবেশে দেখিয়াই সন্তুষ্ট হইবেন নাই। তিনি ইহাকে “বিশ্বতাপন” তপনের উপাসনার পরম্পর অর্থা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন; ইহাকে কঠোর ও কষ্টের সাধনার মূর্ত্তি বলিয়াছেন। গুধু তাহাই নহে—হৃদয়মণির মধ্যে কবি দেখিয়াছেন,—

“যবে সব ভূমাহারা

ধরণী-সতীর সধবাচিহ্ন তুমিই সিঁহর ধারা।”

এই শ্রেণীর কবিতার মধ্যে “সর্বভ্যাগী বিশ্বরাজ” ও “কালোন্নপ” নামক আর দুইটি কবিতার আমরা উল্লেখ করিব। প্রথমোক্তটিতে কবি সম্পদের মধ্যে যে একটি বৈরাগ্যের ভাব লুপ্তায়িত আছে, ভোগের তীব্র আনন্দের মধ্যে যে একটি অবসাদ ও প্রতিকূল ভাব বর্তমান থাকে, তাহার কবিজন-স্বলভ ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

“কালোন্নপ” কবিতার কবি যে বিশ্বের অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সত্যের শিব ও সূক্ষ্মর মূর্ত্তি দেখিয়াছেন, আমরা তাহারই পরিচয় প্রাপ্ত হই। সৌন্দর্য্য যে বাহ্যরূপে নহে, সৌন্দর্য্য যে দেহজ নহে, শুণজ; কবি তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন।

যাহা কিছু কাল, তাহাই যে প্রকৃতপক্ষে কাল নহে, ইহাই তাঁহার কথা । সৌন্দর্য্যের যিনি প্রকৃত উপাসক, সত্যের যিনি অকৃত্রিম ভক্ত, সৌন্দর্য্য ও সত্যের ভাবের মূর্ত্তি যে তাঁহার মধ্যে ব্যক্ত হইয়াছে, এই কবিতাটিতে তাহা অতি সুকৌশলে হুটিয়া উঠিয়াছে । কবির আর একটি কবিতা “হাঘরে” । গৃহহীন, গোত্রহীন, জাতীয়তাহীন সমাজভ্রষ্ট যে ব্যক্তি, তাহাকে জগৎ তুচ্ছ করিয়া থাকে । যে নানহীন, খ্যাতিহীন, তাহাকে সম্মান করিবার অবসর সংসারের নাই । সমাজ-বহু সভা মাহুয তাহাকে কোন দিনই ভাল করিয়া বুঝিতে পারে নাই ; কারণ, তাহার সহিত কোথায়ও ত সে আপনার ঐক্য দেখিতে পায় না । তাহার শিক্ষা-দীক্ষা, আচার-ব্যবহার, সমাজ-ধর্ম্ম লইয়া সে হাঘরে হাতাতে ব্যক্তির নিকট হইতে চিরদিনই দূরে থাকিয়াছে । যুরোপে তাই ভিক্ষাবৃত্তি অপরাধ বলিয়া গণ্য, gypsy অবজ্ঞাত হইয়া থাকে । কিন্তু ভারতবর্ষের আদর্শ বিরাগী যোগীর আদর্শ, মুক্ত পুরুষের আদর্শ । তাই কবি “হাঘরের” মধ্যে বাধন-হারা মুক্ত পুরুষের চিত্র দর্শন করিয়াছেন ।

কালিদাস বাবুর কবিতার হৃদয়দৃষ্টি ও সার্বজনীন সভ্য প্রকাশের এই পরিচয় সর্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায় । ইহা তাঁহার রচনাকে গম্ভীর সারবান্ ও সৌন্দর্য্যময় করিয়া তুলিয়াছে । তিনি দার্শনিকের চক্ষু লইয়া জগৎকে দর্শন করিয়াছেন এবং সৌন্দর্য্য ও রসের মধ্য দিয়া তৎস্বকথা প্রকাশ করিয়াছেন । তবে স্থানে স্থানে তাঁহার দার্শনিকতা কবিতাকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে এবং রচনা উদ্বেগমূলক হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস । দৃষ্টান্তস্বরূপ “সত্য” ও “ঐব” নামক কবিতা দুইটি, “ভরতের মৃগশিশু” কবিতাটির শেষ কয়েক ছত্র এবং “শ্রীকৃত্তমঙ্গল” “ধর্ম্মক্রেত্র” প্রভৃতি কবিতা কয়েকটির উল্লেখ করা যাইতে পারে । শেষোক্ত কবিতা দুইটি এক হিসাবে অতি উচ্চশ্রেণীর । ইহাদের মধ্যে কবির অকৃত্রিম দেশভক্তি—স্বদেশের ও স্বজাতির প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা এবং অপূর্ণ কল্পনা-শক্তি প্রকাশিত হইয়াছে ।

প্রকৃতির সহিত কবির ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের দৃষ্টান্ত অনেক কবিতায় যথেষ্ট পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়—

“পল্ল আমি তুলবো আজি, করবো পপে ছড়াছড়ি,
আজ্ঞাদেহে কাশের ফেতে আজকে দেব গড়াগড়ি ।
সবুজ সবুজ চেউ খেলোছে ধানের ভূয়ে ছুটবো আমি,
লক্ষ দিয়ে ছড়ছড়িয়ে নদীর জলে পড়বো আমি ।”

কালিদাস বাবুর কবিতায় সহস্রহৃতি অতি গভীরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। এই সহস্রহৃতি কোথাও বা দেশপ্রীতি, কোথাও বা সমাজপ্রীতি, কোথাও বা প্রকৃতির প্রতি অত্যাশ্রয়রূপে প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহার “অন্ধকার বৃন্দাবনে”—

“নন্দপুর-চঞ্জ বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার,

বহে না চল মন্দানিল লুটরা ফুল-গন্ধভার”

প্রকৃতি পদগুলি ভাব ও ভাষায় অতি চমৎকার হইয়াছে। প্রত্যক্ষ কবিতায় মধ্যে ইহা যে প্রথম শ্রেণীতে আসন পাইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

কালিদাস বাবুর এই সহস্রহৃতির প্রধান কারণ, তিনি দেশভক্ত এবং তাঁহার জন্ম প্রকৃত হিন্দুর জন্ম। হিন্দুর জন্ম বলিতে ধাহারা সংকীর্ণ আচার-সর্বস্ব কোন বিশিষ্ট সাম্প্রদায়িকতার প্রতি পক্ষপাতিত্ব বলিয়া মনে করিবেন, তাঁহার প্রাস্ত হইবেন। তবে দেশের অতীত ইতিহাসের প্রতি, দেশের পুরাণের অথবা পৌরাণিক ব্যাপারের প্রতি একটি অটল প্রত্যক্ষ যদি কেহ সংকীর্ণতা মনে করেন, তবে তাহা তাঁহাতে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। এই হিসাবে ধাহারা তাঁহাকে গোড়াশ্রেণীতে দেখিতে চাহেন, তাহাদের সহিত আমাদের কোন কলহ নাই। আমরা কিন্তু এরূপ গোড়ামীর পক্ষপাতী। কারণ, তাঁহারই মধ্যে ভারতবর্ষের যাহা বিশেষত্ব, উদারতা ও ধর্মপ্রাণতা, তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে। ক্ষুদ্রের মধ্যে বৃহৎকে দর্শন, জীবনের সকল কর্তব্য ও আদর্শজনের মধ্যে মঙ্গলের প্রতিষ্ঠা এবং ভ্যাগের মধ্য দিয়া জীবনের পরিপূর্ণতা লাভ—ইহাই ভারতবর্ষের প্রকৃত বিশেষত্ব।

“ধর্মক্ষেত্রে” কবি ভারতবর্ষের প্রত্যেক পদার্থই যে একই অর্থও ধর্মজীবনের পরিণতির অঙ্গকূল এবং এই পরিণতিই যে তাহার জীবনের উদ্দেশ্য, তাহাই বলিয়াছেন।

কবি এই দেশপ্রীতি কিন্তু কেবলমাত্র দেশের মহত্ব ও গৌরব-কাহিনী লইয়াই সন্তুষ্ট থাকে নাই। তিনি কেবলমাত্র প্রীক্ষেত্রে ভুবনেশ্বরের মন্দির ও ‘বিন্দুসরোবর’ দেখিয়াই নিবৃত্ত হইবেন নাই,—“পোষের বিষম কনকনে শীতে” পল্লীর পর্ণ-কুটারে এবং বর্ষার কর্দমাক্ত পল্লীর সংকীর্ণ পথের প্রতিও তিনি দৃষ্টিপাত করিয়াছেন; কেবলমাত্র জ্ঞানী ও গুণী ও মহাজনকে দেখিয়াই তাঁহার দৃষ্টি বিহ্বল হয় নাই—দীন কৃষক, ও কৃষানীকে এবং অনাধিনী “হুড়ানীকে” পর্যন্ত তিনি একই প্রকার প্রত্যক্ষ ও সহস্রহৃতির সহিত দর্শন করিয়াছেন।

বলিতে কি, তাঁহার পন্নীবিধরক কবিতাগুলি অতি হুমধুর ও গ্রন্থের অলঙ্কারস্বরূপ হইয়াছে ।

একজন বিখ্যাত ইংরাজ সমালোচক এক স্থানে বলিয়াছেন,—পাঠকের দৃশ্যে কবির সহায়ত্ব উদ্ভেক করিবার ক্ষমতাই কবিত্বের পরিমাপক । যদি তাহা হয় তাহা হইলে কালিদাস বাবুর কবিত্ব যে অতি উচ্চ শ্রেণীর, তাহার সন্দেহ নাই ।

“পন্নীবধূতে” কবি পন্নীগৃহের অতি সুন্দর বাস্তব চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন । কবিতাটি পড়িতে পড়িতে মনে হয়, আমরা সভ্য সভ্যই পন্নীবধূকে তাঁহার কার্য্য-কলাপসহ প্রত্যক্ষ দর্শন করিতেছি । কবি পন্নীবধুর চরিত্র দুইটি মাত্র ছত্রে অতি সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন,—

“লজ্জাসরম সজ্জা পূরন অন্তরভরা মধু,

অবিরত সেবা-সাধন-নিরন্তা এ যে গো পন্নীবধু ।”

কবি কিন্তু একটি স্থানে অতিপয়োক্তি দোষে গোষ্ঠী হইয়াছেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস—“মনদীপ গাণিছাড়া কোন কথা কাণ হাতে নাহি ফিরে ।” নবা বঙ্গের কোন পন্নীবধুর অবস্থাই ঈশ্বর শোচনীয় বলিয়া আমরা অবগত নহি ।

কালিদাস বাবুর কবিতার ‘প্রেম’ সম্বন্ধে আমরা ইচ্ছা করিয়াই এতদূর কিছু বলি নাই । কারণ, প্রেমের কবিতাতে বাঙ্গালা সাহিত্য প্রাবলি হইয়া পড়িতেছে ।

কিন্তু কালিদাস বাবুর প্রেমের কবিতার মধ্যে যে একটি বিশেষত্ব আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না । টেনিসনের প্রেমের কবিতা সম্বন্ধে যাহা বলা যায়, কালিদাস বাবুর কবিতা সম্বন্ধে আমরা অনেকটা তাহা বলিতে পারি । তাঁহার প্রেম উচ্ছৃঙ্খল ও অভিসারিকার প্রেম নহে । তাহা উগ্র মাদকতাময় নহে— তাহা কুসুমের মত মৃদু, সুন্দর ও দৃশ্যের শাস্তি ও তৃপ্তিপ্রদ । তাহা প্রিয়তমের নিকট আত্মবিসর্জন দিতে সর্বদা প্রস্তুত । তাহা প্রিয়তমের জীবনে আপনাকে বিসর্জন দিয়া ভেদ মূণ্ড করিবার জন্ত ব্যাকুল । প্রিয়তমকে সম্পূর্ণ পাইবার জন্ত ‘হুয়ে এক’ হইতে সে সতত প্রার্থনা করে । কালিদাস বাবু সুবক, সুতরায় যৌবন-মূলভ প্রেমের মোহ ও মিলনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা যে তাঁহার কবিতার ছায়াপাত করিবে, তাহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই । বরং তাহাই স্বাভাবিক । তাই “মানসী মূর্ত্তি” ও “কুলশয্যার” কবির এই মিলনাকাঙ্ক্ষা ও মোহের ভাব প্রকাশ পাইয়াছে । কিন্তু আমরা পূর্বেই দেখাইয়াছি যে, আমাদের কবির

ছন্দর তরঙ্গ নহে, তাহাতে সত্য ও মঙ্গলের স্রষ্টা একটি আকুলতা ও ক্ষুদ্রকে বৃহৎ করিয়া দেখিবার একটি অন্তর্দৃষ্টি ব্যক্ত হইয়াছে। তাই কবির যৌবনশ্রুত মিলনের আকাঙ্ক্ষা যে স্থানে তীব্র, সেই স্থানেও উহা কামগন্ধময় হইতে পারে নাই। কবি আপনার মানসী মূর্তির মধ্যে বাহ্য দেখিয়াছেন, তাহা নিরবচ্ছিন্ন নৈতিক পৌনর্য্য নহে।

কালিদাস বাবুর কবিতার আর একটি বিষয় সম্বন্ধে কিছু বলিয়াই আমরা এই দীর্ঘ প্রবন্ধ শেষ করিব। ইহা তাহার কাব্যের Expressiveness। প্রকাশের ক্ষমতাই প্রধানতঃ কবিকে অল্প লোক হইতে পূর্ণকৃ করে। অমূল্য কবিতার ক্ষমতা, দেখিবার শক্তি অল্পবিস্তর প্রত্যেক মানুষেরই আছে—কিন্তু যিনি কবি, তিনি তাহাকে বাহ্য আকার প্রদান করিয়া যখন মানুষের সম্মুখে ধরেন, তখন তাহার মধ্যে সকলেই আপন আপন ছন্দয়ের প্রতিমূর্তি দেখিতে পার। কালিদাস বাবুর পুস্তকে এই ক্ষমতা বিশেষভাবে প্রকাশ পাইয়াছে দেখিতে পাই। তাহার ভাবা ও ছন্দ বেক্সপ মধুর, ভাবের প্রকাশও সেইরূপ সহজ। তাহার একটিনাত্র ছন্দে সমগ্র কবিতাটির ভাব অনেক সময়ে তিনি প্রথমেই প্রকাশ করেন।

তিনি অনেক স্থলেই এমন সুকৌশলে বিশেষণ-পদ ব্যবহার করেন যে, অতি সংক্ষেপেই একটি বৃহৎ ভাব ব্যক্ত হইয়া যায়। কবির চিত্রাঙ্কনক্ষমতা পল্লী-বিষয়ক কবিতাগুলিতে অতি চমৎকাররূপে প্রকাশ পাইয়াছে। প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়াছে বলিয়া আমরা ইচ্ছা সত্ত্বেও সে সকল হইতে উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না।

আমরা এতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রধানতঃ কালিদাস বাবুর গুণের কথাই উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি। ইহাতে হয় ত কেহ আমাদেরকে কবির স্তাবক বলিয়া উপহাস করিবেন। যদি কেহ তাহা করেন, তাহাতে আমরা হুঃখিত হইব না। কারণ, আমরা সত্য সত্যই কালিদাস বাবুর লেখার পক্ষপাতী।

কালিদাস বাবুর কবিতার একটি প্রধান দোষ—তাহা বড়ই দার্শনিকতাবাপন্ন হইয়া উঠে। প্রত্যেক মিনিবের মধ্যেই তিনি একটি গভীর আধ্যাত্মিক তত্ত্বকে দেখিতে গিয়া সময়ে সময়ে কবিতাকে Didactic অথবা উদ্দেশ্যমূলক করিয়া কেলেণ। প্রকৃত কবিতার রসের মধ্য দিয়া তত্ত্বকথা আপনা হইতেই ছুটিয়া উঠিবে। কিন্তু যে স্থানে তত্ত্বকথা রসের সীমা ছাড়াইয়া উঠে, সে স্থানে প্রকৃত কবিত্ব কমিয়া যায়। কালিদাস বাবু ইহা নিশ্চয়ই অবগত আছেন—কারণ, তাহার বহু কবিতাতেই এই প্রকৃত কবিতার যে লক্ষণ, তাহা বর্তমান আছে।

ঐহার কবিতার বিতীর্ণ দোষ—অস্বভাবঃ বাহ্য এই আলোচ্য গ্রন্থ হইতে বৃষ্টিতে পাওয়া যায়—স্থানে স্থানে স্বাভাবিকতার অভাব । স্থানে স্থানে ঐহার রচনা একটু যেন কষ্টকল্পিত বলিয়া আমাদের মনে হয় । কালিদাস বাবুর ভাষা অধিকাংশ স্থলেই অতি সুমধুর ও ঐহার আয়ত্তাধীন—কিন্তু তবুও যেন স্থানে স্থানে উহা একটু ঐহার আয়ত্তের বাহিরে গিয়াছে বলিয়া মনে হয় । দৃষ্টান্ত-স্বরূপ “জমনীবঙ্গ,” “শ্রীক্ষেত্রমঙ্গল” প্রভৃতি কবিতার উল্লেখ করা যাইতে পারে ।

কিন্তু এই দোষ গুণের অতুলাতে অতি সামান্য । আমরা আশা করি,—কবি ঐহার এই ক্ষুদ্র পুস্তকে যে শক্তির পরিচয় দিয়াছেন তাহা ক্রমেই পরিপুষ্ট হইয়া বঙ্গ-সাহিত্যের গৌরব বর্দ্ধিত করিবে । তিনি শক্তিমান লেখক বলিয়াই আমরা এই দোষের উল্লেখ করিলাম । বাঙ্গাল্য সাহিত্য ঐহার নিকট অনেক আশা করিয়া থাকে ; আশা করি, কালিদাস বাবু ইহা বিন্ধিত হইবেন না ।

শ্রীমহীতোষকুমার রায় চৌধুরী ।

বনসুন্দরী ।

এ মধুকাননে তোম কানন-সুন্দরী,
রচিত বিরামকুঞ্জ পল্লব-বিতানে ;
ভ্রামল অঙ্কল চির ছায়াৰূপ ধরি’
জুড়ায় বতনে নিত্য অধীর পর্যাণে ;
তোম এ রসাল বনে কোকিল-কুজন,
ঢালে এ শ্রবণে মোর সুধার নিষ্কর ;
তোম বনফুলগন্ধে মুগ্ধ এ জীবন,
চুষিতে সরসী-মুখ তৃষিত অধর ।
তুই বনে বনসখি, চিত্ত-বিনোদিনী,
আনি মত্ত পান করি’ ও-রূপ-মদিরা ;
কবিত্বের পৌন্দর্য্যের লো চিত্তসজিনী,
ভাবুক বিভোর ভাবে ভাবুকা বিভোরা ।
রেখ এ কবিরে ওই ফুলমধুবনে,
লভিতে বনের শাস্তি এ বন-বিক্রমে ।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম ।

বারিবিন্দুর আত্মকথা।

তোমরা মানবজাতি; অতি সঙ্কীর্ণ কর্মক্ষেত্রের মধ্যে বিচরণ করিয়া আপনাদের কর্মের গরিমা না করিয়া থাকিতে পার না। কিন্তু আমরা জড়পদার্থ; সুবিধৃত কর্মক্ষেত্রে নিরহিতরূপে স্ব স্ব কায করিয়া যাই; কখনও তুচ্ছ ব্যহবার অপেক্ষা রাখি না। স্বর্গ, মর্ত, পাতাল—এই ত্রিভুবনের কথা তোমাদের মুখে শুনিতে পাই বটে; কিন্তু সত্য বল দেখি, তোমরা স্বাধীন চেষ্টায় এই মর্তলোকেরই কতটুকু স্থানের মধ্যে আপনাদিগের বীর্য প্রকাশ করিতে পার? স্বীকার করি, আজি কালি তোমরা পৃথিবীর সর্বত্র অবাধে আনাগোনা করিতেছ, এমন কি, গগনবিহারী পর্যায় ছইয়া উঠিয়াছ; কিন্তু সে কি আমাদেরই কৃপায় নহে? তথাপি তোমরা এমনই কৃত্য যে, আমাদের কৃত উপকারের প্রতাপকার করা দূরে থাকুক, স্বীকার পর্যায় কর না। তোমাদের পূর্বপুরুষগণ এক সময়ে দেবতা বলিয়া আমাদের পূজা করিতেন; আর আজ তোমরা আমাদেরই পূর্বপুরুষকে তোমাদের ভৃত্যতানীয় বলিয়া মনে কর। এমন কি, তোমাদের আইনে আলোক, বায়ু প্রভৃতিকে সাধারণের ভোগ্য সামগ্রী বলিয়া নির্দেশ কর; যেন মানবজাতির ভোগের জন্যই জড়পদার্থের সৃষ্টি হইয়াছে। এই সব দেখিয়া শুনিয়া তোমাদের সহিত আমাদের প্রকৃত সম্বন্ধ কি, মধ্যে মধ্যে তাহার পরিচয় দিতে হয়। আশা করি, ‘টাইটানিক দুর্ঘটনার’ কথা তোমরা এখনও বিস্মৃত হও নাই। মনে রাখিও, জীবজগতের পালন যেমন আমাদের কর্তব্যের মধ্যে, সংহারও তেমনই আমাদের কর্তব্যের মধ্যে। আমরা কর্তব্যের অমুরোধে উভয়বিধ কার্যই মথাসময়ে ও যথানিয়মে সম্পাদিত করি।

এখন বোধ হয়, আমাকে আর ক্ষুদ্র বারিবিন্দু বলিয়া উপেক্ষা করিবে না। আমি ক্ষুদ্র বারিবিন্দু হইলেও আমার জীবনের একটা দীর্ঘকালব্যাপী বৈচিত্র্যময় ইতিহাস আছে। সেই ইতিহাসের একটা পরিচ্ছেদ আজ তোমাদিগকে শুনাইব।

এই পরিচ্ছেদের আরম্ভের পূর্বে কতদিন জলদিগর্ভে স্বজাতীয়গণের সঙ্গে একত্র কাটাইয়াছিলাম, বলিতে পারি না। যত দিনই হউক, বড় সুখে কাটিয়াছিলাম। আমরা কিরূপ স্বজাতিপ্রিয়, তাহা তোমাদের জানিতে বাকী নাই; নচেৎ কথায় কথায় বলিবে কেন—জলেই জল বাধে? অথবা: কাণে জল ঢুকিলে জলেরই সাহায্যে উহা বাহির করিবার চেষ্টা করিবে কেন? তোমরা অবশ্য এটা লক্ষ্য করিয়াছ যে, আমরা সাধ্যপক্ষে কখনও পৃথক হইতে চাহি না, তবে জোর করিয়া পৃথক

করিলে তাহার উপর হাত নাই। তথাপি আমরা মিলনের কোন সুযোগ পাইলে সে সুযোগ ত্যাগ করি না। এই স্থানে তোমাদের সঙ্গে আমাদের একটা প্রকাণ্ড প্রভেদ। তোমরা সাধারণতঃ একত্র থাকিতে চাহ না। তবে যখন ক্ষমতার কুলার না, তখন বিনি অক্ষম তিনি ক্ষমের দ্বন্ধে আপনার ভার বক্ষায় সুযোগ লাভের আশায় একত্র থাকার পক্ষপাতী হইলেন। সে যাহা হউক, বারিধিগর্ভে পরস্পর গাঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ হইয়া আমরা বড় সুখে থাকিতাম।

কিন্তু চিরদিন ত সমান ঘাইবার নহে। এক দিন একটা উচ্ছ্বল মীন-শাবকের সংসর্গে পড়িয়া আমি এমন চুঃসাহসের কাণ্ড করিয়া ফেলিলাম যে, তাহার ফলে আমার জীবনে একটা পরিচ্ছেদের আরম্ভ হইল! সে এইরূপ;—

মীনশাবক ক্রমাগত উপরে উঠিতে লাগিল। আমিও কোতুলকের বশবর্তী হইয়া তাহার অনুগামী হইলাম। খতই উঠে উঠি, ততই উচ্ছলতার আলোকের স্পর্শে কেমন একটা নূতন ধরণের সুখানুভব হয়। শেষে যখন উচ্ছলতম স্তরে গিয়া পৌছিলাম, তখন যেন চক্ষুর সম্মুখ হইতে একটা বাবধান সরিয়া গেল এবং এক নূতন জগৎ আপনার মহিমায় আমাকে বিভুত করিয়া ফেলিল। কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই আমার সুখ-স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। তোমরা পরীতে উড়াইয়া লইয়া বাওয়ার গল্প কর। আমার অসুটে ঠিক তাহাই ঘটিল। অকস্মাৎ যেন একটা দৈত্য আসিয়া আমাকে কোথায় উড়াইয়া লইয়া চলিল। আমি কিছুই ঠিক করিতে পারিলাম না। ভয়ে আমার সংজ্ঞালোপ হইল। কতক্ষণ এইরূপে কাটিয়াছিল বলিতে পারি না। যখন চেতনা হইল, তখন দেখিলাম আমার চেহারার অদ্ভুত পরিবর্তন হইয়াছে *। আমি আপনি আপনাকে চিনিতে পারিলাম না। দেখিয়া শুনিয়া বড় ভয় হইল। ভাবিলাম, এ কোথায় কোন্ রাজ্যে আসিয়াছি, আমার এক্ষণ পরিবর্তনেরই বা কারণ কি? নিজের নির্ভুঙ্কিতাকে শতবার দিচ্ছার দিলাম; কেন এমন মতি হইল, কেন সামান্য কোতুলক চরিতার্থ করিবার প্রকৃত্তিকে দমন করিলাম না? কিয়ৎক্ষণ বিলাপ ও পরিতাপের পর যখন একটু শান্ত হইলে ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিলাম, আমি একা এক্ষণ হৃৎশাশ্রু নহি, আমার চতুর্দিকে আমার মত শত শত চর্ভাগা আমার প্রতি সকল-দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। তখন একটু আশ্বস্ত হইলাম। বুঝিতে পারিলাম, এটা মারা-পুত্ৰী, আমাদের সকলকে ঘাহ করিয়া রাখিয়াছে। ইচ্ছা হইল, নিকটে ঘাইয়া সকলের সহিত আলাপ করি। কিন্তু সর্দান্ন আড়ষ্ট—নড়িবার সামর্থ্য হইল না। ইহাও বুঝিতে

* এই ব্যাপারকে ইংরাজিতে বলে evaporation

পারিলাম যে, সকলেরই অবস্থা সমান। তখন একমাত্র অতীতের স্মৃতি-স্মৃতিকে অবলম্বন করিয়া ভবিষ্যতে মুক্তিলাভের আশার দিনযাপন করিতে লাগিলাম।

কিছু দিন এই ভাবে কাটিল। দিবাভাগে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-কিরণ আমাদেরকে দগ্ধ করিয়া মারিত। নিশাগমে দিবাকরের কবল হইতে নিষ্কৃতি পাইতাম বটে, কিন্তু ধরিয়া তাঁহার দিবাভাগের সঞ্চিত উত্তাপ সেই সময়ে প্রেরণ করিয়া রজনীর আরাম হইতে বঞ্চিত করিতেন। অহর্নিশ এইভাবে জীবন যাপন করিলুম কষ্টকর, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অন্য কেহ উপলব্ধি করিতে পারিবে না।

স্বপ্নের বিষয় কিছু দিন পরে স্বর্ণাদেব দূরে সরিতে আরম্ভ করিলেন; তাঁহার রশ্মিভালের উত্তাপের হ্রাস হইতে লাগিল। তখন হতাশের নিশ্চেষ্ট ভাব দূর হইয়া নবীন আশার সঞ্চার হইল। শেষে এক দিন—সে দিন কখনও বিস্মৃত হইব না—শীতল বায়ু বহিল, আমরা মুক্ত হইলাম। *

আবার আমরা—পরস্পর পরস্পরের আলিঙ্গনে বদ্ধ হইলাম। সে বড় সুখ! বহু দিনের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের পর উহা বড় মধুর লাগিল। দীর্ঘ কারাবাস হইতে প্রত্যাগত হতভাগ্য তাহার প্রিয়-মনের বাহুপাশে বদ্ধ হইয়া যে সুখ উপভোগ করে, বোধ হয়, তাহা কতকটা এই স্বপ্নের সহিত তুলনীয়। মুক্ত হইবার পর আমরা পথের স্বন্ধে চড়িয়া বিনানবিহার করিতে লাগিলাম। সে কি আরাম! মাথার উপরে সৌরকিরণোদ্ভাসিত নীল আকাশ; নিম্নে বিচিত্র ধরা-পৃষ্ঠ। কি স্বন্দর! এই সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে করিতে আমরা বায়ুসহায় হইয়া সাগর হইতে বহু দূরে গিয়া পড়িলাম। অদূরে শৈলমালা শোভা পাইতেছিল। নিম্নে অরণ্যানী ও বিস্তৃত প্রান্তর—প্রান্তরের মধ্য দিয়া স্রোতধিনী বহিয়া গিয়াছে। মনে হইল, কবে উহার স্রোতে মনের সাথে গা ডালাইতে পারিব।

দিবাভাগে ঈষদ্ভূত রবিকিরণ বড় ভাল লাগিত। কিন্তু রজনীতে শৈত্যাত্তভব করিতাম। স্ফোংস্রাময়ী নিশায় আমরা চাঁদের আলো লইয়া ক্রীড়া করিতাম। আমাদের সেই লুকোচুরি খেলা নিম্নে সরসীবক্ষে প্রতিকলিত হইয়া অল্পপম শোভা ধারণ করিত। এক এক দিন বায়ুও আমাদের সঙ্গে ক্রীড়াকৌতুকে যোগ দিত। আমরা ইতস্ততঃ বিক্ৰিপ্ত থাকিলে আমাদেরকে জোর করিয়া একত্রিত করিত, আমরাও আবার ফাঁক পাইলে বাহার বে স্থানে ইচ্ছা, ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া পড়িতাম। এইরূপ আমোদ-প্রমোদের মধ্য দিয়া দিনগুলি বড় শীঘ্র শীঘ্র

কাটিয়া বাইতে লাগিল। আমরাও আমাদের হুঃখের স্বভিত্তিকে প্রায় তুলিয়া বাইতে লাগিলাম।

এমন সময়ে অকস্মাৎ এক দিন বায়ু, কি জ্বালি, কি কারণে কুপিত হইয়া ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিল। প্রচণ্ডবেগে বাত্যা বহিতে লাগিল। আমরা বায়ুর উপরে চড়িয়া ছিলাম, কাবেই আমাদের মধ্যে পরস্পর সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। স্রোযোগ পাইয়া আমাদের চিরশত্রু বিহ্বাৎ আসিয়া দর্শন দিলেন। তখন ভীষণ হত্যাাকাণ্ড আরম্ভ হইল। আমরা প্রাণভয়ে পরস্পর দৃঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ হইয়া থাকিলাম। বাতায় ভগ্ননক শেঁ। শেঁ। শব্দের সহিত মধ্যে মধ্যে দামিনীর ভীম গর্জ্জন মিলিত হওয়ায় ঘেন প্রলয়ের ভেরীরাব বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। নিম্নে দৃষ্টি পতিত হওয়ায় দেখিলাম, বনস্পতিগণ ঘেন প্রকৃতির এই রণরঙ্গিনী মূর্ত্তি দেখিয়া ক্রম্ভভাবে সান্নাঙ্গ প্রণিপাত করিতেছে। নম-নদী-তড়াগাদির বাসিন্দাশি বীচি-বিষ্ট হইয়া উছলিয়া পড়িতেছে। এ ঘেন প্রলয়ের জাণব! ভেরী বাজাইয়া ও নৃত্য করিয়া সে ঘেন তাহার কার্য্যারম্ভের হুচনা করিয়া দিতেছে।

কিরংকণ এই ভাবে চলিল। ক্রমে বায়ু সমরক্লান্ত মনের জ্ঞান নিস্তেজ হইয়া পড়িতে লাগিল এবং অবশেষে তাহার পূর্ব্বের শাস্ত্রমূর্ত্তি ধারণ করিল। তখন নিরুপায় হইয়া ক্ষণপ্রভা বারকয়েক ঘন ঘন ছুটাছুটি করিয়া রণে ভঙ্গ দিল। আমাদেরও ভয় ঘুচিয়া পুনরায় আশার সঞ্চার হইল। কিন্তু সেই সময় হইতে কেন জানি না; অতিশয় শীতবোধ হইতে লাগিল। কায়েই আমরা পরস্পর খুব ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া রহিলাম। শীত ক্রমশঃ বাড়িতে আরম্ভ করিল। শেষে উহা এতটা বৃদ্ধি পাইল যে, আমাদের সর্কাস আড়ষ্ট হইয়া গেল এবং আমরা এক একটি মল পরস্পর পরস্পরের সহিত দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন হইয়া গেলাম *। তখন বায়ু আর আমাদের ভারবহনে স্বীকৃত হইল না। স্মরণ্য আমরা আশ্রয়-বিহীন হইয়া নিম্নে শৈলপৃষ্ঠে পতিত হইলাম। রাজিতা তথায় এই ভাবেই কাটিল। পরদিবস মধ্যাহ্নের রবিকিরণকাল আমাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগের ঐক্স্মালিক স্পর্শে আমাদের আড়ষ্টতাব ঘুচাইয়া দিল।† আমরা আমাদের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া পাইলাম। আমার সহচরগণের মধ্যে অনেককেই শৈলপৃষ্ঠ বাহিরা সমতল ক্ষেত্রের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু আমরা কয়েকজন স্থানে স্থানে ছিদ্রের সন্ধান পাওয়ার কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া সেই ছিদ্রপথে ভূগর্ভে প্রবেশ করিলাম।

* এইরূপ ব্যাপারের ইংরাজী নাম congelation.

† ইহাকে ইংরাজীতে বলে fusion.

তথায় চারি দিক্ হইতে আমার মত অহুসন্ধিৎসু অনেকেই আসিয়া জুটিতে লাগিলেন। স্মৃতরাং আমরা দলে বিলম্বন পুষ্ট হইলাম। তখন আমরা ভূগর্ভে দুইটি স্তরের মহাবর্তী পথ বাহিয়া বেজ্ঞাসেবক-সম্প্রদায়ের মত মহোন্মাদে যাত্রা করিলাম। ঘুরিয়া ফিরিয়া, উঠিয়া, নামিয়া, ভূগর্ভের মত বক্রগতিতে আমাদেরিগকে চলিতে হইতেছিল বটে, কিন্তু কোন স্থানে আমাদের সম্পূর্ণ গতিরোধ হয় নাই। মধ্যে মধ্যে অনেক পঙ্খ লবণ-কণা সমুদ্রবর্ণনের অভিশাপ ব্যক্ত করায় তাহাদিগকে ক্রোড়ে পুষ্টে তুলিয়া লইতে হইতেছিল।* তোমরাও দেখিতে পাই, গৃহে গৃহে দেশহিতৈষিতার ধ্বজা উড়াও এবং পরোপকারের চকানিনাদে কর্ণ বধির করিয়া তুল। কিন্তু বল দেখি, তোমাদের মধ্যে কয়জন প্রকৃত কার্যের দ্বারা দেশ-হিতৈষিতা ও পরোপকারিতার পরিচয় দাও?—কয়জন অন্ধ, অতুর, পঙ্খ দেখিলে সমবেদনা-প্রেরিত হইয়া নিজের বাহুদ্বয় প্রসারিত করিয়া দাও? আমরা দেখ, স্বজাতি বিজাতি, শত্রু মিত্র, আপন পর কিছুই বাছি না, যাহাকে অশক্ত দেখি, যে আমাদের সাহায্যপ্রার্থী হয়, তাহাকেই ক্রোড়ে, পুষ্টে, কন্ধে তুলিয়া লই। কিন্তু কস্মিন্কালেও ইহার জন্ত বাহবার দামামা শুনিয়া আত্মাভিমান বর্জিত করিবার চেষ্টাবৃত্তি হয় না।

সে যাহা হউক, আমরা কিছু দিন ধরিয়া ভূগর্ভে এই ভাবে বিচরণ করিলাম। কোতুহল কাটিয়া গিয়া তখন বাহিরে আসিবার জন্ত একটু উৎকর্ষা জন্মিয়াছে। অথচ কোথাও বাহির হইবার কোন পথ দেখিতে পাইলাম না। ইহাতে সামান্য একটু ভীতির সঞ্চার হইল। তোমাদের একটা পৌরাণিক প্রবাদ আছে যে, শৈলমুতা শিবের জটার মধ্যে প্রবেশ করিয়া নির্গমনের পথ খুঁজিয়া পানেন নাই। নৌভাগ্যের বিষয়, তখনও তোমাদের সঙ্গে পরিচয় না হওয়ার প্রবাদটা আমার জানা ছিল না। নচেৎ পথের যেক্রপ দৈর্ঘ্য দেখিলাম, তাহাতে দৈর্ঘ্যচ্যুতি হইবার সম্ভাবনা প্রবল হইত। ফিরিবারও উপায় নাই। আমাদের দল পথে নিয়ত পুষ্ট হওয়ার এক্ষণে বৃহদাকার ধারণ করিয়াছিল। স্মৃতরাং পঞ্চাভের বারিরাশির এক্রপ চাপ অগ্রভূত হইতেছিল যে, কোথাও স্থির হইয়া দাঁড়াইবারই উপায় নাই, পঞ্চাবর্তী হওয়া ত দূরের কথা। তোমাদের মধ্যে যাহারা মেলার ভিড়ের মধ্যে কখনও প্রবেশ করিয়াছেন, তাহারা আমার অবস্থা কতকটা অগ্রভব করিতে পারিবেন।

এই ভাবে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিবার পর শেষে এক স্থানে উপস্থিত হইলাম।

* ইহার ইংরাজি নাম solution.

তথায় অস্ত্র সকল দিকেই পথ রুদ্ধ, কেবল উপরের দিকে পথ খোলা ছিল। সুতরাং সেই পথ দিয়া আমরা উপরে উঠিতে বাধ্য হইলাম। পথটা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। তাহার উপর পক্ষাৎ হইতে বিঘ্ন চাপ। ফলে আমরা প্রবল বেগে উর্দ্ধে নীত হইতে লাগিলাম এবং অবশেষে ভূগর্ভ হইতে একেবারে বাহিরে আসিয়া পড়িলাম। আবার ধরিত্রী-পৃষ্ঠে গিরি, উপত্যকা, বন, উপবন দেখিয়া নয়ন সার্থক করিলাম। আমাদের উপরে সৌর কিরণ প্রতিফলিত হওয়ার আমাদের অপূর্ণ ত্রি সম্পাদিত হইতেছিল। তন্নিমিত্ত, আমরা যখন ভ্রমণে হইতে এই ভাবে বাহির হই, তখন তোমরা আমাদের নাম দাও—প্রভ্রবণ এবং আমাদের প্রভ্রবণ-মূর্তির অপূর্ণ শোভা সন্দর্শন করিয়া বিমুগ্ধ হও। কিন্তু বলিতে লজ্জা হয়, সেই আমরা যখন তোমাদেরই কল্যাণের জন্ত তোমাদের বাসস্থান হইতে আবর্জনারাশি বানান্তরিত করি, তখন তোমরা আমাদেরকে কুৎসিত বলিয়া ঘৃণা কর। বহু দিন তোমাদের সংসর্গে থাকিয়া আমার এই অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে যে, তোমরা শুধু রূপের ছটাই বুঝ,—গুণের আসন্ন করিতে জান না।

সে যাহা হউক, আমি আমার স্বজাতীয়গণের সহিত ধারা বাহিয়া নিম্নগামী হইলাম। পথে অসংখ্য ধারা আসিয়া আমাদের দ্বারার সহিত সংযুক্ত হইল। ক্রমে আমরা বিপুলকার হইয়া উঠিলাম। তখন আমরা যে খাত বাহিয়া চলিলাম, তোমরা তাহাকে নদী বলিয়া থাক। আকাশপথে বিচরণ করিবার সময় নিম্নে স্রোতধিনীর প্রতি লোলুপ-দৃষ্টি করিয়া ভাবিয়াছি, ইহার স্রোতে গা ভাসান কত সুখের! আজ বহুদিনের সেই পোষিত আশা পূর্ণ হইবার সময় চিন্তে কি আনন্দ হইতেছিল, তাহা বুঝান যায় না। তোমাদের কাব্যে তটিনীর সৌন্দর্যের অনেক বর্ণনা আছে; কিন্তু উহার এক বিন্দু বারি হইয়া বাহ্য প্রকৃতির সৌন্দর্য্য কি ভাবে উপলব্ধি করা যায়, তাহার কোন বর্ণনা কোথাও পাইয়াছি কি? বোধ হয় পাও নাই। সেই অস্ত্র আমার নয়নে প্রকৃতির শোভা যে ভাবে প্রতিভাত হইয়াছিল, তাহা তোমাদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

আমি তটিনীর বারি-রাশির মধ্যে থাকিয়া হেলিয়া তুলিয়া কখনও বা আবর্তে ঘুরিয়া চলিলাম। জলের উপর ফেনরাজি আমাদেরই সঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া চলিল। তীরের দিকে ডাকাইয়া দেখিলাম, বিটপীশ্রেণী হেলিয়া তুলিয়া, উঠিয়া নামিয়া কত অজস্র সঙ্কীর্ণ নৃত্য করিতেছে। মিথ্যা কথা নহে, প্রকৃতই উহার আমার দৃষ্টিতে নৃত্য করিতেছিল। আকাশমার্গে বিচরণ

করিবার সময় বিটপী-শ্রেণীকে দ্বিঃভাবেই দেখিয়াছিলাম, কিন্তু এক্ষণে নদী-গর্ভে অবস্থিত থাকিয়া তাহাদিগকে নৃত্যপরায়ণ দেখিলাম *। শুধু তীহের বিটপী-শ্রেণী নহে, ঘাটে ঘাটে যে সকল কুলকানিনীরা দ্বানার্থ আসিয়াছিলেন, দেখিলাম, তাঁহারাও কলনী-কক্ষে নৃত্য করিতেছেন। যে দিবাকরের প্রথম কিরণে তোমাদের চক্ষু ঝলসিগা যার বলিগা তোমরা তাঁহার দিকে তাকাইতে পার না, আমি বারিরাশির মধ্যে থাকিয়া অক্লেশে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। দেখিলাম, তিনিও নৃত্য করিতেছেন এবং মধ্যে মধ্যে যখন তটিনীর বন্ধের উপর দিয়া চঞ্চল বায়ু বহিয়া যাইতেছে, তখন তিনি শতধা বিভক্ত হইয়া অপূর্ণ শ্রী ধারণ করিতেছেন। এ যেন এক বিরাট নৃত্যশালা; যাহার দিকে তাকাই, তাহাকেই নৃত্যপরায়ণ দেখি। নিশাগমে তাৎক্ষণিকত নতোমণ্ডলকে বহুদিকের নৃত্যগার বলিগা বোধ হইতে লাগিল। এই প্রকার শোভা সন্দর্শন করিতে করিতে আমি বহু দূরে আসিয়া পড়িলাম।

অতঃপর এক দিন দ্বান হইতে প্রত্যাগমনোন্মুখী কোন পুরনারীর পূর্ণকুন্তের মধ্যে স্থান লাভ করিয়া তোমাদের গার্হস্থ্য রীতি-নীতি ও আচার-ব্যবহার দেখিয়া আসিয়াছি। আমার জীবনের সে পরিচ্ছেদটা এখন শুনাইব না। তাহার কারণ, উহা তোমাদেরই গার্হস্থ্য চিত্রে পূর্ণ, আমার নিজের জীবনের ইতিহাস উহাতে খুব কমই আছে। যদি আমি স্মরণে পাই এবং তোমাদের শুনিবার প্রবৃত্তি হয়, তবে বাস্তবস্তরে উহা শুনাইব।

যাহা হউক, সেই পরিচ্ছেদের অন্ত্রে আমি পুনরায় নদীগর্ভে স্থান পাইয়াছিলাম। আশা করিয়াছিলাম, এইবার নিরাপদে আপনার জন্মভূমিতে ফিরিতে পারিব। কিন্তু অদৃষ্টে তখনও অনেক বিড়ম্বনা ছিল। কয়েক দিগম অতীত হইবার পরেই বিজ্ঞের সূচনা দেখা দিল। এক দিন যেন কোন আকর্ষণী শক্তির বলে অকস্মাৎ একটা স্তম্ভরপথে নীত হইলাম, এবং তদবধি কিছুদিন ধরিয়া আমাকে অদৃষ্টের ক্রীড়াপুত্রলী হইতে হইল। বিড়ম্বনার উপর বিড়ম্বনা, তোমাদের জাতিই আমার আমার তৎকালীন ভাগ্যচক্রের নিরস্ত্রা হইলেন। প্রথমেই এই ব্যবস্থা হইল যে, আমাদিগকে বালুকারণি ও অঙ্গারচূর্ণরাশির মধ্য দিয়া বাইতে হইবে। উহাদের মধ্যস্থিত পথ যে কতদূর প্রশস্ত, তাহা আর বলিতে হইবে না। আমরা এক একটি বারিবিদ্যু তাহার মধ্য দিয়া অতি কষ্টে বাহির হইতে পারিলাম। কিন্তু পথিমধ্যে আমাদিগকে আশ্রয় করিয়া যে সকল কন্দম-কণিকা সুসুন্দরদর্শনের

* আলোক-বিজ্ঞানে যে ব্যাপার refraction বলিয়া উক্ত হইয়াছে উহাই ঐ প্রকার দৃষ্টবিজ্ঞানের কারণ।

আশা করিয়াছিল তাহাদিগকে পশ্চাতে পড়িয়া থাকিতে হইল ।* তবে যে সকল পশু লবণ কণাকে আমরা জ্বোড়ে করিয়া লইয়া আসিয়াছিলাম তাহাদিগকে তখনও পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করি নাই ।

তদনন্তর আমরা অপর একটা সুব্রহ্ম পথ দিয়া এক স্থানে নীত হইলাম । তথার এক ব্যক্তি একটা পাত্রে আমাদের কিয়দংশ রক্ষা করিল, তাহার মধ্যে আমিও রহিলাম । সুব্রহ্ম হইতে নিম্নোক্ত হওয়ার ডাবিলাম, এইবার ভোগের শেষ হইয়াছে । কিন্তু তখন বৃষ্টিতে পারি নাট, আমার সে অসুখ্যমান কতদূর ভ্রান্ত । পরদিবস সেই ব্যক্তি আমাদিগকে অপর একটা পাত্রে রাখিয়া সেই পাত্রের তলদেশে অধিসংযোগ করিল । প্রথম প্রথম বড় কিছু বৃষ্টিতে পারিলাম না, কিন্তু ক্রমশঃ সর্গাঙ্গে একটা প্রবাহ অস্বভূত হইতে লাগিল । জিজ্ঞাসায় বৃষ্টিলাম, শুধু আমার একার নহে, সকলেরই একই দশা । এই প্রবাহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । ক্রমে এইরূপ দাঁড়াইল যে, স্থির হইয়া থাকা অসম্ভব । সকলেই যন্ত্রণায় ছটকট করিতে লাগিলাম ; যন্ত্রণা বত বৃদ্ধি পায় আমাদের ছটকটানিও ততই বাড়ে । শেষে অনন্তোপায় হইয়া আমরা ছুটাছুটি আরম্ভ করিলাম । যে পাত্রে আমরা ছিলাম উহার সকল দিক বন্ধ ; কেবল উপরের দিক খোলা । সুতরাং আমরা অনেকে উপরের দিকে লাফাইয়া মুক্তিলাভের চেষ্টা পাইতে লাগিলাম । কিন্তু উহাতে বিশেষ কোন ফলোদয় হইল না । এতক্ষণ আমরা পরস্পরের অবলম্বন ছাড়ি নাই, বা পশু লবণ কণাদিগকেও ত্যাগ করি নাই । কিন্তু অতঃপর দেহ অবল হইয়া আসিল ; সঙ্গে সঙ্গে হস্ত পদও শিথিল হইয়া পড়িল । সেই ভ্রমোগে কে যেন আসিয়া আমাদিগকে উড়াইয়া লইয়া চলিল । যে সকল লবণ কণা পূর্বে গৃহ আলিঙ্গনে বদ্ধ ছিল আলিঙ্গন শিথিল হওয়ার তাহারা পশ্চাতে পড়িয়া রহিল । †

প্রথমবারে তবে যেরূপ সংজ্ঞালোপ হইয়াছিল এবারে আর সেরূপ হয় নাই । অনেক বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হওয়ায় সাহস বাড়িয়া গিয়াছিল । এতদন্ত নিশ্চেষ্টতার মধ্যেও চৈতন্য ছিল । দেখিতে লাগিলাম, একটা অন্নপরিসর নলের মধ্য দিয়া বাইতেছি ; বোধ হইল যেন সেই নলটা অতি বন্ধ, তাহার মধ্য দিয়া আমাদিগকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বাইতে হইতেছে । আন্তর্গোচর বিষয়, এই নলের মধ্য দিয়া বাইতে বাইতে আমাদের—জালা, যন্ত্রণা ও আড়ষ্টতা কমিতে আরম্ভ করিল এবং অচিরে

* এই প্রক্রিয়ার নাম filtration.

† এই ব্যাপারকে ইংরাজীতে বলে ebullition বা boiling.

আমরা আমাদের স্বাভাবিক অবস্থা কিরিয়া পাইলাম । মনের প্রান্তভাগ অপর একটা পাত্রের মধ্যে নাস্ত ছিল । স্বতরাং আমরা সেই পাত্রের মধ্যে গিয়া পড়িতে লাগিলাম ।

সকলে একত্রিত হইলে যখন কতকটা নিশ্চিন্ত হওয়া গেল তখন ভাবিতে লাগিলাম, আমাদের প্রতি এরূপ নির্ঘাতনের আবশ্যিকতা কি । একটু লক্ষ্য করিয়া দেখা গেল যে, আমাদের সকলেরই পক্ষ লবণকণাশিগকে ছাড়িয়া আসিতে হইয়াছে । তখন আর বৃষ্টিতে বাকি রহিল না যে, অঙ্গার ও বালুকার সংকীর্ণ ছিদ্রপথে চালাইয়া বাহা সিদ্ধ হয় নাই তাহা এই অগ্নিপরীকার দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে ।* তোমরা হয় ত আমাদের প্রতি অবজ্ঞাহচক কটাক্ষপাত করিতেছ, কিন্তু তোমাদের মনে রাখা উচিত যে, পক্ষাহত হইলে জননীরাও সাধা নাই যে সম্মানকে ধরিয়া রাখে ।

বাহা হউক অতঃপর নিঃস্বপনের কোন উপায় করা ঘাইতে পারে কি না তাহারই পরামর্শ চলিতে লাগিল । অনেক অনেক প্রকার উপায়ের কথা বলিলেন, কিন্তু প্রায় সকলগুলিই সুখিকের পক্ষে বিভালের গলার ঘণ্টা বাধার মত দুঃসাধ্য । কেবল একটীমাত্র প্রস্তাব কতকটা সুসাধ্য বলিয়া মনে হইল । প্রস্তাবটি এই যে, আমাদের হিতকারী প্রতিবাসী বায়ুর নিকট হইতে কোন অস্ত্র সংগ্রহ করিয়া আমরা যে পাত্রের মধ্যে ছিলাম উহার তলদেশে কিম্বা পার্শ্বদেশে ছিদ্র করা হউক । বায়ুও অস্ত্র দিয়া সাহায্য করিতে প্রস্তুত ছিল, কিন্তু পাত্রটা কাচনির্মিত হওয়ার দেখা গেল যে, বায়ুপ্রদত্ত অস্ত্রে উহার কিছুই হইবে না । কায়েই সে প্রস্তাবও পরিত্যাগ করিতে হইল । তখন সকল প্রকার চেষ্টা ছাড়িয়া আমরা একমাত্র ঋদুশ্রীর উপর নির্ভর করিয়া রহিলাম ।

অতঃপর বাহা ঘটনাছিল তাহা মরণ করিতেও চক্ষুস্প উপস্থিত হয় । প্রথমটা আমার পক্ষে নিতান্ত অপ্রিয় হইলেও তোমাশিগকে শুনাইতে হইবে, কেননা আমার এই ইতিহাস অসম্পূর্ণ রাখা আমার অভিপ্রেত নহে । ঘটনাতা এই । একদিন আমরা এক বিচিত্র প্রকোষ্ঠে নীত হইয়া দেখিলাম, তপায় তোমাদের জাতির বহুলোকের সমাবেশ হইয়াছে এবং এক ব্যক্তি (লোকটা বোধ হয় ঘাড়কর হইবে) সকলকে ভেঙি দেখাইয়া চমৎকৃত করিতেছে । ভেঙি মাথা-মুণ্ড কিছুই নহে, আমাদের ভিন্ন গোষ্ঠীবর্ণ তোমরা বাহাদের নাম দিয়াছ অস্ত্র, তাহাদের সহিত অন্যের মিলন ব্যাপার । দেখিলাম, ইহাতেই তোমাদের জাতি

* ইহাকে ইংরাজীতে বলে distillation.

একেবারে বিস্মিত হইতেছে । কতকটা যে গর্ষ অশ্রুভব করিলাম না এমন নহে । কিন্তু পরক্ষণেই ঘাছা দেখিলাম তাহাতে অস্তরায়্য শুকাইয়া গেল । দেখিলাম, বাহুর প্রভু একটি পাত্রে আমাদের কিয়দংশ রাখিয়া তাহাতে একটা অশ্রুত আকাশের নল জুড়িয়া দিলেন । পশ্চাৎ আমাদের পরম লজ্জা যে তড়িত তাহাকেই ঐ পাত্রের মধ্যে ছাড়িয়া দিলেন । প্রথমতঃ সে বড় একটা কিছু করিতে চাহিল না । কিন্তু বাহুর মহাশয় পাত্রের মধ্যে যেমন আমাদের ভিন্ন গোষ্ঠী গন্ধকারের ছই চারি বিন্দু নিক্ষিপ্ত করিলেন তখনই তাহার গন্ধ পাইয়া তড়িত একেবারে মাতিয়া উঠিল । তখন সে মনের আনন্দে এক একটি বারিবিন্দু লইয়া তাহার অস্থি হইতে মাংস ছাড়াইয়া ফেলিতে লাগিল ।* আমি তখন ভিন্ন পাত্রে ছিলাম, এই লোমহর্ষণ দৃষ্ট দেখিয়া আমার চৈতন্যলোপ হইবার উপক্রম হইল । আমরা যখন আমাদের কর্তব্য কর্তৃ সম্পন্ন করি তখন তোমাদের কোন অহিত হইলে তোমরা আমাদেরিগকে নিষ্ঠুর বলিয়া গালি দাও ; কিন্তু বুঝ না যে, আমরা কর্তব্যের অহুরোধে ও নিরস্তির প্রেরণায় হিত, অহিত উত্তরই করিতে বাধ্য । আমাদের গতাত্তর নাই । আমাদের যিনি কর্তৃষ্ঠাকুত্রাণী, বাহাকে তোমরা প্রকৃতি নামে অভিহিত কর, তাহার আদেশ কিরূপ অলঙ্ঘনীয় তাহা তোমাদিগকে কেমন করিয়া বুঝাইব ? তোমরা কিন্তু শুধু কৌতুকের জন্য আমাদের উপর যে অভ্যাচার কর তাহার কি কোন কৈফিয়ত আছে ? অবশ্য তোমাদের এবস্থি ব্যবহারে বিদিত হইবার কিছুই নাই । কেন না তোমাদেরই জাতি এক সময়ে আপনার স্বভাৱগণকে ব্যাঘ্রাদি হিংস্রজন্তুর কবলে নিক্ষিপ্ত করিয়া তাহাদিগের শোচনীয় পরিণামের জদয়বিহারক দৃষ্ট দর্শনে আমোদ অশ্রুভব করিত । সে ঘাছা হউক কিছুকণ যরিয়া তড়িত এই ভাবে কসাইএর কার্য্য নিষ্পন্ন করিলে যখন এক স্থানে কঞ্চাল রাসিকৃত হইল এবং অন্য স্থানে মাংস স্তৃপীকৃত হইল তখন বোধ হয় বাহুর মহাশয়ের মনোবাছা পূর্ণ হইল । তিনি দর্শকবৃন্দকে এই অস্থিমাংস বিশ্লেষণ ব্যাপার দেখাইয়া খুব বাছা লইলেন ।

অতঃপর বাহুর সেই রাসিকৃত হাড় ও মাংস একটা পাত্রে রাখিয়া দিলেন । আমি ভাবিলাম, বোধ হয় বাহু করিবার সুবিধা হইবে বলিয়া উহাদিগকে একই পাত্রে রাখা হইল । তদনন্তর বাহুর প্রেরণায় একবার মাত্ৰ দামিনী ঐ সকল হাড় ও মাংসের মধ্য দিয়া চমকিয়া গেল । মনে করিলাম, হাড় ও মাংস দপ করিয়া অগ্নিয়া উঠিবে । কিন্তু পরক্ষণেই ঘাছা দেখিলাম তাহাতে আমারও পর্য্যাপ্ত বিষয়ের অবধি

* ইহাকে ইংরাজীতে বলে electrolysis.

রহিল না। দেখলাম, বিদ্যায় চমকিবামাত্রই হাড়ে মাংসে জোড়াতাড় লাগিয়া বারিবিন্দুগুলি সকলেই পূর্বের আকার ধারণ করিল।* গ্রন্থনতঃ চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। কিন্তু বারবার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া যখন নিশ্চিত হুজিলাম যে, উহা চক্ষুর ভ্রম নহে তখন আমার আনন্দের সীমা রহিল না। ইচ্ছা হইল দর্শকবৃন্দের সঙ্গে আমিও যাত্রাকরের ত্রেড়ির প্রশংসা করি। কিন্তু আমার মনের ইচ্ছা মনেই চাপিয়া রাখিতে হইল। কেন না, তখনই যাত্রাকর পুনরায় এই বিশ্লেষণব্যাপার আরম্ভ করিলেন এবং অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় আমিও ইহা হইতে নিষ্কৃতি পাইলাম না। বলা বাহুল্য বিশ্লেষণ আরম্ভ হইবামাত্রই আমার গংজা-লোপ হইয়াছিল। কতক্ষণ সেরূপ ভাবে ছিলাম, বলিতে পারি না। যখন চৈতন্ত হইল তখন দেখিলাম, আমি আমার কতিপয় স্বজাতীয়ের সহিত একটা কাচের পাত্রে বহিয়াছি। তখনও সকলের চৈতন্য হয় নাই। ক্রমে সকলের চৈতন্য হইলে মানবজাতির উপর বৈরনির্গাতনের পরামর্শ চলিতে লাগিল। পরামর্শের শেষ কি গাড়াইল তাহা আর তোমাদিগকে বিদিত কর। আবশ্যক বিবেচনা করি না।

যাহা হউক এইবার বোধ হয় আমার ভোগের শেষ হইয়াছিল। এক দিন এক জন লোক আমাদিগকে অনাবশ্যক বোধে পরঃপ্রণালীতে নির্মুগ্ধ করিল! আমরাও আর তিলার্দ্ধমাত্র বিলম্ব না করিয়া পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে দিতে দ্রুতগতিতে পরঃপ্রণালী বহিয়া চলিলাম। সৌভাগ্যক্রমে উহা একটি নদীত সহিত মিলিত হওয়ার আমরা পুনরায় নদীগর্ভে আশ্রয় লাভ করিলাম। সেই হইতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, আর সাধ করিয়া বিপদকে ডাকিয়া আনিব না। কেবল ইচ্ছা ছিল, একবার আমার এই জীবন-কাহিনী তোমাদিগকে শুনাইব। সে ইচ্ছা এক্ষণে পূর্ণ হইয়াছে। এইবার তোমাদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া আমার বেহময় জননী ও কন্যকুমির উদ্দেশে চলিলাম।

শ্রীজ্ঞানকীনাথ গুপ্ত।

সংগ্রহ

রাবণের লঙ্কা

আজকাল আমাদের দেশে ঐতিহাসিক তথা সত্যে বিশেষ আলোচনা চলিতেছে। এই আলোচনাসময়ে রাবণের লঙ্কা কোথায় ছিল, তাহার সম্বন্ধেও নানা ভরী উঠিয়াছে। সম্ভ্রান্তি মাত্রাঙ্কের বিখ্যাত ‘ইতিহাস রিভিউ’ পত্রে ঐ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ পাইয়াছে। প্রবন্ধটির নাম “রাবণের লঙ্কা আবিষ্কৃত”। প্রবন্ধের লেখক রাও বাহাদুর সর্দার ঈদুত এম্. ডি, কাইব এম্. এ। লেখক রাবণের লঙ্কা সম্বন্ধে একটা নূতন মত ব্যক্ত করিয়াছেন। আমরা নিম্নে তাহার সম্বন্ধে সারমর্ম সন্ধান করিয়া দিলাম।

রাবণের লঙ্কাপুরী কোথায় ছিল ইহাই রামায়ণের সর্কাপেক্ষা জটিল সমস্যা। বাদিকীর রামায়ণে এ সম্বন্ধে যে সমস্ত তথ্য সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, সে সকল ঐ স্থাননির্দেশের পক্ষে পর্যাপ্ত বাঁজা বিবোচিত হয় না। দুই সহস্রাধিক বর্ষ ধরিয়া যে কিম্বদন্তী চলিয়া আসিতেছে, তাহাতে ভারতের দক্ষিণতম সীমার বাহিরে জলধিবক্ষে লঙ্কা অবস্থিত ইহাই বিজ্ঞাপিত হইতেছে। আধুনিক পণ্ডিতগণ সে কথা খাঁকার করেন না। ঈদুত বৈদ্য বিশেষ বন্ধুতার সহিত রামায়ণের অনেক রহস্যের সমাধান করিয়াছেন, কিন্তু তিনি কেবল কতকগুলি সাধুস্তের সাহায্যে কিম্বদন্তীর কথা সমর্থন করিয়াছেন। সে সাধুস্তও সম্পূর্ণ নহে। নিত্যক আধুনিক মতে রামের লঙ্কানিগূঢ়ার্থ দক্ষিণাতিমুখে যাত্রার কাহিনী কাল্পনিক।

রামায়ণে যে ভৌগোলিক তথ্য সন্নিবিষ্ট হইয়াছে তাহা এসময়ঃ উল্লিখিত হইয়াছে এবং তাহা অসম্পূর্ণ ইহা স্বীকার্য্য; কিন্তু ঐ গ্রন্থে যে সমস্ত তথ্য সন্নিবিষ্ট আছে, তাহাদের সাহায্যে হুজ্রাবের রাজধানী কিচ্ছা ও রাবণের রাজধানী লঙ্কার স্থান নির্দেশ করা সম্ভবে। রামায়ণের প্রথমঃণে যে ঐতিহাসিক সে সম্বন্ধে মতবৈধ নাই। রামের অযোধ্যা ও চিত্রকূট যে আধুনিক অযোধ্যা ও চিত্রকূট তাহা সম্ভবান করা অতি সহজ।

কিচ্ছাক্ষাত্রে কিচ্ছা হইতে চারি দিকে চরপ্রবেশের কথা আছে। ঐ স্থানে চারি দিকের দেশেরও নাম উল্লিখিত হইয়াছে। তাহাতে ভারতবর্ষের মধ্যবর্তী স্থানগুলি সম্বন্ধে ধাধা বলা হইয়াছে, তাহা অজ্ঞানিক বসার্থ। কিন্তু ভারতের বহির্ভূত যে সমস্ত দেশের উল্লেখ আছে, তাহা কাল্পনিক। সীতার অশ্রুসন্ধানার্থ হুজ্রাব কিচ্ছার বহু সৈন্ত সমবেত করেন এবং তথা হইতে চারি দিকে চারি দল পুত পাঠান। তাহাদের অবগতির জন্য তিনি চারি দিকের দেশের নামও করিয়াছিলেন।

প্রথমে পূর্বদিকস্থ জনপদাদির কথা। হুজ্রাব পূর্বদিকে চর পাঠাইবার সময় বলিয়াছিলেন, —“পূর্বদিকে যে সমস্ত বন নদী প্রকৃতি আছে তথায় সর্বত্র তোমরা সন্ধান করিবে। জাগিরদী সরণ, কোণিকা, কালিন্দী, ধনুবা, ধনুনশরীত, সরগুতী, গিলু, বদির প্রায় বহুজনপাদী গোণ, নৈলকাননশোভিত নদী ও কালমহী প্রকৃতি নদী এবং ব্রহ্মবান, বিদেহ, বালন, কাশী, কোশল, মাপধ, মহাপ্রাণ, পুণ্ড ও অঙ্গ প্রকৃতি, আর কোণকারকুনি, ব্রহ্মজতকারকুনি প্রকৃতি স্থানে বনরথের পুত্রবধু রাষ্ট্রেশ্বর শ্রিয়া ভাষা সীতার সন্ধান করিবে।” এ বলে কোণকারকুনি অর্থে যে স্থানে কোণের তত্তৎপাদক কীট জন্তে (সত্তবতঃ আসাম) ; আর ব্রহ্মজতকারকুনি অর্থে যে স্থানে বংশট-ব্রহ্মজতনি বিদ্যমান (সত্তবতঃ ব্রহ্মদেশ)।

আর একদল চ্যক্রে দক্ষিণদিকে প্রেরণ করিবার সময় হুগ্রীব বলিয়া দিয়াছিলেন,—“সহ-
শিখরশোভিত নানাক্রমভাসমাকীর্ণ বিজ্ঞাপর্কত ও একাণ্ড সর্পসংবিত মনোহরঃ সর্পনা, সোমাবরী,
মহামনী, তৃকবেশী প্রভৃতি নবীণগণিতে সজ্জান করিবে। পরে মেকল, উৎকল, দশাবনদর, আত্র-
বন্তী, অবন্তী, বিবর্ত, বটীক, মহিষিক, যৎত, কলিঙ্গ, কৌশিক, প্রভৃতি দেশ সকল সজ্জান
করিবে। তদনন্তর পর্কত নদী ও শুভাসম্বিত দণ্ডকারণ্য, গোমাবরী নদী, দণ্ডককাননমধ্যবন্তী
সোমাবরী প্রদেশ, অজু, পুণ্ড, জোল, পাণ্ড ও কেবল প্রভৃতি স্থানে অনুসন্ধান করিয়া দৈরিকাবি
ধাতুসমূহে মণ্ডিত বিচিত্র সুস্ববিধিষ্ট, নানা পুশকাননমণ্ডিত রমণীয় অয়োমুখ পর্কতে দীভ্যর সজ্জান
করিবে। শুভাকার এসরসলিলা কাবেরী নদীতেও সজ্জান করিবে। তৎপরে মলয় পর্কতের
শিখরদেশে সমাসীন নৃপ্যোর স্তায় দীপ্তিশালী ত্বিচ্ছ্রেষ্ঠ অগত্যাকে বেধিবে। তাঁহার আদেশ লইয়া
বিবিধ ক্রলঙ্করসমাকীর্ণ তাত্রাণী নদী পার হইবে। * * * হে বাবরগণ! তোমরা সেই নদী
পার হইয়া পাণ্ডানগরে একান্তবেষ্টিত নগরের পুরষাঃপ্রিত সুত্মমণ্ডিত বর্কণাট বেধিবে। পরে
সমুদ্রের সঙ্গিহিত হইয়া তাহা সমুদ্রপের উপায় স্থির করিবে। সেই সমুদ্রমধ্যে মহাশ্মা অগত্য কর্তৃক
স্থাপিত বিচিত্র সাজ্জান হুগ্রীবর পরম সৌন্দর্য্যশালী মহেশ্র পর্কত। তৎপরে লজ্জাবীণ।”

তৃতীয় দল চক্রে পশ্চিমদিকে প্রেরণ করা হয়। ঐ দিকে সৌরাষ্ট্র, বাহ্লীক, চন্দ্রভিঃ
প্রভৃতি দেশ ও লাগরের কথা আছে। সিদ্ধুনদীর সম্মুখদেশেও সমুদ্রের কথা উল্লিখিত হইয়াছে।
তদ্যায় শতশিখরসম্বিত সোমপর্কত বিরাজমান। উত্তরদিকে যে চারি দল প্রেরিত হইয়াছিল
তাহাদিগকে যে যে স্থানের কথা বলিয়া দেওয়া হইয়াছিল, তদ্বাধ্য হিমালয়েই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।
ঐ অঞ্চলে য়েসর, পুলিন্দ, নুরসেন, প্রতল, ভরত, কুল, ময়র, কংখোজ, ধবন, শকদিগের নগরাদির
কথা আছে। লেশক মহাশয় জানাওণ হইতে স্নোক উচ্চ করিয়া ইহা দেখাইয়াছেন।

তৎপরে প্রথম লেখক লিখিয়াছেন,—এই ভৌগলিক স্নোকভুলিষ্মে তিনটি আপত্তি
উত্থাপিত হয়। প্রথম ইহার মধ্যে অনেক দেশের নাম আধুনিক। শ্রীধৃত বৈদ্য দ্বিতীয় আপত্তি
উত্থাপিত করিয়া বলেন যে, দণ্ডকারণ্য ও গোমাবরীর নাম একবার পূর্বদিকে ও একবার দক্ষিণ
দিকে এই দুইবার উল্লিখিত হইয়াছে। সম্ভবলৈখক সর্দার কাইব মহাশয় বলেন, রামায়ণের সকল
সংকরণে ইহা লেখিতে পাওয়া যায় না। তাহার নিকট যে সংকরণ আছে, তাহাতে পুণ্ড নামটি
দুইবার উল্লিখিত আছে। তৃতীয় আপত্তিও শ্রীধৃত বৈদ্য উপস্থিত করিয়াছেন। সে আপত্তিটি
এই ;—রাবণ ও তাহার বাসস্থানসম্বন্ধে হুগ্রীব দুই স্থানে দুইটি বিপরীত কথা বলিয়াছেন। এক
স্থলে বলিয়াছেন, সেই “বীচবংশসমুত পাপাচারী নিশাচরের নিবাস কোমার, সে কোন বংশে
জন্মিয়াছে বা তাহার পরাক্রম কিরূপ তাহা আমি কিছুই জানি না।” (রামায়ণ কিঙ্ক্যা ৪১২)
আবার এক স্থলে বলিয়াছেন,—“সেই ভীমে দেবতাদিগের অবধা ব্রাহ্মসাবিগণিত দ্বহাস্তা রাবণের
বাল ইহা শুনিতে পাওয়া যায়।” (ই ৪১২১) লেখক লিখিয়াছেন, ঐ স্নোকটি তাহার নিকট যে
রামায়ণ আছে তাহাতে নাই। *

* আবার কোন কোন রামায়ণে একল পাঠও আছে ;—

সহিসেনন্ত বশ্যন্ত রাবণন্ত দুঃস্বপ্নঃ

ব্রাহ্মসাবিগণতেবাসঃ সহস্রাক্ষসদুহ্যাত্তে।

এখন আগন্তিসম্বন্ধে সম্বন্ধলেশবৎ শ্রীযুত কাইব মহাশয় বলিয়াছেন,—“হামায়ণ ও মহা-
ভারতের মূল তথা ত্রিগ্ন বৌদ্ধধর্মের পূর্ববর্ত্তা কালের ইতিহাস সম্বলনের আর উপাদান নাই ।
হুতগ্রাঃ ঐ সকল দেশের প্রাচীন নাম কি ছিল তাহা আনিবার উপায়ও নাই । কোন কোন
দেশের প্রাচীন নামই চলিয়া আসিতেছে, কোন কোন দেশের নামের পরিবর্ত্তনও ঘটিয়াছে । যে
নাম পূর্বে এক দেশের ছিল, পরে সেই নাম অন্য দেশের হইয়াছে । বেশবিশেষের প্রাচীন নাম
অপ্রতিহতভাবে চলিয়া আসিতেছে বা এক স্থানের প্রাচীন নামে অন্য স্থান খাটিলাভ করিয়াছে
বলিয়া যে সে স্থানগুলি ছিল না তাহা সম্ভব হইতে পারে না । দ্বিতীয় আগন্তির উত্তরে এইমাত্র বলা
বাইতে পারে যে, বৈদেশিকরা আসিয়া কোন দেশে উপনিবেশ স্থাপিত করিলে তাহাদের পক্ষে
বিভিন্ন স্থানের একই নাম রাখা সাধারণ ব্যাপার । তৃতীয় আগন্তির উত্তরে বলা বাইতে পারে
যে, দ্বিতীয় স্থলে হুগ্রীব বাহা গুলিয়াছেন (ক্রমে) তাহাই বলিয়াছেন । যে সময় রামের সহিত
হুগ্রীবের প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল,—তখন হুত্ব জিনি রাবণের সম্বন্ধে সত্যসত্যই কোন তথ্যই
জানিতেন না । কিন্তু রামকে সাহায্য করিতে প্রতিজ্ঞিত হইবার পর তিনি নিশ্চয়ই এই বিষয়ে
অনুসন্ধান করিয়াছিলেন । হুগ্রীবের সেনাপতি হুমুমানই বালির নিকট হইতে রাবণের সম্বন্ধে
যে তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা তিনি লক্ষ্যপক্ষে রাখিয়াছিলেন । “সেই কামরূপী দুর্ভব
রাক্ষসদ্বিপকে বধ না করিলে সাতাপহারা রাবণ নিহত হইবে না, হুগ্রীবও একাকী সেই
রাক্ষসদ্বিপকে ও ক্রুরবৃত্তাব রাবণকে বধ করিতে পারিবেন না । আমি রাবণের সৈন্তবলসম্বন্ধে
বাহ্য বলিতেছি তাহা আমি কখনও দেখি নাই কিন্তু সর্জন্য বানররাজ বালির অনুবাৎ আমি ঐ
কথা শুনিয়াছি ।” তাহা হইলে বানররাজি ভারতের বহু স্থানেই বিকিণ্ডভাবে বাস করিত ।
হুমুমান তাহাদের অনেক উপনিবেশে পরিদ্রবণ করিয়াছিলেন । হুমুমানের সর্জন্য পত্নারাত
ছিল । হুতগ্রাঃ ইহা হইতে অনুমান করা বাইতে পারে যে, এইরূপ লোকের নিকট হইতে হুগ্রীব
পরে রাবণসম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন ।

ভারতের মানচিত্রের প্রতি দৃষ্টপাত করিলে বুঝা বাইবে, কিঞ্চিৎ বিক্ষাপকর্ত্তের উত্তরে
সদা ও বহুদূর পান্ডমে এবং চিত্রকূট পর্ব্বতের পশ্চিম-দক্ষিণে অবস্থিত ছিল । কারণ, রামচন্দ্র
চিত্রকূট হইতে দক্ষিণদিকেই যাত্রা করিয়াছিলেন । হুতগ্রাঃ যদিও চিত্রকূট কিঞ্চিৎ উত্তর-পূর্বে
অবস্থিত ছিল, তাহা হইলেও চিত্রকূট কিঞ্চিৎ পূর্বে অবস্থিত বলা অসঙ্গত হয় নাই ।

চিত্রকূট হইতে রামের কিঞ্চিৎ যাত্রার বিবরণ হইতে চিত্রকূট কোথায় ছিল তাহা জানা
বাইতে পারে । রামচন্দ্র চিত্রকূট হইতে দণ্ডকারণো, শ্রবণ করিয়াছিলেন । দণ্ডকারণো তিনি
এক দুর্গম স্থানে কনিদিগের আশ্রয়স্থান প্রাপ্ত হইলেন । তৎপরে তিনি এক নদীতীরে উপনীত হইলেন ।
এই স্থানে তিনি একটি আশ্রয় বেধিতে পাইয়াছিলেন । আশ্রয়স্থ ভবির নিকট রাম ওহার
অবস্থানের বোগ্যস্থান কোথায় তাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন । সেই ভবি তখন বলিতে বাইতে-
ছিলেন, সেইরূপ তিনি সন্নিবিষ্ট অন্য এক ভবির নিকট রামচন্দ্রকে বাইতে বলেন । তথ্য
কতকগুলি ভবি রামচন্দ্রকে রাক্ষসের উপহ্রবের কথা বলেন । ওহারদের আশ্রয়ের কতদূর পথায়
রাবণ উদ্ভূত করিত সে কথাও তাহারা রামকে জানাইয়াছিলেন । এ জনস্থান সদা ও
সম্মানিনী নদী ও চিত্রকূট পর্ব্বতের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত ছিল । উল্লিখিত তিনটি স্থান

যথাক্রমে কিঞ্চিৎদূর দক্ষিণ, পূর্ব ও উত্তরদিশা ছিল। উহার পশ্চিমদিশা সম্ভবতঃ বনমধ্যেই ছিল। এই দিকে সোয়াটুই কিঞ্চিৎদূর সন্নিহিত বেশ ছিল। দক্ষিণে রামচন্দ্র পশ্চানদীতীর পথে আগমন করিয়াছিলেন। ইহার পরই বাবরজাতির উপনিবেশ ছিল।

ইহার পর কাইব মহাশয় রামচন্দ্রের অরণ্যকাণ্ড হইতে স্রোত উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, হুতীরের আশ্রম হইতে রামচন্দ্র অগস্ত্যের আশ্রমে গমন করিতে গায়েন। তথায় তিনি জানিতে পারেন যে, সেই স্থান হইতে অগস্ত্যের জাত্যের আশ্রম ৩২ মাইল দক্ষিণে এবং তথা হইতে অগস্ত্যের আশ্রম আরও ৮ মাইল দক্ষিণে। ইহার ১০ মাইল দক্ষিণে গোদাবরীতীরে রাম ছই বৎসর বাস করেন। এই স্থান হইতে জানকী রাবণকণ্ঠক অপহৃত হইয়াছিলেন।

লেখক মহাশয় বলিয়াছেন যে, গোদাবরী সম্ভবতঃ চিত্রকূট হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। চিত্রকূট পর্বতের একটি গুহায় গোদাবরী নামে একটি ক্ষুদ্র নদী স্রষ্ট হয়। উহা গুহামধ্যে অধঃস্থিত হইয়া কিছু দূরে বাইরা বাহির হইয়াছে শুনা যায়। এই ব্যাপার রামের গোদাবরীবাস ও তথা হইতে সীতাধরণসমস্তার সমাধান করে।

রাম সুপার্য্য বনে গমন করিলে রাবণ জটায়ুক হত্যা করিয়া সীতাকে হরণ করে। জটায়ুর মুখে রাম তাহার পত্নীহরণকারী কোন্ দিকে গিয়াছে ও তাহার নাম কি তাহা জানিতে পারেন।

রাম পত্নীর সন্ধানে দক্ষিণ দিকে বাত্ম্য করেন। তিনি তথা হইতে ৬ মাইল বাইরা স্রোত-রপে এবং স্রোতারগীর ৬ মাইল দক্ষিণে এক দরীতে উপনীত হইয়াছিলেন। সেই দরীজাত্রে মতঙ্গের আশ্রমে ছিল। মতঙ্গের আশ্রমে এক দিন অবস্থিত করিয়া রাম পশ্চানদীতীর পশ্চিমতীরে উপনীত হইয়াছিলেন। তথা হইতে রাম ৩৮ মাইল পর্বতে হুতীরের নিকট গিয়াছিলেন। এই ৩৮ মাইল পর্বতের সারিখোই কিঞ্চিৎদূর অবস্থিত ছিল। কিঞ্চিৎদূর একটি পাকতঃ উপত্যকার অবস্থিত। লেখক মহাশয় হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে, চিত্রকূট হইতে ৩২ মাইল দক্ষিণে মতঙ্গের আশ্রম এবং মতঙ্গের আশ্রম হইতে এক দিনের পথ (৩২ মাইল) ৩৮ মাইল পর্বত অবস্থিত ছিল। কিঞ্চিৎদূর ৩৮ মাইল পর্বতেই সারিখো অবস্থিত। হুতরঃ চিত্রকূট হইতে আর ৩২ মাইল দক্ষিণে কিঞ্চিৎদূর। তবে কি বরহাতের গুপ্তই স্রোতঃ কিঞ্চিৎদূর স্থান চিত্রিত করিয়া দিতেছে ?

তার এক কথা। কিম্বদন্তী অনুসারে কিঞ্চিৎদূর দক্ষিণাত্যের দক্ষিণপ্রান্তে অবস্থিত বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। বাস্তবিক তত দক্ষিণে যে কিঞ্চিৎদূর ছিল না, তাহার আরও অগ্রাণ আছে। একটা অগ্রাণ এই যে, বিষ্ণুপর্বতের দক্ষিণ দ্বাণু বিধোত করিয়া যে জলতরঙ্গ খেলা করিত, তাহাই লতা ও বিষ্ণুগিরির মধ্যে অবস্থিত ছিল। সীতার সন্ধানে বাইরা হুতরঃ প্রথমে বিষ্ণুগিরির সন্ধান করিয়া লতা হইয়া পড়েন। পরে তিনি অশ্বত্থসংক্রমণসম্বন্ধিতা এক উপত্যকার আসিয়া পথ হারাষ্টা করেন। তথায় সাগুচর হুতরঃকে তাপনী প্রদান্যতা পথ দেখাইয়া নিষ্কান্ত করেন। উপত্যকা হইতে নিষ্কান্ত হুতরঃ সাগর তেজিতে পারেন। সে সাগর বিষ্ণুপর্বতের পাদদেশেই অবস্থিত ছিল। সেই সাগরতটে আসিয়া সীতাধরণের নির্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হইয়াছে বুঝিয়া সাগুচর হুতরঃ স্রোতঃপথেই আগন্ত্যপের সন্ধান করেন। সেই সময় তথায় হুতরঃের জটায়ুর জাত্য সম্প্রতি সহিত সাক্ষাৎ হয়। সম্প্রতিই হুতরঃকে বলেন যে, এই সাগরকে লক্ষ্যবীণ আছে ; তথায় রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে।

হুম্মান দুই লক্ষে ঐ সানর পাথ হুইয়াছিলেন । শ্রীযুত বৈদ্য বলেন, এক ব্যক্তি যেদিকোতে এক লক্ষে এত দীর্ঘস্থান অতিক্রান্ত করিয়াছিল যে, তাহার অনুসরণকারীরা তাহা দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছিল । কাশীতে এক ব্যক্তি হুম্মান সাক্ষ্য দুই লক্ষে ৭০ ফিট বীতীর্ণ পক্ষা পার হইয়াছিল ; ইহা অনেকের এখনও স্মরণ আছে । সন্দর্ভসেবক বলেন, কিছুকিছা বিজ্ঞাপাহাড়ের উত্তর সাহু-বেশে অবস্থিত ছিল । ইহা ডিরকুটের দক্ষিণপ্রান্ত হইতে দূরবর্তী ছিল না ।

সামারগে লক্ষ্য হীণ বলিয়া বর্ণিত । কিন্তু উহাতে কোথাও ঐ হীণের সীমা নির্দিষ্ট নাই । শ্রীযুত বৈদ্য দেখাইয়াছেন যে, লক্ষ্য এক পক্ষতোপরি প্রতিষ্ঠিত ছিল । উহার চারি দিকে বৃষ্ণ ও কানন ছিল ।

সৌভাগ্যক্রমে সামারগ-বর্ণিত এইরূপ একটি স্থান সম্ভ্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে (১২-৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৭ জুলাই তারিখের 'পাইওনীয়ার' উল্লেখ) । ঐ স্থানটি রহত-কুইলিকার সমাচ্ছন্ন । বেঙ্গল ন্যাপপুর রেলপথের বিলাসপুর কানন পাথার পেট্রোবোড স্টেশন হইতে ৮৭ মাইল দূরে পক্ষতশিখরে রাষ্ট্র বকাবনীর দুর্গ নামে একটি দুর্গ বর্তমান । ইহা রেওডারাকোর ব্যাঙ্কবগড় তহশিলে অবস্থিত । একাপ, উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে প্রথম ৮৭ বৎসরের কোন বর্ষে যথাক্রমে তদানীন্তন চিক কমিশনার সার রিচার্ড টেম্পল জলাভূমি উত্তরণ করিয়া ঐ স্থানে ঘাটতে চেষ্টা করিয়াছিলেন । কিন্তু তাহার সূত্রর পক্ষে পতিত হওয়াতে তিনি তথায় উপনীত হইতে পারেন নাই । সেই জলাভূমির এ পার হইতে দুর্গটি কুইলিকাসমাচ্ছন্ন বোথ হই, সেইজন্য উহা বাস্তবিক বস্তু দূরবর্তী তাহা অগণ্য । অধিক দূরবর্তী মনে হইয়া গ্যাকে । এক্ষণে যে ভূমি সম্বন্ধে পরিণত প্রাচীন যুগে সে ভূমি জলময় ছিল বলিয়া অনুমিত হয় । ঐ অঞ্চলে প্রবাদ আছে যে, ঐ দুর্গে অনেক ধনরত্ন আছে । ইহাই কি স্রাবণের লক্ষ্য ?

লেন্থক মহাশয় বিশেষ গবেষণার সহিত স্রাবণের লক্ষ্যের স্থান নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই । কিন্তু বহু সহস্র পূর্বের গ্রন্থবর্ণিত স্থানের অবস্থানস্থান নির্দিষ্ট করা অত্যন্ত কঠিন । তখনকার যোজনের সহিত এক্ষণকার যোজনের ও ক্রোনের পার্থক্য আছে কি না তাহা নির্ণয় করা কঠিন । আমাদের বেশিতে দেখিতে ত ক্রোনের পরিমাণ প্রায় হাজার হাত কমিয়া গিয়াছে । আর, এক কথা বহুকালে ভূগুণ্ডেরও অনেক পরিবর্তন হইয়াছে । সামারগ বুট্রি মনে হয়, বিজ্ঞানীদের পাবদেশে সাগরতরঙ্গ বেলা করিত । এখন তাহার চিহ্নমাত্র নাই । তবে ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বলেন যে, অতি প্রাচীনকালে দাক্ষিণাত্য অঞ্চলটি অগ্ন্যাবর্ত হইতে বিচ্ছিন্ন ছিল । তখন সাগরোত্তরি বিজ্ঞানীদের পাদক্ষেপ প্রকাশিত করিত । তাহার পর কোনও অজ্ঞাত ভূমিবে অত্যাশ্চর্য্য হীণ বারিবিগর্ভে আচ্ছাদিত করে এবং দাক্ষিণাত্য স্রিগা আসিয়া বা উহার উত্তরণে উৎকণ্ঠ হইয়া বিজ্ঞানীদের সহিত সংগৃহ হইয়াছে । কতকাল পূর্বে এ ব্যাপার ঘটিয়াছে, তাহা বলা বড় কঠিন । তবে দাক্ষিণাত্য অতি প্রাচীন দেশ ভূতত্ত্ববিদগণ এ কথা স্বীকার করিয়া থাকেন । যদি ভূতত্ত্ববিদগণের অনুমান সত্য হয়, তাহা হইলে সামারগ-বর্ণিত ঘটনা উক্ত ভৌগোলিক দুর্গটীর পূর্ববর্তী এরূপ মনে করা অসঙ্গত নহে ।

ব্যাধি ও তাহার প্রতিষেধ।

টিটেনাস্—ধনুষ্টকার।

ধনুষ্টকার রোগের নষ্টকোষ্টী উদ্ধার করা এখন সহজসাধ্য নহে। স্বরণ্যাতীত কাল হইতে এই ব্যাধি ভারতে বসতি করিতেছে। চরক বলিয়াছেন,—

“পীড়য়ন্ দ্ধনয়ং গব্য শিরঃ শম্বো ৫ পীড়য়ন্।

ধনুর্ধরময়েদপাত্যাপ্যাক্ষিপেদ্যোহয়েত্তদা ॥”

অতঃপাশ্চাত্য বৃদ্ধা বাইতেছে, চারকীয় যুগেও এতদেশে ইহার আধিপত্য অল্প ছিল না। বয়োধর্ম্মে এই সুপ্রাচীন ব্যাধির তেজোহানি হয় নাই। ইহার সংহারিণী শক্তি আজও বেশ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। বন-পল্লীসমূহে এক ম্যালেরিয়া জ্বরই সহস্রবদন হইয়া লোক গ্রাস করিতেছে। পল্লীবাসীর জীবন ম্যালেরিয়ার তাড়নাই বাত-কম্পিত ধীপনিথার স্তায় সতত সচঞ্চল। ইহা বিবেচনা করিয়াই বোধ হয়, ধনুষ্টকার জনশূন্য পল্লীগ্রামে নিজ প্রভাব সর্বদা প্রকাশ করে না; তবে মধ্যে মধ্যে হৃতিকাগারে গিয়া প্রহৃতি ও শিশুর সংবাদ লইয়া থাকে। জনাকীর্ণ সহরের মূলমণ্ডিত রাজপথগুলিই ইহার বিহারস্থান, এক কলিকাতা সহরে প্রতি সপ্তাহে ইহার আক্রমণে ২০ জনেরও অধিক লোক মানবলীলা সম্বরণ করে। আহত, বিকৃত ও অস্বাভাবিক জনগণের প্রতি ধনুষ্টকারের অসুগ্রহ-দৃষ্টি অধিক। এই ক্ষুদ্র সমরাসন পরিদর্শন করা ইহার আবাল্য অভ্যাস। আঘাতগ্রাপ্ত সৈনিকের দেহ-প্রতিষ্টে হটয়া তাহাকে শাস্তি-নিকেতনে প্রেরণ করিতে এই ব্যাধি সর্বদাই সচেষ্ট থাকে। গত আমেরিকান যুদ্ধে ৮৭৮২২ জন আহত ব্যক্তির মধ্যে ৩৬৩ জনের ধনুষ্টকার প্রকাশ পাইয়াছিল। সম্প্রতি ডাক্তাররা জীবাণুনাশক চিকিৎসা-প্রণালী আবিষ্কৃত করিয়া এই ভয়ঙ্কর ব্যাধি-সকলের গর্ভ ধ্বংস করিয়াছেন। কিন্তু তাহা বলিয়া ইহারা রণে ভল্ল দিবার পাত্র নহে। বাসগৃহ বেক্রপ রক্ত-কাটা দি দ্বারা স্প্রিট না রাখিতে পারিলে প্রবল বাত্যা আসিয়া তাহাকে ভয় করে, এই সঙ্কট-সমুল স্থানে বাস করিয়া দেহ-গেহ তেমনিই সুনিয়মাদির সহারে সুরক্ষিত না করিলে অলক্ষ্যে ঐ সকল রোগ আসিয়া তাহাকে পাতিত করিয়া ফেলে।

ধনুষ্টকার রোগে শরীর দুর্দমনীয়রূপে আকৃষ্ট হইয়া ধনুর্ধ্ব বক্রাকৃতি ধারণ করে। সমুখ, পশ্চাৎ ও পার্শ্ব, সকল দিকেই সে বক্র হইতে পারে। সমুখ দিকে বক্র হইলে পুরোষ্টকার (Emprosthotonos), পশ্চাৎ দিকে বক্র হইলে পশ্চাষ্টকার (Opisthotonos) এবং পার্শ্বদিকে বক্র হইলে পার্শ্বোষ্টকার (Pleurosthotonos)

নামে ইহা অভিহিত হইয়া থাকে । কিন্তু এই ত্রিবিধ টক্সানের মধ্যে পণ্ডাটিকারই (Opisthotonos) সচরাচর পরিলক্ষিত হয় । কোন কোন ক্ষেত্রে দেহ ঘটিবৎ কঠিন হইয়া থাকে । আয়ুর্কেন্দ্র শাস্ত্রে মহর্ষি চরক এই অবস্থাকে দস্তক-রোগাখ্যা প্রদান করিয়াছেন । আর্দ্র ভূমিতে শয়ন, অত্যধিক শীত-সেবা অথবা কোন প্রকার বাহু আঘাতই এই রোগের নিদান মধ্যে গণনীয় হইত ।

কিন্তু কিছু কাল হইল, নিকোলিয়ার নামক জটনৈক বৈজ্ঞানিক প্রমাণ করিয়াছেন যে, এই রোগের একপ্রকার জীবাণু আছে । ঐ জীবাণুগণ (Tetanus Bacillus) দেখিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরল রেখার স্ত্রাঘ ; তবে উহাদের উত্তর প্রান্ত গোলাকার । জঘতাক বাজাইবার ঘটির সহিত ইহাদের অবস্থার অনেকটা সৌসাদৃশ্য আছে । এই সকল কালরূপী জীবাণু দূষিত জলে অথবা স্নানপথে ধূলিকণার মধ্যে লুপ্তায়িত থাকে । শরীরের কোন স্থান কাটিয়া যাইলে অথবা দলিত, পেষিত, আহত বা দগ্ধ হইলে উহারা ভ্রমণা দিয়া দেহে প্রবিষ্ট হইতে পারে । এই ছুট অণুদেহিনিচর দেহে সামান্ত একটু কত দেখিলেই ভ্রমণে অল্পপ্রবিষ্ট হইবার সুযোগ অল্পসন্ধান করে । শরীরের কোন স্থানের বন্ধ অল্প উন্মীয়া যাইলে কিংবা কোন স্থানে পেরেক, আগপিন্ বা তথ্য কোন বস্তুপ্রাণ অস্ত্র বিদ্ধ হইলে ইহারা ঐ চক্ষুর অগোচর বন্ধ দিয়া অনায়াসে দেহাভ্যন্তরে চলিয়া যায় । ডাক্তার স্নেইর বলেন, কোন একটি ধগুট্টকার রোগীর শরীরে ক্ষতাদি কিছুই দৃষ্ট হয় নাই । কিন্তু তাহার জীবনাবসানের স্বরকাল পূর্বে বৃদ্ধাঙ্কুরের অগ্রভাবে একটি কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন দেখা গিয়াছিল । তখন অল্পসন্ধান প্রকাশ পাইল যে, রোগাক্রমণের কতিপয় দিবস পূর্বে ঐ স্থানে একটি কণ্টক বিদ্ধ হয় । এই সামান্ত ঘটনার প্রতি রোগীর মন আদৌ আকৃষ্ট হয় নাই ; স্ততরাং সে চিকিৎসকের নিকট ইহা প্রকাশ করা অনাবশ্যক মনে করিয়াছিল । ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ‘ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নাল’ নামক পত্রে এইরূপ আরও কয়েকটি রোগীর কথা লিখিত আছে । ধগুট্টকার রোগ সাধারণতঃ ছই ভাগে বিভক্ত । যে সকল স্থলে আঘাতপ্রাপ্তির পর রোগ প্রকাশ পায় তাহাকে আঘাতজনিত (Traumatic) ধগুট্টকার বলে । অল্প আঘাতের কোন চিহ্ন লক্ষিত না হইলে এই রোগ স্বভোজাত (Idiopathic) ধগুট্টকার নামে কথিত হয় । কিন্তু পেশোক্ত ক্ষেত্রে শরীরের যে কোন দ্বার দিয়া রোগজীবাণু প্রবিষ্ট হইয়াছে বলিয়া ধারণা করিতে হইবে । এই রোগের জীবাণু দেহাভ্যন্তরস্থ না হইলে কখনই প্রকৃত ধগুট্টকার রোগ জন্মে না । আর্দ্র ভূমিতে শয়নোপবেশন, শীতভোগ প্রভৃতি এই রোগের উদ্বীপক কারণ মাত্র । হৃদিকা-

গারে প্রসূতি ও নবজাত শিশুর এই ব্যাদি যথেষ্ট হইয়া থাকে। এক বোম্বাই সহরে ৩ বৎসরে ২৩২ জন প্রসূতি এই রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল। প্রসূতির প্রসবদ্বার ও শিশুর নাসিকাত দিয়া এই জীবাণু সেহনধ্যে উপনীত হয়। অস্বাস্থ্য-কর স্থতিকাগুহে বাস করিলে সন্তান ও প্রসবিত্রী—উভয়েরই এই রোগপ্রবণতা বৃদ্ধি পায়। সন্তান জন্মিষ্ট হইবার পর তই সপ্তাহমধ্যেই রোগ প্রকাশ পাইবার সম্ভাবনা অধিক থাকে। নবপ্রসূতগণের মধ্যে অনেক প্রসবের পর সপ্তাহকাল মধ্যেই রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে। ওয়ারিং নামক একজন বহুদর্শী ব্যক্তি দুই শতাধিক ধুতুকারগ্রস্ত প্রসূতির হিসাব রাখিয়া দেখিয়াছেন, প্রসবের প্রথম দিনে ৭ জন, দ্বিতীয় দিনে ৩২ জন, তৃতীয় দিনে ২২ জন, চতুর্থ দিনে ২৩ জন, পঞ্চম দিনে ২২ জন, ষষ্ঠ দিনে ৩২ জন, সপ্তম দিনে ১৫ জন, অষ্টম দিনে ১৪ জন, নবম দিনে ১৫ জন, দশম দিনে ১৪ জন, একাদশ দিনে ২ জন, দ্বাদশ দিনে ২ জন, ত্রয়োদশ দিনে ৪ জন, চতুর্দশ দিনে ১ জন, পঞ্চদশ দিনে ১ জন এবং অষ্টাদশ দিনে ১ জন রোগাক্রান্ত হইয়াছিল। পশ্চিমভারতীয় বীপপুত্রসমূহে নিগ্রোদিগের মধ্যে প্রসবগারে এই রোগের প্রাদুর্ভাব সর্বাপেক্ষা অধিক।

ধুতুকার রোগের জীবাণু দেহপ্রবিষ্ট হইয়া তথায় বংশবৃদ্ধি করতঃ এক প্রকার বিষপদার্থ উৎপন্ন করে। এই বিষপদার্থ দ্বারা মেরুদণ্ড উত্তেজিত হইলে রোগলক্ষণ সকল প্রকাশ পায়। উষ্ণপ্রধান স্থানে ইহার প্রভাব অধিক। কিন্তু সার জেমস্ সিমসন্ ইহা স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, শীত গ্রীষ্মের সহিত ইহার বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই। তবে ইহা দৃষ্ট হইয়াছে যে, যুরোপ প্রভৃতি শীতপ্রধান দেশের লোক গ্রীষ্মপ্রধান দেশে আসিয়া বাস করিলে তদ্রূপে অধিবাসী অপেক্ষা নবাগত-গণ ইহা দ্বারা অপেক্ষাকৃত অল্প আক্রান্ত হইয়া থাকে। পূর্বকালে লোক সকল মনে করিত, পূর্বব অপেক্ষা রমণীগণ এই রোগে অধিক পীড়িত হয়। কিন্তু সে ধারণা ভ্রমাত্মক। পুরুষের প্রতিই ইহার অমুগ্রহ-দৃষ্টি অধিক। ১০৬৯ জন ধুতুকার-রোগীর তালিকামধ্যে ৮২৯ জন পুরুষ ও ২৪০ জন স্ত্রীলোক থাকিতে দেখা গিয়াছে। কার্ণিং ১২৮ জন রোগীর তালিকা প্রস্তুত করিয়া দেখিয়াছেন, তন্মধ্যে ১১২ জন পুরুষ ও ১৬ জন স্ত্রী ছিল। গ্রাসগো সহরের অধ্যাপক লরি মহোদয় যে ২২১ জন রোগীর কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যেও রমণী অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা অধিক।

“লক্-জ” (Lock jaw) এই রোগের প্রধান লক্ষণ। রোগ প্রকাশের পূর্বে রোগী মুখব্যাবান করিতে কষ্টানুভব করে; ক্রমে নিম্ন দ্ব্যধির মাংসপেশী সকল

আড়ষ্ট ও সঙ্কুচিত হয়। এই অবস্থাকে ডাক্তারেরা “লক্-অ” বলিয়া থাকেন। এই সময়ে রোগী কোন পথ্যই আর গলাধঃকরণ করিতে পারে না। ধুতুকারের সমস্ত লক্ষণ বর্তমান থাকিয়া যদি ঐ আদ্য লক্ষণের অভাব থাকে, তবে তাকে কখনই প্রকৃত ধুতুকার রোগ বলা যায়ইতে পারে না। অপর পক্ষে মূল লক্ষণ লক্-অ প্রকাশ পাইলে রোগী ধুতুকারাক্রান্ত হইয়াছে, ইহা এক প্রকার স্থির সিদ্ধান্ত করা যায়। রোগবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শরীরের সমস্ত পেশী আক্ৰান্ত হইতে থাকে। একবার আক্ষেপের পর কিছুক্ষণ বিরামাবস্থার থাকিয়া আবার আক্ষেপ উপস্থিত হয়। রোগ অত্যধিক বৃদ্ধি পাইলে বিরামকাল আর লক্ষ্য করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। তখন রোগীর গাত্রস্পর্শ করিলে বা শরীরে প্রবল বাতাস লাগিলে “ফিটু” হইতে থাকে। এই মাংসপেশীর আক্ষেপ দমন করা রোগীর সাধ্যাতীত। বল-প্রকাশ করিলে আক্ষেপ স্থিগ্ধ বর্দ্ধিত হয়। আক্ষেপকালে রোগী এক প্রকার অস্পষ্ট কাতরোক্তি প্রকাশ করে। হৃতিকাগারে শিশুনিগের এই রোগ হইলে প্রথমেই শিশুর চোয়াল ধরিয়া যায়। সে তখন স্তম্ভপানে অসমর্থ হয়। ক্রমে তাহার সমস্ত শরীর আড়ষ্ট ও আকুঞ্চিত হইতে থাকে। শিশুর হস্তের মুষ্টি দৃঢ়-রূপে বদ্ধ থাকে এবং তাহার গ্রীবাটিও সঙ্গে সঙ্গে শক্ত হইয়া উঠে। এই রোগের ভাবি ফল নিতান্ত মন্দ। রোগীর প্রাণ রক্ষা হওয়া এক প্রকার অসম্ভব বলিলেও চলে। তবে রোগলক্ষণ মুহুগতি হইলে বা রোগী দশ দিবস জীবিত থাকিলে আশার দীপবর্ত্তিকা উজ্জ্বল হইলেও হইতে পারে। পাঁচ দিবসের মধ্যেই অধিকাংশ রোগী প্রাণ ত্যাগ করে। হাস্যরোধই প্রারম্ভ; মৃত্যুর কারণ হইয়া থাকে।

ধুতুকার সংক্রামক ব্যাধি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং এই রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে এক পৃথক্ অন্ধকার গৃহে রাখিবার ব্যবস্থা করিবে। বাতালোকপূর্ণ স্থানে ধুতুকাররোগীকে রাখিলে তাহার রোগ বৃদ্ধি হয়। পরিচর্য্যাকারী ভিন্ন ঐ ঘরে অপর লোকের প্রবেশ নিষিদ্ধ। রোগীর ক্তমধ্যে ও মূত্রে এই রোগের জীবাণু দৃষ্ট হয়। অতএব রোগীর ক্ত “ড্রেস” করিবার সময় বিশেষ সতর্ক থাকিবে। যে স্থানে রোগীর মূত্র নিষ্কিপ্ত হয়, সে স্থান অবিলম্বে কার্বলিক সোশন দ্বারা ধৌত করিবে। রোগীর সমস্ত শব্দ্যবসনাদি দগ্ধ করাই ব্যবস্থা। পরিচর্য্যাকারী নিজ হস্ত বিশোধক ঔষধ ও সাবান-জলে উত্তমরূপে ধৌত করিয়া খাত-পানীর গ্রহণ করিবে। যে গৃহে ধুতুকার-রোগীর মৃত্যু হয়, তাহা ঔষধ-জলে বিশোধিত ও চূর্ণকাম করিয়া ব্যবহার করাই সমীচীন। ধুতুকার-জীবাণু সাধারণতঃ বায়ুত্যাগিত হইয়া পৃথিবীপাশে সঞ্চিত ক্তমধ্যে প্রবেশিত হয়। ক্তস্থান কার্বলিক

অয়েল বা তৎসং কোন জীবাণুনাশক ঔষধদ্বারা সর্বদা আকৃত করিয়া রাখিলে রোগাক্রমণের ভয় থাকে না। সামান্য আঁচড়ও উপেক্ষণীয় নহে। কোন স্থান একটু কাটিয়া গাইলে বা দণ্ড হইলে অবিলম্বে সতর্ক হইবে। কাচে কাটিয়া গিয়া ধহুইকার হইতে শুনা গিয়াছে। ফলতঃ এই সকল আগন্তুক আত্মরক্ষণিক জীবাণুর প্রবেশ-দ্বার অর্গলবদ্ধ রাখিলে অনিষ্টাপাতের আশঙ্কা থাকে না। ডাক্তার ডা-কাস্টা (Da-casta) বলেন,—

“Perfect asepsis surgical procedures means freedom from tetanus as surely as it means freedom from septicæmia.”

আমাদের দেশের অনেক লোক শরীরে সামান্য একটু ক্ষত হইলে বড় একটা গ্রোহ করেন না। অপরিষ্কৃত জলে ক্ষত ধৌত করিলে বা ক্ষত অনাকৃত রাখিলে, ঐ জল বা ক্ষতের পরিবেষ্ট বায়ু কি ভাবে ক্ষত দূষিত করিয়া তুলিতে পারে, তাহা তাঁহাদের মনে কখনই উদয় হয় না। আবার ইহাও দেখিতে পাই, কাহার কোন স্থানের চর্ম বিচ্ছিন্ন হইল, অথবা কাটিয়া গাইল, এমনই তিনি তৎস্থানের রক্ত রুদ্ধ করিবার জন্য রাস্তা হইতে কিঞ্চিৎ মাটি লইয়া ক্ষতস্থানে সংযুক্ত করিলেন। এইরূপ নির্মুখিতাবশতঃ আমরা অনেক সময় অনেক রোগকে সাধারণে আত্মস্থান করিয়া থাকি। এতদ্বন্দ্বিত জনসাধারণের মধ্যে বীজাণুতত্ত্বের আলোচনা নাই বলিলেই হয়। আমাদের বেশবাসিগণ এই সকল অবস্তা-জাতব্য বিষয় শিক্ষা করিয়া তাঁহাদের দ্বিষ্ট মস্তিষ্ক উত্তপ্ত করিতে সক্ষম নহেন। যে সময়ক্ষেপ করিয়া তাঁহারা এতদ্বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিবেন, সেই সময়টুকু সবাঞ্ছাবে বসিয়া পরছিদ্রাধুসরণ ও পরনিম্না করিয়া কাটাইতে পারিলেই তাঁহারা সুখী। বিজ্ঞানালোকদীপ্ত যুরোপের রমণীগণও এই সকল জ্ঞানচর্চা করিয়া থাকেন। কিছুদিন পূর্বে সংবাদপত্রে পড়িয়াছিলাম, কনাসী দেশের রাজধানী প্যারিস সহরে এক বিধবী বালা একটি বৃহৎ বাসভবন নির্মাণ করিয়াছেন। ঐ অট্টালিকামধ্যে তিনি বসতি করেন। বিবিধ প্রক্রিয়া দ্বারা যে বায়ু বীজাণু-মুক্ত করা হইয়াছে, তাহাই ঐ গৃহে প্রবেশ করিতে পারে। খাদ্য পানীয়াদিও বীজাণুশূন্য না করিয়া ঐ রমণী গ্রহণ করেন না। তিনি যে স্থানে পদচালনা করেন, তৎস্থানও বীজাণুশূন্য। অবশ্য এই রমণীর ন্যায় বীজাণুবাধুগ্রস্ত হইতে আমি সকলকে উপদেশ দিতেছি না। এইরূপ অতিবুদ্ধি ব্যয় করিলেও ত্রে কেহ হনুমান্ বিতীর্ণণের ন্যায় চিরজীবী হইবে, তাহাও বলিতেছি না। “সর্বমত্যন্তং গর্হিতম।” যে সকল স্বাস্থ্যবিধি মান্য করা আমাদের সাধ্যাতীত নহে, তাহাই

পালন কর; তাহা হইলে অনেক রোগের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিবে ।

আর্য্য ভূমিতে বাস, অনাবৃত গাত্রে হিম-ভোগ প্রকৃতি ধনুর্ঈকার রোগের উদীপক কারণগুলি সর্বথা পরিহার্য্য । হৃতিকাগারের দোষে এতদ্বন্দে অনেক প্রহৃতি ও শিশু অকালে ধনুর্ঈকার রোগে মারা পড়ে । ঠংল ও ওয়েল্‌সে শিশুর মৃত্যুর হার শতকরা ৮ ; অপর পক্ষে আমাদের দেশে শতকরা ৪৮টি শিশু অতি শৈশবেই প্রাণত্যাগ করে । এ দেশে সাধারণতঃ যেকোনভাবে হৃতিকাগার নির্মিত হয়, তাহাতে তাহাকে “ঘমাগার” বলিলেও বোধ হয় সোধ হয় না । সেই পুতিগন্ধবৃক্ক দারুণ অস্বাস্থ্যকর হৃতিকাগারের দোষে কত শত ক্ষুদ্র শিশু অকালে চলিয়া যায়, কে তাহার সংখ্যা করে ? আমরা নিজ নিজ বাসগৃহটি যাহাতে পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন থাকে, যাহাতে উহার মধ্যে আলোক-বায়ু সমানভাবে প্রবেশ করিতে পারে, তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া থাকি । আর্য্য মৃত্তিকাতে লয়ন করিলে পীড়া হইতে পারে, এই ভয়ে খাট বা পর্গাঙ্কোপরি লয়ন-স্থান নির্দেশ করি । কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সবজাত শিশুর ঐ সকল সুখ-শান্তির দিকে আমরা একবারও কিরিতা চাহি না । আমরা প্রকাশ করি, শিশু আমাদের বড় আদরের সামগ্রী, শিশুকে আমরা প্রাণতুল্য ভালবাসি । শিশু জন্মগ্রহণ করিলে আমরা কত আনন্দোৎসব করিয়া থাকি, কত বন্ধু-বান্ধবকে ভূরিভোজনে পরিতুষ্ট করি—কত সেবতার পূজা করি । শিশুর মৃত্যুতে আমরা কাঁদিয়া আকুল হই, সংসার শূন্য দেখি । কিন্তু শিশুকে জীবদশায় গৃহ-প্রাপ্তিগে শীত-বাতসমাকুল, শুষ্ক খর্জুরপত্রাচ্ছাদিত এক জঘন্য স্থানে রাখিয়া উহার অকাল-মৃত্যুর হেতুভূত হইয়া থাকি । হায় ! হায় ! কিমান্‌চর্য্যমতঃ পরম্ ।

বাড়ীর মধ্যে যে ঘরটি সন্ধ্যাপেক্ষ ভাল, যে ঘরের মেঝে খটখটে এবং যে ঘরে রৌদ্র ও আলোক সমানভাবে প্রবেশ করে, সেই ঘরই হৃতিকাগার হওয়া উচিত । আমাদের দেশে একটা কুসংস্কার আছে যে, হৃতিকাগার হইলেই ঐ স্থান অন্তর্ভুক্ত হয় । যে স্থানে আমাদের বংশধর ভূমিষ্ঠ হইবে, সে স্থান যদি অন্তর্ভুক্ত হয়, সে স্থান যদি অপবিত্র হয়, তবে আমরা কাহার সুখ-শান্তির জন্য এই অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া কোটা-বালাখানা প্রস্তুত করি ? অতএব জ্ঞানচক্ষু উদ্বীলিত করিয়া দেখ, কুসংস্কার ত্যাগ কর, যাহাতে হেলার শিশুর জীবন নষ্ট না হয়, তৎপাক যত্নবান্ হও । শীতের দ্বিতীতে এক বিলু ঠাণ্ডা লাগিবার ভয়ে আমরা রাশি রাশি উষ্ণবস্ত্র পরিধান করিয়া ঘরের মধ্যে বসিয়া থাকি, আর নবনীত-কোমল

শিশুকে অবাধে অনাকৃত বাহিরের কোন এক স্থানে আর্জ মুক্তিকার উপরে একখানি মলিন ছিন্ন কছা বা মাসুর পাতিয়া ফেলিয়া রাখি। শিশুর শক্তি কতটুকু? সে কতকণ সেই শীত-বাতের সহিত সংগ্রাম করিতে সমর্থ হয়? সন্ধ্যার প্রাকালে অল্প শিত ভূমিষ্ঠ হইল, পরদিন প্রাতে শুনিলাম, শিশুটি মারা গিয়াছে। ক্ষুদ্র শিশু সারা রাত্রি হিম ভোগ করিয়া বরজ্জ, অর, পক্ষাবাত, বাত অপবা ধুইকার রোগে মারা পড়িল, আর ভ্রমাক আমরা ছেলেকে “পেচোর” পাইয়াছিলাম বলিয়া মনকে প্রবোধ দিলাম। বাহিরে হতিকাগার প্রস্তুত করিতে হইলে কতকগুলি বিষয়ে লক্ষ্য রাখা নিতান্ত প্রয়োজন। স্থানটি অপেক্ষাকৃত উচ্চ, ঝটখাটে এবং প্রশস্ত হওয়া আবশ্যক। উহার নিকটে কোন নালা নর্দমা বা চূর্ণকমর স্থান থাকিবে না। ঘরটি দীর্ঘে দশ বায় হাত এবং প্রস্থে ৬।৩ হাত হইলে ভাল হয়। ঘরখানি একপভাবে প্রস্তুত করিবে যে, কোন ক্রমে উহার মধ্যে হিম প্রবেশ করিতে না পারে। কিন্তু ঐ সঙ্গে বায়ু গতাগত্যের জন্য প্রশস্ত জানালা রাখিতে যেন ভুল না হয়। বিলাতের কোন এক সরকারি প্রসবাগারে প্রথম প্রথম ভূমিষ্ঠ হইবার পর এক সপ্তাহের মধ্যে অনেক শিশু মারা পড়ে। শিশুর মৃত্যুর কারণ অসুস্থকান করিতে গিয়া তদ্রূপ প্রথিতনামা চিকিৎসকগণ বুঝিলেন যে, উক্তগৃহে আবশ্যিক বায়ু গমনাগমনের অভাব হইতেছে। ঐ অভাব দূর করিবার সঙ্গে সঙ্গে ঐ শিশুর মৃত্যুসংখ্যার অনেক হ্রাস হইল। বিভ্রম বায়ুই আমাদের জীবন। কক, কাশাদি-চিহ্নিত, মূত্রগন্ধে আমোদিত, বাতালোকবিহীন গৃহমধ্যে বাস করাইলে স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন লাভের আশা অসম্ভবপর। কত দিনে আমাদের অজ্ঞানানুকার ঘুচিবে, তাহা অগাধীর জানেন।

শিশুর শয্যাবসনাদির পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি দৃষ্টি রাখাও নিতান্ত আবশ্যক। আমাদের দেশের গৃহলক্ষীদের এতদ্বিষয়ে আদৌ দৃষ্টি নাই। কোন নবীন ইংরাজ-জননীর শয্যা-বসন দেখিয়া তাহাকে নবপ্রস্থ বলিয়া মনে করা যায় না। অপর পক্ষে এতদেশীয় প্রহৃতগণ যে কক্ষে শিশু-সন্তান লইয়া বাস করেন, তন্মধ্যে প্রবেশ করিলে সুহৃৎ কাল ও থাকিতে ইচ্ছা হয় না। হতিকাগারে শিশুর ভাগ্যে কয়েকখানি মলিন কছা বা বস্ত্রখণ্ড ভিন্ন বড় কিছু মিলে না। প্রহৃত ও শিশুর পরিচর্যা করিবার জন্য যে পরিচারিকা নিযুক্ত হয়, তাহার পরিবেশ বস্ত্রখানিও মসিকৃৎকর্ণ। শিশু অনেক সময় পরিচারিকার ক্রোড়েই শায়িত থাকে। অপরিষ্কৃত শয্যা-বসন ধুইকার রোগের অন্যতম কারণ। ঐ সকল মলিন বসনে রোগ-বীজাণু লিপ্ত থাকা অসম্ভব নহে। পরীক্ষায়ে সচরাচর এক খণ্ড চোঁচাড়ির দ্বারা শিশুর নাড়ী

কাটা হইয়া থাকে । এই প্রথা অতিশয় দূষণীয় । নাড়ী কাটার দোষে এবং নাড়ীকৃত অপরিষ্কৃত রাখিলে শিশুদিগের প্রায়ই ধমুটেকার রোগ হইয়া থাকে । একখানি তীক্ষ্ণধার কাচি পরিশোধক জলে কিছুকণ নিমজ্জিত রাখিয়া, পরে ঐ কাচি দ্বারা নাড়ীচ্ছেদ করাই শ্রাব্যত্বা । ক্ষত-স্থান অনাবৃত রাখিবে না । কোন একটি উগ্রতাবিহীন জীবাণুনাশক ঔষধদ্বারা ক্ষত “ড্রেস” করিবে । “ড্রেসিং” সিল্ক বা চূর্ণকবুজ হইলে তৎক্ষণাৎ উহা পরিবর্তিত করিতে হইবে ।

কিছুদিন হইল, কোটানি ও টিজোনি নামক দুই জন বৈজ্ঞানিক ধমুটেকারপ্রসূত জীবের রক্তরস হইতে একপ্রকার ঔষধ আবিষ্কৃত করিয়াছেন । ইহাকে ধমুটেকারের “ট্যানুস্‌টক্সিন” (Titanus anti-toxin) বলে । রোগ প্রকাশ পাইবার পূর্বে এই ঔষধ হস্ত পিতকারীর দ্বারা যকনিমে প্রযুক্ত হইলে রোগাক্রমণের ভয় থাকে না । এই চিকিৎসা এখনও পরীক্ষাধীন রহিয়াছে ।

শ্রীস্বরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ।

৪৭১২ নং ক্রামবাজার ষ্ট্রট, কলিকাতা

শ্রীগোরাচ প্রেসে

শ্রীঅধরচন্দ্র দাস কর্তৃক মুদ্রিত ।



শ্রী ব্রহ্মমোহন ঘোষ ।

মহারাত্রী ।

উত্তরে স্মার্ট ও সাতপুতা পর্বত, পশ্চিমে আরব-সমুদ্র, দক্ষিণে কর্ণাট প্রদেশ এবং পূর্বে বরদা নদী, এই চতুর্দিশীয়ার মধ্যবর্তী প্রদেশ মহারাষ্ট্র নামে খ্যাত। দক্ষিণাপথ মুসলমানের শাসনাধীন হইবার পর এই প্রদেশের একাংশ বিজাপুরের অধীন এবং অপরাংশ আহমেদনগর রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। শাহজাহান পাদশাহ আহমেদনগর রাজ্য ধ্বংস করেন। মহারাষ্ট্র-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা শিবাজির অত্যাধুনিক-কালে মহারাষ্ট্রকৃষির একাংশ বিজাপুরের অধীন এবং অপরাংশ মোগল-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

মুসলমানের শাসন প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার পরেও মহারাষ্ট্র দেশে হিন্দুর প্রাধান্য অনেক পরিমাণে অব্যাহত ছিল। তাঁহারা সর্বদা বিশিষ্ট রাজকার্যে নিযুক্ত হইতেন। হিন্দু কর্মচারীদের হস্তেই রাজসংগ্রহের ভার সম্পূর্ণ ন্যস্ত ছিল। এই সকল রাজকর্মচারীর মানা প্রেরিত ছিল। শাসন-সৌকর্য্যের জন্য মহারাষ্ট্র দেশ নানা জিলায় বিভক্ত ছিল। এক এক জিলায় রাজস্ব সংগ্রহার্থ এক একজন দেশদূত নিযুক্ত থাকিতেন। ইহারা পারিভ্রমিকরূপে সংগৃহীত রাজস্বের দশমাংশ গ্রাস্ত হইতেন। প্রয়োজন হইলে দেশদূতকে সেখানী পরিভ্রাম্য করিয়া এতর স্বার্থসংরক্ষণকল্পে তদবধিও ধারণ করিতে হইত। মুসলমান দেশবিপত্তিগণ অনেক সময় তাঁহাদিগকে জাহঙ্গীর প্রদান করিতেন।

মহারাষ্ট্র-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা মহাপুরুষ শিবাজী এইরূপ একজন জাহঙ্গীরদারের পুত্র। জুহু কীট বহুকালের পরিশ্রমে ধীরে ধীরে যোজনব্যাপী ঘাঁপনির্মাণ করে; উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের জলন্ত অবতার শিবাজী চৌত্রিশ বৎসরব্যাপী অসৌক্য সাধনার প্রবলপরাক্রান্ত মোগল পাদশাহ এবং বিজাপুরবিপত্তিকে পর্যাবৃত্ত করিয়া মহারাষ্ট্র দেশে অভিন্নব হিন্দু-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন।

মুসলমান শাসন-কর্তৃপক্ষ মহারাষ্ট্রীয়গণের দহাহতা এতদ পূর্বক শাসন-কার্য্য নিরূপ করিতেন; তাঁহাদের শাসনে দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল; প্রজাতুল ধন-বানের অধিকারী ছিল। ওষাপি মহারাষ্ট্রের মোগলের শাসনে সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই। অনেক সময় মোগলশাসন তাহাদের স্বার্থ ও

সময়ের পীড়াদায়ক ছইত, তাহাদের জনগণের অন্তর্ভলে রাষ্ট্রীয় স্বাভিমান্যভের আকাঙ্ক্ষা বিস্তারিত ছিল। জুকারাম ও একনাথ প্রভৃতি ধর্ম্মাচার্য্যগণের উদ্যোগনার মহাপ্রাণ্ডী আভির ধর্ম্মজ্ঞান সমধিক বর্জিত হয়; তাহারা ফলে তাহাদের রাষ্ট্রীয় স্বাভিমান্যভের আকাঙ্ক্ষা প্রবল ছইয়া উঠে। এইরূপ সময়ে ছইটি কারণে তাহাদের জনগণ আকাঙ্ক্ষা জরিস্থতাব ধারণ করে। প্রথম—ধর্ম্মাচার্য্যগণের কঠোর হিন্দুধর্ম্মের অবমাননা ও হিন্দু জাতির পীড়ন; দ্বিতীয়—মহাপুরুষ রামদাস কঠোর অষ্টগর্ভ উপদেশ প্রদান।

মহাপ্রাণ্ডী-ধর্ম্মের বিস্তার, দেব, ব্রাহ্মণ ও গোবন-রক্ষা এবং স্বজাতীয়বিগের সুখসম্মানবর্জনকল্পে রামদাসের মন্ত্রশিবা শিবাজী উদ্ভিত হইলেন এবং ১৬৪৬ খৃষ্টাব্দে তোরণা দুর্গ অধিকার করিয়া মহারাষ্ট্রীয় সাম্রাজ্য স্থাপনার স্বরূপাত করেন। শিবাজী মহাদেবী ভবানীর পরম ভক্ত উপাসক ছিলেন। তিনি বলিতেন, আমি ভবানীর আদেশে এই মহারাষ্ট্র-রাজ্য স্থাপনকল্প ত্রুতী ছইয়াছি। ঈশ্বর স্বগতীয় ধর্ম্মবিদ্যাসই নগণ্য জায়গীরদারের পুত্র শিবাজীকে যুগ্মেয় অর্জনয় মাওলী সৈন্তগণ যুদ্ধলম্বানের চিরবিজয়িনী শক্তির সম্মুখীন ছইতে সাহসী করে, তাহার অতুল বিক্রম এবং অসামান্য ক্ষমতা বিপর্য্যস্ত করিয়া মহারাষ্ট্রের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ করে। শিবাজী প্রতি বৎসর পরৎকালে মহা আড়ম্বরে দশহুবা ভবানীর পূজা করিয়া দিগ্বিজয়ে বহির্গত ছইতেন। তিনি সমস্ত জীবন অপূর্ণ পরাক্রমে ও অলৌকিক অধ্যবসায়ে এই দিগ্বিজয়ে নিরত ছিলেন এবং তাহার ফলে দিল্লী ও বিজাপুরের শাসন বিলুপ্ত করিয়া দৈর্ঘ্যে চারি শত মাইল এবং বিস্তারে এক শত কুড়ি মাইল ব্যাপী রাজ্যপ্রতিষ্ঠা করেন। শিবাজী ঈশ্বর বিরূপ সাধনা-কৃত কোন কোন কার্য্য জ্বরের দ্বন্দ্ব বিচারে সন্দেহ বলিয়া বিবেচিত ছইতে পারে, কিন্তু তাহার স্বগতীয় ধর্ম্মনিষ্ঠা, প্রবল সমাজজ্ঞান, অকৃত্রিম সদাচার লোকাভীভ সাহস এবং অসীম বীরত্বের নিব্বল চিন্তা করিলে আমাদের মস্তক প্রজ্বলিত নত ছইয়া পড়ে। তিনি বিজিত শত্রু এবং জীজ্ঞাতির সম্মান-রক্ষা, পরব্রাহ্ম আক্রমণকালে নিরীহ কৃষক ও পরোপকারী ব্যক্তিগণের প্রতি অত্যাচারনিবারণ এবং যুদ্ধলম্বান পীর, ফকির, মসজিদ, কোরাণ প্রভৃতির সর্ব্বাঙ্গা অক্ষর রাখিবার জন্ত যে সকল নিয়ম রচনাপিত্ব করিয়াছিলেন, সে সকল চিরকাল তাহার উদারতা ও ধর্ম্মপ্রাণতার নিদর্শনরূপে বিদ্যমান থাকিবে।

মহাপুরুষ শিবাজী অসাধারণ প্রতিভা-সম্পন্ন্যাত করিরাছিলেন। তাঁহার অপূর্ণ সাধনাৎলে মহারাট্টা জাতি নবতরঙ্গ প্রদীপ্ত হইয়া উঠে এবং মহা-প্রাণতা লাভ করিয়া অসাধ্য সাধন করিতে প্ররত হয়। শিবাজী পুরুষ তাঁহাকে প্রথম উৎসাহ, অটল অধ্যবসায়, অসাধারণ বীরত্ব ও ভীকরণ-কৌশলের অধিকারী করিরাছিলেন। শিবাজী নিরক্ষর ছিলেন। কিন্তু শাসনকাণ্ডে তাঁহার অসাধারণ দক্ষতা ছিল। তিনি নূতন তন্ত্রে শাসন-ব্যয় প্রতিস্থাপিত করিয়া মহারাট্ট-সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূল সুদৃঢ় করিয়া যাইলেন।

রাজনীতিবিশারদ শিবাজী শাসনকাণ্ডে নির্বাহকত্ব যত্নসমাক্ষেপে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই যত্নসমাক্ষেপ রাজমণ্ডল নামে খ্যাত ছিল। আট জন সচিব লইয়া এই যত্নসমাক্ষেপ গঠিত হইয়াছিল। শাসন এবং সৈন্ত, উভয় শ্রেণীর কার্যাব্যাহ-গণই যত্নসমাক্ষেপে প্রবেশ লাভ করিতেন। রাজমণ্ডলের আট জন সচিবের মধ্যে দুই জন সৈন্তবিভাগ হইতে গৃহীত হইতেন; একজন অখারোহী সৈন্তের সেনাপতি, অপর জন পরাত্তিক সৈন্তের সেনাপতি। শিবাজীর প্রধান মন্ত্রী নাম ছিল পেশওয়া। পেশওয়া রাজমণ্ডলের অধিনায়ক ছিলেন এবং আদেশ প্রচার করিতেন। রাজমণ্ডলের সচিব বা যত্নগণমাধ্যে কাহারও পদ বংশা-গত ছিল না। যত্নগণকে সপরা এক পদ হইতে অপর পদে পরিবর্তিত করা হইত। বালজী বিশ্বনাথের বংশে পেশওয়ার পদ ক্রম হইবার পূর্বে চারিটি বিভিন্ন বংশের লোক এই পদ লাভ করেন। প্রধান সেনাপতির পদে বংশা-ক্রমে লোক নিযুক্ত করিবার প্রথা প্রচলিত হইবার পূর্বে আট জন বিভিন্ন-বংশীয় অধিনায়ক কার্য করেন। বস্তুতঃ প্রথম যুগে মহারাট্ট-সাম্রাজ্যের কোন মন্ত্রীর পদই বংশাভ্যুগত ছিল না।

পেশওয়ার বার্ষিক বেতন ১০ হাজার টাকা ছিল। মন্ত্রী ও সেনাপতি প্রত্যেকে দশ হাজার টাকা প্রাপ্ত হইতেন। রাজস্ব-বিভাগের কার্য সম্পাদনজন্য আট শ্রেণীর কর্মচারী নিযুক্ত থাকতেন। রাজমণ্ডল কর্তৃক এই সকল কর্মচারী নিযুক্ত হইতেন; কেবল রাজমণ্ডলই তাঁহাদিগকে পদচ্যুত করতে পারিতেন। প্রত্যেক বিভাগের নানা শ্রেণীর কর্মচারীর কর্মনিধান একত্র সুকৌশলে নিষ্পন্ন হইয়াছিল যে, তাঁহারা পরস্পরের কার্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে পারিতেন। ইহার ফলে কোন কর্মচারীই প্রাঘবিধি উলঙ্ঘন করিয়া স্বার্থসিদ্ধি করিতে সমর্থ ছিলেন না। দুর্গমস্থানের সংরক্ষণের দিক-তিন জন করিয়া প্রধান কর্মচারী নিযুক্ত থাকিতেন।

পুরুষসিংহ শিবাজী সজদাটের সীমা হইতে কণাট পর্য্যন্ত বিস্তৃত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া এবং সেই সাম্রাজ্য সংরক্ষণকল্পে যুগঠিত ও অদৃঢ় শাসন-ব্যবস্থা প্রতিস্থাপিত করিয়া ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে পরলোক-গমন করেন। এই সময় যোগল পাদশাহ আওরঙ্গজেব মহারাষ্ট্র-শক্তি পর্য্যদন্ত করিবার জন্য পুনরুদ্যম নব ভেঙ্গে দস্তায়মান হইলেন। তাঁহার একজন সেনাপতি শম্ভুজীকে বন্দী করিয়া মুম্বায়েচরণের একশেষ প্রদর্শন পূর্ব্বক হত্যা করেন। ইহার পর-বৎসর তবীর শিত পুত্র সাহ যোগলের হস্তে বন্দী হইলেন। আওরঙ্গজেব তাঁহাকে রাজত্ববশে বন্দী করিয়া রাখেন। সাহ যোগলের হস্তে পতিত হইলে শম্ভুজীর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রাজারাম রাজপদ গ্রহণ করিয়া মহারাষ্ট্র-সাম্রাজ্যের শাসন-সংরক্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন।

শম্ভুজীর বিনাশ ও তবীর পুত্র সাহর (সাহর প্রকৃত নাম শিবাজী। শিবাজীর প্রকৃতি শিথিল ও নিকিরোধ ছিল, একজন বাদশাহ আওরঙ্গজেব তাঁহাকে সাহ অর্থাৎ সাধু নামে অভিহিত করিতেন, তজ্জন্ম শিবাজী ইতিহাসে সাহ নামে পরিচিত হইয়াছেন) অবরোধ, এবং বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা রাজ্যদ্বয়ের বিলোপসাধনে সকলপ্রযত্ন হওরূপে আওরঙ্গজেব অতীব উৎকৃষ্ট হইলেন এবং বিপুল সৈন্যসহ মহারাষ্ট্রদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণ করেন। তিনি “হিন্দুধর্ম্মাদিগের উপর যোঁর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করেন। কনিত আছে, বিজয়োদ্যত হইয়া তিনি খীর অধীন হিন্দু সৈন্যদলেরও ধর্ম্মনাশে উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে সম্পূর্ণ বিপরীত ফলের সম্ভাবনা দেখিয়া তাঁহাকে সে সংকল্প পরিত্যাগ করিতে হয়। যোগলদিগের হস্তে বধধর্ম্মের নিগ্রহ হইতেছে দেখিয়া তেজস্বী মহারাষ্ট্রীয়গণের জোধানল প্রবৃত্ত হইল। তাহাদিগের নরপতি রাজারাম স্বদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া যোগলবানের তরে মাস্তাজ অকলে জিজি দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। রায়গড় প্রকৃতি এসিদ্ধ দুর্গসমূহ যোগলদিগের হস্তগত হইয়াছিল। মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে অশিক্ষিত সৈন্যের সংখ্যাও অতি অল্প ছিল। সমাজে দুই চারি জন বিশ্বাসবাতক দেশ-পৈতৃক ও অভাব ছিল না। কিন্তু এই সকল প্রতিকূল অবস্থায় পতিত হইয়াও তাঁহারা বধধর্ম্ম ও স্বরাষ্ট্রের রক্ষার জন্য বহুপরিকর হইলেন; বর্ষোৎসাহে প্রযত্ন হইয়া প্রকৃত-সাগরতরঙ্গ-সমূহ যোগল সেবার পর্ব্বতগোষে অগম্য হইলেন। যিনি কোনরূপে একখানি বস্ত্র সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন, তিনি যোগলদিগের পক্ষাৎ ধাবিত হইয়াছিলেন। * *

মারাঠারা স্বধর্মের ও সনদ্বিগণের রক্ষার্থে প্রাণ বিসর্জনে কৃতসংকল্প হওয়ার যোগ্য-সৈন্তের নানা স্থানে পরাজয় ঘটিতে লাগিল। *

ইতোমধ্যে ১৭-২ খ্রিষ্টাব্দে রাজ্যভাষ্যের মূহু। ঘটে এবং তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র শিবাজী রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু এই রাজ্যাধিবর্ধনে মহারাষ্ট্র-যুদ্ধের কোন প্রকার ব্যতিক্রম হয় নাই; বরং মহারাষ্ট্রাধিপতির অধ্যবসায় ও বিক্রম দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে। "তাঁহাদের আকস্মিক আবির্ভাব ও তিরোভাব, নীত গ্রীষ্ম বর্ষায় সমান উৎসাহ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও বিশ্বাসের প্রতি অমনোযোগ ও দুর্ব্বার সহযোগিত্য প্রভৃতি দর্শনে স্তম্ভিত হইয়া যোগল সেনানীগণ বলিতে লাগিলেন, 'মহারাষ্ট্রা লোক আদমি নেহি হাং—এতো ভুত থানা হাং।' শুদ্ধ তাহাই নহে, মারাঠাগণের নাম যোগল ভ্রম-বলেরও বিভীষিকার স্থল হইয়া দাঁড়াইল। কথিত আছে, মহারাষ্ট্রা বলপতি-দিগের নাম কর্ণগোচর হইলে যোগল অব চমকিয়া জলপান পরিত্যাগ করিত।"†

পাদশাহ অওরঙ্গজেব বিপুল অশিক্ষিত ও অসজ্জিত সৈন্য লইয়া একাধিক-ক্রমে বহু বৎসর মহারাষ্ট্রাধিপতির সহিত যুদ্ধ করিয়াও তাঁহাদের দমন করিতে অসমর্থ হইলেন। তাঁহার জয় তাদিয়া পড়িল। ১৭-৭ খ্রিষ্টাব্দে নৈরাত্তপীড়িত পাদশাহ প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন।

তদীয় উত্তরাধিকারী বাহাদুর শাহ দৃঢ়কেন্দ্রে মহারাষ্ট্রাধিপকে দমন করা অসম্ভব বিবেচনা করিয়া আশ্রয়কলহের সৃষ্টিযোগ্য তাঁহাধিপকে দুর্ব্বল করিবার অভিপ্রায়ে সাহসকে যুক্তি প্রদান করিলেন। বাহাদুর শাহের উদ্বেগ সিন্ধ হইল। শাহ এতাবস্থ হইয়া পিতৃসিংহাসন দাবী করিলেন; কিন্তু রাজ্যভাষ্যের পুত্র শিবাজী সিংহাসন পরিত্যাগ করিতে অস্বীকৃত হইলেন। ইহাতে মহারাষ্ট্র-সাম্রাজ্যে কলহাঘি জলিয়া উঠিল; এই দারুণ অনল অচিরে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল।

রাজনীতিবিদগণ শিবাজী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শাসন-যন্ত্র সুগঠিত ও সুদৃঢ় ছিল বলিয়া এই সর্বব্যাপী অগ্নির দমন সাধেও মহারাষ্ট্র-সাম্রাজ্য দমীকৃত হইতে পারে নাই; মহারাষ্ট্র জাতি অগ্ন্যবকতার হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছিল।

* সবারান শপেণ দেউত্তর।

† সবারান শপেণ দেউত্তর।

সাহ রাঙ্গসিংহোদয় অনিচ্ছিত করিয়া (১) মন্ত্রীদিগকে পরিবেষ্টিত করিয়া-
ছিলেন; কিন্তু রাজকাৰ্য্যনির্বাহক মন্ত্রিসমাজ পূৰ্ব্বসং নিম্নমান ছিল।
এই মন্ত্রিসমাজের সদন্তগণ আবশ্যিকমত মন্ত্রণা-করু হইতে সমরক্ষেত্রে অব-
তীর্ণ হইতেন এবং সৈন্যপত্ন্যের সমস্ত আদিকার লাভ করিয়া বৃদ্ধ করিতেন।
কেবল জায়াবীণ ও হায়াবীণী উপাধিধারী মন্ত্রিবর কখনও তত্ত্বাবধি দায়িত্ব
করেন নাই। নানাবিধ রাজকাৰ্য্যনির্বাহক সৰ্ব্বদা মন্ত্রিসমাজের অধি-
বেশন হইত।

সাহর রাজহকালে বালকী বিশ্বনাথ নামক একজন কৰণ প্রাচীন পেশওয়ার
পদ লাভ করেন। বালকী বিশ্বনাথ প্রতিভাশালী বিচক্ষণ অমাত্য ছিলেন।
ঔষ্যের অল্পাত সাধনার মহারাষ্ট্র-সাম্রাজ্যের গৌরব সম্বন্ধে বুদ্ধি প্রাপ্ত হয়।
ঔষ্যের উচ্চল বংশপ্রভায় রাজহকালের অন্যান্য সদন্ত স্তান হইয়া পড়েন;
পেশওয়ারই রাজকাৰ্য্যে সৰ্ব্বেসৰ্ব্ব হইয়া উঠেন। এই সময় হইতে পেশওয়ার
এবং অন্যান্য মন্ত্রী পদ বংশোদ্ভূত হইয়া পড়ে। বালকী বিশ্বনাথ রাজ-
বংশের গৌরব ও মর্যাদা রক্ষা করিয়া স্বয়ং সমস্ত রাজকাৰ্য্য সম্পাদন করিতে
উদ্যোগ করেন। সাহ এই প্রভাবে সমস্ত করেন।

এতৎকালে করকশিয়ার দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি
সৈয়দ ব্রাহ্মণুলের হস্তাকীড়নক ছিলেন এবং তৎকাল যোগল-দরবারে নানা-
প্রকার পোলযোগের কলি হয়। করকশিয়ার সমস্ত পোলযোগ দূরীকৃত
করিবার অভিপ্রায়ে অস্ততর সৈয়দ হোসেন আলী খাঁকে দক্ষিণাণ্ণবের শাসন-
কর্তৃপদে নিযুক্ত করিয়া রাজদরবার হইতে দূরে পাঠাইলেন। হোসেন আলী
খাঁ তদনুসারে দক্ষিণাণ্ণবে উপনীত হইলে করকশিয়ারের ইজিতে (এইরূপ
ইজিত নিম্নপ্রয়োজন ছিল।) মহারাষ্ট্রের ঔষ্যকে চতুঃপার্শ্বে পরিবেষ্টিত
করিল। বৃদ্ধ আরম্ভ হইল। কিন্তু হোসেন আলী খাঁর আপন অভিয-
রক্ষার জন্য দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করা আবশ্যিক হওয়াতে তিনি মহারাষ্ট্র-
বিপত্তির সহিত সন্নিহিতস্থাপন করিলেন। এই সন্ধি অনুসারে মহাষ্ট্রিয়গণ
দক্ষিণাণ্ণবের দেশস্থী ও চৌধুর সন্মত প্রাপ্ত হইলেন। হোসেন আলী খাঁ

(১) সাহ খাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাস্ত করিয়া রাঙ্গসিংহোদয় অনিচ্ছিত করেন। পরা-
জিত প্রতিদ্বন্দ্বী মহারাষ্ট্র সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে অধিপত্যবীন করিয়া এক স্বতন্ত্র বংশের
প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু সাহই মহারাষ্ট্রের অনিন্দিত ছিলেন। নতুন রাজ্য কোলাপুর
নামে খ্যাত।

সন্ধিস্থাপন করিয়া দশ সহস্র মহারাট্টা সৈন্য সমভিব্যাহারে ক্ষুদ্রগতিতে রাজধানীর অভিমুখে বাত্মা করিলেন। তদীয় প্রথম সম্মত মহারাষ্ট্রসিঙ্গের স্বপক্ষ ও ব্রাহ্মণ-বিশ্বাসের প্রধান উপায়স্বরূপ হইল।

মহারাষ্ট্রজাতির ঈশ্বর বিজয়লাভের পর দুই বৎসরনগো (১৭২০ খৃঃ) বালকী বিশ্বনাথ পরলোক গমন করিলেন। মহারাষ্ট্র সহ্যে তদীয় উত্তরাধিকারী শেষওয়া বাজিরাওকে মোগল সম্রাটের কাগাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে আদেশ দিলেন। মহারাষ্ট্রবাহিনী প্রথমতঃ গুজরাটে উপনীত হইয়া দেশদূরী ও চৌপের দাবী করিল। তদন্ত মোগল সুবাদার এই দাবী অগ্রাহ্য করিয়া তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিবার জন্ত অস্ত্রযাত্রা করিলেন। কিন্তু বিজয়-লক্ষ্মী তাহার প্রতি বিরূপ হইলেন, মহারাট্টা সৈন্তের তাণ্ডবে গুজরাটের শোচনীয় দশা উপস্থিত হইল, সুবাদার দেশদূরী ও চৌপ প্রদান করিতে অস্বীকার করিয়া অব্যাহতি পাইলেন।

এই সময় চিনকিলিচ খাঁ দক্ষিণাংশের শাসনপতি ছিলেন। তিনি আপনাকে শাসনাধীন প্রদেশের অধিকাংশী বলিয়া বিবেচনা করিতেন। বস্তুতঃ তিনি নামমাত্র দিল্লীর অধীন ছিলেন। মহারাট্টাদের সহিত তাহার যৌব যুদ্ধ উপস্থিত হইল। এই যুদ্ধ একাবিক্রমে সাত বৎসরকাল স্থায়ী হইল। যুদ্ধক্লিষ্ট নিরাম রণক্ষেত্রে হইতে বিশ্রাম লাভোদ্দেশ্যে সন্ধি-স্থাপন করিলেন এবং মহারাষ্ট্রশক্তি মালব দেশাভিমুখে সঞ্চালিত করিয়া দিলেন।

অতঃপর মহারাট্টা অবিনায়কগণ মালব দেশ আক্রমণ করিলেন। তুঘল যুদ্ধের পর মালব দেশ তাহাদের করতলগত হইল। মালব বিজয়ান্তে মহারাট্টা সৈন্ত আশ্রয় দক্ষিণ-পূর্ব প্রদেশে উপনীত হইয়া দোয়াব সৃষ্টন করিল। বাদশাহ নিজাম বাহাদুরকে তাহাদের পতিরোধ জন্য আগমন করিতে আহ্বান করিলেন। নিজাম বাহাদুর আপন অসুস্থত নীতির ভ্রম বুদ্ধিতে পারিয়া রাজাছান্নে রাজধানীতে উপনীত হইলেন এবং চতুর্দিক সন্ত্রাস সন্ত্রাস করিয়া মহারাষ্ট্র-সৈন্যের গতিরোধ জন্য ভূপালে গমন করিলেন। দিল্লীর দরবারের অবিদ্যুৎকারিতানিবন্ধন এই স্থানে পক্ষসৈন্য তাহার পক্ষে পরিবেষ্টিত করিয়া ফেলিল। তিনি যাবৎশক্তি অধোরাষ্ট্র অবরুদ্ধ থাকিয়া মালবদেশ এবং চম্বল ও নর্মদা মদীর মধ্যপর্বা সহস্র প্রদেশ তাহাদের হস্তে সমর্পিত করিতে সীত হইয়া সূক্তি লাভ করিলেন। মহারাট্টা অবিনায়কগণ দৌরবে সীত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু এই সময় তাহাদের

আত্মকলহ উপস্থিত হইল। প্রধান সেনাপতি দাবরি গুজরাটে অবস্থিত করিয়া দেশযুধী ও চৌধ সংগ্রহ করিতেছিলেন। তিনি বাজিরাওর বিরোধী ছিলেন। তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ বাজিরাওর প্রাধান্যের বিরুদ্ধে ছিল। এই কারণে বাজিরাও তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে দাবরি নিহত হইলেন। মহারাষ্ট্র জাতির সৌভাগ্যক্রমে এই আত্মকলহ হইতে মুফল লাভ হইয়াছিল। অতঃপর গুজরাটে সম্পূর্ণরূপে মহারাষ্ট্রীয়-দিসের করতলগত হইল। সেনাপতি শুইকবার এবং দাবরির অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র গুজরাটের ঐতিহিবাহ লাভ করিলেন।

বিশেষতঃ বৎসর শাসনব্যয় পরিচালনের পর বাজিরাও প্রদীপ্ত বশোদ্ধিত হইয়া পরামোক্ষ গমন করেন। অতঃপর (১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে) তদীয় পুত্র বালজী বাজিরাও পেশওয়ার পদ গ্রহণপূর্বক সমগ্র ভারতে মহারাষ্ট্রীয় অধিকার-প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম করেন। বালজী বাজিরাও এই সাধনাতেই আজীবন নিরত ছিলেন। সেই সফলসাধন জন্য মহারাষ্ট্র-বাহিনী ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে বিজয়পতাকা উত্তীর্ণ করে। মহারাষ্ট্রা সৈন্যের এই বেশজর ভারত-বর্ষের “অন্যান্য জাতির পক্ষে বর্ষের উপদ্রবরূপে নিদারুণ হইয়া উঠিয়াছিল।” তাহাদের তান্ত্রিক প্রজ্ঞাতুল বিধ্বস্ত এবং লক্ষ্যক্ষেত্রে বিমর্দিত হইয়াছিল। মহারাষ্ট্রা সৈন্য বা বর্ষের মাঝে সমগ্র ভারতবর্ষে মহাজ্ঞাসের সঞ্চার হইত। যাহা হউক, বালজী বাজিরাও পেশওয়ার সময়ে মহারাষ্ট্রা সৈন্য ভারতবর্ষের যে সকল প্রদেশে প্রাধান্য লাভ করে, তাহা নিম্নে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইল।—

(১) বঙ্গ বিহার এবং উড়িষ্যার বেশমুখী ও চৌধের পরিবর্তে রঘুজি উড়িষ্যার আধিপত্য প্রাপ্ত করেন।

(২) রঘুজি ত্রিচিনপল্লী অধিকৃত করিয়া কর্ণাটে মারাঠা অধিকার-প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার পরবর্তী কালে বালজী বাজিরাও বঙ্গ সৈন্যসহ তথায় গমন করিয়াছিলেন।

(৩) রঘুজি অযোধ্যা ও এলাহাবাদের চৌধ সংগ্রহ করিতে সক্ষম করেন।

(৪) জাহাজি সিদ্ধিয়া যোধপুর রাজ্যে প্রাধান্য স্থাপিত করেন।

(৫) মলহর রাও হোলকার উদয়পুর রাজ্যে প্রবেশলাভ করেন।

(৬) সীদাশিব রাও মহীশূর রাজ্য হইতে দেশমুখী ও চৌধ আদায় করেন।

(৭) সেনাপতি রাঘব পন্ডাবে আধিপত্যস্থাপন করেন।

(৮) পেশওয়া সপৈত্রে এসাহাবাদ প্রদেশে (গড়মণ্ডলে) উপনীত হইলেন। এই সময় ন্যায়সর্ব্ব্ব পাদশাহ পেশওয়াকে বসাত্রাজ্যভুক্ত সকল স্থান হইতে দেশদ্রুণী ও চৌধ সংগ্রহ করিবার জন্ত সনদ প্রদান করেন।

এই সময়ে মহারাষ্ট্র-শক্তির উন্নতির মধ্যাকাল ভারতবর্ষের সকল প্রদেশে তাহাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত অথবা দেশদ্রুণী ও চৌধ সংগৃহীত হইয়াছিল, পৌরবাধিত রাজপুতনা তাহাদের অস্থূলি-সঙ্ঘেতে পরিচালিত হইতেছিল। “মহারাষ্ট্র-শক্তির সর্ব্বগ্রাসিনী মূর্ত্তি দর্শনে ভীত হইয়া ভারতবর্ষের ঘোঁসলমান শাসনপতিগণ আত্মরক্ষার জন্ত একতান্বয়ে বদ্ধ হওয়া নিত্য আবশ্যক বিবেচনা করিলেন। তাঁহারা কণকালের জন্ত গৃহবিবাদ তুলিয়া দিয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগের বিরুদ্ধে সমবেত হইতে লাগিলেন। আমেদ শাহ আবেদালীর নিকট ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবার জন্ত গোপনে নিয়ন্ত্রণ-পত্র প্রেরিত হইল। * * পানিপথের বিজ্ঞত লম্বা-প্রান্তরে আমেদ শাহ, নজিব খান রোহিলা, সুজা উদৌলা, কুতব শাহ, আহমদ নান, দুস্বে খান প্রভৃতি রোহিলা পাঠান ও তুরানী সরদারগণ আপন আপন চতুর্দল বল সহ যুদ্ধার্থ সমবেত হইলেন। মহারাষ্ট্রীয়গণও বিপুল বাহিনী সহ তাঁহাদিগের সম্মুখীন হইলেন। * * ১৭৬১ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে পানিপথের সমরযজ্ঞে মহারাষ্ট্র-বিশ্ববের পূর্ণাঙ্গ হইল। * *

“এই চূর্ণটনায় মহারাষ্ট্রীয়দিগের অসীম ক্ষতি হইল। তাঁহাদিগের প্রধান প্রধান সেনাপতি এবং লক্ষাধিক সৈনিক এই সংগ্রামানলে ভস্মীভূত হন। মহারাষ্ট্রদেশের প্রায় সমস্ত সরদার ও সম্রাজ আইয়্যদার পানিপথে প্রাণ-বিসর্জন করেন। বহুসংখ্যক মারাঠা-পরিবারের অস্তিত্ব একেবারে বিলুপ্ত হয়। মহারাষ্ট্রের একটি পরিবারও এই ঘটনায় আত্মীয়বিয়োগ হইতে অব্যাহতি পায় নাই। স্তব্রাং গৃহে গৃহে ক্রন্দনের রোল উঠিল। বালজী বাজিরাওর জ্যেষ্ঠ পুত্র বিখাল রাও ও তাঁহার পিতৃব্য-পুত্র ভাউ সাহেব দুই নিহত হইয়াছিলেন। তাঁহার বিশাল মিথিলায়ী সৈন্যদলের একদল শোচনীয় পরিণামের বিষয় শ্রবণ করিয়া বালজীর ক্রদর ভর হইয়া গেল। ভাউ সাহেবের শোকে ও বিরোগবিধুর অসংখ্য প্রজার হাহাকার শ্রবণে তিনি উন্মাদগ্রস্ত হইয়া অল্প দিনের মধ্যেই গতান্ধ হইলেন।” (১)

বালকী বাজিরাও অক্লান্ত সাধনাবলে সমগ্র ভারতবর্ষে মহারাষ্ট্রের প্রাধান্য-প্রতিষ্ঠার জন্য অগ্রসর হইতেছিলেন। তাঁহার সুবিশ্বাস কীর্তিসৌধ যুহুর্ন্তমধ্যে বেঘের প্রাসাদের মত আকাশে বিগীন হইল ; তিনি ভয়ঙ্কর উন্মত্তাবস্থায় প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া শান্তিলাভ করিলেন। বালকী বাজিরাওর নায় শাসনপতির ঈদৃশ শোচনীয় পরিণাম দর্শনে সমবেদনা উপস্থিত হয়। বালকী বাজিরাও রাজনীতিবিশারদ শাসনপতি ছিলেন। তাঁহার কর্তৃত্বশক্তি এবং অব্যবসায় অসাধারণ ছিল। তিনি প্রজার হিতকরে কৃষি-বাণিজ্যের উন্নতি সাধনজন্য অবহিত থাকিতেন। বালকী বাজিরাও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। কানী, মিথিলা, রামেশ্বর প্রভৃতি দূরদূরর্তী স্থান হইতে পণ্ডিতমণ্ডলী সর্বদা তাঁহার সভায় আগমন করিতেন। তিনি সমাগত পণ্ডিতদিগের পরীক্ষা গ্রহণ পূর্বক পুরস্কার প্রদান করিতেন। এইজন্য তাঁহার বার্ষিক ১৬ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় হইত। বালকী বাজিরাও সর্বপ্রকার বিদ্যার উৎসাহদাতা ছিলেন। কবি, শিল্পী, চিত্রকর ও গায়ক প্রভৃতি নানা শ্রেণীর ব্যক্তি তাঁহার আশ্রয় লাভ করিত।

ঐরামপ্রাণ শুভ ।

ভিখারী ।

—•—

ক'ম। ক'রো ও ভিখারী

ক'ণেক শুবে মা'নাও ভুলি,

চেয়ে তোমার মুখের পাণে

ভিক্ষা দিতে বাজি ভুলি' ।

জান তোমার ও নয়ন দু'টি

সোপন কথা বলছে 'হুটি',

প্রাণের সকল রুহ ছাড়

একেবারে দিচ্ছে 'হুটি' ।

ভিক্ষা দিতে বাজি ভুলি' ।

(২)

চেনা চেনা যুথ বে তোমাৰ
পৰিচয় যে দিছে অহে,
মনে পড়ে দুই জনেতে
হিলায় কোন স্বপন-পুৱে।

দুলাহাখা তোমাৰ দেহ,
জাগায় এপে অগাধ শ্বেহ,
ওই তোমাৰ ওই কাতৰ চিঠি
যেদে যে হুন্দে হুকান হুলি'
ভিক্ষা দিতে যাই যে হুলি'।

(৩)

শৈশবে সেই পাঠশালাতে
ছিলে তুমি পাঠেৰ সাধী,
কাটায়েছি তোমাৰ মুখে
অনেক দিবা অনেক ৰাতি।

বন্ধু আমাৰ, আজকে কাঙাল,
চাইছ আশি' একঘুঠা চাল,
কাদছে আমাৰ বুকটি বিৰে
সে দিনেৰ সুখহুংখুলি,
ভিক্ষা দিতে যাজি হুলি।

(৪)

ভিখাৰী, ভাই, আৱৰে কাছে
ভিক্ষা নিয়ে কি কিৰবি আশি',
মিতে কি দুই পাৰবিনা রে
ছেলে বেলাৰ কান্ধাশি।

শৈশবেৰ সে এগৰ মধু
হাৱাবি কি দুই রে শুধু,
ভিক্ষা নেবাৰ আগে তব
দে ভাই বাৱেক কোলাহুলি।
ভিক্ষা দিতে যাই যে হুলি'।

ঐহুদৰেন মজিক।*

অশ্রু ।

—•—

নবম পরিচ্ছেদ ।

—•—•—

মা ।

—•—

কলিকাতার আদিবার পুরদিন প্রভাতেই অশ্রু মা'কে বলিল, “আমি আজ যাইব।”

মা জিজ্ঞাসা করিলেন, “কোথায় যাইবে?”

“আমার একজন পরিচিত লোক আছে, তাঁহার গৃহে।”

“কেন?”

“এবার যাইয়া—তাঁহাকে ধরিয়া একটা কায খুঁজিয়া লইব।”

“কায খুঁজিয়া লইবে কেন?”

“নহিলে কি করিব? আমার যে বাক্সটি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে আমার পিতার এদম কিছু কোশলানীর কাগজও আছে; সেগুলারও মূল্য বাহির করিতে হইবে।”

“তিনি তোমার আত্মীয় নহেন?”

“না।”

“তবে তুমি তাঁহার কাছে যাইবে কেন? তুমি যাইতে পাইবে না।”

অশ্রু বিম্বিতভাবে মা'র দিকে চাহিল।

মা বলিলেন, “তোমার মা নাই, আমার বেয়ে নাই, আজ হইতে আমি তোমার মা। তুমি আমাকে ছাড়িয়া যাইতে পারিবে না।”

সেহের সঙ্গে তর্ক করা যায় না। অশ্রু আর কোন কথা কহিল না।

সেই দিন অশোক আহায়ে বসিলে মা কথার কথার তাহাকে বলিলেন, “অশোক, অশ্রুর কোথায় কে পরিচিত লোক আছে, তাঁহার কাছে যাইতে চাহিতেছিল। আমি কিন্তু উহাকে যাইতে দিব না।”

অশোক মা'র প্রস্তাবের সম্পূর্ণ সমর্থন করিল।

অপরাক্ষে মা'র কাছে বসিয়া অশোকের একটি জামার বোতাম লাগাইতে লাগাইতে একটা কি কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্ত অশ্রু ডাকিল,—“মা!”

“মা” বলিয়া ডাকিয়াই অশ্রু আর কথা বলিতে পারিল না। কত দিনের কত কথা—কত বাগা—তাহার মনে বাজিয়া উঠিল। শৈশবে মাতৃহীনা সে যে কখনও “মা” বলিয়া ডাকিতে পারি নাই! যে আছানেন সকলেরই অবিকার সে যে সে আছানেনও বঞ্চিত! তাহার মনে অশ্রু দেখা দিল।

আর তাহার সেই আছানেন মা’র মনে শত স্মৃতি জাগিয়া উঠিল—মা’র চক্ষুতে জল উছলিয়া উঠিল—মা’র হৃদয়ে স্নেহ উবলিয়া উঠিল। সত্যই কি রমা কিরিয়া আনিয়াছে! তাহার বিরোগ-বেদন-বিবুর হৃদয়ে তিনি বাহার শত স্মৃতি সব্বের সত্ত্বা করিয়াছেন, আজ কি তাহারই আছানেন এত-দিন বিচ্ছেদের পর মিলনের মঙ্গলশ্রবণ বাজিয়া উঠিল? তিনি অশ্রুকে বন্ধে টানিয়া লইলেন। অশ্রু কত দিন—এমন স্নেহ পায় নাই—কত কাল—কত যুগ! বৎসরে কি কালের পরিমাণ হয়? আজ অশ্রুত্যাগিত হানে এই স্নেহ লাভ করিয়া সে যেন ধস্ত হইল। সে আনন্দে, বেদনার—বেন সত্যই মাতৃ-বন্ধে যুগ রাখিয়া কীভাবে লাগিল। আর মা’র দুই মেয়ে অবিরল অশ্রু করিয়া বেন সেই দুঃখিনী কস্তার মতকে অজ্ঞান আশীর্বাদ বর্ষণ করিতে লাগিল। সেই অশ্রু যথো দৃষ্টি মারী-হৃদয়ে যে স্নেহ-সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইল, তাহার মত পবিত্র সম্বন্ধ বুঝি জগতে আর নাই। মা’র মনে হইল, তিনি তাহার কস্তাকে কিরিয়া পাইলেন। যে স্নেহ পটকে একান্ত আপনাত করিয়া লইতে পারে, সেই স্নেহে অশ্রুর সব সত্ত্বা ভাসিয়া গেল; সে মা’র কস্তা হইয়া রহিল।

জন্ম যখন বেহে জড়তা আনিয়া দেয় তখন মন বেন আর বেহের সঙ্গে পারিয়া উঠে না; কায করিতে ইচ্ছা থাকিলেও দেহ তখন বিশ্রাম সন্ধান করে। তাই জরাগ্রস্ত হইলে মানুষ বাতাবতই অত্যন্ত কার্যভার অস্তের উপর দিয়া বিশ্রাম লাভ করিতে চাহে—অবলম্বনের সন্ধান করে। মা’রও তাহাই হইয়াছিল, তবুও যে তিনি সংসারের সব কায করিতেন, সেটা কতকটা অত্যাশ্রমে আর কতকটা জোর করিয়া। প্রযুক্ত শক্তিহেতু গতিপ্রাপ্ত বস্তু যেমন সে শক্তি হারািলেও সহসা নিশ্চল হয় না, কার্যের অভ্যাস থাকিলে তেমনই জরা স্নেহও লোক সহসা কায করিতে অপারগ হয় না। বিশেষ, মা জানিতেন, তিনি যে কাযটা না দেখিবেন, সে কাযটা অনোক্তের—তাহার সর্বস্বের মনোমত্ত হইবে না। সে কিছু বলুক আর না-ই বলুক, তাহার অনুমতি হইবে। তাই তিনি সংসারের সব কায করিতেন।

কিন্তু তিনি অবসাদ অহুতব করিতেন। এই সময়ে অল্প আশিষ্টা উপস্থিত
হইল। অল্পের কর্মনিপুণতাও যেমন অধিক ছিল, কায করিবার বাসনাও
তেমনই বলবতী ছিল। অভ্যাগত ব্যতীত উপভোগ অসম্ভব। যে কখন
আনন্দ উপভোগ করিতে অত্যন্ত নখে, তাহার আনন্দের কারণ ঘটিলেও
সে আনন্দ তেমন উপভোগ করিতে পারে না; যে আনন্দে অত্যন্ত নখে,
সে অলস-জীবন যাপন করিতে পারে না। তাই অল্পও চুপ করিয়া বসিয়া
থাকিতে পারিত না; বিশেষ কায করিয়া ও কাযে মন দিয়াই সে তাবনা
ভুলিতে পারিত। মা'র কায ক্রমেই অল্পের হাতে আসিতে লাগিল। তাহাতে
কাযেও কোনরূপ ত্রুটি লক্ষিত হইল না। অশোকের কাপড় জামার
বোপাক্তি করা হইতে তাহার বেওয়া পর্য্যন্ত সব কাযই ক্রমে অল্প করিতে
লাগিল। মা'র চাবির শুদ্ধে চাবি দত্ত কমিতে লাগিল, অল্পের চাবির শুদ্ধে
তত্ত বাড়িতে লাগিল; শেষে একদিন বেথা গেল, মা'র চাবির গোটা
গোছাটাই অল্পের হিঁহুস্ত হইয়া তাহার অকণ্ঠে বদ্ধ হইয়াছে। মা'র হাত
হইতে সংসারের সব কাযাতার এমনই সরল ও সহজ ভাবে অনারাসে অল্পের
হাতে গেল যে, না বা অল্প বা অশোক কেহই সে পরিবর্তন উপলব্ধি করিতে
পারিলেন না। কেবল এই পরিবর্তনে দাস-দাসীরা প্রথমে কিছু সজ্জিত
হইয়াছিল; তাহার মা'র অতিরিক্ত আদরে অত্যন্ত, পাছে তাহাদের কোনও-
রূপ অহুবিদ্যা হয়; কিন্তু তাহাদের বৃত্তিতে বিলম্ব হইল না। যে, তাহার যেরূপ
“রাখ-রাখো” বাণ করিতেছিল, এ পরিবর্তনে তাহাতে রাবণরাজ্যের কোনও
বাবুহাই প্রবর্তিত হইবে না। সকলকে সুখী করিতে পারিলেই অল্প সুখী
হইত।

অশোকের কাপড় জামা হইতে বাবারের ব্যবস্থা পর্য্যন্ত সবই অল্প
করিতে লাগিল। সে সব কায পূর্বে মা করিতেন। কিন্তু ক্রমে অল্প তাহার
আরও কায করিতে লাগিল। সে সব কায মা করিতেন না। অশোক যে
অগোছাল ছিল, তাহা নখে; কিন্তু অল্প খুবই গোছাল ছিল। তাই অশোকের
ঘরেও অল্প কিছু পরিবর্তন প্রবর্তিত করিল। টেবলের উপর পড়িবার
লিখিবার নানা উপাদান। পরি টেবল ঝাড়িলে এক স্থানের জিনিষ অন্য
স্থানে রাখিত; অশোক তাহাকে টেবল ঝাড়িতে বাধন করিয়াছিল। সে
স্বয়ং জিনিষ ঝাড়িত—গুছাইয়া রাখিত; ফলে প্রত্যহ কাড়া হইয়া উঠিত
না, জিনিষে ধূলা কমিত, পুস্তকগুলি ছড়ান থাকিত। অল্প প্রত্যহ জিনিষগুলি

কাড়িয়া মুছিয়া শুছাইয়া বদ্যাহানে রাখিত। অশোক যে জিনিসটি যে স্থানে রাখিত, সেটি সেই স্থানে পাইত, অথচ সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সে অত্যন্ত নিশ্চিন্ত হইত; যথো যথো অশ্রুকে বলিত, “ভূমি দেখিতেছি, আর কাহাকেও কোন কাৰ্য করিতে দিবে না। কাৰ্য কেন্দ্রীভূত করাটা কিন্তু ভাল নহে—রাগোও নহে, সংসারেও নহে।” অশ্রু উত্তরে বলিত, “যাহার কাৰ্য, সে না করিলেই অন্যকে করিতে হয়। কায়েৎ অভাব নাই, লোকেই অভাব।” অশোক হাসিয়া বলিত, “ভাল; দেখিবে, আমি আমার সব কাৰ্য করিতে পারি কি না।” অশ্রুও হাসিয়া বলিত, “ভাল; দেখা বাইবে।” বলা বাহুল্য, অশোকের তাহার সব কাৰ্য করা হইত না, আর তাহার কাৰ্য করা অশ্রুর দেখা হইত না। কারণ, পরদিন আবার বধন অশোক দেখিত, সব জিনিস ঝাড়া-মুছা শুছান হইয়া গিয়াছে, তখন সে বলিত, “আজ আমি ইচ্ছা করিয়াই কাৰ্য করি নাই, জিনিষ সব কাড়াই ছিল, বদ্যাহানেও ছিল; সুতরাং নিশ্চয়োজনে উৎসাহ নষ্ট করা অনাবশ্যক মনে করিয়াই আমি কাৰ্য করি নাই। তাহাতে আমার কৰ্মক্ষমতার অভাব প্রতিপন্ন হইতে পারে না।” অশ্রু উত্তর দিত, “যাহাদের কাৰ্য করিবার উৎসাহ সৰ্ব্বদা থাকে না, যাহাদেরই ক্ষমতার মত যথো যথো দেখা দেয়, তাহাদের হাতে কায়েৎ ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকা নিরাপদ নহে বলিয়াই আমি কাৰ্য সারিয়া রাখিয়াছি। শিশুপাঠ্য পুস্তকে আছে,—যাহা আজ করিতে পার তাহা কাল করিণ বলিয়া রাখিয়া দিও না।” অশোক বলিত, “সে উপদেশ শিশুদের জন্য।” অশ্রু তাহাতে যোগ করিত “এবং যাহারা বুড়া হইয়াও কায়েৎকি দিতে শক্ত অথবা বিশেষ ভাবে তাহাদের জন্য।” অশোক বলিত, “আর পরিষি সকালে উঠিয়াই সব ঠিক করিয়া রাখিত?” অশ্রু উত্তর দিত, “কল্লু বলদ যেমন ন্যায়শাস্ত্র না পড়ার গাড়াইয়া বঁটা নাড়িত না, পরি তেমনই আমি না বলার ণ্যপনি কাৰ্য করিতে আসিত না।” এইরূপ ভর্তুকি শেষে কিন্তু অশোকেরই পরামর্শ হইত; কারণ, প্রথম ক্রটিই অশোকের, আর অশোক ইচ্ছা করিয়াই সে ক্রটি করিত। এরা যেমন দেখে ভড়তা আনিয়া লোককে অপরের উপর নির্ভরশীল করে, যৌবন তেমনই বাস্তবের ছন্দে অপরের সাহায্য ও সাহচর্য লাভ করিয়া সুখানুভববাসনা বলবতী করে। কিন্তু সে বাসনা-লভ্যই মত অবলম্বনের পাত্র না পাইলে বার্জিত হইতে পারে না—ছন্দয়ের উপর লুটাইয়া নিষ্কর্ষ হইয়া পড়ে। অশোকেরও তাহাই হইয়াছিল। তাহার যৌবনশুলভ বাসনা

কাহাকেও অবলম্বন করিতে পারে নাই ; তাই এত দিন অশোক ও গ্রায় তাহার অস্তিত্ব অস্বত্ব করিতে পারিত না । কেবল মধ্যে মধ্যে সে দুহপবনোৎপাদিত অরণ্যনিব সুর চাকলের মত একটা চাকল্য অস্বত্ব করিত ; কিন্তু তাহা কখনও স্থায়ী হইত না । আপনায় বহুবিধ সখের মধ্যে অশোক সহজেই তাহা ভুলিয়া যাইত । এখন সে অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে । নিত্য অত্যন্তরূপে অশ্রু বেন কোন রহস্য-রাজ্য হইতে ঘটনাত্মক ভাসিতে ভাসিতে তাহারই পরিবারের কূলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে । তাহার জননী তাহাকে আপনায় স্নেহমিত্র হৃদয়ে স্থান দিয়াছেন । আজ তাহার সৌন্দর্য্যে তাহার গুণ স্বন্দর হইয়া উঠিয়াছে ; তাহার হৃদয়ে নূতন অস্বত্ব অস্বত্ব হইয়াছে । তাই এত দিন সে কেবল মধ্যে মধ্যে দুরাগত পবন-হিল্লোল মত যে বাসবার অস্তিত্ব অস্বত্ব করিত, এখন তাহারই সরস স্পর্শে তাহার হৃদয়ে নূতন ভাব জাগিয়া উঠিয়াছে । অশোকের সত্য সত্যই মনে হইত, তাহার সব কাণ্ড অশ্রু করিলে যেমন স্নানস্নান হয়—সে আপনিও হুঁকি তেমন স্নানস্নান করিতে পারে না । মায়ের নিপুণতা পুরুষের পক্ষে দুর্লভ । তাই অশোক ইচ্ছা করিয়াই আপনায় কাণ্ড আপনি ক্রটি করিত ; কারণ, সে ক্রটিতে তাহার সখের কারণ ছিল ।

এইরূপে সংসারের সব কাণ্ডের সঙ্গে সঙ্গে অশোকের অনেক কার্য্যও অশ্রু হাতে আসিয়া পড়িল । অশ্রুও সাগ্রহে ও সানন্দে সে সব কাণ্ড স্নানস্নান করিতে লাগিল ও স্নানস্নান করিয়া আনন্দ লাভ করিতে লাগিল ।

সে তাহার হাতে সব কাণ্ড ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন ।

দশম পরিচ্ছেদ ।

নূতন জীবন ।

অশ্রু সাগ্রহে তাহার নূতন জীবনের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছিল । সে কাণ্ডেই আপনায় অস্তিত্ব মনোযোগ দিয়া আর সব ভুলিয়া থাকিতে চাহিত । নহিলে তাহার জীবনের ভার যে নিত্যই দুর্লভ বোধ হয় । সে আর কি লইয়া থাকিবে ? সে এখন তাহার জীবনের সব ঘটনার কথা ভাবিত ; বৈশ্য, বাল্য, বৌদ্ধ ভিন বয়সের ঘটনাস্থলির কথা মনে করিত, এখন তাহার মনে

হইত, সে যেন পাগল হইয়া উঠিলে—তাহার ইচ্ছা হইত, সে তাহার স্বভাব নিকট হইতে পলাইবে—নিরুদ্ধে যাত্রা করিবে। স্বভাভেই দুঃখ। তাহার জীবন-নাটকে অস্তের পর অস্তে যে অভিনয় হইয়াছে, তাহা যেন করিলে সে অস্থির হইয়া উঠিত। আর যখন সে দেখিত, এখন তাহার জীবনে যে অস্তে যথনিকা উঠিয়াছে, সে অস্তে কেবল অন্ধকার—কোথাও কোন আলোকরেখা নাই—যেদিনী অন্ধকারে আবৃত্তা—চারিদিকে যেন অন্ধকার—উপরে মেঘাচ্ছ-কার, আকাশের অবিরল মেঘমালায় কোন ছিন্নপথে তারকার স্বর্ণ দীপ্তিও দৃষ্ট হয় না—তখন সে যেন করিত, এ বার্ষ জীবনের বিষয় তার বহিরা লাভ কি? বৃত্তান্তটির স্তম্ভ স্পর্শে ত সব আশা জুড়ায়! জীবন ত কণহারা—বৃক্ষপত্রচ্যুত শিশিরবিন্দু ভূমিতে পড়িয়া শুকাইতে কতক্ষণ লাগে? যে মুহূর্ত তাহার জননীকে তাহার রহস্য-রাজ্যে লইয়া গিয়াছে—যে মুহূর্ত শান্তিতে তাহার পিতার দীর্ঘকালব্যাপী যোগবস্ত্রপায় অবসান হইয়াছে—সে মুহূর্ত ত কঠোর নহে! পিতার মুহূর্ত-শান্ত মুখে যে পাতুবর্ণ ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, সে কথা তাহার মনে হইত, সেবে এই চিন্তার বিতীৰ্ণ-বিতাড়িত হইয়া সে কেবল কার্যে বিশ্বস্তির সন্ধান করিত। কার্যে শান্তি, চিন্তার অস্থিরতা। তাই সে কেবল কাব খুঁজিত।

সন্ধ্যারের কাবেও সে চিন্তার অবসর পাইত। এক দিন মধ্যাহ্নে সে বসিয়া ভাবিতেছিল। যা মধ্যাহ্নে বিশ্রাম করিতে বাইরা ঘুমাইয়াছেন; দাস-দাসীরাও বিশ্রাম করিতেছে; অশোক তাহার বসিবার ঘরে, মধ্যাহ্নের দীপ্ত-রবিকরে ঐকান্তি অবসরা। সেও একখানা সংবাদপত্র লইয়া বসিয়াছিল। কাগজ-খানার এ দিক ও দিক উন্টাইয়া সে সেখানা ফেলিয়া উঠিল—বারান্দার গেল। বারান্দার ধামের উপর কার্ণিসে চড়াই পাখীর কুঁজিতে আকৃষ্ট হইয়া সে সেই দিকে চাহিল। দুইটি পাখী বাসা ঝাঁকিতেছে; উড়িয়া বাইরা শুক তৃণ, পালক, তুলি সংগ্রহ করিয়া আনিতেছে; বাসা গড়িতেছে। তাহাদের বিশ্রাম নাই। ক্ষুদ্র শক্তি—কিন্তু তাহারা যথাসক্তি কায করিতেছে। বাসা ঝাঁক হইবে—সেই বাসার ডিঙ্ক হইতে তাহাদের শাবক উৎপন্ন হইবে;—তখন আবার আহার সংগ্রহ করিয়া আনিতে হইবে—শাবকে পাখী করিয়া তুলিতে পারিলে তবে বিশ্রাম। তাহার পর আবার এই পরিত্রিত কার্য! ক্ষুদ্র বিহগ; তাহাদেরও নির্দিষ্ট কার্য আছে। অগতে তাহারাও জীবন উদ্দেশ্যস্থল নহে। কিন্তু তাহার? সে কোন্ আশায়—কোন্ আকাঙ্ক্ষায়—কোন্ উদ্দেশ্যে এই

বার্ষ জীবনের তার বহন করিতেছে ? তাহার জ্বরে বেদনার চাকলা এখনই
 এবল হইয়া উঠিল যে, সে আর দাঁড়াইতে পারিল না । সে ঘন তীতিতাড়িতা
 হইয়া ককে এবল করিল । সে ককও ত নৃত্ত ; তথায় তাহাকে আকুটে
 করিবার—তুলাইবার কিছুই নাই । সে মা'র ঘরে গেল । তিনি ঘুমাইতে-
 ছেন । তখন সে অশোকের বসিবার ঘরে গেল । অশোক একখানা কাব্য
 গ্রন্থ পাঠ করিতেছিল ; একটা স্থান দৃষ্টিগোচর হইতেছিল—সে তাহার অর্ধ-
 বোধের চেষ্টা করিতেছিল । সে মুখ তুলিয়া দেখিল, সম্মুখে অশ্রু । সে বহির্জনা
 রাগিয়া বলিল, ইহারই মধ্যে বিগ্রাঘে অশ্রুটি বোম হইল ? কায়ে তোমার
 এত আনন্দ যে, যে কাব্য দাসদাসীরা অনায়াসে করিতে পারে, সে সব কাব্যও
 তুমি তাহাদিগকে করিতে দাও না ; আপনি কর । তুমি যদি শিকারী হইতে,
 তবে কাক মারিবার জন্য বন্ধুকে গীসার ছুটা না পুত্রিয়া হীরার টুকরা
 পুত্রিতে ।" অশ্রু মনে মনে বলিল, "হার ! কাবের জন্য আমার ব্যাকুলতার
 কারণ যদি তুমি মুক্তি—যদি আর এক জনকেও বুলাইতে পারিতাম, তবে
 বোধ হয় কিছু লাভি পাইতাম ।"—প্রকৃত্তে সে বলিল, "কি পড়িতেছিলে ?"
 অশোক বহির্জনা তুলিয়া লইল, যে স্থানের অর্ধ বৃত্তিতে সে মাঝা মাঝাইতেছিল,
 সেই স্থানটা দেখাইয়া বলিল, "এই স্থানটার অর্ধ বৃত্তিতে পারিতেছি না ।"
 অশ্রু পুস্তকখানা লইয়া দুই তিন বার পড়িল ; তাহার পর ত্রু কৃত্ত করিয়া
 কিছুকণ ভাবিল ; তাহার পর একটা অর্ধ বলিল । সেই অর্ধ লইয়া দুই জনে
 কিছুকণ তর্ক হইল । শেষে অশ্রু অশোককে বলিল, "তুমি এই অর্ধটির
 আরম্ভ হইতে পড় ; আমি শুনি ।" অশোক পড়িতে পড়িতে বহন সেই
 দৃষ্টিগোচর স্থানে উপস্থিত হইল, তখন পূর্ণাংশের আলোকে অশ্রুর নিকট সে
 অংশ সম্পষ্ট ও সম্মূল হইয়া উঠিয়াছে । সে সেই অংশের যে ব্যাখ্যা করিল,
 তাহা পূর্ণাংশের ও সঙ্গত । অশোক বলিল, "চমৎকার ! এই ব্যাখ্যাই ঠিক ।
 আমি কিছুতেই ইহা বুঝিতে পারিতেছিলাম না ।" সে হাসিয়া বলিল,
 "কবিরা বলেন, নারীর নয়ন-কিরণে জ্বরের অন্ধকার অংশে উজ্জ্বল হইয়া
 উঠে ; সুদীর্ঘ বলেন, কামিনীর করাল্পর্শে ত্রিহীন গৃহ স্তম্ভর হয় ; এখন
 দেখিতেছি, অধ্যাপকদিগকে বলিতে হইবে, নরবর্ণিনীদিগের বুদ্ধির
 আলোকে কাবের তাব সম্পষ্ট হইয়া উঠে ।" অশ্রু উত্তর করিল, "মহো
 মহো তোমাদের যে অর্ধ করিতে এইরূপ বিলম্ব হয়, সেটা অতিপাণ্ডিত্যের
 ফল । কথার বলে, প্রবীণের ঠিক নিয়মেই অন্ধকার । আর তোমরা জটিল

লইয়া থাকিৱা থাকিৱা শেষে সৰলৈও জটিলতা বুজিয়া শুক ভূমিতে পতিত হও।" অশোক বলিল, "দেখিতেছি, তুমি কেবল কাব্যরসবোঝাই নহ— দার্শনিকও বটে!" অশ্ৰু হাসিয়া বলিল, "তোমাৰ এ তত্ত্ববাক্য আমি আনন্দে গ্ৰহণ কৰিতেছি। তোমৰা ভাৱ দেখ, কিন্তু পৰ দেখ না—তাই তোমৰা কোন কোন বিষয়ে চকু থাকিতেও খৰু। সেটো তোমাৰেৰে ব্ৰতাব। আমৰা ভাৱা দেখিবৰে হোৱা বড় ৰাখি না; কিন্তু পৰ না দেখিৱা চলি না। বৰ্শনে আমাৰেৰে আনন্দ; সেটো আমাৰেৰে ব্ৰতাব।"

সেই দিন হইতে অশ্ৰুৰ আৰ একটা কাৰ্য্য জুটিল। মধ্যাহ্নে তাহাৰ অবসৰ ছিল; তখন সে অশোকৰ সঙ্গ সাহিত্যালোচনা কৰিত। সে কাৰ্য্যে তাহাৰ উৎসাহ ব্ৰতাব-নিৰ্ধাৰ অশোকৰ হৃদয়েও উৎসাহ সঞ্চারিত কৰিল। নিকটে বিদ্যুৎ থাকিলে বিদ্যুৎ প্ৰদীপ হইয়া উঠে। অশোক আবার কাব্য, নাটক বাছিয়া বাহিৰ কৰিয়া পড়িতে লাগিল। এমন কি, অশ্ৰুৰ উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া সে দুকৰ কাৰ্য্যেও হস্তক্ষেপ কৰিতে অগ্ৰসৰ হইল। অশ্ৰু প্ৰস্তাব কৰিল, উভয়ে কোন কোন ইংৰাজী পুস্তক বাঙ্গালীয় ও বঙ্গালী পুস্তক ইংৰাজীতে অনূদিত কৰিব। অশোক সে প্ৰস্তাবেও সন্মত হইল; কাৰ্য্যও আৰম্ভ হইল।

কেবল সাহিত্যালোচনাতেই নহে; পৰন্তু নানা বিষয়ে অশ্ৰু অশোকৰ কাৰ্য্যে যোগ দিত। অশোক পদাৰ্থবিজ্ঞা ও রসায়ন কিছুই অনাগোচিত ৰাখে নাই, প্ৰাণিতৰ ও উদ্ভিদতৰও তাহাৰ অজ্ঞাত ছিল না; ফটোগ্ৰাফীতে সে সিদ্ধবিদ্যা ছিল; চিকিৎসা-শাস্ত্ৰেৰ কিছু আলোচনাও সে কৰিয়াছিল ও কৰিত। অশ্ৰুৰ উৎসাহে তাহাৰ বিজ্ঞানালোচনাৰ বয়তলা আবার আলমহাৱীৰ কাৰাগাৰ হইতে বাহিৰ হইয়া সজিত ধূলিৰ মলিনতা-মুক্ত হইল। আবার অশোক বৈজ্ঞানিক পৰীক্ষা কৰিতে লাগিল। যথো যথো দুই জনে শাস্ত্ৰেৰ পাঠ্য ও কুল লইয়া ছিঁড়িয়া-চিহ্নিয়া সেগুলিৰ বৈজ্ঞানিক বৰূপ নিৰ্ণয়-চেষ্টাৰ মধ্যাহ্ন কাটাইয়া দিত; বৰূপ-নিৰ্ণয়েৰ সাফল্য সৰ্ব্বদা কিন্তু উভয়েৰেই সন্মুখে থাকিৱা ৰাইত। কেবল প্ৰাণিতৰে ও চিকিৎসাশাস্ত্ৰে তাহাৰ অতুৰাৰেৰে একান্ত অভাব দেখা যাইত। সে বলিত, "মড়ৰে হাড় নাড়িতে আমি নিতান্ত নৱাৰ—জীৱিত জন্তু কাটিয়া বিজ্ঞানেৰ খেণা খেলিতে আমি একেবাৰেই অসমৰ্থ।" অশোক বলিত, "বিজ্ঞান কি খেণা? বিজ্ঞানে জগত্ৰেৰ কত উপকাৰ সংসাৰিত হয়!" অশ্ৰু উত্তৰ দিত, "বাঁহাৰা জগত্ৰেৰ

উপকারের জন্য বিজ্ঞানের আলোচনা করেন, তাঁহার নাম—তাঁহাদের ‘সাত খুন মাপ’ । কিন্তু তোমার আমার মত যাহারা কেবল সময় কাটাইবার জন্য বেলো করে, তাহার জীবটাকে না কাটিগে আগন্তের কোনই কতি নাই, বরং তাঁহাদের লাভ আছে ।” অশোক জিজ্ঞাসা করিত, “তাঁহাদের লাভ কি ?” অশ্রু বলিত, “ইচ্ছা করিয়া রক্তপাত করিয়া জন্মটাকে কঠিন করা হয় না ।” অশোক হাসিয়া বলিত, “বিজ্ঞান-চর্চায় সময় জন্মেরও ব্যাঘাত—কবির কথা চলিবে না । বিজ্ঞানে জন্ম দেহের একটা যন্ত্র মাত্র ।” অশ্রু বলিত, “সেই জন্যই ত যে স্থানে কবিতায় আর বিজ্ঞানে বিরোধ সে স্থানে আমি বিজ্ঞানকেই বর্জন করিতে চাহিতেছি ।” ফলে অশোকের সংগৃহীত অহিওলা আবার বাস্তবম্ভী হইল ; আর বাবজেনের জন্য আনীত গিনিগিল ও বরগোসুলি তাঁহাদের জন্য নির্মিত পিঙ্করে অশ্রুর বহন্ত-প্রদত্ত ছোলা ভিজা ও ফুটনার খোসা বাইরা পুই ও পুলকিত হইতে লাগিল । তাহার অশ্রু ডাকিলে তাহার কাছে আসিত, তাহার হাত হইতে খাবার খাইত । তাহাদিগকে গইরা অশ্রুর আরও কাব বাড়িল । একদিন একটা বিড়াল একটা বরগোসুলকে কামড়াইয়াছিল । তাহার হৃৎ-বলন অঙ্গে রক্তচিহ্ন বোঁত করিয়া দিতে দিতে অশ্রু কাদিয়া ফেলিয়াছিল ।

এই ভাবে—অশোকের পরিবারের অকীকৃত হইয়া—নূতন জীবনে অশ্রুর দিন কাটিতে লাগিল । সাংসারিক ও সাহিত্যিক নানা কাবে সে ভাবনার মংশন নিবারণ করিতে লাগিল । কিন্তু যে অতীতে জীবনের স্বতির তাড়না হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য তাহার এই প্রবল প্রয়াস, সে জীবনের কথা সে কিছুতেই প্রকাশ হইতে দিতে চাহিত না । সে কোথাও খাইত না ; আর কেহ আসিলে আপনার কক্ষের বাহির হইত না । তবে সে জন্য তাহাকে বড় বিব্রত হইতে হইত না । অশোকের পরিবারে মা ব্যতীত অন্য স্ত্রীলোক ছিলেন না । মা’র বরণ ও ধারণা সবই “সেকলে,” বাবী জীবিত থাকিতেও তিনি সভাসমিতি-সম্মিলনে যাইতেন না ; যাইতেন কেবল বিবাহ-প্রাঙ্গণি সামাজিক নিমন্ত্রণে । বিধবা হইয়া তিনি তাহাও ছাড়িয়াছিলেন । তাঁহার আচার-ব্যবহার সর্ব্বতোভাবে নিষ্ঠাবতী হিন্দু বিধবার আচার-ব্যবহারের অনুরূপই ছিল । তিনি একাদেশীতে নির্জল উপবাসও করিতেন । এমন কি, পাছে তাঁহার কোনরূপ অশ্রুবিধা হয় বলিয়া মাতৃভক্ত অশোকও গৃহে “অহিন্দু” আহার্য্য আনিতে ভালবাসিত না । স্মরণ্য যে সব সামাজিক

কাষে মহিলানিময়ণ হইত ক্রমে সে সব কাষেও আর মা'র নিময়ণ হইত না । সাও তাহাই চাহিতেন । তিনি আপনার গৃহে, আপনার পুত্রের প্রতি আপনার অথও মনোযোগ দিয়া নিষ্কিরোধে শান্তিতে বাস করিতেই ভাল-বাদিতেন ; সামাজিক সম্মিলন তাঁহার ভাল লাগিত না । সে সম্মিলনে বিশাল বিদ্রোহ বহু কবার আলোচনা হইত । সে সব কবার বিম্ব-বিসর্গও মা জানিতেন না, জানিতে চাহিতেন না । এমন কি, সে সব যুগরোচক পরচর্চায় নবীনা-সমাজে হাসির তরঙ্গ উঠিত এবং প্রবীণা-সমাজেও অর্থপূর্ণ দৃষ্টির বিনিময় যে না হইত, এমন নহে, সে সব চর্চার বিষয়ও মা'র সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল । কাষেই এই সব সামাজিক সম্মিলনে মা যেন বারিহীন স্থানে যৌনের দশাগ্রস্ত হইতেন । একপ সম্মিলন তাঁহার ভাল লাগিত না—সম্মিলনে তাঁহার অবস্থানও যেন আর সকলের বিশেষ ঐতিপ্রদ হইত না । তাই সামাজিক সম্মিলনে নিময়ণ হইতে অব্যাহতি পাইয়া মা আনন্দিতা হইয়া-ছিলেন । তিনি বড় কোথাও যাইতেন না—তাই তাঁহার গৃহে প্রায় অতিপ্ৰ-সমাপন হইত না ।

বৈপরীত্যে ।

এম ছিল পাখানের মত—

পতিহীন, ফিরাহীন, অড় ।

বিন্দু তাহে সকারিল পতি—

সজীবনী শক্তি যথোদর ।

হু'ব ছিল মধুরতা হীন—

যাব কিছু ছিলনা তাহার ।

হুককাটা হু'ব-ঐশ্বর্যতাপ

কি অমৃত শিশাইল তা'র ।

আলো ছিল আলো কি অ'ধার ।—

স্মৃতিহীন, কান্তি-বিরহিত ।

হাস্য রহি' পানে, কৈয় তা'রে

কাত্ত, স্রিগ, স্মৃতি-বিমণ্ডিত ।

বাণীনতা ছিল উচ্ছ্বাস—

সাংঘাতিক—অন্তঃ—তীব্র ;

শাসনের শৃঙ্খল পরিয়া,

হ'ল তাহা গুত, সজীবন ।

ঐবিভূতিভূষণ মজুমদার ।

পাশী ।

পাশীদিগকে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের পূর্বাংশে ও অযোধ্যা প্রদেশে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের ব্যবসা খেজুর রসে ভাড়া প্রস্তুত করা। বেন্দু ফিল্ড বলেন, ইহারা ক'ল্লুর নিয়া (ক'দ পাতিয়া) পাশী ধরে, এই জন্য পাশী নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। পাশী সংস্কৃত 'পাশ' শব্দ হইতে উৎপন্ন বলিয়া বোধ হয়।

মির্জাপুরের পাশীগণ বলে যে, কোন সময়ে পরমেশ্বর নিবিড় অরণ্যে ভ্রমণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে গাভীগণের চিংকারে তাঁহার ভ্রম ভঙ্গ হয়। তিনি দেখিলেন যে, একটি লোক কতকগুলি গাভী হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছে। তিনি গাভী সকলকে রক্ষা করিবার জন্য আগ্রহ হইলেন। এ দিকে অপর কতকগুলি লোক হত্যাকারীর সাহায্যার্থ আসিয়া উপস্থিত হইল। পরমেশ্বর হুস্বাৱা পাঁচ জন মহুবা সৃষ্টি করিয়া আপন শরীরের বর্ণদেহনে পক্ষ মানবের জীবন দান করিলেন। ইহা হইতেই পাশী নামের উৎপত্তি। পাশী (হিন্দী) সিনা (সেন) হইতে উৎপন্ন। ঐ পাঁচ জন মহাশয় হত্যাকারীর হস্ত হইতে গাভীগণকে উদ্ধার করে এবং পরমেশ্বরের নিকট আসিয়া স্ত্রী প্রার্থনা করে। ঘটনাক্রমে সেই সময়ে এক কায়স্থ-কন্যা সেই স্থান দিয়া গমন করিতেছিল, পরমেশ্বর তাহাকে ধৃত করিয়া পাশীদিগকে প্রদান করিলেন। সেই কন্যার গর্ভজ সন্তানগণ কাইখোয়া নামে খ্যাত।

অযোধ্যা প্রদেশে রাজপাশীগণ কহে যে, তাহার পাশী জাতির শাখা মাত্র এবং তাহার ভ্রমরাট হইতে এই প্রদেশে আসিয়াছে। রাজা জিলোকটাদ গুর্জরগির রাজ্য ছিলেন। তাঁহার পরিবারবর্গকে রাজ-বংশী বলা হইত। সেই রাজবংশী হইতে রাজপাশীর উৎপত্তি। পাশীগণ পরস্পরে বিবাদ করিয়া কহে কহে শয্যা (পাটিয়া) গ্রহণ করে, সেই জন্য ইহাদের 'বটীক' নাম হইল। কহে কহে বাগানে (বাগে) যাইয়া বৃক্ষারোহণ করিয়া রহে; ভাঙ্গনা 'বাছাল' নাম প্রাপ্ত হয়। অবশিষ্ট রাজপাশী নামে অভিহিত হয়। পাশী ও আরবগণ গুর্জরগির সহিত বনিষ্ঠতা আছে বলিয়া পরিচয় দেয়। (১)

অথোধ্যা প্রদেশের পানীগা বলে যে, এক কালে নেত্রী, হরদৈ ও উনাউ জিলাত্রয়ের শাতিলা, ধোরাহরা, মিতৌলি ও রায়কোটে তাহাদিগের রাজগণ রাজত্ব করিতেন। (২) উনাউ জিলায় বঙ্গের মৌ নগরের নিকটবর্তী রায়কোটে তাহাদের প্রধান দুর্গ ছিল। রায়কোটের শেষ রাজা, রাজা যান্দ্রর কনৌজের অধীনতা স্বীকার করিয়া বঙ্গ প্রদান বন্ধ করেন। সেই জন্য রাজা জয়চাঁদ গাজীর দেশ বেণাহুর বীর আলা ও উদিলকে প্রদান করেন। আলা ও উদিল রায়কোট আক্রমণ ও সম্বৃত্ত করেন। আজ পর্যন্ত রায়কোটের খবরসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। (৩)

বেত্রী জিলায় পানী, রাজপানী, আরধ, যোধি ও খটিকদিগকে এক জাতি বলিয়া বোধ হয়। রাজপানীগণ কহে যে, তাহাদের পূর্বপুরুষ রতন দত্ত সিংহ। ইনি নিম্বাণের (নৈমিষারণ্যের) নিকটবর্তী পতোন নগরের একজন ঠাকুর (হুত্রিয় বা কুত্রিয়)। রাতনসিংহের ঔরসে ও একজন পানী স্ত্রীলোকের গর্ভে অনেকগুলি সন্তান জন্মে। ইহারা আভান রাজপুত্রের কন্যাকে বিবাহ করিতে গিয়াছিল। আভানদিগের জাতিপতি পানীদিগকে সম্মান প্রদর্শন পূর্বক সুরাপান করিতে দেন। পার্শ্বগণ সুরাপানে উদ্বৃত্ত ও অচৈতন্য হইলে আভানগণ আর ৮০০ আট লত পানীকে হত্যা করে। সেই সময় অনেক পানী পলায়ন করিয়া বঙ্গের, মহম্মদী ও সীতাপুরের উত্তরে বাইরা অবস্থিতি করেন। (৪)

পানীগণ সম্বন্ধে প্রচলিত পদ্য ;—

১। যে সময় পরন্তরাম অবতার করেন, সেই সময়ে কুফল নামক এক ব্যক্তির তপস্যায় পরিতুষ্ট হইয়া ত্রাতা তাহাকে বর গ্রহণ করিতে কহেন। কুফল চৌধা-বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী হইতে চাহে। ত্রাতা তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করেন। কুফলের নামের একরূপ মোহিনী নক্তি যে, আজ পর্যন্ত কুফলের নাম লইলে চৌধা-ভয় দূরীকৃত হয় এবং মারা, নিদ্রা ও মোহিনী তাহার এই তিন স্ত্রীর নাম গ্রহণ করিলে দম্ভা ও তঙ্কর হইতে বন-সম্পত্তি নিরাপদ থাকে।

(২) Oudh Gazetteer, II, 207.

(৩) Elliot, Chronicle of Unao 24.

(৪) Sitapur Settlement Report.

২। কৃষ্ণের পুত্রের নাম কর্ণ (করণ)। এক্ষণে কর্ণ পাণীগণের উপাধ্যায় দেবতা। কর্ণ অঙ্গুলে বাস করিত। কর্ণের দুই স্ত্রী। প্রথমার (ছত্রিশজাতীয়া) পর্বে রাজপাণী ও ভীল এবং বিতীয়ার (আহীরজাতীয়া) গর্ভ হইতে ঋতিকগণ উৎপন্ন হইরাছে।

৩। পাণীরা কল্ল হইতে আসিয়া কনৌজে বসতি করে। চারি ভ্রাতাকে বুদ্ধার্থে আহ্বান করা হয়। মোহন একাকী অগ্রসর ও হত হয়। মোহনের পুত্রগণ রাজপাণী এবং অপর তিন ভ্রাতার পুত্রগণ, আরথ, মার্য্য ও থোঠো নামে অভিহিত হয়। আলা ও উদিলের কাহিনীতে শিউ নামক বারণিয়ার একজন পাণী বীর বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল বলিয়া লিখিত আছে।

৪। প্রতাপগড়ের গল্প এইরূপ ;—

পাণীগণের সহিত নেওয়ারের রাজার যুদ্ধ হয়। ভীক পাণীগণ লম্বার (খাটিয়া) নিয়ে লুণ্ঠায়িত হয় এবং তদবধি তাহার। ‘খটিক’ নাম প্রাপ্ত হয়। যাহারা অর্ধবৃক্ষের পশ্চাতে গোপন ভাবে অবস্থিতি করিয়াছিল, তাহারাই ‘আরথ’ নামে অভিহিত হয়। (৫) মহিরা। নামে একজন পাণী নেওয়ারী রাজসরকারে একজন সামান্য কৃত্য ছিল ; সে প্রেহরীর কার্য্য করিত। একদা ইহার শূকরপাল কোয়েলী নামক মুরাওর (আতিবিশেষ) শস্তক্ষেত্রে পতিত হইয়া বিস্তর ক্ষতি করে। কোয়েলী রাজঘারে অভিযোগ করে ও আপন ক্ষতি পূরণার্থ এককালীন ২০০০০০ নম্বর লক্ষ টাকা চাহিয়া বসে। রাজা বলেন যে, চারি লক্ষ টাকা পাইবে। কিন্তু কোয়েলী বলে যে, হয় অবশিষ্ট পাঁচ লক্ষ তাহাকে দেওয়া হউক, নতুবা মহিরাংকে রাজ্য হইতে নির্দ্বাণিত করিবার আজ্ঞা প্রদান করা হউক। রাজা মহিরাংর নির্দ্বাণনের আজ্ঞা প্রদান করিলেন। মহিরাং রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া অন্তঃস্থ বাইতে অসীকৃত হইয়া আপন জাতি-বদ্ধ ও বান্ধব পাণীগণকে আহ্বান পূর্বক রাজসৈন্যগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া সৈন্যগণকে পরাস্ত করে। অবশেষে রাজা অনন্তোপায় হইয়া রাজ্যের এক চতুর্থাংশ প্রদানে স্বীকৃত হইয়া পাণীগণকে সন্তুষ্ট করেন। ইহা আলা ও উদিলের সংগ্রামের পূর্ববটন।

৫। রতন দক্ষ পানীদিগের পূর্বপুরুষ। পরন্তরাম যখন অগ্নিগণের ধ্বংসসাধন করেন, সেই সময় রাজা বেণকেও বধ করেন। রাণী রাজার মৃত-দেহ ফোড়ে লইয়া নরকগণ বিলাপে পরন্তরামের চিত্তাকর্ষণ করেন। রাণী রাজার বংশবিস্তার পরন্তরামের অমৃত্যুপ্রার্থিনী হইলে পরন্তরাম করুণার্চিত্ত হইয়া রাজার মস্তক স্পর্শ করিবারাত্র এক পুরুষ-মূর্ত্তি উদ্ভিত হয়। ইহার বর্ণ নোর ক্রক এবং হস্তে শরাসন ও শর। এই ব্যক্তিকে আদি রাজপানী এবং ইহার উপর রাজ্য-রক্ষার ভার অর্পিত হয়।

৬। পিলিভিতের গল্প,—

অবিপণ অধর্ষাচরণহেতু বেণ রাজাকে নিধন করেন। কিন্তু রাণীর প্রার্থনার ভীহার (রাজার) শ্বেদবিন্দু (পসিনা) হইতে যে মনুষ্যোৎপাদন করেন, সেই ব্যক্তিকে আদিপানী।

পানীগণের শ্রেণীনিভাগ।

মির্জাপুরে—

১। কৈবোধা (পূর্বোন্নিবিত কাষস্থ-কস্তার গর্ত্তজ।)

২। ভর।

৩। পাশমাকতা (পানীদিগের বিবাহে ইহার ভিক্ষা প্রাপ্ত হয়।)

৪। বোরানী ; (পরন্তরাম বা পরমেস্বর পাঁচ জন মনুষ্য সৃষ্টি করিলে তাহার পাগল [বোরান] হইয়া গিয়াছিল ; তৎকাল ইহাদের সাধারণ নাম বোরানী পানী)।

৫। পহরী (ইহার পাহারা দেয়, এইজন্য ইহাদের এই নাম হইয়াছে। পাহারা বা গ্রহরীর কার্য্যকারী)

বারানসী নামে,—

১। কৈলোয়া (কৈল নগর হইতে। কৈল নগর রাইবেবেলী জিলায়।)

২। কৈলোয়াং বা কৈলোয়ান অথবা অন্য তালিকা অনুসারে কৈলোয়ান বা কৈলোয়া।

৩। শুজার। (বতন্ত্র জাতি।)

৪। তিরশুলিয়া। (ত্রিশূল।) তিরশূল অর্থাৎ ত্রিশ কলাযুক্ত ছুরী ; ইহার খেজুর বা তালগাছ কামাইয়া রস বাহির করে।

৫। পানীওয়ান।

৬। চিড়িয়ায়ার (বতন্ত্র জাতি।)

৭। বাঘ ।

৮। বিহারী (বিহারবাসী)

৯। ভদ্র । (৬)

সার হার্বার্ট হোপ রিসলীর মতে বিহারে পানীগণ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত
যথা,—

১। ব্যাধ ; ইহারা পানিকলের চাষ করে ।

২। গাইরুহা (গাইরুহানা)

৩। কামানী ।

৪। তিরলুগিয়া । (৭)

সে ক পপনায় ৩০৫ প্রকার পানী দেখা যায় ; তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য
পানীগণের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল । প্রতাপগড়ের তালিকা—

—রাজপানী, শুজার, কৈথোয়ান, শুয়াল, মাকতা, আরখ, খটিক ও পাছার ।

বদাউনে—বাহেলিয়া ও ভীল ।

মুগাদাবাদে—আহেরিয়া ও ভীল ।

এলাহাবাদ ও ফতেপুরে—পরশরামী ।

ফতেপুরে—বোরিয়া ।

বান্দ্যাব—রিওয়া ।

মির্জাপুরে—বাতেলিয়া ও ভারী ।

মাজপুরে—বাহেলিয়া, মানোয়া ও তরমামী ।

বতি সুলতানপুর ও ব্যাগাবতিতে—চৌরানী ।

ভড়াইতে—ভাদোরিয়া ।

লক্ষৌতে—বাগিয়া ।

উদাউতে—বোরিয়া, মহতিয়া ও পরশরামী ।

রাইবেরিলীতে—বোরিয়া ।

নীতাপুরে—বাছার, ধাহুক ও খটিক ।

গোন্দ্যাব—বাগিয়া ।

বাহারাইতে—বাছার, চুনাবহ, বাহুক ও খটিক ।

(৬) Hindu Tribes and Castes, I, 389.

(৭) Tribes and Castes. II 166.

পাশীগণ অপর জাতিকে আপন জাতিযথো গ্রহণ করে না। প্রতাপ-
গড়ের পাশীগণের মধ্যে যদি গ্রীলোক অপরজাতীয় পুরুষ হইতে গর্ভধারণ
বহে এবং ঐ গ্রীলোক আপন পিতা বা স্বামীর গৃহে প্রসব করে, তবে তাহার
গর্ভজাত সন্তানকে পাশী বলিয়া গণ্য করা হইবে এবং সমাজে সেই সন্তান
অন্যান্য পাশীগণের মায় সমান অধিকার প্রাপ্ত হইবে। জাতীয় সভা কর্তৃক
বিবাহ-পঞ্চক স্থগীকৃত হয়। সভাপতি প্রতি সভা আহ্বানে নিযুক্ত হয়।
সভাপতির উপাধি চৌধুরী। সভায় (পঞ্চমতে) বাস্তিচার ও ভ্রোচোরাদির
বিচার হয়। কেন না ইহার। সচরাচর কল্পদোষে নির্দান-বাস্তিচার-
দণ্ডে দণ্ডিত হয়। যদি কোন গ্রীলোক স্বজাতীয় কোন পুরুষের সহিত
দোষে দোষিনী হয় তবে উভয় পক্ষ হইতে জাতীয় ভোজ দিতে
হয়। আবার যদি কোন লোক অপর জাতীয়া কোন গ্রীলোকের সহিত
বাস্তিচার-দোষে দোষী হয়, তবে তাহাকে জাতীয় ভোজ দিয়া জাতি
কিনিতে হয়। কিন্তু যদি গ্রীলোক অপর জাতীয় পুরুষের প্রণয়সক্ত হয়
তবে সে চিরদিনের মত জাতিহীন হয়। উপপত্নী (স্বজাতীয়া হইলেও)
রক্ষা করা নিষিদ্ধ। বিবাহের বয়স পাঁচ কিংবা সাত হইতে বোল বৎসর
পর্যন্ত। যান্না-বিবাহ সমাজের সীতি। বিবাহে বর বা কস্তাপক্ষে
কোন পণ-গ্রহণ-প্রণা নাই। তবে কন্যার স্বামী স্বজন যৌতুকস্বরূপ যদি
কিছু বস্তু দান করেন, তাহা হইলে রীতিবিরুদ্ধ কার্য্য হয় না। বিবাহ-কার্য্য
সম্পন্ন হইলে বরকন্ডার মধ্যে কাহারও অধীনতা বা কুঠরোপগ্রস্ততা
প্রকাশ পাইলে পঞ্চমতের অঙ্গমতি লইয়া নীরোগ ও সর্বাবয়বসম্পন্ন ব্যক্তি
অপর হইতে পৃথক হইতে পারে। পাশীদিগের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত।
দেবর যদি বয়ঃপ্রাপ্ত ও অবিবাহিত হয়, তবে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিধবাকে বিবাহ
করিতে পারে। 'সগাই' প্রকার বিবাহ কেবল নিমবার সহিত মৃতপত্নীকের বিবাহ।
বিধবা যদি কোন পুরুষকে (স্বজাতীয়) বিবাহ করিতে চাহে তবে কোন অমু-
ষ্ঠানের প্রয়োজন হয় না। সে কেবল সভায় (পঞ্চমতের) মত লইয়া ঐ
পুরুষের নিকট জ্ঞাতাবে অবস্থিত করিবে। ইহার নাম 'রাখুয়া' (রক্ষিতা)।
কিন্তু জাতীয় লোকদিগকে খাওয়াইতে হইবে। 'সগাই' প্রকার বিবাহকারী
সাধারণতঃ পাঁচ প্রকার গৃহনা ও এক প্রস্ত বস্ত্র লইয়া বস্তুগণের সহিত বিধ-
বার বাসীতে গমন করে। তথায় উভয় পক্ষের বন্ধ-বান্ধবগণ ভোজন করে।
রাত্রিতে অন্ধকারময় গৃহে বিবাহকারী বিধবার সীমন্তে সিন্দূর দিয়া পরদিন

প্রাতে নব বস্ত্র ও অলঙ্কার পরাইয়া বিধবাকে আপন গৃহে লইয়া যায় ।
বিধবা যদি দেবরকে বিবাহ করে, তবে দেবর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সন্মতি রক্ষণা-
বেক্ষণ করে এবং ত্রাহুশ্রুতগণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহাদের পিতৃসম্পত্তি তাহা-
দিগকে প্রদান করে । বিধবা দেবর ভিন্ন অন্যকে (অবশ্য স্বজাতীয়) বিবাহ
করিলে আপন স্বামীৰ বিধর-ভোগে বঞ্চিত হয় ।

(ক্রমশঃ)

ঐআনুতোষ তরুদার ।

বাণী-চরণে ।

ভাষা যদি দিবি যোরে, দিস্ ভাষা স্বচ্ছ সচেতন
বাহার উপর দিয়া গড়াইয়া পড়ে চিত্ত-বারা ;
দাসব করাবি যদি, দিস্ স্নেহ—চাহি না বেতন ;
দেখা দিস্ তরুতলে—চাহি না রে মর্দরের কারা ।
সত্য-ত্বা দিবি যদি, দিস্ ত্বা অগ্নিশিখা-সম
মিথ্যার বাকদল্লুপ স্পর্শে যা'র ভয় হ'রে বার —
প্রেম যদি 'দিবি, মাগো, কর্তব্যে ভরিম্ চিত্ত মম
যাহাতে বৃদ্ধিতে পারি, চালিব তা' কোথা কা'র পার ।
প্রাণ যদি দিবি ভাষে, দিস্ প্রাণ হৃ'দাতে ছড়াতে,
বেচিরঃ রূপার মাঝে দিস্নে করেতে অপমান ;
কোলে যদি টানিবি, মা, দিস্ আগে চরণে জড়াতে,
বুকে দিয়ে বন্ধবল—তার'পর কণ্ঠে দিস্ গান ।
এ হিম্মত-সিদ্ধবন্ধে ভোক্ মম লপথ সফল
অচল এ আরতনে করে যে এ দরিত্রে অটল ।

ঐবিক্রমকৃষ্ণ বোবা ।

মণিহার ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

ধরমপুরাধিপতি দীর্ঘসিংহের সহিত ক তাঁরসিংহের খুব বুদ্ধ
হইতেছিল। যুদ্ধের কারণ, এক ছড়া মণিহার। সেরূপ উজ্জল মণিহার
পৃথিবীর আর কোন রাজার নাই। ধরমপুরে এই হাটের বিষয়ে একটি প্রবাদ
আছে। প্রবাদ এই,—

প্রাচীন কালে ধরমপুরের রাজা সনৎকুমার সিংহ এই হার তাঁহার
পিতামহীর কাছে পাইয়াছিলেন। পিতামহী রানী গঙ্গামণি উহা এক
সন্মানীয় কাছে পাইয়াছিলেন। ধরমপুরে প্রকাশ, সেই সন্মানী স্বয়ং
মহাদেব। তাহা না হইলে অমন মণিহার মানুষ কোথায় পাইবে? সারা
রাজ্য বিক্রয় করিলেও সে হারের মূল্য হয় না।

রানী গঙ্গামণি সমস্ত দিন উপবাস করিয়া রাজবাটীর নিকট নদীর ধারে
যে শিবমন্দির ছিল, সন্ধ্যাকালে শিবিকারোহণে তথায় যাইতেন ও দেবাদি-
দেবকে পূজা করিয়া রাজি দশটার সময় প্রাণাদে ফিরিয়া ফল-মূল আহার
করিয়া শয়ন করিতেন। তাঁহার স্বামী, পুত্র, উভয়েই পাঠানের সহিত
সংগ্রাম করিয়া হত হইয়াছিলেন। বালক পৌত্র সনৎকুমার সিংহ পাঠান-
বাণের অশুগ্রহে করগ্রন রাজ্য হইয়া সিংহাসনে বসিতে পাইয়াছিলেন।
প্রোড়া রানী গঙ্গামণির জন্মে ইহা শেলসম হইয়াছিল। আর সেই কারণে
তিনি পতির সহিত সবধৃতা না হইয়া শিবের আরাধনা করিতেছিলেন।
প্রার্থনা, ধরমপুর-রাজ্য যেরূপ স্বাধীন ছিল, আবার সেইরূপ হউক। তিনি
পৌত্র সনৎকুমার সিংহকে স্বাধীন রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া মরিবেন। তখন
কোন ক্ষত্রিয়ই করগ্রন রাজ্য ছিল না। সর্বপ্রথম ধরমপুর-রাজ্যই করগ্রন
হইল। ইহা ক্ষত্রিয়-রমণীর কিরূপ বেৎনার কারণ, তাহা ক্ষত্রিয় রমণী ব্যতীত
কেহ বুঝিবে না। তখন গঙ্গামণির বয়স পঞ্চাশ বৎসর। কিন্তু তাঁহার দেহের
গঠন ও সৌন্দর্য্য দেখিলে তাঁহাকে পঞ্চবিশতিবর্ষীয়া যুবতী বলিয়া জন্ম
হইত।

সে দিন প্রবল ঝড় ও বৃষ্টি। পথে গমনাগমন আর অসম্ভব। শুভ্র ও রানী
শিবিকারোহণে পূজায় চলিয়াছিলেন। ঝড়ের ঝাপটে বাহকরা শিবিকা

লইয়া চলিতে পারিতেছিল না ; শেষে বিড়ম্বণ পারিশ্রমিকের সোভ পাইয়াও নিবিকা-সহনে অকম্ব হইল । অবশেষে রাণী শিবিকা হইতে অবরোহণ করিয়া পদব্রজে চলিলেন । বাহকগণ কিরিয়া যাইতে স্বীকৃত হয় নাই । তিনি তাহাদিগকে কিরাইয়া দিলেন । একজন লোকের জন্য এতগুলি লোক কষ্ট পাইবে, ইহা অন্যায়, এই মনে করিয়া কেবল দ্বারবান লছমন ও পরিচারিকাকে সঙ্গে লইয়া তিনি মন্দিরে চলিলেন । যে অককার, কড় ও বৃষ্টি, পথে ফেহ নাই, তবে পদব্রজে যাইতে লজ্জা বা ভয় কি ? তিনি বাহকদিগকে আশ্রয় দিলেন, “যদি কড়-বৃষ্টি কমিয়া যায়, তোমরা পাখী লইয়া আসিও ; নহুবা আসিবার প্রয়োজন নাই ।” বার বার পদত্বলন হইতে লাগিল । তাহাণি রাণী নিঃসঙ্কোচে পদব্রজে চলিলেন । অবশেষে তিনি আশ্রয়মন্ডপে সিদ্ধবেহে মন্দিরে উপস্থিত হইলেন । পূজা শেষ করিয়া তিনি যখন বাহিরে আসিলেন, তখন বৃষ্টির বেগ কমিয়াছে, কড় থামিয়াছে । এতক্ষণ সিদ্ধবেহে থাকিয়া রাণী কালিতেছিলেন । তাঁহার হস্তপদ অংশ লইয়া আনিতেছিল । আসিবার সময় তিনি পূজার আগ্রহে কড়ের সহিত বুদ্ধ করিতে করিতে আসিয়াছিলেন ; পূজা শেষ করিয়া আর দাঁড়াইতে পারিতেছিলেন না । লছমন রাণীর অবস্থা দেখিয়া তাঁহাকে মন্দিরে বলিতে বলিল ও বয়ঃ ক্রমপক্ষে শিবিকা আনিতে চলিল । রাণী পরিচারিকার জোরে মস্তক রাখিয়া মন্দিরের চরণে শয়ন করিলেন । সেই মুহূর্ত্তে এক জন পাঠানপ্রাঙ্গণে আনিয়া দাঁড়াইল । সে যখন-তাহার আজ্ঞার বরমপুর-রাজের নিকট কর আদায় করিতে আসিতেছিল ; কড়-বৃষ্টির জন্য মন্দিরের প্রাঙ্গণে যে বৃহৎ পক্ষবটী বৃক্ষ ছিল, তাহারই মধ্যে আশ্রয় লইয়াছিল । রাণী যখন মন্দিরে প্রবেশ করেন, তখন সে দেখিতে পার নাই । কড় থামিলে ও বৃষ্টি মন্দীভূত হইলে সে নগরে যাইবার জন্য অগ্রসর হইতেছিল । এমন সময় সে দেখিল, চরণে দুইটি বমনী । সে অগ্রসর হইয়া প্রশ্ন করিল, “কে ?”

অন্ধকারে পাঠানের মূর্ত্তি দুই হইতেছিল না । পরিচারিকা তাহা, পূজারী আসিয়াছেন ; এতক্ষণ কড়-বৃষ্টির জন্য আসিতে পারেন নাই । সেইজন্যে উত্তর করিল, “রাণী মা ।”

পাঠান সানন্দে বলিল, “রাণী ! বেশ, বেশ, তুমিরাছি খুশ হুন্দরী । এ অন্ধকারে দেখিতে পাইতেছি না, এই হুঃখ । আজ আমার নন্দীর ভাল । যাত্রা শুভ । এস, রাণি, সন্ধ্যাপ করি ।” এই কথাগুলি শুনিয়া গন্ধামনি বিদ্বাদ্-

বেগে উষ্ণিরা দাঁড়াইলেন। সতীর দেহে অবসান দ্রুত হইল। তিনি ভীতকণ্ঠে বলিলেন, “কে রে পাবণ, মরাদম! মন্দির অপবিত্র করিতে আসিয়াছিস।”

“আমার চিন না, স্তম্ভরি? আমি পাঠান দূত আমের আসি খাঁ। কর লইতে আসিয়াছি; সঙ্গে সঙ্গে তোমায় লাভ।”

পরিচারিকা কাঁপিয়া উঠিল। রাণী আরও ঘণাপূর্ণবরে বলিলেন,—
“লিখাচ! দেবমন্দিরে প্রবেশ করিয়াছিস? বাহির হ’, এখনই দূত হ’।”

“এই যে যাইতেছি।” বলিয়া পাঠান চব্বরে উঠিতে যাইল।

রাণী তাহার বকে এমন ভীষণ পদাবাত করিলেন যে, সে প্রাঙ্গণে পড়িয়া গিয়া অজ্ঞান হইল। ইতোমধ্যে শিবিকা ও আলোক লইয়া লহমন্ আসিল। রাণীর ও পরিচারিকার তখন রণরঙ্গিনী মূর্তি। রক্তাক্ত ও মূর্ছিত পাঠানকে মন্দিরের বাহিরে একটি বৃক্ষের সহিত রক্তাঙ্কানস্বায় রাধিয়া লহমন্ রাণী ও পরিচারিকাকে শিবিকায় উঠাইল। সে রাত্রিতে রাণী জনস্পর্শ করেন নাই। তাঁহার প্রবল জ্বর হইল। প্রাতে কেহ তাঁহাকে জল স্পর্শ করাইতে পারে নাই। কারণ সন্ধ্যায় মৃত্যু করিতে হইবে।

সে দিন পূজার পর রাণী যখন উঠিলেন, তখন এক তেজঃপুরুষলবের সন্ন্যাসীকে সম্মুখে দেখিলেন। সন্ন্যাসী মধুর স্বরে বলিলেন, “বৎসে! তোমার পূজার ও সতীষ-মহিমায় দেবাদিদেব সন্তুষ্ট হইয়াছেন। তোমার আশা পূরিবে। ধর্মমণ্ডর রাজ্য স্বাধীন হইবে। আসি এই মহাদেবের পূজক। আর তুমি গুপ্তের বাহির হইও না। রাজবাটীর ঠাকুর-ঘরে যে মহাদেব আছেন, তাঁহারই পূজা করিও। তিনি রাজরাজেশ্বর। ইনি বাণলিঙ্গেশ্বর। ইহাও পূজ্য গৃহীর অবিকার নাই। তুমি নারী, জ্ঞান না। স্তম্ভরং তোমার ভোগ নাই। আর এই লও, তোমার গুণের পুরস্কার। কল্য তুমি সাহস ও বুদ্ধিবলে অমূল্য সতীষমণি ও দেবমন্দিরের পবিত্রতা রক্ষা করিয়াছ। সেই জন্য এই মণিহার তোমার জন্য অনিরাছি। এই মণিহার যে বংশে থাকিবে, সে বংশের সকল পুরুষ বীর ও সকল রমণী সতী হইবে। জীবন বিসর্জন দিবে, তথাপি কখনও স্বাধীনতা বা সতীষ বিসর্জন দিবে না।” সেই উজ্জ্বল মণিহারের আলোকে মন্দির আলোকিত হইল। পুণকপূর্ণিতজ্বর রাণী সন্ন্যাসীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া হার লইয়া প্রাসাধে ফিরিলেন। পরদিন প্রাতে সনৎকুমার সিংহকে সেই খেদগত মণিহারের মহিমা-সুকাইয়া দিয়া রাণী বলিলেন, “ইহা সাবধানে

রাখিও, কাহাকেও দেখাইও না। কোথায় রাখিবে, কাহাকেও বলিবে না। স্বাহার সময় ইহা সন্তানকে দিবে ও এই উপদেশগুলিও দিবে। দুর্ভাগ্য পাঠান তাহার রাজার রাজ্যে গিরিমা যাউক। নিশ্চয়ই সে আপনার দোষ গোপন করিয়া অন্য কথা বলিবে। এই তোমার সুযোগ। আর কর দিও না। সৈন্য-সামন্তদিগকে আমি কল্যাণ ডাকিয়া এ বিষয়ে পরামর্শ করিব।”

তাহার পর লক্ষ্মণ ও পরিচারিকার যুগে সন্ন্যাসীরা আগমন ও মণিহার প্রদানের কথা রাজার ঘড়াইয়া পড়িল। কেহ সে হার না দেখিলেও যেন দেখিয়াছে, এইরূপ ভাবে তাহার সৌন্দর্য্য ও মহিমা বর্ণিত করিত। দীপ্তই স্নকলও ফলিল। পঞ্চদশবর্ষীয় সনৎকুমার নিঃস্বপ্ন বিক্রমে পাঠান-সেনাপতিকে পরাজিত করিয়া রাজ্য স্বাধীন করিলেন। যে দিন রাজ্যে স্বাধীনতার পতাকা উড়িল, সেই দিনই গজাঘনি চিত্তারোহণ করিলেন। তাহার পর সেই মণিহারের জন্য এক দিন দুঃখ চলিতেছে।

বীরসিংহের সহিত চাঁদসিংহের পূর্বে তিন বার যুদ্ধ হইয়াছিল। প্রত্যেক বারেই চাঁদসিংহ পরাজিত হইয়া পরাভূত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু এই চতুর্থ বারের যুদ্ধে তাহারই জয়লাভের সম্ভাবনা। কারণ, উপর্যুপরি যুদ্ধে বীরসিংহের অর্ধ-বল ও সৈন্য-বল কমিয়াছিল। এবার তিনি অধিক সৈন্য সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। কাষেই তিনি জীবনের আশা ত্যাগ করিয়াছিলেন। শত্রুরে একবিন্দু রক্ত থাকিতে তিনি মণিহার অপরের হস্তে দিবেন না। শেষ যুদ্ধে জীবন দিবেন, তিনি এই সংকল্প করিয়াছেন। জীবন থাকিতে ত কেহ মণিহার বা রাজ্য লইতে পারিবে না। তিনি জীবন দিবেন, কিন্তু যে মণিহারের জন্য এই যুদ্ধ, সে মণিহার কখনই বিপদের হস্তে দিবেন না। আর এই অসঙ্গত সৈন্য লইয়া যদি জয়লাভ করিতে পারেন, সে ত ভালই। যুদ্ধ চলিবেই—জীবন থাকিতে সন্ধিও নাই, বিগ্রামও নাই।

ছয় মাস ধরিয়া ক্রমাগত যুদ্ধ হইল। বিপক্ষ-দল পরাজিত হইল না, ক্রমাগত নূতন সৈন্য সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধিতে লাগিল। বীরসিংহ যখন দেখিলেন, তাহার আর জয়ের আশা নাই, তখন তিনি এক দিন রাজ্যের ছোট বড় সব প্রজাকে ডাকিয়া বলিলেন, “আমার সন্তান নাই, —আছে। একমাত্র কন্যা— সে নির্ভীক শিষ্ঠ, কিছুই বুকে না। তৎক্ষণি আমার সমস্ত আশা ঐ কস্তার উপর। উহাকে আমার প্রধান অমাত্যের সহিত দূরদেশে প্রেরণ

করিতেছি; যাহাতে বিপক্ষীয়েরা জানিতে না পারে—তাহার উপায় করিয়াছি। এই মণিহার সকলে দেখ, এই হার ও আমায় জ্যোৎস্না দূরদেশে চলিল। রাজাকে প্রস্তাবিত করিবার জন্য আমি এখন মুছ করিব। আর সৈন্ত যখন পাঁচ শতের অধিক নাই, তখন বুঝিতেছি, এই মুছে আমার প্রাণও যাইবে। জ্যোৎস্না বড় হইলে, তোমরা তাহাকে নাও চিনিতে পার। মন্ত্রীও বৃদ্ধ,— যদি মরিয়া যাবেন, কে তোমাদের জ্যোৎস্নাকে চিনাইবে? সেইজন্য এই হার তোমাদিগকে দেখাইয়া রাখিলাম। জ্যোৎস্না বড় হইলে মন্ত্রীর মুখে শুনিবে, এই মণিহারের জন্য আমাদের রাজ্যে চিরদিনই মুছ হইয়াছে; কিন্তু এ হার অপরে কেহই লইতে পারে নাই; আমি প্রাণ দিলাম, তবু এ হার দিনাম না। তখন সে-ও নিশ্চয়ই এ হার যত্নে রাখিলে। যদি তাহার পিতার রাজ্যে আসিয়া তাহার রাণী হইতে উচ্ছা হয়, আর যদি সে কখনও তাহার রাজ্যে ফিরিয়া আইসে, তাহা হইলে তোমরা এই হার দেখিলে অবশ্য তাহাকে চিনিবে। আর তোমরা রাজ্যচ্যুতাকে যদি রাজ্যে বসাইতে ইচ্ছা কর, তবে বসাইও। জ্যোৎস্না বড় হইয়া রাজ্যে ফিরিয়া আসিতে অনেক বিলম্ব আছে। তোমাদের ইচ্ছা থাকিলে ততদিনে তোমরা নববলে নূতন সৈন্য সংগ্রহ করিয়া বিপক্ষ রাজাকে তাড়াইতে পারিবে। আমার যাহা বক্তব্য ছিল বলিলাম। তোমাদের ইচ্ছাতে কি মত, শুনিতে চাহি।”

রাজ্যের লোকেরা মণিহারের কথা কৰ্ণে চিরদিন শুনিয়া আসিতেছে, হার কখনও দেখে নাই। আজ সেই হার দেখিয়া তাহারা চমকিত ও মোহিত হইল। রাজা যখন হার তুলিয়া ধরিয়া দেখাইলেন, তখন সেই উজ্জ্বল মণির আলোক রাজার মুখে প্রতিভাত হইল। সব্বত্র রাজ্য বিক্রম করিলেও ত ইহার নাম হয় না।

প্রধান সামন্ত অধিক সিংহ বিনীতভাবে বলিলেন, “মহারাজ! আমাদের মধ্যে যে ঐতিহাসিক থাকিবে, সে-ই রাজকন্যাকে সাদরে এই রাজ্যে স্থাপিত করিবে। যদি আমরা সকলে বৃত্ত্যমুখে পতিত হই, তাহা হইলেও আমাদের বংশধরগণকে এই হারের কথা বলিয়া দাইব। তাহার সন্দেশে ভিতরে ভিতরে ঠিক থাকিবে; যখনই এ হার লইয়া রাজকন্যা আসিবেন, তখনই তাঁহাকে সাদরে তাঁহার রাজ্যে আহ্বান করিবে; বাঁধার হতে এই হার দেখিবে, তাহার ঠাহাকেই রাজকন্যা বলিয়া গ্রহণ করিবে। মন্ত্রী মহাশয়, রাজকন্যা বড় হইলে একথাও তাঁহাকে যেন ভালরূপে বুঝিয়া দেন। যদি

কোনরূপে এ হার হারার, তাহা হইলে বিস্তাট বটাবে । নিঃসংসার যন্ত্রী এ হার বেন খুব বয়ে রাখেন । দেশের লোক যাঁহার কাছে হার পাইবে, তাঁহাকেই রাজী বলিয়া গ্রহণ করিবে,—এ কথা যেন তাঁহার মনে থাকে । আমাদের প্রাণের আশা অতি অল্প । আমরা জীবিত থাকিতে আপনাকে পরাজিত করা চুড়র হইবে । কিন্তু যখন আমাদের সৈন্যবল কমিয়াছে, তখন আশাও কমিয়াছে । আমাদের বংশধরগণের উপর নির্ভর করিয়া আমরা স্বর্গারোহণ করিব । হার যেন বয়ে রাখা হয় ।”

রাজা বলিলেন, “বৎসগণ! আমাদের একথা রাজ্যের বাহিরে যাইবে না । সুতরাং হার লইয়া কে আর রাজ্যে আসিবে ? বিপক্ষীয়রা যখন রাজ্য লইবে, তখন হার না পাইলে, সন্দেহ করিয়া হার ও রাজকন্যার অহুসন্ধান করিতে পারে বটে । যদিই তাহারা কোনরূপে সন্ধান পাইয়া এ হার কাড়িয়া লয়, তাহা হইলে ও রাজকন্যার রাজ্যপ্রাপ্তির আশা থাকিবে না; কারণ, তাহারা তাহাকে মারিয়া কেলিবে, আর যদি তাহার প্রাণরক্ষা হয়, তব্বাপি তোমাদের আর তাহাকে চিনিবার কোন উপায় থাকিবে না । সেইজন্য বলিতেছি, হার লইয়া আসিলে তাহাকে রাজ্যে স্থাপিত করিও, নহিলে তোমরা অস্বীকার হইতে মুক্ত । যদি গুন, শক্ররা হার লইয়াছে, তবে তাহার প্রতিশোধ দিতে পার, ভালই ; সে বিষয়ে আমি তোমাদিগকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিতে চাহি না । তোমাদের রাজার আর কোন কথা নাই । তোমরা যে বাহার হামে যাইতে পার ।”

সকলে রাজার জয়গান করিয়া প্রণত হইয়া বলিল, “আপনার সকল কথা আমাদের জয়গে গাঁথা রহিল ।” তাহার পর সত্যভক্ত হইল ।

সতাই বরষপুত্ররাজ সুদূরকৈ প্রাণ বিসর্জন দিলেন । বিপক্ষের দল রাজ্যে আসিয়া রাজ্য তোলপাড় করিল, কিন্তু সে বিধবার পাইল না । পরে যন্ত্রী আর রাজকন্যার পলায়ন-বার্তা শুনিয়া তাহারা চারিদিকে চর পাঠাইল । অহুসান করিল, কিন্তুই তাহাদের কাছে হার আছে ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

যন্ত্রী দূরে আরাধ্যী পর্ব্বতের সাহসেনে এক ভীল গ্রামে রাজকন্যাকে লইয়া গেলেন । তিনি রাজদত্ত অর্থে পাহাড়ীদিগের সহায়তা আবশ্যক সামগ্রী আনাইয়া লইতেন । আপনি এক দত্তও রাজকন্যাকে ছাড়িয়া

হাইতেন না। প্রহরকন্যা ও মণিহার রক্ষার জন্য মন্ত্রী আশনার স্ত্রী পূজা ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছেন। তাহাদের সংবাদ পাইবার কোন আশাও তাঁহার নাই। জীবনে আর তাহাদের সঙ্গে দেখা হইবে কি না, সে বিষয়েও সন্দেহ। তথাপি মন্ত্রীর ক্রোধ নাই। সর্বদা রাজকন্যা ও হারের ভাবনাতেই তিনি মগ্ন। পাছে শত্রুরা সন্ধান পায়, পাছে সেই মহামূল্য হার নষ্ট হয়। তাহা হইলে বে রাজকন্যা চিররাজ্যচ্যুতাই থাকিয়া বাইবে। মন্ত্রী রাজকন্যাকে রাজকন্যার উপযুক্ত শিক্ষা দিতেছিলেন। তিনি তাহাকে কোন পাষাণী বালিকার সহিত মিশিতে দিতেন না। মৃত্যুকে সঙ্গে লইয়া মৃত্যুর পিতা প্রতি দিন মন্ত্রীর হুটীয়ে আসিত। মন্ত্রী স্বয়ং তাহাদের সহিত আলাপ করিতেন। জ্যোৎস্না মৃত্যুর সহিত খেলিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিত, মন্ত্রী সাদরে তাহার শিরচ্ছন্ন করিয়া বলিতেন, “তুমি আমার সঙ্গে খেলিবে, আর কাহারও সঙ্গে তোমার খেলিতে নাই যে, না।”

মন্ত্রী জ্যোৎস্নার নামের পরিবর্তন করেন নাই; তাহাকে ঐ নামেই ডাকিতেন। তিনি জানিতেন, নামে কোন গোয়েন্দাই সন্দেহ করিবে না; হারের কথা কেহ না জানিলেই হইল। এইরূপে অজ্ঞাতবাসে প্রায় আট বৎসর কাটিয়া গেল। শত্রুরা কোন সন্ধান পায় নাই। জ্যোৎস্নাও কৈশোরের শেষ সীমার উপনীত হইল। তাহার যৌবনে পদ্যপণ করিবার আর বিলম্ব নাই দেখিয়া মন্ত্রীও কিছু চিন্তিত হইলেন; ধরমপুরে প্রত্যাগমনের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু চিন্তা কার্যে পরিণত করিবার শূন্যে বিবি বাধ সাধিলেন।

সে দিন পূর্ণিমার রাত্রি। পার্শ্বীয় প্রদেশটি অপূর্ণ ঐতে সূর্য হইয়া উঠিয়াছিল। নিশাচর পক্ষীরা ডালে বসিয়া আতুল আত্মানে ঘন কাহাকে ডাকিতেছিল। এই জ্যোৎস্নাগোত নিশিতে তাহার আনন্দ-গীত গাহিয়া পল্লীবাসীদিগকে ঘন কাহার কথা স্বপ্ন করাইয়া দিতেছিল। এই সূর্য জ্যোৎস্নার—নিরুদ্ধ পূর্ণতম্বিরে, বিটপীনিরে, নিমিগীতনেএ বোয়ীর ঘান-ময় তাবটি হুটিয়া উঠিয়াছিল। মৃত্যুর পিতা মন্ত্রীর শিরে বসিয়া ব্যজন করিতেছিল। মন্ত্রী ক্ষীণকণ্ঠে তাহাকে বলিতেছিলেন, “জহর, আমার মনে হইতেছে, প্রত্যাহেই আমার ডাক পড়িবে। সকলই তাহার ইচ্ছা। এ প্রাণ যদি আজ ধরমপুর গিয়া ত্যাগ করিতে পারিতাম, তবে কত শান্তি পাইতাম। জহর, তোমাদের সাথে আমার কন্যা জ্যোৎস্নাকে লইয়া আমি বড়

শান্তিতে ছিলাম। কারণ, নগরের কোলাহল এ স্থানে নাই। এ স্থানের লোক কত শরল, যাহ্নবের কথার তাহার। অবিবাস করে না। তাই, আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা করিও। জ্যোৎস্নাকে ধরমপুরের প্রধান সামন্ত অজিৎ সিংহের গৃহে পৌছাইয়া দিও। তিনি আমার পরম আত্মীয়। তুমি পথে কাহাকেও বলিও না যে, তাহাকে ধরমপুর লইয়া যাইতেছি। যে টাকা তোমার দিলাম ইহার চতুর্গুণ অর্থ তুমি তাঁহার কাছে পাইবে।”

“আপনি কি কোন ছদ্মবেশী রাজা—আমরা ত আপনার ব্যবহারে বরাবরই সেই সম্বোধন করিয়াছি। হয় ত আপনি বিদ্রোহের লক্ষ্য পলায়িত। নহিলে আপনি জ্যোৎস্নাকে কোন ছোট বেগের সঙ্গে মিশিতে যেন নাই কেন?”

“জহর, তোমাকে ত বলিয়াছি, সে কথা কাহাকেও বলিও না। এখন শবনের ডাক আসিয়াছে বলিয়া আমার দেশের নাম বলিলাম। আর সামন্তের কাছে না পৌছাইয়া দিলে, জ্যোৎস্না চিরদিন দুঃখিনী থাকিবে। তাই তাঁহার কথা বলিলাম। এত দিন কোন পরিচয় না পাইয়া তুমি আমার আদেশ পালন করিয়াছ এখনও তাই করিও, ইহাই আমার প্রার্থনা। তুমি যদি নিজে ততদূর যাইতে না পার, তোমার কোন বিশ্বাসী লোক দিয়া জ্যোৎস্নাকে পাঠাইও। সে ছাড়া আর কাহাকেও ধরমপুরের কথা বলিও না। বল তাই, বল—আমার শেষ কথা রাখিবে?”

সজলনয়নে যুগ্মার পিতা বলিল, “রাখিব।”

“চিরশান্তিতে থাক। তগবান্, আমরা শেষ আশা পূর্ণ কর। জ্যোৎস্না মা! তোমায় যাহা বলিয়াছি, যে শিক্ষা দিয়াছি সব মনে আছে ত? স্বদেশ বৎসরের বালিকাকে বিশ্বপিতার চরণে সমর্পিত করিয়া আমি অজ্ঞাত দেশে চলিয়াছি। তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া সংসারের পথে চলিও। এস মা, তোমায় আশীর্বাদ করি।”

জ্যোৎস্না দুইটি কোমল বাহুতে মস্তকি বেষ্টিত করিয়া বলিল, “কেলে যেও না, বাবা”—

“আবার চেয়ে যিনি তোমায় ভালবাসেন, সেই দরবার অগতঃপিতার হস্তে তোমায় সমর্পিত করিয়া যাইতেছি। মা—বল, আমার প্রণাম আদেশ তোমার অঙ্গন আছে।”

“আছে।”

মন্ত্রী দক্ষিণ হস্ত জ্যোৎস্নার শিরোপরি রাখিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।
 প্রভাতে ধানময় পক্ষীদের দ্বান ভয় হইল। পাখীর কাকলীতে, পাহাড়ী
 বালক-বালিকাদের কলহনো কণ্ঠের শব্দে রজনীর গমনাগমনে সজীবতা
 ফিরিয়া আসিল। জ্যোৎস্নাদের ক্ষুদ্র কুটারে মন্ত্রীর দ্বান আর ভাঙিল না।
 সেই যে তিনি রজনীর অবসানে প্রভুত্বব্যাপার শিরে ক্রান্ত দক্ষিণ হস্তশানি
 তুলিয়া বিবেচনের করুণা ভিক্ষা করিতেছিলেন, সে ভিক্ষার বৃক্ষি শেষ নাই—
 তাই তাঁহার চক্ষু আর উদ্বীলিত হইল না।

(ক্রমশঃ)

ঐশ্বরীলাহরী দাসী।

উৎকৃষ্টিতা।

শ্রদ্ধ ময়নে চাহি' পথপানে
 রহিয়াছ তুমি কাহার বেয়ানে,
 (যেন গো যুদ্ধ ঘরেছ স্বপনে,)
 বসি' গৃহ বাতায়নে ?

চমকি' উঠিছ খলিত পত্রে
 শিথিল আঁচল লুটিছে গাত্রে,
 হেরিছ বাতুল চকিত নেত্রে,
 কেন চকল-নয়নে !

ভাবিছ কি বসি' ও গো বিরহিনী,
 গগনে চমকি' খেলিছে দামিনী—
 কেমনে কাটাবে বিরহ-যামিনী,
 সে যদি না আসে আজ।

তাই কি একাকী বসি' বাতায়নে
 বাতুল ছদয়ে—সজল নয়নে
 • শুধুটি ঢাকিয়া স্থনীল বসনে,
 ভুলেছ সকল কাজ ?

ঐতানারন চট্টোপাধ্যায়।

কিশোরীচাঁদ মিত্র ।

এইবার সমাজ-সংস্কারবিধরে কিশোরীচাঁদ কি করিয়াছিলেন, তাহাই বলিব। যখন হস্তভাগিনী লক্ষ-বিধবার জন্য দেশবাসীর দৃষ্টি বিচলিত হয় নাই, যখন বহুবিবাহকারী কুলীনগণের কাঁচা গর্হিত বলিয়া বিবেচিত হইত না, এমন কি যখন বাঁহাদিগের উপর জাতিসংগঠনের ভার ন্যস্ত, সেই নারী জাতির শিক্ষাবিষয়ক অস্ত্রাণ সাদরে গৃহীত হওয়া দূরে থাকুক, মহা অসমলকর বলিয়া পরিভাষ্য হইতেছিল, সেই সময়ে কুসংস্কারাক্রম সমাজকে উন্নত করা কিশোরীচাঁদের জীবনের সর্বপ্রথম কর্তব্য বলিয়া বোধ হইল। তিনি এই উদ্দেশ্য-সাধনার্থ যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে কৃতসংকল্প হইলেন।

দীর্ঘই তাহার বাস-ভবনে সমাজোন্নতিবিধায়িনী অল্পদ্ সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইল। যে সভার এই সমিতির প্রতিষ্ঠা হয়, তাহার কার্য-বিবরণীর বাঙ্গালা পুস্তকাদি নিম্নে প্রদত্ত হইল—

সভার কার্যবিবরণী ।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে ১৫ ই ডিসেম্বর দিবসে কান্দীপুরে বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্রের ভবনে বেঙ্কের সামাজিক উন্নতিবিধায়িনী একটি সমিতি স্থাপনের সম্ভাব্যতা বীক্ষার করিবার জন্য একটি সভা আহূত হইয়াছিল। বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে অগ্ররুদ্ধ হইলেন।

কিশোরীচাঁদ মিত্র সভার উদ্দেশ্য সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া সভার কার্য আরম্ভ করেন। তিনি এইরূপে সম্ভাষণ করেন ;—

“যে রূপ আশ্রয়ের সহিত আমার সাক্ষাৎ নিমন্ত্রণে আপনারা যোগদান করিয়াছেন, তদ্বৎ আমরা আপনাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। আপনারা সকলেই জানেন, এই সভার উদ্দেশ্য, এতদেশে সমাজোন্নতিবিধায়িনী সভা সংস্থাপনের সম্ভাব্যতা লব্ধে আলোচনা করা। আমাদের দেশের সমাজ-সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার অথবা ঐরূপ সংস্কারের অপরিমেয় সুফলের কথা পুনরুল্লেখ করিয়া আমি আপনাদের জ্ঞানের অবস্থাননা করিতে চাহি না। ইহা যে সর্বত্রই অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত এবং সর্বপ্রকার সংস্কারের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম, ইহা ব্যতীত যে রাজনীতিক সংস্কার অসম্ভব, ইহা যে আমাদের দেশের উন্নতির সহিত অচ্ছেদ্যভাবে বিজড়িত এবং বলিতে কি, একাধাচক এ সকল সভ্য নিম্নেরই প্রতিদিন আপনাদিগের নিকট প্রতীয়মান

হইতেছে। আমি নিশ্চয় জানি যে, এ বিষয়ে আমি বৈদেশিক অনুভব করিতেছি আপনারাও সেইরূপ করিতেছেন এবং উন্নতির জন্য সেইরূপ যাকুল হইরাছেন। যদি আমি এ বিষয়ে স্থিরনিশ্চয় না হইতাম, তাহা হইলে অল্প সন্ধ্যাকালে আপনাদিগকে আশ্বাস করিয়া কষ্ট প্রদান করিতাম না। আমরা নিশ্চয়ই উদ্দেশ্যসম্বন্ধে একমত হইরাছি। কিন্তু আমি হুঃপিত যে, উপায় ও কার্যের সময়সম্বন্ধে আমরা একমতে উপস্থিত হইতে পারি নাই। আমাদের কার্যকরন বহু নির্ভীক এবং সাধুভাবে অগ্রসর হইবার পক্ষ সমর্থন করেন; অপর পক্ষে অন্য বহুগণ (আর হুঃপিত বিষয়, তাঁহাদিগের সংখ্যাই অধিক) বিপরীত পক্ষ সমর্থন করেন। পূর্বেক্ত পক্ষ তাঁহাদিগের বিবেকের আদেশ কিয়ৎপরিমাণেও লঙ্ঘন করিয়া সাধারণ দেশবাসিগণ কর্তৃক অবলম্বিত প্রাচীন আচার-ব্যবহারসমূহের অনুসরণ করিতে অসম্মত এবং শৈথিল্য পক্ষ যদিও উহাদের অনিষ্টকারিতা ও নৈতিক অপকর্ষণপ্রবণতাসম্বন্ধে জ্ঞাতপ্রভাৱ, তথাপি সেগুলিকে অতিক্রম করিতে অভিলাষী নহেন। আরও এক পক্ষ আছেন, বাঁহারা এই সকল আচার-ব্যবহার ত্যাগ করিতে উপদেশ দেন, অথচ আপনারা সে সকলের অনুসরণ করেন। তাহার পর সময়সম্বন্ধেও মতভেদ আছে। কোন কোন লোকের বিশ্বাস যে, বৈদেশিক অনুষ্ঠানের বিষয় আমরা চিন্তা করিতেছি, এখনও সে সকলের সময় আইসে নাই। আমি যে বলভুক্ত, সে দলের বিশ্বাস যে, আমরা না জানিলে সময় কখনই আসিবে না। শিক্ষিত দেশবাসিগণের মধ্যে সচরাচর একই কথা শুনিতে পাওয়া যায় যে, জাতিভেদ-লোপের ও বিধবাবিবাহপ্রদত্তনের সময় এখনও আইসে নাই। তাঁহারা বলেন যে, আমাদের দেশ এই সকল সংস্কারের জন্য এখনও উপযুক্ত হয় নাই এবং এই সকল সংস্কারবিষয়ে প্রচেষ্টা অতি অসময়ে হইতেছে ও নিশ্চয়ই ফলপ্রসূ হইবে না। আমি অকুণ্ঠিতভাবে বলিতে পারি যে, এই বৃথা উদ্যোগের স্বর—আমাদিগের মধ্যে অকর্ষণাদিগের ওজর—ইহা সেই আলস্যের অবলম্বন—যে আলস্য সমগ্র দেশের প্রয়োজন হইলেও একটি অনুশীল উত্তোলন করে না। আমার কথার বিশ্বাস করুন, আমরা যদি সময় আসিবে বলিয়া অটুপকা করি, তবে দেশের নৈতিক পুনর্জীবন লাভ চিরকালের জন্য হুঃপিত থাকিবে। সময়ই বটে!! কেন, ইহাই আমাদের প্রবর্তন করিবার উপযুক্ত সময়। যদি আমরা বর্জন্য ত্যাগ করি, তাহা হইলে

সময় কখনও আসিবে না । আমাদিগের সন্তানগণ এবং পরে আমাদিগের সন্তানগণের সন্তানগণ ঐ একই সুরে গাহিবে, “সময় এখনও আইসে নাই ।” না, আমাদিগকেই উন্নতিচক্রে ঝড় দিতে হইবে । আমি গম্ভীরভাবে আপনাদিগকে আশঙ্ক করিতেছি যে, সময় আসিয়াছে এবং বর্তমান ভাবে চলিলে ইহা আর কখনও আসিবে না । আমি আগ্রহের সহিত অহুরোধ করিতেছি, আপনারা অগ্রসর হউন এবং সময়ের সুব্যবহার করুন । আমি অহুরোধ করিতেছি যে, আপনারা আপনাদিগের কল্যাণসাধনের বর্তমান সুযোগ পরিত্যাগ করিবেন না । আমি অহুরোধ করিতেছি, আপনাদিগের সমস্ত শক্তি দেশের সমাজসংস্কাররূপ মহান্ ও পবিত্র কার্যে উৎসর্গ করুন । আমি আপনাদিগের অহুরোধ করিতেছি—যাঁহারা মানসিক শ্রেষ্ঠতার অগ্রভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া চতুর্দিকে অজ্ঞতা এবং কুসংস্কারের অজেয় অন্ধকার স্পন্দিত ভাবে দেখিতে পাইতেছেন, তাঁহারা দেশের সমাজ-বিস্তার-কার্যের নেতার গৌরবোজ্জ্বল ব্রত গ্রহণ করুন । আমি দেশের নামে আপনাদিগকে অহুরোধ করিতেছি, আর আপনাদিগের উপর দেশের প্রধানতম অধিকার সকল জুছ করিবেন না, ভবিষ্যৎ সুযোগের জন্ত অপেক্ষা করিয়া উত্তম হইতে বিরত হইবেন না, যে সকল পৈশাচিক সামাজিক পাপের অত্যাচারে দেশ ক্রন্দন করিতেছে, তাহা হইতে তাহাকে মুক্তি প্রাপ্ত করিতে বিলম্ব না করিয়া সমস্ত ছদ্ম, সমস্ত উৎসাহের সহিত এই মুক্তির জন্ত জীবন উৎসর্গ করুন । প্রবন্ধ-রচনার ও বক্তৃতা-প্রদানের সময় গিয়াছে । কায়ের সময় আরও হইয়াছে । অতিশয় সাহসের সহিত—প্রবৃত্ত বলের সহিত মুক্তির পথে দেশকে টানিয়া তুলিতে হইবে । আমাদিগকে এক হইতে হইবে ; অন্তর্গত আমাদিগের উদ্বেগ বার্ষ হইবে । গর গৃহ এক নিশ্বাসে ধূলিসাৎ হয় । প্রাচীন বাঙ্গালী এবং নব্য বাঙ্গালীদিগকে এক সঙ্গে এই অহুষ্ঠানে যোগদান করিতে হইবে । একীভূত উত্তম অসম্ভবকেও সম্ভব করে ।

আমাদিগের ব্যবহারিক ধর্ম পৈশাচিক পাপের আধার । ইহা সকল প্রকার উন্নতির বিরোধী । ইহা প্রতিনিবৃত্ত এবং অতি হস্তান্তরে আমাদিগের সকল সামাজিক অহুষ্ঠানের সহিত সংঘর্ষে আইসে । ইহা কেবল আমাদিগের আচার-নিয়ম নিষ্পত্তি করিয়াই ক্ষান্ত নহে, এমন কি, শৌচাদি বিষয়েও নিষ্পত্তি করিতেছে । ইহা কেবল যে আমাদিগের যাতায়াতের সময় নিষ্পত্তি করিতেছে, তাহা নহে ; কেবল আমাদিগের বাজা নিরোধ করিতেছে,

বৎসরের মধ্যে অর্ধেক সময় ইহা অমঙ্গল বলিয়া ঘোষণা করিতেছে এবং কালাপানি পার হইতে নিবেদ্য করিতেছে, এমনও নহে; পরন্তু আমাদিগকে বলিয়া থাকিতে এবং বিশ্রাম করিতে উপদেশ দিতেছে। হাঁ, আমাদিগকে এক নির্দিষ্ট বিধি অনুসারে আহার ও পান করিতে হইবে, পাঠ করিতে হইবে এবং ভ্রমণ করিতে হইবে, বিশ্রাম করিতে হইবে এবং নিদ্রা ঘাইতে হইবে—যেন আমাদিগের সাধারণ কাৰ্য্য না করিয়া আমরা একটি গভীর এবং পবিত্র ধর্ম-কর্ম করিতেছি। যত্ন, যাক্ষবত্ব এবং অন্যান্য স্বত্বিকারগণ আমাদিগের জীবনের নিত্যকর্মগুলি বন্ধের গাভীরা ও পবিত্রতার সহিত স্নেহের তাবে সংশ্লিষ্ট করিয়া সর্বপ্রকার সামাজিক উন্নতির পথ অতি অব্যর্থ ভাবে রুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। সত্য বটে, গ্রীক ধর্মও গ্রীক আমাদিগের ধর্মের ন্যায় অল্পত হুসংসারে পূর্ণ ছিল; কিন্তু উহা দেশবাসীর সামাজিক ও গার্হস্থ্য আচার-পদ্ধতির সহিত একত্র সংশ্লিষ্ট ছিল না। বরঞ্চ উহা কয়েকটি উত্তম ফল প্রসব করিয়াছিল; যথা—যে ভাষার্থ ও স্থাপত্য জ্ঞানও উহার বিগত গৌরব অরণ করাইয়া দেয় এবং বাহ্য এখনও সমগ্র জগৎ প্রতিযোগিতায় অতিক্রম করিতে পারে নাই—তাহা সেই ধর্ম হইতে সৃষ্ট হইয়াছিল এবং সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল। রোম্যান ক্যাবলিক ধর্ম ইহার নানা গর্হিত নিয়ম এবং অনিষ্টকারিতা সত্ত্বেও (অর্ধেক এবং মেকলে উভয়েই তাহা দেখাইয়াছেন) যুগোপে অতি কল্যাণকর ফল প্রদান করিয়াছিল। ইহা জ্ঞানচর্চা বর্জিত করিয়াছিল, তাই নির্জন প্রদেশে বর্ষব্যাকগণ সাংসারিক কর্ম হইতে মুক্ত হইয়া, বহির্জগতের যত্নমত এবং হুসংসারের প্রভাব হইতে স্বতন্ত্র থাকিয়া জ্ঞানচর্চায় আপনাদিগকে উৎসৃষ্ট করিতে পারিতেন এবং পরে সেই জ্ঞান সাধারণ জনসাধারণ মধ্যে বিস্তৃত করিতে পারিতেন। কিন্তু আমাদিগের জাতীয় হুসংসার সকল প্রকার সামাজিক সংসারে অতি প্রবল ভাবে বাধা প্রদান করে। সুতরাং একটির বিনাশের সহিত অপরটির উন্নতি অসম্ভবভাবে বিলম্বিত। বস্তুতঃ যখন ভারতবর্ষ তাহার সচ্ছিত্ত ধর্মের দাস হইতে মুক্তিলাভ করিবে, তখনই আমরা জাতীয় পার্বক্য এবং অন্যান্য পৈশাচিক সামাজিক পাপের নিগড় হইতে মুক্ত হইব এবং যখন এ দেশ ধর্ম ও সামাজিক যত্ন হইতে মুক্তিলাভ করিবে এবং নবজীবন লাভ করিবে, তখন সকল বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া স্বতঃই উন্নতিমার্গে উঠিতে থাকিবে এবং সত্যতা ও স্বাধীনতার সকল প্রকার অধিকার ও বন্ধে ভুক্ত হইবে।

দৌরবয়স ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন—তাহার আলোক দেখা বাইতেছে—আর অধিক দূরে নহে, পরন্তু আপনাদিগের নিকটই উদ্ভিত হইয়াছে এবং বলুন, আপনারা আপনাদিগের নিকট আগত ভবিষ্যৎ বংশীয়দিগের নিকট এবং ভবিষ্যৎবংশীয়দিগের নিকট এই অদৃষ্টানে যোগদান করিতে বাধ্য কি না ? আমি পুনরায়, যতদূর ব্যাখ্যার সাহায্য সম্ভব, আপনাদিগকে অনুরোধ করিতেছি, আপনারা আপনাদিগের জন্মভূমির সামাজিক উন্নতির পক্ষে ব্রত গ্রহণ করুন ।

“আমি গৌরব এবং আনন্দের সহিত প্রস্তাব করিতেছি যে, ‘এই সত্তার মধ্যে সাধারণ হিন্দুজনসংখ্যার বর্তমান সামাজিক অবস্থার আলোচনা করিয়া বোধ হয় যে, সম্মিলিত এবং বণোচিত প্রযত্নই ইহার উন্নতির একমাত্র উপায় এবং সমাজোন্নতিবিধায়িনী অশ্রু সমিতি নামক একটি সভা স্থাপিত হউক ।’ ”

প্রস্তাবটি বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক সমর্থিত হইলে সর্ববাদিসম্মতি-ক্রমে গৃহীত হইল । তৎপরে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয় ;—

বাবু হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রস্তাব করেন এবং বাবু বাসবচন্দ্র মিত্র সমর্থন করেন যে,—সভাগণ য য চুটান্তে, শিক্ষায়, কর্মে এবং যতে দেশের সামাজিক উন্নতির বিরোধপাদনকারী এবং চুক্তি ও সত্তার বিরুদ্ধ সর্বপ্রকার নীচ এবং নৈতিক অবনতির কারণস্বরূপ কুসংস্কারের অমুখোদন করিবেন না ।

বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র প্রস্তাব করেন এবং বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত সমর্থন করেন যে, খ্রীশিক্ষার প্রবর্তন, হিন্দু-বিবাহার পুনবিবাহবর্জন, বাসাবিবাহ এবং বহুবিবাহ প্রচলন-প্রোধের নিমিত্ত সমিতির শক্তি বিশেষভাবে প্রয়োগ করা হউক ।

বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রস্তাব করেন এবং বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র সমর্থন করেন যে, উক্ত প্রস্তাব অমুসারে এই সমিতি হিন্দু-বিবাহার পুন-বিবাহের আইন সম্বন্ধীয় অক্ষমতা দূর করিবার জন্য ব্যবস্থাপক-সভায় আবেদন করুন এবং আপাততঃ অনতিদূর অয়োজনে নগরের উপকণ্ঠে অথবা ভিন্ন ভিন্ন পাড়ায় বাসিকা-বিভাগের প্রতিষ্ঠার প্রবন্ধ ও প্রচেষ্টা করুন ।

বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র প্রস্তাব করেন এবং বাবু কান্টিনাথ দত্ত সমর্থন করেন যে, সত্তার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতাবিশিষ্ট একটি কার্যনির্বাহক সমিতি সংগঠিত হউক ।

রাত্রি ২৪ ঘটিকার সময় সভাপতিকে প্রবাহুবারী ধস্তাবাদ প্রদান করিয়া সভা ভঙ্গ করা হয়।

(বাক্যের) শ্রীদেবেশ্বরনাথ ঠাকুর

সভাপতি

সভাপতি

বাবু দেবেশ্বরনাথ ঠাকুর

কার্যনির্বাহক-সমিতির সভাগণ।

রাজা সত্যচরণ ঘোষাল বাহাদুর, বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র, বাবু হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বাবু চন্দ্রশেখর দেব, বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র, বাবু ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র, বাবু জামাচরণ সেন, বাবু দিগম্বর মিত্র, বাবু বামদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বাবু গৌরদাস বসাক, বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত, বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র।

সম্পাদকগণ

বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র।

বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত।

এই সভার সভ্যগণের নামের তালিকা পাওয়া যায় না। তবে অধিকাংশ শিক্ষিত হিন্দু যে ইহাতে যোগদান করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। বাবু রাধানাথ শিকদার ও বাবু বসিকরুক্ষ মল্লিক প্রভৃতি এই সভার সভ্য ছিলেন; কারণ, ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে ২ই ডিসেম্বর তারিখে কিশোরীচাঁদ ডায়েরীতে লিখিয়াছেন,—

Myself, Brother, Radhanath, Russic and Tarucknath Sen considered and revised our petition to the Legislative Council regarding the remarriage of Hindu widows.

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের কার্যনির্বাহক-সমিতির সভ্যগণের মধ্যে এই কয়টি নতুন নাম দেখিতে পাওয়া যায়—বাবু লিবাচন্দ্র দেব, বাবু হরচন্দ্র ঘোষ, বাবু হেরম্বচন্দ্র চৌধুরী, বাবু জীবনরুক্ষ সেন।

আমরা ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত এই সভার একটি বাৎসরিক কার্য-বিবরণী প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহা হইতে দৃষ্ট হয় যে, এই সভায় বহু প্রয়োজনীয় সমাজসংস্কারবিষয়ক প্রস্তাব আলোচিত হইয়াছিল এবং সংস্কারকল্পে যথাসাধ্য চেষ্টাও হইয়াছিল। আমরা এই সভার অসুষ্ঠি ও কয়েকটি প্রবান কুখ্যোর সাক্ষিপ্ত পরিচয় নিয়ে প্রদান করিতেছি।

(১) ১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দের প্রারম্ভে এই সভা বহুবিবাহ নিষাধনের নিমিত্ত ভারতীয় ব্যবস্থাপক-সভায় সর্বপ্রথম আবেদন প্রেরণ করেন । (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ও তাঁহার বহুবিবাহবিষয়ক পুস্তকের সূচিকাংশ লিখিয়াছেন যে, কিশোরীচাঁদই সর্বপ্রথম বন্ধুবর্গ-সমবায় হইতে এই গরিব প্রথার বিরুদ্ধে ব্যবস্থাপক-সভায় আবেদন প্রেরণ করেন ।) রক্ষণশীল হিন্দুগণের নেতা রাজা রাধাকান্ত দেব এই আবেদনের বিরুদ্ধে আর একখানি আবেদন করেন । ১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দে বহু সত্ৰান্ত ব্যক্তি এই আবেদনের অমুদ্রণ আর একটি আবেদন প্রেরণ করেন । স্মরণ্য এই সমবায় হইতেই একটি দেশ-ব্যাপী আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছিল । ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের কার্যবিবরণীতেও বোঝা যায় যে, ঐ বৎসর ঐ সমবায় আর একখানি সুদৃঢ় আবেদন প্রেরণ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন ।

(২) এই সভা পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রস্তাবিত বিধবা-বিবাহ-বিষয়ক আইন বিধিবিদ্ধ করিতে সাহায্য করেন । তাঁহার সাকল বিষয়েই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত একমত হইয়াছিলেন । কেবল বিধবাবিবাহ যে হিন্দুশাস্ত্রমত, কয়েকজন সভ্য তাহা বিশ্বাস করেন নাই । সেইজন্য এই সভা প্রস্তাবিত আইনের কোনও অংশ সামান্য পরিবর্তিত করিবার নিমিত্ত আবেদন করিয়াছিলেন এবং বিধবাবিবাহ রেজেষ্ট্রারী করিবার প্রস্তাব করেন । ব্যবস্থাপক-সভার বিশেষ সমিতি মিঃ গ্রাণ্টের বিল পরীক্ষা করিবার সময় তাঁহাদিগের রিপোর্টে এই সমবায়ের প্রস্তাব কেন গৃহীত হইতে পারে না—তাহা লিখিয়াছিলেন । যাহা হউক, বিধবাবিবাহ আইন বিধিবিদ্ধ হওয়ার এই সভা আনন্দ প্রকাশ করেন এবং পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে তাঁহার “অদম্য উৎসাহ এবং অপূর্ণ দেশহিতৈষণার” জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন । ১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই এবং ৮ই ডিসেম্বর বঙ্গদেশে এই আইনাঙ্গুরে যে প্রথম এবং দ্বিতীয় বিধবাবিবাহ অমুষ্ঠিত হয়, তাহাতে এই সভার সম্পাদক (কিশোরীচাঁদ) এবং সভার অনেক সভ্য “পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রকে এই কার্যে সাহায্য করা কর্তব্য এবং গৌরবের বলিয়া বোধ করিয়াছিলেন ।” এই স্থানে কিশোরীচাঁদের ডায়েরী হইতে হই এক অংশ উদ্ধার করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না ;—

7th December 1856.—This day will form an era in the annals of my country. The first marriage of a Hindu widow

was celebrated this night at about 12 o'clock P.M. It took place at the house of Rajkisto Mokerjee, Sukea's Street Simlah. The bridegroom is Pandit Srish Chunder Bidyaratno, son of the late celebrated Kottnuck Ramdhone Sreemony and Law Officer of the Moorshedabad Circle. The bride is the widow daughter of the late Burmanand Mokerjee. I started after dinner with Brother, Sib Chunder Deb, Gopee and other friends. There was a large gathering in the house. There were not only Young Bengal but several Professors of Govt. Sanscrit College, Pandits of Bally and other places and one or two members of Old Bengal. Everything went off well. The ceremony was conducted in the old orthodox way. The mother of the bride Lucksmi Dabeah gave away the bride. Ramgopal and myself were only present in the room where it took place besides the members of the family and Issur Chunder Bidyasagar whose indefatigable zeal and inimitable tact so largely contributed to this happy result.

December 8. Attended another remarriage this evening. The parties who tied the hymenical knot were Kyastho and members of most respectable families. The bridegroom is Mudhoo Sooden Ghose son of . . . and brother-in-law of Ramkally Ghose connected with the Sahab Gat Raj family. The bride is the widow daughter of Isser Chunder Mitter of Suntunia.

(৩) এই সভায় গন্ধাযাত্রা উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব আলোচিত হয়; কিন্তু শিক্ষাবিশ্তাৰেণ সাহিত শীত্ৰই এই প্রথা বিলুপ্ত হওয়া সম্ভব, এই বিবেচনা কৰিয়া গৰ্ব্বমেন্টে আবেদন কৰা নিম্নাযোগজনীয় বলিয়া বিবেচিত হয়।

(৪) জীশিকা-বিশ্তাৰেণ জনা এই সভা প্রথম হইতেই উৎসুক ছিলেন। সম্মাদক (কিশোৰীচাঁদ) কর্তৃক উৎসাহ কাশীপুত্ৰ হওনে একটি বাগিকা-

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু ছাত্রীর অভাবে এবং স্থানীয় ব্যক্তি-
গণের সহায়ত্বের অভাবে ঐ বিদ্যালয় উঠিয়া যায়।

(৫) বাঙ্গালী কৃষকগণের মথারী অবস্থা ইংলণ্ডের জনসাধারণের গোচর
করিবার উদ্দেশ্যে এই সভা “প্রজাগণের সামাজিক অবস্থা” বিষয়ে সর্বোৎ-
কৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য ৫০০ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেন। কিন্তু পরীক্ষকগণের
(সভাপতি, সম্পাদক এবং রেভারেন্ড মিঃ জে, লঙ্ক) মতে কোনও প্রবন্ধ
পুরস্কারযোগ্য বিবেচিত হয় নাই। সুতরাং প্রাইজ ফণ্ডের টাকায় প্রজাগণের
অবস্থাসম্বন্ধীয় মৌলিক এবং গবেষণাপূর্ণ পুস্তক বা পুস্তকানুশীলন, রিপোর্ট প্রভৃতি
প্রচার করা হইবে স্থির হয়।

(৬) চড়ক পুজার সহিত সংশ্লিষ্ট যে সকল নিষ্ঠুর প্রথা প্রচলিত সে
সকলের উচ্ছেদের জন্য এই সভা বিশেষ চেষ্টা করেন।

উপরে বর্ণিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে এই সভার অঙ্গীকৃত কার্যাবলী সম্বন্ধে
একটা স্থূল ধারণা হয়। সে সময়ে সমাজ-সংস্কার কার্য নিত্য সহজসাধ্য
ছিল না। কারণ, তখন শিখা এত বিস্তৃতি লাভ করে নাই এবং অসংখ্য
যুক্তি সকলও অজ্ঞানতাবশতঃ প্রতিষ্ঠিত হইত। এইস্থলে আগত পুরুষোক্ত
কার্যবিবরণীর উপসংহারংশের অমূল্য প্রদান করিয়া এই পরিচ্ছেদ শেষ
করিব। বলা বাহুল্য, এই বিবরণী কিশোরীচাঁদ কর্তৃক লিখিত।—

“আপনাদিগের কার্যানির্বাছক-সমিতি এই সভার এই সংযুক্ত অথচ
সংক্ষিপ্ত কার্যবিবরণীর উপসংহারে গভ বৎসরে অতি অল্প কার্য সংসাধিত
হইয়াছে বলিয়া হুঃ প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু এ বৎসর যে বিফলে
প্রিয়াছে, এখন কথা বলা যায় না। অজ্ঞতা ও কুসংস্কার জন্মে ইহা বিশেষিত
হইয়াছে। হস্তাধিনি বিনবাগণের লুপ্ত হইয়াছে এবং অল্প ভবিষ্যতে
হিন্দুনারী আর গাহ-হা বন্ধ বলিয়া নিশ্চিত হইবেন না। সভার দূরীকরণীয়
দুষ্কৃতির বিপুলতা এবং প্রস্তাবিত উদ্দেশ্য ও প্রাপ্ত সুযোগের অসমতা বাহ
অকৃতকার্যতার যথেষ্ট কারণ বলিয়া অনুভূত হইবে।

* “আপনাদিগের দেশের সভ্যত্বপূজিত বিধানসভা, ইহার অতি প্রাচীন
অথচ অধ্যাত্মিক আচারসমূহ, ইহার পুরাতন অথচ ন্যায়বিরুদ্ধ কুসংস্কার-
সমূহ এক দিনে উজ্জ্বল হইবার নহে। সাফল্যের মুহূর্ত লাভ করিবার পূর্বে
এই সভাকে বহু বৎসর কার্য করিতে হইবে। কিন্তু সংসাধিত পরিবর্তনের
ওকৎ দর্শন করিয়া মুক্ত না হইয়া পাকা যায় না। যখন আপনাদিগের সমিতি

কয়েক বৎসর পূর্বের হিম্মত মানসিক অবস্থার সহিত বর্তমান অবস্থার তুলনা করেন—যখন তাঁহারা মরণ করেন। সেই এক সময়ের—অবিচ্ছিন্ন অজ্ঞতা কিরূপে দূর হইল—কিভাবে সমগ্র জাতির মতি কুসংস্কারে নীচতাপ্রাপ্ত এবং চিত্তবিকারে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়াছিল, কিভাবে তাহারা শৃঙ্খলমুক্ত হইতেছে ও ক্রান্তির প্রাধান্য আতিক্রম করিয়াছে এবং আপনাদের স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছে—তখন তাঁহারা সমাজসংস্কারবিষয়ে নিরাশ হইবার কারণ দেখিতে পাবেন না এবং সর্জনশক্তিমান্ সিদ্ধিহাতার ঐতি ধন্যবাদের অশেষ কারণ বিদ্যমান আছে মনে করেন।”

ঐময়খনাথ বোষ।

সনেট।

কি সাধে কল্লনবালা এ ফুল মন্দিরে,
যেহে এমনি নব বেশ বিনোদিনী ?
যেরিহা জদর মুড় ও রূপ, রতিনী,
খেলে কি করুণ আভা তরুণ মিহিরে ।
মরি কি লহরীগীণা তাব-নদীতীরে,
করেছে প্রফুল্লচিত্ত কবিকুরুগণে,
শোভাশ্রী ইতালীর কাব্য কুজবনে,
কি মধুসূদীত-অনি উঠিছে সুধীরে ।
সুখদ-বিশাস-কল্প-কাননে তোমার,
বাজাও বিনোদ বীণা হে বীণাবাদিনী !
ঢেলেছ কি মর্ত্যাত্মে জিহ্বা স্বভাৱ,
স্বর্গের বর্ষণে যেন তুল্য এ মেদিনী !
বিচিত্র অনিররসে ডুবেছে সংসার,
কি অপূর্ণ সুখমার হুটি যাবাবিনী !

ঐনগেননাথ সোম।

শেষ পাঠ ।

[স্পেনের রাণী ইসাবেলা উচ্ছ্বলতাযেতু জনসাধারণের অপ্রীতিভাজন হইলেন। শেষে ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে দেশের লোক বিদ্রোহী হইয়া উঠে ও ইসাবেলা ফ্রান্সে পলায়ন করেন। তখন বিদ্রোহ-নেতৃগণ কাহাকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবেন, তাহারই বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। যুস্বন বংশের কাহাকেও রাজ্য করা দেশের লোকের অভিপ্রেত ছিল না। পটুগালের রাজাকে রাজ্য করিয়া দুই দেশ এক রাজ্যে পরিণত করিবার প্রস্তাবও হয়। কিন্তু পটুগালরাজ সে প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন না। শেষে ফ্রান্সিস রাজ-বংশোদ্ভূত প্রিন্স লিয়োপোল্ডকে রাজ্য করিবার প্রস্তাব হইল এবং লিয়োপোল্ড ফ্রান্সিস প্রিন্স বলিয়া সে বিষয়ে ফ্রান্সিস রাজ্য উইলিয়মের সম্মতি লইলেন। ফ্রান্সের রাজ্য তৃতীয় নেপোলিয়ন কিন্তু মনে করিলেন, ইহা ফ্রান্সিস প্রত্যাখ্যানকারক মন্ত্রী বিসমার্কের চক্রান্ত। তাহাকে ভুট্ট করিবার জন্য লিয়োপোল্ড স্পেনের রাজ্য হইতে অবরুদ্ধ হইলেও তিনি নিরস্ত হইলেন না এবং যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া শেষের অসম্বল জনগণকে আকৃষ্ট করিবার সক্ষম করিলেন। তিনি প্রস্তাব করিলেন, ভবিষ্যতে কোন হোহেন-হোলানকে স্পেনের রাজ্য করিবার কথা হইলে উইলিয়ম তাহাতে বাধা দিবেন। উইলিয়ম এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলে ফ্রান্সের সহিত ফ্রান্সিসের যুদ্ধ ঘোষিত হইল। যুদ্ধে ফরাসীদিগের পরাজয় হইতে লাগিল। শেষে সিডান সমরক্ষেত্রে ফরাসী সেনাদল সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল। নেপোলিয়ন বন্দী হইলেন। নেপোলিয়নের পত্নী ইউজিন ইংলণ্ডে পলায়ন করিলেন। ফ্রান্সে আবার সাধারণতন্ত্র শাসন প্রতিষ্ঠিত হইল। এ দিকে বিজয়ী জার্মান সেনা ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস অবরুদ্ধ করিল। প্যারীস-বাসীদিগের হুর্দশার সীমা রহিল না। শেষে সন্ধি সংস্থাপিত হইল। ফ্রান্স জার্মানীকে প্রভূত অর্থ এবং আলসেস ও লোরেনের অবিকাশ প্রদান করিলেন। কালের ভেদে ফ্রান্সের ছবয়ে সে ক্ষত বিলুপ্ত হয় নাই। বর্তমান যুদ্ধে ফরাসী সেনা এই প্রদেশে প্রবেশ করিবারাত্র অবিবাসীরা তাহাদিগের সহিত যোগ দিয়াছে। আলসেস প্রদেশের অপমানে ফরাসী-দিগের মনোভাব বিখ্যাত ফরাসী লেখক ডডের নিম্নে অঙ্গুভিত গল্পে সপ্রকাশ।]

আমি পাঠশালায় বাইতেছিলাম। সে দিন আমাদের ব্যাকরণের পরীক্ষা গৃহীত হইবে। একে আমি ব্যাকরণে তেমন অতিজ্ঞ ছিলাম না, তাহাতে আবার পাঠশালায় নির্দ্ধারিত সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল—কাবেই আমি কিছু ক্রতগতিতে পাঠশালায় দিকে ধাবিত হইয়াছিলাম।

তখন গ্রীষ্মকাল। আকাশ মেঘমুক্ত। পাখীগুলি বনান্তরাল হইতে ডাকিয়া ডাকিয়া ঘন পরিশ্রান্ত হইতেছিল। সম্মুখে সুবিস্তৃত ময়দানের এক পার্শ্বে প্রলিয়ান সৈন্তগণ মল্লক্রীড়ায় রত। ব্যাকরণের সুদীর্ঘ পুস্ত্র অপেক্ষা এই সকল আমার চিত্ত তখন অধিক আকৃষ্ট করিয়াছিল, সন্দেহ নাই। তথাপি আমি সব প্রলোভন সন্মরণ করিয়াছিলাম।

আমি যখন আমাদের মেরয় মহাশয়ের গৃহের নিকটে বাইতেছিলাম, তখন দেখিলাম এক দল লোক তাহার বিজ্ঞাপন-স্তম্ভের নিকটে দাঁড়াইয়া কি একটা নূতন বিজ্ঞাপন দেখিতেছে। দুই বৎসর বরিয়া প্রতিদিন ঐ স্তম্ভে যুদ্ধের নানা-রূপ ভীষণ ছঃসংবাদ টানাটানা দেওয়া হইত। আজও ঐরূপ একটা কিছু প্রদত্ত হইয়া থাকিবে মনে করিয়া আমি যুদ্ধকালও বিলম্ব না করিয়া চলিয়া গেলাম। বৃদ্ধ স্বর্ণকার ওয়াষ্টার তাহার একজন শিক্ষানবীসকে লইয়া তখন ঐ বিজ্ঞাপন পাঠ করিবার জন্য আগ্রহ হইতেছিল। সে আমাকে ডাকিয়া বলিল, “এত ক্রত ধাবিত হইবার প্রয়োজন নাই, তোমার বিদ্যালয়ের কার্য আরম্ভ হইতে এখনও অনেক বিলম্ব আছে।” আমি মনে করিলাম, সে আমাকে বিজ্ঞপ করিতেছে। আমি হাঁপাইতে হাঁপাইতে বসিয়া পাঠশালায় উপনীত হইলাম।

সাধারণতঃ বিদ্যালয়ের কার্য আরম্ভ হইবার সময় বালকগণের কলরব রাজপথের লোকগুলিকেও উত্‍যাক্ত করিয়া তুলে। কেহ চীৎকার করিতে থাকে, কেহ টুল টেবল সজোরে নিক্ষিপ্ত করিতে থাকে, কেহ বা সহপাঠীগণের সহিত সম্বন্ধে নির্দ্ধারিত পাঠ চীৎকার করিয়া বলিতে থাকে। আর শিক্ষক মহাশয় তখন তাঁহার বৈদ্রব্যানি আশ্বাসন করিয়া সজোরে “চুপ চুপ” বলিতে থাকেন।

আমি সেই সুযোগে নিঃশব্দে বাইয়া সকলের অগোচরে খীর আসন গ্রহণ করিব, ইচ্ছা করিয়াছিলাম। কিন্তু সে দিন কি বিশ্বকর ব্যাপার—রবিবারের মত সব নীরব—কোথাও লাড়া শব্দ নাই। আমি যুক্ত গব্যাকপথে দেখিলাম, আমার সহপাঠীরা নীরবে বসিয়া আছে এবং আমাদের শিক্ষক মহাশয় সুদীর্ঘ

একখানি বেত্র বগলে লইয়া ইতস্ততঃ পাইচাটী করিতেছেন। আমি দরজা খাড়া দিয়া সেই অনীম নীরবতার মধ্যে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলাম। ভয়ে আমার মুখ রক্তবর্ণ ধারণ করিল।

কিন্তু কি আশ্চর্য! শিক্ষক মহাশয় ক্রোধের পরিবর্তে আমাকে ধীরে প্রশান্তভাবে বলিলেন,—“ফ্রাঙ্ক, তোমার নির্দিষ্ট স্থানে সত্বর উপবেশন কর। আজ আমরা তোমাকে ২০ ডিগ্রাই বিদ্যালয়ের কাণ্ডে আরম্ভ করিতে প্রস্তুত হইরাছিলাম।”

আমি সত্বর যথাস্থানে উপবেশন করিলাম। আমার ভয় বিদূরিত হইল; আমি চাষিয়া দেখি, তিনি সাধারণ পুরুষের নিত্যগণের দিনে অথবা কেহ বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে আসিলে বেত্রপ পরিচ্ছন্ন পরিধান করিতেন, আজ সেইরূপ বেশ পরিধান করিয়াছেন। ছাত্রগণও আজ কিরূপ গভীর হইয়া বসিয়া আছে। সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয়, কক্ষের প্রান্তে যে সকল আসন প্রতিদিন শূন্য হইয়া পড়িয়া থাকিত, আজ সে সকল আসনে গ্রামের বৃদ্ধগণ স্থান গ্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহারাও আমাদেরই মত নীরবে উপবেশন করিয়া আছেন। বিদ্যালয়ের কৃত্য স্থানস্বরূপ তাহার তৃণনির্ধৃত টুপীটি পরিয়া ঐ স্নেহ উপহৃত। আমাদের কৃত্যপূর্ণ বিচারক, প্রাচীন পোটামাটোর ও অস্তিত্ব বহু সম্ভ্রান্ত লোককেও ঐ স্থানে দেখিতে পাইলাম।

স্থানস্বরূপ তাহার বহু দিনের পুরাতন জীর্ণ প্রথমভাগখানি খুলিয়া আপনাতর জাহুর উপর রাখিয়াছিল। তাহার চসমা জোড়াটি সেই পুস্তকের উপর পড়িয়া রহিয়াছে। সকলেই কেমন বিষন্ন।

আমি যখন এ সকলের কারণ নির্ণয় করিতে পারিতেছিলাম না, তখন শিক্ষক মহাশয় তাঁহার নির্দিষ্ট চেয়ারে উপবেশন করিলেন এবং আমাকে ইত্যপূর্বে বেত্রপ কোমল স্বরে তিনি সন্ধান করিয়াছিলেন, সেইরূপ করে সকলকে সন্ধান করিয়া বলিতে লাগিলেন,—

“সৎসপন, আমার অধ্যাপনা-কার্যের আজ শেষ দিন। আমি আর তোমাদিগকে পড়াইব না। বাণিন হইতে এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি যে, আলসেস ও লোরেনে অতঃপর ফরাসী ভাষার পরিবর্তে জার্মান ভাষা শিক্ষা প্রদান করা হইবে। তোমাদের নূতন শিক্ষক আগামী কলা আদিয়া উপস্থিত হইবেন। আজই তোমরা ফরাসী ভাষার শেষ শিক্ষা গ্রহণ কর। আমি তোমাদিগের সকলকে বিশেষরূপে মনোযোগ প্রদান করিতে অসুযোগ করিতেছি।”

শিক্ষক মহাশয়ের এই কথা শুনিয়া আমার হৃদয় বাণিত হইল। বুঝিলাম, বিচারালয়ের বিজ্ঞাপন-পত্রে তবে এই সংবাদই প্রচারিত হইয়াছিল। হায় আমার মাহাত্ম্য! আমার প্রিয় কগনী ভাষা!—অদ্যকার দিনের অবস্থানের সহিত আমাদের এ ভাষাশিক্ষার সুযোগেরও অবধান হইবে! আর আমরা এই ভাষা শিক্ষা করিতে পাইব না।

পূর্বে জানিলে কে এমন করিয়া বুঝা সম্বন্ধে মন্ত করিত? কে পুস্তক ফেলিয়া নানারূপ খেলায় সময় কাটাইত? কে বিদ্যালয়ে অসুপস্থিত থাকিয়া পশ্চিমবঙ্গের অসুপস্থানে ছুটিয়া বেড়াইত? আজ হৃদয় সে ক্ষত অসুতাপান্নে দগ্ধ হইতে লাগিল। এক দিন যে পুস্তকগুলি কত আশ্রয় ছিল, আজ তাহাদের ক্ষত প্রাণ কেমন কাঁদিতে লাগিল। আমার সেই ব্যাকরণ—সেই ইতিহাস যেন বহু দিনের পরিচিত বন্ধুর মত আমার নিকট প্রতীক্ষমান হইতে লাগিল। সেগুলিকে পরিভ্যাগ করিতে হৃদয়ে যেন কেমন বেদনার স্ফূর্তি অনুভব করিতে লাগিলাম। আমাদের সেই পুরাতন শিক্ষক মহাশয়ও আজ আমার নিকট কত চির? তাঁহার অদর্শনের সম্ভাবনা আজ যেন তাঁহার প্রদত্ত সঙ্গপ্রকার কঠিন দণ্ড ও পোষাঘাত আমাদের স্মৃতিশব্দ হইতে বিদূষিত করিল। হায় আমাদের চিরসুহৃদ! আজ বিদ্যায়ের শেষ দিন সমুপস্থিত বলিয়াই বুঝি তিনি এমন অক্ষর পরিচ্ছদ বাহন করিয়াছিলেন; গ্রামের বৃদ্ধসদৃশ বুঝি তাই আজ বিদ্যালয়ে সমাগত। গত চল্লিশ বৎসর এই বৃদ্ধ শিক্ষক প্রাচ্যের যে উপকার সাধন করিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিয়া আজ বুঝি বৃদ্ধগণের অক্ষর কৃতজ্ঞতার পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

আমি যখন এইরূপ চিন্তা করিতেছিলাম, তখন শিক্ষক মহাশয় আমাকে আহ্বান করিলেন। আমার মনোযোগ সে দিকে আকৃষ্ট হইল। আমি আমার পাঠ বলিতে আরম্ভ হইলাম, কি জানি কি এক বক্তিবলে সে দিন ব্যাকরণের স্তম্ভগুলি নিভুল ভাবে পরিভাষ্য করে আবৃত্তি করিয়া গেলাম। কেবল প্রথম শব্দ উচ্চারণকালে আমার কণ্ঠ যেন রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল; আমার চিত্তের সকল ঐশ্বর্য অতিক্রম করিয়া আমি কেমন বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলাম; তাই সমুখের কাঠাসনে বহুক্ষণ বস্তুক অবনত করিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। তখন শিক্ষক মহাশয় বলিলেন,—

“প্রিয় ব্রাহ্ম, আমি তোমাকে আজ তিরস্কার করিব না। তুমি অন্তরে আজ যে কঠোর শান্তি তোপ করিতেছ, তাহার তুলনা নাই। এতকাল মনে করিয়াছ,

সন্মুখে বসেই সময় ও সুযোগ বিদ্যমান ; আগামী কলা শিক্ষা করিব বলিয়া এত কাল কত পাঠ ফেলিয়া রাখিয়াছে ; কিন্তু একবার ভাপাচক্রের ঘোর পরিঘর্টন দর্শন কর । আলসেসের সকল লোকই এই ধোঁষে ডুবে । প্রতিদিনই তাহার কলা করিব বলিয়া পাঠ ফেলিয়া রাখিয়াছে । আজ যখন বিদেশী আসিয়া বলিবে, ফরাসী ভাষা অবগত নহ অথচ ফরাসী বলিয়া গর্ব কর ? অথন আমরা কি উত্তর দিব ?

“এ সকলের ভিত্ত, ফ্রাঙ্ক, তুমিই একমাত্র দোষী নহ, আমরা সকলেই ভুলান্ধে নিম্ননীয় । তোমার পিতামাতা হয় ত কতদিন সামান্য একটা পরসার লোতে তোমার পাঠের বহুদূর সময় নষ্ট করিয়া তোমাকে কারখানার কার্য করিতে প্রেরণ করিয়াছেন । আমি নিজেও কতদিন তোমাকে শিক্ষা প্রদানকালে পাঠ বলিয়া না দিয়া আমার জুল গাছে জপসেচন করিতে নিযুক্ত করিয়াছি, কতদিন বা তোমাদের অসময়ে ছুটী দিয়া আমি মস্তক ধরিতে গমন করিয়াছি । হায়, কি ভুল কাণে আমরা বহুদূর সময় অতিবাহিত করিয়াছি !”

তিনি অতঃপর ফরাসী ভাষাস্বত্বে কত কথাই বলিতে লাগিলেন । ভাষার মতে এই ভাষা পৃথিবীতে সর্বাধিক উৎকৃষ্ট ভাষা । এমন মধুরতা আর কোনও ভাষায় নাই । এত সহজ-বোধগম্যও বোধ হয়, অপর কোনও ভাষা নহে । আমরা সবচেয়ে এ ভাষা রক্ষা করিব, কখনও এ ভাষাকে বিস্তৃতির সাগরে নিক্ষেপ করিব না । মানব যখন পরাধীন হয়, তাহাদের ভাষা-সম্পদের মধ্যেই তাহাদিগের স্বাধীনতার বীজ নিহিত থাকে । পরে ব্যাকরণ গ্রহণ করিয়া তিনি আমাদের উল্লেখ প্রদান করিতে লাগিলেন । এমন বিশদরূপে বুঝি তিনিও কখন ইহার সুত্রগুলি ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ হইবেন নাই ; আশ্চর্য্য বুঝি ইতঃপূর্বে এমন প্রাক্কলরূপে বুঝিতে পারি নাই । আমার কাছে আজ সকলেই যেন সহজবোধ্য বলিয়া অনুভূত হইতেছিল । তিনি যেন আজ ভাষার সমস্ত জ্ঞান এক দিনে আমাদের সম্মুখে ঢালিয়া দিতে ব্যগ্র হইয়া ছিলেন ।

আমাদের ব্যাকরণ পাঠ সমাপ্ত হইল, আমরা হস্তলিপি লিখিতে যেনোনিবেশ করিলাম । আজ শিক্ষক মহাশয় আমাদের এতোকের সন্মুখে যে আদর্শলিপিগুলি রাখিয়াছিলেন, তাহাতে বড় বড় অক্ষরে সুন্দররূপে ফ্রাঙ্ক, আলসেস এই দুইটি কথা লিখিত ছিল । ঐ লিপিক্রম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পতাকার দ্বারা এতোকের

সমুদয় টেনলে শোভা পাইতে লাগিল। প্রত্যেকেই সর্গতে সে দিন সে লিপির অক্ষররূপে বস্তাকর লিখিতে যত্ববান হইল। গৃহে জনকালের অল্প নিমন্তরতা বিরাজ করিতে লাগিল। শুধু কলমের খসখস শব্দ ব্যতীত আর কিছু শ্রুতিগোচর হইতেছিল না। একবার মাত্র কতগুলি ভ্রমর সেখানে উড়িয়া আসিয়াছিল; অল্প দিনের মত এ সকল ক্ষুদ্র গটনা কাহারও মনোযোগ আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইল না। এমন কি, ছোট ছোট শিশুগুলিও যেন এমন করাসী ভাবে অতৃপ্নানিত হইয়াছিল যে, তাহারও যেন তাহাদের প্রিয় ফ্রাঙ্কের নাম লিখা পরিত্যাগ করিয়া ক্রীড়ায় উন্নত হইতে পারিতেছিল না। গৃহের ছাতে কতগুলি কপোত বড় বৃহৎসরে ডাকিতেছিল। আমার মনে হইতে লাগিল, তাহারও বৃষ্টি অন্তঃপর আশ্রয় ভাষায় তাহাদের ধ্বনি করিতে আদিষ্ট হইয়াছে।

আমি মাঝে মাঝে অবসরমত যখনই আমার খাতার অন্তরাল হইতে লিখক মহাশয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিলাম, দেখিতেছিলাম, তিনি নিশ্চল ভাবে বসিয়া শুধু বিদ্যালয়ের সকল প্রযুক্তি একান্ত মনোযোগের সহিত দর্শন করিতেছেন। মনে হইতেছিল, তিনি বৃষ্টি ঠাণ্ডা প্রিয় প্রযুক্তির একটা শেষ প্রতিরূতি এইরূপ ভাবে তাঁহার দ্বন্দ্বের অঙ্কিত করিয়া লইতে চাহিতেছেন। আহা, চল্লিশ বৎসর তিনি এই গৃহে কত সময় অতিবাহিত করিয়াছেন; আজ এই গৃহের ক্ষুদ্র যে তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়ে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? তাঁহারই বহু-রোপিত বাদ্য বস্তুটি আজ শাখা-প্রশাখার বিকৃষিত হইয়া বায়ুতরে হেলিতেছে ছলিতেছে, তাঁহারই সযত্নবর্দ্ধিত কামিনী পুষ্পের লতিকা গবাক্ষ ছাইয়া গিয়াছে, তাঁহারই সজ্জিত কাঠাসনগুলি অতিরিক্ত ব্যবহারে কতক ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে। আজ এইগুলি যেন তাঁহার প্রাণের সহিত কেমন এক বেদনা-বন্ধনে বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে। বিশেষ এই সময় তাঁহার ভগিনী যখন পার্শ্ববর্তী কক্ষে তাহাদের ব্যবহার্য্য প্রযুক্তি ভিন্নবিদ্যার নিমিত্ত গুছাইতেছিলেন, তখন তাহার প্রাণে কেমন এক উদাস ভাবের সৃষ্টি হইতেছিল। তথাপি শেষ পর্য্যন্ত তিনি তাঁহার অব্যাপনার কাব্য-নির্কাহ করিয়া কেমন সাহসিকতা ও কর্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় দিতেছিলেন। আমাদের হস্তলিপির বণ্ট। অতিবাহিত হইল, আরও ইতিহাসে মনোনিবেশ করিলাম। অল্পবয়স্ক বালকরা সময়ে প্রথম ভাগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বানানগুলি অধ্যয়ন করিতে লাগিল, বৃদ্ধ ছাত্রের তাহার চমকা পরিচয় প্রথমতঃখানি হাতে

লইয়া তাহাদের দীর্ঘত বশমান করিয়া পড়িয়া যাইতে লাগিল। সে-ও তাহার কঠিনা সূত্ররূপে সংলগ্ন করিতে লাগিল। তাহার কঠিন উদ্দেশ্যের কল্পিত হইতেছিল, তাহার সে আশ্রয় আমাদের ক্ষমতায় যুগপৎ হস্ত ও ক্রমশঃ ছুটাইয়া তুলিয়াছিল। অহা! সে দিনের সে দৃষ্ট জীবনে কখনও বিস্তৃত হইব না।

শিক্ষার বৃত্তিতে টং টং করিয়া তখন চারিটা বাজিয়া গেল। প্রিয়ান সৈন্ত-গণ তাহাদের ব্যায়াম শেষ করিয়া আমাদের গবাক্ষের নিম্নে সম্মিলিত হইল। শিক্ষক মহাশয় তাহার চেয়ার পরিত্যাগ করিয়া গাজোখান করিলেন। তাহার বদন বিস্তৃত ও বিবর্ণ বোধ হইতেছিল। তাহাকে যেন সে দিন অস্বাভাবিক দীর্ঘ বলিয়া মনে হইল। তিনি বলিলেন,—“আমার প্রিয় বন্ধগণ, আমি—আমি—”আর তাহার বাক্য উচ্চারিত হইল না, কে যেন তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ করিল, তিনি বিদ্যালয়ের বোর্ডের নিকট গমন করিয়া তাহার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া বড় বড় অক্ষরে লিখিলেন,—

“তগবান্ ফ্রান্সেয় মঙ্গল করুন।”

অতঃপর তিনি প্রাচীরগাত্রে মস্তক সংলগ্ন করিয়া সেই স্থানে নীরবে দণ্ডায়মান রহিলেন, শুধু হস্তের ইঙ্গিতে প্রকাশ করিলেন,—

“সব শেষ—তোমরা যাও।”

ঐ অমলেন্দু গুপ্ত ।

ব্যর্থ প্রেম ।

যে প্রেম ভাঙিয়াছে চির-উজ্জ্বল

আমার মরমভলে—

হ'ত যদি মণি-মুকুতার-হার

স্তম্ভ-অবসরে কতু গলে তা'র

পরায়ে দিতাম ছলে ।

২

যে প্রেম আমার কদমকুলে
 ফুটে আছে অনিবার—
 হ'ত কাননের যদি ফুলরাশি
 অঞ্জলি ভরি' এক দিন আসি'
 দিতাম চরণে তা'র।

৩

যে প্রেম আমার শতগীত-ধারে
 জবর প্রাণিয়া যায়—
 বাজিত বীণায় যদি হয়ে সুর—
 হু'র হ'তে তা'র তান স্রুযধুর
 জনাতেম করু তা'র।

৪

যে প্রেম তাসিছে দামলে আমার
 লঙ্কার যেবলম,
 এ যদি ঘইত সোণার রপন—
 দুম্বোরে করু তাহার সরস
 দেবিত এ প্রেম যব।

৫

যে অতুল প্রেম রয়েছে গোপনে
 রুদ্ধ আমার প্রাণে—
 পারে না আপনা করিতে প্রকাশ—
 পাইবে না করু সে তা'র আভাস
 শোভা-সৌরভ-গানে।

ঐরমণীমোহন ঘোষ।

সমালোচনা ।

উর্ধ্বিকা । *

রবীন্দ্র দীপ্তি আহরণ করিয়া যেমন বহু গ্রন্থউপগ্রহ দীপ্তিমান, তেমনি রবীন্দ্রনাথের প্রভাব তাঁহার বহু সমসাময়িক কবির উপর স্পষ্টভাবে ছুটিয়া উঠিয়াছে । সমসাময়িক প্রধান লেখক অসংখ্য লেখকগণের উপর নিজ প্রভাব বিস্তার করিবেন, ইহাতে আশ্চর্যের বিষয় কিছুই নাই । কিন্তু বাঁহারা কেবলমাত্র প্রধান লেখকের ভাব ও ভাব অঙ্কুরণ করিয়া থাকেন, বাঁহাদের নিজস্ব ভাব অতি সামান্য তাঁহাদের নাম অতি অল্পদিন মধ্যেই ছুবিয়া যায়, তাঁহাদের গ্রন্থাবলীও অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সাধারণের অপরিচিত হইয়া পড়ে ।

কিন্তু কতকগুলি লেখকের নিজস্ব ভাব-সম্পদ যথেষ্ট আছে । প্রতিভার অধিকারী হইয়াও তাঁহারা নিজ ক্ষমতার বিষয়ে সম্পূর্ণ অমনোযোগী থাকেন । লবঙ্গ কোনও কবির বীণাফলারে তাঁহাদের সুগুণ প্রতিভার চমক ভাদিয়া যায় । প্রথমে তাঁহারা স্রুত বীণার সুরেই সঙ্গীত গাহিতে থাকেন, পরে বীরে বীরে তাঁহাদের নিজস্ব ভাবরাশি বহুঃই উচ্ছ্বসিত হইতে থাকে ।

যে সকল কবি প্রথমে রবীন্দ্রনাথের অঙ্কুরণে রচনা আরম্ভ করিয়াও শেষে নিজ মৌলিক প্রতিভার অত্যাশ্রয় নির্দর্শন প্রদর্শন করেন তাঁহাদের রচনাই সার্থক । শ্রীযুক্ত রমণীমোহন ঘোষ রচিত এমন কতকগুলি কবিতা আছে যাহা পাঠ করিলেই রবীন্দ্রনাথের সুপরিচিত কবিতাগুলি মনে জাগিয়া উঠে । কিন্তু এই অঙ্কুরণে রচিত কবিতাগুলি বাস্তবিক কবির নিজস্ব ভাব-সম্পদ যথেষ্ট বিস্তারিত । তাঁহার অল্পসংখ্যক এই নবপ্রকাশিত কাব্যোপাঙ্গী যার ।

শ্রীযুক্ত রমণীমোহন ঘোষের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'মুকুর', পঞ্চদশ বৎসর পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল । এই কাব্যখানিতেই রবীন্দ্রনাথের অঙ্কুরণ বেশী বাজার ছুটিয়া উঠিয়াছে । 'মঞ্জরী'তে রবীন্দ্রপ্রভাব স্থলে স্থলে মাত্র পরিদৃষ্ট হয়, তাঁহার নূতন কাব্য 'উর্ধ্বিকা'র কবি সম্পূর্ণ স্বাভাবিকভাবে করিয়াছেন । রবীন্দ্রনাথের যে সকল নব নব ছন্দ পাঠকবিগণকে মোহিত করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে স্রষ্টা ছন্দ অবলম্বনে রমণীমোহন 'মুকুর' ও 'মঞ্জরী'তে কবিতা রচনা

* উর্ধ্বিকা—(সীত কবিতা) শ্রীমণীমোহন ঘোষ প্রণীত ।

“প্রাতে প্রেরণীর স্নান দরি
 তুমি এসেছ প্রাণেশ্বর,
 প্রাতে কখন দেবীর বেশে
 তুমি সমুখে উদিলে হেনো।”

‘মঞ্জরী’তে “রূপান্তর” কবিতাটিও পূর্বে উক্ত কবিতাটির ভাবে
 অঙ্কুরোদিত,—

“প্রভাতে দেখিলু তব বালিকা-মুরতি —
 প্রসন্ন আনন ;
 ময়ন অধর হ’তে পড়ে ঠিকরিয়া
 হাসির কিরণ ।

সন্ধ্যায় তোমার পানে চাহিয়া বিম্বিত

এ কি বধুবেশে

কখন এ গৃহকোণে নিঃশব্দ চরণে

দাঁড়াইলে এসে ।” [মঞ্জরী, ২২ পৃষ্ঠা ।]

আর অধিক উদাহরণ দিবার প্রয়োজন নাই । এখন আমরা কবির নিজস্ব
 সম্পদের আলোচনা করি ।

কবি রমণীমোহনের প্রধান বিশেষত্ব তাঁহার সুমধুর ছন্দ । বর্তমান সময়ে
 অতি অল্প কবিই রমণীমোহনের স্তায় স্রুতিমধুর অবাধগতি ছন্দরচনার নিপুণ ।
 জরদেব হইতে ভারতচন্দ্র পর্য্যন্ত বাক্যলার গ্রন্থ কবিগণ যতদূর সম্ভব নিজ
 কাব্যকে স্রুতিমধুর করিবার চেষ্টা করিয়াছেন । রবীন্দ্রনাথও বিহারীলালের
 অনুসরণে প্রথমে নর্জনশীল গতিমুক্ত ছন্দ প্রবর্তিত করেন । তাঁহার নিপুণ হস্তে
 বাক্যলা ছন্দের বহুবিধ বিকাশ হইয়া স্রুতিমাধুর্যের পরাকাষ্ঠা হইয়াছে ।
 মধুসূদনও ‘ব্রজাঙ্গনা’র এই নৃত্যচকল ছন্দের ব্যবহার করিয়াছেন,—

“সখি রে ! বন অতি রমিত হইল হুল ফুটনে ।

শিকতুল কল কল চকল আলিঙ্গন

উছলে সুরবে জল ঢল লো বনে ।”

[ব্রজাঙ্গনা কাব্য ।]

এইরূপ ছন্দের সলীল গতি রমণীমোহনের কাব্যে আর সর্বত্রই দেখিতে
 পাওয়া যায় ।

“অঙ্গণ দিয়াছে দেখা বরষের ছয়াগ্রে,

কূলে কূলে ভরা নদী জোয়াগ্রে।

উজ্জলে নীল জল

কল কল হুল হুল,

কাপিতে অধীর বেগে তীরে বাধা তরলী,

যাবে যদি, এম হরা সজনি!”

[সুহৃৎ, ১-৭ পৃষ্ঠা।]

“বাদল রাগিনী বাকি উঠে আভি হুবনে,

বনবীণি সুপরিভ পবনে।

কর কর অবিরল

করে বাদলের জল,

অনিত তটিনী-নীরে কলকলিত লহসা,

সজীভময়ী নব বরষা।”

[উর্ধ্বিকা, ৭৪ পৃষ্ঠা।]

শিলা-প্রতিঘাতে উর্ধ্বিকার নৃত্যের ভায় “বর্ণা-গীতি”র মনোরম শব্দ-
ককার কর্ণ সুস্থ করে।

এইরূপ প্রতিমধুর হুল শ্রাব্যলোচ্য কাব্যখানিকে মনোরম করিয়াছে।
তখনী বাবু মাধুর্ঘ্যের উপাসক। মধুর হুলের ন্যায় মধুর ভাষাই তাঁহার গ্রন্থ।
যে ভাবে বস্তু হইয়া কালিদাস পরিত-বৃশোও মাধুরী-বিকাশ দেখিতেন, তখনী
বাবুও সেই ভাবে বিস্তার। তিনি নিজেই তাঁহার কবিতার বর্ষা-চন্দ্র
অঙ্কিত করিয়াছেন,—

“দীরে বীরে পশে চিত্তে যোর

সুহুমারী কবিতা-সুন্দরী,

করে তার কনক-কতন,

চরণে মঞ্জীর সুহু বালক ;

চাক্র নীলাঘরে ঢাকি দেহ

মণি-বুদ্ধা আসন্ন পদ্রি’

নব বধু-সম দেয় দেখা

অবিপাতা অনিমিত্ত লাগে।”

[সুহৃৎ, ২৬ পৃষ্ঠা।]

যথার্থই রমণীবাবুর কবিতা এইরূপ অলঙ্কার-ভূষিতা, মাদুর্য্য-মণ্ডিতা । ভবভূতির ন্যায় ভূবরের ভীষণ নৃতি, গভীর অগণ্যের ত্রাস-জনক রূপ অক্ষণ-প্রয়োগ আলোচ্য কাব্যত্রয়ের কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না । রৌদ্র, বীতংল প্রভৃতি রসাবতারণাও রমণীবাবুর অতীল্লিত নয় । বাঙ্গালী যে মাধুর্য্যের উপাসক, বাঙ্গালী যে কোমল ভাবের অমুরাগী, বাঙ্গালী যে শান্তি-প্রিয়, তাহা রমণীবাবু বুঝিয়াছেন,—

“প্রচাপিত হেথা প্রেমের বর্ষ
 ক্ষুধিত পথ—পরমা প্রীতি
 অদূত ছন্দে অগনিত কবি
 গাহিয়াছে হেথা প্রেমের কীতি ।
 মঙ্গলময়ী বদ-জননী
 বেহ-উচ্ছ্বাস, বরদা-বেশ,
 বেধা ভারতীর কমলকুসুম
 এ বে গো শান্তি—প্রীতির দেশ ।”

[উর্দ্বিকা, ১১৬ পৃষ্ঠা ।]

তাই রমণী বাবু মধুর সুরে প্রেমের গানই গাহিয়াছেন, কখনও বা করুণ-গ্রাসিনী আলাপেও তাঁহার বীণা বজ্রত বহিয়াছে । কোমল ভাব প্রকাশ করিতে কোমল কবিতামধুর ছন্দই উপযোগী—সে দিনাবে রমণীবাবুর ভাষা ভাবের সহিত বেশ সুরমঙ্গল । কিন্তু তাঁহার ভাষা অনাড়ম্বর কৃষকের মেঠো গানের ভাষা নহে, নিপুণভাবে স্বল্প-শিল্পীর অলঙ্কার-মণ্ডিত । ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ বা বার্লসের স্তায় Rugged rhymesএর প্রতি তিনি অমুরাগ দেখান নাই । তাঁহার কবিতা সুলক্ষণী শাণী পরিধান করিয়া এতদ্ভাষা সুবদ্য বিকাশ করে না, “নীলা-ধরে বেহ ঢাকিয়া”, “মণিযুক্ত আভরণ পরিয়া” লোকলোচন-মনোহারিণী হয় । তাঁহার গমনে সুললিত ছন্দে করুণ ও মঞ্জীর রিনিঝিনি বাজিতে থাকে । কবির নিজের পাঞ্জিকুলিই তাঁহার কবিত্বের যথার্থ পরিচয় দিয়াছে ।

রমণীমোহন বাবুর কাব্যের বিস্তৃত পরিচয় প্রদান এই ক্ষুদ্র সমালোচনার অসম্ভব । অবসরহীন কবির কর্তৃত্বাত্মক জীবনের যে কয়েক সুদৃষ্ট কবিতার আরাধনায় কবিকে স্বর্ণমুখ দান করিয়াছে, তাহার পরিচয় আমরা কবিতা-গুলিতে দেখিতে পাই । কবির চিরন্তন কাহিনী—সংসারের উপেক্ষা ও নৈরাশ্রের মধ্যে একমাত্র শান্তিহীন প্রকৃতির-বেহ অতি সুলক্ষণরূপে চিত্রিত,—

“যেই জন মীন হীন ছিল ক্ষুদ্র গৃহে মীন
 মগ্ন নিরাশায়,
 এ কি তব মীলা—তা’রে ডেকে নিলে একবারে
 বিশ্বের সত্যায় !
 রবি-অশি-তারাপুঞ্জ তরু-মতা পুষ্পকুঞ্জ
 নিষ্ক রিণী সনে,
 কোন্ মন্ত্রবলে মোরে বাঁধিলে প্রেমের ডোরে
 অক্ষয় বন্ধনে ?”

[উর্দ্বিকা, ১৪ পৃষ্ঠা।]

প্রকৃতিই কবিকে নৈরাশ্রে উত্তেজনা আঁরা
 দিতেছে।

“যখন ছুঁধিন পোর দিবিদিক্ আধারিয়া
 করে বারিধারা,
 রুড যত পুরষাণ শূকপথে বিদ্র হিয়া
 ফিরি গৃহ-হারা,
 চকিত বিহুভাতি গগনে আঁধার যেবে
 পোর বজ্রনাদ,
 প্রলয়-নিশ্বাস-সম পরজি বহিছে বেগে
 লবন উদ্ভাদ—
 তখন সাহসনারণে তুনি আসি দিলে দেখা
 অগ্নি তচিস্ভিতা,
 আনিলে কঙ্কর রাতে শাস্তির অরুণ লেখা
 হে মোর কবিতা।”

[উর্দ্বিকা, ২৩, ২৪ পৃষ্ঠা।]

‘উর্দ্বিকা’র প্রকৃতি পর্যায়ের “বর্ষা-স্মরণী”, “বর্ষা-গীতি”, “শরৎ”,
 “শারদোৎসব”, “বসন্ত-লক্ষী” ও “বসন্তের আহ্বান” কবিতাগুলি ঋতুবর্ণনা-
 মূলক। ঋতুভেদে কবির নয়নে বরষা নারিকার ফায় কখনও মোহিনী,
 কখনও মানিনী, কখনও বিরহিনী, কখনও গতিসোহাগিনী, কখনও জননী,
 কখনও বা তাপসী। (উর্দ্বিকা, ৮১-৮৮ পৃষ্ঠা)। উষা, সন্ধ্যা, নিশীথে

প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্য অনেকগুলি কবিতায় বর্ণিত হইয়াছে। কবির স্বদেশ-প্রীতি “বন্দনা,” “বদেশে,” “বঙ্গভূমি,” “বঙ্গমঙ্গল,” “বঙ্গলক্ষ্মী” প্রভৃতিতে প্রকটিত। ইহা ছাড়া প্রায় সকলগুলিই প্রেমের চরিতা। কবি কামনাপূর্ণ প্রণয়ের চিত্র ছাড়িয়া পবিত্র নির্মল প্রেমের চিত্র আঁকিয়াছেন। তাহার আত্মা “নিরুত্তি” নামক নাট্যকাব্যে অতি সুন্দরভাবে বিকসিত। দেবযানী ব্যাটিকে সবেধন করিয়া বলিতেছেন,—

“হায় নাথ, নারী শুধু বিলাপের বন।
যৌবনের কামা বশ, কণিক অসার
বেশনা পুরুষ-হস্তে ; নাহি কিছু আর—
এয়োজন তার, পেলা হ’লে সমাপন !
ছিন্নদল পুষ্পদল হেলায় তখন
বূরে ফেলে দিবে তা’রে ! বিলাস-প্রকিনী
নারী শুধু ! যদুকুল হইতে সজিনী
নাহি কোন অধিকার ? দিক্ নারী-প্রাণ,
নীচবে কেনে সবে এত অপমান
বিশিদিন।

তখন আজ কহিল সে কথা,
পোপনে জবরতলে ছিল সেই বাধা
এত দিন। যবে শূন্যে সঁপি জরাভার
ভরল সৌগন মাণি’ মটিল তরঙ্গের
ভূজিতে বিষয়স্ব—রূপ রম্যবীর,—
আসিলে আমার পাশে, পুলকে অগীর,
আকুল করিলে মোরে সোহাগে আদরে,
তখন সহসা নারীজন্যের পরে
জাগিল কি ভণা মনে ! জাগিল দিকার
এ রূপলাবণ্য—বাঁহে ছিল অদকার—
হেত্রি’ তব প্রত্যাগত নবীন যৌবনে
শুধু বাসনার আলা ! জান হ’ল মনে,
যোর প্রতি তোমার সে অঙ্গ উজ্জ্বল
আদরের—প্রাণহীন শূণ্য পন্ডিহাস।

নীরবে আপনি সেই বিষ করি পান,
 তবুও তোনার স্বপ্ন করিছাছি পান।
 আলি নাথ শুভদিন; এস ত্রুত পরি'
 হও তুমি ত্রুতগামী, আমি সহচরী
 তপস্বিনী। মহাশয়, চল দুই জনে
 তারি' রাজ্যভোগ বাই বিজন কাননে,
 পবিত্র প্রেমের ত্রুত করি উৎসাহন।
 নিবে না বাসনা-বহি যোগালে ইন্দন,
 শুপন্তার শান্তি-বারি করিয়া সেচন
 নির্দোষিত কর তারে।"

[যক্ষরী, ১০০-১০১ পৃষ্ঠা।]

রমণীর মঙ্গলময় প্রভাব উদ্ধৃত অংশটিতে বিশদরূপে বর্ণিত। কবি এই-
 রূপ ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াই 'উর্ধ্বিকার' "পূজারিনী," "আত্মতী," "নারী"
 প্রভৃতি কবিতার রচনা করিয়াছেন। গৃহকর্মরতা নারীকে সন্ধান করিয়া
 কবি বলিয়াছেন,—

"হে কল্যাণি, আছ তুমি রানীর গৌরবে
 বিস্তারি' সুখ্যা-শান্তি নিজ গৃহমাকে,
 তবু দীনা দাসীসম নিকটে নীরবে
 নিরন্ত সংসারে সদা পত তুচ্ছ কাজে।
 মহা রানী, মহা দাসী, যোর মনে লয়
 তুমি—পূজারিনী, নারি! গৃহ—দেবালয়।"

[উর্ধ্বিকা, ১২১ পৃষ্ঠা।]

সংসারের দুঃখজালা তুলাইতে নারীর অসীম শক্তিও কবি আঁকিয়াছেন,—

"সংসার-সমুদ্র—নিত্য আবর্ত-চকল,
 তরলিত তারিনিকে কর্ম-কোলাহল।
 তারি মাক হ'তে রাশি, তরুণ শোভাতে
 একদা উঠিলে তুমি সুখপাত্রে ছাতে;—...
 অমর করিলে নরে বর্গসুখ। দানে,
 বিষয়ে রহিল বিষ চাহি' তোমা পানে।"

[যক্ষরী, ৫৪ পৃষ্ঠা।]

রমণীর এই মঙ্গলময়ী, শান্তিময়ী মূর্তিই কবির প্রিয়। মাঝে মাঝে বিরহের করুণ রাগিনী কবির বীণার বাজিয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতেও লালসার আভাস নাই।

‘মঙ্গরী’ নাট্যকাব্য দুইটিতে কবির শক্তি সুপ্রতিফলিত। প্রণয়-কবিতা রচনার সফল হইলেও আমরা কবির নিকট অন্য ভাবেও কবিতার প্রত্যাশা রাখি। কবির কথায় কবিকে বলি—

উঠ, কবি, ছেড়ে এস প্রিয় গৃহধোর,—

অলস স্বপন ;

আকাশ-কুসুমের আর কত বা গাঁথিবে হার

এস ছেড়ে সুকোমল স্ত্রীমল লরন ।

[যুক্ত, ১০০ পৃষ্ঠা ।]

কবির শক্তি আছে—হৃদয়ে অসীম অধিকার আছে। তাঁহার নিকট আমরা উৎসাহ ও উদ্দীপনার সন্ধান চাহি—বর্তমান যুগের নবজীবনের আবেগ-ময় স্পন্দনের উচ্ছ্বাস চাহি—নব আশা, নব আকাঙ্ক্ষার গাথা চাহি। আমাদের বড় আশা রহিল, অদূর-ভবিষ্যতে কবি আমাদের এ সাধ পূর্ণ করিয়া তাঁহার সাধনা সার্থক করিবেন।

ঔষরজ্ঞান বোম্বাল ।

প্রতিশোধ।

(বিশ্বভেদ্য আত্মকাহিনী)

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ব্যথিত অন্তরে বৃদ্ধের করুণ কাহিনী শ্রবণ করিতে করিতে আমার নয়ন অশ্রুভাগ্যক্রান্ত হইয়া উঠিল। আমি শিরাশ শিরাশ কেমন একটা নৈতা অশ্রুতর করিতে লাগিলাম। নীনা চিরদিনই অগতের প্রীতি ও প্রভা আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছে। তাহার এক দিনের একটা অসতর্ক ব্যবহার যে গোপনে বৃদ্ধের মনে এতটা শত্রুতা সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা কে জানিত ? আমি সে কথা চিন্তা করিয়া কিছু বিস্মিত ও দুঃখিত হইলাম। অপরিণত বয়সের চপলতা-বশতঃ নীনা যাহাই করুক, সে যে নির্ভর নহে, তাহা আমি জানি। তাহার একটা সহাত্মকুতিপূর্ণ বাক্য—কোমল করুণ ব্যবহার বৃদ্ধের সকল দুঃখ যে অপ-নোদিত করিতে সমর্থ হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু নীনা হয় ত তাহার আশাতের গুরুত্বই বুঝিতে পারে নাই। তাই সে ঐরূপ ভাবে চণিয়া দিয়াছিল। আমি নীরবে এই সকল কথা চিন্তা করিতে লাগিলাম। বৃদ্ধের নিকট আমার প্রকৃত পরিচয় প্রদান করিবার ইচ্ছা ছিল না ; তাই আমি নীরবেই দত্তানন্দান রহিলাম। বৃদ্ধের যেন সে নীরবতা অশঙ্ক বোধ হইতে-ছিল। সে কিছুকণ আমার মুখের দিকে তাকাইয়া পরে ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করিল,—“আমি কি উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করি নাই ? আমার মনে হয়, বয়ঃ ভগবানও বৃদ্ধি এতদপেক্ষা কঠোর শাস্তিবিধানের অসমর্থ হইতেন।”

আমি বলিলাম,—“উহা বসার্থ। তোমার স্ত্রীর পাপের জ্বলনায় তাহার শাস্তি অল্পপূরক হয় নাই। তথাপি আমার মনে হয়, তুমি নরহত্যা-পাপে লিপ্ত না হইলেই ভাল ছিল। তাহাকে হত্যা করিবার তোমার অধিকারই বা কি ছিল ?”

বৃদ্ধ অবজ্ঞাতরে হাসিয়া উঠিল। সে বলিল,—“হত্যা ?—কে কাহাকে হত্যা করিয়াছে ? সে কি আমাকে হত্যা করে নাই ? পরপুরুষের অঙ্কে আমি যে দিন তাহাকে স্নেহে শায়িত দেখিয়াছিলাম, সেই দিনই কি আমি ‘বৃহাযু’ পড়িত হই নাই ? সে সে দিন আমার ক্ষমতায় যে দারুণ আঘাত করিয়াছিল, আমার মুখ্য তাহাতেই সংশ্লিষ্ট হইয়াছে। আমার দারুণ প্রতিহিংসার

দানব-মূৰ্ত্তিই শুধু সে দিন আমাতে প্ৰবেশ কৰিয়া আমাৰ প্ৰতিহিংসাজ্ঞত উদ্‌যাপনের সাহায্য কৰিয়াছিল। আৰুও সে মূৰ্ত্তি আমাতে বৰ্ত্তমান। সে বড় ভীষণ, বড়ই দুৰ্দ্ধান্ত। সে আমাৰ জ্বৰ হইতে সৰ্ব্বপ্ৰকাৰ ভয় একেবাৰে বিমূৰ্ত্তিত কৰিয়াছে। আমি আৰ মৃত্যুভয়ে কল্মিত হই না। তাই এই মহা-মাত্ৰীও আমাকে আৰ ভয় প্ৰদৰ্শন কৰিতে পারে নাই। এই ভীষণ দানব আমাকে যে দিন পৰিত্যাগ কৰিবে, সে দিন আমি মহানিত্ৰাৰ স্নেহমল ক্ৰোড়ে আপনাকে বিপ্ৰায় কৰিতে দিয়া কি আনন্দ—কি শান্তি উপভোগ কৰিব! মৃত্যুও আমাৰ আৰ মূৰ নাই—শান্তি নাই। নিত্ৰা বহু দিন আমাকে পৰিত্যাগ কৰিয়াছে। অতীতের সেই জনম-পিপাৱক দুস্ত্ৰ এখনও প্ৰতিদিন আমাৰ নয়ন-সমক্ষে তাসিয়া উঠে। আমি প্ৰতিদিন রক্তনীর গাঢ় অন্ধকাৰে তাহাৰ সেই মৃত্যু-বস্ত্ৰণা, সেই হিৰ নীল চকু, সেই দাৰুণ হাসকট্ট এখনও দেখিতে পাই। কত বৃণ অতিবাহিত হইয়াছে। আমাৰ প্ৰবল স্মৃতি এখনও সে দুস্ত্ৰ ভুলিতে সমৰ্থ হয় নাই।” বৃদ্ধ এই বলিয়া কিছুক্ষণ নীরব হইল। তাহাৰ নয়নময় তখন যেন কোন কাৰ্ম্মিক দৃষ্টে আবদ্ধ ছিল। সে তাহাৰ অনাবৃত মস্তকে বীৰে দীৰে হাত বুলাইতে লাগিল; পৰে সহসা নিম্নোন্মিত ব্যক্তির ন্যায় চমকিয়া উঠিয়া আমাৰ বিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। তাহাৰ অবস্থা দেখিয়া মনে হইতে লাগিল, সে যেন আমাকে এই প্ৰথম দেখিল। পৰে কতকটা প্ৰকৃতিস্থ হইয়াসে বৃদ্ধ বৃদ্ধ হাসিতে লাগিল।

সে তখন অজুত্বৰে বসিতে লাগিল,—অতীতের স্মৃতির কি মোহিনী শক্তি, কি আকৰ্ষ্য ক্ষমতা! আমি বৰ্ত্তমান ভুলিয়া গিয়া সেই অতীতের স্নেহে প্ৰবেশ কৰিয়াছিলাম। তাই তোমাৰ কথা একেবাৰে বিস্মৃত হইয়াছিলাম। তুমি একটা পৰিচ্ছন্ন চাহিয়াছিলে, তাহা অবশ্যই তোমাকে দিতে হইবে। তোমাৰ যেমন পৰিচ্ছন্ন প্ৰয়োজন, আমাৰও ত তেমনই অৰ্থের প্ৰয়োজন। তুমি যদিৱাসিত্ত পৰিচ্ছন্ন গ্ৰহণে সম্মত হও নাই। ভাল, অপেক্ষা কৰ; আৰ একটা পৰিচ্ছন্ন আনিতেছি।”

সে এই বলিয়া বোকাবোৰ পঞ্চাভাষের জুপীকৃত বস্ত্ৰাৱাণি আলোড়িত কৰিতে লাগিল। তাহাৰ হৃদয় দেহ ও গভীৰ বদন দেখিয়া মনে হইতেছিল, যেন একটা প্ৰাচীন গৃহ শব্দভঞ্জে নিযুক্ত হইয়াছে। তথাপি কৰুণাৰ তাহাৰ জন্ত আমাৰ জ্বৰ আৰ্জি হইতেছিল। আহা! সে কি দাৰুণ মনঃকট্টই

ভোগ করিতেছে! সে বতাই কেন হাত-পরিহাসে সময় অতিবাহিত করুক না, তাহার মানসিক যন্ত্রণার ভুলনা নাই। আমার সবত রজনীর দুর্ভাগিনী বাক্যনা ইহার এক মুহূর্তের বাতনার সহিত ভুলনা করিলে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হয়। নীনার অবিবেচনা তাহাকে বৃদ্ধের যুগের পাত্রী করিয়াছিল, সন্দেহ নাই; কিন্তু আমার মনে হয়, জগতের নারী জাতির প্রতিই তাহার কেমন একটা বিবেচ ছিল। বৃদ্ধা প্রতিদিন কত সুখের জীবন জগতের পর-পারে লইয়া বাইতেছে, আর এই হতভাগ্যের প্রতি কেন তাহার কৃপা হয় না, ইহা বিশ্বের বিবর। এই বৃদ্ধ তাহা হইলে বিশ্রাম-সুখ লভ্য করিতে সমর্থ হইত।

আমি এইরূপ বহুবিধ চিন্তা করিতেছিলাম, এমন সময় বৃদ্ধ চীৎকার করিয়া উঠিল। সে বলিল,—“কি হৃদয়ের পরিচ্ছদ! ইহা তোমারই উপদ্রুত। একজন মৎস্যজীবী ইহা পরিধান করিত। ভূমিও কি সমুদ্রে প্রবাল সংগ্রহ করিয়া জীবিকা অর্জন কর না? সে মৎস্যজীবী তোমারই মত উদ্রত-বেহ ছিল। ইহা তোমারই অঙ্গের পরিমাণাভূষণ। যথামাত্রীর সংগ্রহ ইহাতে নাই। সমুদ্রের লবণাক্ত জলে ইহা সিক্ত ছিল; সমুদ্রজাত শৈবাল ও বাসুকণার গন্ধে ইহা পরিপূর্ণ।”

আমি হাসিয়া বলিলাম,—“ইহার পরিধানকারীও কি স্ত্রী-হত্যা করিয়াছে?”

বৃদ্ধ অবজার সহিত মন্তক-সঞ্চালন করিতে করিতে বলিতে লাগিল,—“না, সে বড় বৃথ ছিল। সে নিজেই আপনার জন্মে সাধিত করিয়াছে।”

“সে কি আত্মহত্যা করিয়াছে, না অপঘাতে তাহার বৃদ্ধা লগ্নে হইয়াছে?”

বৃদ্ধ বলিল, “প্রায় দুই মাস অতীত হইয়াছে, এক বিদেশপ্রত্যাগত যুবক তাহার প্রণয়িনী কর্তৃক উপেক্ষিত হইয়া আপনার সর্বনাশ সাধন করিয়াছে। আহা, সে কত আশা করিয়া ঐ রমণীর জন্য বিদেশ হইতে স্ক্রুতার মালা, প্রবালের শিরাতরঙ্গ আনয়ন করিয়াছিল! সে পতিতা রমণী, তাহার প্রেমে বৃদ্ধা কি বৃকিবে? যে স্থানে অর্থের বাহন্য, সে স্থানেই সে আত্ম-বিক্রয় করিয়া থাকে। কোন ধনবান্ যুবকের কৃপালাভ করিয়া এই রমণী সত্য বিদেশপ্রত্যাগত যুবককে সমুদ্রের তীরেই অপমানিত করিল; তাহার প্রদত্ত উপহার-দ্রব্যগুলি ঘুরে নিক্ষেপ করিল; যুবকের সাহসের অগ্রসোপে

কর্ণপাতও করিল না ; বারংবার দস্তে দস্তনিপীড়ন করিয়া তাহাকে ভিন্নস্থান করিতে লাগিল । সুবর্ণকর্ণকাল কি চিত্রা করিল ; কর্ণকাল মৃতক অবনত করিয়া রহিল । তাহার বদন অস্বাভাবিক পাংশুবর্ণ ধারণ করিয়াছিল । আমি তাহার সন্নিহিতে দণ্ডায়মান ছিলাম । সৎ লোক সে স্থানে সমবেত হইয়াছিল । আমরা একটি শব্দ উচ্চারিত করিবার পূর্বেই সে সমুদ্রগর্ভে কল্প প্রদান করিল । অশীম বাহিরানি তাহাকে চাকিয়া ফেলিল । পরদিবস তাহার মৃত শরীর ভাসিয়া উঠিল । আমি ছুইটি মাত্র মুদ্রার বিনিময়ে তাহার পরিচ্ছদ ক্রয় করিলাম । চারিটি মুদ্রার বিনিময়ে উহা বিক্রয় করিব ।”

সে আরও বলিল,—“এই চূর্ণটনাতেও এই বালিকার চৈতন্ত সম্পাদিত হয় নাই । সে এখন প্রতিদিন নিত্য নূতন প্রণয়ীর হস্ত ধারণ করিয়া আনন্দে সময় কাটায় ।”

আমি বুদ্ধকে পরিচ্ছদের উপযুক্ত মূল্য প্রদান করিলাম এবং বস্ত্র পরিবর্ত্তন্থে অন্য একটু স্থানের প্রয়োজন হওয়ায়, আরও ছুইটি মুদ্রা প্রদানে প্রতিশ্রুত হইলাম । বুদ্ধ আমাকে তাহার শরনকক্ষ দেখাইয়া দিল । তথায় একখানি বৃহৎ মূরুর গৃহের শোভাবর্ধন করিতেছিল । বুদ্ধ বলিল, সেখানি তাহার পত্নীর শেব নিদর্শন ।

আমি ইতস্ততঃ বিলম্বিত বস্ত্ররাশি অতিক্রম করিয়া বুদ্ধের শরনকক্ষের দ্বারে উপনীত হইলাম । বুদ্ধ দ্বার উদঘাটনপূর্ব্বক আমাকে গৃহে প্রবেশ করিতে বলিল । ক্ষুদ্র একটা কাচবদ্ধ পবাকের পথে যে সামান্য আলোক গৃহমধ্যে আসিতেছিল, শুদ্ধারা গৃহের সমস্ত দ্রব্য আমি ভাল করিয়া দেখিয়া লইলাম । ক্ষুদ্র একটি অপরিষ্কৃত বিছানা, পদচীন একখানি কেদারা ও সেই মূরুরখানি সে গৃহের বিলাস-সামগ্রী । মূরুরখানি চতুর্দিকে নানা কারু-কার্য্যে ষষ্ঠিত রোপ্য ক্রমে আবদ্ধ ছিল । উহা চিনিয়া লইতে আমার বিলম্ব না হইলেও আমি কিছুকণ সেই দিকে ভয়ে তাকাইতে পারিতেছিলাম না । বুদ্ধ সাহসকারে তাহার গৃহের অর্গল দেখাইয়া আমাকে বলিতে লাগিল, উহা তাহার বহন্ত-নির্ধৃত । তাহার পত্নীর মৃত্যুর পূর্বে সে ঐ ব্যবসা করিত । কিন্তু জানি না, কেন সে তাহা নির্দ্বাণের কোশল একপে বিন্ধত হইয়াছে ।

বুদ্ধ আমার ক্রীত পরিচ্ছদটি আমার সম্মুখে রাখা করিয়া প্রস্থান করিল । আমি বেশ-বিত্রাসে প্রস্থত হইলাম । মূরুরে আমার দৃষ্টি পতিত হইবামাত্র আমি চমকিত হইলাম । একটা তীব্র রেখা বেন আমার হৃদয় অবিকৃত

করিল। বৃদ্ধ সতাই বলিয়াছিল, আমি বার্ত্তকো উপনীত হইয়াছি। বিশেষতঃ বর্ষের দাক্ষণ শারীরিক যন্ত্রণাও বোধ হয়, আমাকে এত পরিবর্তন সংঘটিত করিতে সমর্থ হইত না। হায়, আমার ব্যাধি আমার সমস্ত শ্রী হরণ করিয়াছে। আমার লবনমণ্ডল বিতক, আমার চক্ষু ফোটন্ত্রিবিষ্ট, আমার দৃষ্টি ভয়-চকিত। সমাদি-মন্দিরের মানসিক যন্ত্রণা আমার কেশগুলি শুভ্র ও আমার আকৃতি ভীষণ ও উগ্র করিয়াছিল। সেই আত্মবিক্রোভা আমাকে দেখিয়া কেন ভীত হইয়াছিল, আমি তাহা বুঝিলাম, কেন বৃদ্ধ আমাকে বৃদ্ধ বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিল, তাহাও বুঝিলাম। বরতঃই আমিই লাগাকে চিনিতে পারিতেছিলাম না। আমার পত্নী—আমার বন্ধু আমাকে চিনিতে সমর্থ হইবে কি? এই চিন্তা আমার হৃদয়কে বড়ই ব্যথিত করিতেছিল। আমার দুই গও বহিরা অস্ত্র-বারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। পরব্রহ্মের আবার মনে হইল, আমি কি মূর্খ। শরীরের এই ভীষণ পরিবর্তনের জন্য কেন আমি এত দুঃখিত হইতেছি? আমার শুভ্র কেশ, আমার শুভ্র বদন আমার কি অনিষ্ট সাধিত করিবে? আমার পত্নীর বিতক প্রেম আমাকে তাহার অন্তঃ হইতে কখনই বিতাড়িত করিতে সমর্থ হইবে না। হর ত আমার এ পরিবর্তনে সে প্রথমে ব্যথিত হইবে; তাহার বদনমণ্ডল বিবর্ণ হইবে। কিন্তু আমার করুণ কাহিনী শ্রবণ করিয়া সে কি আমাকে পূর্ণাপেক্ষা অধিক ভালবাসিবে না?—তাহার প্রেমালিঙ্গন কি আমার সকল দুঃখ বিদূরিত করিবে না; আমাকে নূতন জীবন প্রদান করিবে না?

এই সকল চিন্তা আমার হৃদয়কে অনেকটা সুলব করিল। আমি মৎস্তজীবীর সেই পরিচ্ছদে আপনাকে ভূষিত করিলাম। আমার শিথিল পালামার স্ত্রবহৎ পকেট দুইটিতে আমার সংগৃহীত অর্থরাশি রক্ষা করিলাম। আমি কেশবিভ্রাস করিলাম। যুক্রে আমার প্রতিবিম্ব আর তেমন ভীষণ দেখাইল না। আমার পরিচ্ছদের পরিবর্তনের সহিত আমার আকৃতিরও অনেক পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছিল। আমার পরিচ্ছদ একেবারে অশোভন, হয় নাই। আমার শুভ্র কেশরাশির উপর ব্রহ্মবর্ষ চুপী অপূর্ণ শোভা বারণ করিয়াছিল। আমার শুবিবাতের আশা ও আনন্দ আমার চক্ষুর দীপ্তি কিঞ্চিৎ উজ্জ্বল করিয়াছিল। বিশেষতঃ আমি বুকিতে পারিয়াছিলাম, আমার শরীরের এই ক্লান্ততা, আমার এই লাভগাছীনতা, আমার বর্ষের মলিনতা

এক দিন বিদূষিত হইবে; আমার কান্তি—আমার অন্তর্দোষ কিরিয়া আনিবে; হয় ত আমার শুভ্র কেশও এক দিন কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিতে পারে। আর তাহা না হইলেই বা কি? শুভ্র কেশ হয় ত কত লোকের স্রদ্ধা ও প্রীতি আকৃষ্ট করিবে।

আমি কক্ষের দ্বার উদঘাটন করিয়া সেই বস্ত্রবিক্ষেপকে আত্মদান করিলাম। সে-ত আমাকে দেখিয়াই একেবারে আশ্চর্য্যাবিত হইল। আমার বক্ষ যে এত প্রসন্ন, আমি যে এত উন্নতকায়, সে যেন তাহা এই প্রথম উপলব্ধি করিল। তাই সে বার বার বিষয় প্রকাশ করিতে লাগিল। সে বলিতে লাগিল, যৌবনে নিশ্চয়ই আমি এতদপেকা অধিক বলশালী ছিলাম।

আমি আমার উন্মুক্ত বাহু তাহার সম্মুখে ধরিয়া বিজপদ্মলে বলিলাম, বার্ষিক্য আমার শক্তি একেবারে বিদূষিত করিতে সমর্থ হয় নাই। বৃদ্ধ আমার হস্ত স্পর্শ করিল; বলিল,—“আঃ! কি সুন্দর—কি সুন্দর। দৌহের ন্যায় সুদৃঢ়। নরহত্যা করিতে তোমার আর কোন অন্তরে প্রয়োজন হয় না। আমিও একদিন এইরূপ বলশালী ছিলাম, শাগিত কুপাণ পরিচালনে আমার অসাধারণ দক্ষতা ছিল। শত বঞ্জ একত্র গ্রথিত করিলেও আমি এক আঘাতে তাহা ছিন্ন করিতে সমর্থ হইতাম। তুমিও নিশ্চয় এক দিন তাহা করিতে সমর্থ হইতে। সুদৃঢ় বাহু এই সব কার্য্যে সহায়তা করে, সন্দেহ নাই। এক আঘাতেই নরহত্যা করিতে উহা সমর্থ হয়।” বৃদ্ধ এই কথা বলিয়া আমার দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া গেল। তাহার ক্ষুদ্র চক্ষুর্দ্বয় যেন আমার সম্যক প্রকৃতির পরিচয় লাভের জন্য ব্যগ্র হইয়াছিল। আমি আমার পরিত্যক্ত বসনগুলি তাহাকে প্রদান করিলাম। আরও তিনটি মুদ্রা দিয়া আমি এক জোড়া বিনামা চাৰ্ছিলাম।

বৃদ্ধ এই অপ্রত্যাশিত অর্থ প্রাপ্ত হইয়া আনন্দে অধীর হইল; উত্তর হস্ত উত্তোলন পূর্বক আমাকে আশীর্বাদ করিতে লাগিল ও আমার প্রার্থিত বস্ত্র আনিয়া দিল। আমি উহা পরিধান করিলাম ও আমার বাসস্থান রোমানী প্রাঙ্গণে গমন করিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই আমার মনে হইল, এইরূপ অপ্রত্যাশিত ভাবে দিবাগালেকে গৃহে প্রবেশ করিলে আমার নীনার অনিষ্ট হইতে পারে। সে হয় ত আমারই এই বিকৃত আকৃতি দেখিয়া হঠাৎ বৃদ্ধিত হইতে পারে; তাহার সংজ্ঞা পুনঃ প্রত্যাঘর্ষণ নাও

করিতে পারে। এইরূপ অবস্থার স্বগ্যাপ্ত পর্যাণ্ত এই স্থানে অপেক্ষা করাই সম্ভব। পরে রক্তনীর গাঢ় অন্ধকারে আপনাকে আবৃত করিয়া গৃহের পশ্চাদ্ভাগে দিয়া স্বগৃহে প্রবেশ করিয়া পূর্বে কোন ভৃত্যের বা বন্ধু গিড়োর দ্বারা আমার অবস্থা নীমার নিকট ক্রমে প্রকাশ করিলে আর কোনও বিপদের আশঙ্কা থাকিবে না।

বস্ত্রবিক্রেতা বৃদ্ধ এই সময় আমার পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিল। সে অতি মনোযোগের সহিত আমাকে নিরীক্ষণ করিতেছিল। আমাকে তীব্র — কল্পিতভাবে সে লিঙ্গাঙ্গা করিল,—“তুমি কি অধিক দূরে গমন করিবে? তুমি কি কোনও গ্রীলোকের অহুসন্ধানে গমন করিতেছ?” এই সময়ে তাহার হস্ত আমার হৃদয়ে অর্পিত ছিল।

আমি বৃদ্ধের উক্তি সমর্থন করিলে কেমন এক দৃণাবাজক হান্ত তাহার বদনে ফুটিয়া উঠিল। আমি বিরক্তির সহিত তাহার হস্ত দূরে নিক্ষেপ করিলাম ও তাহার গৃহের দ্বারের নিকট আগমন করিলাম। সে আমার অহুসরণ করিল ও চাপা স্বরে বনিতে লাগিল,—“গ্রীলোকের নিকট গমন করিতেছ! বেশ কথা। তুমিই যে আজ নূতন বাইতেছ, তাহা নহে। তোমার পূর্বে কত লোক গিয়াছে, তোমার পরেও কত লোক বাইবে। জগতের এই নিয়ম—গ্রীলোকের এমনই একটা আকর্ষণ। বাও, তোমার দেহ সবল, তোমার বাহ্য শূন্য। বাও—তাহাকে হত্যা কর—বিনাশ কর। তুমি নিশ্চয়ই অনায়াসে সে কার্য সাধনে সমর্থ হইবে। বাও—তাহাকে হত্যা কর—বিনাশ কর।”

সে তাহার গৃহের দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া সয়তানের গুণগের বস্ত হস্ত উত্তোলন পূর্বক শুধু এই কথাই বনিতে লাগিল। আমি তাহাকে অতিবাহন করিয়া গৃহের বাহিরে চলিয়া আসিলাম। সে আমার দিকে বড় ক্রুদ্ধপণ করিল না। আমি বস্তবার পশ্চাদ্ভাগে চাহিয়া দেখিলাম, দেখিলাম, সে সেই অবস্থাতেই ষাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহার ওষ্ঠ সেই কথাই পুনরাবৃত্তি করিতেছিল। তাহার হস্ত শূন্য কল্লিত মনুষ্যের কল্লিত কণ্ঠ নীপীড়নের অভিন্ন করিতেছিল। আমি বহু দূর গমন করিলাম। আমার কর্ণে বয়েযবার সেই কথাই প্রতিধ্বনিত হইতেছিল,—“বাও—হত্যা কর—বিনাশ কর”।

শ্রীঅমলেন্দু গুপ্ত।

দাশরথি রায় ।

(২)

কবির দল ত্যাগ ।

কৰ্ণজীৱনের প্রথম সময় হইতেই দাশরথি কবির দলে গীত রচনা করিয়া দিতেন ; পরে ক্রমে ক্রমে আসক্ত হইয়া কবির দলের ছড়াবার হইলেন । ক্রমশঃ কবির দল-সমাজে দাশরথির বিশেষ পসার প্রতিপত্তি হইয়া পড়ে । এই সময় অকস্মাৎ নারী কোন নীচজাতীয়া কবিগানওয়ালী দাশরথিকে আকৃষ্ট করে । এই অকস্মাৎ তখন “আকা কবিদ্বারিনী” নামে অভিহিতা হইত । একে আকা (অকস্মাৎ) কবিদ্বারিনীর পসার, তাহার সঙ্গে দাশরথির সংযোগ—যেন সোনার সোহাগার হইয়া উঠিল । অকস্মাৎ কোকিল-কণ্ঠস্বরে গান ধরিত । সে ভ্রামরবাণী, মাংসপ অঙ্গসৌষ্ঠববিশিষ্টা এবং একটু কীৰ্ত্তিকারবাণী । সে মধুরকল্পী ঢেলী পরিয়া, রূপায় চম্ভহারে বিশাল নিতম্ব শোভিত করিত ; দুই হাতে রূপার করণ পরিহিত । তাহার পদে কাঁসার নুপুর বাজিত । সে কিরিকী হুঁচী বাঁধিতে আনিত না,—যন স্নানীৰ্থ কেশরাশি তৈললিঙ্গ করিয়া এলো চুলের গুচ্ছ ঐবাদেশোপরে বাড়িয়া রাখিত ও গলায় কাঁচীমালা পরিধান করিত ; আর ঐ মধুরকল্পী ঢেলীর অকালে দক্ষিণাবর্ত্তনে নিজ বকোদেশ ঘূর্ণায়িত করিয়া তাহার সেবাংশ কোমরে বাড়িত । আকা তখন যৌবন-কাল অতিক্রম করিয়াছিল ;—প্রৌঢ়ে প্রবৃত্তা । আর তখন শুভ্র-বস্ত্র অনেক পুরুষেরও বাজিত না ;—সে স্থপরিপাটী দন্তশ্রেণীর দুইটি দুইটি দন্ত-মধ্যস্থল তাৎকালিক “মিষি” নামক বস্ত্র-সজ্জত কাল রেখায় আঁকিত করিত । আকার রূপ ও বেশ-বিন্যাসে এবং কণ্ঠস্বর ও মর্ত্তনে মৃদু না হইত, এমন নারী বা পুরুষ তখন ছিল না ।

তখন হারমোনিয়ম ও বেহালায় সঙ্গে স্ত্রী-কীৰ্ত্তন ছিল না ; আকছই-কর স্বর্ণলঙ্কার, সোনার কাণ ও মাথায় সোনার বাগান লাগাইয়া বেনারসী ঢেলী পরিয়া কোন রমণী গান করিত না,—সুতরাং আকার ঐ প্রকার সম্ভার সহিত কবির নৃত্য-গীত দেখিতে শুনিতে সকলেই বড় ভালবাসিত । তবে দাশরথিকে আকা বিশেষরূপ আকৃষ্ট করে । অস্তের মৃদু হওয়া আর দান্তর মৃদু হওয়া অনেক প্রভেদ । আকার সু-বদনবস্ত্র দান্ত কবির-দন্ত

মহন করিতেন; আর আকা দাশরথিকে অঙ্গুরাগ প্রদান করিত। আকা কবিদারিনীর গীত-শক্তিতে আর দান্তর কবি-চন্দ্রনার কবিত্বে জমাট বাঁধিয়া গিয়াছিল। ফলতঃ আকার সঙ্গে দাশরথির বড়ই মিল হইল। গ্রামের পর গ্রাম, আগরের পর আগর গানের বিরাম নাই,—উপার্জনও হইতে লাগিল। আকার সঙ্গে এক্রপ যেনামিশিটা দান্তর মাতুল মহাশয়ের ভাল লাগিল না,—তিনি ভাবিলেন এবং দেখিলেন, লোক দান্তর প্রশংসা করিতেছে বটে, কিন্তু ঐ আকার নাম-সংযোগে সকলেই যেন কেমন একটা ইঙ্গিত ইসারা করিতেছে। মাতুল রামকীবন চক্রবর্তী মহাশয় কাটোয়ার উত্তরে এক ক্রোশ দূরস্থ ভাৎকাপিক শাঁকাই নীল কুটীতে মাসিক তিন টাকা পেতনে মুহুরীগিরি কার্যে দান্তকে নিয়োজিত করাইলেন। দান্তর কবিত্ব দর্শে বাওয়া বন্ধ হইল। এ সময় দাশরথির মাতুল মহাশয়ই তাঁহার একমাত্র মুখ্য শাসনকর্তা—অতএব তাঁহার আজ্ঞা বা বাবস্তা উন্নয়ন করা দান্তর পক্ষে সহজ নহে। কিন্তু আকাকে বিমুখ হওয়া তাঁহার পক্ষে বড়ই ক্লেশকর হইয়া উঠিল। নীরস মুহুরীগিরি কার্যে সেই “এসভাষা” স্বভাবপণ্ডিত দাশরথির ভাল লাগিল না।

শেষে দান্তর কাছে ঐ শাঁকাই কুটীতে আকা উপস্থিত হইল। যেমন পরম্পর দর্শন, অমনই গোপনে একত্র পলারন। চতুরা আকা দান্তকে লইয়া সদলে রাজসাহী অঞ্চলে গাওনার অহিলার চলিয়া গেল। গ্রাম এক বৎসর কাল আকা-দান্তর কবির দল রাজসাহী প্রদেশে রহিয়া গেল। এ কথা আর লিখাই বাহুলা বে, মাতুল রামকীবন বা দান্তর অত্যন্ত আত্মীয়গণ আকা-দান্তর খবর রাখিতে লাগিলেন। ফলে জাতি-কুইৎগণ, ঐতিবেদিগণ দান্তর উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। কেহ বলিলেন, দান্তর হুকা বারণ হওয়া উচিত। কেহ বলিতে লাগিলেন,—তাঁহাকে আর পংক্তি-ভোজনে লওয়া হইবে না; দেশে একটা হগছুস পড়িয়া গেল—দান্ত রায় কবিদার হইল; জাতি গেল, বান্ধবভ্রাতা রায়বংশে এমন কুলাঙ্গার জন্মিয়াছিল—ইত্যাকার কথার দান্তর অপমানের আর অবশেষ রহিল না। কিন্তু পাকালী-বন্ধি যে এই কুলাঙ্গারকে স্পর্শ করিয়া কালে এমন উচ্ছল করিকে; তাহা তখন কেহ মনে স্থানও দেয় নাই। এই সময় দান্ত কিছু কিছু অর্থস্বার্থে প্রেরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন হুকা বারণ হইবে কি, বাহাতে দান্ত বাকগুড়ার বাগীতে আইসেন—এই আশ্রয়-অনমনগণের প্রবল হইয়া

উঠিল। যে পারিল, আকা-দাণ্ডর কাছে গিয়া সাক্ষাৎ করিতে ও স্বার্থসাধন করিতেও কতক করিল না। কিছুদিন গতে বিদেশবাসেই পীড়ার কষ্ট এবং কবির দল ছত্রস্তম্ব হইয়া পড়িল। বিদেশে বাস আর কাহারও অভিলেপ্ত হইল না। আকা ও দাণ্ড স্ব স্ব আবাসে পৌঁছিলেন। দেশে আনিয়া অল্পদিন পরেই আবার দেশের বাসনা হইতে লাগিল। নূতন গান ও নূতন ছড়া—পাঁচালীর ধ্বনি পড়িয়া গেল! দাশরথির অব্যবহিত কনিষ্ঠ তিনকড়ি রায় (তিহু রায় নামে খ্যাত) সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন। ছোট দাদার কবির দলে অর্থাগম হয় তাবিয়া তিনকড়িই যেন বিশেষ বস্ত্র করিয়া দলের তোড়বোড় করিতে বসিলেন। পুনরায় দল হইল এবং দেশে স্থানে স্থানে গাওনাও হইতে লাগিল।

এই সময় কবির গানের বিশেষ আদর ছিল। ফরাসডালাবানী অ্যান্টনী “দাহেব” গুটিয়ান হইয়াও তখন কবির দল করিয়া প্রথমে লব করিয়া গাহিয়া বেড়াইতেন, পরে রীতিমত ব্যবসাদারী দল বাহির করেন। তিনি বালালীর মতন ধুতি-চাদর পরিয়া কবির আসরে বসিতেন। বিশেষতঃ অ্যান্টনী কবির গানে কেমন মজবুত হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার কৃত কবির গানের কোন কোন স্থান হইতেই বেশ বুঝা যাইবে। যথা,—

“কুকে আর বুটে কিছু এতেন নাই রে তাই ;—

সুদু নামের কেরে, মালুধ কেরে ‘এ’ ‘ও’ কথা শুনে পাই।”

ইতি চীতান অর্থাৎ এই অংশটি প্রথমে অতি চীৎকার করিয়া গাহিতে হয়।

• • • • “অপানে করুণা কর ওগো মাতঃ মাতলি,

আমি তখন সাধন জানি না মা আমি ক্ষেতেতে কিরিকী।”

পরে চীতান। তাহার পর অন্তরায় মনো—

“পূনা করে সোনার কান্ধী, ওগো ভ্রামা সর্সনান্ধী,

শিবকে করে অপমানবাসী, তার সন্ন্যাসী মাতিয়েছ ;—

নাথ কেবল করুণাময়ী, কা’রে বা করুণা করেছ।—

দক রাজার নিধর হলি, আপনি হলি, তারেও মেলি ;—

আবার, যার অপমান কাণে শুনে, প্রাণ তেজিলি যোগাসনে,

ভবে, বদু বেধি মা কোন পরাণে তারির কুকে ধাড়িয়েছ—

নাথ কেবল করুণাময়ী, কা’রে বা করুণা করেছ।”

এই সময় বা ইহার কিছু পূর্বে হইতে এদেশে আর একজন কবিগারনী গায়িকা ছিল; তার নাম সহচরী। আকা এতদিন বিদেশে পলাই করিয়া বেড়াইতেছিল—কিন্তু সহচরী নিজ দেশেই দল চালাইত;—এই দলের প্রতিদ্বন্দ্বী দল ছিল, ঐবাটার প্রসিদ্ধ কবিগায়ক ৮গ্রামনাগায়ক ঠাকুরের (বর্ষের ভ্রাতা—“নারায়ণ ঠাকুর” নামে প্রসিদ্ধ) লোক সহোদর চতুর্দেয়—ঐদাম ও সুবল এবং কনাই ও বলাই—(দুই দুই ভাই জন্মগ্রহণ করেন)। আকা-দাস্ত বিদেশে, আর সহচরী ও নারায়ণ ঠাকুর দেশে পাওনা করিত। আকা-দাস্ত তিনকড়ির প্রেরোচনার দেশে দল গুলিলেন; সুতরাং ঐ দুইটি দলের—বিদেশতঃ সহচরীর দলের সঙ্গে আকা-দাস্তর দলের বিশেষ আড়াআড়ি চলিতে লাগিল। দাস্তর রচনা ভালই হইতে লাগিল বটে, কিন্তু সহচরীর দল গানসম্বন্ধে কম হইল না—দেশব্যপ্ত আকা-দাস্তর দলের সঙ্গে সহচরীর দলের পাওনা-যুদ্ধ হইতে লাগিল। সহচরীর দলে হুহরী বা ছড়াবার অর্থাৎ রচয়িতা ছিল—করুই নিবাসী নদে তুড়ী বা নদের-চাঁদ সাহা। নদে তুড়ীর সঙ্গে দাস্তর গ্রাহই প্রতিযোগিতা চলিতে লাগিল। আর একটা কথা একালের প্রয়োজন যে, দেশে আসিয়া আকা-দাস্তর পরস্পর মিশামিশি ভাবটা মাতুল গ্রামজীবন ও দাস্তর অজানা আত্মীয়গণের বড়ই চক্ষুশূল হইয়া উঠিল।—উপার্জন হইলে কি হয়, সমাজের শালন-পাল বড় শক্ত; দাস্তর চরিত্রে প্রতিবেদী কুটুংগণ বড়ই ভীত কটাক্ষপাত করিতে লাগিলেন। গ্রামজীবন ও আর আর আত্মীয়গণের বড়ই মনস্তাপ হইল। তবে এ মনস্তাপ দীর্ঘকাল রহিল না, বিচনাগরার বারনাক্ষণ অমোঘ ‘পশ্চিম মেঘ’ হঠাৎ দেখা দিল।

দাশরথির জন্মস্থান ও এই সময়ের আবাসভূমি বাক্সমুড়ার অতি নিকট উত্তরাংশে এবং মাতুলালয় পীলা গ্রামের তিন চারি ক্রোশ পশ্চিমাংশে বিচনাগ্রাম নামক গ্রামে আকা-দাস্তর ও সহচরীর কবির পাওনার বারনা হইল। চতুঃপাশ্বে বর্তী গ্রামবাসিগণ এই পাওনা-সম্বন্ধ-প্রাক্ষেপ উপস্থিত হইবার জন্য আয়োজন করিতে ব্যস্ত হইল। এ নিকে দাস্তর গ্রামবাসী ও আত্মীয়গণ গান শুনিবার আক্সাদ হইলেও একটা উৎকট চিন্তায় পড়িলেন। “আমাদের দেশে একে ত বীন বাবসা কবির গান করিতেছে, তা’র ভিতর আবার একটা কুৎসিত ব্যাপার নিহিত রহিয়াছে—গান হওয়া চাই, কিন্তু আকা (অকরা) বাবাতে এ আসরে না আইসে, এমনত চক্রান্ত করিতেই

হইবে।” এই পরামর্শ আটিতে সকলে বহুপরিকর হইলেন। পণ্ডিত কেনারাম ভট্টাচার্য্য ঐ বিচনাগরা গ্রামের একজন পণ্যমান্য বাসন্দ্য;—অপিচ তিনি বাকুড়া ও তৎসন্নিহিত গ্রামসমূহের প্রায় সকল ব্রাহ্মণের পুরোহিত, স্মরণ্য দাশরথিরও তিনি পুরোহিত। চক্রাভিকারীরা উদার কোনারাম পুরোহিতকে বরিতা বলিল; অহুর্গোধ করিল—আপনি আহ্বেল করুন যে, হুস্তরিয়া গ্রীলোকের মুখে পুরাণ-কথা-প্রবণ শাজে নিবিড়; অতএব আকা কবিদারনী যেন বিচনাগরার আসরে না আইসে। অহুর্কৃত হইয়া কেনারাম বিশেষ চেষ্টা করিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় যজ্ঞমানগণের অতীষ্ট সিদ্ধির জন্য অনেক বলিলেন। কিন্তু অক্ষয়া গ্রী-পায়িকা,—সে আসরে নামিয়া নাটিবে না, গাহিবে না, এমন কি গ্রামে আসিতেই পাইবে না—ইহাতে কে সন্তোষ দিবে?—বিচনাগরা গ্রামের কেন, অন্যান্য গ্রামেরও ইহাতে মত হইল না—আবার অক্ষয়া না আসিলে দাতাই কি পূর্ণবয়সে আসরে নামিবেন?—কখনই না। মীমাংসার স্থির হইল—অবশ্যই অক্ষয়া আসিবে। যৎসময়ে আকা-দাস্তর দল ও অপর দল আসিল। গানের আসর ঐ বিচনাগরা গ্রামে ৮শিবতলায়। এই শিবতলা এখনও বর্তমান। কয়টি বহুল বৃক্ষ স্থানটিকে অতি মনোহর করিয়া রাখিয়াছে। শিব-বন্দিরেরও কীর্ণ-লক্ষ্যের অল্পদিন হইল হইয়াছে। রাজি দেড় প্রহরের পর পাওনা আরম্ভ হইল। লোকে লোকারণ্য—স্থানসঙ্কলান হয় না—দাশরথির আকীর-বজনগণ প্রকাশ করিলেন, গান শুনিতে আসিবেন না; কিন্তু শেষে সকলেই আসিয়া গোপন ভাবে এ দিক্ ও দিক্ স্থান করিয়া লইলেন। পুরোহিতপ্রবর কেনারাম ভট্টাচার্য্য মহাশয়, হুর্গানামের নাযাবলী উত্তরীর গাজে মজলিশের বদ্যস্থলে “সমস্তাং গঠৈঃ যজ্ঞমানগঠৈঃ” এই ভাবে ছুইচিঙে মস্তক উন্নত করিয়া বলিলেন। এ বৃন্ত চাকুস করিয়াছেন, এমন ব্যক্তি এখনও একবারে বিরল নছেন। চারিখানা মুচে ঢোল গগনতেমী রবে বাজিয়া উঠিল,—কীন্দার দুইটি বালক “বাল কীচা মারিচা” স্মৃতি সহ নৃত্য করিতে করিতে কীন্দী বাজাইয়া আসর জমাইয়া দিল।

ঢোল কীন্দীতে আসর জমাইয়া দিল। সহচরীর দল অগ্রে অবতীর্ণ হইল—প্রথমে তাৎকালিক নৃত্য আরম্ভ হইল। পরে ভবানীবিষয়ক গান—এই প্রকার উত্তর দগেই দুই দফায় হইয়া গেল—পরে কুঁকলীলার সখী-সখাদ—ইহাতেও কোন খেব-বিষয়ের আভাস পাওয়া গেল না। তৎপরে কবি—

অর্থাৎ এ পানকে যে জন্য কবির গান বলে, তাহাই আগ্রহ হইল। মঙ্গলিশের আদেশে প্রয়োজন—চাপান দিবে কোন পক্ষ, আর পাণ্টা করিবে কোন পক্ষ। দাশরথি প্রার্থনা করিয়া বলিলেন যে, অন্যর দল চাপান দিবে—তিনি পাণ্টা করিবেন। দাশরথি প্রার্থনা মন্তর করিয়া সহচরীর দলকে চাপান দিতে অর্থাৎ প্রেরণ করিতে বলা হইল। এ দলের ছড়ানার বা কবি “নদে শুড়ী” এ কথা পূর্বে উক্ত হইয়াছে—নদে একটা চাপান চাপাইল—এবং গান গাহিয়া প্রেরণ করিল।—

“তুন ওহে দাশরথি, তোমার এমন কায কি শোভা পায়।

তোমার বিশেষ দৃষ্টি দেখে তুনে দিচ্ছি আমি আশ্রয়।

..... (অতি অল্পীল—অপাঠ্য অংশ পরিত্যক্ত হইল)

তুমি বায়ুন কিসের ?—খেতাবটি তো “রায়”,—

মুহুরো, চাটুঘো, ঝাড়ুঘো ত্রাঙ্কণের উপাধি রয়,—

তবে প্রণাম কর্ত্তে ইচ্ছে হয়।

.....

তোমার বায়ুন হয়ে হয় না কি দেখা ;—

(ও মরি হায়,—হায়,—হায় হায় রে ;)—

কেবল আকার আকা পানে চেয়ে থাক। কি বিড়ম্বনা।

তোমার আপনার লোক সব লজ্জা পেয়ে,

ঐ পোপন হয়ে লোক বাড়ায়।

তুন ওহে দাশরথি—ইত্যাদি—

ফলতঃ ঐ চাপান গানে দাশরথি রায় মহাশয়কে কটু কথায় গালি দেওয়া হইয়াছিল। দাশরথি আত্মীয়গণ তাহা শুনিয়া আর পোপনে থাকিতে না পারিয়া মঙ্গলিশে গিয়া বহুতর দুঃখ ও পরিতাপ প্রকাশ করিলেন ; বলিলেন,—“দেখো ! তোর লজ্জা বেশ ছাড়িয়া যাইতে ইচ্ছা হয়—মঙ্গলিশের যাকে নদে শুড়ী এত গালিগালাব করিল ; হয় তোর মূর্ত্তা হউক, না হয় আমরায়ই সকলে মরি।”—এই সব দুঃখমূচক কথা উচ্চস্বরে গভীররবে উক্ত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য যে, এই সময় নৃত্য-গীত বন্ধ হইয়া যায়। পুরোহিত কেনারাম অতি ব্যথিত হইলেন এবং দাশরথির মুখের উপর বলিলেন, “বেশ দাঁত, সমাজবণ্যে তোমার যে প্রকার অপমান হইল, ইহার প্রতীকার প্রায়শ্চিত্তাদি যদি না কর, তবে আমি তোমার পুরোহিত্য করিব না।

এমন যজ্ঞবানে আমার প্রয়োজন নাই।”—দামরুণী মন্তক অবনত করিয়া মজলিসে বসিয়া রহিলেন।—সে রাত্রি আর আসরে উঠিলেন না। উত্তর দলই বিশেষ নিকৃৎসাহ; দুই একখানা করিয়া গাওনা হইয়া প্রাতঃকাল হইবামাত্র আগর ত্যাগিয়া গেল। তখনও দান্ত নতদৃষ্টিতে সেইরূপ বসিয়াই আছেন। আকা দান্তর দৃষ্টিতে মর্মান্বিতিক দৃষ্টিত হইল এবং দান্তকে বাসার লইয়া গিয়া বিত্তর প্রয়োণ ছিল; বলিল,—“বাটীর নিকটে গান করা ভাল হয় নাই,—তা বাহা হইবার হইয়াছে, তাহার আর উপায় কি? মন ভাল কর—আর এ কাৰ্য্য আবস্থা করিব না, যদি করি তবে বিদেশে করিব।” দলের সকলেই রায় মহাশয়ের দৃষ্টিতে হইল এবং “আকার জগতই এই সব হইল”, এই ভাব প্রকাশ করিয়া সাংলে ব ব গৃহে চলিয়া গেল। তখন আকা কান্দিতে কান্দিতে বলিল, “দেখ রায়! আমার জন্যই তোমার এই সব অপমান, নাজেহাল, আমি তেঁকে লইয়া ভিক্ষা করিয়া খাইব। তুমি তোমার ঘর-গৃহস্থালী আর আত্মীয়-বন্ধন লইয়া থাক, আমাকে আশ্রয় কর।” এই বলিয়া আকা নিজের রৌপ্যানিধিত ২৪ খানি অলঙ্কার বাহা গায়ে ছিল, তৎসমুদায় দামরুণীর পদোপরে স্থাপিত করিয়া প্রণাম করিল ও নীরবে কান্দিল। দামরুণীর অনেকক্ষণ হইতেই বাস্তব-নিপত্তি নাই। এমন তাঁহারও নয়নে অশ্রু দেখা দিল।—তিনি বলিলেন, “আকা! বাড়ী যাইবি, না বাক্সঘড়ায় যাইবি?” আকা বলিল, “এ মুখ আমার তোমার বাড়ীর সবাইকে দেখাইব?—পাতাই হাটের ঘাটে জাহ্নবী নাইতে চলিলাম; এস রায়! তুমিও এস। জাহ্নবী আনের পরে বাড়ী আসিবে—আমিও বাড়ী যাইব।” শেবে এইরূপই হইয়াছিল। আকার স্বত্বের নাম “গঙ্গা সর্দার” ছিল এ জন্য আকা স্বল্পে “গঙ্গা” কথা উচ্চারণ না করিয়া “জাহ্নবী আন” বলিল। দামরুণি রায় কবির দল ত্যাগ করিলেন।

শ্রীরমানাথ মুখোপাধ্যায় ।

কৃষ্ণদেব বিজ্ঞাবাগীশ।

মহাৰাজ ৰাজবল্লভেৰ সময়কালে, ৰাজনগৰে আৰও চুইজন সুগ্ৰসিদ্ধ লোক জন্মগ্ৰহণ কৰে। বদেৰে এই চাই জনেৰ নাম অতাপি সৰ্বসাধাৰণেৰ নিকট পৰিচিত হইয়াছে। তাহাৰে একজন গায় মহাভাৰত বেওয়ান, অপর জন কৃষ্ণদেব বিজ্ঞাবাগীশ। এৰেবোক্ত মহাভাৰতৰ ত্ৰাহুপুত্ৰ ও শেসোক্ত তাঁহাৰ শৈবগুৰু ছিলেন। ৰাজনগৰে ইহাদেবও কীৰ্ত্তিচিহ্ন বিজ্ঞমান ছিল; তৰে ৰাজবল্লভেৰ কীৰ্ত্তিমেথলাৰ সন্নিহিতে বিজ্ঞমান ছিল বলিয়া সেসকল সামান্য অনুদীয়ায়ও প্ৰতীয়ামান হইত। কিন্তু যদি কিঞ্চিৎ ব্যবধানে ঐ সকল কীৰ্ত্তি বিয়াজ কৰিত, তাহা হইলে উহাৰা বে সমাদৃত হইত তাহাতে সন্দেহ নাই। এই প্ৰসঙ্গে, কৃষ্ণদেব বিজ্ঞাবাগীশ-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা কৰাই আমাদেৰ উদ্দেশ্য।

আমরা বহুতৰ অবগত হইতে পাৰিরাছি, তাহাতে বলা যাইতে পাৰে, ৰাজনগৰেৰ ৰাজনগৰ আগমনেৰ পূৰ্বে, ভট্টাচাৰ্য্য কণ তথায় বাস কৰিতেন। বেকালে ৰাজনগৰ বিল দহুদীয়া নামে পৰিচিত ছিল, তৎকালে সত্যবন্ত দাশ নামে বৈভবংশোদ্ভূত এক বৰ্দ্ধিত ব্যক্তিৰ কণ অবগত হওৱা যায়। কৃষ্ণদেবেৰ পূৰ্ণপুৰুষ নুসিংহ তৰ্কভূষণ তাঁহাৰ পুৰোহিত ছিলেন। বশোহৰ জিলাৰ অন্তৰ্গত ইটনা গ্ৰামবাসী বেদগৰ্ভ সেন সত্যবন্তেৰ কণ; বিবাহ কৰিয়া বিল দহুদীয়াবাসী হইলে এই নুসিংহ তৰ্কভূষণকে পুৰোহিতপদে বৃত্ত কৰিয়া লৱেন। যদিও বেদগৰ্ভেৰ সহিত তাঁহাৰ কুলোপুৰোহিত ঈশানচক্ৰ চক্ৰবৰ্তী মহাশয় আগমন কৰিয়া বিল দহুদীয়াৰ গৃহসংস্থাপন কৰেন, তথাপি তিনি বৎসকুলেৰ পুৰোহিতকেও দ্বিতীয় পুৰোহিতৰূপে গ্ৰহণ কৰিতে বাধ্য হইলেন।

বেদগৰ্ভ সেনেৰ অধঃস্তন বৰ্ণ পুৰুষে ৰাজবল্লভ জন্মগ্ৰহণ কৰেন। এদিকে নুসিংহ তৰ্কভূষণেৰ পক্ষ পুৰুষে কৃষ্ণদেবেৰ জন্ম হয়। অতএব ৰাজবল্লভ ও কৃষ্ণদেবেৰ সমসাময়িক হওয়া কোনৰূপে অসম্ভব হইতে পাৰে না। এবাৰ—কৃষ্ণদেব বিজ্ঞাবাগীশ, মহাৰাজ ৰাজবল্লভেৰ শৈবগুৰু ছিলেন। আৰ ৰাজনগৰ নিবাসী কৃষ্ণদাস সিদ্ধান্ত নীলকণ্ঠ সাৰ্দ্ধভৌম ও কৃষ্ণদেব বিজ্ঞাবাগীশ বে মহা-ৰাৰেৰ সত্যসদ পণ্ডিত ছিলেন, ইহা পৰিভ্ৰাত কণ।

ৰাজবল্লভ বে সফল বক্তৃতাশক্তি কৰেন বা বিববাবিবাহ প্ৰভৃতি সমাজ-

সংসারকাণ্ডের পূর্ণাঙ্গান করেন, উহার প্রত্যেক কাণ্ডের মূলেই এই তিন জন পণ্ডিত সংলিপ্ত ছিলেন ।

বুনিং তর্কভূষণের পুত্র কল্যাকান্ত বাচস্পতি ; তৎপুত্র রামকীবন আচার্য্য ; আচার্য্যের দুই পুত্র—প্রথম অগ্রকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী, দ্বিতীয় আচার্য্য চক্রবর্ত্তী । অগ্রকৃষ্ণের বংশোদ্ভূত বৈষ্ণবাবিদ্ভাক্ষণ, কানীচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার ও তারিণীচরণ তর্করত্ন প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বর্ত্তমান সময়ের কিঞ্চিৎ পূর্ন সময় পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন ।

আচার্য্য চক্রবর্ত্তী বহাশর ব্যাকরণে পণ্ডিত ছিলেন, বর্ত্তমান সময়ের যত পূর্বে বৈয়াকরণগণের কোনরূপ উপাধিব্যবহারের নিয়ম ছিল না । আচার্য্যের চারি পুত্র—কৃষ্ণদেব, বাণেশ্বর, কৃষ্ণদেব ও কানীনাথ । প্রবাহ—আচার্য্য সিদ্ধপুরুষ ছিলেন ; এই জন্য তিনি সাধারণের নিকট ভট্টাচার্য্য বলিয়া পরিচিত । যজ্ঞমানসের মধ্যে অনেক ঠাঁহাকে গুরুপদে বৃত্ত করিয়া লয়েন । তদবধি আচার্য্যের বংশধরগণ ভট্টাচার্য্য উপাধি ধারণ করিয়া আসিতেছেন । তাঁহার ভ্রাতার বংশধরগণ চক্রবর্ত্তী নামেই পরিচিত । রাজনগরের চাকলাদার ও ভূঞা উপাধিবিধিষ্ট ব্রাহ্মণগণ এই চক্রবর্ত্তী ও ভট্টাচার্য্য বংশের জাতি-সন্তান বলিয়া পরিচিতি ; রাজনগর ও অগদাগ্রামে যে সকল বৈষ্ণব বাস করিতেন তদ্ব্যতীত বেদগর্ভ সেনের বংশধরগণ সকলেই এই চক্রবর্ত্তী ও ভট্টাচার্য্য-বংশের বলমান ।

কৃষ্ণদেব “বিজ্ঞাবাগীশ” উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ; এক দিকে যেমন তাঁহার বিজ্ঞার ও প্রতিভার সকলেই তাঁহাকে সম্মাননার দৃষ্টিতে দেখিতেন ; অপর দিকে তেমনই বুদ্ধিবলেও তিনি বসমাঙ্গে গণনীয় ব্যক্তিমধ্যে পরিগণিত ছিলেন । ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের মধ্যে সর্বাধিক বুদ্ধিপরিচালনা করিতে সে কালে বড় কাহাকেও দেখা যাইত না । অতীত অবস্থার ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ কিরূপে ধনসকল বা গৃহস্থীর পাত্রশোভন ভূষণচিত্র অর্জন করিতেন তদ্ব্যতীত চিত্তাকুল হইয়া, বুদ্ধি খাটাইয়া নান্যপথে বিচরণ করিয়া থাকেন । কিন্তু আশ্চর্য্য যে সময়ের কথা বলিতেছি তৎকালের পণ্ডিত-সম্প্রদায়ের মনে কদাচিৎ এইরূপ ভাবের উদ্বোধন হইত । দেখা যায়, কৃষ্ণদেব বিজ্ঞাবাগীশ এই পদেরও লবিক ছিলেন । তাঁহার প্রগাঢ় সাধনার সিদ্ধিও খটয়াছিল ।

মহারাজ রাজবল্লভ তাঁহার নিকট যত্নগ্রহণ করিলেন, কাষেই তিনি রাজগুরু হইয়া যে তৎকর্তৃক সংকৃত হইয়াছিলেন তদ্ব্যতীত সন্দেহ নাই । এই সময়েই



শ্রীঅনন্দনাথ রায় ।

তাঁহার মৌর্য্যগ্য সরকারের স্বত্বপাত হইয়া, পরে গোহুলতাদে বোমানের সাহচর্য্যে তাঁহার পূর্ণতাসাধন হয় ।

যীর কামেন আলী যখন রাজবল্লভ ও তদীয় পুত্র কৃষ্ণদাসকে যুদ্ধের কারাকন্ড করেন, তৎসময়ে নবাবপক্ষীয় আকা রেজা নামক একজন গৈরজা-ধাক রাজনগরে উপস্থিত হইয়া রাজসম্পত্তি ও তদীয় গ্রামস্থ সমুদায় গ্রন্থের এমন কি দুরবর্তী রাজজাতি ও কুটুম্বগণের গৃহ পর্য্যন্ত লুণ্ঠিত করেন । এই ব্যাপারে কিন্তু বিজ্ঞাবাগীশের এক কণর্দকও নষ্ট হয় নাই । কারণ, তিনি যীর হুদি ও বাগ্মীভায় আকা রেজাকে এইরূপ বশীভূত করিয়াছিলেন যে, আকা সাহেব তাঁহাকে সম্মান করিতেন । এ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রবাদ চলিয়া আসিয়াছে ।—

রাজনগরে অবস্থানকালে আকা রেজার সর্দি হইলে নানারূপ চিকিৎসাভেও তাঁহার শান্তি হয় না । এক দিবস বিজ্ঞাবাগীশ আকার সমীপে উপস্থিত হইয়া নানাবিধ প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়া আকা সাহেবের বাহ্য-সম্বোধী কথ্য উত্থাপিত করিয়া বলিলেন, “আমি অবগত আছি, এইরূপ সর্দিতে ডাবনারিকেলের জল পান করিলে অচিরে রোগের প্রতীকারসাধন হইয়া থাকে ।” আকা সাহেব পণ্ডিতকে যথেষ্ট প্রভা করিতেন, এই কথা শুনিয়া তিনি ডাবনারিকেলের জল পান করিতে উত্তোষী হইলেন ; কিন্তু তাঁহার সঙ্গীতা বাবা প্রদানপূর্ব্বক বলিলেন, পণ্ডিত রাজগুরু ; সম্ভবতঃ তিনি পত্রনিপাতের ক্ষত এইরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া থাকিবেন, অতএব তাঁহার কথায় বিশ্বাসস্থাপন করা সঙ্গত নহে । আকা কিন্তু তাঁহাদের কথা গ্রাহ্য করিলেন না, পণ্ডিতের কথাছাড়ায়ী ঔষধ ব্যবহার করিলেন ; তথাপি মনের আশঙ্কাগ্রস্ত বিজ্ঞাবাগীশের উপর দৃষ্টি রাখিবার ক্ষমতা গুণ্ডচর নিরক্ষ করিলেন ।

এদিকে ক্রমশঃই তাঁহার রোগের হ্রাস হইয়া তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হইলেন । এই ক্ষত তিনি বিজ্ঞাবাগীশের সম্পত্তিতে হস্তার্পণ করেন নাই ।

রাজবল্লভের ও শেঠবংশের ধ্বংসসাধন করিয়া যীর কামেন রাজ্যভ্রষ্ট হইলে প্রকৃত প্রভাবে ইংরাজের প্রভাবই দেশমধ্যে বিস্তৃত হইয়া পড়ে, মুর্শিদাবাদের রাজ্যসন তৎকালে ক্রীড়ার পুত্তলিকাঘারা সুশোভিত থাকিত যাত্র পরে ইংরাজগণ যথেষ্ট রাজ্যশাসনের ভারগ্রহণ করেন ।

ইংরাজ রাজ্যের প্রারম্ভে যে কয়জন বাঙ্গালী রাজকাৰ্য্যে বিখ্যাত ও

সৌভাগ্যশালী হইলেন, তদন্তে গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের নামও উল্লেখযোগ্য । বিভাবাগীশ শীঘ্র বৃত্তিতে পারিলেন, এই পরিবর্তনের সময়ে রাজাশুগ্ৰীত ব্যক্তিগণের সন্মত বাতীত উল্লেখ্যভেদ সম্ভাবনা নাই, অতএব তাঁহাদের আশ্রয় গ্রহণ করা সর্বতোভাবে সমীচীন । তিনি গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের উদ্দেশ্যে গমন করিয়া, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন । ক্রমে পরস্পরের মধ্যে আলাপ পরিচয় হইতে বিলম্ব ঘটিল না । বিভাবাগীশের পাণ্ডিত্য ও বহুদর্শিতায় বিমূঢ় হইয়া সিংহ মহাশয় তাঁহাকে আশ্রয়প্রদান করিতে সীতুত হইলেন ।

কিছুদিনের পর পণ্ডিত সেই আশ্রয়দাতাকে জানাইলেন, রাজবল্লভ দত্ত তদীয় বৃত্তিকুমির সন্নিকটে কথখানি ক্ষুদ্র চর নদীগর্ভ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে, তিনি যদি উহার বন্দোবস্ত করিয়া লইতে পারেন, তবে তাহাতেই তদীয় জীবনযাত্রা অনায়াসে নির্বাহ হইতে পারিবে । বলা বাহুল্য, তাঁহার আবেদন অগ্রাহ্য হইল না ; সিংহের কৃপায় বিভাবাগীশ নিষ্কমনোরথ হইলেন । এইরূপে তিনি একটি ক্ষুদ্র জীবীদারীর মালিক হইলেন । উহাই তাঁহার নামের সহিত যুক্ত হওয়ার, তন্মূলে কৃকদেবপুর নামে এক মহালের উদ্ভব হইল । বিভাবাগীশ তৎপ্রসীত বাবরগঞ্জের ইতিহাসে এই তন্মূলে কথা ও কৃকদেব বিভাবাগীশের নামের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন (১) ।

বিভাবাগীশ ১১৯৯ সনের ১০ই পৌষ তারিখ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন । জগদানন্দ হরিনারায়ণ সেন ঐ গ্রামবাসী চারি কানী তিন গত্তা পরিমাণ জমী আদ্যারাম চক্রবর্তী মহাশয়কে ব্রহ্মত্ব দান করেন, চক্রবর্তী মহাশয়ের চারি পুত্র উহা বন্টন করিয়া লয়েন । এই বন্টন উপরের লিখিত সন তারিখ সংযুক্ত বেধা যায় । তাঁহাদের তিন ভ্রাতার ও ব্রাহ্মপুত্রের স্বাক্ষরযুক্ত দলিল আমাদের নিকট বর্তমান রহিয়াছে (২) । দেখা যায়, রাজবল্লভের মৃত্যুর ২১ বৎসর পরেও তদীয় গুরু বিভাবাগীশ জীবিত ছিলেন । তিনি যে দীর্ঘ-জীবী মনুষ্য ছিলেন তাৎবিষয়ে সন্দেহ নাই ।

কৃকদেব বিভাবাগীশের যথাক্রমে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন ; প্রথম গঙ্গা-

(১) বিভাবাগীশ কৃত বাবরগঞ্জের ইতিহাস ত্রুটিয়া ।

(২) সাক্ষর ঐকদেব বিদ্যাবাগীশ, ঐকদেব চক্রবর্তী, ঐকদেব চক্রবর্তী, ঐকদেব চক্রবর্তী । আত্মীয় ঐকদেব দেব কর্তৃক ছুনি বাটোয়ারায় চিটা ।

হরি ভট্টাচার্য, দ্বিতীয় ঐহরি বিভাগলকার, তৃতীয় নব তর্কভূষণ। বিজ্ঞাবাগীশ কালগ্রাসে পতিত হইলে এই তিন ভ্রাতা বিপুল অর্থব্যয়ে তাঁহার আত্মপ্রাণ-কার্য সম্পন্ন করেন। তদবধি তাঁহারা এই নিয়ম-সংস্থাপন করেন যে, প্রতি বৎসর এই প্রাণবাসরে যে কোন পণ্ডিত উপস্থিত হইবেন, তাঁহাকে উপযুক্ত বিদায় প্রদান করা যাইবে। বিক্রমপুর ও ইদিলপুর প্রকৃতি স্থানের পণ্ডিতগণই সাধারণতঃ এই কার্যে উপস্থিত হইয়া, আহার ও বিদায় প্রাপ্ত হইতেন। তাঁহাদিগকে একত্র আর প্রতিবৎসর পৃথক্ নিমন্ত্রণ করা আবশ্যক হইত না। গ্রামস্থ জনগণ এই ব্যাপারে নিমন্ত্রিত হইয়া আহারে পরিভূট হইতেন। দ্বিতীয়া তিথিতে এই কার্য সম্পন্ন হইত বলিয়া সাধারণে উহাকে দ্বিতীয়ার প্রাণ বলিয়া বোঝা করিত।

তাঁহাদের আর একটি কার্যের কথা উল্লেখযোগ্য ; উহা “অনন্তোৎসব”। প্রতিষ্ঠিত শিলাচক্ৰ অনন্তদেবকে প্রতি বৎসর পৌষ মাসে যথাগীতি অভিব্যক্ত করান হইত। এই সময় নানাক্রপ আয়োদ প্রয়োদের ও আহারের ব্যবস্থা ছিল। আহুত, রবাহুত যে কোন ব্যক্তি উপস্থিত হইত, তাহাকেই পরিভোষ সহকারে ভোজন করান হইত।

কুলতপ না করিয়া, ভঙ্গকূলে কল্পা সম্প্রদানের নিয়ম এই বংশে কখন ঘটে নাই। বর্তমান কালে রাষ্ট্রীয় ভ্রাত্ত্বণ ঘটকদিগের বিদায়দলকে যে নিয়ম প্রবর্তিত আছে, উহা এই বিজ্ঞাবাগীশের বাড়ী হইতেই প্রথম প্রবর্তিত হয়। কুলতপ ও ঘটকবিদায়দল ইহারা অল্পস্ব অর্থব্যয় করিয়াছেন।

ঐহরি বিভাগলকার বেত্রপ পণ্ডিত ছিলেন, বৈষ্ণবিক ব্যাপারেও তদনুক্রম ক্রমতা দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার তত্ত্বাবধানে পৈত্রিক জমীদারীর যথেষ্ট উন্নতি সংবাদিত হয় ; এমন্য অপর ভ্রাতৃত্বয় বিভাগলকার মহাশয়কে অর্দ্ধাংশ প্রদান করিয়া অপরাধ লইয়া সন্তুষ্ট থাকেন। সর্গসাধারণে তাঁহাদের বাড়ীকে ভট্টাচার্য বাড়ী বলিলেও রাজনগরবাসীরা বিভাগলকার বাড়ীই বলিত। এই বংশে বিষয়সম্পন্ন হইয়াও “পতিভী” ও “যজমানী” ব্যবসায় পরিত্যাগ করেন নাই। ঐহরি বিভাগলকারের পুত্র রামকৃষ্ণার ন্যায়ভূষণ একজন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। ন্যায়ভূষণের পুত্র কাশীকান্ত ন্যায়চলকার। তাঁহার পুত্র শশীভূষণ ভট্টাচার্য। শশীভূষণের উচ্চোগে প্রতি বৎসর বগলাঘুণী দেবীর মূর্তি পঠিত হইয়া মহাসমারোহে অর্জিত হইত। তাঁহার একমাত্র পুত্র ঐহুক ইন্দ্রভূষণ ভট্টাচার্য অধুনা ঢাকায় বাস

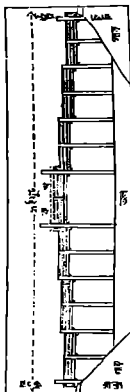
করিতেছেন । শ্রীমদ্রামমোহন বিহারী পুত্র কালীপ্রসাদ তৎপুত্র কৈলাসনাথ ভট্টাচার্য্য ।

শ্রীহরির অপুত্র পুত্র রূপরাম ভট্টাচার্য্য । তৎপুত্র হরচরণ ন্যায়পকানন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন । এই মহাত্মা বর্তমান লেখকের আচার্য্য ওরূপ । ন্যায়-পকাননের যথাক্রমে দুই পুত্র জয়প্রহর করেন, তন্মধ্যে কোষ্ঠ কাশীনাথ বিহারের উপাধিধিনিষ্ট ছিলেন । তাঁহার চারি পুত্র, ব্রজলাল, বিহারীলাল, প্যারীলাল ও রাধেন্দ্রলাল । অধুনা এই ভট্টাচার্য্য বংশবধো একমাত্র রাধেন্দ্রলাল উপাধি প্রাপ্ত হইয়া পৈত্রিক “পণ্ডিতী” সম্মান রক্ষা করিয়াছেন ।

কৃষ্ণদেব বিজ্ঞাবাগীশের প্রথম পুত্র গঙ্গাহরি ভট্টাচার্য্য, তৎপুত্র হরি-শঙ্কর ভট্টাচার্য্য মহাশয় মহাপ্রয়াগেই নানাস্থানের পণ্ডিত নিমন্ত্রণ করিয়া স্বীয় জননীর্ অশ্রুশ্রদ্ধা কার্য্য সম্পন্ন করেন । বলা বাহুল্য এ বাড়ীর কর্তা ও কর্ত্রী-গণের মৃত্যু হইলে প্রায়ই দানসাপর কার্য্যের অনুষ্ঠান হইত । হরিশঙ্কর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের দুই পুত্র, শ্রীমুক্ত ভগবতীচরণ ও শ্রীমুক্ত ভ্রামাচরণ ভট্টাচার্য্য ।

বিজ্ঞাবাগীশ মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র নব ভর্তুকচরণ, তৎপুত্র কালীদাস ভট্টা-চার্য্য । এই ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিজ জমীদারী কৃষ্ণদেবপুরের নিকটবর্ত্তী গবর্ণমেন্টের খাস মহাল হইতে চর লালমোহন ও চর ভূতা নামে দুইটি ইজারা গ্রহণ করেন । তাঁহার মৃত্যু হইলে তৎপুত্র হরপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় বর্ত্তমান থাকি সময়ে লালমোহন মহাল গবর্ণমেন্টে খাস করিয়া লয়েন । হর-প্রসন্নের মৃত্যুর পর তৎপুত্র তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্যের সহিত ভূতা মহাল লইয়া গবর্ণমেন্টের নানা মোকদ্দমার পর মহাল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের হস্তেই ন্যস্ত হয় । কিন্তু উহার অনেক জমী গবর্ণমেন্টকে ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে । কৃষ্ণদেব বিজ্ঞাবাগীশের বংশধরগণবধো শ্রীমুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিকল্পী হাই কুলটিকে স্বীয় বাসস্থান উবাদী গ্রামে সংস্থাপিত রাখিয়া জনসাপারগণের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন ।

এই বংশের রাজনগর বাড়ী বহু দৌধসম্মিত ছিল, বিশেষতঃ সর্ব্বসাধা-রণের হিতকল্পে রাজনগরের খানের উপর যে সেতু ভট্টাচার্য্য বংশধারা নির্ম্মিত হর উহা উল্লেখযোগ্য । কলিকাতার প্রান্তবাহী গঙ্গার উপর অব-স্থিত সেতু অবশ্য বিশ্বয়ের বস্তু ; তবে উহা প্রায়বায়ো ও বহু বীসম্পন্ন এজি-নিগারের কৌশলে নির্ম্মিত । কিন্তু রাজনগরের এই সেতু স্থানীয় স্বতন্ত্রগণের বুদ্ধিকৌশলে প্রস্তুত হইরাছিল । জনমানাষি পরিচালনকালে এই সেতুর



মহাভাগও খুলিয়া লওয়া যাইতে পারিত। ইহা হইতেই বুঝা যাইবে যে, আমাদের দেশের শিল্পীরা প্রকৃত শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে, এই সকল কার্যে যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে পারে।

কৃষ্ণদেব বিজ্ঞাবাগীশের বংশধরগণ কেবল বিদ্যা ও পণ্ডিত ছিলেন এমন নহে—সঙ্গীতও ইহারা পারদর্শী ছিলেন, তাঁহাদের সবেগ কবিতা ও কবির দল ছিল। তাঁহারা আসরে অবতীর্ণ হইয়া, গীত-বাদ্য করিতে কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করিতেন না, অথচ নিয়মমত বিজ্ঞাধিগণকেও পাঠদান করিতেন। বাড়ীতে অল্পমাত্র ছিল; উহাতে প্রতিনিরন্তর বহু লোক আহার প্রাপ্ত হইত। আজ সেই রম্য-নিকেতন কীর্ণিনাথার প্রাচ্যে তরঙ্গাঘাতে অনন্ত মগিলের কুক্ষিগত হইয়া একেবারে পোকলোচনের অন্তর্গত হইয়া পড়িয়াছে।

এই স্থানে একটি শেখ কথা বলা আবৃত্তক যেন করি, রাজনগরসম্বন্ধীয় যে সকল চিত্র এ পর্যন্ত পুস্তক বা পত্রিকার বাহির হইয়াছে, তন্মধ্যে একুশ রত্নের একরূপ চিত্র তিন্ন সুন্দর্যই রাজনগরনিবাসী রাজবংশের সহিত একই বংশীয় শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত

দেব মহাশয়ের দ্বারা সংগৃহীত। কিন্তু এ পর্যন্ত কোন লেখক এই কথার উল্লেখ করেন নাই। ইহা আমাদের পক্ষে যতদূর নাই লজ্জার কথা। এই সেতুর প্রতিকৃতি তাঁহার নিকট হইতে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। সেন মহাশয় আসামের একষ্টা এমিষ্টান্ট কমিশনারের কার্যে নিযুক্ত ছিলেন; সন্ততি পোষন এবং করিয়াছেন।

শ্রীমানন্দনাথ রায়।

পাপিয়া-স্তুতি ।

(কীটন)

ছক ছক বিহাতল ; তজ্জাহর জড়তার সংজ্ঞা যম লুপ্ত হ'য়ে আসে
 পান করিয়াছি যেন তীব্রতম তরল পরলে ;
 অথবা কণেক আগে স্থপিতর্য পানপাত্র নিঃশেষিত্য প্রতি খাসে খাসে
 বিশ্বতির নদীনীরে তলাইয়া যাই পলে পলে ।
 তোর এ সৌভাগ্যে, পাখি, জেঁধ্যা যোর জাগে নাই মনে ।
 এই তাবি' সুখে তোর মহাজুখী হইয়াছি আশ
 যে কুই—এ লম্বুক বনচারী—লুকারে গোপনে
 জামল পরবে ঢাকা, ছায়া-সুখমায় আঁকা
 গীতিরমা সুখ-নিকেতনে,
 পরিপূর্ণ মুক্তকণ্ঠে নিমায়-বন্দনা-গীতি অনিভ্রান্ত গা'সু বনমাক !

২

লতাপুশপ্পশোভা, নৃত্য ও কীর্তন-মান, রৌব্রতল-প্রমোদপ্রীতির
 একাধারে বাদমাধা,—দীর্ঘবর্ষ দীর্ঘকাল ধরি'
 ধরনীপহনতলে-সুশীতল স্রাক্ষারসে পরিপূর্ণ পানপাত্রটির
 একটি চুম্বক সুরা যদি আমি পাইতাম, মরি !
 বুধ-বিনোদ-তট কোন রক্ত-নিষ্করের মত,
 মলয়-নিবিক্ত সুখ-আবেশ-পরশ-রসে ভরা
 সত্য-সার-পূর্ণ পাত্রে, ওঠ যদি করি' অবনত
 পেতাম করিতে পান ; আর, যদি গাছি' পান
 তোর সাথে থাকি' অবিরত,
 মিলাইতে পারিতাম সুর অরপ্যপারে অলক্ষ্যে ত্যজিয়া এই ধরা,—

৩

দুই দুহাতের কোলে মিলিয়া গলিয়া তবে একেবারে হাইতাম ভুলি'
 পলকের অন্তরালে কুই বা'র পাসনিরে বাদ—
 এই ক্রান্তি, এই অরা, এই বন্দনানিভরা এ ধরা'র আঁহুলি বিহুলি
 সেবা নর পরম্পর এ উহার শুনে আর্পণাব ।

পক্ষাঘাতে, পিছে বেধা জীর্ণ কক্ষকেশ মাত্র রয়,
যৌবন—পাত্ৰ, ক্রমে পরিণত বিশীর্ণ কঙ্কালে ;
চিন্তা বেধা, সে কেবলি হৃৎপিণ্ড করিতে ছন্দ
রক্তশোণী হতাশায় ; লাবণ্য যেখানে যায়

থাকে নাকো চিরহাতিময়—

অথবা তরুণ প্রেম ছ'দিন না হ'তে গত, বা'র লাগি আঁধারী চালে

৪

দূরে, দূরে—বহু দূরে ! চিত্রক-যোজিত রথে সারথী সে যত্ন-দেবতার

শূণ্য-সমাজে থাকি' বাঁহি না সরিকটে তোর—

আমি বা'র আরোহিয়া হৃৎকণ্ঠে রমনীয় কবির-কলার,

যদিও অড়িমাণ্ডে অবরুদ্ধ অড়বুদ্ধি যোর ;

এই যে পড়েছি আসি ! শান্ত দ্বিগুণ মধু-বিতারী,

গৌপ্যদীপ্ত সিংহাসনে বিরাজিত শব্দ অমল,

ভারকা-অশ্রয়ী যত চতুর্দিকে পুঞ্জীভূত, বরি,—

যেথা কিন্তু আলো নাই, জীবন যতু তাই

সমীর বা' আনে চুরি করি'

নভঃ হতে,—ঐবাহিয়া বিসর্পিত তৃণ-পথে, ঘুরি' ভাষে কুঞ্জ-ছায়াভল ।

৫

দেখিতে পাইনা চোখে কি স্থল চরণতলে রচিয়াছে স্রবসার বর

বুঝি না কি বহুগন্ধ খেলা করে তরুশাখাশিরে ;

ছন্দ-সুধান এই গাঢ় তমিস্রায় শুধু অসুতবি, যা কিছু স্রবস

চয়নিয়া বড়ুহু সাজায় বরণ ডালাটির—

বিলাইতে উপহার আসে শেষে, বিটপীশাখায়,

ঝোপেঝাড়ে, তৃণশিরে, কুন্দমূলে, আরণ্য-গোলাপে,

পল্লবছায়ায় ঢাকা ক্ষণস্থায়ী জবার আভার,

শিশির-নিষিক্ত-বল, যদুপসে টল টল

'সুগন্ধি-গোলাপের' গায়,

নিদাঘের মধুসাঁজে মঞ্জীর-গুঞ্জনসম সারিবদ্ধ-অলি-কলালাপে ।

৬

অন্ধকারে কাণ পাতি' শুনিতে শুনিতে গান কতবার ভাবিয়াছি যনে

— অক্ষয়-মরণে বুঝি পাইব বা জবরের তীরে ,

কত ছন্দে সুরে গানে, কত কমনীয় নামে সেখিঁচি সে মধুর মরণে

অস্তিত্ব-নিবাস মম ছড়াইয়া দিতে ও সমীরে ;

আঁখি মনে হয়, নাহি সুখভাগ্য চরম এমন,
 তোর ও মরম-গলা লীলামিত স্বর-সহরীতে
 এই অর্দ্ধরাতে যদি স্বরে যায় আরাধে জীবন ।—
 হয়ত সুউচ্চতানে, আশ্রয় কল্যান-গানে
 ভবনও যাতাবি গগন—

বশির-প্রাণ আঁখি, লাগলেই যত আর সে সঙ্গীত পাব না শুনিতে ।

৭

মরণে বসিতে তোর হয় নি জনম, ওরে বিহ্বল অঙ্গর অমর !

তুহিত ভবিষ্য-বংশ দলে নাক তোর পদতলে ;
 যুগ আমি অন্য রাতে যে স্বরলহরী শুনি'—অবিকল সেই সুধাবর
 সহস্র বরষ আগে রাজ্যপ্রাণী শুনেছে সকলে !
 যেদিন করুণাদেবী, জন্মকুমি-বিয়োগ-কাতরা,
 প্রাণেশ্বর লক্ষ্যক্ষেত্রে দাঁড়াইলা সজল-নরান,
 তাঁর হৃদি-উৎস-মুখে যে গান প্রাণিয়াছিল ধরা—
 সাগর-তরঙ্গ-ভঞ্জে উদ্ভাসে বিচিত্র রঙ্গে
 যে সঙ্গীত ইন্দ্রজাল-ভরা,

যুঁজি এই একই গান,—একই গানে উদ্ভাসিত পরিত্যক্ত পরীরাজ্যধান ।

৮

'পরিত্যক্ত' । অকস্মাৎ চমক ভাঙিয়া গেল শুদ্ধ ঐ একটি কথার,
 পলকে ধসিয়া আসি' পড়িলাম আপনার যাকে ।
 বিদায় ! করনা কি গো, যতবাণি শুনা যার প্রকৃতই সেরূপ ঠকায় ?
 নতুবা এ কি-ভৌতিক প্রত্যরণা দেখিলাম আন এ ।
 বিদায় ! বিদায় ! ঐ স্করূপ বন্দনা মিলায়
 অম্বর প্রাসুর-পারে ; আসে শুদ্ধ তুষ্টিনীতে নাহি' ;
 'পাহাড়ের কোলে কোলে কৈণে' ঐ মিলাইয়া যার
 উপত্যকা-বীথিকার, সীমাহারা মীলিয়ায়—
 ঐ গেল একেবারে হার !

একি স্বপ্ন ? একি সত্য ? পলাইয়া গেছে গান—জগেনা বুঝারে আছি
 আমি ?

ঐবিজয়কৃষ্ণ বোষ ।



দশমস্কন্ধের স্বপ্নস্বপ্ন ।

[Indian Myth and Legend পুস্তক হইতে গৃহীত ।

বহুমতী প্রেস]

আবাহন।

—:০:—

শরতে এস, মা, শারদ-লক্ষ্মী, উজলি' বঙ্গ-ভবনে ।

পুলকে চাসিছে ধরণী গগন নিখিল রবি-কিরণে

মাঠে মাঠে ধানে সজ্জের মেলা

জানি তরুণিরে বায়ু কলে গেলা

নিশায় জেগেছা নুটাইয়া পড়ে অপগতমেঘ গগনে ।

শরতে এস, মা, শারদ-লক্ষ্মী, উজলি' বঙ্গ-ভবনে ।

বিনল সলিলে ফুটেছে কমল চরণ-পরশ-রভসে

কলে কলে ভরা তটিনীর কলে খেলিছে মরাল চরণে

স্বধন-পরশ বায়ু চঞ্চল

শেফালীর ফলে ভরা তরুতল ;

প্রাকরে শ্বেত কাশের চামর ছলিছে পবন-পরশে ।

ধন কর, মা, বঙ্গ-ভবন তোমার পূজন-দরশে ।

নীলব বিচগকণ্ঠে আবায় উজ্জ্বলি' উঠে কাকলী ;

বরনার ধারাকাতর ধরায় শত শোভা উঠে উজলি' ;

প্রভাতে হীরক শোভে তৃণদলে ;

সন্ধ্যায় তারা অঁধার উজলে ;

কমলে কমলে রজনী-দিবসে উঠে শোভারানি উজলি' ।

তু'নি এস, মাতঃ, চরণ-কিরণে ধরণী-গগন উজলি' ।

শরতে এস, মা, শারদ-লক্ষ্মী, উজলি' বঙ্গ-ভবনে ;

ঘুচারে ছন্দরে বিবাদ-অঁধার, অস্ত্র মুছারে নরনে ;

লয়ে এস আশা, লয়ে এস স্বপ্ন,

উৎসাহে তেজে ভরি' দাগ বুক ;

শূন্য ঘা' আচে পূর্ণ হউক সন্ডি' তব রূপা ভীবনে ।

শরতে এস, মা, শারদ-লক্ষ্মী, উজলি' বঙ্গ-ভবনে ।

—:—:—

অশ্রু ।

—:—

একাদশ পরিচ্ছেদ

—:—

মেজ-তোঠাইমা ।

—:—

আজ অশোকের জন্মদিন । তাই অশোক সময়ের, অসময়ের ও সর্বসময়ের বে সব খাবার খাইতে ভালবাসে, যা ও অজ্ঞ সে সব প্রস্তুত করিবার আয়োজন করিয়াছেন । আজ মা স্বয়ং অশ্রুর সঙ্গে যোগ দিয়া কার্য করিতেছেন । গৃহের দ্বিতলে মা'র রন্ধনশালা ছিল । মা সেই রন্ধনশালায় স্বয়ং সখ করিয়া রাখিতেন, পতি-পুত্রের জন্য খাবার প্রস্তুত করিতেন । তাহার বৈধব্যের পর সে ঘরে অশোকের খাবার প্রস্তুত হয় ; ত্রিতলে একটি কক্ষ নির্মিত হইয়াছে—তথায় মা'র নিরামিষ রান্না হয় । আজ দ্বিতলের রন্ধনশালায় সম্মুখে বাতান্ধায় বসিয়া

আয়োজনে অজ্ঞকে সাহায্য করিতেছিলেন । এমন সময় একখানা খোলা ও একখানা বন্ধ পত্র লইয়া অশোক আসিয়া ডাকিল, “মা !”—তাহার পর রন্ধনের বিপুল আয়োজন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “আজ এত ঘট কেন, মা ?”

মা বলিলেন, “আজ যে'তোর জন্মদিন ।”

“তাহাই ত বটে ! কিন্তু কি আশ্চর্য, আনন্ড জন্মদিনটা আমার কিছুতেই মনে থাকে না । প্রতি বৎসর এই দিন আমি আপনার উপর রাগ করি—এই বর্ষার অঙ্কুর গুতোট গরমের দিন না ! জন্মিয়া কেন অল্প সময় জন্মি নাই আর প্রতি বৎসরই ঠিক পরদিন সব ভুলিয়া বাই !”

মা বলিলেন, “তোর কোন কথাটাই বা মনে থাকে !”

“ঠিক কথা, মা ! এত দেখ, আমি যে যেজ-তোঠাইমাকে আসিতে বলিয়া আসিরাছিলাম, সে কথা আনন্ড মনেই ছিল না ; কিন্তু তিনি ভুলেন নাই । তিনি ভাসিগেছেন ।”

“কবে ?”

“কল্যা দশহরার গজান্নান করিতে আসিবেন । নায়েব আমাকে পত্র লিখিয়াছেন । তোমার নামেও একখানা পত্র আসিয়াছে ; ২২/৫ ২১, সেই কথাই আছে ।”

“পত্রনা পড়।”

অশোকের কথা শুনিয়া অশ্রু শঙ্কাকুল-নয়নে তাহার দিকে চাহিল; তাহার মুখে ভীতিভাব। অশোক পত্র জিঁড়িয়া না'র পত্র বাহির করিতেছিল, সে অশ্রুর এই ভাবান্তর লক্ষ্য করিতে পারিল না।

অশোক পড়িল—“তোটে বৌ, কতবার মনে করি, একবার তোমার সঙ্গে দেখা করিব কিন্তু চটরা উঠে না। এবার অশোক আসিয়াছিল। তাহাকে দেখিয়া কত দিনের কত কথা মনে পড়িল। অশোকও আমাকে বার বার বাটতে বলিয়া গিয়াছিল। আমি মনে করিতেছি, মণ্ডরার সময় মা গন্ধার মশ'নে বাটব। সেই সময় তোমার সঙ্গে দেখা হইবে।”

অশোক বলিল, “চাতের লিখা বড় সুন্দর।”

মা বলিলেন, “মেজ দিদির লিখা বড় পরিষ্কার। বাড়ীর ছেলেদের তিনিই বাহালা চাতের লিখা লিখাইতেন, আর বাচার যখন পেন-কলম কাটিতে হইত, মেজ দিদিই কাটিয়া দিতেন।”

“মেজ-ছোঠাই মা কি ভাল লিখাপড়া জানেন?”

“তখন যেমন চলন! ছিল, তেমনই জানেন। রামায়ণ, মহাভারত, চণ্ডী, অন্নদামঙ্গল—এ সব অনেক মেজ দিদির কণ্ঠস্থ ছিল। মেজ দিদিই ঠাকরুণকে রামায়ণ পড়িয়া শুনাইতেন। মেজ দিদির তবপাঠ শুনিলে শ্রীণ জুড়াইত। আমার বাপের বাড়ী যেতেন লিখাপড়া লিখান রেয়াজ ছিল না। কস্তার কথামত আমি মেজ দিদির কাছে লিখাপড়া শিখিতে আরম্ভ করি।”

অশোক হাসিয়া বলিল, “তবে ত মেজ-ছোঠাইমা তোমার কেবল দিদি নহেন গুরুমহাশয়ও বটেন।”

“তোমার সবটাই ঠাট্টা—পাগলের গোবধে আনন্দ। এখন মেজ দিদির খাইবার কি ব্যবস্থা হইবে?”

“সে যে চর একটা ব্যবস্থা হইবেই। তিনি যে নিতান্তই প্রারোপবেশনে প্রাণত্যাগ করিবার চক্কর তোমার কাছে আসিতেছেন, এমন বোধ হয় না।”

না “থোকার খি”কে বলিলেন, “উপদ্রব রান্না-ঘর ভাল করিয়া ধুইয়া রাখিবে, আর চাকরদিগের কাহাকেও বলিয়া দিও, ভারী ডাকিয়া ডুই ঘড়া। গন্ধাফল আনাট্টা রাখিবে।”

তাহার পর মা অশোককে বলিলেন, “পরিকে হেঁশনে পাঠাইয়া দিস।”

অশোক বলিল, “আমিই যাইব।”

“গাড়ী খুব সকালে আইসে না?”

“তুমি বুলি বলিতে চাহ, আমি বেলায় উঠি? তাহা নহে। আমি খুব সকালে উঠি,—এবং তাহার পর আবার ঘুমাই।”

অশোক অশ্রুর দিকে চাহিয়া বলিল, “তুমি একটা ঘড়ীতে এলাবুম দিয়া আমার খাটের পাখেরই রাখিয়া দিও। যদি কুন্তকর্ণ রূপা না করেন, তবে তাহাতে আমার ঘুম ভাঙিতে পারে।”

এই কথা বলিবার সময় অশোক লক্ষ্য করিল, অশ্রুর মুখে তাহার স্বাভাবিক প্রফুল্লতার একান্ত অভাব। সে ভাবিল, অশ্রু বোধ হয় বহুকণ কায করিয়া শ্রান্ত হইয়াছে, তাই তাহার মুখে শ্রান্তির চাহা। সে বলিল, “তোমরা বেতন আয়োজন করিতেছ, তাহার সম্ভাবনার এক দিনে করা যায় না। দুই দিন করিলে হয় না?”

অশ্রু বলিল, “কিন্তু তুমি ত দুই দিন ভ্রমগ্রহণ কর নাই!”—সে হাসিল—কিন্তু সে হাসিতে তাহার স্বাভাবিক সরসতার অভাব অশোক বুলিতে পারিল।

অশোক চলিয়া গেল। তা কায করিতে করিতে খোকর দিকে মেজ দিমির তত্ত্ব বিবিধ কাবের উপদেশ দিতে লাগিলেন। আর, অশ্রু যত্ন-ভাবে কায করিতে করিতে অশ্রু কেবল ভাবিতে লাগিল। যাত্র ও আশো-কের নিকট সে মেজ-ভোঁঠাইয়ার যে অনাবিল প্রশংসা শুনিয়াছে, তাহাতে তাহার পক্ষে তাহার আগমনে শঙ্কিত হইবার বিশেষ কারণ ছিল না; কিন্তু তথাপি সে মনের মধ্যে কেমন অস্বস্তি অনুভব করিতেছিল। সে যে শান্তিন্দ্রিয় পরিবারে আশ্রয় পাইয়াছে, তাহাতে এক জন নতুন লোকের আবির্ভাব হইবে। তিনি সাহাই কেন হউন না—তিনি আসিলেই তাহার সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন হইবেই—যে আলোচনার আশঙ্কায় সে শঙ্কিতা, সে আলোচনা অনিবার্য। বিশেষ সে আলো-চনার কল কি হইতে পারে, তাহা কেহই বলিতে পারে না। অশ্রু এইরূপ ভাবিতে-ছিল;—ভাবিতেছিল আর শঙ্কিতা হইতেছিল।

সে দিন মধ্যাহ্নে অশোক ও অশ্রু একথানা নবপ্রকাশিত বাঙ্গালা উপন্যাসের আলোচনা করিতেছিল; সে সময়ও অশোক অশ্রুর মুখে চিন্তার ভাব লক্ষ্য করিয়া তিক্তাঙ্গা করিল, “তোমার শরীর কি ভাল নাই?”

অশ্রু বলিল, “আমি আহ্বারের যে আয়োজন, তাহাতে অন্তর্ভুক্ত না হইলেই ‘আয়োজনের দুর্গাম হয়।’

“তুমি অত্যন্ত অধিক পরিশ্রম কর।”

“কখনই নহে।”

তাহার পর কথাটা চাপা দিবার তত্ত্ব অশ্রু বলিল, “ঘড়ীতে যে এলাবুম দিতে হইবে, টেণ আসিবার সময় জানিব কিরূপে?”

অশোক বলিল, “কেন, আমি ঘাইবার সময় ত একথানা টাইমটেবল সঙ্গে লইয়াছিলাম। সেখানা কি নাই?”

“আছে : কিন্তু তাহার পর, নতুন টাইমটেবল বাতির চইয়াছে।”

“বেশী বদল চইয়াছে কি?”

“তাড়া কি বলা যায়?”—বলিয়া অশ্রু হারবানকে নতুন টাইমটেবল আনিতে পাঠাইল। সেখানি আসিলে সে সময় দেখিয়া ঘড়ীতে এলাবুয় দিল ও অশোকের খাটের পার্শ্বে যে ছোট টেবলে জল, খামকতক পুস্তক প্রভৃতি থাকিত, ঘড়ীটি সেই টেবলে রাখিয়া দিল।

সেই এলাবুনের শব্দে যথাকালে জাগিয়া অশোক পরদিন প্রত্যবে ষ্টেশনে গেল ও মেজ-চেঁচাইয়া’কে লইয়া আসিল।

গাড়ী আসিয়াছে শুনিয়াই না আসিয়া বাড়ীকে প্রণাম করিলেন। বহুদিন পরে চুই ভনে সাক্ষাৎ। আর একবার অনেক দিন পরে দুই ভনে সাক্ষাৎ চইয়াছিল। সেবার বুকাবনে ঘাইবার পথে চেঁচাইয়া অল্প সময়ের জন্য এটি গৃহে আসিয়াছিলেন। না’র বৈধবের ও চেঁচাইয়া’র পুত্রশোকের পর দুই ভনে সেই প্রথম সাক্ষাৎ। সেই বহুসময়ব্যাপী সাক্ষাতে দুই ভনে কেবল কাদিয়াছিলেন। এবার ও গৃহে পুনর্পণ করিয়া মেজ-চেঁচাইয়া দেবরের কথা বনে করিয়া দীর্ঘকাল ভাগ করিলেন।

এ দিকে দুই জন চাকর গাড়ী চইতে চেঁচাইয়া’র জিনিষ নামাইতে লাগিল; জিনিষের মধ্যে হাড়ির বাহন দেখিয়া না জিজ্ঞাসা করিলেন, “মেজ দিদি, ও সব কি?”

চেঁচাইয়া বলিলেন, “কিছুই নহে। বাড়ী ঘাইয়া সে দেশের কয়টুকর খাবার পাইয়া অশোক ভাল বলিয়াছিল; বাছার জন্য সেটগুলি কিছু কিছু প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছি।”

“তাই তুমি এত পথ এই সব আনিয়াছ!”

চেঁচাইয়া সে কথার উত্তর না দিয়া বলিলেন, “এখন ঘরে চল।”

দুই জন দ্বিতলে চলিলেন। অশোক ও সঙ্গে চলিল।

বাড়ীকে বসাইয়া না জিজ্ঞাসা করিলেন, “মেজ-দিদি, রাঁধিবার কি ব্যবস্থা হইবে?”

চেঁচাইয়া বলিলেন, “ছোট বৌ, তোর কি চিরকালই সমান গেল? আসিলাম না গন্ধাকে দর্শন করিব বলিয়া, পাড়াইতেই না পাড়াইতেই তুই আহারের জন্য ব্যস্ত! পোড়া পেটের ভাবনা আর কত ভাবিব? আর, আমি কি পরের বাড়ী আসিয়াছি—না জলে পড়িয়াছি? হা হা করিতে হয়, আমি করিব।”

বধন জ্ঞাতিয়া সুবোঁগ বৃথিরা তাঁহাকে নির্ধনাতিত করিতে চাচিলেন, তখন তোমার জেঠামচাশর ভ্রাতার পক্ষ লইয়া আপনি উদ্যোগ করিয়া সম্পত্তি ভাগ করিলেন সে সময় চোট ঠাকুরপো দুই ভ্রাতার সম্পত্তি এক সঙ্গে রাখিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি বলিয়াছিলেন, “ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই” চণ্ডাটী তুংখের কথা । কিন্তু বধন তাহা চাইল, তখন আর ভবিষ্যতে কলচের কারণ রাখিব না ।” সেট সময়েই তিনি উইল করিয়া সব সম্পত্তি আমাকে দেন । আমি সেট দ্বত্রে সম্পত্তি ভোগ করিতেছি । কিন্তু তখন চানিতাম না, আমাকে আবার উইল করিতে চাইবে ।” রেচের একমাত্র অবলম্বন—স্বল পরলোকগত পুত্রের কথা মনে করিয়া জেঠাটীমা’র নরন অশ্রুপূর্ণ চট্টা উঠিল । যা দীর্ঘস্থাস কেলিলেন ।

অশোক বলিল, “তাহা চাইলে উইল চাইবে ।”

জেঠাটীমা বলিলেন, “কিন্তু এ সম্পত্তিসম্বন্ধে আমার উইল করিবার ইচ্ছা নাই—আমি উইল করিব না । তুমি ধূরে আছ, ভাল আছ ; কিছুই জান না । তোমার জ্ঞাতিদের মধ্যে ঈর্ষা ও হিংসা অত্যন্ত প্রবল । আমার সম্পত্তির বিভাগ লইয়া যে সে পাপের বুদ্ধি চর, তাহা আমার অভিপ্রেত নহে । তাই সে সম্পত্তি-সম্বন্ধে আমি কোন ব্যবস্থা করিব না । আমার আর একটি সম্পত্তি আছে । আমি পিত্রালয় চাইতে কিছু সম্পত্তি পাইয়াছিলাম । সেট সম্পত্তিটুকু আর আমার গহনা বিক্রয় করিয়া যে টাকা পাওয়া যাইবে, তাহা আমি গোপালের সেবার জন্য দেবোত্তর করিব । এই সম্পত্তির অস্ত্র কেহ না কেহ সেবা করিবে ।”

অশোক মনে মনে জেঠাটীমা’র বুদ্ধির প্রশংসা করিল ও প্রকাশ্যে বলিল, “আমি কলাই এক চুন উকীল জানাটগা উইল লিখাইবার ব্যবস্থা করিব ।”

“বাবা, তোমাকে আরও একটি কাৰ করিতে চাইবে—তোমাকে দেবোত্তর সম্পত্তির তত্ত্বাবধানের ভার লইতে চাইবে ।”

“কিন্তু আমি শু চিন্তা নহি ?”

“তাঁহাতে ক্ষতি কি ? তাহাতে শু ধর্ম্মের কোন কথাই নাই । আমি তোমাকে একটা কাবের ভার দিতেছি : তোমাকে করিতেই হইবে ।”

“কেন, গ্রামে কি ভার লইবার কেহ নাই ?”

“ভার লইবার অনেক লোক আছে, কিন্তু ভার লইবার উপযুক্ত পাত্র নাই । যাহারা ভার লইতে বাগ্ন, তাহাদিগকে ভার নিলে দেবসেবার ঙ্গাচালদের সেবাই চলিবে । তুমি তত্ত্বাবধান করিবে জানিলে—তুমি যাহাকে ভার দিবে, তাহাঁর ভয় থাকিবে । তাই আমি তোমাকে সে ভার দিব এ কাৰ তোমাকে করিতেই হইবে ।”

অশোক আর এ অশ্বগোপে অসম্মতি জানাইতে পারিল না।*

তাঁহার পর “গচনা গুলি আনি” বলিয়া জেঠাইমা উঠিলেন।

যা বলিলেন, “তোমার হাউতে চটবে না।”—তিনি অক্ষয় নিকে চাহিয়া বলিলেন, “মা, আমার ঘর চটতে মেজ মিলিও লাভ-বান্ধটা আন ত।”

অক্ষয় অশোকের মত মনে নব জেঠাইমা'র বুদ্ধির প্রশংসা করিতেছিল। জেঠাইমা'র ব্যবহারে তাঁহার আশঙ্কা অনেকটুকু মিটিয়া গিয়াছিল; কিন্তু অহসিত-ভাবে ঘর চয় নাই। সে চলিতা খেল ও বাস্তব লইয়া আসিয়া জেঠাইমা'র নিকটে চম্ভাটলে স্থাপিত করিল।

জেঠাইমা বাস্তব খুলিয়া অলঙ্কারগুলি বাহির করিয়া অক্ষয় তাঁতে স্নিহে লাগিলেন, অক্ষয় সেগুলি অশোকের টেবুলের উপর স্থাপিত করিতে লাগিল। অলঙ্কার-গুলি মূল্যবান—সে কালের গচনা, মনে ভারী, মাঝেও অধিক করপানি অলঙ্কার ভড়োয়া। জেঠাইমা একে একে সব অলঙ্কার দিলেন, কেবল চুইটি দিলেন না, একটি অনুরী, অপরাট মূক্তার মালা। অনুরীটি তাঁহার খামীর নামাঙ্কিত; তিনি সেটি গালা-ঘোড়ার করিবার কল ব্যবহার করিতেন। জেঠাইমা সেটিকে বাস্বে রাখিয়া বাস্বে বন্ধ করিলেন এবং মূক্তার মালা ঘা'র হাতে দিয়া বলিলেন, “এই মালা তোমার কাছে থাকিল।” মূক্তাগুলি স্থল, কুগোল—মালা মূল্যবান।

যা জিজ্ঞাসা করিলেন, “মালা কি রাখিয়া যাইবে?”

জেঠাইমা বলিলেন, “হাঁ। ও মালা আমি অশোকের বোকে দিব।”—এই কথা বলিয়া তিনি অক্ষয় নিকে চাহিলেন, যদি তাঁহার নয়নের দৃষ্টিতে, মুখেও বর্ণপরিবর্তনে কোনরূপ ভাবান্তরে তাঁহার মনের ভাব জানিতে পারেন। কিন্তু সে মুখে কোনরূপ ভাবান্তর বক্ষিত হইল না। কেবল অশোক লজ্জার মুখ নক করিল।

যা বলিলেন, “কেন, মেজ মিলি, তুমি কি অশোকের বিবাহে আসিবে না?”

জেঠাইমা বলিলেন, “আসিব বটে কি। কিন্তু মত্ৰা-বীচার কথা কি কেহ বলিতে পারে? যদি আমার অদরে আসা না থাকে, তুই আমার চটই বো'র মুখ দেখিবি।”

যা তবুও মূক্তার মালা রাখিতে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। জেঠাইমা বলিলেন, “তবে চল, আমার কথা হইয়াছে।”

পরদিন অশোক জেঠাইমা'র অলঙ্কারগুলি বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিল, সে টাকা'র তাঁহার নামে কোম্পানীর কাগজ খরিদ হইল। এ নিকে উত্তীল আসিয়া জেঠাইমা'র নির্দেশমত উইল লিখিলেন। জেঠাইমা তাঁহার পরদিনই ফিরিয়া যাউবেন। যা তাঁহাকে আরও দুই দিন থাকিতে জিন্দ করিয়াছিলেন,

রাখিয়াছে, সেগুলিকে ক্রমাগত টানিয়া বাহির করিয়া, সে সমাজের চকুর সম্মুখে
পাড়া করাষ্টয়া দিতে চাহিত। নিপুণ পরিদর্শকের চক্ষু লটকা। সে যাহা প্রত্যক্ষ
করিত, শুধু সেইগুলিকেই সে সাধারণ পাঠকের বিচারবুদ্ধির নিকট আনিয়া উপ-
স্থিত করিত। কখনার অতিরঞ্জে সে তাহার চিত্রগুলিকে কোনও দিনই
অব্যক্ত করিয়া তুলিতে চাহে নাই। শচীন্দ্রনাথের বিশ্বাস ছিল, মুখের শাসন-
বাণীতে পরিবার শাসিত হয় কিন্তু যখন বিস্তৃত সমাজ-পরিবারকে শাসন করিতে
চাইবে, তখনই সাহিত্যের প্রয়োজন। সাহিত্য এক দিকে যেমন সমাজকে সংগঠিত
করিয়া তুলিবে, অপরদিকে তেমনি সমাজকে তাহার প্রত্যেক দোষের বিষয়ে
সাবধান, সতর্ক করিয়া দিবে।

মানুষ সংখ্যের পথ দিয়া ধীরে ধীরে কল্যাণের দিকে অগ্রসর হইবে, শুধু
বিলাস-রসের মধ্য দিয়া জীবনকে ও জীবনের উদ্দেশ্যকে সার্থকতার অভিমুখে
লইয়া যাওয়া অসম্ভব। এই মতটিও তাহার চিন্তা ও কল্পনাকে আশ্রয় করিয়া
বাড়িয়া উঠিতেছিল।

আত্মিকার ডাকে যে অভিনব চিঠিখানি আসিয়াছিল, সে চিঠি তাহার মতে-
রই সমর্থন করিয়াছে এবং বিলাসকে সূচীত করিয়া সে যে সহজ, সরল, তুষ্ণ
জীবনের চিত্র অঙ্কিত করিয়া এত দিন দেখাষ্টয়া আসিয়াছে, সেই জীবন-নির্ধারণ-
প্রণালীকেই লেখিকা অভিনন্দন করিয়াছেন। শচীন্দ্রনাথের কাছে এই লিপি-
খানি অনেকটা তৃপ্তি ও গৌরব বচন করিয়া আনিয়াছিল। সে তৃপ্তি ও গৌরব
তাহাকে উৎফুল্ল না করিলেও একটি নির্মল পুলকধারায় তাহার অন্তরকে অ-
সিক্ত করিয়া তুলিয়াছিল।

সমস্ত দিনের নানা কার্যের মধ্যে শচীন্দ্রনাথ কোনও মতেই এই চিঠিখানির
কথা হুলিতে পারিতেছিল না। চিঠিখানির অন্তরাল দিয়া এক নতুনমণ্ডিতা নারীর
শৌন্দর্য্যোদ্ভাসিত মূর্তিখানি তাহার কল্পনা-পুলকিত নরনের কাছে ফুটিয়া উঠিতে-
ছিল। সে কে,—কিরূপ তাহার শিক্ষা,—কেমন তাহার রূপ,—কি নাম তাহার,—
কিছুই তা শচীন্দ্র জানে না। চাঁদের লিখার চক্কের মধ্য দিয়া তবুও যেন সেই
নারীর কঙ্কণ-ভাজিত স্তন হস্তখানি শচীন্দ্রের কল্পনা-স্ফটেলিকায়িত নরনের কাছে
ধরা দিতেছিল। লিখার চক্কের মধ্যে নাকি মানুষের অন্তর-প্রকৃতি প্রতিকলিত
দেখিতে পাওয়া যায়। বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত এই তথ্যটি শচীন্দ্রনাথের কাছে আর
মিথ্যা বলিয়া মনে হইল না। অক্ষরগুলির প্রত্যেক অক্ষররেখার মধ্য দিয়া,
ভাবার সরল মধুর অভিব্যক্তিতে সে যেন সেই অপরিচিতার অন্তরের সংবাদ
অনেকটা পাইতেছিল।

৭]

শচীন্দ্রনাথ এতদিন অন্যতম শাস্ত্র পল্লীজীবন অতিবাহিত করিতেছিল ; আজ চ্যাম্বল কর্মক্ষেত্র হইতে তাহার আসান আসিল। মাসিক পত্র ‘কল্যাণীতেই’ এতদিন সে তাহার অধিকাংশ রচনা দিয়া আসিয়াছিল। ‘কল্যাণী’র ঐচ্ছিক সম্পাদক শচীন্দ্রনাথকে বহুদিন চাইতে সরকারিরাপে পাঠ্যগার ভূমি চেষ্টা করিতেছিলেন। সংসারে শচীন্দ্রনাথের একমাত্র বৃদ্ধা জননী ও একটি কনিষ্ঠা ভগিনী ছিলেন। ভগিনীর বিবাহান্তে শচীন্দ্রনাথ জননীর সেবা-কষ্টে জীবনের সর্বপ্রধান কার্যরূপে গৃহ করিয়া লইয়াছিল। সুতরাং এত দিন বাহিরের কোনও আসানই তাহাকে টেনাটতে পারে নাই। সম্প্রতি জননী স্বর্গারোহণ করিয়াছেন ; পল্লীগ্রামে শচীন্দ্রের আর বিশেষ কোনও বন্ধনই ছিল না। বিবর-সম্পত্তি ঘাটা ছিল, পুরাতন বিশ্বালী নাগের হরিচর বাবুর উপর তাহার ভার দিয়া শচীন্দ্রনাথ পরম নিশ্চিন্ততার সহিত কল্যাণ-লক্ষ্মীর বরাদ্দ-প্রসাধনে আপনাকে নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু ‘কল্যাণী’-সম্পাদক রাখাল বাবু এত সংবাদ শুনিলেন ; এবার আর তিনি শচীন্দ্রকে ছাড়িলেন না।

শাস্ত্র পল্লীজীবনের মাতা কাটাউয়া কিছু কালের ভ্রম তাহাকে কলিকাতার কর্মক্ষেত্রলাভের মধ্যে আসিয়া পড়িতেই হইল।

গঙ্গার ধারে ছোট একখানি একতল বাসা ভাড়া করিয়া শচীন্দ্রনাথ “ঠাকুর” চাকরের উপর গৃহস্থালীর সম্পূর্ণ ভার অর্পিত করিল এবং পরদিনই একরাশি পুস্তক ও কতকগুলি ছবিখরিস করিয়া আনিয়া নিতের পাঠ্যগার স্তম্ভস্থিত করিতে লাগিয়া গেল। “ঠাকুর” ও চাকর সে সঙ্গে করিয়া দেশ হইতেই আনিয়াছিল, সুতরাং গৃহস্থালীর বন্দোবস্তের ক্ষুদ্র শচীন্দ্রনাথের আর কোনও প্রকার উবেগই রহিল না।

পরদিন সন্ধ্যাবেলা শচীন্দ্রনাথ রাখাল বাবুর বাসায় দেখা করিতে গেল। রাখাল বাবু তাহার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

ছোট একটি কক্ষে বসিয়া রাখাল বাবু লিখিতেছিলেন, এমন সময় শচীন্দ্রের কার্ড বহন করিয়া উড়িয়া চাকরটি গৃহে প্রবেশ করিল। রাখাল বাবু নিজেই উত্তীর্ণা গেলেন এবং সামনে তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া আনিলেন।

রাখাল বাবু প্রোঢ় : শচীন্দ্রনাথ বাটশ বৎসরের যুবক। ইতঃপূর্বে কোনও দিন উভয়ের সাক্ষাৎ-সংঘর্ষে দেখা-শুনা হয় নাই। শচীন্দ্রনাথের রমনার কল্যাণ ও ভাবের পরিণতি এবং লক্ষ্যলা লক্ষ্য করিয়া রাখাল বাবু তাহাকে আর একটু অধিকবয়স্ক বলিয়াই মনে করিয়াছিলেন।

“কখন এলেন আপনি ?”—দ্বিহাসে রাখাল বাবু তিজাসা করিলেন।

আর্য্যাবর্ত ।

“আমার ‘তুমি’ বল্বেন ।—পরন্তু সকালে এসেছি একবারে বাসাটা ত্রি-
ক’রে রেপেট আপনায় সঙ্গে দেখা করতে এসেছি ।”—শচীন্দ্রনাথ তাহার স্বভাব-
স্বলভ প্রফুল্লতার সচিত্র কথা কয়টি বলিয়া গেল ।

রাখাল বাবু শচীন্দ্রনাথের উত্তর দিবার প্রণালীতে এবং তাহার সরল,
উদার শ্রিতহাস্তটুকুর মধ্যে এমন কিছু দেখিতে পাইলেন, যাহা এষ্ট প্রথম আলা-
পেট তাহার জন্মস্থিত স্নেহ-উৎসের মূগে বাউয়া আঘাত করিল ।—“পরন্তু এলে,
আর আজ হুঁ আমি দেখা পেলাম ?”

শচীন্দ্র রাখাল বাবুর কথা শুনিয়া একটু হাসিল । উত্তর দিবার
পূর্বেই কক্ষে আর এক জন প্রবেশ করিল : সে রাখাল বাবুর একমাত্র কন্যা—
কল্যাণী ।

রাখাল বাবু কন্যার দিকে ফিরিয়া কহিলেন, “মা, টনি শচীন্দ্র বাবু, ঐ চাকে
নমস্কার কর ।”

কল্যাণী নমস্কার করিবার পূর্বেই শচীন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইল এবং উঠ পার্শ্ব
গুলু করিয়া লম্বাটের একটু কাছে লইল, তাহার পর আবার বলিয়া পড়িল ।

কল্যাণীও যথারীতি একটি ছোট রকমের নমস্কার করিল ।

কল্যাণী ভাবিল, শচীন্দ্র অতিথি তাহার পক্ষে প্রথম কথা আরম্ভ করা অশো-
ভন হইবে না । সে একবার তাহার নত চক্ষু তুলিয়া শচীন্দ্রের মুখের উপর
স্থাপিত করিল, বৃদ্ধ-কণ্ঠে কহিল, “পল্লী ছেড়ে কলিকাতা আপনায় কৰ্ম্মক্ষেত্র স্থির
করেছেন দেখে সুখী হলেম”—কথা বলিয়াই কল্যাণী আবার তাহার চক্ষু নত
করিয়া লইল ।

কল্যাণীর বৃকের মধ্যে যেন বড় কাপিতেছিল কপাটা বলিয়া কেলিয়াই সে
ভাবিল, কপাটা ‘থাপ ছাড়া’ হয় নাই ত ?

শচীন্দ্র একটু হাসিল কহিল, “কৰ্ম্মক্ষেত্র স্থির করাটা খুবই সহজ, কিন্তু দেখতে
হ’বে, সে ক্ষেত্রের উপযুক্ত করণ হয় কি না, ক্ষেত্র আশাভূরূপ ফল বহন করে
কি না ।”

উত্তর শুনিয়া কল্যাণী একটু আশ্রয় বোধ করিল । তাহার অন্তরমধ্যে যে
একটা কুণ্ডার ভাব আনিতোছিল, সেটুকু কতক পরিমাণে কাটিয়া গেল । প্রথম
আলাপের স্মৃতিপাতের যে ঋত্ৰিমতার আবরণ দিয়া আপনাকে ঢাকিতে চাভে না,
বল্ধ বর্ণণের উপর চারাপাতের স্তায়, আলাপের ভঙ্গীর মধ্যে নিঃস্বের প্রকৃতির
একটা স্বরূপ প্রতিবিম্ব দেখাউয়া দেয়, তাহার সচিত্র আত্মরিক ঘনিষ্ঠতা এক দিনে,
এক মুহূর্তেই স্থাপিত হইতে পারে ।

রাখাল বাবু লিখিতেছিলেন : শতীন্দ্রনাথের কথা শুনিয়া কহিলেন, “
হটলে অল্পক্ষণ ক্ষেত্রেও ফসল ফলে।”

কল্যাণী দেখিল, সেই উন্নতদের দ্বা এক বৃহৎপট পিতার দ্বন্দ্বের পানিকটা
হান অধিকৃত করিয়া লইয়াছে। তাহার সরল বগতিত দেহ, উন্নত ললাট, বিশাল
চক্ষুদ্বয়ের স্বপ্নময় দৃষ্টিটুকু, তাহাকে এক অনির্পটনীয় মহিমান্বিত করিয়া
রাখিয়াছিল। সে চক্ষুর দৃষ্টি সন্মত করা খুব কঠিন নহে। শঙ্কর, সন্ন্যাস, মধুরতার
পরিপূর্ণ সেই অনাবিল কৃষ্ণাশ্রু দৃষ্টিটুকু !

বাহিরে কি একটু কাব ছিল, রাখাল বাবু উঠিয়া বাইতে বাইতে কহিলেন,
“না, তুমি শতীন বাবুর সঙ্গে আলাপ কর, আমি এখনই কিরিয়া আসিব।”

চিত্তাঙ্গদা কোন্ এক মধুর বসন্ত-প্রভাতে মুকলিত কৃষ্ণবন-পথে পার্থেয় সম্মুখে
তাহার বিশ্বর-বিমুগ্ধ দৃষ্টি লইয়া দণ্ডায়মান হইয়াছিল : সে যে নারী, সর্বপ্রথম
তাহা অল্পে অল্পে অনুভব করিয়া ক্রীড়া-কৃষ্টিতা হইয়া পড়িয়াছিল। কল্যাণী
চাহিয়া দেখিল, সেই ক্ষুদ্র কক্ষের মধ্যেও এমন এক জন তাহার নির্দিষ্ট আসনে
আসীন রহিয়াছেন, তাহার স্বতন্ত্র স্বাধীন ভাবটি নারীকে অত্রান্তভাবে মগ্ন করা-
ইয়া দেহ যে, সে নারী।

কল্যাণী এমন করিয়া আর কাহারও সম্মুখে পাড়াইয়া নিজের দিকে চাহিয়া
দেখে নাই ; তাহার নারী-প্রকৃতি এমন করিয়া আর কাহারও কাছে লক্ষ্য
সমুচিত হইয়া পড়ে নাই। কল্যাণী কি কহিবে, স্থির করিতে পারিতেছিল না
এমন সময়ে শতীন্দ্র কহিল, “একেবারে পল্লীসম্মত ছেড়ে এখানে এসে পড়েছি,
অনেক সময়ে হয় ত অনুবিধা সৃষ্টি ক’রে তুলব।”

“হয় ত সহরের সমাজ আপনাকে ততটা ভুগি দিতে পারবে না”—কল্যাণী
স্বত্বকণ্ঠে কথা করটি বলিল।

“প্রত্যেক সমাজের মধ্যে যেটুকু মন্দ, তাহা চিরদিনই পীড়া প্রদান করিবে ;
যেটুকু ভাল, ভুগি তাহার মধ্যেই পাওয়া বাইতে পারে সহরের প্রাপ্তীর সমাজ
উভয়ই যন্ত্রণের সমাজ ; ভাল ও মন্দের সংমিশ্রণেই এই মহন-সমাজ গঠিত,
কোনও সমাজই নিরবচ্ছিন্নভাবে ভাল বা মন্দ নহে, হুতরাং পল্লীর সমাজে যে
দোষযুক্ত অংশটুকু লক্ষ্য করিয়াছি, এখানে তাহা দোষবিমুক্ত দেখিতে পারি,
আবার, পল্লীসমাজের মধ্যে যে সাবল, নিষ্ঠা ও মাদুর্য্য দেখিয়াছি, এখানে তাহার
অভাব অনুভব করিতেও পারি।”—শতীন্দ্র একাগ্রভাবে কথাগুলি বলিয়া বাইতে-
ছিল। কল্যাণী দেখিল, এই নবাগত তাহার মতকে প্রথম হইতেই একটা স্পষ্ট
ভিত্তির উপর স্থাপিত করিয়া উপস্থিত করিতে পারে।

এমন সময়ে স্বাধাল বাবু কিরিয়া আসিলেন । তাঁহার সঙ্গে আর একজন যুবক আসিয়াছিল ।

“শচীন বাবু, কোম্বাকে আমি নীপেশ বাবুর সঙ্গে পরিচিত করিয়া দিতেছি । তিনি”— স্বাধাল বাবুর কথা শেষ হইবার পূর্বেই শচীন্দ্র উঠিয়া অগ্রসর হইয়া গাটোয়া দিয়া করিল এবং কহিল, “নীপেশ বাবুর সঙ্গে আমার চাক্ষুষ পরিচয় ছিল না, তবে নীপেশ বাবুর কবিতাগুলি আমি আগ্রহের সঙ্গেই পড়িয়াছি । অতঃ পরে আমি তাহা সঙ্গে পরিচিত হইয়া যুগ্মী হইলাম ।

নীপেশ প্রতি-নমস্কার করিল এবং সমাজে তট একটি কথায় তাহার সম্ভাষণ শেষ করিয়া গেল ।

নীপেশ তাহার বৃকের মধ্যে কেমন একটা অস্বচ্ছন্দতা বোধ করিতেছিল ।

তাহার এই অস্বচ্ছন্দতার ভাবটুকু কল্যাণী লক্ষ্য করিল । ইহার পর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে নীপেশের মুখের দিকে চাহিল । সেটী তীক্ষ্ণদৃষ্টিপাতে বুদ্ধিমত্তী কল্যাণী যেন তাহার অন্তর পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া গেল ।

চতুঃ নীপেশ কল্যাণীর দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া দিগিল, সে তাহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে — তাহার মূঢ় কৃত্রিম দৃষ্টিতে বিরক্তিপূর্ণ অতুলস্বভাবের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে ।

নীপেশ মনে মনে ভাবিল, এ বিরক্তিভাব কেন? কল্যাণীর কাছে তাহার মনোভাব সে যে লুকাইতে পারে নাট, ইহা সে বুঝিল : বুঝিয়া একটু স্তব্ধ হইল । কিন্তু কল্যাণীর বিরক্তিপূর্ণ ভাবটুকুর বিশ্লেষণ করিয়া সে যাহা পাইল, তাহা তাহার পক্ষে কোনও ক্রমেই তৃপ্তিগ্রন হইল না ।

নীপেশ বলিয়া উঠিল : “তা’ হ’লে আপনাতা বস্তু, আমি আসি : একটু বিশেষ কাম আছে ।” বিদায়-নমস্কার করিয়া নীপেশ বাহির হইয়া পড়িল । তাহার মনে হইতেছিল, যেন গর্কিতা কল্যাণীর সেটী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তখনও তাহার অন্তরঙ্গ করিতেছে ।

কল্যাণী মনে মনে ভাবিল, “ছিঃ, নীপেশ বাবু, এত দুর্লভতা তোমার !”

স্বাধাল বাবু কল্যাণীর দিকে কিরিয়া স্নেহাঙ্গুষ্ঠে কহিলেন, “নীপেশকে একটু কেমন দেখিলাম, ওর অন্তর করে নাট হ’ল”

কল্যাণী উত্তর দিল না ।

প্রোচ স্বাধাল বাবুর স্নেহদৃষ্টির নিকট যাহা ধরা পড়ে নাট, তাহা কল্যাণীর নারীচক্ৰ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাট ।

এবার শচীন্দ্র উঠিল, পিতাপুত্রীর নিকট বিদায় লইয়া বাসায় ফিরিল ।

শটীশ্বের কলিকাতার আসিবার পর প্রায় ছয় মাস কাটিয়া গিয়াছে ।

বেলা প্রায় নয়টা । পিগন একখানি ধূসরবর্ণের পাম চিঠির বাক্সের মধ্যে ফেলিয়া দিল । শটীশ্বে নিকটে আসিয়া বাক্স খুলিয়া চিঠি বাহির করিল । প্রত্যেক মাসের এই দিনটি শটীশ্বের বার্থ দায় না : তাহাকে অভিনন্দন করিয়া এই লিপি প্রতি মাসেই একখানি করিয়া আসিতেছে ।

কে এই নারী ?—এই লিপি-প্রেমিকা ?

রমণী যে-ই হউক, সে যে শটীশ্বের সম্বন্ধে বিশেষ সন্ধান রাখে, তাহাতে তাহার এতটুকুও সন্দেহ ছিল না । সম্রাটের কোষাগারে রাজস্ব যেমন ঠিক নিয়মিত সময়ে আসিয়া পৌঁছে, এই অবাচিত অভিনন্দন-লিপি পাটয়া শটীশ্বের মনে হইত, ইত্যও যেন, রাজস্বের মত, তাহার একটি স্তাঘ্য প্রাপ্য : তাহা নিরুপিত সময়ে আসিয়া পৌঁছবেই ।

বসন্ত-সমাগমে পল্লবশীর্ষে নবপত্রোদগমের স্তায় প্রতি মাসেই এই ধূসরচ্ছবাবৃত লিপিখানি দেখা দিত । জীবনের অনেক পরীক্ষার মধ্যে, অনেক নিরাশার মধ্যে এই লিপিখানি তাহার কাছে উৎসাহবাণী বহন করিয়া আনিয়াছে । এ যেন তাহার জীবনের সমগ্র সুখ ও দুঃখের অঙ্কুর্ভূতির সহিত একান্তভাবে জড়িত হইয়া গিয়াছে । গদনই সে তাহার জনয়ের মধ্যে দৈন্ত অহুভব করিয়াছে, যখনই আশাত পাটয়া তাহার অন্তর কুণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছে, তখনই আশার, বিশ্বাসে, উৎসাহে প্রদীপ্ত এই লিপিখানি তাহার কাছে একটি নিশ্চিত সাহসনা বহন করিয়া আনিয়াছে ।

মাটির নীচে যে চিরন্তন রসধারা প্রবাহিত হইয়া বাইতেছে, উপরে থাকিয়া কেহ তাহা বুঝিতে পারে না । শটীশ্বেনাথ জানিত না, কে এই লিপি-প্রেমিকা, কিন্তু তবুও এই অনির্দিষ্টা নারীর উদ্দেশে তাহার অন্তরে এক আবেগ-পুলকিত আকর্ষণ-স্রোতঃ অস্তের অলক্ষ্যে ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল । হৃদনার শটীশ্বেও তাহা বুঝিতে পারে নাই, কি নামে তাহার এই আকর্ষণকে সে অভিহিত করিবে ?

এ কি প্রেম ?

যে আকর্ষণের অঙ্কুর্ভূতি—অরণ তাহাকে চকল করিয়া তুলে, সতর্ক করিয়া, স্নেহ, অনুরাগ করিয়া রাখে,—সে কি ? সে কি সেই বিশ্ব-বিপ্রাবী প্রেম ?

শটীশ্বেনাথ সেই লিপিখানি পাঠ করিয়া গেল । একবার পড়িয়া সে আর কুপ্তি পায় না । সে দিন গিয়াছে, যখন সে এই লিপিকে শুধু একটি মুড়—ভক্ত-

হৃদয়ের অস্বাভিনত ভক্তিনিবেদন বলিয়াই মনে করিত। কোন এক নিপুণ শিল্পী মৰ্ম্মর-প্রতিমা গঠিত করিয়া, সেই প্রতিমাকেই তাহার নিষ্ঠ প্রেমাবিহে-
চনে প্রাণময়ী করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিল। এখন আর সে কাচিনী শচীশ্র-
নাথের কাছে কল্পনার মোহিনী সৃষ্টি বলিয়া মনে হইত না।

তাহার জীবনের সমস্ত আবেগ, সমস্ত কল্পনা, সমস্ত সুখ ও দুঃখের অঙ্গুষ্ঠিত
স্বপ্ন এই মূৰ্ছ লিপিকানিকে বেষ্টিত করিয়া ফিরিতেছিল! তাহার মৰ্ম্মতন্ত্রীতে
একটি অনচ্ছূতপূর্ণ পুলকগুহন নিশ্চিন্দই মৃদুভাবে বাজিতেছিল,—সেই
গুহনকে, সেই অচ্ছূতিকে সে আর কোনও মতেই অস্বীকার করিতে পারিতে-
ছিল না।

[৮]

সে দিন সন্ধ্যায় নীপেশ আসিয়া দেখিল, রাখাল বাবু কার্য্যোপলক্ষে বাড়িরে
গিয়াছেন। কল্যাণী খালি বাসার টেবলের কাছে দাঁড়াইয়া একগানি বচির
পাতা উল্টাইতেছে।

নীপেশ কাছে আসিল, কহিল, “বাসার একা আপনি?”

কথাটা বলিবার সময় নীপেশের কণ্ঠস্বর বৃদ্ধি একটু কাপিয়াছিল। অনাময়কা
কল্যাণী তাহা লক্ষ্য না করিয়া উত্তর দিল, “বাবা বাহিরে গিয়াছেন।”—সাদর
অভ্যর্থনার কোনও ভঙ্গী কল্যাণীর এই সংক্ষিপ্ত উত্তরটির মধ্যে নীপেশ খুঁজিয়া
পাইল না।

কল্যাণী সম্বন্ধে পুস্তকখানির পাতাই উল্টাইতেছিল নীপেশ একবার তীক্ষ্ণ-
দৃষ্টিতে কল্যাণীর মুখের দিকে চাহিল। মৃৎ দেখিয়া নীপেশ বৃদ্ধিল, কল্যাণী
অস্তময়কা।

আলাপটাকে সতেজ রাখিবার জন্য সে কথা খুঁজিয়া পাঠিতেছিল না, চঠাৎ
জিজ্ঞাসা করিল, “কি বই ওখানা?”

“শচীশ্র বাবুর ‘দীপিকা’।”—শচীশ্রের নামটি উচ্চারিত করিবার সময় কল্যাণীর
বুকের মধ্যে ক্ষতভর তালে একটা বক্তের ঝলক প্রবাহিত হইয়া গেল। স্বপ্ন না
কাপিয়া যায়, দুৰ্ব্বলতা ধরা না পড়ে, এ জন্য কল্যাণী একটু অতিরিক্ত জোর
দিয়াই শচীশ্রের নাম উচ্চারিত করিয়া ফেলিল।

তাহার নিজের উচ্চারিত নাম তাহার কাণের মধ্যে প্রবেশ
করিয়া তাহার অন্তরে একটা মোহমগ্ন রচিত করিয়া তুলিল। মোহ-মগ্নাবিষ্ট
কল্যাণী কুণ্ডাচকিত-দৃষ্টিতে নীপেশের দিকে একবার চাহিল। নীপেশও বে একটু
শ্রিত-হহয়াছে, তাহা সে বৃদ্ধিল। কল্যাণী তাহার দৃষ্টি নত করিয়া লইল।

নীপেশ একটু উদাসভাবে হাত বাড়াইয়া দিয়া করিল, “দেখি বহিথানি ।”

কল্যাণী তাহার এই উদাসভাবেটুকু লক্ষ্য করিল, তাহার অস্থির একটা বিদ্রোহ ও বিরক্তির ভাব ভাগিয়া উঠিতেছিল। সে আশ্চর্যস্বরূপ করিয়া লইয়া বহিথানি নীপেশের দিকে একটু ঠেলিয়া দিল। টেবলের উপর হঠাৎ বহি তুলিয়া লইয়া পুষ্ট বহিরাবরণটা উল্টাইতেই নীপেশ দেখিল, ভিতরে উজ্জল স্পন্দনাকারে লিপিত গ্রহিয়াছে,—“শ্রীমতী কল্যাণী দেবীকে প্রদত্ত হইল।”

নিম্নে শচীশ্বরের সাঙ্কেতিক নামাকর ! নীপেশের মনে হইল, এট্ট একটি ছত্র আড়ম্বরশূন্য লিখার মধ্যে অনেকটা ঘনিষ্ঠতার সঙ্কেত লুক্কায়িত রহিয়াছে। এই লিখাটুকুকে সে কোন মতেই সহ্য, সরল ভাবে গ্রহণ করিতে পারিল না।

কল্যাণীকে এমন ভাবে উপহার দিবার কি অধিকার শচীশ্বরের থাকিতে পারে, এই প্রশ্নটাই বারংবার নীপেশের অন্তরমধ্যে সচেতন হুটুয়া উঠিয়া সাড়া দিতে লাগিল। কিন্তু সে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবারই বা নীপেশের কি অধিকার আছে ?

এই দীর্ঘকালের পরিচয়ের মধ্যে যে অধিকার-সীমাকে নীপেশ মনে মনে ক্রমাগতই বাড়াইয়া দিয়াছে, আজ হঠাৎ শচীশ্বরের কুছ এক ছত্র লিখা, সম্রাটের আদেশের মত অতর্কিত-ভাবে আসিয়া পড়িয়া, সেই অধিকার-সীমাকে একেবারেই সঙ্কুচিত করিয়া কেলিতে চাছিল। নীপেশ একবার মনে করিল, চর ত এ সবই তাহার শঙ্কিত সন্দেহাকুল চিন্তের মিথ্যা কল্পনা। কোনও সত্যই ইতার মূলে নিহিত নাই। কিন্তু প্রবল শক্তির আক্রমণ কল্পনা করিয়া, বিরাট সংগ্রামের নিফল আরোহন প্রত্যেক শক্তিই চিরদিন করিয়া আসিতেছে ; নীপেশও বিদ্রোহ করিয়া, সংগ্রাম করিয়া আপনাকে জয়যুক্ত করিবে, এমনই একটা আরোহন করিবার মন্ত্র উন্মূখ হইয়া উঠিল। নীপেশ বহির পাঠা উল্টাইতেছিল এবং চিন্তা করিতেছিল। কল্যাণী একটু সরিয়া একটা দেয়ালের কাছে ঘাটয়া পাড়াইল।

নীপেশ চক্ষু তুলিয়া চাহিয়া দেখিল, কল্যাণী সরিয়া গিয়াছে এবং শচীশ্বরের ও রাখাল বাবু কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিতেছেন।

“এই যে নীপেশ এখানেই”—রাখাল বাবু প্রশান্তভাবে কহিলেন।

“আমি প্রায় আধঘণ্টা হইল আসিয়াছি।”—“আধঘণ্টা” কথাটার উপর নীপেশ একটু বিশেষ করিয়া জোর দিয়াছে, তাহা আর কেহ লক্ষ্য না করিলেও, কল্যাণী লক্ষ্য করিল। তাহার কক্ষতার নয়ন দুইটি মৃদুত্বের স্তম্ভ জগিয়া উঠিল।

“নমস্কার, নীপেশ বাবু!”—একটু অগ্রসর হইয়া শচীন্দ্র কহিল। নীপেশ এতকাল কতকটা ইচ্ছা করিয়াই শচীন্দ্রের উপস্থিতি লক্ষ্য করে নাই। কিন্তু শচীন্দ্র যে প্রকৃতির লোক সে প্রকৃতির লোক কাহাকেও অস্বীকৃত থাকিতে দিতে চাহে না!

নীপেশ প্রতিশ্রুতিমত করিল।

“কি বহি দেখিতেছ?”—রাখাল বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন।

“নীপিকা—শচীন্দ্রবাবু—”

“নীপিকা’ আমার বেশ লাগিয়াছে,—শচীন্দ্রনাথের লিখা ক্রমেই আমাকে মুগ্ধ করিতেছে।”—রাখাল বাবু শচীন্দ্রের বিনয়ময় মুখের দিকে চাহিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কথাগুলি বলিলেন।

সেৱাজের পাশ হইতে কল্যাণী চক্ষু তুলিয়া শচীন্দ্রের উদ্ভল মুখখানির দিকে চাহিল। তাহার প্রশংসমান চক্ষু দুই নীপেশের চক্ষু এড়াইল না।

নীপেশ কেন যে একটা অনির্দিষ্ট তীত্র অন্তর্দাহ অমূঢ়ব করিতেছিল, তাহা সে নিজেই ভাল করিয়া বুঝিতে পারিল না। কিন্তু তবু একটা কিছু উত্তর করা দরকার। নীপেশ হঠাৎ বলিয়া ফেলিল, ‘বসুন্ধরা’ পত্রিকার ‘নীপিকার’ যে সমালোচনা বাতির হইয়াছে, তাহা দেখিয়াছেন কি?”

নীপেশের কথা নিঃশেষ হইবার পূর্বেই সেৱাজের পাশ হইতে কল্যাণী উত্তর দিল, “আমি পড়িয়াছি,—সে দুইতাপূর্ব সমালোচনের অন্ত ‘চাবুক’ প্রস্তুত হইতেছে।”—কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই কল্যাণী বড় কুণ্ঠিতা হইয়া পড়িল। কল্যাণীর মনে হইল, কথাটা বড়ই রূঢ় ও স্নেহপূর্ণ হইয়া গেল।

তীত্র সমালোচনার ভঙ্গ সাত্ত্বিক্যক্রমে ‘কল্যাণী’র বেশ একটু নাম ছিল। নীপেশ বুঝিল, কে ‘চাবুক’ প্রস্তুত করিতেছে। ‘বসুন্ধরা’য় সমালোচকের নাম ছিল না, তাই রক্ষা।

“তা’ তীত্র বিরুদ্ধ সমালোচনা হওয়াটা এক প্রকার মন্দ নহে, সহজে বিখ্যাত হইয়া পড়াবার।”—শচীন্দ্র কথা করটি এমন স্নানর ভাবে হান্ততরলকণ্ঠে বলিয়া গেল যে, কল্যাণীর কুণ্ঠা অনেকটা কমিয়া গেল এবং যে বিতর্কের সূচনা হইতেছিল, তাহাও কতকটা কটিয়া গেল।

রাখাল বাবু ধীরে ধীরে তাহার বেশ-বিরল মস্তকে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিলেন, “নীপেশ, তুমি কাল একবার আমার সঙ্গে দুপুরের পর দেখা করিলে সুবিধা হয়। সময় হইবে ত?”

“সে আছে। দুইটার পর আপনার সময় হইবে ত?”

“তা হইবে, বেশী স্রোত্রে আসিও না, কষ্ট হইবে।”

কালিকার আসিবার বন্দোবস্ত হইয়া গেলে আজ আর বসিয়া থাকা চলে না ;
স্বতঃস্ফূর্ত নীপেশ কহিল, “তবে আমি এখন উঠি, কাল ছুটটার পরই আসিব।”

নীপেশ চলিয়া গেল।

রাখাল বাবু একটু ক্রান্তভাবে আরাম-কেনারার উপরেই শুইয়া পড়িলেন
কল্যাণীকে কহিলেন, “মা, একটা ছোট গান গাহিবে?”

ঘরের কোণে টেবলের উপর একটা হার্মোনিয়াম ছিল। কল্যাণী তথায় গিয়া
পিতার আদেশ পালন করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া দাড়াইল।

শতীন্দ্র একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, “আমি তবে বাসায় যাই, আপনাতা
বিশ্রাম করুন।”

“না। সে কি? বস। বাবা, কল্যাণীর গানটা শুনিয়া গাইতে আপত্তি আছে
কি?”—রাখালবাবু সম্মুখে কথোপলি বলিলেন।

ইতঃপূর্বে কল্যাণী আর কোনও দিন শতীন্দ্রের সাক্ষাতে গান করে নাই
আজই প্রথম গাহিবে। কল্যাণী সজোচ বোধ করিবে মনে করিয়া শতীন্দ্র
উঠিতে চাহিতেছিল।

এখন অচক্ষু হইয়া শতীন্দ্র বসিল। কল্যাণী বহুবাক্যবহির্গত সন্মিলনে গান
গাহিতে কোনও দিন তেমন কণ্ঠ্য না সজোচ বোধ করে নাই। আজ সে শতীন্দ্রের
সম্মুখে গাহিবে। যদি গলাটা দরিয়া যাহ,—গান তেমন ভাল না হইবে! তাহা
হইলে কি হইবে?

কিন্তু তাহাকে গাহিতেই হইল। সংসারে শঙ্কাকুল ছন্দে এবং সম্বৃতি
ভাবে এমন অনেক কর্তব্য সম্পন্ন করা অবশ্যস্বাভাব্য হইয়া পড়ে, যাহার পরিসমাপ্তি
তৃপ্তি ও আনন্দ উভয়ই প্রদান করিতে পারে।

কল্যাণী গাহিতেছিল। বিন্দু বিন্দু ঘনবায়ু তাহার ললাটে ও কপোলে সঞ্চিত
হইয়াছে, উপরের পাখার বাতাসে তাহার চূর্ণকৃন্তলগুলি একটু একটু উড়িতেছে।
তাহার নীল শাড়ীখানির প্রান্তভাগ তাহার মাথার উপর দিয়া, অর্ধাবগঠন-
কারে মোড়ল্যমান বেণীটি বেষ্টিত করিয়া নামিয়া আসিয়াছে; চাঁপার কলির মত
তাহার স্নায়ব অঙ্গুলিগুলি হার্মোনিয়ামের চাবির উপর দিয়া নিপুণ ভাবে ফিরিতেছে,
ঘুরিতেছে; আর, সর্বোপরি তাহার স্বপ্নময় কর্ণধরটুকু পুনকোচ্ছুরিত হইয়া সেই
কক্ষের মধ্যে উৎখিত হইতেছে।

শতীন্দ্রনাথ একবার মুখনত্রে এই সর্কীতরতা মহীরদা নারীমুষ্টির দিকে
চাহিল;—প্রাক্তন পক্ষের মত তাহার স্বপ্নগৌর মুখখানি সর্কীত-ক্রান্তিতে আরও
স্বন্দর দেখাইতেছিল।

কল্যাণী একবার চক্ষু তুলিয়া চাহিল। শচীন্দ্রের চক্ষুর সঙ্গে তাহার আঁহিত চক্ষু মিলিল। উভয়েই চক্ষু কিরাটয়া লটল।

গান বধন শেষ হইয়া গেল, রাখাল বাবু তখন ধীরে ধীরে কহিলেন, “মা, তোমার গান আজ বড় সুন্দর লাগিল।”

শচীন্দ্র ভাবিল, বড় সুন্দর লাগিয়াছে। কল্যাণীও বুঝিয়াছিল, বড় সুন্দর হইয়াছে। কল্যাণীর কেন যেন বারংবারই মনে হইতেছিল, কতদিন গান গাহিয়াছি, এমন তপ্তি ত আর কোনও দিনই পাই নাই !

গানের মধ্য মিরাই বুঝি জনগণের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়। এই বিদ্বতী কল্যাণীকে এতদিন পর্যন্ত শচীন্দ্রনাথ একটি নির্দিষ্ট আকার দৃষ্টিতেই দেখিয়া আসিয়াছে। আজ এই গানের পর তাহার মনে হইতেছিল, এতদিন পর্যন্ত যে একটি ছন্দ কঠিন আবরণে এই রমণীর নারী-মহিমাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল, আজ তাহা খসিয়া পড়িয়াছে। আজই সর্বপ্রথম সে যেন কল্যাণীর নির্মল রমণীরূপ দেখিতে পাইল। পূর্ববোচিত যে গরিমা ও স্বাতন্ত্র্য তাহাকে আশ্রয় করিয়াছিল এবং কল্যাণীর যে স্বাতন্ত্র্যটুকুর সহিত শচীন্দ্রনাথ এ পর্যন্ত আপনার “বনিবনাও” করিয়া লইতে পারে নাই, তাহা এই গানের পর যেন দূরে চলিয়াই গিয়াছে।

শচীন্দ্র দেখিল, এ নারী,—কোমলা, স্নেহপূর্ণজদয়া নারী। লতিকা যতই দৃঢ় হউক, আশ্রয় পাউলে সে তাহার আশ্রয়-স্থানকে বেষ্টিত করিয়া ধরিবেই। পূর্ববোচিত গুণের নিম্নে নারীকে অক্ষুর, অব্যাহত দেখিয়া শচীন্দ্রনাথ তৃপ্ত হইল। কোনও অভিনন্দন-বাণী শচীন্দ্রনাথের মুখ হইতে নির্গত হইল না। তবু কল্যাণী বুঝিল, গান শচীন্দ্রকে তৃপ্ত করিয়াছে,—সে তাহার সঙ্গীত-শিক্ষাকে আজ সম্পূর্ণ সার্থক বলিয়া মনে করিল।

ধীরে ধীরে শচীন্দ্র কহিল, “অনেক রাতি হইয়াছে, এখন উঠিবা।”

রাখাল বাবুকে নমস্কার করিয়া এবং কল্যাণীর দিকে একবার অন্ত্যমনস্কভাবে চাহিয়া শচীন্দ্র রাত্তার বাহির হইয়া পড়িল।

[]

নদীর তলেয় মধ্য দিয়া বাম্পীয় পোত চলিয়া যাইবার পরেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত তরঙ্গের একটি উচ্ছাস ছুই কুল প্রাণিত করিয়া ছুটিয়া থাকে। গান শেষ হইয়া গেল, কিন্তু গানের একটা রেশ শচীন্দ্রের অন্তরে রহিয়া গেল! কে যেন মর্ম্মবীণার তন্ত্রীটি বড় জোর করিয়া টানিয়া বাধিয়া দিয়াছে; সেই তন্ত্রীনির্গত

ব্রহ্মটুকুর সচিত্র এই গানের স্বরের মধুর রেশটুকু তাহার সমস্ত রূপকে আচ্ছন্ন করিয়া সমানভাবে ব্যক্তিরা উঠিতেছিল।

তোরের স্বর্গা যখন তাহার প্রথম কোমলরস্মিপাতে শিশিরসিক্ত পুষ্পগুলিকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিতেছিল, তখন শটীশ্রের ঘুম ভাঙিয়া গেল। নিদ্রাত্তরের পর বৃকের মধ্যে সে কেমন একটা অকারণ পুলকাবেগ অনুভব করিতেছিল। এই অনুভূতি তাহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিল এবং তাহার নরনে প্রকৃতির সৌন্দর্য্যকে অনেক পরিমাণে বাড়াইয়া তুলিল। আভিকার আকাশে, বাতাসে যে আনন্দ, যে মাধুর্য্য উছলিয়া উঠিয়াছে, তাহার বৃকের মধ্যেও যেন সেই আনন্দ ও মাধুর্য্যের তরঙ্গ আসিয়া পৌছিয়াছে।

পিগুন আসিয়া চিঠি দিয়া গেল। সেই চির-পরিচিত ধূসরজদাবৃত লিপিপানি।

শটীশ্র চিঠি বুলিয়া পড়িল। সেই চিঠির ভাষা, ভবী ও ভাবছন্দের ভিতর কল্পনাভীত সৌন্দর্য্যে যথিত। একপানি মানসী মূর্ত্তি ধীরে ধীরে শটীশ্রের নরন সমক্ষে দৃষ্টিয়া উঠিল।

গত রত্ননা হইতেই শটীশ্রের অন্তরমধ্যে একটা সংগ্রাম বাধিয়াছিল। যে নারী অপূজ্য থাকিয়াও ধীরে ধীরে তাহার অন্তরমধ্যে প্রকার আদর্শ লাভ করিয়াছিল, তাহাকে রূপের হইতে একেবারে নির্ঝাসিত করিয়া দেওয়া আজ আর শটীশ্রের পক্ষে সম্ভব নহে। বাহার বৈদিকা, ইচ্ছার হউক অনিচ্ছার হউক, ধীরে ধীরে রূপের প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে, তাহাকে দূর করা সহজ নহে। সেই বৈদিকা নিঃশেষ করিয়া তুলিয়া কেলিতে চাহিলে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে রূপেরও যে অক্ষত বহিবে না, ইহা শটীশ্র অতি নিশ্চিতভাবে বুদ্ধিতে পারিয়াছিল।

কিন্তু কোথায় সে? মাসান্তে তাহার একপানি রহস্তাবৃত লিপি আইসে;—এই ত মাত্র সম্বল। এই সম্বলটুকু লইয়া সে জীবন-পথে কেমন করিয়া অগ্রসর হইবে? আর, সেই লিপির মধ্যে এক ভর-রূপের প্রত্যাশাবোধন ছাড়া সে কি আর কিছুর নিদর্শন পাইয়াছে?

ওধু সামান্য কথখানি চিঠি;—তাহার পশ্চাতে কল্পনা ব্যতীত আর কিছুই তাহার চক্ষু অপেক্ষা করিয়া নাই! নিবিড় কল্পনার অন্ধতম আবরণে আবৃত্তা এক নারীর ছায়া লইয়া সে কেমন করিয়া বাচিবে? কিন্তু এই লিপিপ্রেত্রিকা—যে তাহার মতকে প্রকার সহিত বরণ করিয়া লইয়াছে, যে তাহার সাহিত্যসেবাকে অন্তরের উৎসাহবাণী ও প্রীতিপূর্ণ অভিনন্দন দ্বারা সংবদ্ধিত করিতে চাহিয়াছে, সে কি দূর দিবে না? সে কি চিরদিনই এমনই করিয়া দূরে দূরে থাকিয়া যাইবে?

শচীন্দ্রনাথের অঙ্কর বনিতেনছিল। তাহাকে আসিতেই হইবে, তাহাকে দয়া দিতেই হইবে। সেই দূর-ভবিষ্যতের অনির্দিষ্ট দিনটির ভগ্ন সে কি আপন নিষ্ঠ প্রেমকে বাচাইয়া রাখিতে পারিবে না? যে নারী মাসের মধ্যে অল্পতঃ একটি দিনকেও তাহার নিকট অভিনন্দন-প্রেরণের ভগ্ন একান্তভাবে নিক্ষেপ করিয়া রাখিতে পারিয়াছে, সে কি কোনও দিনই কল্পনালোক হইতে বাস্তব-রাজ্যে তাহার নয়ন-সমক্ষে নামিয়া আসিবে না? না, তাহাকে আসিতেই হইবে।

কিয়ং কল্যাণী? সঙ্গীত-স্রমকাতরা সেই কিশোরীর প্রশান্ত নয়ন দুইটি ঐ যে তাহার স্বপ্নময় দৃষ্টিটুকু লইয়া, যেন তখনও তাহার দিকে চাছিল। রহিয়াছে। সেই কলভরা চক্ষু দুইটির প্রশান্ত দৃষ্টি যেন জীবনের পরপার পর্য্যন্ত তাহার অঙ্গসংগ করিতে প্রস্তুত!

কি করিবে শচীন্দ্রনাথ?

কল্পনার পূণ্যবেদিকাকে চূর্ণ করিয়া ফেলিয়া, সে কি তাহার দৃষ্টিতে ঐ কল্যাণীর চক্ষুই প্রেমসিংহাসন পাতিয়া রাখিবে?

[৬]

‘কল্যাণী’ পত্রিকার ‘বঙ্গভ্রমর’ ‘দীপিকা’-সমালোচনার তীব্র আলোচনা বাহির হইয়াছে।

শচীন্দ্র যখন জানিল, কল্যাণী স্বয়ংই লেপিকা, তখন তাহার দুইকণ্ঠ হৃদয় সে কেমন একটা নূতনতর স্পন্দন অনুভব করিতে লাগিল। আপনার হৃদয়ের শরীরে আঘাত লাগিলে নাস্ত্র্য দে ভাবে প্রতীকারপরায়ণ হইয়া উঠে, কল্যাণী ঠিক তেনই ভাবে ক্ষমার সমস্ত সত্যজুষ্টি দিয়া তাহার আক্রমণকে শাণিত ও তীব্র করিয়া তুলিয়াছিল।

সেদিনের সাক্ষাৎকার তখন পর্য্যন্ত কেহ আইসে নাই। রাখাল বাবু তাহার আরাম-কেন্দারাতার উপর অর্জুনারিত অবস্থার রহিয়াছেন। কল্যাণী পিতার আশ্রয়ত সেই আলোচনাটি পাঠ করিতেছিল। কল্যাণীর কণ্ঠস্বরটা মধ্যে মধ্যে যেন ধরিয়া আসিতেছিল। প্রবন্ধের মধ্যে যে কয় স্থানে শচীন্দ্রনাথের নাম ছিল, সেই স্থানগুলি ঠিক সহজভাবে সে পড়িয়া যাঠিতে পারিতেছিল না। তাহার অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্বয়ং যেন একটু কাঁপিয়া যাইতেছিল, কণ্ঠ-মূলটা একটু যেন বেদী উত্তপ্ত হইয়া উঠিতেছিল, আর তাহার গোলাপী কপোলের কাছটা দিয়া শোণিতের একটা ক্ষুদ্র উজ্জ্বল মধ্যে মধ্যে আসিয়া পড়িয়া তাহাকে একেবারে অস্তিত্ব করিয়া তুলিতেছিল।

ঠাণ্ড রাখাল বাবু ডাকিলেন, “মা ।”

কল্যাণী পাঠ বন্ধ করিয়া উত্তর দিল, “বাবা ।”

“একটা কথা বলিব মনে করিতেছি ।”

“কি কথা, বাবা ?”

“আজ যদি তোর মা থাকিতেন ?”—রাখাল বাবুর কর্ণধর গাঢ় হইয়া আসিতে-
ছিল । কল্যাণী হুতিল, পিতা যে কথাটি বলিবেন, বহুক্ষণ ভেঁতে তাহার বিষয়ে
মনে মনে আলোচনা করিতেছেন ।

কল্যাণীর চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল । পিতা আজ এমন করিয়া কথা বলিতে-
ছেন কেন ? পিতার দিকে আর একটু অগ্রসর হইয়া গিয়া কল্যাণী তাঁহার
চুনের মতো ধীরে ধীরে অশ্রু-সঞ্চালন করিতে লাগিল । কিছুক্ষণ উভয়েই
নীরবে রহিলেন ।

শোকের এই নীরবতাকে বড় পবিত্র—বড় মধুর ।

গৃহের ও অগ্রের লক্ষ্মীস্বরূপিনী সেট সাধনী রমণী, একমাত্র কন্যাকে উপহার
দিয়া আজ মোড়ল বর্ষ অতীত হইল চিররহস্যবৃত্ত লোকে চলিয়া গিয়াছেন,
তবু তাঁহার দৃষ্টিটুকু রাখাল বাবুর জন্যে নিশি-দিন সমানভাবে জাগিয়া আছে ।
আজ এই মেঘমেঘের বর্ষায় সন্ধ্যায় যখন বাহিরে সমস্ত প্রকৃতি কাহার ভক্ত উন্মুখ
অপেক্ষায় জাগিয়া রহিয়াছে, তখনও রাখাল বাবুর প্রৌঢ়কদমযশে পরলোক-
বাসিনী পত্নীর স্মৃতি নিঃশব্দে প্রবল হইয়া উঠিতেছিল ।

পার্বকস্তা কল্যাণী :—তাঁহার মৃত্যিতে সেট প্রিয়মূর্ত্তির প্রতিচ্ছায়া দিনে দিনে
পরিশুদ্ধ হইয়া উঠিতেছে । সেট অঙ্গনোদয়, সেট দৃশ্যবরষ, সেই কলডরা বিবাদ-
জাগরু চক্ষু দুটো ।

রাখাল বাবু ধীরে ধীরে কহিলেন, “মা, কাল নীপেশের বন্ধু ক্ষিতীশ আসিয়া-
ছিল । নীপেশ বড় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে ।”—রাখাল বাবু কহায় মূগের দিকে
ডাকিলেন : কল্যাণীর মূগে বিদ্যার ছায়া গাঢ় হইয়া আসিয়াছে । তিনি কল্যাণীকে
বৃকের কাছে টানিয়া লইয়া ধীরে ধীরে তাঁহার ললাটে ও মস্তকে ছাচ ব্লাটতে
লাগিলেন ।

নীপেশের সঙ্গে কল্যাণীর বিবাহ আর যে সম্ভব নহে, এই ধারণাটা কেন
যেন তাঁহার মনে ক্রমেই বদ্ধমূল হইতেছিল । এ ব্যাপারের একটা সীমাঃসা
দহর করিয়া ফেলিবার নিশ্চিন্ত হইবার ভ্রম তিনি ব্যস্ত হইয়া উঠিতেছিলেন ।
নীপেশ যে যখন তখন লোক পাঠাউরা সাঁড়া দেয়, ইহাতেও রাখাল বাবু তাঁহার
অন্তরের মধ্যে একটা অস্বচ্ছন্দতা বোধ করিতেছিল । স্ততরাং আজই কল্যাণীর

মত গ্রহণ করিয়া, নীপেশকে কালই কিংবা দরকার হইলে আত্ম রাত্রিতেই ডাকা-
ইয়া আনিয়া একটা শেব উত্তর দিয়া দিবেন, এই সংকল্প তিনি সঙ্কতার পূর্ক হই-
তেই মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন।

নীপেশ বহু উপসম্পন্ন। শচীন্দ্রনাথ আসিবার পূর্ক পর্যন্ত রাখাল বাবু নীপেশ-
কেই ভাবী ভামাতা বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু শচীন্দ্র আসিবার
পর হইতে নীপেশের মধ্যে যে একটা অস্বাভাবিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বিদ্বেষের ভাব
দেখা যাইতেছিল, তাহাই নীপেশকে রাখাল বাবুর নিকট অনেকটা ছোট
করিয়া দিয়াছিল। ‘দীপিকা’-সমালোচনার ব্যাপার লইয়া কল্যাণীকে যখন
প্রকাশ্যভাবেই একটু উগ্র ও প্রতীকারপরায়ণ দেখা গেল, তখনই রাখাল বাবু
নীপেশের সহস্বে কতকটা হতাশ হইয়া পড়িলেন। কল্যাণীর ভীত আলোচনা
যখন চোখে চোখে হলাহল উপনীত করিল, তখন রাখাল বাবু আর অপেক্ষা করা
সমর্থ মনে করিলেন না। বহু দীর্ঘ হউক একটা চূড়ান্ত মীমাংসা করিয়া ফেলি-
বার জন্য তিনি আঞ্জিকার সঙ্কটকেই নির্দিষ্ট করিয়া লইয়াছিলেন।

কল্যাণীর মনোগত ভাব বৃদ্ধিতে যখন আর বাকী রহিল না, তখন তিনি এ
বিষয়ে তাহাকে আর প্রস্ত করা সমীচীন মনে করিলেন না।

এমন সময়ে কক্ষমধ্যে শচীন্দ্রনাথ প্রবেশ করিল। কল্যাণী পিতার কাছ
হইতে একটু সরিয়া একটা টেবলের পাশে গিয়া পাড়াইল।

রাখাল বাবুকে নমস্কার করিয়া শচীন্দ্র একবার কল্যাণীর দিকে চাছিল।
কল্যাণীর চক্ষু শচীন্দ্রের প্রতিভানীপ মুখখানির উপরেই নিবদ্ধ ছিল; শচীন্দ্র
চারিদেহে তাহাদের চক্ষু মিলিত হইল। শচীন্দ্র দেখিল, সেই প্রশান্ত নির্মল
চক্ষু দুইটির প্রান্তে বিবাদ-কালিম-ব্রোথা পড়িয়াছে; কাফন-গৌর বর্ণছটা মলিন
হইয়াছে, চাকুসেহলতা যেন সূর্য্যতাপক্লিষ্ট মল্লিকা কুম্বমের জায় শুকাইয়া উঠিয়াছে।

রাখাল বাবু কহিলেন, “‘কল্যাণীতে’ বে আলোচনা বাহির হইয়াছে, দেখিয়াছ
শচীন্দ্র?”

শচীন্দ্র একটু অস্বমনস্ক ছিল, চনকিয়া উঠিয়া কহিল, “আজ্ঞা হাঁ, দেখিয়াছি।”

শচীন্দ্র জানিয়াছিল, লিখাটা কল্যাণীর; তবু জিজ্ঞাসা করিল,—“কে লিখিয়া-
ছেন? নাম কেওয়া নাই ত?”

রাখাল বাবু কল্যাণীর দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন, “এইবার ত
আর চাপা বার না, যা!”

“উনিষ্ট লিখিয়াছেন?”—শচীন্দ্রনাথের শ্রীতিপ্রকৃষ্ট বৃদ্ধি কল্যাণীকে সর্ব-
ত্রের পুরস্কারে পুরস্কৃত করিল।

কল্যাণী একবার তাহার কৃতগব্বন দৃষ্টি ঈশং তুলিয়া অপাঙ্গে শচীন্দ্রের মুখের দিকে চাছিল।

শচীন্দ্র দেখিল, সেট পুনর্কিত দৃষ্টিতে শ্রদ্ধা, প্রীতি ও প্রেম উজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে।

এমন সময়ে নীপেশ কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিল। নীপেশ প্রবেশ করিবার সময়েই কল্যাণীর সেট অপকৃষ্টদৃষ্টি লক্ষ্য করিয়াছিল। যে দৃষ্টি শুধু তাহার দিকেই প্রেরিত হইবে বলিয়া সে এককাল আশা করিয়া আসিয়াছে, আজ তাহা ভিন্নপায়ে বিস্তৃত দেখিয়া নীপেশের মধ্যস্থল বেরনার আর্দ্র চইয়া উঠিল। কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই সে একখানি ছোট টুলের উপর আঙ্গুঠের মত বসিয়া পড়িল। রাগাল বাবু চাওয়া দেখিলেন, তাহার মুখ একেবারে পাত্তবর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং তাহার দৃষ্টিতে এমন একটা কাতরতার ভাব দৃষ্টিয়া উঠিয়াছে যে, তাতা দেখিলেই মনে হয়, সে এখনই হয় ত তাহার আসন হইতে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়া যাইবে।

“অস্থপ করিয়াছে কি, নীপেশ?”—সম্মত কণ্ঠে রাগাল বাবু নীপেশকে তিজ্ঞাসা করিলেন।

নীপেশ একবার কল্যাণীর মুখের দিকে চাছিল। এক জন সামান্য পীড়িতের তত্ত্ব বহুটুকু উষেগের লক্ষণ। এক জন করুণহৃদয়া রমণীর মুখে দেখিতে পাওয়া নাইতে পারে, তদপেক্ষা সামান্য অধিক সহানুভূতির রেখাও কি নীপেশ সে মুখে দেখিবার আশা করিতে পারে না?

না।—সে মুখে তাচার তত্ত্ব উষেগ আছে :—কিন্তু সহানুভূতির চিহ্ন এতটুকুও নাই!

নীপেশ বাণাহতের মত আর্দ্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—“না—না অস্থপ করে নাই।”—তাহার পরেই সে পাগলের মত অস্থির-পবনিকোপে করু হইতে বাহির হইয়া গেল।

[]

সে দিন সকালবেলা কল্যাণী একটি অপ্রত্যাশিত ভ্রম লাভ করিল। পিতার দেৱাজ টানিতেই সে দেখিল, তাহার মধ্যে একখানি ছোট ফটো। ফটোখানি শচীন্দ্রনাথের; ‘কল্যাণীতে’ ছবি দিবার তত্ত্ব সংগৃহীত হইয়াছে। কল্যাণী দেৱাজ টানিয়াই ছবিখানি দেখিল। তাহার কক্ষের মধ্যে একটা বক্তের বলক বড় ঘোরে উৎক্লিষ্ট হইয়া উঠিল। তাহার সর্ব্বদা কাপিতেছিল, ‘পদের নিয়ম’ হইতে হর্দ্যাতল যেন সরিয়া যাইতেছিল।

কল্যাণী চকিতের মত একবার এদিকে ওদিকে চাটিল,—ছবিখানি দেখিতে হইবে। সে ত শীতলনাথের মুখের দিকে কোনও দিনই তেমন ভাল করিয়া চাটিতে পারে নাই। আচ্ছ এই ছবিখানিকে সে একেবারে নিজের করিয়া লইবার ভবিধা পাইয়াছে। সে এমন সুযোগ কিছুতেই ছাড়িতে পারে না।

২৩ কম্পিত হস্তে ছবি বাহির করিয়া লইল। সেই দিনই ভাল ফটোগ্রাফারের দোকানে ছবি পাঠাইয়া দিয়া কাপি তুলিয়া লইবে এবং মূল ছবিখানি যথাস্থানে রাখিয়া যাইবে, এমনটী একটা কল্পনা সে মূহুর্তের চিন্তায় স্থির করিয়া ফেলিয়াছিল।

নীলাশ্রীর অঞ্চলতলে ছবিখানি ঢাকিয়া লইয়া কল্যাণী কম্পিত-পদ-বিক্ষেপে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া একেবারে তাহার নিজের পাঠাগারে প্রবেশ করিল। চেয়ারের উপর বসিয়া কল্যাণী অঞ্চলাবরণ হইতে ছবি বাহির করিল। সেই বৃক্ষিত উজ্জল, প্রতিভার নীপ, শাস্ত্র, সরল মুখখানি! দৃষ্টিতে তাহার খ্রীতি উজলিয়া পড়িতেছে প্রশান্ত ললাটে গরিমালেখা অদ্ভুতভাবে অঙ্কিত রহিয়াছে।

কল্যাণী চাহিয়া চাহিয়া দেখিল সে ছবি দেখিয়া আশা আর মিটে না। সে তাহার অন্তরের প্রেমরাসিকে বাহার উদ্দেশ্যে নিবেদন করিয়া দিয়াছিল, সেই নিষ্ঠুর দেবতা ত এক দিনের ভ্রমও তাহার দিকে ফিরিয়া চারে নাই। তাহার নিবেদিত নৈবেদ্য অশুভ, অগৃহীত, অস্বীকৃত হইয়াই পড়িয়া রহিয়াছে।

কল্যাণীর চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। হায় দেবতা, হায় নিষ্ঠুর! কবে তুমি ভক্তের মৌন নিবেদনকে স্বীকার করিয়া তাগকে সার্থকতা প্রদান করিবে? অসহায় নারীর ব্যথিত মর্ম্মবিতানের অন্তরালে যে মন্ত্র নিশিদিন প্রস্রবিত হইতেছে,—কবে সেই মন্ত্র প্রেমকে প্রতিষ্ঠা প্রদান করিবে? কবে তাহার প্রসন্ন দেবতা তাহার পূজা গ্রহণ করিবার ভক্ত পাখির স্বর্গের দ্বারে নামিয়া আসিবেন?

আচ্ছ এই ব্যথিতা নারীর অন্তর মণিত করিয়া কি অতপ্ত আকাঙ্ক্ষা উঘেলিত হইয়া উঠিতেছে, তে দেবতা, গণো নিষ্ঠুর, তুমি ত তাহা জানিতেও পারিলে না!

কল্যাণীর ভবিত নারীপ্রকৃতি আচ্ছ অবসর বৃথিয়া তাহাকে একেবারে অভিভূত করিল।

অন্তর-দেবতার সেই মোহন প্রতিরূতিখানি একবার বৃকের কাছে চাপিয়া ধরিবার ভক্ত একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা আচ্ছ তাহাকে একেবারে পাইয়া বসিল।

কিন্তু কল্যাণী ত সে অধিকার পায় নাই! সেই একটিনাত্র প্রবল আকাঙ্ক্ষাকে দমনিত করিয়া ফিরাইয়া দিবার জন্য বহুটুকু শক্তির প্রয়োজন, কল্যাণী তাহা তাহার নীরব হৃদয়ের উপর প্রসূক্ত করিল। তাহার ব্যথিত অস্থির আরও কাতর হইয়া উঠিল। কিন্তু তবু নারী-হৃদয় একটা সখল চাহে স্বপ্নের বা দুঃখের এমন একটা স্থিতি নারী চাহে, বাহা লইয়া সে জীবনের সুসার্থ পথটি অতিবাহিত করিয়া যাউতে পারে। যাহাকে বৃকের কাছে পাইবার অধিকার পাওয়া যাবে নাই, নাথ। নানাইয়া তাহার চরণস্পর্শ-স্বপ্নটুকুও পাওয়া যায় না কি?

কল্যাণীর অবসর হাত দুইখানি টেবলের উপর পড়িয়া গেল,—সে তখন প্রতিকৃতিখানির চরণের কাছে তাহার মাথা নীচু করিয়া আসিল! তখন তাহার অক্ষর বাধ ভারি। গিয়াছে। অস্থিরের মধ্যে একটা বেদনাপূর্ণ বিরতি অবসরতা ভাগিয়া উঠিয়া তাহাকে একেবারে অধির করিয়া তুলিল।

“হে দেবতা, তোমাকে বৃকের কাছে পাইবার অধিকার ত পাই নাই,—তোমার চরণ স্পর্শ করিব, অপরাধ লইও না!”—কল্যাণীর অস্থিরের মধ্যে যে কথা নীরবে গুরিয়া উঠিতেছিল, তাহারই অশ্রুত গুণন আত্ম নিবাসে, বেদনায়, অক্ষতে ভিত্তি হইয়া বাহির হইয়া আসিল।

কল্যাণী দীর্ঘ দীর্ঘ সেই ছবিখানির চরণে তাহার গুণস্পর্শ করিল।

মুখ তুলিতেই সমুপের দর্পণে তাহার দৃষ্টি পড়িল। সেই স্বরূপ দর্পণে এক জীবন্ত মুষ্টির প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে: কল্যাণী চিনিলা—সে প্রতিবিম্ব শচীন্দ্রনাথের!

শচীন্দ্রনাথ অক্ষমুখী কল্যাণীকে দেখিল। ব্রতকৃত্তলদান শৈবালরাজির মত তাহার প্রসূতিত পঙ্কজতুল্য চাক্ষু মুখখানির উপর আসিয়া পড়িয়াছে; অক্ষভায়াবনত চক্ষু দুইটি ঐবৎ ক্ষীত হইয়াছে!

কল্যাণী দেখিল, তাহার অস্থিরদেবতা, তাহার প্রগতি গ্রহণ করিবার জন্যই বেন এমন সময়ে, এমন করিয়া কাছে আসিয়াছেন! তাহার মনে হইল, অতীতের কোন যুগে তপস্কণা গৌরীর, মুখ দৃষ্টির সমুখে দেবানন্দেব শশাঙ্ক-শেখর বুকি: এমনই করিয়া আসিয়া পাড়াইয়াছিলেন এবং তাহার নিষ্ঠাপূর্ণ তপস্বীকে সার্থকতা প্রদান করিয়াছিলেন।

তাহার দেবতা কি তাহাকে সার্থকতা দিবেন না?

কল্যাণী তাহার বৃকের মধ্যে বড় বেশী অস্থিরতা অনুভব করিতেছিল। সে ধরা দিতে চাহে নাই, তবু আত্ম সে ধরা পড়িয়াছে। সেই নির্বন্ধন কক্ষের মধ্যে সে যখন তাহার হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশ উন্মোচিত করিয়া দেখিতেছিল,

তখনই সেই অন্তরতম প্রবেশের প্রকৃ নিত্য অপ্রত্যাশিতভাবে তাহার কাছে আসিয়া পড়িয়া তাহাকে একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছেন ।

আজ মুখ-হৃদয়া নারীর দুর্জয়তা ধরা পড়িয়াছে সে তাহার দীর্ঘ হৃদয়কে আর কোন মতেই শাস্ত, স্থির রাখিতে পারিল না ।

কলাগী সন্মুখের টেবলের উপর আবার অবসন্নভাবে উপুড় হইয়া ছুই হাতে মুখ ঢাকিল ;—তাহার এলায়িত কুন্তলরাশি তাহার মুখখানিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল । আজ তাহার হৃদয়ের বাধ ভাঙিয়া গিয়াছে,— সে যে নারী, সে যে নিত্য অসহায়, তাহা বিশ্ববিভরী প্রেম আজ তাকে বুঝাইয়া দিল ।

কলাগীর পাঠাগারে শচীন্দ্রনাথের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল না । কিন্তু সে ত এমন করিয়া মুখা নারীর হৃদয়ের গোপন ডাব জানিবার চেষ্টা প্রস্তুত ছিল না ! সে প্রেম তাহাকেই অবলম্বন করিয়া বাড়িয়া উঠিতেছে, এমন করিয়া হঠাৎ আসিয়া পড়িয়া তাহা জানিবার কি অধিকার তাহার আছে ?

শচীন্দ্র ধীরে ধীরে সেই কক্ষ হইতে বাহির হইয়া একেবারে বাসার চলিয়া আসিল ।

[৮]

বৃকের মধ্যে এক বিশ্ববিদাহী জ্বালা লইয়া শচীন্দ্রনাথ যখন বাসার কিরিয়া আসিল, তখন তাহার বাহ্য সংজ্ঞা একপ্রকার বিলুপ্ত হইয়াছে । শব্দ্যার উপর সে নিত্য অবলম্বনবিহীনতার জ্বালা শুইয়া পড়িল । তাহার বৃকের মধ্যে বড় ফাঁকা বোধ হইতেছিল । একটা কিছু আঁকড়াইয়া বৃকের সঙ্গে চাপিয়া না ধরিয়া সে আর কোনমতেই স্থির হইতে পারিল না একটা বালিশ টানিয়া লইয়া সে আকুলভাবে ছুই হাত দিয়া জড়াইয়া ধরিল

শচীন্দ্রনাথের মনে পড়িল, কবে পল্লী-উদ্যানে সে এক দিন দেখিয়াছিল, এক পল্লবিনী লতিকা সহকারকে বেষ্টিত করিতে চাচিতেছে :—কিন্তু পারিতেছে না ! তখন সে ভেবে, আমার লতিকার উন্মুখ আগ্রহকে সার্থক করিয়া দিয়াছিল । আর আজ এক কুন্তলমণ্ডিক পেলবা নারী, তাহারই উদ্দেশ্যে হৃদয়ের সমগ্র প্রেমরাশি নীরবে নিবেদন করিয়া দিতেছে, সে তবুও তাহা স্বীকার করিবার জন্যও আপনাকে প্রস্তুত করিতে পারিতেছে না । কোথায় তাহার বাধা, কেমন করিয়া সে তাহা বুঝাইবে ?

হার, নিষ্ঠুর অদৃষ্টের নত কোথায় তুমি শচীন্দ্রনাথের মানসী প্রতিমা ? মাসান্তে লিপির মধ্যে দিয়া তোমাকে একটিবার কল্পনায় মগ্ন করিয়া অভি-
পন্ন শচীন্দ্রনাথ কেমন করিয়া বাঁচিবে ? ও গো মানসী, 'ওগো কল্পনা-বর্ণ-

বাসিনী, তুমি এস, তুমি এস! তোমার বিদ্যামণ্ডলী কটাক্ষপাতে শটীজনাথের
কন্যার অঙ্ককার দূর করিয়া দিয়া যাও।

[৯]

নীপেশের সঙ্গে কল্যাণীর বিবাহ-প্রস্তাব পরিত্যক্ত হওয়ার পর কিছু দিন
ঐ রাপাল বাবু নিশ্চয় রহিলেন। কল্যাণীর দ্বন্দ্বের শটীজনাথের জন্য
মহারাগ-বহিঃস্থানস্থিত হইয়া উঠিতেছে, রাপালবাবু তাহা বুঝিয়াছিলেন। ইহার
পরাম্পরের প্রতি আর একটু বেশী আকৃষ্ট হইলেই তিনি শটীজনাথের নিকট
বিবাহ-প্রস্তাব করিবেন, মনে মনে এটী কল্পনা করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু
নারীহৃদয়ে প্রেম কখন প্রথম প্রবেশলাভ করে এবং কখন সেই প্রেম পূর্ণ-পরিণত
হইয়া উঠিয়া পড়িতে আরম্ভ করে, পুরুষ তাহা কোনও দিনই স্থির করিতে
পারে না। কল্যাণীর উজ্জ্বলিত প্রেমাবেগ শটীজনাথ প্রত্যক্ষ করিয়া গেল
কিন্তু তাহার হৃদয়ে যে একটুও তরঙ্গ-উত্তিগাহে, এমন কোনও লক্ষণই কল্যাণী
শটীজনাথের ব্যবহারে দেখিতে পাইল না।

শটীজনাথ যে দিন আপনার বিষয়ক জরুরীকৈ শাস্ত্র করিবার জন্য কলিকাতা
ছাড়িয়া পশ্চিমে চলিয়া গেল, কল্যাণী সেই দিনই শব্দগ্রহণ করিল। তাহার
উজ্জ্বলিত প্রেমকে এমন করিয়া উপেক্ষা করিয়া, অস্বীকার করিয়া, শটীজনাথ
চলিয়া গেল, এ কথা অভিনয়িনী কল্যাণী কোনও মতেই তুলিতে পারিল না।
তাহার বুকখানা লটগট যত জ্বালা, যত গোল! এক মুহূর্তের জন্যও আর সে
বুকের মধ্যে স্বচ্ছন্দতা, আরাম অঙ্গভব করে না। সমগ্র বুকখানাই যেন খালি
হইয়া গিয়াছে, সেই শূন্যস্থান পূর্ণ করিবার জন্য তাহার যে কিছুই নাই,—
এতটুকু স্বতিও নাই! সে আর কোন্ সাধনা লইয়া, কোন্ কল্পনা লইয়া বাঁচিয়া
থাকিবে?

কল্যাণী ভাবিল, নিছক শটীজনাথ যখন কোন পথই দেখাইয়া দিয়া যায় নাই,
তখন যে পথ খোলা আছে সেই পথই সে গ্রহণ করিবে। তাহার বুকের মধ্যে
যে দহন আরম্ভ হইয়াছে, মৃত্যুর তুফানলীল ম্পর্শই শুধু সেই দহনকে নির্দোষিত
করিয়া দিতে পারে।

কল্যাণী স্থির করিল—“মরিব”। তাহার বুকের মধ্যে একটা স্বপ্ন-বেদনাপূর্ণ
স্বর শুমরিয়া উঠিতেছিল; সে স্বর ফিরিয়া ফিরিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া করিতেছিল,
“কল্যাণী মরিবে, কল্যাণী মরিবে।” কল্যাণী সে স্বরকে অঙ্গ দিয়া, বুকের স্বর
দিয়া চর্চিত করিয়া দিতেছিল।

শটীজনাথের ছবিখানির দিকে চাহিয়া চাহিয়া কল্যাণীর বড় সাধ হইতেছিল,

একবার সেখানি বৃকের কাছে চাপিয়া ধরে। বৃকটা বড় খালি হইয়া গিয়াছে। সেই শ্রির ছবিখানি চাপিয়া ধরিলে বৃক শূন্যস্থান কতকটা পূর্ণ হইবে!

তাহার বক্ষপত্র নিষ্পিষ্ট করিয়া দিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইয়া আসিতেছিল, কলাগী কাঁচরকণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—“না নিষ্ঠুর, তোমার দেওয়া কোনও অধিকারই ত পাট নাট। সব সাধ আমার দীর্ঘ বৃকের মধ্যেই লুপ্তিত হউক! আমি মরিব,—আমার মৃত্যুর সংবাদ পাটয়াও কি তুমি আমাকে কোনও অধিকারই দিবে না?”

তখন কলাগী সেই বৃকের মনে পড়িয়া ধূল্যবলুপ্ততা হইয়া কাদিতে লাগিল।

[১০]

শচীন্দ্র কলিকাতা ছাড়িয়া কয়েক দিন পশ্চিমের নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইল তাহার পর ব্যাঙ্গসীধামে ছোট একটা বাসা ভাড়া করিয়া তথায় কিছু দিনের ভ্রমর হইয়া গেল।

ব্যাঙ্গসীতে বাসা করার একটা প্রলোভন ছিল। যে লিপি তাহার জীবনে-তিহাসের এক পৃষ্ঠা ব্যাপিয়া রহিয়াছে, একটি নির্দিষ্ট ঠিকানার না থাকিলে সেই লিপি তাহার নিকট নিহনিত না-ও আসিতে পারে। শচীন্দ্রের বিশ্বাস ছিল, সে ব্যাঙ্গসীতে থাকিলে, তাহার ঠিকানা সেই নারীর কাছে অজ্ঞাত রহিবে না।

বাসা ঠিক করিয়া শচীন্দ্রনাথ কর্তব্যবোধে রাখাল বাবুর কাছে এক পত্র লিখিল। পারীষিক ও মানসিক অন্বহতা বশতঃই সে যে তাঁহাকে সংবাদ না দিয়া হঠাৎ কলিকাতা হইতে চলিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছে এ জন্য সে রাখাল বাবুর কাছে ক্ষতি-স্বীকারও করিল।

ব্যাঙ্গসীতে আসিয়াও শচীন্দ্রের মন স্থির হইল না। তাহার অন্তরে ও বাহিরে যে এক অবল সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছে, তাহারই ঘাত-প্রতিঘাত তাহাকে একেবারে অস্থির করিয়া তুলিল। অন্তরে এক নারীর ছায়ামূর্ত্তি। কল্পনার লান্তলীলার সে তাহাকে গঠিত করিয়া তুলিয়াছে; আর অন্তরের বাহিরে লীলাময়ী কলাগীর বাণব প্রতিমা :—সে তাহার বাহুবল্লরী দিয়া তাহাকেই বেষ্টিত করিবার ভ্রম উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে। এক বাধিতা নারী এমন করিয়া তাহার প্রেমকে তাহার কাছে নিবেদন করিয়া দিয়াছে,—সে তাহাকে উপেক্ষা করিয়া পৃথিবীর কোন্ নিকৃত কোণে বাটয়া দুকাবে! না,—সেই অঙ্গপ্রাণিত নয়নের ধ্রুব দৃষ্টিটুকু যে তাহাকে জীবনের পরপার পর্য্যন্তও অহমরণ করিতে চাহিতেছে।

প্রতি সন্ধ্যায় বিবেচনের মন্দিরে আরতি দেখিতে দেখিতে শচীন্দ্র মনে জাবিত, হায়, যদি তাহার বার্ষ্য জীবনান্তির মাকথানে সে তাহার অন্তিমটুকু

একেবারেই নিঃশেষ করিয়া মুহুরা ফেলিয়া দিতে পারিত ! এই যে একটা বিরাট অস্ত্রের নির্দ্বিধাসের মধ্যে দিয়া সে তাহা হার্স জীবনটাকে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে, কোথায় উহার সার্থকতা ? আরতির শেষে সে যখন দেবতার সম্মুখে মূটাটয়া পড়িত, তখন তাহার বেলনা-কাতর জ্বর হইতে শুধু এই প্রার্থনাই বাহির হইয়া আসিত, হে বিশেষ তাকুর, হে দয়াল, এমন একটু কিছু দাও, যাহার স্বতি লইয়াও জীবনটাকে নিঃশেষ করিয়া দিতে পারি !

কয়দিন কাটিয়া গেল । এ ঘাসের গিলিপানি শটীজ্ঞনাথ এখনও পায় নাই । সে যখন তন্তুটুকুর সহিত সে তাহার জীবনটাকে বাঁধরা রাখিয়াছিল, হাত রে, মুক্তি তাহাও ছিঁড়িয়া যার ! ঘাসের শেষ দিনটাও আসিল, চলিয়া গেল ; কিন্তু সেট মদনকুব্জবৃত্ত গিলিপানি আর আসিল না ।

পরদিন যখন শব্দাত্মক করিয়া শটীজ্ঞনাথ বাহিরে আসিল, তখনও ভোরের আলো ভাঙ করিয়া কুটিয়া উঠে নাই । দূরে বড় বড় পাতরের বাড়ীগুলার আশে-পাশে তখনও একটু একটু অন্ধকার জমিয়া রহিয়াছে । শটীজ্ঞ তাহার জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল । বহুদূর হইতে নহবতের কঙ্কণ রাগিণী ডানিয়া আসিতেছিল । জাহ্নবীজ্ঞানার্থীরা ঘাইতেছে, আসিতেছে । ধীরে ধীরে কর্ণ-কোলাহল জাগিয়া উঠিতেছে । বিশ্বের এই কণ্ঠস্বরদের মধ্যে একটা ঐক্য, একটা মৃদুলা পরিচুট হইয়া উঠিতেছে । এই ঐক্য ও মৃদুশব্দটার মধ্যে শুধু সে-ই যেন কেমন করিয়া আনাবস্তকরূপে, অশোভন ভাবে আসিয়া পড়িয়াছে । সে যদি এই কণ্ঠস্রোতের সঙ্গে সঙ্গে না চলিতেই পারে, তবে কেন সে তটকৃষিতে এমন করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে ?

এমন সময়ে ঘরের কাছে আসিয়া দ্বার ঠেলিয়া কে সম্মুখকর্থে ডাকিল “শটীজ্ঞ” —

চমকিত শটীজ্ঞ বৃথ ফিরিয়াইয়া দেখিল, রাখাল বাবু !

“আপনি ! কবে এখানে আসিলেন ?” বিম্বিত শটীজ্ঞনাথ দেখিল, রাখাল বাবুর সমাহারপ্রকুর মুখ গাঢ় বিদ্যাক্ষায়াপাতে মলিন হইয়া উঠিয়াছে !

“আমি কাল সন্ধ্যায় আসিয়াছি, — কাল আর তোমার কাছে আসিতে পারি নাই, আর ভোরেই আসিয়াছি ! আমাদের বাণীর একবার ঘাইবে শটীজ্ঞ ?” — তিনি শব্দের করটি কথা বলিবার সময়ে শটীজ্ঞ দেখিল, রাখাল বাবুর কর্ণধর একটু কাঁপিল, — চক্ষুতে অস্ত্রের একটা ক্ষণিক উজ্জ্বল দেখা গেল !

শটীজ্ঞ আর সাহস করিয়া কল্যাণীর কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না । বহু-চালিতের মত বলিল, “চলুন, ঘাইব ।” — উভয়ে নীরবে পথ প্রতিবাহিত করিলেন ।

ধানার প্রবেশ করিয়া রাখাল বাবু কহিলেন, “শতীন, কল্যাণী পীড়িতা একবার দেখিবে কি?”

শতীশের সর্কাস যেন আড়ষ্ট হইয়া আসিতেছিল। কল্যাণীর পীড়ার কথা শুনিয়া তাহার অন্তরে কোন অশ্রীয়া বাণী যেন তাহাকে কেবলই ডাকিয়া বলিতেছিল, এই কক্ষস্থর কক্ষের মধ্যে যে নারী তোমারই অপেক্ষার বসিয়া রহিয়াছে, সেই তোমারই মানসী :—তোমারই কল্যাণী !

শতীশের কেবলই মনে চইতে লাগিল, কল্পনা ও বাস্তব যেন আড়ষ্ট এক মিলনস্থলে প্রপিত হইয়া যাউবে। আজ যেন এমনই একটা মুহূর্ত্ত আসিয়া পড়িয়াছে, যে মুহূর্ত্তের অপেক্ষার সে এতদিন কাটাইয়াছে ;—আজ অন্ধর ও বাহির তাহার কাছে একই মূর্ত্তির মধ্য দিয়া প্রকাশ হইয়া পড়িবে !

এক অননুভূতপূর্ব্ব নূতন চিন্তা কেন যে তাহার হৃদয়ে জাগিয়া উঠিতেছিল, সে তাহা কোনও মতেই স্থির করিতে পারিল না। রাখালবাবুর কপাল উত্তর না দিয়া সে দুরার ঠেলিয়া কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিল, স্ত্রী-এর কবচ আবার কঁক হইয়া গেল !

শতীশ কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল, জানালার পাশে ছোট একখানি সোফার উপর কল্যাণী শয়ন করিয়া রহিয়াছে। সে শূন্য দৃষ্টিতে জানালার দিক দিয়া বাহিরের আকাশ দেখিতেছিল।

শতীশের পদশব্দ শুনিয়া কল্যাণী কিরিয়া চাহিল ; মুহূর্ত্তমাত্র একটা অস্পষ্ট কাতরভাবাপন্ন বুদ্ধবনি কল্যাণীর মুখ হইতে বাহির হইয়া গেল।

শতীশ দেখিল, কক্ষ কুহলগাতি সেই পাণ্ডুর মুখখানির উপর আসিয়া পড়িয়াছে ; সেই উল্লীবরনভূল্য নগ্ন দুইটির কোণে কে বিষাদকালিমারেখা অঙ্কিত করিয়া দিয়াছে। সেই লীলাভরঙ্গারিত মেহলতা কীর্ণ হইয়াছে ! সেই চাকুপ্রতিমা তপঃকুশা গোষ্ঠীর দ্বার প্রতীক্ষমানা হইতেছে।

কল্যাণী দীর্ঘে দীর্ঘে উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিল : কিন্তু তাহার সর্কাস বড় কাঁপিতেছিল ; মনের আলো যেন নিবিয়া গিয়াছে।

কল্যাণী এক হাতে বকোবসন চাপিয়া রাখিয়া, আর এক হাতে খাটের একটা বাজু ধরিল, তবু স্থির হইতে না পারিয়া দুই হাতে বাজুটা চাপিয়া ধরিল। তখন কল্যাণীর বকোবসনের নিম্নে কি লুকান ছিল, তাহা সরিয়া শব্দার উপর পড়িল !

কি সে ?—শতীশ দেখিল, একখানি দশমবর্ষের বাম ! উপরে সেট চিরপরিচিত লক্ষ্যাকরে হুঁহারই নাম লিপিত রহিয়াছে !

একটা অভিজ্ঞবাক্য নিপুলবেশে শতীশ্রনাথের মস্তিষ্কের ভিতর দিয়া বাহির হইয়া আসিল,—তাহার সক্ষম কাপিতেছিল তাহার জন্মপিণ্ড নির্মিত্ত করিয়া শতনাথ চাঁৎকায়নি বাহির হইয়া আসিল,—“কল্যাণি—কল্যাণি—তুমি! রাকসি, তুমি—এখানে—”

কল্যাণির মূৰ্চ্চার ভাবটা কাটিয়া আসিতেছিল, সে চাছিল দেখিল, তাহার সেই পুনরজ্জন্মের নিমিষানি শতীশ্রনাথের হস্তে বহিয়াছে।

কল্যাণি আবার চক্ষু মুদ্রিত করিল। তাহার বকের ওরু স্পন্দন তাহাকে বহু অস্তির করিয়া তুলিতেছিল। পুনরায় তাহার মুষ্টি শিথিল হইয়া আসিল। তাহার মূৰ্চ্চার নিম্পন্দ দেহনভা সেই বহু শব্দার উপর বুটাইয়া পড়িল।

[১১]

কল্যাণির পীড়া বাড়িয়া চলিয়াছে। মিলনের প্রথম কলোঙ্কাসের মধ্যেই যে এমন করিয়া অস্বস্তি বিরত হইত, শতীশ্রনাথ তাহা কোনও কালেই মনে করে নাই। কোন এক দিন নৈরাজ্যের ভীতজন সহনের মধ্যে সে দেবতার কাছে এতটুকু দ্বারের চিক চাহিয়াছিল, যে দ্বিতিক্রি লইয়া সে জীবনকে অবসান করিয়া দিতে পারিবে মনে করিয়াছিল। আজ দেবতা তাহার প্রার্থনা ঠিক পরিমাণ করিয়া ততটুকু পূরণ করিতে বাইতেছেন।

কিন্তু এমন করিয়া মৃত্যুপথদ্বারিণী কল্যাণির মধ্যেই যে তাহার অমৃত কামনারাশিকে মুহূর্ত্তের পরিচর্য্যাহুই একেবারে নিঃশেষ করিয়া ঢালিয়া দিতে হইবে, ইহা শতীশ্রনাথ যত্নেও কখনও মনে করিতে পারে নাই। তাহার জীবনের এই যে শুভমিলনমুহূর্ত্ত দেবতা স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন,—এই মুহূর্ত্তটিকে সে কোনক্রমেই অসংগত হইতে দিতে পারে না।

এই মুহূর্ত্তটির কথা হইতেই সে এমন কিছু সংগ্রহ করিয়া লটবে, বাহার দ্বিতিকে অবলম্বন করিয়া সে অবশিষ্ট জীবনভাগ কাটাইয়া দিতে পারে। শুভরাত্রি শতীশ্র সেই দিন সন্ধ্যার পর রাখাল বাহু বধন উঠিয়া বাহিরে আসিলেন, তখন কল্যাণির শয্যাশ্রেণিতে বাইয়া গাড়াটন এবং উবেলিতকণ্ঠে ডাকিল,—“কল্যাণি!”

কল্যাণী চক্ষু বেলিয়া চাছিল। শতীশ্র উত্তর চাহিয়াছিল,—কল্যাণীর দৃষ্টির মধ্যেই সে তাহার উত্তর পাইল। সে দৃষ্টিতে অনন্ত ভাণ, অনন্ত অতৃপ্তি, অনন্ত আকাঙ্ক্ষা উবেলিত হইয়া উঠিয়াছে।

শতীশ্র আবার মুহূর্ত্তে ডাকিল, “কল্যাণি”—

কল্যাণী এতক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কথা বলিবার শক্তিসংগ্রহ করিতেছিল,—এতবার আকাশের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া মৃদু কণীণ কণ্ঠে কহিল, “ওখানে—

এখানে নেহে !”—

একবিষু তপ্ত অশ্রু তাহার দীর্ণ পাণুর কপোল বাহিরা নামিয়া আসিল ।

“কেন, কল্যাণী, এখানেতে, এমন একটা কিছু আমাকে দাও, তাহার স্মৃতি লইয়া আমি জীবন কাটাতে পারি ।”—শচীন্দ্র তাহার মুখ নত করিয়া কল্যাণীর মুখের কাছে লইয়া গেল ।

কল্যাণী তাহার মুখ ফিরাইয়া লইয়া কহিল, “না । এমন করিয়া তোমার জীবনকে নষ্ট করিতে পারি না ।”—একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বড় ছোরে কল্যাণীর দীর্ণ বক্ষঃ নিশ্চিষ্ট করিয়া বাহির হইয়া আসিতেছিল । কল্যাণী তাহার সমস্ত শক্তি-প্রয়োগ করিয়া সেই নিঃশ্বাসকে ফিরাইয়া দিল ।

শচীন্দ্র একটু ভাবিল,—তাহার পর দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, “আমি আমার জ্ঞাষা প্রাপ্য পাইবার অধিকার চাহিতে আসিয়াছি, কল্যাণী, অহুমতি কর তুমি ।”

এইবার কল্যাণী কাঁদিয়া ফেলিল । তাহার অশ্রু কপোলদ্বয় প্রাবিত করিয়া উপাধান সিক্ত করিল ।

কল্যাণী যে তাহার জীবনকে একান্তভাবেই নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়াছে, এ কথা রাখাল বাবু ও শচীন্দ্র জানিয়াছিলেন ।

শচীন্দ্র যখন রাখাল বাবুর কাছে বিবাহপ্রস্তাব করিল, তখন তিনি স্তম্ভিত হইলেন !—সে তাহাকে সুশৃঙ্খলভাবেই বলিয়াছিল যে, জীবনে আর কোনও নারীই তাহার গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না ; সুতরাং যে চলিয়া যাউবে, তাহার কাজ হইতেই বতরুই স্মৃতি রাখা যায়, সেই-ই তাহার পক্ষে পরম লাভ হইবে ! যদি একমুহূর্ত্তের জন্য সে তাহার অধিকার প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলেও যে কৃতার্থ হইবে ।

এই প্রাণপণ আগ্রহকে রোধ করা রাখাল বাবুর সাধ্যাত্ত হইয়া উঠিল না । রাখাল বাবুর অভিমত পাইয়া শচীন্দ্র কল্যাণীর কাছে আসিয়াছিল !

কল্যাণীর অশ্রুপ্রাবিত দৃষ্টির মধ্য হইতে সে তাহার স্মৃতিকে খুঁজিয়া বাহির করিবেই ।

[১২]

সম্প্রদানান্তে রাখাল বাবু কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন । তাহার নরনয়ন বেদনার তপ্ত অশ্রুতে প্রাবিত হইয়া যাইতেছিল ।

তখন শচীন্দ্র ধীরে ধীরে কল্যাণীর শয্যার উপর আসিয়া বসিল ।

উচ্চ সিতবরে শচীন্দ্র ডাকিল,—“কল্যাণী, প্রিয়া আমার !”

কি সে আহ্বান !—সেই আবেগ-কল্পিত কণ্ঠের প্রিয় আহ্বানটি কল্যাণীর

সর্বত্র কম্পিত, রোমাঞ্চিত করিয়া দিল । তাহার বৃক্ষের নখে বঁড় ঢাকলা অঙ্কিত হইতেছিল ; শিরায় শিরায়, ধমনীতে ধমনীতে অনন্তকৃতপূর্ণ স্পন্দনপ্রোত বহিয়া বাইতেছিল । সে এই কম্পনকে, এই আবেগকে আর কোনমতেই বন্ধ করিয়া রাখিতে পারিল না । তাহার সমগ্র শক্তি, সমগ্র অঙ্গকৃতি সেনা বীজা ধীরে তাহার বৃক্ষের নখে কেন্দ্রীভূত হইয়া আসিতেছিল ।

শচীন্দ্র একটু নত হইয়া কল্যাণীর মুখের কাছে মুখ আনিয়া মৃদুস্বরে আবার ডাকিল, —“কল্যাণি,—প্রিয়তমা আমার !”

এ কি কর্তব্য ! এ কর্তব্যর গুণিণে নরনপ্রায় অঙ্গসিক্ত হইয়া উঠে,—জীবন স্পৃহণীর হইয়া উঠে,—আসন্ন-মৃত্যুও বুঝি কিছুকালের জন্য তিরিয়া পাড়ায় !

জীবনকে যে একান্তভাবে নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়াছে, তাহার কাণের কাছে, হায় শচীন্দ্রনাথ, তুমি এমন করিয়া প্রেমাবেগ-কম্পিতকণ্ঠে কেন ডাকিলে ?

তখন কল্যাণী তাহার শীর্ণ বক্ষিণ বাহু দিয়া শচীন্দ্রের কণ্ঠ বেষ্টিত করিল !

কিন্তু চোখের কাছে ও কিসের আঁধার ঘনীভূত হইয়া আসিতেছে ?

শচীন্দ্র তাহার মুখ আরও নত করিয়া আনিয়া,—কল্যাণীর হৃদয় পাণ্ডুর অধরে স্বীয় তপস্বী হস্তাধর স্থাপিত করিল ।

কল্যাণী একটু শিহরিয়া উঠিল,—তাহার সর্বত্র একবার কাঁপিল,—তাহার পর বক্ষের স্পন্দনটা রুত হইয়া উঠিয়া চোখে ধানিয়া গেল !—কণ্ঠাধিত পিথিল বাহু ধীরে ধীরে শব্দার উপর পড়িয়া গেল ।

চকিত শচীন্দ্রনাথ মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল, কল্যাণীর পাণ্ডুর গুটপুট আরও পাণ্ডুর হইয়াছে !

আর, সেই প্রাপ্তপ্রণয়নূষনের গৌরবের নখেই কল্যাণী তাহার মুকুলিত বৌবনের সমগ্র সাধ ও আশা তাহার প্রিয়তমের কাছে নিঃশেষে নিবেদন করিয়া দিয়াছে !

তাহার মুখশ্রী রুতার্থতার গৌরবে উজ্জল হইয়া উঠিয়াছে ।

ঈষতীক্ৰমোহন সেন ওপু ।

অদৃষ্টের উপহাস ।

[১]

দিকে দিকে রটি গেল রাজার আদেশ,—

“নৃপতির পুত্র আসে রেবিবারে বেশ ।”

কর্মচারী দলে দলে,

রাজপথ দিরা চলে,

শ্রীহীনে গোপন করে দিরা শ্রীর বেশ ।

নৃপতির পুত্র আসে রেবিবারে বেশ ।

পত্রপুষ্পে গৃহিণী সাজাইল দ্বার

উৎসবের বেশ অঙ্গে উঠে জনতার ।

ধূলি নাট রাজপথে,

পাছে কমান্বয়ের রথে,

উঠে ধূলি, আশঙ্কায় ঢালে তলধার ।

এসেছে বেগিতে দেশ রাজার কুমার ।

জনতা উনমীল চাতি' তৃপ্ত নহন ।

অসিতে রথের অগ্রে সেনা অগণন :

চলে অশ্ব ভেঙে ভরা,

অশ্বারোহী বর্ষপরা,

শাপিত কপালে খেলে রবির কিরণ,

নগনে উক্কত দৃষ্টি, বলিষ্ঠ গঠন ।

চলে করী—সারি সারি মন্তর-গমনে,

রক্তিত বিপুল রেহি বিচিত্র বরণে ।

চলিছে পদাতি কত,

অসি বাজে অবিরত,

অসিতে, শৃঙ্খলে, কুরে উঠিছে গগনে

শব্দ—যেন বাতাহিত সাগর-গর্জনে ।

ভই আসে রাজরথ বিচিত্রগঠন !
 শত কণ্ঠ জয়নাদে ধনিল গগন ।
 গাগরী ভরিতে জলে,
 গ্রাম্যবালা ষাটে চলে,
 সরল হঠাৎ বেহে লাবণ্য মোহন,
 সঙ্কোচ-বিহীন-দৃষ্টি-নীল-দ্বন্দ্বনন ।
 জয়নাদ শুনি' পথে ফিরিল চকল :
 দেখিল, ঘিরিছা রথ চলে সেনাদল,
 রথে সিংহাসনে বসি'
 পূর্ণিমার পূর্ণ-লক্ষী,
 উন্নত ললাট গৌর, কৃত্তিক কুন্তল,
 ক্রীটে হীরকদীপ্তি—উজ্জ্বল—তরল ।
 চলি' গেল রাজরথ । রাজার কুমার
 বারেক ফিরাল মুখ । জনতা আবার
 উচ্চারিল, “জয় ! জয় !”
 ধনিল আকাশময়
 বিশাল বিপুল ধনি । গৃহে যে যাচার
 জনতা মিশারে গেল : শূন্য গৃহদ্বার ।
 কিশোরী ফিরিল একা লটুয়া গাগরী,—
 আনিতে 'ভটিনী'র লুপ্ত কুন্ত ভরি' ।
 তখন বকল-শাণে
 কোকিল কহরি' ডাকে,
 রক্ত রবি চিতা রচে মেঘের উপরি ।
 একাকী চলিলা বালা—ভরিতে গাগরী ।
 [২]
 বহু দেশ ভ্রমি' ঘুরে রাজার কুমার
 চিত্তে জাগে সেই মুখ গ্রাম্যবালিকার :
 সেই যে চলিতে রথে
 চকিতে হেরিল পথে,—
 নয়নে সরল দৃষ্টি বালা স্নানকুমার !
 চিত্তে জাগে সেই মুখ গ্রাম্য বালিকার ।

৩
আর্য্যাবর্ত ।

তা'র সে তরল চুটি--সৌরভের মত
হৃদয়ে জড়াবে রহে । ডাবে অবিরত

"সে ছাড়া সকল স্তম্ভ

কেবল অসহ দুখ,

জীবন কেবল জ্বালা ।" তুলি,—ডাবে মত
শব্দ উত্তর করে উঠে সেই মুখ তত ।

সে যেন কেবল শান্তি বত কামনার,
প্রেমের লতিকাবুকে নন্দনমন্ডার ।

দূরত্বের কুহেলী-জাড়ে

নাধুরী কেবল বাড়ে ।

সে ছাড়া জীবন, ডাবে, যাতনার ভার ।

চিত্তে জাগে সেই মৃৎ গ্রাম্যবালিকার ।

দেশ 'হিম' রাজপুর্য কিরিল নগরে
সেথা হেরে শত শোভা চিত্তে নাহি পরে ।

ডাবে, "যদি তা'রে পাই

রাষ্ট্রঋণ নাহি চাই,

তুচ্ছ করি' নাই সব অবহেলাভরে,

স্বপ্ন ত এসেছি ফেলি'—কোথা সে নগরে ?"

সোণার পালকে হরে রাজার নন্দন ।

আদেশের প্রতীক্ষায় দাস-দাসীগণ

সদা ব্যগ্র হয়ে রহে,

কাহারে কিছু না কহে,

হৃদয়ে গোপন রাখে হৃদয়-বেদন—

গ্রাম্য পথে দৃষ্ট সেই সোণার স্বপন ।

ডাবে, "যদি পারিতাম তটিনীর কূলে
রচিত কুটীরখানি ত্রানতরুন্মূলে,

অধর' পরশে তা র

বধূব্রিত এ সংসার,

বনফুল তুলি' তা র পরাতাম কূলে,

তা'রে বৃকে লয়ে সব বৃহিতাম কূলে ।

“পাশাপ পাশাপপুর বিলাসের ঘর
 কারাগৃহে বদ্ধ করি’ রাখে নিরঙ্কর।
 তটিনীর কলতান,
 বিচরণের মণুগান,
 অসংসৃত কেশবাসে প্রকৃতি স্তম্ভর—
 স্থপ ত এসেছি ফেলি’ তার সহচর !
 “কেন পাপ ব্যবধান নাহে ত’জন্য
 প্রকৃতির স্রোতস্রোতে বাধার বিস্তার ?
 পিপাসিত প্রাণ টানে,
 নানব ক্রিয়ায় আনে,
 হ্রদিলে রচে শুধু উৎস বেদনার।”
 চিত্তে ভাগে সেই মূগ গ্রাম্যবান্ধব।
 [৩]
 ভল লয়ে গ্রাম্যবালা গৃহে ফিরে তার,
 নিশাধ গাণদীভনে নৈয়নের দার।
 সেটে সে চলিতে পথে —
 দেখেছিল, বসি’ রথে
 কনককিরীটে ধরে রাজার কুমার,—
 চলেছে সৈনিক শত বিরি’ চারিদার।
 কিস্রীটে হীরকলীপি করে কলমল—
 মধ্যাজ গগনে ঘেঁষে স্বর্গা সনুজল !
 রাজপুত্র পতি যার
 না জানি কি স্থপ তার,
 চরণে লুটায় তার অবনীমণ্ডল !
 গ্রাম্যবালা স্বপ্ন দেখে প্রাসাদ কেবল।
 শত শত দাস-দাসী আজ্ঞা-প্রতীকার
 উত্তিতে মনের ভাব জানিবারে চায়
 কেহ বা ব্যজন করে,
 কেহ বা চান্ন ধরে,
 অসাধ্যসাধন হয় সূমাস্ত ইচ্ছায় —
 কাহনার নোঙ্কদ্যুম সেই অমরায় !

চারিদিকে দেখে চাতি উদাস-নয়নে —
 শত শোভা দুল হেন লাগে তার মনে
 “তরলতা পত্রফুলে
 মানব কেমনে হুলে ?
 বহুর মাধুরী নাই বিচল-কুঞ্জে ।
 নগরে সকল সুখ — সুখ নাই বনে ।
 দুল্লভ ঘরে একা শুয়ে মাধবী নিশায়
 গ্রামাবলা ভাবে, “সুখ পল্লিতে কোথায় ?
 প্রাসাদে পাখান-বরে
 সুখ সুখে বাস করে,
 যেথায় বিলাসস্রোতঃ উছলিয়া যায়,
 দূতীরে খুঁজিলে সুখ মিলিবে কোথায় ?
 “লভিতাম চন্দ্ৰ হস্তি নৃপতির হরে
 রাজপুত্র লয়ে যেত রাজতরুণরে
 বাক্তিত বিলাসে দুর্লভ
 কেটে যেত দিনগুলি,
 ধরণী দাসীর মত পূরিত আদরে
 যে সাধ উঠিত তবে রাণীর অন্তরে ।”
 “সুবর্ণে আলোকপাণি গুলকে উজ্জল ।”
 গ্রামাবলা ভাবে আর নেত্রে আসে জল ।
 গাগরী ভগ্নিতে ভলে
 নিভা দেউ পথে চলে,
 আপন অদৃষ্টে রুধি বিজ্ঞানে কেবল ।
 দেউ কথা করে সদা হৃদয় চঞ্চল
 “কেন পাপ ব্যবধান মাঝে দু’জনায়,
 প্রকৃতির স্রোতোমুখে বাধার বিস্তার ?
 পিপাসিত প্রাণ পরে
 বারিবিন্দু নাহি ঝরে,
 হৃদয়ে কেবল জ্বালা, বাতনার ডায় ।” *
 গ্রামাবলা স্বপ্ন দেখে রাজার কুমাৰ ।

জাশিন, ১৩২১।

উমেশচন্দ্র দত্ত।



উমেশচন্দ্র দত্ত।

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত ।

দীনবন্ধু মিত্রের 'স্বরণী কাবে' কৃষ্ণনগরের কথা কবি বলিয়াছেন—

“কৃষ্ণনগরেতে আছে কালের স্রব্দ,

বিদ্যাবিশারদ তার শিক্ষকনিকর,

এ কালের একবার উমেশ-প্রভাব

উঠেছিল সর্বোপরি বিদ্যাপ্রদীপায় ।”

এ দেশে ঈশ্বাকী শিক্ষাপ্রবর্ত্তনের প্রারম্ভকালে যাহারা প্রতীচা জ্ঞানভাণ্ডার হইতে রত্নরাজি সংগ্রহ করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন, শ্রীশ্রী উমেশচন্দ্র দত্ত তাঁহাদের অন্যতম । যে দেশে কহুর বিবাহ-পাত্র পিতা বিনাট প্রার্থনা করেন— যে দেশে নৃপতির অপেকাও বিদ্বান্ সনাদিত, সে দেশে যে উমেশচন্দ্রের কথা সনাদিত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই ।

কৃষ্ণনগর ঈশ্বাকী শিক্ষার প্রবর্ত্তনকালে শিক্ষাকেন্দ্ররূপে বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল । কৃষ্ণনগরই উমেশচন্দ্রের পৈতৃক বাসস্থান । তথায় ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ১৮ই জুন তারিখে বৈষ্ণবপরিবারে উমেশচন্দ্রের জন্ম হয় । তাঁহার পিতা ভূগোপলাল ২৭ পরগনায় চাকরি করিতে গিয়াছিলেন কিন্তু অতিরিক্ত দায়িত্ববশত অর্থ-সঞ্চয় করিতে পারেন নাই । উমেশচন্দ্রের দুই বৎসর বয়সে ভূগোপলালের মৃত্যু হইলে পরিবারে দারিদ্র্যঃপন্ন হইল । বিধবা জননী যে কথখানি অলঙ্কার ছিল, সে কথখানির বিক্রয়লব্ধ অর্থ কোনরূপে দিনাতিপাত হইতে লাগিল । উমেশচন্দ্রকে হরীদ্বারী সেরেত্তার চাকরী করিতে দেওয়া হইবে বলিয়া রঘুনাথ রায় মহাশয়ের গ্রাম পাঠশালায় শিক্ষালাভার্থ প্রেরণ করা হইল ।

পাঠশালায় উমেশচন্দ্রের প্রতিভার গুরুমহাশয় এমনই প্রীত হইলেন যে, বৎসকালে রাত্তার জল দাড়াইলে তিনি বয়ঃ আসিয়া ছাত্রকে স্বন্ধে তুলিয়া বহিয়া দাউতেন ও ফিরাইয়া দিয়া দাউতেন ।

প্রথম হইতেই দারিদ্র্য উমেশচন্দ্রের বিদ্যালোভের পক্ষে বিনম্র বাধারূপে উপস্থিত হয় । গ্রাম পাঠশালা হইতে তিনি যখন শিবপ্রসাদ স্বলে ভর্ত্তি করেন, তখন গৃহে অন্নভাব । বিধবা ভগিনীর শেষ সম্বল অলঙ্কারগুলিও বিক্রয় করিতে হইল তবুও সংসার চলে না । এত ভগিনী চরকায় হুতা কাটিয়া দাঁলে প্রায় দুই টাকা উপার্জন করিতেন । কয় মাস চেষ্টা করিয়া তিনি চারি আনা সঞ্চয় করিলেন ।

সেই পরবার উমেশচন্দ্রের ঈশ্বরার্জী প্রথম শিক্ষা পুস্তক জ্যোত হইল। স্বীয় চেষ্টায়—
 অপরের সাহায্যের অপেক্ষা না রাখিয়া উমেশচন্দ্র এই পুস্তক পাঠ শেষ করিলেন;
 কিন্তু অর্থভাবে আর কোন পুস্তক কিনিতে পারিলেন না। অন্তোপাস হইয়া
 তিনি পাঠ্য পুস্তক নকল করিয়া পাঠ করিতেন। গৃহে ভ্রাতা রাপিবাস সজ্জিত নাট—
 বতরং বালক উমেশচন্দ্রকে নিবাত্তাগে নানা কাম করিতে হইত। কায়েট উহার
 পক্ষে শাস্তিকালে পাঠ ব্যতীত গত্যন্তর ছিল না। কিন্তু তৈলের পরমা সংগ্রহ হইবে
 কিরূপে? অগত্যা উমেশচন্দ্র সতীর্থদিগের গৃহে বাড়িয়া তাহারিগের দীপালোকে
 পাঠ করিতে প্রয়াস পাঠতেন। এই সতীর্থদিগের অনেকে আবার তাহার সাক্ষ্যে
 ঈশ্বরিত হইয়া উহাকে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিত। যাহা হউক, ঘরে ঘরে
 পুরিদা, ত্রিনি পরের ঘরে পরের আলোকে পাঠ করিয়া ভবিষ্যতে জ্ঞানালোক-
 বিস্তারের উপায় করিয়া লইতেন। বিদ্যালয়ে তিনি সৰ্বপ্রথম স্থানই অধিকার
 করিয়া থাকিতেন।

কিন্তু এত কষ্ট সহ্য করিয়া বিদ্যালিকা করাও অত্যন্তকালমধ্যে অসম্ভব হইয়া
 উঠিল। গৃহে অরের অভাব প্রবল হইল। মাতার ও ভগিনীর অলসতার বিক্রীত চট-
 চণ্ডে—আর কোন সঞ্চয় নাই। এই সময় যে দুর্দশার আরম্ভ, তাহা চারি পাঁচ
 বৎসরব্যাপী চটরাছিল। উমেশচন্দ্রকে বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া চাকরীর চেষ্টায়
 করিতে হইল। তাহার ভগিনী দিনান্তে একবার আহ্বারের চক্ষু প্রতিবেশীর গৃহে
 পাচিকার কার্য করিতে লাগিলেন। এক এক দিন তিনি আপনার আহ্বার্য্য ব্রাত-
 গণকে ভাগ করিয়া দিতেন। তখন দিনান্তে একবার আহ্বার ও উহারের পক্ষে
 বিলাস বলিয়া বিবেচিত হইত। এক এক দিন কাহারও আহ্বার হইত না।

এইরূপ দুঃখে দিন কাটিতে লাগিল। উমেশচন্দ্র রেজেটারী আফিসে দলিলাদি
 নকল করিয়া সময় সময় চট চারি আনা উপার্জন করিতেন, আর তাহার এক জন
 আত্মীয় সময় সময় উচ্চাধিকারে দুই চারি আনা দিয়া সাহায্য করিতেন। শেষে
 তাহার আর এক জন আত্মীয় উমেশচন্দ্রকে মধ্যে মধ্যে নকলের কাম জোগাড়
 করিয়া দেওয়ার পরিবারের অগ্রসংস্থানের উপায় হইল।

এইরূপ অবস্থার উমেশচন্দ্র যে কোনরূপে উন্নতিসাধ করিতে পারিবেন, তাহা
 কেহ করনাও করিতে পারেন না। কিন্তু দারুণ দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম—
 অনাহার, অমাহার—উপেক্ষা ও অপমান—কিন্তুতেই উমেশচন্দ্রের জ্ঞানার্জন পূরা
 নষ্ট করিতে পারিল না। তিনি একদিন সহকারী ম্যাজিস্ট্রেট মিটার (পরে সার)
 ডাল'স হুবাউসের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আপনার অবস্থা জানাইলেন ও শিক্ষা-
 লাভের জন্য অর্থসাহায্য প্রার্থনা করিলেন। মিটার হুবাউস বালকের সরল ব্যব-

চারে ও জ্ঞানভূমির মুক্ত হইয়া উঠার বিজ্ঞানগণের বেতন ও পুস্তকের মূল্য দিতে বীৰত্ব চট্টলেন।

এ দিকে উমেশচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ ও কবিরাজী করিয়া কিছু কিছু অর্থ উপাৰ্জন। করিতে লাগিলেন। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে উমেশচন্দ্র নবপ্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণনগর কলেজে প্রবেশ করিলেন। তিনি এট কলেজের ছাত্রদের জ্ঞানরসি পত্রীকাপী ছাত্রদিগের প্রথম মনোভূক্ত।

মিষ্টার হবহাউসকে অধিক দিন উমেশচন্দ্রের শিক্ষার বাধভার বহন করিতে চট্ট নাই। বৎসর মাস পরেই উমেশচন্দ্র জ্ঞানরসি পত্রীকা দিলেন ও পত্রীকায় উত্তীর্ণ ছাত্রদিগের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান অধিকৃত করিলেন। তখন তিনি ছাত্র-বৃত্তি ও বিনাবেতনে পাঠের অধিকার লাভ করিলেন।

কলেজে সতীর্থদিগের মধ্যে ঈশ্বরাজী সাহিত্যে তাহার মত জ্ঞান আর কাহারও ছিল না। তিনি সেক্সপীরের রচনা এমন ভাবে আবৃত্তি করিতে পারিতেন তাহার 'মার্চেন্ট অব ভেনিসের' একাংশের আবৃত্তি শুনিয়া ক্যাপ্টেন রিচার্ডসন তাহাকে ৫০ পূর্ণ সংখ্যার মধ্যে ৬০ দিয়াছিলেন! অথচ তখন উমেশচন্দ্র যে জ্যেষ্ঠে অধ্যয়ন করেন, সে জ্যেষ্ঠ ছাত্রের পক্ষে সেক্সপীরের রচনাপাঠ দুঃসাধ্য। তাই অধ্যাপক রিচার্ডসন তাহাকে পূর্ণ সংখ্যারও অধিক দিয়াছিলেন। রিচার্ডসন স্বয়ং সেক্সপীরের রচনার এমন ক্ষমতা আবৃত্তি করিতেন যে, তাহার আবৃত্তি শুনিয়া লর্ড মেকলে একবার বলিয়াছিলেন, তিনি ভারতের সব কুলিতে পারিবেন, কিন্তু রিচার্ডসনের সেক্সপীরের রচনার আবৃত্তি কুলিতে পারিবেন না। উমেশচন্দ্রের সেক্সপীরের শ্রীতি অসাধারণ।

প্রথমে কৃষ্ণনগর কলেজ স্থানীয় ব্যক্তিদিগের তত্ত্বাবধানাধীন ছিল এবং কলেজের পত্রীকাও কলেজের ছাত্রদিগের মধ্যে নিবন্ধ থাকিত। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে সরকারের সেক্রেটারী মিষ্টার (পরে সার) সিসিল বিডনের চেষ্টায় মফঃস্বলের সকল কলেজট কাউন্সিল অব এডুকেশনের তত্ত্বাবধানাধীন হয়। মিষ্টার বিডন সকল কলেজের ছাত্রদিগের জন্য একই পরীক্ষার ব্যবস্থা করিতে চাহিলে কাউন্সিলের সদস্যদিগের মধ্যে কেহ কেহ এই বলিয়া আপত্তি করেন যে, মফঃস্বলের কোন কলেজের ছাত্র কিছু কলেজের ছাত্রদিগকে প্রতিযোগিতা-পরীক্ষার পরাস্ত করিতে পারিবে না। উমেশচন্দ্রের সাক্ষ্যে তাহাদিগের নৃত্তি খণ্ডিত হয়। উমেশচন্দ্র পরীক্ষার প্রথম স্থান অধিকৃত করিয়া রচকোর্ড বেডেল লাভ করেন। ইহাতে কাউন্সিলের সভাপতি মিষ্টার বেথুন এত প্রীত হইয়াছিলেন যে, তিনি সাক্ষ্যদোষাগাসম্পন্ন ছাত্রদিগকে স্বয়ং পুনরায় দ্বিবার্ষিক ভুক্ত আর দুই জন সদস্যকে (মিষ্টার বিডন ও ডাক্তার মোরট) সঙ্গে

পট্টা কৃষ্ণনগরে গমন করেন। উন্মেষচন্দ্র এই পরীক্ষার কেবল সে ব্যতীত সন্মান লাভ করিয়াছিলেন, তাহাই নহে; পরন্তু তাহার কলেজকেও সম্মানিত করিয়াছিলেন— বশিরা মিটার বেধন তাহাকে অভিনন্দিত করেন। কিন্তু তখনও কলিকাতা হুইতে পুরস্কার আসিয়া পৌঁছে নাই। তাই কলেজ পরিষদের অঙ্গতন সমস্ত মহারাজা ক্রীশচন্দ্র সার করদিন পূর্বে স্বীয় ব্যবহারার্থ ক্রীত বহুমূল্য শাল উন্মেষচন্দ্রকে উপহার দেন। তৎকালে বিশেষ রাজকর্মচারীগণের মত দেশের ধনীরাও বিজ্ঞা-বিস্তারবিষয়ে কিরূপ উৎসাহী ছিলেন এই ঘটনার তাহা বুঝা যায়। মহারাজা ক্রীশচন্দ্রের এই কার্য— “ভারতীর রাজধানী— ক্ষিতির প্রদীপ” নবদ্বীপের মহা-রাজেরই উপযুক্ত কার্য হইয়াছিল— সন্দেহ নাই।

পরবৎসর (১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দ) উন্মেষচন্দ্র সিনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষার সর্বোচ্চ স্থান অধিকৃত করেন। সে বৎসরও পূর্ববৎসরের মত আর হুই জন সমস্তকে সঙ্গে লইয়া কাউন্সিল অব এডুকেশনের সভাপতি মিটার বেধন কৃষ্ণনগরে গিয়া পুরস্কার বিতরণ করেন। সেবার তিনি বলেন— “এক বৎসর পূর্বে আমি এই কলেজে আসিয়াছিলাম। তখন আমি তোমাদিগকে বলিয়াছিলাম যে, আমি কলিকাতার কলেজের ছাত্রদিগকে বলিয়া আসিয়াছি— তাহারা অত্যন্তকালমধ্যে মক্খল কলেজে প্রবল প্রতিযোগী দেখিতে পাইবে— কবেই বিশেষ সেরা ব্যতীত তাহারা আপনাদিগের প্রাধান্য অক্ষর রাখিতে পারিবে না। কৃষ্ণনগর কলেজ যে এত অল্প দিনেই আমার ভবিষ্যদ্বাণী সকল করিয়াছে, ইহার জন্য আমি এই কলেজকে অভিনন্দিত করিতেছি। গত বৎসর তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ছাত্র পঞ্চম স্থান লাভ করিয়া ছিলেন, এবার তোমাদের অগ্রণীত সর্বোচ্চ স্থান লাভ করিয়াছেন। আমি উন্মেষ-চন্দ্র দত্তকে পুনরায় অভিনন্দিত করিতেছি। তিনি ব্যতীত সন্মান লাভ করিয়াছেন, যে শিক্ষকদিগের শিক্ষাওণে তিনি এই উচ্চ স্থান অধিকার করিতে পারিয়াছেন— তাহাদিগকে সম্মানিত করিয়াছেন এবং যে কৃষ্ণনগর কলেজের সকল ছাত্রই আজ তাহার সাক্ষ্যে সহায়ক হইয়াছেন, সেট কলেজকেও সম্মানিত করিয়াছেন।”

এই পরীক্ষায় ইংরাজী নৌথিক ৩৫নং উন্মেষচন্দ্র ৭০ শের মধ্যে ৫৭ পাইয়া-ছিলেন। পরবৎসর তিনি লাইব্রেরী পরীক্ষায় পূর্ণসংখ্যা পাইয়া স্বর্ণমেন্ডেল লাভ করেন। তখন বঙ্গদেশের সর্বত্র তাহার বিজ্ঞার কথা ব্যক্ত হইয়া পড়ে।

উন্মেষচন্দ্রের ছাত্রজীবনের একটি ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বশোহর জেলার জোগাড়া গ্রামবাসী অধিকাচরণ ঘোষ উন্মেষচন্দ্রের সতীর্থ ও বন্ধু ছিলেন।

অধিকাচরণ ও অলশারণ প্রতিভার অবীক্ষণ ভিগেন । ১৮১০ খৃষ্টাব্দে অধিকাচরণ দাক্ষিণ্য বসন্তুর্বাণিত পীড়িত হইলে উমেশচন্দ্র স্বজনগণের নিবেদন না মানিয়া প্রতি দিন সঙ্কট বন্ধুগৃহে আসিতেন ও সমস্ত রাত্রি বন্ধুর শয্যাপার্থে থাকিতেন । তাঁহার স্বজনগণ শেষে অন্ত্রোপায় হইয়া তাঁহাকে পৃথমধ্যে আবিষ্কৃত করিয়া রাখিলে উমেশচন্দ্র ঘরের বেড়া কাটিয়া পলাইয়া বন্ধুর নিকট উপস্থিত হইলেন । এই দারুণ ব্যাধিতেই অধিকাচরণের জীবনান্ত হয় । তাঁহার অববহিত পরেই উমেশচন্দ্রের প্রবল অর হইগে সকলেই আশঙ্কা করেন, তাঁহারও বসন্ত হইবে কিন্তু তাহা হয় নাই । উমেশচন্দ্রের বন্ধুবাংসলোর উল্লেখ করিয়া মিটার বেথুন বলিয়াছিলেন, তাঁহার কানতলা ও বন্ধুবাংসলা কোন্টার ভক্ত তিনি অধিক প্রশংসাত, তাহা স্থির করা চক্কর । আমানতের কিছু মনে হয়, বিজ্ঞান গৌরব অপেক্ষা এই বন্ধুবাংসলোর গৌরবই অধিক ইহা প্রকৃত মন্তব্যের নিদর্শন । যে উদারতা মাত্রের দেবভাবব্যাক্ত ও বিকাশক তাঁহারই পরিচায়ক । উমেশচন্দ্রের মত বিদ্যালাত চম্ভ—কিন্তু এক্ষণ বন্ধুবাংসলা আরও চম্ভ ।

পরীক্ষার উদ্দেশ্যেই দাক্ষিণ্য আকৃষ্ট হইয়া কাউন্সিল অব এডুকেশনের সম্পাদক কাস্টেন হেন্স তাঁহাকে শিক্ষাবিভাগে চাকরী দিতে চাহেন ও মাসিক এক শত টাকা বেতনে চট্টগ্রাম স্বাদের দ্বিতীয় শিক্ষক নিযুক্ত করেন । উমেশচন্দ্রের আর্থিক অবস্থা তখনও শোচনীয়—কর বৎসর প্রধানতঃ তাঁহার ছাত্রগুণিতেই সংসার চলিয়াছে, কার্যেই তিনি এই চাকরী গ্রহণ করিলেন ।

চট্টগ্রামে শিক্ষকরূপে তিনি বিশেষ স্তম্ভাতি লাভ করিয়াছিলেন । কিন্তু তথার তাঁহাকে অধিক দিন থাকিতে হয় নাই । কখনাস পরেই তিনি কক্সনগর কলেজের দ্বারা বদলী হইয়া আসিয়াছেন । কক্সনগরে ফিরিবায় সময় পথে সংঘটিত একটি ঘটনা উমেশচন্দ্রের স্বভাবের সঙ্গুণের পরিচায়ক । তখন এ বেশে রেলপথ কেবল সংগঠিত হইতেছে চট্টগ্রাম পালকোতে ১৬ দিনের পথ । উমেশচন্দ্র পাঠ্যে আসিতেছিলেন, ভ্রাতৃ সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছিল । ছাদশ দিবসে ভ্রাতৃ পীড়িত হইলে প্রত্ন তাঁহাকে পাঠ্যে তুলিয়া দিয়া স্বয়ং অবশিষ্ট পথ পদব্রজে অতিক্রম করেন । একপ বালহার সকল ঘেষ্টে বিরল । উমেশচন্দ্র জীবনে বহু লোককে দ্বিগুণে সাহায্য করিয়া বিপন্ন কহিয়াছেন—অনেককে অনেক প্রকারে সাহায্য করিয়াছেন কিন্তু তাঁহার দানের কথা কখনও প্রচার করেন নাই । তাই অনেকে তাঁহার দানের বিষয় অজ্ঞাত নহেন ।

কক্সনগর কলেজে ছাত্রগণ তাঁহার শিক্ষাদান-প্রণালীতে আকৃষ্ট ও উপকৃত হইতে লাগিল । সকলেই তখন এই শিক্ষকের প্রশংসা করিতে লাগিলেন ।

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে উমেশচন্দ্র হেডমাষ্টার হইয়া ঢাকায় বদলী হইলেন। পরবৎসর তিনি পুনরায় কৃষ্ণনগর কলেজে আসিলেন। এই কলেজেই তিনি ক্রমে অধ্যাপকের পদে উন্নীত হইয়া শিক্ষাবিভাগের উচ্চ শ্রেণীতে (Higher Grade Bengal Education Service) প্রবেশ করেন।

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি কৃষ্ণনগর কলেজে ইংরাজী ও ইতিহাস—দুই বিষয়ের অধ্যাপনা করিতেছেন। দুই বার তাঁহাকে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে ইংরাজীর অধ্যাপক নিয়োগের প্রস্তাব হয়—দুই বারই কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যাপকের আপত্তিতে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যত হয়। একবার অধ্যাপক নব আঁর একবার অধ্যাপক বেপত্রিচ তাঁহার অসুস্থ গমনে আপত্তি করিয়া বলেন, তাঁহার কার্যঃ ইংলণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত দুই জন অধ্যাপক ব্যতীত চলিবে না।

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে কটকে রাভেন্সা কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু তিনি দুই বৎসরের ছুটি লইয়া ছুটির শেষে অন্ততানিবেদন কর্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

উমেশচন্দ্র বরাবরই সর্কবিষয়ে নিয়মাহুগ ছিলেন। সম্ভবতঃ সেই জন্তই তিনি অসংখ্য স্বস্থ শরীরে স্বাস্থ্যস্ব উপভোগ করিতেছেন। তাঁহার চিত্তের দৃঢ়তা, বিচার-ক্ষমতা ও কর্তব্যনিষ্ঠারপতংপরতা আজও অব্যাহত আছে। পঠকশায় যে তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তির বলে তিনি একবার বা দুইবার শুনিয়াই দীর্ঘ রচনা অনায়াসে মুখস্থ করিয়া ফেলিতেেন, সেই স্মরণশক্তি বার্ষিকের পূর্বে হয় নাট।

আজও পাঠে তাঁহার পরম আনন্দ। অত্যন্ত কাল পূর্বেও তিনি ইংরাজী সাহিত্য, ইতিহাস ও অঙ্কশাস্ত্র—এই সকল বিষয়ক পুস্তকপাঠে ব্যাপৃত থাকিতেন। এখন দৃষ্টিশক্তিগ্ন কীণতাপ্রযুক্ত তিনি আর বয়ঃ পুস্তকপাঠ করিতে পারেন না। এখন তাঁহার পুস্তকগণ তাঁহাকে পুস্তক পড়িয়া শুনান।

অধ্যাপকের কার্যভাগের পর তিনি অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটের ও কৃষ্ণনগর মিউনিসিপালিটির ভাইস-চেয়ারম্যানের কার্য করিয়া লোকের প্রশংসা-ভাজন হইয়াছেন।

তিনি তাঁহার পরিভ্রমণে পরিবেষ্টিত হইয়া তাঁহার কৃষ্ণনগরস্থ ভবনেই বাস করেন। জ্ঞানার্জনে ও জ্ঞানবিস্তরণেই তাঁহার জীবন অতিবাহিত হইয়াছে; বিজ্ঞাই তাঁহাকে সুখ, সম্পদ ও সম্মান দান করিয়াছে।

প্রতিশোধ ।

(বিন্মতের আত্মকাহিনী ।)

সপ্তম পরিচ্ছেদ ।

লক্ষ্যপূর্ণ তরুণী মত আমি পথে পথে পুরিতা বেড়াইতে লাগিলাম । সে দিন-টার যেন আর কিছুতেই অবসান হইতে চাচে না । মজামারীর ডায়ে অধিকাংশ খনবান্ ব্যক্তিই সত্বর পরিত্যাগ করিয়াছিলেন যে ছই এক জন ছিলেন, তাহারাও বড় ঘরের বাহির হইতেন না । তাই পথে বড় কোন পরিচিত লোকের সঙ্গিত সাক্ষাৎ হইল না । ব্যাধির অত্যাচার সর্বত্র পরিলক্ষিত হইতে লাগিল । মদান-বাত্রীদিগের উচ্চ কলরব ও আত্মীয়-বন্ধনের আকুল ক্রন্দন আমাকে বড়ই বাধিত করিতে লাগিল । এক স্থানে একটা ক্ষুদ্র শবাধারে কতকগুলি লোক একটা অস্বাভাবিক মৃতদেহ প্রদর্শিত করাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছিল । তাহাদের নিশ্চয় অত্যাচারে আমার ক্রন্দন কাদিয়া উঠিল । মৃতের পদদ্বয় সজোরে মৃতকের দিকে আকৃষ্ট করার তাহার নেচের সমস্ত অঙ্গিগুলি যেন মড় মড় করিয়া উঠিল ! আমি ভিজাসা করিলাম, “এ ব্যক্তি যথার্থই মৃত কি না, তাহা কি একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিরাছ ?” তাহারা আমার এই অকৃত জ্ঞানে হাস্ত করিয়া উঠিল ; আমাকে বিহ্বল করিতে লাগিল ; অসাড় প্রত্যক্ষণেওঁর জ্ঞান মৃতের মস্তককে সেই শবাধারের পার্শ্বে বায়ংবার আঘাত করিতে লাগিল । আমি বাধিত অন্তরে সত্বর সে স্থান পরিত্যাগ করিলাম । কিরদূর অগ্রসর হইতেই কতকগুলি কৌতূহলাক্রান্ত লোকের সঙ্গিত আমার সাক্ষাৎ হইল । তাহারা অত্যন্ত ঘরে কি জানি কি আলাপ করিতেছিল । তাহাদের সমবেত দৃষ্টি কাহার প্রতিপক্ষ করিতেছিল । আমি সে স্থানে উপনীত হইবার অল্পক্ষণ পরেই এক জন বলিয়া উঠিল, “ঐ যে মহারাজ এ দিকেই শুভাগমন করিতেছেন ।” তখন সকলের নেত্র সেই দিকে পতিত হইল । আমি দেখিলাম, সমগ্র ইটালীর সম্মানের পাত্র সয়াট হাম্‌বাট করেকজন ভূতলোক

সমভিব্যাহারে সেট পথে পদব্রজে আগমন করিতেছেন। তাঁহার উদার হৃদয় প্রচার বেদনার ব্যাপিত হইয়াছিল। তিনি ব্যাধিপ্রসীড়িত প্রদেশসমূহ যথঃ পর্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। আমি মৃত্যুর টুপী উত্তোলিত করিয়া তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করিলাম। তিনি সন্নিহিত-বন্দনে আমার দিকে তাকাইলেন; সমভিব্যাহারী জনৈক পার্শ্বচরকে বলিলেন, “চিত্রপটে অঙ্কিত তত্ত্বকেশধারী মন্ত্রজীবীর স্থায় এই মন্ত্রজীবীকে কেমন স্থলয় দেখাইতেছে!” এমন এক দিন ছিল—যখন প্রতিবৎসর আমি হোমে আগমন করিতাম, যখন প্রাসাদের সকল উৎসবে আমি নিমন্ত্রিত হইতাম। আজ আমার সেট চিরচিহ্নিতধী সন্ধ্যাট আমাকে চিনিতে পারিলেন না দেখিয়া আমার হৃদয় কেমন ঢকল হটল আমার ইচ্ছা হইল, তাঁহার পদপ্রান্তে পতিত হইয়া আশ্রয়-পরিচর প্রদান করি; সকল কথা তাঁহার নিকট ব্যক্ত করি। পরব্রহ্মে মানাবিধ চিন্তা আমার হৃদয়কে অধিকৃত করিল আমি সে কার্যে বিরত হইলাম। তথাপি কি এক আকস্মণে আরুঠে হইয়া আমি বহু দূর পর্ণাস্ত্র সন্ধ্যাটের অভ্যগমন করিলাম। সন্ধ্যাট প্রশান্তহৃদয়ে কত মুমূর্ষু গৃহে, কত মৃতের সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন; কত শোকাকুল নরনারীকে সাহুনা প্রদান করিলেন; কত ভীত ও নিরাশ হৃদয়ে আশার ও উৎসাহের সঞ্চার করিলেন কত শীন-নরিককে অর্থদান করিলেন। তাঁহার করুণ হৃদয় সকলের শ্রদ্ধা ও ভক্তি আরুঠে করিল। কত ঘেরমটী জননী আপন শিশু অঙ্গে লইয়া জ্ঞানুপবিষ্ট হইয়া কাতরভাবে তাঁহার আশীর্বাদ প্রার্থনা করিতে লাগিল। কত লোক আসিয়া তাঁহার চরণ স্পর্শ করিতে লাগিল। তিনি জানিতেন, মায়ুষের এ সকল বিপদে ভগবান্ বাতীত আর কেহই উদ্ধার করিতে পারে না, তথাপি তিনি তাহাদের এই উচ্ছ্বাসে বিচলিত হইয়া তাহাদিগকে আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন। এক রমণী আশ্রয়িত কুন্তলে অন্তর্কীর্ণভাবে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল তাঁহার চরণপ্রান্তে পড়িয়া বারংবার তাঁহার পদচুম্বন করিতে লাগিল ও পূর্ণ বিশ্বাসভরে বলিতে লাগিল,—“আমি আজ হইতে সম্পূর্ণ নির্যাপন হইলাম। সন্ধ্যাট বে স্থান বিহীন গমন করিয়াছেন, ব্যাধি সে স্থানে কিছুতেই আগমন করিতে সমর্থ হইবে না।” সন্ধ্যাট তাহার সরল বিশ্বাসে সন্তুষ্ট হইলেন; পিতার স্থায় বিশ্ব দৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইতে লাগিলেন। এইরূপে কিছু দূর অগ্রসর হইলে এক স্থানে দেখা গেল, কতকগুলি লোক একত্র হইয়া বড় গোল করিতেছে। তই তিন জন লববাহক পক্ষ-বাক্যে কাহাকে যেন তিরস্কার করিতেছে; কতকগুলি দ্বীলোক আশ্রুল ক্রমেনে চতুর্দিক্ নির্যাপিত করিতেছে। তাহাদের মধ্যস্থলে

একটা শূক্ৰ শব্দধারি যেন শব্দের প্রতীক্ষা করিতেছিল। তাহার চনৈক সহচর একটু অগ্রবর্তী হইয়া তাঁহার আগমনবার্তা প্রচার করিলে সে কলরব শব্দ হইল, রোক্তমান রমণীরা রোমন সংবরণ করিল, কলহকারী পুরুষগণ মস্তকের টুপী তুলিয়া সম্রাটকে সম্মানপ্রদর্শন করিল। রাজা ব্যাপার কি, জানিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলে শব্দাহকগণ বড়ই লজ্জিত হইল। এ দিকে এক স্থলস্রী যুবতী জনতা ভেদ করিয়া সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার বদন-মণ্ডলে বিদ্যাদের কালিমা—তাহার নেত্রদ্বয় অতিরিক্ত ক্রন্দনহেতু ঈষৎ আনক্ত বলিয়া অশ্রুত হইতেছিল। রমণী দ্বীপে অথচ স্থলস্রী দ্বীপে বলিতে লাগিল :—“মাতা মেরী ও সর্দারাদা দেবতাগণ এই লোকপ্রিয় নৃপতিকে আশীর্বাদ করুন। এই নিম্নজ শব্দাহকগণের অত্যাচার হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবার জন্য আমরা নানাদের দত্ত-জন্য সম্রাটের শরণাপন্ন হইতেছি। ইচ্ছায়া নিবৃদ্ধিতাবশতঃ একটি স্থলস্রীকে যুবকে হত্যা করিতে বসিয়াছে যুবক জিরোতানি তাহার প্রিয়-তনু পত্নীর মৃতদেহ বন্ধে ধারণ করিয়া পড়িয়া রহিয়াছে, সে কিছুতেই তাহাকে পরিত্যাগ করিতে সম্মত নহে। বলপ্রয়োগে তাহার অনিষ্ট হইতে পারে, এই আশঙ্কায় আমরা শব্দাহকদিগকে সামান্য এক ঘণ্টা কাল অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিতেছি। ইত্যবসরে তাহার পিতা এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইবেন ; তিনি এই যুবকে নিশ্চরই সাধনা প্রদান করিতে পারিবেন। ইচ্ছায়া এক ঘণ্টা কাল অপেক্ষা করিলে সকল কার্য স্ফটিকরূপে সম্পন্ন হইবে। সম্রাট আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।”

রমণীর কাতর প্রার্থনা সম্রাটের জন্য আর্পণ করিল। তিনি জনতার মধ্য দিয়া সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার সহচরবর্গও তাঁহার অচসরণ করিল। আমি কিঞ্চিৎ দূর হইতে সেই দৃশ্য অবলোকন করিতে লাগিলাম। কি হৃদয়-বিদারক অথচ মহান দৃশ্য ! সম্রাট স্বয়ং কিংকাল সেট স্থানে অবনত-মস্তকে সজ্ঞারমান রহিলেন। তাঁহার বদনে অস্বাভাবিক গাঢ়ায়া কুটিয়া উঠিল। তাঁহার নয়নদ্বয় অন্ধকারাক্রান্ত হইল।—একখানি শব্দায় চতুর্দিক আলোকিত করিয়া এক অসামান্য রূপসী চির-নিদ্রায় নিমিত্তা : মৃত্যুর করাল ছায়া এখনও যেন তাহাকে স্পর্শ করিতে সন্মুখ হইয়া নাই। তাহার বক্ষে উপরে তাহার প্রেমাস্পদের স্থির অচঞ্চল মূর্তি : মৃত্যু যেন চিরদিনের মত তাহার চৈতন্য হরণ করিয়াছে। তাহার বাহ্যিক যুবতীর গ্রীবা বেষ্টিত করিয়া রহিয়াছে ; তাহার মস্তক বালিকার উন্নত উরসে সংলগ্ন। গৃহের অম্পষ্ট আলোকে সেই করন দৃশ্য যেন আরও করুণ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছিল। দুইটি পুণ্ড্রময়

মানবের সন্নিধানে নরাত্ৰি চিত্ত উন্নতকার টটালীর অধিপতি অবনুত-মন্তকে বণ্ডায় মান—পক্ষাতে অসংখ্য চিত্তাক্রিষ্ট নরনারীর স্তম্ভীর বধন । সে যে কি মহান্দ্রুজ তাহা কি প্রকারে বর্ণনা করিব ?

সেই স্বরূপতা ভঙ্গ করিয়া আশ্রমের পূৰ্ণপরিচিতি। রমনী বলিল, “গত রজনী হইতে ইহারা এই ভাবে পড়িয়া আছে । যুবকের স্মৃদ বস্ত্র নৌহনুওর দ্বায় এই মতাকে বেষ্টিত করিয়া রহিয়াছে । কে এট স্মৃদ বন্ধন ছিন্ন করিবে ?”

নৃপতি সেই হস্তভাগা যুবকের দিকে অগ্রসর হইলেন, তাহার স্বকূলেপে হস্তা-পণ করিলেন । ককনাথ তাহার দ্বার বিগলিত হইয়াছিল ; সহায়কৃতিতে তাহার কণ্ঠের বিকম্পিত হইতেছিল । তিনি অতি কষ্টে বলিলেন, “বৎস, আমার প্রিয় বন্ধু !”—সে স্বর সকলের কর্ণে স্রাব-বর্ণন করিল । রমনীগণের শোকবেগ বর্জিত করিল—তাঁহারা নীরবে অঙ্গ-বিসৰ্জন করিতে লাগিলেন । পুরুষগণের নয়ন-পল্লব সিক্ত হইল । রাজা পুনরায় কম্পিত-কণ্ঠে বলিলেন, “প্রিয়বন্ধু ! তোমার রাজ্য তোমার সম্মুখে বণ্ডায়মান ; তুমি কি তাহার সংবর্দ্ধনা করিবে না ?”

যুবক স্তম্ভোপিতের দ্বায় চমকিয়া উঠিল : স্বীয় পত্নীর বক্ষঃস্থল হইতে মন্তক উন্মোচিত করিয়া মৃদু দৃষ্টিতে রাজার দিকে চাতিয়া রহিল । তাহার বিভ্রম বধন, কক্ষ কেশ, ভীষণ দৃষ্টি তাহার অক্ষনির্ভিত শোকের পরিচয় প্রদান করিতেছিল । সে যেন আশ্চর্য্যজন্য ব্যতীত এ ভীষণ অবস্থা হইতে পরিত্রাণ পাইবার অস্ত্র উপায় পাইতেছিল না ।

“বৎস, হস্ত প্রসারিত কর, তোমার রাজ্য করমর্দন কর ।”—রাজা ধীরে অথচ অল্পজ্ঞার স্বরে এই করটি কথা উচ্চারিত করিলেন ।

যুবক অনিচ্ছার সহিত ধীরে অথচ যেন এক অজ্ঞাত মোহিনী শক্তির প্রভাবে মৃতের গ্রীবা হইতে আপনায় দক্ষিণ-হস্ত মুক্ত করিয়া রাজার দিকে প্রসারিত করিল । নৃপতি দৃঢ়রূপে তাহা ধারণ করিলেন ; তাহার মূখের দিকে চাহিয়া গভীর অথচ সরল বিধাঙ্গের সঙ্গিত বলিলেন, “বৎস, প্রেমের যে বিনাশ নাই, তুমি কি তাহা অবগত নহ ?”

যুবক বিম্বিতমনে তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল । তাহার দৃষ্টির পুরুষ ভাব ক্রমে বিদূষিত হইল ; তাহার নয়ন আর্জ হইল ; সে রাজার হস্ত হইতে নিষ্ক হস্ত মুক্ত করিয়া কক্ষণ ভাবে রোদন করিতে লাগিল । রাজা উভয় হস্তদ্বারা তাহাকে বেষ্টিত করিয়া ধরিলেন ; জনৈক পারিষদের সাহায্যে তাহাকে কক্ষান্তরে লইয়া গেলেন । সে বালকের দ্বায় তাহার অঙ্গসরণ করিল । তাহার অঙ্গধারা প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল ; তাহার জীবনের একটা ভীষণ অবস্থা এইরূপে কাটিয়া

গেল। সহস্র নরনারী সহস্রকর্ণে রাজার ভয়ধ্বনি করিতে লাগিল। তিনি অবনত মস্তকে প্রজার আশীর্বাদ গ্রহণ করিলেন এবং শববাহকদিগকে সহস্র তাতাদের হস্ত-বিদায়ক কর্তব্য সম্পন্ন করিতে ইচ্ছিত করিলেন।

এককালে আপনার কর্তব্য সম্পন্ন করিয়া সহস্র লোকের উল্লাসধ্বনির মধ্যে সম্রাট হাম্বাট স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন। রণবিভট্টী নৃপতিগণ শত্রু-সৈন্য বিধ্বস্ত করিয়া স্তম্ভিত দ্রব্যসম্ভারসহ স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেও বোধ হয়, এতদধিক সন্মানলাভে সন্তুষ্ট হইলেন না। আমি একদৃষ্টে তাহার দিকে তাকাইয়া রহিলাম। তিনি দৃষ্টি-পথের বহির্ভূত হইয়া গেলে আমিও সে স্থান পরিত্যাগ করিলাম। পীড়িতাবস্থায় যে গৃহে আমি কলা নীত হইয়াছিলাম, সেই গৃহখানি রেখিবার ক্ষমতা আমার বাসনা বলবতী হইল। আমি সমস্ত সেই গৃহের দিকে অগ্রসর হইলাম। সে গৃহের দ্বার তখনও উন্মুক্ত ছিল। গৃহস্থানী পিটে। সে দিনও তাহার কাচপাত্র-গুলি পরিষ্কার করিতেছিল : সে দিনও সেই কাষ্ঠাসনখানি সেই অবস্থায় গৃহের পার্শ্বে পড়িয়া ছিল। আমি ইহার উপর নয়ন করিয়া কি দারুণ যোগবশ্যপাই না এক করিয়াছি! সম্ভবতঃ এই স্থানেই আমার মৃত্যু হইয়া থাকিবে। গৃহস্থানী আমাকে চিনিতে না পারিলেও অভিযাদন করিল। আমি তাহাকে প্রত্যভিযাদন করিয়া একখানি চেয়ারে উপবেশন করিলাম : তাহাকে কফি ও রুটী আনিতে বলিয়া একখানি সংবাদপত্র-পাঠে মনোনিবেশ করিলাম। সে কক্ষের পাত্র পরিষ্কার করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি সম্ভবতঃ স্মরণ সমুদ্রযাত্রার পর এই স্থানে আগমন করিয়াছ। এবার মন্ত্র বেচিয়া কিরূপ লাভ করিলে?”

আমি প্রথমে তাহার প্রশ্নের কি উত্তর দিব, বুঝিতে পারিতেছিলাম না, পরে চাসিয়া বলিলাম, “লাভ নশ্চ হয় নাই—তোমার কেমন ব্যবসা চলিতেছে, ভাই? আর, মহামারীর অবস্থাট বা কিরূপ?”

সে বিষমভাবে বলিল,—“মে কথার আর উত্থাপন করিও না; পক্ষপালের স্বাধ দলে দলে লোক প্রতিদিন মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। গত কলা যে দারুণ দুর্ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে, তাহা আর কি বলিব?” এই বলিয়া সে দীর্ঘনিশ্বাস ভাগ করিল এবং আমাকে এক পেয়লা কফি দিয়াই বিমর্ষভাবে বসিয়া পড়িল। সে যে কোন্ দুর্ঘটনার কথার উল্লেখ করিবে, তাহা আমি অচ্যুতানে বুঝিতে পারিলেও তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “কেন, কল্য এমন কি দুর্ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে যে, সে ক্ষণে তুমি এত ত্রিস্রয় হইতেছ? আমি নেপল্‌সে নতুন আসিয়াছি; কোন সংবাদই অবগত নাই।”

পিটের সর্কীয়বব ঘর্ষে সিক্ত ছিল। সে তাহার সিক্ত অনুলীর সাহায্যে

মন্ত্রপ্রত্নরাক্ষাসিত টেবুলের উপর নানাবিধ ছবি অঙ্কিত করিতে করিতে চিন্তাশাস করিল। “তুমি কি সুবিধা হইবে ধনী কাউন্ট রোমানীক নাম কখনও শুনি নাই

‘আমি মৃত মন্তক-সকলনে অস্বীকার করিলাম এবং অবনত-বননে আমার কণি-পাতের সিকি চাছিয়া রছিলাম।

সে বলিতে লাগিল,—“তাহার কথা জানিয়াই বা আর কি হইবে ? সে কাউন্ট রোমানী ত আর নাই ! তাহার সকল লীলার অবসান হইয়াছে। রাজার দ্বার সর্বজনপ্রিয় কাউন্ট যে-এত শীঘ্র মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন, তাহা কে জানিত ? গত কল্য প্রকৃষে তিনি ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া ধর্ম্মভাষ্য জ্ঞা সিপ্রিয়ানো কর্তৃক এই স্থানে আনীত হইলেন। আর পাচ ঘণ্টা, অতীত হইতে না হইতেই তিনি সংসারের মায়া পরিত্যাগ করিয়া বিদায় গ্রহণ করেন। স্বর্গান্তের পূর্বেই তাহাকে ভগতে নিহিত করা হইয়াছে। তাহার কথা মনে করিলে সবই বেন হৃৎস্পের মত প্রতীতমান হয়।”

আনি এই সময় তাহার প্রবৃত্ত কটী কাটিতেছিলাম। তাহাকে চিন্তাশাস করিলাম, “ইহা আর বিশ্বস্তের বিষয় কি ? কাউন্ট ধনী ছিলেন বলিয়াই কি মৃত্যু তাহাকে পরিত্যাগ করিবে ? মৃত্যুর নিকট বিদ্যানুর্ধ্বের—ধনিদরিত্রের প্রভেদ নাই। মৃত্যু এক দিন সকলকেই সমভাবে গ্রাস করিবে।”

প্রিটে। বলিল, “সে কথা যথার্থ। এই ত সিপ্রিয়ানোর দারিদ্র্যও তাহাকে মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হইল না।”

আমি এ সংবাদে চমকিয়া উঠিলাম ; কিন্তু পরমুহূর্তে আপনাকে সংবত করিয়া নির্বিকারভাবে চিন্তাশাস করিলাম, “তুমি তাহার কথা বলিতেছ ? তিনি কি কোনও মহাপুরুষ ?”

গুহস্বামী বলিল, “আমি পরহৃৎকাতর ধর্ম্মবাক্যের কথাই বলিতেছি। তাহার নাম ভগতের মহাপুরুষদিগের নামের সহিত একত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে কি না, জানি না ; কিন্তু তিনি যে প্রকৃত মহাপুরুষ ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনিই গত কল্য মুমূর্ষ কাউন্ট রোমানীকে এই স্থানে আনিয়াছিলেন। হায় ! মঙ্গলময় পর-মেবর তাহাকে এত সত্ত্বর আচ্ছাদন করিলেন !”

এই নিদারুণ সংবাদে আমার হৃদয় ব্যথিত হইল। আমি তারম্বরে চিন্তাশাস করিলাম, “কি ? তিনি কি সত্যই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন ?”

পিটে। বলিল, “হী, আত্ম-বিসর্জনকারী মহাপ্রেমিকের মত সত্যই তিনি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়াছেন। কাউন্ট রোমানীর মৃত্যুসংবাদে তিনিই তাহার

সেবা করিয়াছিলেন। তিনিই তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার অশোকীক্ৰিয়া সম্পন্ন করিয়াছিলেন, তিনিই তাঁহার মৃতদেহে পবিত্র বারি সেচন করিয়াছিলেন, তিনিই তাঁহার বক্ষেপরি স্বীয় ক্রসপানি সহজে রক্ষা করিয়াছিলেন, তিনিই তাঁহার পরি-ত্যক্ত ঘড়ী, অঙ্গুরী, তাম্রকুটাধার প্রভৃতি বস্তুস্বল পরার্থগুলি তাঁহার মৃত্যুসংবাদ-সহ তাঁহার পত্নীকে প্রদান করিয়াছিলেন এবং তিনি আত্ম তাঁহারই সংস্পর্শে এত দারুণ সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হইয়া মানবলীলা সংবরণ করিলেন ।”

এই সময় আমার পত্নীর নাম উচ্চারিত হওয়ায় আমার হৃদয় কেমন এক বেবনার পূর্ণ হইয়াছিল ; আমি আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলাম, “বিবি রোমাণী কি তাঁহার স্বামীর মৃত্যুসংবাদে বড়ই বিচলিত হইয়াছিলেন ?”

গৃহস্বামী বলিল, “আমি তাহা কি প্রকারে অবগত হইব ? দর্শনাত্মক মহাশয় শু আমাকে কোন কথাই বলেন নাই। তবে বিবি রোমাণী যে একবার মূর্ছিতা হইয়া পড়িয়াছিলেন, আমি তাহা সেই মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছিলাম। কিন্তু তাহাতে স্বীলোকের সহরের অবস্থা কিছুই নির্ণয় করা যায় না। কারণ, স্বীলোক বড়ই মূর্ছাপ্রবণ। সামান্য মূর্ছিক হইতে ভীষণ শবের সন্দর্শন—সবই তাহাদের মূর্ছার কারণ হয়। মহাশয় সিপ্রিয়ানোট কাউন্ট রোমাণীকে সমাধি-গর্ভে নিষ্টিত করেন ; এবং তিনি সে স্থান হইতে প্রত্যাবর্তন করিতে না করিতেই ঐ পীড়ার আক্রান্ত হইলেন। আত্ম প্রভাবে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। ভগ-বান তাঁহার পুত্র আশ্বাথ মঙ্গলবিধান করুন। এমন পবিত্র লোক-সন্দর্শন আমার ভাগ্যে আর কখনও ঘটে নাই।”

আমি এই সংবাদে বড়ই বিচলিত হইলাম। আমার নয়নধর এই আশ্চর্য্যাপী মহাপুরুষের শোকে অশ্রুভারাক্রান্ত হইল ; আমার কণ্ঠ শুষ্ক বোধ হইতে লাগিল। আমি আমার আহাঙ্গা দূরে নিক্ষিপ্ত করিলাম। আমি বুঝিলাম, এই স্বার্থপর জগৎ হইতে একটি নিঃস্বার্থ হৃদয় ভিন্নদিনের জন্য অস্তহিত হইল। আমি নীরবে গভীর চিন্তার নিমগ্ন হইলাম। গৃহস্বামী বিস্মিতভাবে আমার দিকে চাহিয়া রহিল ;—আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, “কক্ষি কি তোমার ভাল লাগিতেছে না ? তোমার কি ক্ধা নাই ?”

আমি অতি কষ্টে কাষ্ঠ-হাসি হাসিয়া বলিলাম, “না—তাহা নহে ; তোমাদের এ সকল দুঃসংবাদ আমার চিত্তকে বড় ব্যথিত করিতেছে, আমার ক্ষুৎ-পিপাসা একেবারে জিরোহিত করিয়াছে। তোমাদের এই সকল হৃদয়-বিদারক সংবাদ ব্যতীত কি আর কোনও সংবাদ নাই ?”

পিটে। কিছু অপ্রতিভ হইল। সে বলিল, “বিবাতার মৌনে নেপালুদের এত ভীষণ অবস্থা। এ দুর্দিনে আর কি সংবাদ থাকিতে পারে?”

এই সময় আমার দুটি গৃহের বাহিরে পতিত হওয়ার আমি দেখিলাম, কে বেন পাশশালার দ্বার অতিক্রম করিয়া ধীরে গমন করিতেছে। তাহাকে চিনিতে আমার মনে অধিক দিলম্ব হইল না। সে যে ফেরারী গিডো—আমারই পরম বন্ধু! তাহার নিকট উপস্থিত হইবার ভয় আমার হৃদয় বড় ব্যাকুল হইল। কিন্তু তাহার ভাব দেখিয়া আমি সে ইচ্ছা পরিত্যাগ করিলাম। সে দুঃখান করিতে করিতে আগ্রসর হইতেছে। তাহার বদনমণ্ডলে টমৎ চান্দ্র-রেখা ফুটিয়া উঠিয়া-ছিল। তাহার বক্ষঃস্থলে আমারই উদ্ভানম্নাত গোলাপের স্ফার একটি রক্তবর্ণ গোলাপ শোভা পাঠিতেছিল। আমি তাহার দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিলাম। হৃদয়ে কেমন এক বেদনা অন্তর্ভব করিতে লাগিল। তাহাকে প্রকৃত বোধ হইতে লাগিল : বোধ হয়, তাহাকে আর কখনও আমি এমন প্রফুল্ল দেখি নাই। তাহার চিরচিহ্নিত বন্ধু আমি সবে নাত্র গত কলা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছি, সে কি প্রকারে আমাকে এত স্নেহ বিদ্যুত হইল? কি প্রকারে বা সে স্মৃতি-বদনে রক্তবর্ণ গোলাপ বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া লোকসমাগ্রে বাহির হইল? এতলি যে শোকের চিন্তা নহে, তাহা আমি বেশ বুদ্ধিতে পারিলাম। তাই হৃদয়ে বড়ই আঘাত লাগিল। পদমূর্ছিত আমার মনে হইল, আমার এ সকল ভিত্তার ভিত্তি নাও থাকিতে পারে। নাত্রের বাহিরের অবস্থার দ্বারা তাহার অন্তরের অবস্থা অনুমান করা যায় না। সে হয় ত অস্বাস্থ্যবোধে ঐ গোলাপটি চরন করিয়া থাকিবে : হয় ত বা আমারই পিতৃদীনা শিশুকলা টেলার আশ্রয় রক্ষা করিতে উহা বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া থাকিবে। তাহার বদন হয় ত স্তম্বে স্তম্বে চিরদিনই অবিকৃত থাকে। হয় ত তাহার কোমল হৃদয় প্রতিদিনই লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া আমার জন্য ক্রন্দন করিতেছে। হয় ত সময়ের স্বল্পতা হেতু শোক-পরিচ্ছন্ন প্রস্তুত না হওয়ার সে তাণ্ডা পরিধান করিতে পারে নাই। আমার এই সকল কল্পনা আমাকে সান্ত্বনা দান করিল। আমি আর তাহার পশ্চাদ্ভাবন না করিয়া সূর্যাস্তের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। সন্ধ্যা-সমাগমে তাহার সচিৎ সাক্ষাৎ করিয়া সকল কথা জ্ঞাপন করাই আমার সর্বত বোধ হইল।

আমি এই সময় আমার গৃহবাসীকে আভ্যর্থনের অন্ত কি মূল্য প্রদান করিতে হইবে, বিজ্ঞাসা করিলাম।

সে বলিল,—“তুমি আর কি দিবে? আমি মৎস্তজীবীমিগের নিকট হইতে বড় কিছু লই না। কিন্তু সেখান বেঙ্গল দুর্দিন উপস্থিত, তাহাতে কাহাকেও আর বিনা-

মূল্যে পাণ্ডা প্রদান করা যায় না। নতুবা তোমার নিকট হইতে কিছুট লইতাম না। তোমার স্বজাতীয়দিগের সেবাই আমার ধর্ম্ম। তজ্জন্ত মহাশয়! সিপ্রিয়ানো এক দিন আমাকে বলিয়াছিলেন, স্বর্গরাজ্যের দ্বার চিরদিন আমার নিজ উন্মুক্ত থাকিবে। মাতা মেরীও এই জাতীয় সেবকদিগকে বিশেষ অঙ্গগ্রহণ করিয়া থাকেন কারণ, ভগবানের প্রেরিত দ্বাদশ জন মহাপুরুষ এই ধীর-বংশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আমি আর তাহার বিরাগভাজন হইতে চাই না। কিন্তু—”

আমি হাসিয়া তাহাকে একটি রৌপ্যমুদ্রা প্রদান করিলাম। সে সানকে তাহা গ্রহণ করিল। তাহার চক্ষু'র আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

সে বলিল, “তুমি ত ইহার অর্ধেক মূল্যের পাণ্ডাও গ্রহণ কর নাট? ভগবান্ তোমার মঙ্গল করুন।”

আমি বলিলাম, “আমি যখন বেজার তোমাকে উহা প্রদান করিতেছি, তখন তোমার আর উহা গ্রহণ করিবার পক্ষে কোনরূপ বাধা থাকিতে পারে না। ভগবান্ নিশ্চয় তোমার মঙ্গল করিবেন তোমার ব্যবসা দিন দিন নিশ্চয়ই উন্নতি লাভ করিবে।”

সেও আমাকে আমার—“ভবিষ্যৎ সমুদ্রযাত্রা শুভ হইউক” বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিল। আমি তাহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম। সে তাহার কাচপাত্রগুলির সম্মাৰ্জ্জনে পুনরায় মনোনিবেশ করিল।

আমি সহরের নিষ্ঠুর প্রদেশসমূহে হ্রমণ করিতে লাগিলাম এবং রক্তিম সন্ধ্যার প্রতীক্ষার বারংবার সতৃষ্ণ-নয়নে আকাশের দিকে তাকাইতে লাগিলাম। কখন বে সন্ধ্যা সৈনিকের হস্তস্থিত লোহিত পতাকার দ্বার দ্বীপ অঞ্চলখানি উভাইয়া আমাকে গৃহপ্রবেশের অঙ্গুমতি দিবে, আমি শুধু তাহারই অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

ঐজমলেন্দু গুপ্ত ।

এস ।

নীরসে সরস করি' এস ক্রাম চলধর !
 শ্রীচীন রাধার কৃষ্ণ বিনা রাধা-মনোহর :
 ফটে না কৃষ্ণম-কলি,
 গুজরি' না আসে অলি,
 যমুনার তলবেগী নুটে বেলাবানু'পর,
 বিরহ-বাণিত ব্রজ, এস ক্রাম চলধর !

তোমা বিনা, ব্রজেশ্বর, ব্রজ আজি অন্ধকার
 তোমার বিলাসকুঞ্জে উঠে শুধু হাহাকার
 পূলকিত বননাথে
 বাশী তব নাহি বাজে,
 বনপথে নাহি রাচে—ছিন্নশত্রু ফুলহার
 জানারে তোমারি তরে গোপিকার অভিসার ।

শোভে না কৃষ্ণ আর কল্লরের পাখা'পরে ;
 শীকরশীতল বায়ে ফুলরেণু নাহি ধরে ;
 শ্রীহীন তমালনাথে
 পাখী আর নাহি ডাকে ;
 তুলিরাছে মৃত্যু শিখী—কেকারব নাহি করে ;
 উৰ্দ্ধ মুখে গোঠে গাভী আছে চাহি' তোমাতরে ।

জ্যোছনানিশার আর নাহি রাস—রসময় ;
 গোপিকা নাহিক গণে ফাগুন দিবসচর—
 কবে দোল-মহোৎসবে
 আনকে মাতিবে সবে

• পূলক-চকল-হিরা, নাহি লাজ, নাহি ভয় ;
 গোপিকা তোমার ঠৈগ্রমে করিবে আপনা লয় ।

‘ চল ফেলি’ ব্রজবালা ভলে আর নহি চলে,
যৌবনযমুনাকূলে তোমারে তেরিবে বলে
বিকচ করহমূলে
কাল কালিন্দীর কূলে
দিন যায়—দিন যায়—উঠে জগকলকলে—
তুমি যে ডেকেছ তা’রে বাশরীবাননছলে

তোমার বাশরীষর পশিরাছে কাণে যা’র
সে কি মানে কোন বাধা—সে কি থাকে গৃহে আর ?
তুমি যা’র চিনাকশে
কে তা’রে ফিরা’বে বাসে ?
অন্তর উজল যা’র কোথা তা’র অঙ্ককার ?
তুমি প্রেম—তুমি ভক্তি—তুমি মুক্তি গোপিকার ।

এস ফিরি’ বৃন্দাবনে, এস শ্যাম জলধর
বিপিনে যমুনাকূলে উঠুক বাশরীষর ।
বরণ জলমযটা
তাহে বিজলীর ছটা,
পিথিপুচ্ছচূড়া শিরে—উল্লসিত ননোড়র
বাধাহৃদিকুলে আসি’ বিহর, হে নটবর !

সমালোচনা।

গল্পকথা।

ভারতে গল্পের বাহুলা ও প্ৰচলপ্রচার লেখিকা সকল দেশের লোকট ভারত-বাসীর কল্পনাকৌশলের প্রশংসা করিয়াছেন। এমন বিরাট কাব্য, এমন বিচিত্র গল্পকথা ভগতে আর কোন দেশের সাহিত্য সমলঙ্ঘিত করে নাট। প্রতীচো প্রচলিত অনেক গল্পও বে ভারতবর্ষ হইতে উদ্ভূত, তাহাও দেখা গিয়াছে। এই দেশের বহুবিধ গল্প যুরোপে সংগৃহীত হইয়াছে। লণ্ডনের গ্রেসাম পাবলিশিং কোম্পানী ভগতের সকল দেশের সাহিত্য হইতে গল্পকথা সংগ্রহ করিয়া যে দুই খণ্ড সচিত্র ও স্থলিখিত পুস্তক প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহার মধ্যে একখণ্ড ভারতীয় গল্পের বহি। ডোনাল্ড মেকেঞ্জি এই Indian Myth and Legend পুস্তকের সম্পাদক। এমন ছাপা, -ইবি, বাঙ্গালা পুস্তকে বড় দেখিতে পাওয়া যায় না।

পুস্তকখানি কেবল গল্পের বহি নহে। ইহাতে ভারতীয় সাহিত্য-সম্বন্ধে নৌলিক গবেষণার—ভারতীয় ধর্মমতের আলোচনার পরিচয় পরিচ্ছট। প্রস্তাবনার ভারতীয় ধর্মমত বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। তাহাতে ভারতীয় ধর্মমতের অভিযান্ত্রিক ও পরিবর্তনসম্বন্ধে লেখক যে সকল সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, সে সকল সিদ্ধান্ত সর্বজনগ্রাহ্য নাও হইতে পারে, কিন্তু সে সকল মত সর্বতোভাবে আলোচনার উপযুক্ত।

প্রস্তাবনার পর মূল পুস্তকে প্রথমে বৈদিক দেবতাদিগের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। এরূপ সত্ৰলভাবে বৈদিক দেবতাদিগের পরিচয় সচরাচর দেখা যায় না। তাহার পর বৈদিকযুগের সমাজ ও ধর্মসম্বন্ধীয় ক্রমবিকাশের বিষয় বিবৃত হইয়াছে। তাহার পর বৈষ্ণব, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মমতের আলোচনা আছে। সর্বশেষে এ দেশের বিরাট কাব্য রামায়ণ ও মহাভারতের বিবিধ গল্প বিবৃত হইয়াছে।

পুস্তকের চিত্রগুলি রমণীয়। আমরা দুই একখানি চিত্রের প্রতিলিপি পাঠকদিগকে উপহার দিব।

সংগ্রহ ।

কান্দ্যারের শিল ।

কান্দ্যার এসেছে “কুর্বার্গ” বলিয়া পরিচিত । কান্দ্যারের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখিলে মুগ্ধ হইতে হয়—মনে হয়, মানব যেন পুণ্যপ্রভাবে স্বর্গের এক অংশ দর্শন-তলে আনিয়া প্রকৃতির এই মনোমগ্ন লীলাভূমি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে । কিন্তু কান্দ্যারের শিল্প-পথাও প্রাগৈতিহাসিক কাল হইতে সুপরিচিত । কয় বৎসর পূর্বে আন্তর্জাতিক মিত্র মতামত কান্দ্যার-সরবারের পক্ষ হইতে কান্দ্যারের শিল্পজাতসম্বন্ধে একখানি পুস্তিকা প্রচারিত করিয়াছিলেন । ‘জার্মান অব দি রয়্যাল সোসাইটী অব আর্টস’ পরে কান্দ্যারীদিগের শিল্পসম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে ।

খ্রিস্টপূর্ব ষোল্লবৎসর, তরীর কায় ধাতুদ্রব্য রচনা প্রকৃতি শিল্পের কেন্দ্র বলা হইতে পারে । বর্তমানে কান্দ্যারে উৎপন্ন রেশমের রপানীই বিশেষ লাভজনক ব্যবসা । ছুংপের বিষয়, গতপূর্ব জুলাই মাসে (১৯১০ খৃঃ) সরকারী রেশমের কারখানা ভাঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে । এই কারখানাটিতে ১৮ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছিল এবং ৪ হাজার লোক পাটিত । যুরোপ হইতে বীজ জার্মানিয়া লোককে দেওয়া হইতে ; সরকার নিম্নিষ্ট মূল্যে ভটী কিনিয়া লইতেন ।

কান্দ্যারের শাল বহুকাল হইতে এসিঙ্জি লাভ করিয়াছে । মহাভারতে দেখা যায়, ঐক্লব পাণ্ডবদিগের দূতরূপে কোরব-সভায় উপনীত হইলে দূতরাষ্ট্র তাঁহাকে যে সব উপহার দিয়াছিলেন, সে সকলের মধ্যে দশ সহস্র কান্দ্যারী শাল ছিল । বাউবেলে কান্দ্যারী শালের উল্লেখ আছে । তাহার পর যোগল নম্রাটগণ সম্বন্ধে এই ব্যবসায়ের উন্নতি করিতেন । আইন-উ-আকবরীতে দেখা যায়, আকবর এই শাল ভালবাসিতেন । বার্নহার ইহার উল্লেখ করিয়াছেন । ১৭০৯ খ্রিষ্টাব্দে নামের শাহ তুরস্কের সুলতানকে কান্দ্যারী শাল উপহার পাঠাইয়াছিলেন । ১৮০২ খ্রিষ্টাব্দের ও ১৮৭৮ খ্রিষ্টাব্দের হুর্ভিক্ষে অনেক কান্দ্যারী শালবরনকারী লাহোরে ও অন্তঃসরে যায় । তাহাদের বংশধরগণ অজ্ঞাপি পৈতৃক ব্যবসারে লিপ্ত আছে । মহা-রাজ্য রণবীর সিংহের সময়েও ৩৮ হাজার লোক শাল বুনিত ও শাল বিক্রয় করিয়া তাহার বৎসরে গড়ে ২৮ লক্ষ টাকা পাইত । ৪০ বৎসর পূর্বেও প্রায় ১০ হাজার লোক শাল বুনিয়া অন্নসংস্থান করিত ও বৎসরে প্রায় ১০ লক্ষ টাকা পাইত । ১৮৭০ খ্রিষ্টাব্দে ফরাসী-প্রুসীয় যুদ্ধ হইতেই এই ব্যবসায় সর্ব্বনাশ প্রচলিত হয় । সেবে ১৮৭৮ খ্রিষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষে ব্যবসা বিনষ্ট হয় । এখন মহারাজ্য রণবীর সিংহ

শালবনকারীদিগকে ১০ লক্ষ টাকা দান দিয়াছিলেন। তাহাতেও ব্যবসা রকিত হয় নাট। সার জর্জ বার্ডউড বলেন, করাসী নন্দার শাল প্রস্তুত করিয়া শালওয়ালারা ব্যবসার বিশেষ অনিষ্ট করিয়াছে। সার জর্জ ভারতীয় শিল্পের পন্থা ভক্ত। তিনি শিল্পের সৌকর্য্যহামির কথাই বলিয়াছেন। এখন অনেক কাম্বোজী শালওয়াল কাম্বোজ ত্যাগ করিয়া অল্পতর গিয়াছে ও গালিচা বুনিয়া বা ভারী কাশ করিয়া জীবিকা নির্ভাট করিতেছে। এখন কাম্বোজের আর সেকালের মত শাল প্রস্তুত হয় না। সেক্ষপ জিনিস কিনিবার লোক নাট। এখন সস্তার আদর। কাম্বোজের ও তিন্মতে একজাতীয় চাগ আছে; সেই ছাগলের লোনে শাল প্রস্তুত হয়। পশম পরিষ্কার করিয়া তাহাতে নাড় দেওয়া হয় ও পরে চরকার হুতা প্রস্তুত করা হয়। হুতা প্রথমে রং করিয়া লওয়া হয়। এখন ব্যবসা ভাল চলিত, তখন ৬৭ প্রকার বর্ণের কথাও শুনা গিয়াছে। হুতা কাঠীতে চড়াইয়া সাজাইয়া লইয়া বয়ন আরম্ভ করিতে হয়। বয়নকারী কি বুনিতোছে, তাহা নিতে বৃত্তিতে পারে না। সে নন্দা অল্পসারে হুতা সাজাইয়া লয়, — সেও যেন একটা কল। ‘জার্গাল’র প্রবন্ধ-লেখক বলিয়াছে, এখন কাম্বোজের ম্যাজেণ্টা রং অর্থাৎ রাসায়নিক প্রক্রিয়া অল্পসারে প্রস্তুত রংও ব্যবহৃত হয়। আমরা কিন্তু জানিভান, পাছে বর্ণের স্থায়িত্ব না থাকিলে কাম্বোজী জিনিষের আদর কমিয়া যায়, এই ভয়ে কাম্বোজ-দরবার কাম্বোজ সীমান্তে এই সব বর্ণের উপর শতকরা ৫২ টাকা শুদ্ধ আদায় করেন ও সীমান্ত অতিক্রান্ত হইবার কিছু দূরে উচা বাজেয়াপ্ত করিয়া নষ্ট করিয়া দেন। কাবুলের আমীরও এইরূপ বর্ণের রঞ্জিত গালিচা রাজ্যমধ্যে আনিতে দেন না। ‘জার্গাল’র প্রবন্ধলেখকের কথা সত্য হইলে কাম্বোজের এই মুগ্ধ শিল্পে নবজীবন সঞ্চারের আশা একান্তই অল্পপরাহৃত মনে করিতে হইবে। কারণ, থাহারা মূল্যবান শাল ক্রয় করেন, তাহারা তাহাতে বর্ণের স্থায়িত্ব থাকিবে — এ আশা অবশ্যই করিয়া থাকেন।

কাম্বোজের ভারী-কাশও হয়। বর্তমানে প্রায় ৩ হাজার লোক এট কাশ করিয়া থাকে। হুতী, পশমী ও রেশমী কাপড়ে ভারী কাশ করা হয়। সে সব কাশকরা কাপড়ের মূল্যও তত অধিক নহে। বৎসর বৎসর অনেক টাকার ভারী কাশ-করা কাপড় বিদেশে রপ্তানী হয় — থাহারা বিদেশ হইতে ভারতভ্রমণে আটসেন, তাহারাও এট সব কাপড় কিনিয়া লইয়া যানেন।

পেপিরারমাসী শিল্প কাম্বোজের নিজস্ব বলিয়াও অনুভূতি হয় না। কাগজ নরম করিয়া পরতে পরতে ছাঁচে সাজাইয়া দেওয়া হয় — ধীরে ধীরে কাগজ শুক — ইয়া আর এক স্তর কাগজ দেওয়া হয়। জিনিষের আকৃতি ঠিক হইলে কাগজ গুলি কাপড়ে আবৃত করিয়া তাহাতে আটা দেওয়া হয়। তাহার পর জিনিষটি মসৃণ

কারিগর্য্য জমীন সহ প্রযুক্ত হয় । সবটা শুষ্ক হইলে জলের বর্ষণে নক্ষা আঁকিয়া বার্ষিক করা চট্টনেই তিনিধ প্রস্তুত হইল । আজীজ মোগল পারঙ্গ হইতে শিল্পী আনিয়া কান্দোরে এই শিল্প প্রবর্তিত করেন । ইহাতে কান্দোরা শিল্পীরা অসাধারণ দক্ষতা লাভ করিয়াছে । পূর্বে কাবুলে বৎসরে প্রায় ১০ হাজার টাকার ও ফ্রান্স প্রভৃতি যুরোপীয় দেশে ৭ হাজার টাকার পেপিরারমাসীর ব্যবসা বিক্রীত হইত । এখনও বৎসরে ৫ হাজার টাকার তিনিধ বিক্রীত হয় কাবুলে কলমদান ও চামড়ার অধিক চালান হইত । কলমদানগুলি দেখিতে অতি সুন্দর । পূর্বে প্রত্যেক পণ্ডিত একটি করিয়া কলমদান সঙ্গে লইতেন । কিছু দিন ফ্রান্সে যে স্থান রপ্তানী হইত, সে সব পেপিরারমাসী দায়ে পাঠান হইত তৎক্ষণাৎ বাস্তব হুই বিক্রীত হইত । মহারাজা রমবীর সিংহ এই শিল্পের পুষ্কপোষক ছিলেন । কান্দোর-দরবার দিল্লী প্রদর্শনীতে যে টেবল পাঠাইয়াছিলেন, তাহা ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে প্রস্তুত । তাহা এক্ষণে লাতোর পুরাবস্তুশালার বসিত হইয়াছে । তাৎপা প্রভৃতিতেও এইরূপ কাণ করা হইত । পুস্তকেও পেপিরারমাসী শিল্পকার্য্য ব্যবহৃত হইত । মিত্র মহাপ্রভু কোন পণ্ডিতের নিকট এইরূপ শিল্পকার্য্যখচিত একখানি পীতা দেখিয়াছিলেন তিনি তাহার জন্য ১ হাজার টাকা দিতে চাচ্ছিলেন । পণ্ডিত পুথি দেন না । বর্তমানে পেপিরারমাসীর ছবির ফ্রেম, পর্দা, টেবল টে, ফুলদান, কুমাল বা দস্তানের বাস্তব, বাড়িমান প্রভৃতিই অধিক প্রস্তুত হয় । আজকাল অনেক স্থলে কাগজের পরিবর্তে কাঠ ব্যবহৃত হয়—জমীন ভাল করা হয় না—নক্ষাও তেমন ভাল হয় না । এখন কেবল সস্তায় তিনিধ বিক্রয়ের চেষ্টা লক্ষিত হয়—শিল্পের দিকে কেহ চোখে না । কান্দোরা এই অতুল্য শিল্পের বিশেষ অবনতি পরিলক্ষিত হইতেছে ।

কান্দোরের কাঠের কোদণ্ড কাষ, পিত্তল তাম্র ও রৌপ্যের উপর মিনা কাষ এ সবও এখন শিল্প হিসাবে অবনতির পথাক্রম হইয়াছে । শিল্পীরা ভেল চালাইতেছে ।

কান্দোরে বহুবিধ শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে । পশমী কাপড়ের ও চামড়া পরিষ্কার করিবার কারখানা সংস্থাপিত হইলে লাভ হইবার সম্ভাবনা । উইলো গাছে খেলার ব্যাট ও ব্লুড়ী হইতে পারে । এ দেশের পশম সজ্জিত করিবার জন্য রপ্তানী না করিয়া কান্দোরের উদ্ভিজ্জাত বর্ণে সজ্জিত করিলে হয় । আবার এ দেশে সাবানের উপকরণ মিলে, গন্ধদ্রব্যের উপযোগী ফুলের অভাব নাই, পাইন হইতে টার্পিন নিষ্কাশিত ও মেশলাইয়ের কাটা প্রস্তুত হইতে পারে । এ দেশের মধুর মৌরত তাহার বিশেষত্ব । কান্দোরে চীনাবাঞ্জীরও অভাব নাই ।

দ্বিতীয় প্রকৃত পত্র।

শ্রীদূর্গা :

৮ পুরীধাম

হরিনাথাম

১০২১, ১০ই আধুনিক

শ্রীচরণকমলেশ্বর

পত্র লিখিতে বসিয়া তোমাকে “জীবিতেশ্বর” বলিয়া কি “আর্য্যাপুত্র” বলিয়া সম্বোধন করিব, ঠিক করিতে পারিলাম না। সীতা, লক্ষ্মীনাথ, বাসবদত্তা ত এই দুইটি শব্দেরই ব্যবহার করিতেন; ইহার কোনটি ভাল, কোনটি মন্দ, জানি না। সম্বোধন না করিয়াই পত্র লিখিতে আরম্ভ করিলাম। পূর্ব পূর্ব পত্রে এ ক্যাসাদে পড়ি নাই, তখন সংস্কৃত নাটকে চক্ষুঃসংযোগ হয় নাই।

তোমার পত্র পাইলাম সেটী সঙ্গে ‘সবুজ পত্র’ নামে একখানি মাসিক পত্র পাইলাম। ‘সবুজ পত্র’র কভার ভিন্ন সব পাতাগুলিই ত সাদা। তবে ইহার নাম ‘সবুজ পত্র’ হইল কেন, বুঝিলাম না। বাঙ্গালীর “অন্নরটা পল্লভের কাজের উণ্টো পিঠ, সেই দিকে কোন লজ্জা নেই, শ্রী নেই, সজ্জা নেই। সেই দিকে আলো মিট মিট ক’রে জ্বলে। হাওয়া চোরের মত প্রবেশ করে, উঠোনের আবর্জনা নড়তে চায় না; দেহালের এবং বেজের সমস্ত কলহ অক্ষর হ’য়ে বিরাজ করে।” স্তব্ধতা এই রূপ অন্নরের নামে, এই অন্নরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নামে বাড়ীর নামকরণ হইতে পারে না; তাই বাঙ্গালীদিগের কবীর নামেই বাড়ীর পরিচয়; কারণ, সদর কবীর “বৈঠকখানা ঘরে সাজসজ্জা আসবাবের অভাব নেই।” “সদরে একটুখানি বাগানও আছে।” কিন্তু ‘সবুজ পত্র’র অন্নরমহলও একটুখানি নয়, প্রকাণ্ড, “হাওয়া চোরের মত প্রবেশ করে” না, সর্বত্র অবাধ-গতিতে খেলিয়া বেড়ায়, সেখানে, “আলো মিট মিট ক’রে জ্বলে না,” উজ্জ্বল আলোকে সাদা পাতাগুলি চক্ষুর উপরে ধপ ধপ করিয়া ছুটিয়া উঠে; তবে সে নামে পরিচিত না হইয়া ল্যাণা শোচা কালো কভারের নামে কেন তাহার পরিচয় হইল, বুঝিলাম না। কভারও ত

কালো! সবুজ কৈ? হবে কভারে যে একটি গাভের পাতা আছে ও 'সবুজ পত্র' এই কয়েকটি স্বকর আছে, তাহা কভারের রং অপেক্ষা একটু গাঢ় কালো রঙ্গে লিখিত, তাহার দ্বারাষ্ট বোধ হয় প্রমাণ করা হইয়াছে—কভারের রং সবুজ। সাদা কালোতে মিশিলে সবুজ হয় কি না, বলিতে পারি না; কারণ, আমি বর্ণ-বিজ্ঞান জানি না। বাহা হউক, আর 'সবুজ পত্র' এই কথাটুকুর আলোচনা করিয়া সময় কাটাইতে চাই না, 'সবুজ পত্র' "দ্বীপ পত্র" নামে একখানি পত্র বাহির হইয়াছে, সেই সহজে উই একটি কথা বলিতে চাই। না বলিলেও চলিত। কিন্তু দেখিলাম, পত্রখানিতে আমার নাম স্বাকর রহিয়াছে ও আমার জীবনের কয়েকটি ঘটনার সহিত পত্রোন্নিখিত ঘটনার মিল আছে।

দেখিলাম,—“বাস্তব লেখক” এই পত্রের প্রচারক। বাস্তব লেখকের প্রশস্ত হস্ত হইতে উই চারিটি বাস্তব ঘটনার সহিত স্ববাস্তবে পরিপূর্ণ এইরূপ পত্র বাহির হইয়াছে দেখিয়া বিম্বিত হইলাম। ঐচা মাহুদের নামে এইরূপ জাল পত্র বাহির করাতে চাঞ্চল্য হই নাই, কেবল হাসি পাউতেছে এক গাল হাসিয়াও তৃপ্তি পাই নাই, আপনার মনে আপনি যখন তখন হাসিতেছি : দেখাইবার লোক নাই, তুমি দূরে।

এত কাল অশ্রুতুমি পূর্ববঙ্গ ছাড়িয়া কলিকাতার বাস করিয়াও কখনও “থেনুম, গেনুম” বলি না; হোমরা জান, পূর্ববঙ্গের নয়নারী দক্ষিণ-বঙ্গের অহু-করণে কথা বদলায় না,—বিশেষতঃ তাহার কথা ভাষা ও লেখা ভাবাকে এক করিতে একেবারে নারাজ। কলিকাতার কথা ভাষার কুড়ি কুড়ি পুস্তক লিখিতে আসামের মত একটা প্রকাণ্ড দেশ একেবারে হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে। পূর্ব-বঙ্গও হাতছাড়া হইয়াছিল। তখন এই পত্রের লেখক প্রকৃতি বঙ্গের ত্রিষ্টবিগুণই নাকের জলে চোখের জলে অকলসাগ্রে ভাসিয়াছিলেন। এই উই দিনের কথা ভুলিয়া গিয়া আবার কথা ভাষার পত্র লিখা ও পুস্তক লিখা। ভাল ভাষার এরূপ লোককে কি বলে, জানি না : আমরা মেরেলি ভাষার ‘বেহারা’ বলি। “থেনুম গেনুম” আছে বলিয়াষ্ট ত এই পত্রখানি জাল, সকলেই বুঝিবেন, আবার আমার নাম স্ফালিনী, আমি নামস্বাকরে স্ফালিনীই লিখি, স্ফাল লিখি না, তা তুমি জান। যদিও জাল পত্রে আছে,—আর কখনও আমি তোমাকে পত্র লিখি নাই, সেটি জে একেবারে মিথ্যা, তার সাক্ষী তুমিই বর্তমান। তুমি আমার হাতের লিখা কুড়ি কুড়ি পত্রের একখানিও নষ্ট কর নাট, বাকসে বন্ধী করিয়া রাখিয়া দিও। ভগবান, আমাকে মেয়ে মানুষ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, আজ স্ফালিনী কাটিয়া স্ফাল করিলেই কি পুরুষ মানুষ হইবে? না নামের পরে স্ফোগোপাধ্যায়, বন্দ্যো

পাখায়, ঘোষ, বহু লিখিলে বা পুরুষের মত বট জুতা পরিয়া ঘোড়া-গাড়ী ইকাতলেটে পুরুষ মানুষ হইব ?

পত্রের স্বাক্ষরে আছে—‘তোমাদের চরণতলাঙ্গলিঙ্গ মৃগাল। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।’ প্রথমে ভাবিয়াছিলাম, মৃগালের পরে যে পাড়ী আছে, ওটি পাড়ী নয়, ছাপার চাপে ডায়াল চিকিটি উলটু পাইয়া পাড়ীর মত হইয়াছে। তাহা হইলে অর্থও হয়, যে রবীন্দ্রনাথ পদ্মটি আনানিগের গৃহ-সরোবরে নুটিয়াছিল, তাহার মৃগালটি ছিন্ন হইয়াছে, অর্থাৎ আনানিগের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ আছে, একথাও তিনি অত্যন্ত লজ্জিত, তাই তিনি এই সম্বন্ধটুকু ছিন্ন করিতে বাস্তব। প্রমাণ ‘অচলারতন’, প্রমাণ বিহ-দর্শনে সাধকের মুচ্ছা লইয়া বক্তৃতার ব্যঙ্গ, প্রমাণ ‘ইতিহাসের দ্বারা’, প্রমাণ নোবেল প্রাইজ পাটয়া প্রভাগত রবীন্দ্রনাথের অজ্ঞানতার ভক্ত বোলপুর শাস্তি-নিকেতনে সমাগত সাহিত্যিকদিগের সহিত তাঁহার ব্যবহার, প্রমাণ আনার নামে প্রচারিত এই ভাল পত্রখানি।

তিনি একটি কলমের আঁচোড়েট, একটি অতি কচি আর একটি যুবতী, সমস্ত সমস্ত ছুটি স্ত্রীহত্যা করিয়া বসিলেন। “ইংরেজ ডাক্তার” নাকি “আঁতুড় ঘর দেখে বিরক্ত হয়ে বকাবকি করেছিল।” জিজ্ঞাসা করি, সহরে বা মহঃশলে এরূপ আঁতুড় ঘর কোথায় আছে, যাঁহা দেখিয়া ইংরেজ ডাক্তার বকাবকি করিতে পারেন। ইংরেজ বিশেষণ কেন? বাঙালী ডাক্তারদিগের বাড়ীতেও আঁতুড়-ঘরের সেই রূপ ব্যবস্থা; তাঁহারা আর বকাবকি করিবেন কেন? একপাশ ত এই অর্থ? সম্পন্ন ব্যক্তির ত যে ঘরে বেশ হাওয়া খেলে, এইরূপ দেখিয়া দোতলার একটি পৃথক ঘর আঁতুড়ের জন্ত পাকা বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়া মেন, আর যাহারা সেক্ষেপ সম্পন্ন নয়, তাহারা নিত্য-ব্যবহাৰী ঘরের মধ্যে একটি ঘর সময়ে আঁতুড়ের জন্ত ছাড়িয়া দেয়, আবার চণপৌচড়া মিয়া তাহাতে একরাতি পুরু বাধিয়া ও নানারূপের পুজা দিয়া ব্যবহার করে। এই ত সহরের ও পশ্চিম-বঙ্গের পাড়াগাঁয়ের রীতি। পূর্ব-বঙ্গ ও উত্তর-বঙ্গের পাড়াগাঁয়ে সকলের পাকাবাড়ী নাই তাহারা মধ্য-উঠানে উঁচু ভিটা করিয়া গড়ের ঘর তুলে ও কানাগো বরে সমস্ত বেড়া লেপিয়া দেয়। এইরূপ আঁতুড় ঘর দেখিয়া কোন ডাক্তারেরই ত বিরক্ত হইবার কারণ নাই। তবে আর বকাবকি কেন? কলম দরাই বা কেন? এইরূপ আঁতুড় ঘরে জন্মিলেই যদি ছেলে মারা যায়, প্রসূতি মারা যায়, তবে আঁতুড়ের লেপক মহাশয়রা কলম ধরিতে সামর্থ্য পাটিলেন কি করিয়া? তাঁহাদের পূর্বপুরুষরা ত হিন্দু এইরূপ আঁতুড় ঘরে জন্মিয়া সেই আঁতুড় ঘরেই মারা গিয়াছেন। তবে তাহার এই ধারণাটা চলিতেছে কি করিয়া? এই আঁতুড়-ঘরের

দোবে “আমার নেয়েটি ত সন্ধান্তারার মত নগ্নকালের কস্তে উদয় হয়েই য়া” গিয়াছে। যখন এই নম্রের পত্রের অংশটুকু পড়িলাম তখন ধপধপ করিয়া হৃদয়টা কাঁপিয়া উঠিল, হাস বন্ধ হইয়া গেল, আমি তখন আর আমি নাই। পাশে থাকা খেলিতেছিল, “বাঠ বাঠ বঠের বাছা” বলিয়া তাহাকে একটি চুনো খাইলাম। থোকা আমার মুখের দিকে ঋণিকরূপে কাল কাল করিয়া চাহিয়া হাসিয়া কেলিল আমি সেই হাসি দেখিয়া ও সেই হাসির সঙ্গে উপরমাতীর দুইটি ক্ষুদ্র দাঁত দেখিয়া সব ভুলিয়া গেলাম, আবার চুনো খাইলাম “বহ বলে নন্দ নন্দ তত পায় দেবীর বস্ত্র” এই ভাবিয়া মনকে প্রবোধ দিলাম।

আমায় ত বেয়ে হইতে নাই একটি থোকা হঠাৎ সেটিত আমার সঙ্গেই আছে। এই যে তোমাকে আমি পত্র লিপিতে বসিয়াছি থোকা আমার কাছে বসিয়াই কুটি কুটি করিয়া কাগজ ছিড়িতেছে, আর সেইগুলি ঘরময় করিতেছে, এক একবার দোয়াতে আঙ্গুল ঢুকাইয়া বিছানার ছাপ নারিতেছে। ঠ্যা থোকাকে দেখিতে তোমার ইচ্ছা হয় না? এ সময়ে থোকাকে দেখিলে একেবারে মুগ্ধ হইয়া যাইবে। তুমি পত্রে লিখিয়াছ,— তুমি ২৫ দিনের ভিতরে ৮৩গম্মাথ বর্ণনে আসিবে। তা শীঘ্র আইস। আমরা এক সঙ্গে প্রভুর মুখপত্র দেখিয়া কৃতার্থ হইব।

দেখিবে, সমুদ্রে অকূল অতল রক্ত-ধবল ভলধি পর্কভের মত তরঙ্গ ভুলিয়া তীরক্ৰমিক গ্রাস করিবার ভক্ত বার বার ছুটিতেছে, বার বার দেবাদিদেবের অমোঘ শাসনে বাধা পাইয়া মাথা মাছড়াইয়া সরিয়া বাইতেছে, আবার ছুটিতেছে। তোমরা ততরীর দোকানে মাসের আলমারায় আবদ্ধ চুণি পাত্রা ঠীরা নিকে হা করিয়া তাকাইয়া থাক, আকাশে রামধনু উঠিলে হা করিয়া রেখ, স্বরকে পর্য্যন্ত ডাকিয়া রেখাও; কিন্তু সমুদ্র দেখিলে আর সে সব সাধ থাকিবে না। সমুদ্রের বৃকে সদা-সর্বদা কেবল চুণি, পাত্রা, ঠীরা, মুক্তা উৎখলিতেছে। রামধনুর ত সীমা-সংখ্যা নাই। সমুদ্র যেমন বৃদুস্ত তেমনই ভীষণ। ইহার ঘন-ঘোর গর্জনে কাণে তাল লাগিয়া যায়। ঝড় উঠিলে ত কপাই নাই। কাহার সাধ সেই ভীষণ ভৈরব মূর্তির তাণ্ডন তাকাইয়া দেখে? মূর্ত্তের মধ্যে শক্ত—সত্ত্ব জাহাজ চুরমার হইয়া যায়। সমুদ্রে হাকর-কতীরের অস্ত্র নাই, কিন্তু জগৎস্বামী ভক্তসিগের ভক্ত ভীরের দিকে সমুদ্রে সাতটি তরঙ্গময় অস্ত্রের দুর্গপ্রাচীর করিয়া রাখিয়াছেন। হাকর কুমীরের সাধ কি এ দিকে এগোর। সমুদ্রের উচ্চ ভীরে জগন্নাথ দেবের উচ্চ প্রাসাদ; সেই মন্দিরে যদি-বেদিকার উপরে বিশ্বমূর্ত্তি জগন্নাথ ভক্তকে যেন আলিঙ্গন করিবার ভক্ত বাক বাড়াইয়া রহিয়াছেন। জগন্নাথের কপালে ধক ধক

করিয়া প্রকাণ্ড নগ্ন জলিতেছে : বোধ হয় যেন ঐটি দেবাদিদেব মহাদেবের অগ্নি-বসী চক্ষু :। তরু কুতাহলিপুটে সম্মুখে দাঁড়াইয়া দেবাদিদেবের নৃপচক্রকে দেখি-লেই কুতাপে হইয়া যায়, আর তাহার কোন বিষয়ে অভিলাষ থাকে না। ললাটস্থ সেই চক্ষু যেন অধিবর্ণ করিয়া ভক্তের কানকে পুড়াইয়া একেবারে ছারখার করিয়া দেয়। শব্দের সম্মুখে ত এই ভাবে প্রতিফলন মনন-ভঙ্গই হইতেছে। হিন্দু-ধর্মে হিন্দু-শাস্ত্রে সন্ন্যাসের সহিত ঈশ্বরের বিবাদ-বিসংবাদ, যুদ্ধ-বিগ্রহ নাই। যুদ্ধ-বিগ্রহ হইবে কি ? ঈশ্বরের সম্মুখে সন্ন্যাস কান টিকিতেই পারে না। কণাটি নম্র রাখিয়াছি। তুমিই এক দিন বলিয়াছিলেন, কানের আর একটি নাম স্কন্ধ (হৃৎ-শব্দ)। বলিতে পারি না এই শব্দটি অহিন্দু দেশে দাঁড়াইয়া যে সন্তানটি প্রসব করিয়াছে, তাহার নাম সন্ন্যাস কি না। আরও একটি মজার কথা শুনিলে আশ্চর্য্য ভাবিবে। যাহারা সমুদ্রের নগ্ন দেহিবার ভয় ভীরে আসিয়া দাঁড়ায়, তাহারা সমুদ্রের গভীর গর্জনে ভয় পাওয়া আর সমুদ্রে নানিতে বা সমুদ্রের দিকে এগোতে সাহস করে না। অল্প দূরেই জগন্নাথ দেবের মন্দির। সেই পুরীর প্রাচীরের ভিতরে প্রবেশ করিলেই শত কামানের মত সেই শব্দের এক বিন্দুও কাণে আসে না। সেখানে কোন ভয় নাই, কোন ভাবনা নাই—আনন্দমন্দের আনন্দমহাভারের প্রসার লইয়া বাও, মাথায় ছাত পোছ, বিশ্বমুখি ভগবানের প্রসন্নমুখীর মুখি দেখিয়া আনন্দে মাতোয়ারা হও, আনন্দহারা হও।

সংসার-সমুদ্রেরও লবণাধুনগে ভাস্কর-কৃষ্ণীরে অস্ত্র নাই; তরঙ্গ-আবর্তেরও অস্ত্র নাই। এক একবার ভিতর হইতে জন্মিয়া বা বাহির হইতে আসিয়া কড়-তুফান যে সমুদ্রকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলে, তাহারও অস্ত্র নাই। ইহারও তরঙ্গের উপরে নায়নার তীরা, চুণি, পায়া, মুক্তা। নর-নারীর মন প্রাণ মুগ্ধ হইয়া যায়। কিন্তু ইহারও ভীরে দাঁড়াইলে ইহার গভীর গর্জনে ভীত হইয়া নানব আর ইহার দিকে এগোতে সাহস করে না। এইটিই বৈরাগ্যের ধাপ। এই ধাপে উঠিয়াই যাহারা আর উপরে উঠিতে চেষ্টা করে না, তাহাদিগের ভয়েও ভয় যায় না। বুদ্ধদেবের শিক্ষাগণ এই পর্যায়ে উঠিয়াছেন। ইহার উপরেই বিষ্ণু-মন্দির; সেখানে সংসার-সমুদ্রের শত বজ্রনাদের এক বিন্দুও পৌছিতে পারে না। এট শিক্ষা দিবার ভক্তই বৃন্দ দেবাদিদেব বিশ্বনাথ জগন্নাথ অসীম সমুদ্রের বেলাতুনি—পুরী-ধামে এই ভাবে নিত্য বিরাজ করিতেছেন।

যদিও আমার মুখে এইরূপ কথা শুনিলে, লেখক হয় ত আমাকে অত্যন্ত কুসংস্কারসম্পন্ন মনে করিয়া আমার প্রতি বিজাতীয় ঘৃণা পোষণ করিবেন তথাপি সত্যের খাতিরে আমি বলিতে বাধ্য। আবাদিগের মত যাহাদের ছাদন

নড়ী নাই, বেসকল মহীশূরী মহিলা একমাত্র সমুদ্র-সমীরণ-সেবার উদ্দেশ্যে সাগরসৈকতসৌধে বাস করিতে আসিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যেও অনেককে গরদের শাট পরিধান করিয়া নরপদে পুরীপ্রবেশ করিতে দেখিয়াছি ও ভক্তিরূপে ভগবান্কে প্রণাম করিতে দেখিয়াছি। বিলাতপ্রভাণ্ডিত তাঁহাদিগের স্বামীরা হস্তবেশে সেই সন্ধ্যা ছিলেন কি না, নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না। বাস্তব-লেখকের অনেক গানে, অনেক কবিতায় অনেকবার ভগবানের হস্তপদমূলের কথা শুনিয়াছি। তাঁহার মুখে বহুনাকুলে কিশোর স্ত্রীমূলের মধুর বংশীধ্বনিও শুনিয়াছি। তাঁহার প্রদর্শিত কৈলাসনাথ ও গঙ্গাধরের তাণ্ডবকাতও দেখিয়াছি। কিন্তু সেগুলি নাকি স্বপ্নবৎ অবাস্তব, আর বাস্তব হইতেছে “অলসারতন”-প্রভৃতি এবং আমার নামের সেই ভাল পত্রখানি। তবে আর কি বলিব ?

পত্রে আছে, “সমস্ত আকাশকে কাঁদিয়ে দিবে বাঁশী বাজতে লাগল—তোমাদের বাড়ীতে এসে উঠলুম।” বাঁশীর স্বরে আকাশ কাঁদে কেন ? এর রোমান্টিক ব্যাখ্যাটা বৃথিমান না। বাঁশীর বাজানটাট বা কি, আকাশের কানটাটাই বা কি আরও আছে, “আমার রূপের দরকার কি ছিল তাই ভাবি, রূপ ভিনিসটাকে যদি কোন সেকেন্দ্রে পণ্ডিত গঙ্গামুক্তিকা দিয়ে গড়তেন, তা হ’লে এর আমার থাকত—কিন্তু ওটা যে কেবল বিধাতা নিজের মানকে গড়েছেন, তাই তোমানের ধর্মের সংসারে এর দাম নেই।” আমার পৃষ্ঠনীয়। স্বজ্ঞাতকরাণী কি তোমানের সংসারের কেউ নছেন ? কারণ, ই পত্রেই যে আছে,—তোমানের বড়-বউয়ের রূপের অভাব মেজ দউকে দিয়ে পূরণ করবার ভয়ে “তোমার নামের একান্ত জিন্ ছিল।” আরও আছে “মেয়ের রূপের উপর ভরসা,” তবে আর হিন্দুর “ধর্মের সংসারে” রূপের “দাম নেই” কেমন ? একটুখানি পত্রে এইরূপ আগাগোড়া নিল নাই দেখিয়া হতভম্ব হইলাম। “তোমার নামের একান্ত জিন্ ছিল” কি অবিনয় ! তোমরা এই ভাবে মেয়েদিগকে শিক্ষা দিবে ? স্বামীর মাতুলবৌর সহিত বৃদ্ধি স্থির কোন সম্পর্ক নাই !!! “সেকেন্দ্রে পণ্ডিতের” উপরে লেখকের যে কারণেই রাগ থাকুক না কেন, তাঁহার পূর্ববর্তী, ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা না হই-সেও বিত্তীয় পিতা কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের বেদীর উপরে “সেকেন্দ্রে পণ্ডিত”কেই বসাই-রাইছিলেন। কেশবচন্দ্র ক্রোড়ে, ক্ষোভে, বাহির হইতে চাছিলেনও বাহির হইলেও, সে দ্বিকে জ্বলিয়া না করিয়াই তিনি উপবীতশূন্য ব্রাহ্মণকে বা ব্রাহ্মণের বর্ণকে আচার্য্যের আসনে বসাইতে সম্মত হন নাই ও “সেকেন্দ্রে পণ্ডিতের” সেকেন্দ্রে ৬৭এর দীর্ঘ জীর্ণ তালপত্রে লিখিত পুস্তকের ব্যবস্থা দেখিয়া, অসবর্ণ-বিবাহে, সগোত্র-সপিও-বিবাহে কখনও প্রস্তর দেন নাই—এবং বিবাহ হইতে পাণিগ্রহণ সপ্তপদী-

পমন উঠাউয়া বেলেঙোৱী প্ৰণাৱ প্ৰবৰ্ত্তন কৰেন নাই। অবন্ত একেণে “তেনামি তাতাধিকঃ”-দিগেৰ ব্যবহাৰ অক্লৰূপ হইয়াছে।

“বিধাতা” বৃত্তি “নিভেৰ আনন্দে” স্বৰূপেৰ ক্ষতি কৰেন, আৰ “ভূপে কুংসিতের ক্ষতি” কৰেন ? এ নূতন সিদ্ধান্তটি বোধ কৰি নূতন দৰ্শন, নূতন বিজ্ঞানেৰ উদ্ভাবনে নূতন বাহিৰ হইয়াছে; কাৰণ, এত দিন এ তত্ত্ব কাহাৰও মুখে শুনি নাই। “নতুন” না বলিবা নূতন বলাতে হয় ত তিনি ৰাগ কৰিবেন। তত্ত্ব ব্যবহাৰ থাকুক বা না থাকুক, “নতুন” কষ্ট চালাইতে হইবে। নূতন যে সংস্কৃত শব্দ। নূতন চালাইলে বাগলা ভাষাৰ মান থাকে কি কৰিবা ? ওৱিদ্ধিকালিটি থাকে না। স্বতরাং খুড়াকে খাড়, হুড়াকে নাড়, তুলাকে তাদ, উলাকে আদ, সুধাকে সাধ, বৃথকে বধ, নৃতিকে লিচু কৰিতে হইবে। “নতুন” কথাৰ কিন্তু নূতন অৰ্থ আছে। নতু উন, নতুন। কাহাৰও অপেক্ষাৰ ছোট নহ অৰ্থাৎ “নতুন”ওলা কেইকই কাৰা নহ, সবাই তোহা। কিন্তু এ বাধ্য হয় ত অপত্তি হইবে। ইহা সংস্কৃত—বাগলা নহে। “আবাৰ বীৰবল” বলিবেন এ যে “পড়ম পট্‌পটায়নান”। অক্লৰূপ বাধ্যও আছে। আমাৰ পিতাৰ বাড়ীৰ কাছে একটি কাঠেৰ টোল আছে। আমি ছোটবেলাৰ সেখানে কখন কখন যাউতাম। চান্দালকাৰ মহাশয়কে পড়াইতে শুনিয়াছি,—ভট্টবাৰ “না” বলিলে “ঈ” হয়, ভট্টবাৰ ‘ন’ বলিলে যাহা নহ বলিতেছি, তাহাই হয়; “নতুনে”ৰ আগে একটি ন ও পিচনে একটি ন স্তভয়াং তু নহ এটি নহ অৰ্থাৎ তু। তু এৰ কিন্তু ও একটি অৰ্থ আছে। “কা” এৰ মত তু দীৰ্ঘ হইয়াছে। উচ্চকণ্ঠে বলিলেই ত দীৰ্ঘ হয়। কায়ে কানেই “নতুন”ওলা একেবাৰেই কিন্তু। এ’ৰ ভিতৰে আৰ একটুকু মজা হইয়া গেল। এতক্ষণ যে নতুনেৰ দীৰ্ঘ তু লিখিবা এত ব্যাখ্যা কৰিলান। পত্ৰখানি দেখিবা সে মনও নাটী চটয়া গেল। পত্ৰে দেখিলাম, “নতুনে” দীৰ্ঘ উকাৰ নাই—ব্ৰহ্ম উকাৰ। তা যদি ব্ৰহ্মকে দীৰ্ঘ কৰা যায় ত দীৰ্ঘকে ব্ৰহ্ম কৰিতে কতক্ষণ! ব্যাখ্যাৰ দীৰ্ঘ কৰা গেল, কায়ে ব্ৰহ্ম থাকুক না কেন, মোস কি ?

বীৰবলেৰ কথাটা যখন উঠিল, তখন বীৰবল কে, প্ৰসঙ্গত: তাহাৰও ব্যাখ্যা কৰা উচিত। দ্বীপীশ্বৰ আকবৰও নাট, তাহাৰ সভাসন্ বীৰবলও এখন নাই। এ বীৰবল কোন ৰাজ্যৰ সভাসন্ কি না, জানি না। তোমরাই ত বল—চন্দ্ৰেৰ নিয়ন্ত্ৰ কৰিবা নাট, স্বৰ্গেৰ কৰিবা চন্দ্ৰেৰ কৰিবা! স্বৰ্গেৰ অসহ কৰিবা চন্দ্ৰে আসিবা ঈতল হইয়াছে। এও তাই; ৰবিৰ বলই ‘সব্জপত্ৰে’ৰ সম্পাদকে আসিয়াছে, তাই তিনি বীৰবল হইয়াছেন! “নতুনে” কেবল স্বৰবৰ্ণেৰ বিপৰ্যায় ও দীৰ্ঘে ব্ৰহ্মেৰ বাধ্য।

এখানে বীরবলের বীরে রবির সম্বর ব্যক্তিবর্ণের বিপর্যায়। বলিতে পারি বীর-বল দীর্ঘ হউল কি করিয়া? একদম প্রথম উত্তরে বলিতে পারি, “কী”বৎ। দেখ, অধিকাংশ লোক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর না বলিয়া রবি ঠাকুর বলিয়া থাকে। উক্ত নাম অস্ত্রের পিছনে ছাড়ে নাট; রবির পিছনে লাগিয়াও টিকিতে পারে নাট। এখন ইন্দ্রনাথ যে মুগ্ধ। নন-নদী সমুদ্রে জল ঢালিয়া শুষ্ক চইলেও সমুদ্রের নদীতি যায় না, স্রুতরাঃ রবী দীর্ঘ। রবির ত্রৈলোক্য “গেলুম, গেলুম, নতুন, কী” থাকিলেও একটু একটু “পটুপটারমান খড়মে”র শব্দ আছে। বীরবলে তাহা নাট। বীরবল যে বুট চাড়িয়া খড়ম না ধরিয়া নগ্নপদে সরস্বতীর মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছেন। ভক্তিমান! ভক্তির পোলা বহুপদেই প্রতিপন্ন হয় যে তিনি। কালিদাসও “চন্দ্রপানৈঃ” বহুবচন ব্যবহার করিয়াছেন। তবে তাঁহার প্রতিবেশীরাও যে তিনি নগ্নপদ চইলে তাঁহার পদাঙ্কের অনুসরণ করিতে পারিবে না—তাহা নিশ্চয়।

হিন্দুর “ধর্ম্মের সংসারে” রূপের “দাম” না থাকিলে বিবাহের আগে যেহেতু পছন্দ করিবার জন্য বরণক্ষীরেয়া নন-নদী পার চইয়া পপত্রেশ হুগিয়া কস্তার বাড়ী যায় কেন? কস্তা-দেবার পছন্দিটা যদি হিন্দুসমাজে নাট, তবে সেই ভাল পত্রে কস্তা দেখা লাউয়া এত তীব্র ব্যস্ত কেন? রাগিলে নাড়ব ঠিক থাকিতে পারে না, আগাগোড়া ঠিক রাগিতেও পারে না। রাগের কারণ—হিন্দু-সমাজে কেন কোট-সিপের ব্যবস্থা হয় না? কোটসিপের ব্যবস্থা করিলে যে সঙ্গে সঙ্গে ডাউডোসের ব্যবস্থা করিতে চইবে, সেটুকু মনে আছে ত? রূপজ মোহের প্রলোভনে পড়িয়া যুবক-যুবতীরা আর গুণের পরীক্ষার প্রতীক্ষা করে না। হিন্দু যাহাদের মোহ চইতে পারে, তাহাদের হাতে বর-কস্তা-নির্কাচনের ভার দেয় না। আরও দেখ, রূপ অপেক্ষা গুণের আদর অধিক করে। শুধু বরকস্তাকে দেখিয়াই নিশ্চিন্ত হয় না, তাহাদের সাত পুরুষের পর্যন্ত গুণের পরীক্ষা করে, কোজী পর্যন্ত মিলায়। ইহাতে স্ত্রীরাগ চইবারই কথা। রূপ অপেক্ষা গুণের আদর কি কেবল এই দেশে? সে ত সর্বত্র। হিন্দু-সমাজে গুণবৃত্ত রূপের অত্যন্ত আদর, শুধু রূপের আদর নাট। শিশু-কুলের ও মাকাল-কুলের একেবারে আদর নাই। তবে যদি গুণদে লাগে, সে স্বতন্ত্র কথা। প্রমাণ—কুরুপা ভরতী দেবী। তাঁহার কুরুপ অনেক-দিন অগ্নিদেব জীর্ণ করিয়াছেন; কিন্তু গুণ জীর্ণ করিতে পারেন নাট, আজও অনেকের নুখে তাঁহার সংকৃত কবিতা অনিতে পাওয়া যায়। তিনি তাঁহার কুরুপে বিরূপ স্বামীকে সংকৃত কবিতার পত্র লিখিয়াছিলেন। তাঁহার বন্দ্যার্থ এট বে—“মুখ” ভরত! তুমি যে রূপের বাহ্যে ও বহুবিধ সৌরভে কুলের দিকে আকৃষ্ট হইতেছ, এ রূপটুকু যে কনস্বারী, বাসি হইলে

রূপের সঙ্গে সঙ্গে রূপের দৌরভট্ট হুও বে উবিয়া যায়। সুগমবে রূপ নাই সত্য। কিন্তু তাহার দৌরভ রূপভাৱী নহে, আবার সে দৌরভ বেদ-ভুল'ত।" এক বিতাটিও অনেকের মুখে মুখে আছে। পরে আছে "আমি লুকিয়ে কবিতা লিপ্তুই। —সেখানে তোমাদের অক্ষর-মহলের পাঁচিল ওঠেনি।" তবে ভগবতীর কবিতাও নো। কেন তোমরা মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছ? পনার বসনগুলিই বা কেন মুখে মুখে অনিতে পাট? করিন্দপুর জিলার অধ্বগত ননীকীরগ্রামবাসী ৮ বজ্রধর বিদ্যালয়দ্বারের নবতিবসবরত্না নাতা আতও কলাপ ব্যাকরণ অব্যাপনা করিয়া থাকেন। তবে এ সকল স্থানেই বা কেন তোমাদের অক্ষরের পাঁচিল ওঠেনি?" জানিয়া অনিয়াও ত "পাঁচিল ওঠাওনি।" কেবল আমার ভাগ্যে এই "পাঁচিল ওঠাইবার" কথা ছিল! প্রাচীন কালেও স্ত্রীশিক্ষা ছিল। এখন ত পল্লীগ্রামে পর্যন্ত গরে ঘরে স্ত্রীশিক্ষা আছে। কেবল নবো দিন কতক ছিল না। ছিল না বলিয়া কেহই শিক্ষিতা ছিলেন না, এ কথা ঠিক নহে। নবো-সময়েও জবস্তীর নত চট চারি জন মহিলা অত্যন্ত বিদ্বা ছিলেন।

গোপ্তক হিন্দুর বাড়ীতে গোদেবতার অথ দেনিয়া, গোবৎসের কট দেনিয়া কট চটবারট কথা। তবে কথা কি, —আমাদের ত বাড়িয়াই পাইতে হয়, বল জন চাকর রাখি কি করিয়া? হুতরাং গোসেবার জন্ত নিছিত চাকর রাখা অসম্ভব। কাখে কাখেই মাড়টা ভাতটা পুজার ফুল-বেলপাতাগুলি দিয়া গোসেবা করিতে হয়। শুধু আমার দাড়ে ফেলিলে হইবে কেন? দিদিও যে কাক ভালে এ কাখে বোগ দিন। বোগ না দিবারও ত উপায় নাই। মার চক্ষু ঠাকুর দেবতার কাণের মত সঙ্গী। ঐ দিকে থাকে। কলিকাতার বাড়ীর উঠান ছোটখাট, এ কথা অতি সত্য। ব্যাগা না পাইলে কি করা যায়? বাড়িরে ছোড়িয়া দিবার কি সম্ভাবনা আছে? প্রতিবেদী রূপা করিলেও পুলিশে যে রূপা করে না ধোয়াড়ে দেয়। আবার নিভুতে পাইলে কসাই যে কি করিবে, তাহাই বা কি করিয়া বলি? পূর্বে কেবল ইংরেজ নুসলনানেরই এই দিকে নোভ ছিল। এখন যে কুসংসারে জঙ্করিত সমাজের ভগবন্তা দেখিয়া অক্লিষ্ট-মুখে অনেক ধরের শত্রু বিভীষণ মহাম্যাকেট হিন্দুমানীর হৃদয় প্রাচীরে সবলে শাবলের আঘাত করিতে দেখি। তাহাতে অনেকটা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সেই ভগ্নপথে বাড়ির হইয়া অনেক ধরের ছেলেও যে কসাইকে রূপা করেন।

দল-শালা বন্দোবস্তের সময়ে জমিদারগণ উহাদিগের পূর্বদত্ত দেবত্র ব্রহ্মত্ব ভূমির জায় গোচর-ভূমিরও খাজনার বাপ লইয়াছিলেন। ক্রমে তাহারা সেগুলি প্রত্যাগতন করিয়া আশ্রয় রাখিয়াছেন।

গরুর উপর রূপা করিতে করিতে ভেড়ার উপরে লেপকের রূপা উপলব্ধি।
উঠিল ! চাকুরিজীবী তোমার সে আবার জমীদারি আছে, আগে তা জানিতাম
না। তোমার সেই জমীদারের প্রজা তোমার আহারের জন্য তোমাকে নাকি
একটি ভেড়া নজর দিয়াছিল। আমার একান্ত প্রার্থনায় তাহার সহিত নাকি
তোমার উদরের বনিষ্ট সম্বন্ধ হয় নাই। আজ্ঞা, ভিজ্জালা করি, হিন্দু-সমাজে কি
মেঘনাংস আহারের সেক্ষেপ প্রচলন আছে ? দুর্গা-পূজার কাহারও কাহারও
বাড়ীতে মেঘ-বলি হইয়া থাকে। বলি হইলেই তাহা বাড়ীতে লটকা যায়, ইহাট
ত জানি। “সে কেলে শক্তিতের” উপদেশে পশু-পক্ষী কীট-পতঙ্গ কেন, গাছের
পত্রান্ত আত্মা আছে, হিন্দুর বিশ্বাস। ঈশ্বর মানুষের আহারের জন্য জাগে আবদ্ধ
কর্তব্য পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গ মানুষের সম্মুখে ফেলাইয়া দিয়াছেন, এ বিশ্বাস হিন্দুর
নাই। মনুষ্য ভিন্ন অন্য কোনও প্রাণীরই আত্মা নাই, এ বিশ্বাসেও হিন্দু প্রবেশ
করে না। বাহাদুরিগের বিশ্বাস সেটরূপ শাস্ত্র চইতে গৃহীত, উহাদিগের তিহ্মা
মটনচপের ক্ষুদ্র লোলুপ হইতে পারে। দাণ্ডয়ানন্দী মহাত্মার বাগানের সম্ভারটি
দেওয়ান্দী মহাত্মার উদরে আভিঃগ্রহণ করিয়াছে, এই কথা শুনা পর্য্যন্ত বেদান্ত-
বাসীশ সে আর তাঁহার বাগান মাড়ান নাই, এ কথাও সুবিদিত।

“বিধবা মার মৃত্যুর পরে আমার বড় ভায়ের বোন বিন্দু তার খুঁড়তত ভাইদের
অত্যাচারে আমাদের বাড়ীতে তার দিদির কাছে এসে যে দিন আশ্রয় নিলে,
তোমরা সে দিন ভাঙ্গে, এ আবার কোণাকার আপদ।” প্রকাণ্ড হিন্দু-সমাজের
ভিতরে কোন স্থানেই যে “খুঁড়তত ভাইদের অত্যাচার” নাই ও বিপন্ন আসিয়া
গলগ্রস্ত হইলে কেহই যে “আপদ” মনে করে না, এ কথা বণিতে পারি না। এত
বড়, তা, এত লিপালিপির চোটে সম্বন্ধেও হিন্দু এখনও বিপন্নকে একমুষ্টি অন্ন দেয়,
এখনও হিন্দুর সংসারে দুই একটি বিপন্ন বিধবার স্থান বজায় আছে। এখনও হিন্দু
মুষ্টিভিক্ষা বন্ধ করে নাই। এখনও কানী প্রভৃতি তীর্থস্থানে হিন্দুর অন্নসত্র চলি-
তেছে। সংস্কারকর্মণ একরূপ স্থলে কি করেন ? কেবল আবলগ্নন-শিক্ষার উপদেশেই
কি কর্তব্য পর্য্যবসিত হয় ?

“এটা বেশ বোঝা গেল, পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে অকিঞ্চিৎকর মানুষকে আশ্রয়
কেন্দ্রাই সব চেয়ে কঠিন ! আশ্রয়ের দরকার তার বহু বেশী, আশ্রয়ের বাধাও
তার ভেতনি বিষয়।” এত “কঠিন” কেন ? “বাধাই” বা এত বিদগ্ধ কেন ? এ যে
ভগবানের সঙ্গে যুদ্ধ ; আমরা হিন্দু মেয়েরা ও হিন্দু পুরুষরা কষ্ট পাইলে বা
কষ্ট দেখিলে যাহা বলিয়া শান্তি পাই, পত্রে সেই কথাটুকু উদ্ধৃত করিয়া আবার
আল খাড়া হইয়াছে ! কথাটুকু এই, “ওর পোড়া কপাল, তা জুখ করে কি কনুস ?”

আরও আছে “কপালে যদি ভাং পাকে ত কেউ খণ্ডে পাবে না।” আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, কেহ খণ্ডটিতে পারে কি? ভাল পাত্র আছে, জানিয়া তনিয়া বিন্দুকে পাগল বস্ত্রের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া চইয়াছে। বিবাহের পূর্বে সে পাগল ছিল না। এক-এ, পরীক্ষায় সে সধ্যমরূপ পাল করিয়াছে। গণিয়া বলিতে পারি, বিবাহের ঠিক আট মাস পরে সে পাগল হইয়াছে। বিন্দুর স্বামী ভিন্ন অল্প কেহ কি বিবাহের পরে পাগল হইয়া নাই বা হইতে পারে না? উত্তর কি? এত দেখিয়া তনিয়া বিবাহ দেওয়ার আগে স্বামী পাগল হইল। “কপাল” ভিন্ন উত্তর আছে কি? “অদৃষ্ট” ভিন্ন উত্তর আছে কি? সমস্ত পূর্ণ হইলে কি কাঙ্ক্ষাকেও রাখা যায়? অদৃষ্ট ভিন্ন উত্তর নাই। উক্তের উচ্চায়াত্র বলিলে তাঁহাকে ধামধেনুগণি সাক্ষ্য কর। তাহা হইলে তাঁহাকে আর স্বাস্থ্যপত্রও বলা যায় না, দয়াবানও বলা যায় না। আবার কেহ আজন্ম অল্প, আজন্ম পদ্ম, আজন্ম বিকলাঙ্গ। বলিতে পার, এগুলি হয় কেন? এ অল্পে ত সে কোনরূপ অনিরম করে নাই। বলিবে, পিতা-মাতার দোষে হইয়াছে। উত্তরে বলিব, সেরূপ পিতার ঐক্যে সেইরূপ মাতার গর্ভে সেরূপ ছেলে হয় কেন? পিতা-মাতার আত্মা আর ছেলের আত্মা ত এক নহে। একের পাশে অল্পে ভোগে কেন? এ কেমন দিয়ার? শাস্ত্র না জানিয়াও শাস্ত্রের উপর টিটকারি বড় অসহ। শাস্ত্রে কি পাগলের বিবাহ দিতে বলিয়াছে? না বারণ করিয়াছে। উদ্ভাদ, গন্ধা, প্রভেদ গুরুত্ব রোগ হইলে একেবারে তাহার বিবাহ শাস্ত্রনিষিদ্ধ। কোন “সেকলে পণ্ডিত” ইহার অত্মোন্নয়ন করিবেন না। শাস্ত্রে যখন এ বিবাহ নিষিদ্ধ, তখন এ বিবাহে সংস্কারকের আনন্দ প্রকাশ করাট ত কর্তব্য পাতার উল্টা দিকে পাওয়ার মত শাস্ত্রের উল্টা। বলাট ত কলিকালের প্রকাশ ও ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যরক্ষা। উদ্ভাদ নাহয় নহে, উদ্ভাদ রোগ পত্রে আছে—“সে এক এক দিন এমন উদ্ভাদ হয়ে ওঠে,” “সকাল তারার মত উদয় হ’লেই অস্ত গেলে” ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক আছে। আমি ত সেইগুলি দেখিয়া লজ্জার ও ভয়ে ভড়সড় হইলাম। ‘ব্যাকরণ-বিভূতিকা’র তৃতীয় সংস্করণ হইলে লিখিত বাবু কি আমাকে রেখাত করিবেন? তখন আমায় দেখা কি হইবে? এই যে “পোনেন্নো বড়র” কবিতা লিখিয়া পোনেন্নো হাড়ী শুভ বশ: প্রচ্ছন্ন করিয়াছি, একবিন্দু গোমুত্রে যে সবগুলি ঠৈ হইয়া বাইবে! যিনি খেতবীপ-কীরসমূহ মনন করিয়া পুরস্কার-কৌতুহলপাণি পাইয়াছেন, তিনি পণ্ডিত আমাকে কবি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এগুলিকে আর বলিয়া মানিয়া লইতে পারি; কিন্তু তাহা নহে। তিনি যেমন সমাজটাকে ভাঙ্গিয়া ছুরিয়া যথেষ্টাচারিতার একটা নূতন সমাজ করিতে চাহেন, গাংবাটাকেও সেইরূপ ভাঙ্গিয়া ছুরিয়া নিরমেক দণ্ডী ছিড়িয়া নূতন করিয়া গড়িতে চাহেন! ইহার

দোষগুণ বুঝাইয়া তাঁহাকে সংপথে আনা আমার মত হৌলোকের কন্ম নহে । সেই পত্রেই যে আছে, “আমি বেটাকে ভালো বলে বুঝি, আর-কারো পাতিরে নন্দ বলে মেনে নেওয়া আমার কন্ম নয়—তুমিও তার অনেক প্রমাণ পেরেছ।” এক মাত্র তুমি কেন ? জগৎজ্ঞ এই ক্রি ক্রি প্রমাণ পাটয়াছে। “তানিস্ ত, বিন্দী, পতিই হচ্ছে হৌলোকের গতিমুক্তি সব।” “পাগল হোক ছাগল হোক স্বামী ত বটে” আনাদিগের নিত্যব্যবহৃত এই দুইটি কথা লইয়া লেখক রাগিয়াই আগুন। তিনি আগুন হউন, আমাদের কি ? আমরা চল আছি, চলই থাকিব। যা বলিয়া যা ভাবিয়া শান্তি পাই, স্বপ্ন পাই, আনন্দ পাই, হোনার কথায় তা চাড়িব কেন ? চন্দ্রাতলবাসী বিলাসী হোনার কথায় অরণ্য-বাসী কবির কথা ছাড়িব ? অহঙ্কারে আত্মবিনাশ হয়, অঙ্গে ঈশ্বরের স্মরণ অভভব করিলে, অঙ্গে ঈশ্বরের অধিষ্ঠান নহে করিলে আত্মার উপলব্ধি হয়। বেদান্তবাগীশ মহাশয় যখন হোনাকে এই সকল তত্ত্ব বুঝাইতেন, আমি আড়ালে থাকিয়া তাঁহার সমস্ত কথা মনোযোগের সহিত শুনিতাম ও সেই রূপ করিবার চেষ্টা অভ্যাস করিতাম। ইহারই নাম কি প্রতীকোপাসনা ?

“কন্তুরোগীকে কোলে করে তার স্ত্রী বেস্তার বাড়ীতে নিয়ে পৌছে দিগেছে। সতী-সাম্বীর সেই দৃষ্টান্ত তোমাদের মনে জাগছিল ; জগতের মধ্যে অদ্বৈতের কাপুরুষতার এই গল্পটা প্রচার করে আসতে তোমাদের পুরুষের মনে মাত্র পর্য্যন্ত একটুও সন্দেহ হয় নি।” এই ত পত্রের বোল ! চারি ভাগে এদের বিভাগ করিয়া, বেদান্তমর্মন লিখিয়া, আঠারখানি পুরাণ আর “যা নাই ভারতে” তা নাই ভারতে” আঠার পক্ষে এমন একখানি প্রকাণ্ড পুণি রচিয়া অবশেষে এক জন কেচ্ছা-লেখকের হাতে কাপুরুষ সাব্যস্ত হইলেন ! জং করিবার যে গারগা নাই ! দিবসকে বুঝাইবার চক্র রাত্রির সৃষ্টি, পূর্ণিমাকে বুঝাইবার চক্র অমাবস্যার সৃষ্টি, রামসীতাকে বুঝাইবার চক্র রাবণের চরিত্র-অঙ্কন ।

পুরুষ হইয়াও যিনি একটি নারীকে মহামহিমাদিত্য করিবার চক্র স্বকাজীর একটি পুরুষকে এই ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন, যিনি মুক্তকণ্ঠে “হিরঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎস্ব” দর্শনমঞ্চে গাহিয়াছেন ; তিনি কি সাম্বী স্বীর নিকট হইতে বেঙ্গাপুংগমনের সাহায্য লইবার চেষ্টা অভিনায়ী ? হুঙ্কৃত পুত্র, হুঙ্করিয়া পত্নী ও কন্তাকে সংপথে আনিয়নের চেষ্টা এক ব্রাহ্মণ অনেক খরচপত্র করিয়া। তাঁহাদিগকে মহাভারত শুনাষ্টয়াছিলেন ; সে গল্পটি সকলেই জানে, তুমিও, জান, প্রচারকও জানেন। মহাভারত শুনিয়া তাহার কি বৃষ্টিরাছিল তাহা আর লিখিবার প্রয়োজন নাই। আমরা মূলমামনের মসজিদ দেখিলেও সেলাম করি, বুজ্জদেবকেও

ঈশ্বরের অবতার বলির পূজা করি। তবে "কহিলে ত্রিনিত হর, দেপাইলে
দেখিতে হর"। "সেটা তোমাদের গৃহদেবতার কিছুতেই 'সইবে না।' পত্রে
এই ভাবে হিন্দুর গৃহদেবতার উপরে তীব্র বাক আছে। বড় অসহ্য, বড় অসহ্য
আমরা মেয়েমানুষ ঠাকুরদেবতা লইয়াই থাকি কোনক্রমেই সহিতে পারি না।

"আমার ঘরকরার মধ্যে ঐ অনাদৃত মেয়েটার চিত্র যে দিন আগাগোড়া
এমন রঙীন হয়ে উঠল, সে দিন আমি বঙ্গলুম, জনরের ভগতেও একটা বসন্তের
হাওয়া আছে সে কোন স্বর্ণ থেকে আসে, গলির মোড় থেকে আসে না।"
বুকলিয়াম, আমাকে ভালবাসিতে বাসিতে বিন্দুর "চিত্র আগাগোড়া রঙীন হয়ে"
উঠিয়াছে; কিন্তু যাহার সহিত জুগনা করা হইয়াছে, সেই "গাঘের গাঘের নতুন
পাতাগুলি রাঙা টুকটকে হয়ে" উঠিয়াছে, কাহাকে ভালবাসিয়া? কবি কালিদাস
ত বসন্তের হাওয়া বহাইয়া মমর-মমরী, হরিণ-হরিণী সকলকে পাগল করিয়া
তুলিয়াছিলেন। মুনিদের চিত্তবৃত্তি কলুষিত হইয়াছিল। পত্রলেখক মহাশয়ও
মদন-ভাষ্যের পুরী মদনকে "জঙ্গ" ধরাইয়া "বাঘের সনে বাঘিনীকে" রাখিয়া
দিয়াছিলেন। তবে বিন্দুর যে আমাকে ভালবাসা, সে ভালবাসা কি? আমাকে
ভালবাসা উপলক্ষ্যমাত্র, সে বাঘিনী একটি বাঘের অন্বেষণ করিতেছে, ইহাই কি
ইচ্ছিত? এই বসন্ত নাকি স্বর্ণ হইতে আসে, গলি হইতে আসে না। আমরা
বলি, বিপন্নীত। হার 'নিবৃত্তিপটী' হিন্দুগণে জন্মিয়া কি এমন করিয়া প্রবৃত্তির
লেলিহান আওনের শিখর ঘী ঢালিয়া দিতে আছে; নির্ঝাণোন্মুখ আওনকে
কাগাইয়া তুলিতে আছে? আমরা মেয়েমানুষ এইরূপ অসীল কড়াব-আগান
পত্র, কাব্য, উপক্ৰাস, আমাদের কাছে যুগ। ভিতরে অসীল ভাবকে পোষণ
করিয়া বাহিরে অসীলতার প্রতি যুগাপ্রকাশ বড়ই নিষ্কার।

হিন্দু শিবপূজাও করে, কামাখ্যা-দর্শনেও যায়। তাহাতে হিন্দুর মনে কোন
কড়াব আইসে না।

আমাকে মারিবার ভয় লেখক "বালিকার (বিন্দুর) ডাকা-হুদয়ের ভিতর
দিগে আমার জীবনের ঘন পাত্রে", "স্বকৃত্তর বাণী" বাজাইয়াছেন। আঃ পোড়া
কপাল! আমি কোন্ ভাংখো মরিব? বিন্দুও ত মরে নাই, সে যদি পাগল
স্বামীর সেবা করিয়া সুখ পায়, তবে আমি জন্মজন্মান্তরের ভগত্যার "রূপে
কার্ত্তিকের, গুণে গণপতি" তোমার মত এমন স্বামী পাইয়া কেন মরিব?
আমি যে সে মেয়েমানুষ কি না যে একখানা পত্র পড়িয়া, কণ্ঠাদের রচা
রূপকথা পড়িয়া, আর দুইগা রেহনতার ভঙ্গ কণ্ঠারা মেমোরিয়ালের বনোবন্ত
করিতেছেন জানিরা, ভগবান্ যাহা নিঃসংশয় প্রস্তুত করিয়াছেন, অন্যায়সে সেই

ধরখানা ডাকিয়া ফেলিব : আমি যদি মন্দির নিয়া কুঁড়ে-ঘর করিত করিয়া লই, আর তাহা যদি অগ্নি লাগাইয়া কেহ পোড়ায়, তবে তাহার উপরে আমার রাগ পড়ে না : ইহাতে ভগবানের রাগ চইবে না ? সীতা মরেন নাই, লক্ষ্মী মরেন নাই, আমি মরিব কেন ? কেবল “সেকেলে পড়িত” নহে, তোমাদের হালের গুরুদের দেশের বুড়ো পণ্ডিতরাও যে “আত্মহত্যার মহাপাপ” বলিতেছেন। ষাঁহার কৃত্তের রাজ্যের খবর দেন, তাঁহার বলেন, “যারা আত্মহত্যা করে, তারা প্রতিক্ষেপে আত্মহত্যার কষ্ট পায়।” সুতরাং এটি “রাজমিস্ত্রীর গড়া দেয়াল নহে,” “ঘরো আটন দিবে গড়া কাটার বেড়াও” নহে, এটি বিশ্বনিয়ন্ত্রার গড়া কঠিন আটন। “মৃত্যুর বাশী” “যমুনাপারে”ই বাজুক, আর আকাশেই বাজুক, আমি কিছু মরিতেছি না। লেখক জাম ছাডিয়াছেন, জামের “যমুনা” ছাডিতে পারেন নাই, জামের বাশী ছাডিতে পারেন নাই। যেখানে সেখানে তাঁহার “বাশী” বাজিয়া উঠে : আকাশে বাজে, মৃত্যুর হাতে বাজে আবার তিনি নিজে বাশী হইয়া ভগবানের হাতেও উঠেন। ফল “বাশী”র উপরে তাঁহার বড় টান। তাঁহার “বাশী”র সুরে আমি কিছু ভুলিবও না, মরিবও না। আমি মরিষা কি তোমার মরিব ? ইন্দুমতী মরিলে কালিদাস অজ রাজাকে বড় কষ্টে বাঁচাইয়াছিলেন, তোমার বাঁচাইবে কে ? তোমার কালিদাস যে তোমার বাঁচাইতে নারাজ ; মারিতেই বাস্ত ! “কেবল মেয়ের শাড়ীর উপর দিয়েই হয় কেন,” আর তোমাদের “কৌটার উপর দিয়ে, হয় না কেন” বলিয়া যে তিনি বড় দুঃখ করিয়াছেন। প্রবাদ আছে, কিছে পাখী নাকি প্রার্থনা করে—“ঘর পুড়ে বাক্, ঘোঁরা খাই।” ইঁহারাও চইয়াছেন ফিরা পাখী। সব মারা বাউক, আর উঁহারাও ছনিয়ায় থাকিয়া ভঁরনার নজা লুঠন।

ইন্দুমতী অজের গৃহিণী, মন্ত্রী, সখী ও প্রিয় শিষ্যা ছিলেন। অজ তাই বলিয়া কাদিয়াছিলেন। আমিও তোমার গৃহিণী বটি, সখী বটি, মন্ত্রীও বটি। আমার মরণা না লইলে কোন কাষে তোমার মন সরে না। তোমার শিষ্যা আমি কখনই নই, বরং গুরু বটি। তুমি বামুনের রাজা খাইতে নারাজ এ জগৎ আমার রক্ষিতে হয়, অশক্ত হইলে অগ্ন্যাগারে বাঁচিয়া গাছপত্য বহির হোতুকাঁচা তুমি নিজেই সমাধা কর। এই বিচার হাতেখড়ী আমিই তোমাকে দিয়াছি। আমারই রূপার তুমি আজ টেডেউশীপ পরীক্ষার উত্তীর্ণ। সুতরাং আমি মরিলে তুমি যে অজবিলাপের “প্রিয় শিষ্যা ললিতে কলাবিধো” কাটিয়া “হলবত্যা” গুরুরপাসি প্রিয়ে” বলিয়া চীৎকার করিয়া কাদিবে, আমি তাহা সহ্য করিতে পারিব না, মরিবও না, “মীরাও” হইব না। স্বামী ডাঙিয়া হিন্দু-মুসলমানের কাছে জগৎস্বামী কিছুই নহেন হিন্দু-মুসলমানের বিশ্বাস, স্বামী হইবে জগৎস্বামীর প্রকাশ।

আমরা চিরদিন যত্নের ছেলের উন্নতির কামনা করি, ক্রটি কমা করি । কিন্তু ধর্মের উপরে—সমাজের উপরে তাঁহারা যদি পড়াহস্ত হইয়াই থাকেন—আমাদের বর ভাঙাইতে চেষ্টা করেন, তবে আর কমা করিতে পারি না । এই জন্যই অন্ততঃ তোমাকে এই পত্রপানি লিপিলান

পূতনীয়া স্বকর্তৃকরণীকে ও দ্বিদি ঠাকুরাণীকে আমার প্রণাম জানাইবে । সকলের স্বাস্থ্য-সংবাদ চাহি । ঈমান পোকা ভাল আছে । ইতি

সেবিকা

শ্রীমণালিনী দেবী

তুলনা ।

অধার যদি আমার কেহ,
গোলাপ বেলে কোথায় গেলে?
বলব আমি হাত-মুখে,
তোমার গালে গোলাপ মেলে ।

অধার যদি আমার কেহ,
রুমকলি কোথায় কোটে?
বলব আমি, ওই ত ফুটে
তোমার ছুটি পাতলা ঠোঁটে

অধার যদি আমার কেহ,
মুক্তা কোথা লুকিয়ে থাকে?
বলব আমি, ঐ দেখা যায়—
তোমার ছুটি ঠোঁটের ফাঁকে ।

শ্রীবিষ্মপতি চৌধুরী ।

সেকালের শিক্ষা ।

ইংরাজীশিক্ষা যে ভারতে যুগান্ত প্রবর্তিত করিয়াছে—ভারতবাসীর অভিজ্ঞতার পরিসর বর্ধিত ও জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিয়াছে, তাহাতে কাঠারও সন্দেহ থাকিতে পারে না। তখন শিক্ষণীয়া যেমন নূতন জ্ঞানভাণ্ডারের দ্বার মুক্ত পাইয়া সাগ্রহে সজ্জিত রত্নাদি-সংগ্রহে উৎসাহিত হইয়াছিলেন—শিক্ষকগণও তেমনই একটি জাতিকে নূতন শিক্ষার শিক্ষিত করিবার উৎসাহে অমুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। শিক্ষকশিক্ষার্থীর মধ্যে তখন যে মধুর সম্বন্ধ ছিল, এখন তাহা সচরাচর দৃষ্ট হয় না।

তখন আমাদের দেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রধান যুগ। সেট স্বর্ণযুগে জিলার কত ন্যাভিষ্টেট প্রভৃতি উচ্চপদস্থ ইংরাজ রাজকর্মচারিগণ পদস্থ দেশবাসিগণকে অবজ্ঞা না করিয়া আপনারা কৃষ্ণাঙ্গ বালকগণকে পুত্রাধিক যত্নে প্রতীচ্যসাহিত্য-বিজ্ঞানাদিবিষয়ে শিক্ষা প্রদান করিতেন। তখন শিক্ষাসচিব লৈলনুয়ে বসিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে নিত্য নূতন নূতন প্রণালীর উদ্ভাবন করিয়া মন্ত্রিকের উর্ধ্বতর পরিচয় প্রদান করিতেন না। পরন্তু এতোক বিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ ছাত্রগণের মানসিক উন্নতির প্রতি স্বেচ্ছাপূর্ণ দৃষ্টি রাখিতেন—তাহাদিগকে জীবনে প্রতিষ্টালাভে সহায়তা করিতেন।—তখন ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেলগণ দেশবাসীর শিক্ষার উন্নতি দেখিয়া স্বেচ্ছায় বিচলিত হইতেন না, লর্ড কর্জনের দ্বারা প্রকাশ্য সভায় তাহাদিগকে গালি দিয়া বিকৃত মন্ত্রিকের পরিচয় প্রদান করিতেন না; পরন্তু আপনারা বিদ্যালয়পরিদর্শন করিয়া, লাট-প্রাসাদে ছাত্রগণের পরীক্ষাগ্রহণ করিয়া এবং পুরস্কার-বিতরণ করিয়া ছাত্রগণকে উৎসাহ দিতেন। তখন এতদেস্যের ইংরাজগণ ভারতবাসীর নানা প্রকার অক্ষমতা প্রদর্শিত করিতে ব্যস্ত না হইয়া ভারতবর্ষে প্রতীচ্য বিজ্ঞাবিজ্ঞানের সুফল সর্বদা সগোচরে স্বদেশবাসীকে দেখাইতে সমুৎসুক ছিলেন। তাহারা ভারতীয় ছাত্রের ইংরাজী গণ্য ও পণ্য রচনা ইংলেণ্ড প্রেরণ করিয়া পাশ্চাত্য-শিক্ষা-বিত্তারে উৎসাহ প্রদান করিতেন। তখন ইংরাজ অধ্যাপকগণ প্রত্যেক ছাত্রকে চিনিতেন, প্রত্যেকের জ্ঞানোন্নতির প্রতি প্রথম দৃষ্টি রাখিতেন এবং ভারতীয় ছাত্রগণকে ডিরোজিগর সচিত্র সমন্বয়ে বলিতে পারিতেন—

Expanding, like the petals of young flowers,
I watch the gentle opening of your mind
And sweet loosening of the spell that binds
Your intellectual energies and powers, that stretch
(Like young birds in soft summer hours),
Their wings of try their strength. O how the winds
Of circumstance and freshening April showers
Of early knowledge, and unnumbered kinds
Of new perceptions shed their influence;
And how you worship truth's omnipotence.
What joyance rains upon me, when I see
Fame in the mirror of futurity
Weaving the chapters you are yet to gain,
And then I feel I have not lived in vain.

এই বর্ণনায় শিক্ষাপ্রণালীর কথা—শিক্ষা-পরিবর্তনের সেই আগ্রহপূর্ণ চেতনার কথা—ভাবগণের মানসিক উন্নতির ইতিহাস—সেই সময়ের শিক্ষাবিদগণের বিবরণ-সমূহ বেশ বিশদভাবে নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহা আত্মকালিকার লালফিতাবাদী কাগজের ন্যায় বা অত্যন্ত ‘লেকাকানোরস্ত’ সরকারী বিবরণে ভ্রম’ভ। এই সময়ের বিবরণগুলি হইতেই এই প্রবন্ধটি সংকলিত হইয়াছে।

তখন এ দেশে শিক্ষাবিভাগের ভার একটি শিক্ষাপরিবর্তনের উপর ন্যস্ত ছিল। এই পরিবর্তনের নির্দেশায়ুসারে প্রত্যেক কলেজ এক একটি পরিচালক-সমিতির তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইত। এই কলেজকমিটি প্রায় স্থানীয় জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত এবং উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদিগকে লইয়া গঠিত হইত। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার কলেজ স্থাপিত হয়। ১৮৪৭-৮ খ্রীষ্টাব্দের রিপোর্টে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বৎসরিক পরীক্ষার ফল অহুসারে কলকাতার কলেজের পরিচালকসমিতি চারি জন ভাত্রকে সিনিয়র ছাত্রবৃত্তি প্রদানের জন্ত গবর্ণমেণ্টকে অহরোধ করেন। ইংল্যান্ডের নাম যথাক্রমে, অধিকাচরণ ঘোষ, রাসবিহারী বসু, হর্গাচরণ হালদার এবং উমেশচন্দ্র দত্ত।

কলকাতার কলেজের মি: ডি. জে. মণি এই বৎসর গণিতে সর্কালেক্সা পারদর্শী ছাত্রকে একটি রোপাশ্রমক প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। হিন্দু কলেজের মিটার রীতি পরীক্ষা করিয়া অধিকাচরণকে পদকলাভের উপযুক্ত গ্লান্ন বলিয়া নির্দেশ করিলে তিনি উহা প্রাপ্ত করেন।

অধিকাচরণ ঘোষাচার্যের অন্তর্গত চৌগাছার প্রসিদ্ধ ঘোষবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি উমেশচন্দ্রের অভিন্নভ্রমর বন্ধ ছিলেন এবং তাঁহারই দ্বারা অসাধারণ প্রতিভার

অধিকারী ছিলেন। কৈশোর অতিক্রম করিতে না করিতে, জীবনের আশা অসম্পূর্ণ রাখিয়া তিনি উল্লোক হইতে অপরিত হইলেন। উল্লোকের দালাতীবন অধিকাংশের জীবনের সচিত্র অঙ্কিতভাবে বিস্তৃতি। আশার স্রব প্রবল উল্লোকের বন্ধ-প্রেমের সম্পূর্ণ পরিচয়-প্রদান অসম্ভব। তবে এই প্রবলকেন অনেক ফলপ্রসূ উল্লোকের নাম একসঙ্গে উল্লিখিত হইবে।



রাসবিহারী বসু

রাসবিহারী বসু পরে ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট হইয়াছিলেন। তিনি প্রস্তুতহে পাণ্ডিত্যের ভিত্তি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন এবং স্বর্গীয় লক্ষ্মীচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত ‘ব্ৰাহ্মসংস্কৃত্যে’ প্রকাশিত বাল্যকালের প্রস্তুতহে-সংস্কৃত্য প্রবন্ধাবলী ইত্যাদি রচনা। উক্ত পরে ‘ভবনেশ্বরী’ নামে তাঁহার একখানি উল্লিখিত উপন্যাসও প্রকাশিত হইয়া

ভূগোলগণ বহু যশোহরের সেখগাঙ্গী নিবাসী ছিলেন। তিনি পরে পুলিশ-ইন্সপেক্টর হইলেন।

যে কমিটির বিবেচনার উদ্যোগ ছাত্রবৃত্তির উপযুক্ত বলিয়া নিৰ্দ্ধারিত হইয়াছিল, তাহাতে কোন্ কোন্ ব্যক্তি ছিলেন, তাহা নিয়ে উল্লেখ করিতেছি—

মি: জে. সি. ব্রাউন —	সিবিল এণ্ড মেসনস জজ। *
মি: ডি. জে. মনি —	কলেজের।
মি: জি. পি. স্টোয় —	ম্যাজিষ্ট্রেট।
মি: সি. অটোর এন্ড ডি—	সিবিল এন্সিষ্টেণ্ট সার্জান।
মহারাজা শ্রীশচন্দ্র রাগ বাহাদুর —	নবীয়ার রাজা।
বাবু রামলোচন ঘোষ—	প্রধান সনন আমীন। †

রুকমণির কলেজের ভবনোন্নয়ন শিক্ষকদের নামোদ্যোগেও বোধ হয় এষ্ট সময়ে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

মি: এম্. রচফোর্ড—প্রিন্সিপাল এবং পরিচালক-সমিতির সম্পাদক।

এম্. ডব্লিউ. ব্রাড্‌বেলী—প্রধান শিক্ষক, সিনিয়র ডিপার্টমেন্ট।

জি. বিটসন—দ্বিতীয়

জে. জি. বিন্‌ল্যাণ্ড—তৃতীয়

বাবু রামচন্দ্র লাভিড়ী— দ্বিতীয় শিক্ষক, জুনিয়র ডিপার্টমেন্ট

দয়ালচাঁদ রায়— " তৃতীয় " "

গুরুচরণ চট্টোপাধ্যায়— চতুর্থ

বেণীমাধব বসু— পঞ্চম

* মিটার ব্রাউন অত্যন্ত ভোজনবিলাসী ছিলেন। তিনি কাটাল পাউন্ডে ভাল বাসিতেন। কাটাল কলিলেই তাহার লোক যাটরা জিলার ভাল ভাল কাটাল গাছগুলির ফল গণিয়া গাছ জমীদারের জিন্দা করিয়া দিয়া আসিত, কাটাল তাহার জন্য পাঠাইতে হইত। ব্যক্তিগত পূর্ণ আহারের পর তিনি আবার সকলের পরিভোক্ত পাশ্চাত্য এক বোতল জিন মদ্য লইয়া টেবলে বাসিতেন।—সম্পাদক

† তিনি সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার মনমোহন ও লালমোহনের পিতা। বিক্রমপুর * ইহার জন্মস্থান ও রুকমণির কর্মস্থান।—সম্পাদক

* ইনি প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ভাগিনের ও পরে যশোচর জিলাস্থলের শিক্ষক। তৎকালে তাহার মত সেক্ষেপীয়রসকল বড় সেরা নাই।—সম্পাদক

গঙ্গাচরণ সরকার—† যন্ত্র
 গোবিন্দচন্দ্র কুমার—সপ্তম
 গঙ্গাধর চক্রবর্ত্তী—অষ্টম
 চরনাথ মিত্র—নবম
 আমলচন্দ্র শিরোমণি প্রধান পণ্ডিত
 নবগোপাল তর্কাকাকার—দ্বিতীয় পণ্ডিত
 বাবু জগজ্ঞান নাথিডী হেড প্রাইটার এবং লাইব্রেরিয়ান।

১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে চিত্রসরগীর মহাশয় হিঙ্গওয়টার বেথুন মাননীয় সি. এইচ. কামেরগের নিকট হইতে শিক্ষাপরিষদের সভাপতির ভার গ্রহণ করেন। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্য ভাগে তাঁহার পরলোকগমন পশ্চাৎ মহাশয় বেথুন একত্রে শিক্ষাবিস্তারের জন্য যে কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, তাহা একত্রে ইংরাজী শিক্ষাবিস্তারের ইতিহাসে স্বর্ণ অক্ষরে লিপিত থাকিবে। এই প্রবন্ধে উক্ত বক্তৃতা হইতে তাঁহার জনহিত উদ্ধৃতি, ভারতবাসীর প্রতি সভ্যত্বভিত্তি গভীরতা, প্রভৃতি বিবিধ গুণ পরিদৃষ্ট হইবে। এ স্থলে তাঁহার চরিত্রবর্ণনের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই কিন্তু তাঁহার পরলোকগমনে শিক্ষাপরিষদ যে শোকস্বচক মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা এ স্থানে উক্ত করিবার প্রয়োজন সম্বরণ করিতে পারিলাম না—

"That the Council desire to record their deep sense of the loss their own body and the cause of Education in India have sustained by the death of their late President, the Hon'ble John Elliot Drinkwater Bethune.

"A cultivated mind ; a catholic taste for and appreciation of general literature, combined with more than ordinary proficiency in the exact sciences ; lofty views of the duty of Education, and an ardent desire for the dissemination of its benefits, rendered him peculiarly fit to direct the course of public instruction ; and the exercise of these qualities were so prompted by benevolence, so regulated by a conscientious sense of responsibility, and so frequently accompanied by acts of personal munificence, as to earn for Mr. Bethune a high place amongst those who have laboured for the improvement and development of the Native mind, and to entitle him to the admiration of his own countrymen, and the affectionate gratitude of the inhabitants of this country."

† ইনি ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই নবেম্বর তারিখে পদত্যাগ করিয়া স্থানীয় অফিসে প্রবিষ্ট হইলেন।

পেঞ্চা.লার শিক। ।

শিক্ষাপরিসদের অত্যন্ত সবল ও অতি উপযুক্ত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহানিগের নামও এ স্থানে সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য :—

বাবু জে. ডব্লিউ. কস্টিন (নাইট্) লিউনি জন্.
ফ্রেডরিক, জে. জালিতে— সি, এস,— সেক্রেটারী, গবর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়া.
হোম ডিপার্টমেন্ট
বাবু এইচ. এম্. এলিট, কে, সি, বি. —সেক্রেটারী, গবর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়া,
ক্যারেন্ ডিপার্টমেন্ট
মি: সি. বিডন, সেক্রেটারী, বোর্ড অব কাষ্টনস্, স্টেট এণ্ড
গণিয়ন

মি: জে. গ্রাণ্ট-সিনিয়র সাক্ষর

মি: জে. করনাইস সিনিয়র সাক্ষর সেক্রেটারী, মেডিক্যাল বোর্ড

বাবু ব্রহ্মদত্ত —কমিশনার, মূল কাজ কোটি ।

বাবু প্রমথকুমার ঠাকুর —সরকারী উকীল, সদর মেগ্রানী

বাবু ব্রাহ্মগোপাল ঘোষ—সওদাগর

ফ্রেড. জে. মোরট এম্. ডি, —এসিষ্ট্যান্ট সাক্ষর, সেক্রেটারী ।

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে শিক্ষাপরিসদ পরীক্ষার এক নতুন ব্যবস্থা করিলেন। প্রতিবছরিতার ছাত্রগণের উচ্চশিক্ষালাভে উৎসাহ আরও বর্ধিত হইবে মনে করিয়া এই বৎসর ঢাকা এবং কুমিল্লার কলেজের ছাত্রগণকে হিন্দু কলেজের ছাত্রগণের সহিত একত্র পরীক্ষা করা হইল। তখন এই সকল বিষয় ছাত্রশ্রুতি পরীক্ষার অন্তর্ভুক্ত নির্দিষ্ট ছিল :—

সাহিত্য

Prose.—Bacon's Essays

Addison's Essays from the Spectator.

Shakespeare's Tempest and Mid-Summer Night's Dream

Poetry—As much of Dryden as is contained in Richardson's Selections.

Mental & Moral Philosophy—Reid's Enquiry, Mill's Logic. First Volume

ইতিহাস

England—Macintosh's History of England, from the commencement to the accession of James I.

Greece—From the close of the Peloponnesian War to the death of Philip of Macedon.

India—Stewart's History of Bengal (Calcutta Edition).

অঙ্কশাস্ত্র

Algebraical Equations—Analytical Geometry of two dimensions.

Analytical Geometry of three dimensions, as applied to straight lines and planes.

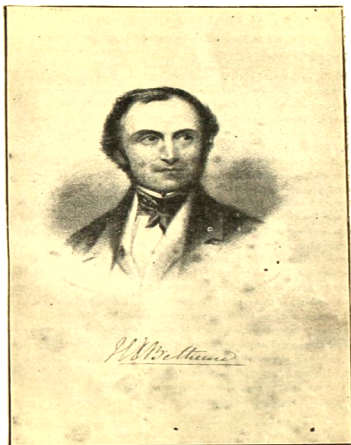
Mechanics as treated of by Whewell.

Hydrostatics Pneumatics so far as they can be studied without the aid of Differential and Integral Calculus.

এতদ্ব্যতীত ইংরাজী ও মাতৃ ভাষায় প্রবন্ধ রচনার ক্ষমতাও পরীক্ষা করা হইত। পরবর্ত্তী বৎসরদ্বয়ে পাঠাপত্তিকের তালিকা কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের এই পরীক্ষায় হিন্দু কলেজ হইতে প্রসঙ্গ-কুমার সর্বাধিকারী সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকৃত করেন। উমেশচন্দ্র কৃষ্ণনগর কলেজ হইতে পঞ্চম স্থান অধিকার করেন বটে, কিন্তু প্রসঙ্গকুমার তাঁকুর অপেক্ষা ১২ নম্বর নাকি কম পাইয়াছিলেন এবং ইংরাজী প্রবন্ধ-রচনায় প্রথম হইয়াছিলেন। তিনি পরাবর্ত্তী প্রবন্ধ-রচনায় শ্রেষ্ঠস্থান পাইলেন। প্রবন্ধের বিষয় ছিল “On the Influence of Climate on National Character” হিন্দু কলেজের সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক কাপেন ডি. এল. রিচার্ডসন পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। উমেশচন্দ্রের অভিজ্ঞতায় বৃদ্ধ অধিকাচরণ অস্বস্থতা বশতঃ এই পরীক্ষার উপস্থিত হইতে পারেন নাই। উমেশচন্দ্র দ্বিতীয়বার চাত্রগুণ্ডি পাইলেন। বেথুন, বিডন এবং ডাক্তার নৌট কৃষ্ণনগরে পুরস্কার বিতরণ করিতে আসিলেন। বেথুন মহোদয়ের উদ্বোধনবাক্যে হার উমেশচন্দ্রের প্রশংসা করিয়া অধিকাচরণের কথা বলিতেও বিবৃত হইলেন না।

“In the general list of the scholarships held in all the Colleges of Bengal, which we have printed this year for the first time, at the end of our Report, I find that the name of Umesh Chunder Dutt stands 8th in order and that the number of marks gained by him is within 22 of the highest number of marks gained by the first scholar of the Hindu College. I have been informed too, since I entered the Hall, that another young man, who was obliged to absent himself from the Examination by illness, would, in all probability, have distinguished himself in an equal degree. * * * I congratulate Umesh Chunder Dutt, not only on the individual honour he has achieved for himself, but also on the honour which he has reflected on his College.”

এই পুরস্কারবিতরণকালে উমেশচন্দ্র কলেজের অধ্যাপক রিপোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত একটি সুন্দর রৌপ্যপদক প্রাপ্ত হইলেন।



এই বৎসর মাননীয় বেধুন মহোদয় ছাত্রগণকে বাঙ্গালা ভাষার চর্চা করিবার নিমিত্ত যে সারগর্ভ সঙ্গপদেশ প্রদান করেন তাহা প্রত্যেক বাঙ্গালী ছাত্রের সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্তব্য । শিক্ষিত হিন্দু ছাত্রগণ ভবিষ্যতে বিস্তার বিমল জ্ঞোতিঃতে দেশের অজ্ঞান-তিমির বিনষ্ট করিয়া জ্ঞানের প্রথর কিরণজালে দেশকে উদ্ভাসিত করিয়া কিরূপে সমগ্র জাতিকে উন্নত করিতে পারিবেন, তাহার এক উজ্জল চিত্র অঙ্কিত করিয়া তিনি বলেন :—

"But it is impossible that you should do this effectually, unless you sedulously combine the cultivation of your native language with the study of the European science and literature for which you have acquired a taste in this College. It is impossible that the English language can ever become familiar to the millions of inhabitants of Bengal ; but, if you do your duty the English language will become to Bengal what long ago Greek and Latin were to England ; and the ideas which you gain through English learning will, by your help, gradually be diffused by a vernacular literature through the masses of your countrymen. The language of Bengal is now as rude and uncultivated as that of England was five hundred years ago. It is your taste and your learning by which it is to be cultivated and adorned. This is the language which I have constantly held to those young men in Calcutta, who have brought for my opinion, with intelligible pride, their English compositions in prose and verse. I have told them, while awarding the praise that I have thought due to many of these productions, that, if they would follow my advice, they would not seek for distinction by such channels : but, if their talents and disposition led them to authorship, they would attain a more lasting reputation, either by original compositions in their own language, or by transposing into it the masterpieces of English literature. & There is great glory in store for those who will be the first to achieve success in this path. Perhaps, even among those whom I am now addressing, may be concealed those whom a later age shall recognize as the earliest poets, historians and philosophers of Bengal."

১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় দিনিয়ার স্বলার্শিপ পরীক্ষা গৃহীত হইল । এবার সমগ্র বঙ্গদেশের ছাত্রগণকে প্রতিযোগিতার অতিক্রম করিয়া উমেশচন্দ্র প্রথম স্থান লাভ করিলেন । বন্ধু অধিকাচরণ চক্রবর্ত্তে আক্রান্ত হইয়া ছয় মাস কলেজে পাঠ করিতে পারেন নাই, তথাপি তিনি পঞ্চম স্থান অধিকৃত করিলেন এবং দর্শন ও নীতিবিজ্ঞানে কেবল যে সর্ব্বপ্রথম হইলেন এমন নহে,—পঞ্চাশের মধ্যে পঞ্চাশ

• শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বসু বিরচিত নাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিতে উক্ত মহাত্মা বেধুনের 'The Captive Lady'র সমালোচনা সংবলিত পত্রখানি জটব্য ।

নবর প্রাপ্ত হইলেন । গণিত এবং বিজ্ঞানেও তিনি কেবল উৎকর্ষকে নহে—
কৃষ্ণনগরের ছাত্রগণকে নহে পরন্তু ঢাকা এবং সুগলী কলেজের ছাত্রগণকেও
প্রতিযোগিতায় পরাস্ত করিয়াছিলেন । মাননীয় বৈপ্লবী পুরস্কার বিতরণ সভায়
উচ্চাঙ্কিত অপরূপ প্রতিভা এবং প্রশংসনীয় চরিত্রের জন্য একটি বিশেষ রৌপ্যপদক
প্রদান করেন । বেথুন ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে এই আভ্যন্তরীণ তারিখে বিভিন ৫ মৌরট এট
দুই জনের সহিত কৃষ্ণনগর কলেজে পুরস্কার বিতরণোপলক্ষে গমন করিয়া যে
বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন তাহা হইতে আমরা কিয়দংশ নিচে উদ্ধৃত করি-
তেছি । উহা হইতে হিন্দু ছাত্রগণের প্রতি বেথুনের যে সম্বন্ধকৃত, স্নেহ এবং
শ্রীতির পরিচয় যথেষ্ট হওয়া যায়, তাহা discipline রক্ষার জন্য উৎকর্ষিত আভি-
কালিকার বিদ্যালয়পরিদর্শকগণের মধ্যে প্রায়ই দৃষ্টিগোচর হয় না ।

"A year has elapsed since I last visited this College. I told you then
that I had just come from warning the students of the Metropolitan
College, that they must expect soon to find formidable rivals in the Mofussil
institutions, and must exert themselves to the utmost, if they wished to
keep their old pre-eminence. I congratulate this College of Krishnaghar on its
having so speedily verified my prediction. Last year the foremost man among
you occupied the fifth place in the comparative list which we now publish
annually of all the distinguished students in lower Bengal; and his name
stood as the only representative of Krishnaghar among the first twenty in
the list. This year you have three among the first twenty; the second
of them, who was prevented by illness from competition last year,
occupies the same relative place which your leader then did.
and your leader is now at the head of all our colleges. I once more
congratulate Omesh Chunder Dutt upon the honour that he has gained
for himself, that he has gained for the masters by whose able
tutelage he has been trained to occupy his proud position, that he has
reflected on the College to which he belongs; and which, I trust, from
one end of it to the other, sympathises with him in his success.

"I have already noticed, with deserved commendation, the position
of Omesh Chunder Dutt. I should not do justice to another very deserving
student, or to my appreciation of his exertions, if I did not also mention
in terms of warm approbation, the name of Ambica Charan Ghose, who
stands second only to him in this College, and fifth on the general list. I
remember that he was prevented by illness from contending in the last
year's examination; at which time it was the opinion of the authorities
of the College, that he would perhaps have carried off the
palm of superiority from Omesh Chunder Dutt; or at all events, that
it might have proved a measuring cast between them. His efforts

this year have fully justified the good opinion they then entertained of him. It is well-known to all connected with the College that he has been disabled for more than half the year, by weakness of his eyes, from effectually prosecuting his studies. Nevertheless, he occupies a very high and distinguished place, not only in this College, but in the general classification. I remember, a remarkable instance, which occurred almost in my own time at Cambridge of success attained under similar disadvantages. A young man of the name of Law, whom I have already mentioned to you as the first man of his year, not belonging, I am sorry to say, to my own Colleges but to that of my friend near me, was similarly disabled, by an affection of his sight from systematic reading, for a considerable time previous to his final Examination. The story went at Cambridge, that he owed his triumph to the affectionate energy of his sisters; they read to him the subjects of Examination, they examined for him the necessary books of reference, and had the proud satisfaction of enabling him to attain his pre-eminent station, by the assistance they so rendered him. To return to Ambica Charan Ghose I find that in mental and moral philosophy he has attained the highest possible number of marks, in mathematics and natural philosophy, he has beaten not only Omesh Chunder Dutt but every student of this and of the Hooghly and Dacca Colleges. It is chiefly in the Bengali and English Essays that he has fallen behind; and, in comparison of all the subjects of Examination the difference between him and the first man is not very considerable. In the peculiar disadvantages with which he has had to contend, this is highly creditable to him. It is my intention to bestow upon Ambica Charan Ghose a special prize of a silver medal which I shall give him nominally for his superiority in mathematics, but which in reality I am induced to give him, to mark my sense of the general manner in which he has acquitted himself, and of the excellent character which he bears in the estimation of his teachers.

এই বৎসর উমেশচন্দ্র ঈশারজী রচনার প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। রচনার বিষয় ছিল, "On the advantages of virtue over vice, as exemplified in the histories of remarkable characters, during the reign of the Stuarts" এই বৎসর হুগলী কলেজের প্রধান শিক্ষক ডে. গ্রেভস্ পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

এই বৎসর কৃষ্ণনগর কলেজ আর একটি কারণে গৌরবান্বিত হইয়াছিল। বাহালা ডাঃবার চর্চা করিবার নিমিত্ত বেথুন মহোদয়, পূর্ববৎসর চাত্রগণকে যে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্রগণ তাহা বিশ্বস্ত করেন নাই। কৃষ্ণনগর কলেজ হইতে এই বৎসরে নীলকমল ডাঃজী • এবং উমেশচন্দ্র দত্ত

বঙ্গালী ব্রহ্মচারী বৎসর প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকৃত করেন। অসুস্থতা বশতঃ প্রথমোক্ত ছাত্র অকাল বিদেহ পরীক্ষাপ্রদান করিতে না পারায় অকৃতকার্য হইলেও সঙ্গের বেপন পুরস্কার-বিতরণসভায় মুকুর্ভে তাঁহার প্রশংসা করেন :—

"Another honour has been gained this year, for the Krishnagur College, by Neemconal Bhadoory, a junior scholar from the Jessore Schools who has gained Sir Herbert Maddock's Gold Medal for the best Bengali Essay written in all the Colleges under our superintendence. It is a very remarkable circumstance that this prize should have been gained by so young a student, and highly creditable to him. I own that, before I came here, I had felt much disappointment and dissatisfaction that so important a prize as this should have been gained by a student, who appeared on the tabular statement of his performances to have failed in every other subject. It is due to Neelconal Bhadoory that this misapprehension should be publicly explained, as it ought to have been in the Report. I have been told, since I came to Krishnagur that he suffered from illness at the time of the examination, and was not able to be present, except on the last days. His masters assure me of their conviction that he would have acquitted himself creditably in other subjects also, if he could have been present.

"I own I was very glad to learn this, because it is among our distinguished English scholars that I am most anxious to find writers of pure and elegant Bengali; so that we may have a chance of educating some, who will give a stimulus to the general intellectual improvement of your countrymen, by clothing in a vernacular dress, and in a popular form, the lessons of wisdom and philosophy which they have learned from a foreign literature. As I told you, last year, great honour is in store for those who will be the first to distinguish themselves in this career; there is a solid and lasting reputation to be gained by those who will exert themselves successfully to create the modern Bengali Literature, and secure to themselves the glory of being at the head of its classical authors; to be still looked back upon with reverence and respect, when others, to whom they will have taught the way, shall have carried your language to the highest pitch of refinement of which it is capable."

দ্বন্দ্বী বেপনের ভবিষ্যদ্বাণী সকল হইয়াছে। ইংরাজী শিক্ষিত বাঙ্গালী লেখকগণ বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে নতুন যুগের অবতারণা করিয়াছেন। বিদ্যাসাগর অক্ষরকুমার, টেকচাঁদ, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, যদুনাথ প্রভৃতির চেষ্টার অতি অল্প-সময়ের মধ্যেই বঙ্গসাহিত্য অসামান্য উন্নতি লাভ করিয়াছে।

ব্যাম্বি ও তাহার প্রতিষেধ ।

—:•:—

হাম ও বসন্ত ।

সম্ভবতঃ হাম-বসন্তও বীজাণুঘটিত পীড়া । তবে ইহাদের বীজাণু এত ক্ষমতাবান যে, অণুবীক্ষণের সাহায্যেও আমরা তাহাদিগকে দেখিতে পাই না । বোড়স থ্রটসে হাম সৰ্ব্বপ্রথমে লোহিত-দাগরের উপকণ্ঠে আত্ম-প্রকাশ করে । শীত ও বসন্ত কাল হানের প্রকৃষ্ট সময় । শিশুদিগের মধ্যেই এই রোগের প্রাচুর্য্য অধিক । তবে কোন কোন সময় প্রাপ্তবয়স্কদিগেরও এই পীড়া হইতে দেখা যায় । বালিকা অপেক্ষা বালকরাই ইহাদ্বারা অধিক সম্বর আক্রান্ত হয় । হামের বীজ দেহপ্রবিষ্ট হইবার পর সত্তরাচর দশ হইতে ত্রয়োদশ দিবসের মধ্যেই রোগ প্রকাশ পাইয়া থাকে । কিন্তু তার উনাস ওয়াটসন্ বলেন, চতুর্দশ দিবসেও অনেকের রোগ প্রকাশ পাইতে দেখা গিয়াছে । সন্ধি, কাশি, জ্বরভাব, নালিকা ও চক্ষু হইতে জলস্রাব প্রভৃতি এই রোগের প্রাথমিক লক্ষণ । পরে চঠাৎ এক দিন শরীরের তাপ অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় । সত্তরাচর জ্বর-প্রকাশের পর দ্বিতীয়, তৃতীয় অথবা চতুর্থ দিনে “ইরাপ্পল্‌ন্” বাহির হয় । এই “ইরাপ্পল্‌ন্” প্রথমে মুখমণ্ডলে বাহির হইয়া ক্রমে সৰ্ব্বাঙ্গে প্রকাশ পাইতে থাকে । স্ফোত হানের আকার দেখিতে লালবর্ণ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরিষার স্ফায় । শরীরে সাত হইতে দশ দিবসের মধ্যে উহার অদৃশ্য হইয়া যায় । হামের দ্বারা সাধারণ স্বাস্থ্য অত্যন্ত ক্ষয় হয় । উদরাময় এই রোগের সহচর । কাহারও কাহারও এই উপদ্রবটি দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়া পড়ে । অত্যন্ত জ্বর, বিবমিষা, কাশি, শ্বাসকষ্ট ও অন্ত্রের তুলক্ষণ-সংযুক্ত এক প্রকার হাম আছে । ক্রান্তেরা তাহাকে malignant measles বলেন । ইহারা দেখিতে রক্তবর্ণ । এই দুই হাম অল্প অল্প এবং অনিয়মিত ভাবে প্রকাশ পায় ও অদৃশ্য হয় । ইহা প্রথমে হামরূপে প্রকাশ পাইয়া পরে বিবম আকার ধারণ করে । কোন কোন সময় ইহাদ্বারা অনেক লোকের জীবন নষ্ট হয় ।

পল্লীগাম অপেক্ষা জনগহন সহরে হাম রোগে মৃত্যুর সংখ্যা অধিক । হাম ভালরূপ বাহির না হইলে তাহাকে চলিত কথায় “হাম লাট খাওয়া” বলে । হাম এইরূপ “লাট খাইবে” বিশেষ “আলস্য” কারণ হয় । দুই হাম (malignant measles) অধিকাংশ স্থলেই সাংঘাতিক হইয়া পড়ায় ।

এই রোগ স্পর্শক্রমক এক সময়ে বহু লোকের ইহা হইতে দেখা যায়। বাড়ীতে কাহারও হান হইলে রোগকে তৎক্ষণাৎ এক পুত্রক ঘরে রাখিবে। সংস্পর্শ ও বস্ত্রাদি-সংযোগে এই ব্যাধি-বীজ এক স্থান হইতে অন্য স্থানে নীত হয়। শ্রুতরাং বাড়ীর শ্রম বালক-বালিকাগণকে রোগের সংস্পর্শে আসিতে দেওয়া কদাচ উচিত নহে। যত দিন রোগীর কাশি ও গায়ের ভাল উঠা আশ্রয় না হয়, তত দিন তাহাকে পৃথক বাস করানই সুব্যবস্থা। ঘান ও শরীরে তৈল-মকন দ্বারা এই রোগের স্পর্শক্রমকতা অনেকটা বিনষ্ট হয়। এই জন্য আমাদের দেশে রোগকে “আরোগা-স্বানেত” ব্যবস্থা আছে।

বসন্ত অত্যন্ত সংক্রামক ও স্পর্শক্রমক। এই ব্যাধি ভারতে তির-পরিচিত। এতদ্ব্যতীত একটি কিংবদন্তী আছে যে, এই রোগ প্রথমে উদ্ভূত হইতে মানব-দেহে পরিচালিত হয়। বোটি কথা, এই রোগের সন্মূহুতি কোথায় এবং কিরূপেই বা ইহা মনুষ্য-সমাজে প্রথম প্রবিষ্ট হইল, তাহা নিশ্চয়রূপে কেহই বলিতে পারেন না। তবে অনেকে বলেন, ইহা ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়া তথা হইতে দেশান্তরে সম্প্রসারিত হইয়াছে। বসন্তের অধিষ্ঠাত্রী দেবী “শীতলা” শ্রমণাভীত কাল হইতে ভারতবাসীর পূজার্থ হইয়া আছেন। খৃষ্ট জন্মাইবার প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্বেও বসন্ত এ দেশবাসীর উপর আধিপত্য করিয়াছে। এই পীড়ায় ৫ম্বে মস্তর সদৃশ “ইরাপশন্” বাহির হওয়ার সংস্কৃত ভাষার ইহাকে মফরিকা বলে। এই ব্যাধি বসন্তকালেই অধিক প্রাদুর্ভূত হয় বোধ হয়, এই জন্য লোকে-ইহাকে বসন্ত নামে অভিহিত করিয়াছে। সিংহলে ইহার নাম মহাব্যাধি। ভারতের বিভিন্ন স্থানে ইহা বিভিন্ন নামে অভিহিত। যথা—“পীড়ক,” “ঠাকুরাগী,” “দেবী,” “শীতলা,” “ইচ্ছাবসন্ত,” “দাতা,” “ভবানী,” “বাবা,” “শীতলাগুটি,” “বড় পীড়ক,” “জগদম্বা” ইত্যাদি। তিন সহস্র বৎসর পূর্বে চীনবাসীরা এই ব্যাধির সহিত পরিচিত ছিল। অতি প্রাচীন কাল হইতে আরব দেশেও ইহা আধিপত্য করিতেছে। কাফ্রিগণ ইহা দ্বারা অতি সহজেই আক্রান্ত হয়; এই কারণে কেহ কেহ অসুস্থমান করেন, আফ্রিকা দেশই ইহার আদি স্থান। আবার কেহ কেহ বলেন, পূর্বকালে যখন বাণিজ্যপথে ভারতের সহিত আফ্রিকার ঘনিষ্ঠতা ছিল, তখন এই রোগ ভারত হইতে তথায় নীত হয়। ফল কথা, এ সকল অসুস্থমান মাত্র।

এই রোগের গুণ্যাবস্থা ষাট দিনস। রোগ-প্রকাশের পূর্বে গাত্র-বেশনা হইয়া শ্রবল জর হয়। জ্বর হইবার তৃতীয় অথবা চতুর্থ দিবসে বসন্তের গুটিকা বাহির হয়। এই গুটিকা হামের দ্বারা মুখমণ্ডলে প্রথম বহির্গত হইয়া ক্রমে

দুই তিন দিবসমধ্যেই সর্বাঙ্গে পল্লিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। ওটিকার চতুর্দিকে বক্তৃ-
পণ হইয়া উঠে। প্রাচীর অট্টালিকার মধ্যে ওটিকাগুলি পরিপক্ক হয় এবং ক্রমে পূর্ণ
নির্ণত হইয়া দুই সপ্তাহের মধ্যেই ক্ষত শুষ্ক হইয়া যায়। সচরাচর শুষ্কতা বসন্ত
উদ্ভাট হইলেই কম অস্থিহিত হয়। কোন কোন জাতীয় বসন্ত বাহির হইলেও
ক্ষয়ভাগ হয় না : অধিকন্তু শিরঃপীড়া, অধিরতা, তন্দ্রা ও বিকারের লক্ষণ সকল
প্রকাশ পায়। ইহাকে “হুই বসন্ত” বলে। ইহার জাবিকল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই
মন্দ। কক্ষসের প্রদাহ, পরিপাক-বিকার, চক্ৰাত ক্ষত, কণ হইতে পুত নিঃসরণ,
বক্তৃপ্রাব প্রভৃতি বসন্ত-রোগের বিবিধ উপসর্গ আছে। অনেক স্থলে চক্ৰ মনে
বসন্ত হইয়া চক্ৰ নষ্ট হয়। অজাবিক ওটিকা নির্ণত হইলে মস্তক, মূৰ্ধন ওল ও
চক্ৰের ক্ষীণ হইয়া পড়ে। এই রোগে মৃত্যুর হার শতকরা ৩০। রোগের
বয়স ও উপসর্গের উপর শুকাওঁত ফল নিতর্য করে। অতিশিথ ও অতিদ্রুতের
বসন্ত-রোগ বিশেষ ভয়াবহ। গতিশীল এই রোগ হইলে গর্তপ্রাব ও মৃত্যু দ্রুত
অসম্ভব নহে।

হান বা বন্যভয় বা রোগ-প্রবিষ্ট হইলে কখনই এই সকল রোগ জন্মে
না। বেসময়ে রোগের প্রাচুর্যের ভাগ উঠিতে আরম্ভ হয়, তখন ঐ ছালের মধ্যে
রোগ-বীজ অবস্থিতি করে। ইহারা বায়ু ও শব্দাবসনাদি দ্বারা স্থানান্তরে নীত
ও বিস্তারিত হয়। কোন কোন বিজ্ঞ চিকিৎসক বলেন, বসন্ত-রোগের বীজ দুই
শত বৎসরকালও সজীব থাকিতে পারে। হান বা বসন্ত কাহার একবার হইলে
ঐ ব্যক্তি আর ঐ রোগে দ্বিতীয়বার আক্রান্ত হয় না। তবে কচিং কাহার
কাহার দ্বিতীয় আক্রমণের কথা শুনা যায়। ১৭৭৪ খ্রষ্টাব্দে ফরাসী দেশের
নরপতি পঞ্চদশ লুই ১৪ বৎসর বয়সে বসন্ত-রোগে পঞ্চদশ প্রাপ্ত হইলেন। চতুর্দশ
বৎসর বয়সক্রমকালে রাজার একবার বসন্ত রোগ হইয়াছিল : সুতরাং এই দ্বিতীয়
আক্রমণের কারণ অসুস্থত্বের জন্য তৎকালে রাজ্যমধ্যে এক বিশম আন্দোলন
উপস্থিত হয়। অবশেষে ভিনক্সেইট গ্রেগরি বৃত্তিতে পারিলেন যে, বাংলাকালে
পঞ্চদশ লুই মহারাজার প্রকৃত বসন্ত হয় নাই উহা পানিবসন্ত মাত্র।

বসন্তবীজ দেহপ্রবিষ্ট হইলে চর্মমধ্যে প্রথমে প্রদাহ উপস্থিত হয়। পরে
ঐ প্রদাহগত স্থানে ওটিকোদগম হইয়া থাকে। বসন্তমধ্যে রস সঞ্চিত হইয়া যে
“লিম্ফ” (Lymph) উৎপন্ন হয়, উহাট এই রোগের বীজ। ঐ বীজ অপর
কোন ব্যক্তির রক্তের সচিহ্ন মিশ্রিত হইলে তাহারও বসন্ত হইয়া থাকে।
বহুদূর দূর অস্ত্রান্ত জীবেরও বসন্ত হয়। গোজাতির মধ্যে ইহার প্রাদুর্ভাব যথেষ্ট।
অধুনা গো-বসন্তের বীজ লইয়া এই রোগের প্রতিরোধক টিকা দেওয়া হইতেছে।

বসন্ত-রোগীকে কনকাল ও বিলম্ব না করিয়া এক পৃথক ঘরে রাখা উচিত। এই সঙ্গে সঙ্গে সম্ভব হইলে বাড়ীর অস্তিত্ব লোককে ও দানাদরে পাঠান সুব্যবস্থা। রোগীর গৃহ প্রণয় ও বায়ুপূর্ণ চত্বর চাহি। তাহার অনাবশ্যক দ্রব্যাদি রাখা কখন উচিত নহে। কয়েকখানি বস্ত্র কার্জনিক লোষণে নিমজ্জিত করিয়া এই কক্ষের আনালা ও দরজার কৃণাইয়া রাখিবে এবং ঘরের মেঝেটি মধ্যে মধ্যে পরি-শোধক জলে দৌত করিয়া ফেলিবে। রোগীকে সর্বদা মশারির মধ্যে রাখিবে কারণ, বসন্তের ক্ষেত্রে মক্ষিকাদি বসিয়া রোগ-বিস্তার করিতে পারে। রোগীকে নত্ন তত্ন কক-কানাদি ফেলিতে দেওয়া নিষিদ্ধ একটি পাত্রে পরিশোধক জল রাখিয়া উহাতেই কক, কাণ নিক্ষিপ্ত করিতে উপদেশ দিবে। রোগী নিরানন্দ হইলেও তাহাকে কিছু দিন পৃথক বাস করাইবে। সুস্থসঙ্গে আসিবাস পূর্বে অস্তুতঃ দুই তিন বার কোন পরিশোধক জলে তাহাকে বান করাইয়া লইবে। তাহার ব্যবহৃত শয্যা, বস্ত্র, কমাল, ভোজনপাত্র প্রভৃতি নষ্ট করিয়া ফেলাই সর্বদ্য তদভাবে পরিশোধক জলে নিমজ্জিত ও ফুটন্ত জলে সিদ্ধ করিয়া ব্যবহার করিবে বসন্ত-রোগীঃ পুঃ কার্জনিক লোষণ বা তহঃ কোন জলে উত্তমরূপে দৌত করিয়া চণকাম করিয়া লইবে।

যাহারা অল্প দিন হইল টিকা গ্রহণ করিয়াছে, অথবা বাহাদের একবার বসন্ত রোগ হইয়াছে, এমন লোকই বসন্ত রোগীর পরিচর্যা করিবার উপযুক্ত পাত্র। সংক্রামক রোগীর পরিচর্যা করিতে হইলে বেশকণ নিয়ম অবশ্য প্রতিপালন করিতে হয়, এই সকল পরিচর্যাকারী সেগুলি নাক্ত করিতে কদাচ উপ-বেশ না।

টিকা গ্রহণই বসন্তের শ্রেষ্ঠ প্রতিষেধক। বাড়ীতে বা গ্রামে বসন্ত দেখা দিলে কালবিলম্ব না করিয়া সকলেই টিকা গ্রহণ করিবে। বাংলাকালে একবার টিকা হইয়াছে বলিয়া কখনই নিশ্চিত থাকিবে না। পূর্বকালে এ দেশে বসন্ত রোগা-ক্রান্ত মাহুকের বীজ গইরা টিকা দিবার পদ্ধতি ছিল। উহাকে "ইন্‌অকুলেশন" বলা হইত। ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে জনট্রাণ্টিনোপল নামক স্থানে এই "ইন্‌অকুলেশন" প্রথা সর্বপ্রথম প্রচলিত হয়। কিন্তু এই টিকা অনেক সময় মারাত্মক হইয়া উঠিত। এ ডল ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আমাদের সদাশয় গভর্ণমেন্ট উহার পরিবর্তে "ভ্যাকসিনেশন" অর্থাৎ গোবসন্তের বীজ টিকা দিবার নিয়ম বিধিষ্ট করিয়াছেন। ১৭২৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে, ১৭২৯ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকায় এবং

• আমাদের দেশে "আরোগা-হানের" সময় বিদ্যপত্র সহ ত্রিভা বাটিয়া গাত্রে লেশন করা হয়। উহার দ্বারা রোগ-বীজ বিনষ্ট হইতে পারে।

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী দেশে প্রথম “ভ্যাকসিনেশন” (Vaccination) আরম্ভ হইল। ইংলণ্ডের সুবিখ্যাত ডাক্তার জেনার মহোদয় ইহার প্রবর্তক। আজ সেই চিরস্মরণীয় জেনারের রূপান্তর চুরিকার অগ্রভাগে এক বিদ্যুৎ গো-বীজ লইয়া আমরা ভীষণ নামক-শত্রু বসন্ত রোগের আক্রমণ হইতে আশ্রয়লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছি। বসন্তবীজ বহনযোগ্য প্রবীণ করাইয়া এই দুই ব্যাধির হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইবার চেষ্টা প্রাচীন নিমগ্ন, চীন, তাতার প্রভৃতি দেশবাসীরাও করিত। তবে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন পন্থা অবলম্বিত হইত। চীন দেশে পুত্রের পরিবর্তে গুটিকান করু, নাসারুদ্ধে প্রবীণ করান হইত। স্বটলকে যত শিশুকে বসন্ত রোগের সন্ততি এক শস্যায় রক্ষা করা হইত। কোন কোন স্থানে বসন্ত রোগের পুরসংস্কৃত যত শিশুর হস্তে বাঁধিয়া দেওয়া হইত। আবার কোপায় বা বসন্তের শুক করু শিশুর কোমল হস্তে অথবা পদতলে ঘর্ষণ করিবার রীতি ছিল।

শরীর স্বরূপ থাকিলে প্রত্যেক তিন বাস বসন্ত শিশুকে টিকা দেওয়া উচিত। প্রথম বৎসর বয়সে ও ষোল্লবৎসর বয়সে আবার টিকাগ্রহণ করা আবশ্যিক। এতদ্-ভিন্ন বসন্তের “এপিডেমিক” সময়ে কালাকাল বিচার না করিয়া সকলের পক্ষেই নতুন টিকা গ্রহণ করা সমীচীন। পরীক্ষানে প্রথমতঃ গো-বীজে একটি শিশুকে টিকা দেওয়া হয়। পরে ঐ শিশুর বসন্ত হইলে তাহার হস্ত হইতে বীজ লইয়া আবার অল্প শিশুকে প্রদত্ত হয়। এই প্রথা সম্পূর্ণ নির্দোষ নহে। যে শিশুর বীজ গ্রহণ করা হয়, তাহার শরীরে উপদংশাদি রোগ থাকিলে ঐ রোগবিধ সঙ্গে সঙ্গে অল্প ক্ষেত্রে সংক্রমিত হইতে পারে। এই দোষ নিবারণের জন্য আজ কাল প্রত্যেক স্থানে গভর্ণমেন্ট কর্তৃক দখলি পরিমাণে গো-বীজ প্রেরিত হইতেছে।

কোন কোন বিজ্ঞ চিকিৎসক বলেন, গন্ধভুক্ত এই-রোগের প্রতিষেধক। রোগের প্রাদুর্ভাবকালে প্রত্যেক লোক অর্দ্ধ কাঁচা পরিমাণ এই দুই পান করিলে বসন্তের কণ্ঠ হইতে নিগ্ৰাহ পাইতে পারেন। কিন্তু টিকা গ্রহণের দ্বারা আর কোন শব্দহাই এই রোগের স্থানিক্তি প্রতিষেধক নহে।

শ্রীস্বরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ।